প্রচেত গুপ্ত

পঞ্চাশটি গল্প

পঞ্চাশটি গল্প • প্রচেত গুপ্ত

অতলান্ত জীবনের বিচিত্র হীরকদ্যুতি ধারণ করে থাকে ছোটগল্প। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাস্পর্শে আলোকিত ছোটগল্প প্রথমাবধি সাহিত্যরসিকের কাছে সমাদৃত। অল্প পরিসরে বৃহৎকে ধরাই ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য। এই সময়ের পাঠক-অভিনন্দিত গল্পকার প্রচেত গুপ্ত-র 'পঞ্চাশটি গল্প' প্রকাশিত হল। প্রচেত-র গল্পগুলির এক-একটা স্তরে এক-এক রকম সৌন্দর্য, এক-এক রকম রহস্য। কখনও আলো পড়ে ঝলমল করে, অন্ধকারে গা-ছমছম করে ওঠে কখনও-বা। গভীর বলেই গল্পগুলি তৈরি করে এক ধরনের ঘোর। সেই আবেশ থেকেই আসে মুগ্ধতা। প্রচেত-র ভাষা ও গল্প বলার ভঙ্গিতে এমন জাদু আছে, পাঠক নিঃশব্দে কখন যেন একাত্ম হয়ে পড়েন। জীবনের সুখ-দুঃখ, পাওয়া না-পাওয়া, সময়ের অস্থিরতা, প্রেম, ভেঙে-পড়া মূল্যবোধ প্রতিফলিত হয়েছে 'পঞ্চাশটি গল্প'-এ। প্রতিটি গল্পই ছুঁয়ে যায় অনুভূতির শিখরদেশ।

প্রচেত গুপ্তর জন্ম ১৯৬২ সালের ১৪ অক্টোবর কলকাতায়। বাবা ক্ষেত্র গুপ্ত, মা জ্যোৎস্না গুপ্ত শিক্ষা জগতের মানুষ। ছোটবেলা থেকেই পারিবারিক ভাবে সাহিত্যের পরিমণ্ডলে বড় হয়েছেন। অর্থনীতিতে স্নাতক হয়ে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নেন। অল্পদিনেই লেখক হিসেবে জনপ্রিয়। ইংরেজি, হিন্দি, ওড়িয়া সহ বিভিন্ন ভাষায় গল্প অনুবাদ হয়েছে। বিশিষ্ট পরিচালক তরুণ মজুমদার তাঁর চাঁদের বাড়ি উপন্যাসটি নিয়ে চলচ্চিত্র করেছেন। এছাড়াও তাঁর বহু গল্প নিয়ে চলচ্চিত্র, নাটক, টেলিফিল্ম হয়েছে। বাংলা আকাদেমি প্রবর্তিত সুতপা রায়চৌধুরী স্মৃতি পুরস্কার, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার সহ বিভিন্ন পুরস্কার পেয়েছেন।

৩৫০.০০

ISBN 978-81-7756-958-2

প্রচ্ছদ দেবাশিস সাহা

পঞ্চাশটি গল্প

প্রচেত গুপ্ত

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ২০১০

© প্রচেত গুপ্ত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 978-81-7756-958-2

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং বসু মুদ্রণ ১৯এ সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪ থেকে মুদ্রিত।

PANCHASTI GALPA
[Stories]
by
Pracheta Gupta
Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

সূচিপত্র

জ্যোৎস্নার রেল স্টেশন ১
চোরের বউ ১৪
ফ্লাইওভার ২৮
পেঁচা ৩৩
নদী ৪৯
সখী ৫৬
কথা ৭০
হলুদ গোলাপ ৭৬
নীল ৮৮
আহা! আজি এ বসন্তে ১০১
ধর্ষিতা ১১০
মেয়েটা ১২০
যে যা পারে না ১৩০
মোবাইল ১৩৫
গৃহত্যাগী ১৪০
পালিয়ে ১৪৯
অচেনা ১৫৩
ইমেল বিছানো পথে ১৬২
আজ কি শুভ্র আসবে ১৭৪
মেঘ-বৃষ্টি ১৮২
ডাস্টবিন ১৯৬
কুঞ্জবিহারীর দুঃস্বপ্ন ২০৫
দিঘি ২১৭
নেতা ২২৪
তালিকা ২৩৪
চেয়ার ২৪৩
সন্ন্যাসী ২৪৮
ব্যথা ২৫৬
কৃষ্ণচূড়া ২৭২
মৃত ২৮৩
আমি ও মানালি ২৯৬
পুঁইশাক ৩০৫
কালবৈশাখী ৩১১
চাপা ৩২২
গর্ত ৩৩১
হিরে ৩৪৬
গুহা ৩৫৪
পোস্টম্যান ৩৬৩
মূর্তি ৩৭৩
নিকুঞ্জবাবু ৩৭৮
জলছাপ ৩৯০
গোলাপি জামা ৪০৩
চন্দ্রাহত ৪১০
লাস্ট ট্রেন ৪২০
শ্রাবণের হানিমুন ৪৩১
দাঁত ৪৩৫
মাটির মেডেল ৪৪৬
রক ফেস্টিভাল ৪৬০
এবার পুজোয় ৪৬৬
নীলকণ্ঠ ৪৭১

জ্যোৎস্নার রেল স্টেশন

১

'ডাকাত! ডাকাত!'

বাজখাঁই গলার চিৎকারে ঘুমটা ভেঙে গেল। আমি চোখ খুললাম। ট্রেন কি চলছে? নাকি থেমে আছে? ট্রেনের এই একটা মজা। অনেকক্ষণ চলার পর থেমে গেলেও বোঝা যায় না। বাইরের বদলে ট্রেন তখন চলতে থাকে শরীরের ভেতরে। ভেতরের সেই ট্রেনটা মাঝেমধ্যে হুইস্‌ল দেয়, ঘটাং ঘটাং করে নদীর সাঁকো পেরোয়!

উঠে বসলাম! না, ট্রেন থেমেই আছে। কামরা অন্ধকার। তবে একেবারে অন্ধকার নয়। কোথা থেকে যেন আবছা একটা আলো আসছে। এই তো ঘুমোনোর আগেই দেখেছি, করিডরে নীল রঙের ডুমো ডুমো আলো জ্বলছিল। সেগুলোর কী হল? ট্রেন থামার সঙ্গে আলোও নিভে গেল! আবছা আলোটা কোথা থেকে আসছে? নিশ্চয় কোনও জানলা খোলা।

আবার চিৎকার।

সাবধান সকলে! খুব সাবধান! জানলা টানলা বন্ধ করে দিন। যে-কোনও মুহূর্তে ডাকাত পড়তে পারে।

ঝপ ঝপ শব্দ। আবছা আলোটাও চলে গেল। মনে হয়, ভয় পেয়ে খোলা জানলাটা কেউ বন্ধ করে দিল। বাঃ, এবার একেবারে পুরো অন্ধকার। সত্যি যদি ডাকাত পড়ে তাদের খুব সুবিধে হবে। ক'টা বাজে? কত রাত?

আমি আপার বার্থে আছি। আমার উলটোদিকের বার্থে তমাল। ট্রেনে উঠেই গভীর মনোযোগ সহকারে ফুঁ দিয়ে হাওয়া বালিশ ফুলিয়েছে। তারপর চাদর টেনে শুয়ে পড়েছে। শোওয়ার আগে বলল, 'আমাকে বিরক্ত করবি না, সাগর। মেজাজ ভাল নেই। ডাকাডাকি করবি না একদম।'

'তুই কি চাদর মুড়ি দিয়ে শুবি?'

তমাল ভুরু কুঁচকে বলে, 'কেন মুড়ি দিয়ে শোব কেন?'

আমি সামলে নিয়ে বললাম, 'না, তেমন কিছু নয়। তবে মুখ ঢেকে শুলে ভাল হয়। তোর ওই পেঁচার মতো মুখ যত কম দেখা যায়। বেড়াতে যাওয়ার সময় বেজার মুখ দেখতে নেই। অমঙ্গল হয়।'

চাপা গলায় দাঁত কিড়মিড় করে তমাল বলল, 'তোর কি মনে হচ্ছে, আমি বেড়াতে যাচ্ছি? তোর তাই মনে হচ্ছে?'

না, তমাল বেড়াতে যাচ্ছে না। ছন্দার সঙ্গে তুমুল ঝগড়ার কারণে সে গৃহত্যাগী হচ্ছে। গৃহত্যাগী না বলে কলকাতাত্যাগী বলাই উচিত। তবে পাকাপাকিভাবে নয়। আপাতত অফিস থেকে দিন দশেকের ছুটি নিয়েছে।

তবে গৃহত্যাগের মুখে দাঁড়িয়ে সে একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই সিদ্ধান্তের সময় আমি ছিলাম তার সঙ্গে। সেদিন ওর পাশে বসে, ওর পয়সাতেই চা খাচ্ছিলাম।

নিয়ম হল, খিদের সময় চা খেলে খিদে মরে দরকচা মেরে যায়। তবে আমার ক্ষেত্রে দেখেছি, বেশিরভাগ সময়ই নিয়ম ফেল মারে। সেদিনও চায়ের নিয়ম ফেল মারল। যত চা খেতে লাগলাম, আমার খিদে তত বাড়তে লাগল। বুঝতে পারলাম, সলিড কিছু খেতে হবে। পকেটের যা অবস্থা, তাতে সলিড কিছু হবে না। এই টানাটানির সময়গুলোতে তমালই আমার ভরসা হয়। চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে উদাস মুখে তমাল বলল, 'ধুস, যদি দশ দিন পরেও মন-মেজাজ ঠিক না হয়, তা হলে ভাবছি আর ফিরবই না। এখানে থেকে কোনও লাভ নেই। কেউ শালা দামই দিল না।'

আমি তলানির চাটুকুও চুমুক মারলাম। বললাম, 'খুবই ভাল সিদ্ধান্ত। তোর বাইরে কোথাও থেকে যাওয়াই উচিত। যেখানে কেউ দাম দেয় না সেখানে তুই থাকবি কেন? আমি একটা সামান্য, বেকার, ফালতু ধরনের ছেলে, তবু দাম না দিলে থাকি না। এই যেমন তুই এখন কাছাকাছি একটা কোনও খাবার হোটেলে আমাকে নিয়ে যাবি, আমি সেখানে পেটপুরে লাঞ্চ সারব এবং তুই দাম দিবি। দাম দিবি বলেই না আমি তোর সঙ্গে থাকব।'

তমাল ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'রসিকতা করছিস সাগর? একটা বন্ধু বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছে, আর তুই রসিকতা করছিস?'

না, ছেলেটার অবস্থা মনে হচ্ছে, সত্যি খুবই খারাপ। ছন্দার সঙ্গে তার ঝগড়া নতুন কোনও ঘটনা নয়। গত তিন বছর ধরে এই কাণ্ড চলছে। প্রতি মাসে দু'জনের কমপক্ষে ছ'বার করে ঝগড়া হয়। তার মধ্যে কয়েকটা থাকে মারাত্মক ধরনের। একেবারে সম্পর্ক ছাড়াছাড়ি পর্যন্ত ঘটনা গড়ায়। যে যার পথ দেখে। এবারেরটা মনে হচ্ছে, সেই মারাত্মকেরও বেশি। তমাল কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে কেন? ছন্দা কি মারধরের হুমকি দিয়েছে? দিলে খারাপ করেনি। বিয়ে-থা'র আগে সব মেয়েরেই উচিত সুযোগ থাকলে হবু বরকে আগাম দু'-এক ঘা দিয়ে রাখা। এতে পরের দিকে সহজে কন্ট্রোল রাখা যায়। যাক, আমার এসবের মধ্যে থেকে লাভ নেই। ওদের মারধর, ওদের ভালবাসা ওরা নিজেরা বুঝুক গে। আমার এখন খিদে পেয়েছে।

গম্ভীর হয়ে বললাম, 'হ্যাঁ, রসিকতা করছি। সম্প্রতি আমেরিকার কোনও একটা বিশ্ববিদ্যালয় যেন খিদে এবং রসিকতা নিয়ে বড় ধরনের কাজ করেছে। দীর্ঘ গবেষণার পর তারা জানতে পেরেছে, খিদের সঙ্গে খাবার ছাড়া একমাত্র মোকাবিলা করতে পারে হাসি ঠাট্টা। তমাল তুই যদি মনে করিস, এই সিদ্ধান্ত আকাশ থেকে নেওয়া হয়েছে, তা হলে খুবই ভুল করবি। আফ্রিকার কয়েকটা দুর্ভিক্ষ পীড়িত এলাকার মোট সাতশো বাইশ জনের ওপর দীর্ঘ তিন বছর ধরে নিবিড় পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। অভুক্ত মানুষকে রুটিন করে জোকস্ এবং হাসির গল্প শোনানো হয়েছে। সকালে এক ঘণ্টা, বিকেলে চল্লিশ মিনিট। সেই পরীক্ষার

ফলাফল শুনলে তুই হাঁ হয়ে যাবি তমাল। খেতে না পাওয়া হাড়গিলে মানুষগুলো হাসতে হাসতে নাকি একেবারে কেলেঙ্কারি কাণ্ড বাধিয়েছে! কেঁদে কেটে একসা।'

তমাল অবাক হয়ে বলল, 'কেঁদে কেটে কেন? এই তো বললি হাসি। বললি না?'

আমি বিজ্ঞের মতো হেসে বললাম, 'ওরে এই কান্না কি আর সেই কান্না রে গাধা? এ হল গিয়ে তোর আনন্দের কান্না। খিদে ভুলে যাওয়ার আনন্দ। ওদের প্রত্যেকের চোখের জল কালেক্ট করে ল্যাবরেটরিতে টেস্ট করা হয়েছিল। দেখা গেছে, সব অশ্রুই হল আনন্দাশ্রু। আমি সেই কারণেই রসিকতা করছি। তুই গৃহত্যাগী হওয়ার আগে আমাকে একটা হাসির বই প্রেজেন্ট করে যাস তো। মোটা দাগের কোনও জোকস হলে ভাল হয়। হাসতে হাসতে যেন পেটে খিল ধরে যায়। আমার আর্থিক অবস্থা যেরকম চলছে, তাতে সামনের কয়েকদিন মনে হচ্ছে, শুধু হাসি ঠাট্টার মধ্যেই থাকতে হবে। তুই গৃহত্যাগ করছিস মানে আরও বিপদ।'

তমাল মাথা নামিয়ে বলল, 'চল, কোথায় খাবি?'

গোটা খাওয়ার পিরিডটায় তমাল মুখটাকে হাঁড়ির মতো করে রাখল আর মাঝেমধ্যে বিড়বিড় করতে লাগল। মনে হয়, নিজের মনেই ছন্দার সঙ্গে ঝগড়া করছিল। কিন্তু খাওয়াল খুব যত্ন করে। পাবদা মাছটা তো অতি চমৎকার। তমাল জোর করে দুটো দিতে বলল। শেষ পাতে আমের চাটনি আর দই। আমি সামান্য একটা মানুষ। এত যত্ন পেলে লজ্জা করে। চোখে জল চলে আসে। একেই সম্ভবত বলে আনন্দাশ্রু। আমি নিজেকে সামলে ঢেকুর তুললাম। বেশ একটা সাধু সাধু ভাব করে বললাম, 'বৎস, আমি তোমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট। অতি সন্তুষ্ট। এবার বলো, আমি তোমার কী উপকার করতে পারি?'

তমাল ফট করে বলল, 'সাগর, আমার সঙ্গে যাবি?'

আমি চমকে উঠলাম। ছেলেটা বলে কী!

'আমি! আমি কেন গৃহত্যাগ করব তমাল? আমার প্রেমও নেই, গৃহও নেই। ভাড়া বাড়িতে থাকি। তিন মাসের ভাড়া বাকি। যে-কোনও সময় ওরাই আমাকে ত্যাগ করবে।'

'বাজে কথা রাখ। আমার মেজাজের যা অবস্থা, তাতে মনে হচ্ছে, একলা যাওয়াটা রিস্কের হয়ে যাচ্ছে। শুনেছি, এই সময়টা সুইসাইডের দিকে একটা ঝোঁক আসে। ট্রেন ফেন থেকে ঝাঁপ না দিয়ে বসি। সঙ্গে পাহারার জন্য একজনের থাকা দরকার। তুই আমাকে চোখে চোখে রাখবি। খরচ টরচ সব আমার। তা ছাড়া, তোর তো সুবিধেই হল, ক'টাদিন খাওয়া-টাওয়া নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।'

গৃহত্যাগীর পাহারাদার! বাঃ, চাকরিটা বেশ তো! তার ওপর বেড়ানোও হয়ে যাচ্ছে। দশ দিনের জন্য লাঞ্চ, ডিনার, চিফিন, চা-সিগারেট নিয়ে নো চিন্তা। তারপর যদি তমাল গৃহত্যাগের ব্যাপারটা পাকাপাকি করে ফেলে তা হলে তো আর কোনও কথাই নেই। প্রভিডেন্ড ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বোনাস টোনাস নিয়ে মন দিয়ে চাকরি করব।

আমি বললাম, 'রাজি।'

তমাল বলল, 'গুড। তা হলে রেডি হয়ে নাও। তবে একটা শর্ত আছে। যতদিন আমার সঙ্গে থাকবে ততদিন ওই মেয়ের নাম একবারের জন্যও মুখে আনতে পারবে না।'

আমি অবাক হওয়ার ভান করে বললাম, 'কোন মেয়ে? কার কথা বলছিস তমাল?'

'ওই যে ওই মেয়ে। নাম শুনলে আমার মাথায় আগুন জ্বলে যাবে। তোকে মেরেও দিতে পারি।'

আমি মৌরি চিবোতে চিবোতে বললাম, 'বয়ে গেছে আমার উচ্চারণ করতে। তোর খরচে খাব-দাব, বেড়াব। অন্যের নাম বলতে যাব কোন দুঃখে? আমি শুধু তোর নামই বলব। যার নুন খাই তার গুণ গাই। আচ্ছা, ছন্দার নিন্দে করা যাবে কি?'

তমাল কড়া চোখে তাকিয়ে বলল, 'নিন্দে, প্রশংসা কিচ্ছু করতে হবে না। সাগর, তুই কি জানতে চাস আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

আমি একটা দার্শনিক দার্শনিক ভাব করে বললাম, 'না, জানতে চাই না। গৃহত্যাগের কোনও ঠিকানা থাকে না। কুড়িটা টাকা দে তো।'

তমাল চলে যাওয়ার পরই আমি ঠিক করলাম, কুড়ি টাকার ফুল কিনব। কিনে ছন্দার অফিসে যাব। ওর হাতে ফুল তুলে দেব। ও অবাক হয়ে বলবে, 'ফুল এনেছেন কেন? নিশ্চয় কোনও মতলব আছে?' আমি হেসে বলব, 'তুমি এত বড় একটা কাজ করেছ, শুধু হাতে ধন্যবাদ দেওয়া যায় না। সেইজন্য ফুল এনেছি।'

শুধু ধন্যবাদ নয়, ধন্যবাদের সঙ্গে ছন্দাকে অনুরোধও করব। বছরে যদি ও অন্তত দুটো এ ধরনের বড় ঝগড়ার ব্যবস্থা করতে পারে, আমার ফ্রি-তে থাকা, খাওয়া এবং বেড়ানোটা হয়ে যাবে। ছন্দা কি আমার অনুরোধ রাখবে? মনে হয় না রাখবে। মেয়েটা আমার কোনও অনুরোধই রাখে না। উলটে মাঝেমধ্যেই ধমক ধামক দেয়।

'আপনার জন্য তমাল পাগলামি করতে পারে, কারণ সে আপনার বন্ধু। তাকে সেটা মানায়। আমি করব কেন? আমি তো আপনার বন্ধু নই। সুতরাং কথা না বাড়িয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে যান। আমার অনেক কাজ আছে। আর হ্যাঁ, যাওয়ার আগে এই প্যাকেটটা দয়া করে নিয়ে যাবেন। এটায় আপনার জন্য একটা জামা আছে। রং পছন্দ হলে পরবেন। না হলে ফেলে দেবেন। তবে দয়া করে আমাকে দেখাতে আসবেন না।' এই মেয়ে আমার অনুরোধ কেন রাখবে?

আশ্চর্য, ছন্দা সেদিন আমার অনুরোধ রাখল! প্রথমটায় গাঁই গুঁই করছিল। শেষপর্যন্ত রাজি হয়েছে। আমি এত খুশি হলাম, মনে হল ছন্দার অফিসের মধ্যেই একটা লাফ মারি। সাহস হল না। বেকার মানুষের কাজের জায়গায় লাফালাফি করা মানায় না।

আবার কে যেন চিৎকার করে উঠল, 'ডাকাত পড়তে পারে... ডাকাত। সাবধান সবাই...।'

সত্যি ডাকাত পড়বে নাকি? তমালকে ডাকব? থাক, দরকার নেই। যে মানুষ সব ছেড়ে ছুড়ে বিবাগী হওয়ার প্ল্যান নিয়েছে তার কাছে ডাকাতই বা কী? সন্ন্যাসীই বা কী? ঘুমোচ্ছে ঘুমুক। আহা, বাড়ি ঘর ছেড়ে এসে এমন নিশ্চিন্তে কতজনই বা ঘুমোতে পারে?

ক্রমশ অন্ধকারটা একটু চোখ সওয়া হয়েছে। ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে অনেকেই। একজন দু'জন হাঁটা-চলাও করছে। বার্থের ওপর থেকে আমি ঝুঁকলাম। কে যেন ফস করে একটা টর্চ জ্বালল। হলুদ রঙের আলোর বল লাফিয়ে উঠল কামরায়। অমনি বাজখাঁই গলার ধমক— 'টর্চ কে জ্বালালেন? নিভিয়ে ফেলুন, নিভিয়ে ফেলুন এখুনি। আলো দেখলেই কামরাটা টার্গেট হয়ে যাবে।'

যে টর্চ জ্বালিয়েছিল সে বোধহয় ধমক শুনে রেগে গেল। বলল, 'রাখুন মশাই, আপনার টার্গেট। তখন থেকে ডাকাত ডাকাত করে চেঁচাচ্ছে। কী এমন সোনাদানা নিয়ে ট্রেনে উঠেছেন? সঙ্গে মেয়েছেলে আছে। অন্ধকারে কেউ গায়ে হাত টাত দিয়ে দিলে কী হবে? ধরতেও পারব না।'

এতক্ষণ সবাই চুপ করে ছিল। এই মারাত্মক কথার পর গোটা কামরায় একটা শোরগোল পড়ে গেল। চোর ডাকাত সব মাথায় উঠল।

'অ্যাই, টর্চটা দাও। শিগগিরই দাও।'

'শিগগিরই দেব কী করে? কিছু দেখতেই তো পাচ্ছি না।'

'উফ তোমাদের নিয়ে বেরোনোটাই ভুল হয়েছে। নীল ব্যাগের চেনের মধ্যে আছে। হাত ঢুকিয়ে দেখো।'

'লাল, নীল কিচ্ছু বুঝতে পারছি না। অন্ধকারে সব একরকম দেখাচ্ছে।'

'আচ্ছা ছাড়ো, আমি দেখছি।'

'এই যে দাদা, আমার ব্যাগটা টানাটানি করছেন কেন?'

'ভাই, আমি কি ইচ্ছে করে টানছি? ঝগড়া করছেন কেন?'

'অ্যাই চোপ।'

'এদিকে ঘেঁষছেন কেন? দেখছেন না, আমার মেয়েটা শুয়ে আছে। নিজের জায়গায় ঠিক করে বসুন।'

'মুখ সামলে কথা বলবেন দিদি।'

'ওফ, মোবাইলটা কাজ করছে না।'

'মোবাইল দিয়ে কী হবে? পুলিশ ডাকবেন?'

'চোপ।'

'ও টিকিট চেকার দাদা, আপনি কোথায় গেলেন!'

'কোথায় আর যাবে। নেমে জঙ্গলের মধ্যে হাঁটা মেরেছে।'

বলতে বলতে ঝপাঝপ অনেকগুলো টর্চ জ্বলে উঠেছে। ওদিকে কে যেন একটা মোমবাতিও জ্বেলেছে। আমার নিজের কোনও আলো নেই। না টর্চ, না মোমবাতি। তাতে এখন আর কোনও অসুবিধে নেই। অন্যের আলোতেই আমার কাজ চলবে। আমি নেমে এলাম। বাঙ্কের তলা হাতড়ে পায়ে চটি গলালাম। নিশ্চয় ভুল চটি পরেছি। থাকুক। এরকম পরিবেশে ভুল চটিই জমবে।

তবে ট্রেন যদি আরও খানিকক্ষণ এই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে, আমাকে একবার নামতে হবে। নামতেই হবে।

'সাগরকাকু, ট্রেন কোথায় দাঁড়িয়ে আছে?' আমি মিডল বাঙ্কের দিকে ঝুঁকে, গলা নামিয়ে বললাম, 'অ্যাই, তুই কোনটা রে? বঙ্কা না ঝঙ্কা?'

'বঙ্কা। বলো না, ট্রেন কোথায় দাঁড়িয়ে আছে?'

তার মানে এটা ঝঙ্কা। বছর দশেকের যমজ ছেলে দুটো কাল সন্ধে থেকে এই খেলা শুরু করেছে। নাম গুলিয়ে দিচ্ছে। ওরা ওদের বাবার সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে। দুটোই

ভয়ংকর রকমের পাজি এবং বুদ্ধিমান। মুখগুলো সুন্দর আর দেখতে প্রায় একইরকম।

ওদের বাবা ট্রেনে ওঠার পর থেকেই দুই ছেলেকে বকা ঝকার ওপরে রেখেছেন।

'বঙ্কা-ঝঙ্কা জানলা বন্ধ করে দাও। বঙ্কা-ঝঙ্কা বাঙ্ক থেকে নামবে না। বঙ্কা-ঝঙ্কা অতবার বাথরুমে কেন যাচ্ছ? বঙ্কা-ঝঙ্কা মারপিট করবে না। বঙ্কা-ঝঙ্কা লুডো খেলা বন্ধ করো। বঙ্কা-ঝঙ্কা শুয়ে পড়ো। বঙ্কা-ঝঙ্কা চড় খাবে।'

আমার মনে হয়, এত বকা ঝকার কারণেই ওদের এরকম নাম। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও বুঝতে পারলাম না, কোন নামটা কার। ওদের বাবা সবসময়ই দু'জনকে একসঙ্গে ডাকছেন। যেন দুটো ছেলে মানে একজনই! এদের মা কোথায়?

ভদ্রলোক বাথরুমে যেতে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোরা কে বঙ্কা, আর কে ঝঙ্কা রে?'

ওরা লুডো খেলছিল। একজন চাল দিতে দিতে গম্ভীর মুখে বলল, 'আমি বঙ্কা আর ও ঝঙ্কা।' সঙ্গে সঙ্গে পাশের জন মিটিমিটি হেসে বলল, 'না কাকু, ঝঙ্কা মিথ্যে বলছে। আমি বঙ্কা। ও সবসময় এরকম করে। উলটোটা বলে।' অন্যজন হাত তুলে বলল, 'অ্যাই ঝঙ্কা, চড় খাবি।'

বাঃ বেশ মজা তো! আমি ওদের সঙ্গে লুডো খেলতে বসে গেলাম। তমালকে বললাম, 'অ্যাই তমাল, লুডো খেলবি? আরে বাবা, ট্রেনে একটু লুডো খেলতে হয়। নইলে রেল কোম্পানি ফাইন নেবে। আয়, নেমে আয়।'

নেমে আসার তো দূরের কথা, তমাল আমার দিকে আগুন চোখে তাকিয়ে পাশ ফিরল। বঙ্কা-ঝঙ্কা আমার কথায় খুব হাসতে লাগল। তারপর দ্রুত ঝগড়া ভুলে দুই ভাই নিজেদের মধ্যে হাত মেলাল এবং নানা ধরনের গোলমাল পাকিয়ে আমাকে হারানোর চেষ্টায় মেতে উঠল। বাপ রে, দু'জনের এত ভাব! ওদের বাবা ফিরে এসে বললেন, 'এদের থেকে সাবধানে থাকবেন মশাই। দুটোই অতি বিপজ্জনক।'

আমি হেসে বললাম, 'কোথায় বিপজ্জনক? আমি তো দেখছি চমৎকার।'

চমৎকার শুধু এরা নয়, এদের বাবাটিও চমৎকার।

পরে পরিচয় হতে জানতে পারলাম, তিন বছর হল ভদ্রলোকের স্ত্রী মারা গেছে। স্ত্রীর মৃত্যুর তারিখটিতে উনি কখনও বাড়িতে থাকেন না। প্রতি বছরই দুই ছেলেকে নিয়ে বাইরে কোথাও চলে যান। উনি চান না, মা সম্পর্কে গভীর দুঃখের স্মৃতি এই ফুটফুটে দুই বালকের ওপর চাপ তৈরি করুক। তাদের মা হইচই ভালবাসত। তার সন্তানেরাও হইচইয়ের মধ্যে মাকে মনে রাখুক।

'বঙ্কা, হয়তো কোনও গভীর জঙ্গলের মধ্যে ট্রেন দাঁড়িয়ে গেছে।'

ছেলেটা উঠে বসল। ফিসফিস করে বলল, 'দারুণ ব্যাপার, সাগরকাকু। ডাকাত আসবে?'

আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'পরিস্থিতি যা তাতে মনে তো হচ্ছে, আসবে।'

উলটোদিকের বার্থে ঝঙ্কাও উঠে বসেছে। বলল, 'ডাকাত কীসে চেপে আসবে কাকু? ঘোড়ায় চেপে?'

'না রে, গাধায়। হি হি।' বঙ্কা হেসে উঠল। আমি বললাম, 'অ্যাই, তোরা চুপ কর। বাবা

উঠে পড়লে কিন্তু বকবে। এখন শুয়ে থাক, আমি বরং ডাকাতের ব্যাপারটা খোঁজ নিয়ে আসি। এসে তোদের জানাচ্ছি।'

বঙ্কা ফিসফিস করে বলল, 'ঠিক আছে, তাড়াতাড়ি যাও। আমরা অপেক্ষা করছি। ডাকাত এলেই ছুটে এসে আমাদের খবর দেবে।'

ঠোক্কর খেতে খেতে গেটের কাছে এসে দেখলাম, সেখানে জটলা।

চিমসে ধরনের একটা লোক দরজা আটকে দাঁড়িয়ে। হাতে লম্বা টর্চ। সেটা নাড়াচ্ছে এবং ভাষণ দিচ্ছে। বাকিরা শুনছে।

'শালা, দেশটার এইজন্য কিছু হল না। এতগুলো লোককে এই যে রাত দুপুরে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে রেখে দিয়েছে, এর সিকিউরিটিটা কী? নো সিকিউরিটি। এই যদি বিদেশ হত, তা হলে দেখতেন কয়েক মিনিটের মধ্যে মাথার ওপর হেলিকপ্টার ভোঁ ভোঁ করত। বিদেশের ব্যাপার স্যাপারই আলাদা। এখন এখানে একটা গুড-ব্যাড কিছু হয়ে গেলে কে রেসপনসিবিলিটি নেবে?'

সামনের লোকটা কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, 'গুড-ব্যাডের কথা কী বলছেন ভাই?'

চিমসে ছেলেটা প্রশ্নকর্তার মুখের ওপর দু'বার টর্চ নেড়ে বলল, 'কী বলছি বুঝতে পারছেন না? ভাল-মন্দ কিছু হলে বুঝতে পারবেন।' তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'এই যে গাড়িটাকে রাতদুপুরে জঙ্গলের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিল তা কি এমনি এমনি?'

সামনের লোকটা যেন আর্তনাদ করে উঠল, 'তা হলে?'

'সব সাঁট আছে মশাই। আগে থেকে বলা আছে।'

'বলা আছে? কাকে বলা আছে?'

চিমসে মুচকি হাসল। বলল, 'সে দেখতেই পাবেন, কাকে বলা আছে। প্রবলেম তো আর ডাকাতি নয়, আজকাল আবার নতুন কায়দা হয়েছে, ডাকাতরা লেডিস নামিয়ে নেয়। তারপর...।'

লোকটা আবার হাসল। যেন ডাকাতদের 'লেডিস' নামিয়ে নেওয়া বিরাট মজার কোনও ঘটনা। কিছু লোক আছে যারা ট্রেনে উঠেই একটা 'বাড়িতে আছি, বাড়িতে আছি' ধরনের ভান করে আনন্দ পায়। এরা ফটাফট শার্ট প্যান্ট বদলে পাজামা আর স্যান্ডো গেঞ্জি পরে ফেলে। খবরের কাগজের মোড়ক খুলে হাওয়াই চটি বের করে। তারপর কাঁধে একটা তোয়ালে ফেলে ব্যস্ত হয়ে কামরার মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে থাকে। আমার পাশে যে মোটাসোটা লোকটা এসে দাঁড়াল, সে শুধু কাঁধে তোয়ালে ফেলেনি, হাতে একটা টুথব্রাশ পর্যন্ত নিয়েছে! মাঝরাতে টুথব্রাশ! লোকটা আমার কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, 'এই লোকটাকেই আমার টিকিট চেকার বলে মনে হচ্ছে। বিপদ বুঝে এখন ড্রেস বদলে পাবলিক সেজেছে। দেখছেন না, বেশি লেকচার মারছে।'

উলটোদিকের দরজার কোনায় একজোড়া অল্পবয়সি ছেলেমেয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে। মনে হয়, সদ্য বিয়ে করে হানিমুনে বেরিয়েছে। শুনতে পেলাম, মেয়েটা ফিসফিস করে বলছে, 'তখনই বললাম, এসি কোচে টিকিট করো। তোমার সবটাতে কিপটেমি। এসি কোচে সিকিউরিটি অনেক বেশি।'

ছেলেটা তোতলাতে তোতলাতে বলল, 'শিখা আমি, আমি...'

মেয়েটার নাম তা হলে শিখা।

শিখা চাপা গলায় বলল, 'এখন হাঁদার মতো আমি, আমি করতে হবে না। এরপর যখন ডাকাতরা এসে আমাকে নামিয়ে নিয়ে যাবে, আমি কিন্তু হাসতে হাসতে চলে যাব। বুঝবে ঠেলা।'

আড় চোখে দেখলাম, ছেলেটা মেয়েটার দিকে আরও সরে এসেছে। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না, তবে আমি নিশ্চিত সে এবার স্ত্রীর একটা হাতও ধরে ফেলেছে।

আমি এগিয়ে গেলাম। আমাকে নামতে হবে। জঙ্গল, পাহাড় যা-ই হোক আমাকে এবার নামতে হবে। এসি কোচে সিকিউরিটি বেশি শুনে বসে থাকলে চলবে না। নিজের চোখে দেখে আসা দরকার।

চিমসে লোকটাকে বললাম, 'ভাই, একটু সরুন তো।'

আমার মুখে একবার টর্চ ফেলে কঠিন গলায় লোকটা বলল, 'কেন? সরব কেন?'

'এমনি ভাই। নামব।'

'নামবেন! জঙ্গলের মধ্যে নামবেন কেন?' লোকটা জেরা করছে। আমি মাথা ঠান্ডা রেখে বললাম, 'কোনও কারণ নেই। নেমে একটু ঘুরে দেখব।'

'ঘুরে দেখবেন! এটা কি দার্জিলিং-এর ম্যাল না পুরীর সি বিচ, যে ঘুরে দেখবেন?'

শান্ত গলায় বললাম, 'তার থেকেও তো ভাল কিছু হতে পারে। নিন, সরুন এবার, দরজা খুলব।'

লোকটা এবার পা নাচিয়ে, চোখ নাচিয়ে বলল, 'দুঃখিত, দরজাটা তো খোলা যাবে না। ট্রেন না ছাড়া পর্যন্ত দরজা, জানলা কিছুই খোলা যাবে না।' তারপর অন্যদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'বুঝলেন দাদা, ভেতরে ওদের লোক থাকে। দরজা খুলে দেয়।' আমার রাগ বাড়াচ্ছে। একে এখনই একটা শাস্তি দেওয়া দরকার।

চিমসেটা এবার সোজা হয়ে বলল, 'এই যে ভাই, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? কত পর্যন্ত টিকিট কাটা?'

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললাম, 'জানি না।'

'জানি না মানে?' লোকটা মুখ ঘুরিয়ে বাকিদের দিকে তাকাল।

আমি অল্প হেসে বললাম, 'জানি না মানে জানি না। তবে এটা জানি, আপনি টর্চটা নিয়ে অসভ্যতা করছেন। অনেকক্ষণ ধরে ব্যাপারটা লক্ষ করছি।'

'অসভ্যতা! অসভ্যতা করছি!' লোকটা প্রায় তেড়ে এল।

আমি একইরকম শান্ত গলায় বললাম, 'আপনি ইচ্ছে করে বারবার ওই মেয়েটির গায়ে আলো ফেলছেন। মেয়েদের গায়ে ইচ্ছে করে আলো ফেলা একটা বিরাট অসভ্যতা। ভাই, এটা আর করবেন না। ওই মেয়েটার নাম কি আপনি জানেন? ওর নাম শিখা। অন্য কোনও নামের মেয়ে হলে অসুবিধে ছিল না, কিন্তু আপনি বোধহয় জানেন না শিখা নামের মেয়েরা ডেঞ্জারাস হয়। এরা ডাকাতদেরই ভয় পায় না, আপনি তো কোন ছুঁচো। বলা যায় না, এই অপরাধের জন্য এগিয়ে এসে ও আপনাকে একটা চড়ও মারতে পারে। সাবধান ভাই।'

ছেলেটা কেমন থতমত খেয়ে গেছে। বাকিরাও চুপ।

এমন সময় আরও একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল! উলটোদিক থেকে শিখা নামের মেয়েটি সত্যি সত্যি এগিয়ে এল! এগিয়ে এসে বলল, 'এই যে ছোকরা, শোনো। আমিও তখন থেকে দেখছি...।'

আমি হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুললাম এবং ট্রেন থেকে নেমে পড়লাম। নামতে গিয়ে বুঝতে পারলাম মাটিটা অনেক নীচে। ছোট একটা লাফ দিতে হল।

আরে! কোথায় জঙ্গল? ডাকাতই বা কোথায়?

এ তো একটা স্টেশন! ছোট্ট একটা স্টেশন! আলগোছে পড়ে আছে। ফটফটে জ্যোৎস্নায় যেন নিকোনো! অল্প অল্প হাওয়ায় গা এলিয়ে স্টেশন ঘুমিয়ে রয়েছে! ইট বাঁধানো একফালি প্ল্যাটফর্ম। সেই প্ল্যাটফর্মের ওপরই ঝাপসা ঝাপসা গাছ। গাছের তলায় বাঁধানো বেঞ্চ। ঝকঝকে চাঁদের আলো আর অন্ধকারে মাখামাখি হয়ে তারা দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ দেখে মনে হচ্ছে, সেজেগুজে অপেক্ষা করছে। যদি কেউ আসে?

আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। সাহস করে ট্রেন থেকে একজনও নামেনি। ভালই হয়েছে। এখানে মানুষ মানায় না। কতকগুলো রেল স্টেশন রয়েছে, যেখানে ভুল না করলে ট্রেন কখনও দাঁড়ায় না।.চলন্ত ট্রেনের জানলা থেকে এদের সঙ্গে দেখা হয়। খুব অল্পক্ষণের দেখা। হাত নাড়ার আগেই ফুরিয়ে যায়। মনে হয়, আহা, এখানে একটু নামতে পারলে বেশ হত। কখনওই সে সুযোগ হয় না। আজ আমার হয়েছে। এটা সেরকমই একটা ট্রেন না দাঁড়ানো স্টেশন। ইস, এতক্ষণ ট্রেনটা দাঁড়িয়ে রইল, আরও আগে যদি নেমে আসতাম। ওই গাছের তলায়, বেঞ্চে বসে থাকতাম। এখনই যদি ট্রেন ছেড়ে দেয় বড় আফশোসের হবে। আমাকে এখানে কিছুক্ষণ বসতে হবে। বসতেই হবে।

ছোট্ট এই স্টেশনে এত বড় ট্রেনটাকে একেবারেই মানাচ্ছে না। ট্রেনটা নিজেও যেন সেকথা বুঝতে পারছে! লজ্জা পেয়ে জড়সড় হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি হাঁটতে শুরু করলাম। প্ল্যাটফর্ম জুড়ে আমার বড় বড় ছায়া পড়তে লাগল। জ্যোৎস্নার ছায়া।

এসি কোচগুলো যেন কোন দিকে?

২

তমাল বড় হাই তুলে বলল, 'আর কতক্ষণ বসে থাকতে হবে?'

আমি হাত বাড়িয়ে বললাম, 'একটা সিগারেট দে।'

তমাল পকেট হাতড়ে বলল, 'প্যাকেটটা মনে হচ্ছে ট্রেনে ফেলে এসেছি। বললি না তো, আর কতক্ষণ বসে থাকতে হবে?'

'আমি কী করে বলব? আমি কি ট্রেনের ড্রাইভার? তা ছাড়া, তোর কীসের তাড়া? কথায় বলে, ট্রেন ধরার তাড়া। সেই প্রবাদ এখানে খাটবে না। ট্রেন কয়েক হাত দূরেই দাঁড়িয়ে আছে। বলতে পারিস ধরেই আছি।'

তমাল বিরক্ত হয়ে বলল, 'বাজে কথা বলিস না সাগর। এই রাত দুপুরে তোর নিচু স্তরের ঠাট্টা মোটেই ভাল লাগছে না। ইস, কতটা লেট হয়ে গেল! ভেবেছিলাম, পৌঁছে ব্রেকফাস্ট করব। এখন তো দেখছি, দুপুরের খাবার জুটলে হয়।'

আমি হাসলাম। বললাম, 'গৃহত্যাগীর আবার ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ কীসের? আচ্ছা, তমাল এখানে থেকে গেলে কেমন হয়?'

'এখানে! এই স্টেশনে? তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে সাগর।'

আমি আবার হাসলাম। বললাম, 'ঠিকই বলেছিস। এরকম আকাশ ভরা চাঁদের আলোয় অচেনা একটা রেল স্টেশন আবিষ্কার করে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে, খুব শিগগিরই একটা পাগলামি করে বসব।'

তমাল আমার দিকে তাকাল। ওর মুখ খুব স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। তবে নির্ঘাত ও ঘাবড়ে গেছে।

একটা-দুটো করে লোক ট্রেন থেকে নেমে আসছে। জানলাগুলোও খুলছে। ডাকাতের ভয় মনে হয় কেটেছে। তবে কেউই দরজা থেকে খুব বেশি দূরে যাচ্ছে না। হঠাৎ যদি গাড়ি ছেড়ে দেয়! কেউ কেউ আবার হাতল ধরে দাঁড়িয়েছে। ট্রেন ছেড়ে দিলে এখানে পড়ে না থাকি। সত্যি মানুষ পড়ে থাকতে কত ভয় পায়।

শুধু শিখা আর তার স্বামী আমাদের মতো খানিক দূরের একটা বেঞ্চে গিয়ে বসেছে। গাছের কতকগুলো ডাল নিচু হয়ে বেঞ্চটাকে ওদের জন্যই যেন একটু আড়াল করে রেখেছিল। আশ্চর্য! ওরা কি জানত? দুটো ছায়াকে মনে হচ্ছে, গাছেরই ডাল-পালা। সেই ছায়া অল্প অল্প নড়ছে। কী করছে ওরা? ওরা কি চুমু খাচ্ছে? খেলে ভাল করবে। এই চুমু সারাজীবন মনে থাকবে।

একটু আগে আমি বঙ্কা ঝঙ্কাকে ডাকতে গিয়েছিলাম। মাঝরাতে এমন একটা চমৎকার রেল স্টেশন দেখতে পেলে ওরা নিশ্চয় খুব খুশি হত। কিন্তু কামরায় উঠে দেখলাম, দু'জনেই ঘুমিয়ে কাদা। ধূর্জটিবাবু জেগে গেছেন। বসে রয়েছেন চুপ করে। অন্ধকারে, জানলার পাশে । ডাকতে গিয়েও আমি থমকে গেলাম। আজ ওঁর স্ত্রীর মৃত্যুদিন নয় তো? হতেও পারে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি নিঃশব্দে নেমে এলাম।

টুথব্রাশ হাতে সেই লোকটা প্ল্যাটফর্মে নেমে এসেছে বটে, কিন্তু এখনও টুথব্রাশ ছাড়েনি। মাঝেমধ্যেই সে ট্রেনের এমুড়ো থেকে ওমুড়ো পর্যন্ত ব্যস্ত হয়ে ছোটাছুটি করছে। প্রথমটায় অবাকই হয়েছিলাম। একটু পরে বুঝতে পারলাম, লোকটা আসলে ট্রেন সংক্রান্ত খবরাখবর সংগ্রহ করছে। তারপর সেই খবর চিৎকার করে ঘোষণা করছে। একেকবার এক-একরকম খবর। একবার ঘোষণা করল, ইঞ্জিন খারাপ। একবার জানাল, না ইঞ্জিন খারাপ নয়। সিগন্যাল খারাপ। পরেরবার হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, ইঞ্জিন, সিগন্যাল সবই ঠিক আছে। লাইনম্যানকে পাওয়া যাচ্ছে না। শেষবারের খবর তো মারাত্মক। এক কিলোমিটার দূরে জঙ্গিরা সাতাশখানা ফিশপ্লেট খুলে ফেলেছে। কাল বিকেলের আগে ট্রেন ছাড়বার কোনও সম্ভাবনা নেই। ঘটনা শুনে কে একজন ট্রেনের ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'কেউ একটা হারামজাদাকে ধরে ট্রেন লাইনে ফেলে দিয়ে আয় তো। ফেলার আগে টুথব্রাশটা কেড়ে নিবি।'

তমাল বেঞ্চ থেকে উঠে অস্থিরভাবে পায়চারি করতে করতে বলল, 'খুবই বিপজ্জনক পরিস্থিতি।'

আমি পা দুটো সামনে ছড়িয়ে দিয়ে বললাম, 'বিপজ্জনক! বিপজ্জনক কোথায়? আমার তো দারুণ মজা লাগছে।'

'মজা! রাতদুপুরে একটা অজানা স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে তুই মজা কোথা থেকে পেলি সাগর?'

'বাঃ, রাত না হলে এমন চমৎকার চাঁদের আলো পেতিস? রেল স্টেশনে চাঁদের আলো দেখা একটা বিরল অভিজ্ঞতা।'

'রাখ তো চাঁদের আলো! আরও কিছুক্ষণ আটকে থাকলে ওসব আলো টালোর মজা বেরিয়ে যাবে।'

আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'তুইও পাবি। তুইও মজা পাবি।'

তমাল রাগে গোঁ গোঁ করতে করতে বলল, 'একজনের জন্য আজ এই হাল হয়েছে। শুধু একজনের জন্য। তার জন্যই আজ আমি ঘর ছেড়েছি। তোর মতো একটা পাগলের সঙ্গে আজ রাত দুপুরে পথের মাঝখানে বসে গেলাস গেলাস চাঁদের আলো গিলছি।'

হাসি পাচ্ছে। হাসি চেপে বোকার মতো মুখ করে বললাম, 'কার জন্য?'

তমাল আঙুল তুলে বলল, 'খবরদার সাগর, ওই নাম মুখে আনবি না। তোর সঙ্গে কিন্তু শর্ত রয়েছে।'

আমি বেঞ্চের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লাম। বললাম, 'ঠিক আছে আনব না। তুই এখন যা তো। অনেক বকবক করেছিস। একটু ঘুমিয়ে নিই।'

'সে কী, ঘুমোবি মানে! ট্রেন যদি ছেড়ে দেয়। সাগর, সবসময় রসিকতা মানায় না। ঘুমোতে হলে ট্রেনে উঠে ঘুমোও।' আমি পাত্তা না দিয়ে বললাম, 'আঃ কতদিন গাছের তলায় ঘুমোইনি। শুধু কি গাছ? গাছের সঙ্গে আবার ঠান্ডা হাওয়া। তুইও ওদিকের বেঞ্চটায় শুয়ে পড় না তমাল। দেখবি মাথা ঠান্ডা হয়ে যাবে। গুনগুন করে গান ধরবি।'

তমাল শুল না, আবার গেলও না। উলটোদিকে মাথার কাছে বসে রইল। বসে বিড়বিড় করতে লাগল। মনে হয়, ছন্দার সঙ্গে ঝগড়া করছে। তিনদিন ধরে দেখছি ও এই কাণ্ড করছে। সুযোগ পেলেই মনে মনে ছন্দার সঙ্গে ঝগড়া করছে। করুক, যত খুশি করুক। রাতদুপুরে চাঁদের আলো মাখা গাছের তলায় বসে প্রেমিকের সঙ্গে ঝগড়া করলেও মন ভাল হয়ে যায়। তমালেরও হবে। বাকিটুকু আমি করে দেব। সেদিন খিদের সময়ে তমাল আমাকে খাইয়েছে। খাইয়েছে বড় কথা নয়। অনেকেই খাওয়ায়। কিন্তু অমন যত্ন করে? বুকের ভেতরে খিদের থেকেও তীব্র ভালবাসা না থাকলে অমন যত্ন করে খাওয়ানো যায় না। তখনই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, ওর জন্য একটা কিছু করব। আমার মতো একটা বেকার, ফালতু ধরনের ছেলে কী বা করতে পারে? মন ভাল করে দেওয়া ছাড়া?

আমি গৃহত্যাগী তমালের মন ভাল করে দেব। খানিক আগেই সব ব্যবস্থা করে এসেছি। আমাদের সাধারণ কামরার মতো এসি কোচের টিকিট চেকার অন্ধকারে পালিয়ে যায়নি। তা ছাড়া, সেখানে আলো টালো সবই আছে। চেকার মানুষটা খারাপ নয়। রসবোধ আছে। আমি

বললাম, 'আপনাকে বলতাম না, দাদা। প্ল্যান অন্যরকম ছিল। যা ঘটবার কাল সকালেই ঘটত। কিন্তু এই স্টেশনটা দেখে মাথা খারাপ হয়ে গেছে। বিশ্বাস না হলে, আপনি একটিবারের জন্য নেমে দেখুন। আচ্ছা, নামতে হবে না। কান পাতলেই একটা শোঁ শোঁ আওয়াজ শুনতে পাবেন। বাঁধ ভাঙার আওয়াজ। বাইরে আজ চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে।'

কপালের ওপর চশমা তুলে মানুষটা বলল, 'ভাইয়ের মনে হচ্ছে কবিতার অসুখ আছে। কাজটা বেআইনি হচ্ছে, তবে কবিতার আর আইনি বেআইনি কী? কলেজ জীবনে আমিও টুকটাক লিখতাম কিনা। ঠিক আছে, একটা ফাঁকা বার্থ ম্যানেজ করে দিচ্ছি।'

এই ভদ্রলোক আমাকে ট্রেনের খবরও দিয়েছে। চিন্তার কিছু নেই। দুটো স্টেশন আগে একটা মালগাড়ির ইঞ্জিন গড়বড় করেছে। ওয়াকিটকিতে খবর এসেছে, সারানোর কাজ প্রায় শেষ। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই ট্রেন ছাড়বে।

আমি সেই সময়টার জন্যই অপেক্ষা করছি। বেশি দেরি নেই। সময় প্রায় হয়ে এসেছে। আমি কান খাড়া করে আছি। তমালকে আগে থেকে কিছু বুঝতে দেওয়া যাবে না। কোনওরকম আপত্তির সুযোগ পাবে না সে। ট্রেন হুইস্‌ল দিলেই ওর একটা হাত শক্ত করে ধরে ছুট লাগাব। তারপর ঠেলে এসি কোচে তুলে দিয়ে আসব।

৩

ট্রেন ঘন ঘন হুইস্‌ল দিচ্ছে। এর মানে, এখনও যদি কেউ বাকি থাকো, উঠে এসো। উঠে এসো শিগগিরই।

আমি বসে আছি একা।

তমালকে নিয়ে আমাকে এসি কোচ পর্যন্ত যেতে হয়নি। তার আগেই ছন্দা নিজেই ওই কামরা থেকে নেমে আসে। চাঁদের আলোয় সে আমাদের সহজেই খুঁজে বের করে। তমাল ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। এত ঘাবড়ে যায় যে প্রথমটায় সে ছন্দাকে আপনি আপনি করে কথা বলতে শুরু করে—

'আপনি! আপনি এখানে! আমি তো...।'

ছন্দা চাপা গলায় ধমকে উঠে বলে, 'অনেক হয়েছে, নাটক আর ভাল লাগছে না। সারারাত কি তোমার জন্য জেগে বসে থাকব? চলো, শিগগিরই। ইস তোমার এই অপদার্থ বন্ধুটার জন্য একগাদা টাকা খরচ হয়ে গেল। নাও চলো, চলো।'

তমাল আরও ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'যাব! কোথায় যাব?'

ছন্দা এবার এগিয়ে এসে তমালের হাত ধরল। গলা নামিয়ে বলল, 'রাত দুপুরে আর পাগলামি করতে হবে না। চলো।' তারপর আমার দিকে ফিরে কঠিন গলায় বলল, 'এই যে মশাই, অনেক ঝামেলায় ফেলেছেন। বাকি পথটুকু বন্ধুর লাগেজটা দয়া করে একটু সামলে রাখবেন। কাল সকালে দেখা হবে।'

তমাল আমার দিকে তাকালই না। সেটাই স্বাভাবিক। বিশ্বাসঘাতকের দিকে কে তাকায়?

তবে আমি ওদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কুয়াশার মতো নীল আলোয় ছায়া তৈরি করতে করতে ওরা এসি কোচের দিকে হেঁটে চলে যাচ্ছে। ইস, একটা ভাল চাকরি হাতছাড়া হয়ে গেল। তা যাক। ওরা হাঁটছে হাত ধরাধরি করে। খুব ভাগ্য না করলে এমন দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায় না।

আর কেউ বাকি নেই। সবাই উঠে পড়েছে। জনমানব শূন্য রেল স্টেশন ফের ভেসে যাচ্ছে রহস্যময় চাঁদের আলোয়। ট্রেন হুইস্‌ল দিচ্ছে। শেষ হুইস্‌ল। একটু যেন নড়েও উঠল।

আমি কী করব? চলে যাব? নাকি থেকে যাব এই জ্যোৎস্নার রেল স্টেশনে?

সানন্দা পুষ্পাঞ্জলি, ২০০৫

চোরের বউ

গান হচ্ছে। নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল...।

কিছুদিন হল, বিশ্বনাথ তার মোবাইল ফোনে রবীন্দ্রসংগীত নিয়েছে। এখন কেউ ফোন করলেই ভেতরে এই গান শুনতে পায়। অবশ্য পুরো গান নয়। ঘুরে-ফিরে দুটো লাইন। নেওয়ার সময় ভয় ছিল। কে জানে, এই গান শিখার পছন্দ হবে কি না। পছন্দের ব্যাপারে শিখা খুবই খুঁতখুঁতে। দু'বছর হয়ে গেল তারা নতুন ফ্ল্যাটে এসেছে। শিখার এখনও সবটা পছন্দ হয়নি। দক্ষিণে নাকি আর একটা জানলা থাকা দরকার ছিল। বারান্দাটা বড্ড ছোট। ফ্ল্যাট তিন তলার বদলে চার তলায় হলে ভাল হত। এইরকম আরও নানা কিছু। তবে মোবাইলের গান শিখার পছন্দ হয়েছে। সে তার স্বামীকে বলেছে, 'আমি যখন ফোন করব তুমি কিন্তু চট করে ধরতে পারবে না। আগে আমি কিছুক্ষণ গান শুনব, তারপর কথা বলব।'

আজ গান শুনেই শিখা রেগে গেল। উত্তেজিত গলায় বলল, 'এত দেরি করো কেন? আমি কি গান শুনতে ফোন করেছি?'

বিশ্বনাথ চাপা গলায় বলল, 'আঃ বাজে কথা বোলো না। আবার কী হল?'

শিখা চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'কী আবার হবে? এখন ওই মেয়ে বলছে, দুপুরে নাকি সেদ্ধ খাবে।'

'সেদ্ধ খাবে!'

শিখা ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'মানে কী জানো না? ন্যাকা! ফোনটা ওকে দিচ্ছি, তুমি বরং জিগ্যেস করে নাও।'

বিশ্বনাথ চারপাশটা একবার দেখে নিল, তারপর গলা আরও নামিয়ে বলল, 'আঃ শিখা, কী হচ্ছে কী? এত অধৈর্য হয়ে পড়ছ কেন?'

শিখা ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'অধৈর্য হব না? রান্নাবান্না সব হয়ে গেছে, এখন বলছে শরীরটা কেমন টিসটিস করে বউদি। মনটাও ঠিক নেই। আজ আর অন্য কিছু খাব না। ভাতের সঙ্গে আলু, কুমড়ো আর বড় দেখে একটা উচ্ছে সেদ্ধ করে দিন। তেল, লঙ্কা দিয়ে দু'গেরাস খেয়ে নেব। আর কী বলছে শুনবে? বলছে, ঘরে মুসুর ডাল আছে? থাকলে ভাতের মধ্যে এক মুঠো ফেলে দেন। না থাকলে অসুবিধে নাই। অন্য ডাল হলেও চলবে। ভাবো কাণ্ড! এমনভাবে কথা বলছে, যেন সত্যি সত্যি আমার ননদ এসেছে। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর আমাকে নিয়ে শপিং-এ যাবে! উফ!'

বিশ্বনাথ খানিকটা নিশ্চিন্ত গলায় বলল, 'ভালই তো, পরিস্থিতি সহজ হয়ে গেলে সুবিধে। তুমি ঠান্ডা মাথায় কথা বলতে পারবে।'

'সুবিধে! এর মধ্যে সুবিধের কী দেখলে? এই ভরদুপুরে উচ্ছে চাইছে, সেটা সুবিধের হল!'

বিশ্বনাথ বলল, 'উফ, সামান্য উচ্ছে নিয়ে তুমি ভাবছ শিখা? ঘটনা যা, তাতে এই মহিলা এক লাখ টাকা দিয়ে শুরু করলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই।'

শিখা অবাক হয়ে বলল, 'এক লাখ টাকা! বলো কী! আমরা কিছু করলাম না...।'

'একটা মানুষ মরলে এক লাখ আর কী? বেশ কমই। দিনকাল বদলে গেছে শিখা। আমি এমনি এমনি মেয়েটাকে ভুজুংভাজুং দিয়ে হাসপাতাল থেকে সরিয়ে বাড়িতে নিয়ে আসিনি। ওসব এখন ছাড়ো। তুমি রান্নার মাসিকে চট করে বাজার থেকে একটু ঘুরে আসতে বলো না। একটা সামান্য উচ্ছে পাবে না? ঠিক পাবে। উচ্ছে-টুচ্ছে অনেক বেলা পর্যন্ত পাওয়া যায়।'

'কী ব্যাপার বলো তো? তুমি কি চাও আমি গৌরীকে তাড়িয়ে দিই? এই দুপুরে বাজারে গিয়ে উচ্ছে আনতে বলাও যা, মাইনে হাতে ধরিয়ে চলে যেতে বলাও তাই। আমি পারব না। বলার হলে তুমি বলো। টেলিফোনটা দেব?'

বিশ্বনাথ সোজা হয়ে বসল। আড়চোখে বাঁদিকে তাকাল। বাঁদিকের টেবিলটা অদিতি পালের। এই ধেড়ে বয়সেও মহিলার একটা বিচ্ছিরি অভ্যেস আছে। আশেপাশে কেউ ফোন করলেই হল। কথা শুনবে। আড়ি পেতে শোনা নয়, একবারে হাঁ করে শোনা। একদিন তো অ্যাকাউন্টসের মনোময় রেগেমেগে রিসিভার কান থেকে নামিয়ে বলল, 'অদিতিদি, কিছু বলবেন?'

মহিলা হেসে বলল, 'না ভাই, কিছু বলব না। তুমি কার সঙ্গে কথা বলছ তাই শুনছি।'

এর পরে আর কী বলা যায়?

অদিতি পাল আজ অবশ্য কথা শুনছে না। শুনলেও অন্তত এদিকে তাকিয়ে নেই। মাথা নামিয়ে ফাইল দেখছে। বিশ্বনাথ ঝুঁকি নিল না। সে যেমন গলা নামিয়ে কথা বলছিল সেভাবেই বলতে লাগল।

'শিখা, যা হোক একটা কিছু করে ম্যানেজ করো। উচ্ছে, পটল যা চাইছে দিয়ে দাও। খাইয়ে-টাইয়ে কথা বলার চেষ্টা করো। ট্রাই টু টক উইথ হার। যে ঝামেলাটা হয়ে গেছে, সেখান থেকে টাকাপয়সা ছাড়া বেরোনোর কোনও পথ নেই। আমি যাদের সঙ্গে কথা বলছি, প্রত্যেকেই একই কথা বলছে। বলছে, ঝামেলা বাড়াবেন না, মুখ বন্ধ করে দিন। অ্যামাউন্টটা কত, সেটাই এখন কথা। তোমার ওপর সেটুকুই এখন দায়িত্ব। পাঁচকান হওয়ার আগেই...। একটু আগে হাসপাতালে ফোন করেছিলাম। ওয়ার্ডে সিস্টার নেই। ঠিকমতো বলতে পারল না। তবে বলল, লোকটা এখনও ঘুমোচ্ছে। ওরা ব্যথার জন্য কড়া কোনও ইঞ্জেকশন দিয়েছে। বিকেলে ডাক্তার রাউন্ডে আসবে। এক্স-রে হবে। ক'টা হাড় আস্ত আছে তখন বোঝা যাবে। আমি চাইছি, তার আগেই লোকটার ফ্যামিলির সঙ্গে একটা সেটলমেন্টে চলে আসতে।'

হিসহিস করে একটা দাঁত ঘষা ধরনের শব্দ করল শিখা। রাগের শব্দ। বলল, 'আমি কী করব?'

'ওই মহিলার সঙ্গে তুমি কথা বলবে। সেইজন্যই বাড়িতে দিয়ে এসেছি। আমি যে বলতে পারতাম না, তা নয়। মহিলা বলেই তোমার হাতে ছেড়েছি, বাবা-বাছা বলে বারগেনটা ভাল পারবে। এই মেয়ে যদি বাইরে থাকত সমস্যা হত শিখা। গুন্ডা-মস্তানরা সব এদের চেনাজানা। তারা চাপ বাড়ানোর জন্য পাঁচ রকম পথ শিখিয়ে দিত। সেইজন্যই মেয়েটাকে চোখের আড়াল করতে বারণ করছি।'

শিখা সামান্য গলা তুলে বলল, 'এর মধ্যে দরাদরির কী আছে? আমাদের কী দোষ? তুমি এমনভাবে বলছ, যেন আমরা মাথায় রডের বাড়ি মেরে, লোকটাকে আমাদের তিন তলার বারান্দা থেকে ফেলে দিয়েছি!'

বিশ্বনাথ টেলিফোন কানে নিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। না, এখান থেকে কথা বলা যাবে না। এবার একজন-দু'জন করে তাকাতে শুরু করেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে সে বারান্দায় এল। শিখা এখনও বিষয়টার গুরুত্ব বুঝতে পারছে না। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে না। লোকটার সত্যি সত্যি যদি বড় কিছু হয়ে যায়, তা হলে থানা-পুলিশ অনেক দূর পর্যন্ত গড়াবে। কীভাবে মরল, কে মারল, কেন মারল—হাজার কথা। সেসব সামলানোর মানে জলের মতো খরচ। লোকটার ফ্যামিলি তো টাকা নেবেই, পুলিশও টাকা নেবে। তার ওপর আজকাল নানা ঝামেলা হয়েছে। মহিলা সমিতি, হিউম্যান রাইটস্, পাড়ার ক্লাব, লোকাল কমিটি আছে। দোষগুণের বিচার হবে না। ঘটনা যত জানাজানি হবে বিপদ তত বাড়বে। সকালে কোনওরকমে মিথ্যে বলে হাসপাতালে ভরতি করা গেছে। এখন এই মহিলাকে টাকাপয়সা দিয়ে রাজি করাতে হবে। ও হাসপাতালে জানাবে, যা ঘটেছে লোকটার নিজের বাড়িতেই ঘটেছে।

লম্বা বারন্দার এককোণে দাঁড়িয়ে বিশ্বনাথ বলল, 'শিখা তোমাকে আমি আবার বুঝিয়ে বলছি। দয়া করে তুমি মন দিয়ে শোনো।'

শিখা চাপা গলায় ধমকে উঠল, 'আমার কিছুই মন দিয়ে শোনার দরকার নেই। আসল ঘটনা কী? ঘটনা কিছুই নয়। ভোররাতে একটা চোর কার্নিশ বেয়ে আমাদের তিন তলার ফ্ল্যাটে উঠে আসছিল। আওয়াজ পেয়ে তুমি দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে গেলে। বেরিয়ে দেখলে, লোকটা রেলিং টপকে বারান্দায় উঠি উঠি করছে। তোমাকে দেখে ভয় পেয়ে চোরটা পিছনে লাফ দিল। ব্যস, এই তো ঘটনা। তারপর চোরটা নীচের চাতালে পড়ে পা ভাঙল, না পাঁজর ভাঙল তাতে তোমার কী? কিছুই নয়। মরুক, মরে জাহান্নামে যাক। আসলে তোমার অত দরদ দেখানোটাই বিরাট বোকামি হয়েছে। লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেলে। নিয়ে গিয়ে এখন ফেঁসে গেছ। পুলিশকে একটা ফোন করতে, তারা আসত। এসে যা ভাল বুঝত করত। তুমি ওই পরিমল আর কল্যাণটার কথা শুনে নাচলে। এখন ঠেলা সামলাও।'

না, শিখা বুঝতে চাইছে না। এখন পুলিশকে অ্যাভয়েড করা ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই। পরিমল কল্যাণরা ঠিক পরামর্শই দিয়েছে। বিশ্বনাথ খানিকটা হুকুমের ভঙ্গিতেই বলল, 'আগে তুমি ওই মেয়েটার খাবারের ব্যবস্থা করো।'

'দুঃখিত, একটা চোরের বউয়ের জন্য আমি এখন গাছ থেকে উচ্ছে পাড়তে যেতে পারব

না। ইচ্ছে হলে তুমি পেড়ে দিয়ে যাও। উফ, কোন আক্কেলে যে মেয়েটাকে এখানে এনে তুললে? অচেনা, অজানা একটা মহিলাকে কেউ বাড়িতে নিয়ে আসে? ছি ছি। আর যে-সে মহিলা নয়। চোরের বউ। যত ভাবছি, তত অবাক হয়ে যাচ্ছি।'

বিশ্বনাথ রেগে গিয়ে বলল 'আঃ, আস্তে বলো শিখা। চোরের বউ, চোরের বউ করছ কেন? শুনতে পাবে। অন্য কেউ তো আর জানছে না যে তোমার বাড়িতে কে রয়েছে! চোরের বউ না রাজার বউ! বলছি তো, একটা বেলার ব্যাপার। লাস্ট যেটুকু খবর পেয়েছি তাতে মনে হচ্ছে, সন্ধের মধ্যে লোকটা অনেকখানি সুস্থ হয়ে যাবে। ইনজুরি কতটা জানার আগেই মহিলার সঙ্গে টাকাপয়সার কথা শেষ করে নাও। মোটামুটি একটা অ্যামাউন্টে রাজি করিয়ে ফেলো। ফাইনাল আমি দেখব। সাবধানে কথা বলবে। মেয়েটা চালাকচতুর আছে। দেখলে না কেমন খবর পেয়ে হাসপাতালে এসে হাজির হল? দেখি এমারজেন্সিতে ঢুকে বেডের পাশে বসে আছে। শুধু বসে থাকলে কথা ছিল। ফিচফিচ করে কান্নাকাটিও করছিল। বানানো কান্না। তখনই পরিমল আর আমি ঠিক করলাম, একে আগে এখান থেকে সরাতে হবে। মেয়েটার কান্নাকাটি দেখে অনেকেই তাকাচ্ছিল। নেহাত হাসপাতালে কান্না একটা নরম্যাল ব্যাপার।'

শিখা বলল, 'সরাতে হবে মানে? সরিয়ে একেবারে বাড়িতে এনে তুলতে হবে?'

'আর কোথায় নিয়ে যাব? মেয়েটা যে লোকটার বউ প্রথমটায় বুঝতে পারিনি। পরে জিগ্যেস করায় বলল। বোধহয় কাছাকাছি কোনও বস্তিটস্তিতে থাকে। হাসপাতালের এক ঝাড়ুদার নাকি তার স্বামীকে চিনতে পেরে খবর দিয়েছে। ডাহা মিথ্যে। এদের সব আগে থেকে ঠিক করা থাকে। গোটা বস্তি যে বাড়িতে উঠে আসেনি তাই যথেষ্ট!'

'মানে!' শিখার গলায় বিস্ময়।

বিশ্বনাথ পিছন দিকটা একবার দেখে নিল। কেউ শুনছে না তো? না, বারান্দা ফাঁকা। এই সময়টা সবাই নিজের টেবিলে থাকে। স্ত্রীর প্রশ্নের উত্তর বিশ্বনাথ নিজেও ঠিক জানে না। কল্যাণ বলছিল ও নাকি কোথায় শুনেছে, এই ধরনের ঘটনায় দলবল আশেপাশে লুকিয়ে থাকে। ক্রিমিনালের গা থেকে একটু রক্ত বেরোলেই ব্যস। একেবারে রে-রে করে উঠবে। গণপিটুনি, মানবাধিকার বলে তুলকালাম কাণ্ড করবে। কে আর পুলিশ-টুলিশের হাঙ্গামার মধ্যে যেতে চায়!

শিখা ফোঁস করে উঠল, 'চুপ করে আছ কেন? যাই হোক, একটা কথা বলে রাখছি। আমি কিন্তু কিছু পারব না। একটা চোরের বউকে কোলে বসিয়ে, গায়ে হাত বুলিয়ে কথা বলতে পারব না। একে যত তাড়াতাড়ি পারো বাড়ি থেকে তাড়ানোর ব্যবস্থা করো।'

শিখা ফোন ছেড়ে দেওয়ার পর বিশ্বনাথ নিজের টেবিলে এসে বসল। ব্যাগে রাখা জলের বোতলটা বের করে দু'ঢোক জল খেল। শিখা যেরকম বলছে, ঘটনা পুরোটা তা নয়। চোরটা তিন তলায় উঠে এসেছিল ঠিকই, তবে হঠাৎ করে লাফ দেয়নি। খসখস আওয়াজ পেয়ে বিশ্বনাথ ঘর থেকে বেরোনোর সময় দরজার পাশে রাখা লোহার রডটা হাতে নিয়েছিল। তখনও ভোরের আলো ফোটেনি। কোথা থেকে যেন একটা চাপা হলুদ আলো এসে বারান্দায় পড়েছে। সম্ভবত রাস্তার আলো। সেই আলোতে বিশ্বনাথ দেখল, কালো, গোল একটা মুখ। ছোট ছোট করে চুল কাটা। তখনই বিশ্বনাথ রডটা মাথার ওপর তুলে হুংকার

দেয়—'অ্যাই কে রে?' কালো মাথাটা বিড়বিড় করে কী যেন একটা বলবার চেষ্টা করে। বিশ্বনাথ দু'পা এগিয়ে আসে।

আর তখনই ঘটনাটা ঘটল।

লোকটা হাত ফসকাল। যত দূর মনে হচ্ছে, তিন তলা থেকে নীচের চাতালে পড়ার আগে দোতলার কার্নিশে ধাক্কা খেয়েছে। মাঝপথে একটা শব্দ হয়েছিল।

বিশ্বনাথ রুমাল বের করে ঘাম মুছল।

আচ্ছা, লোহার রডটা কোথায়? মনে পড়ছে না। ঘরেই রয়েছে নিশ্চয়? ইস্, খুব ভুল হয়ে গেছে। জিনিসটা ঘরে রাখা ঠিক হয়নি। শিখাকে একটা ফোন করলে কেমন হয়? রডটা কাপড়ে মুড়ে পিছনের বাগানে-টাগানে কোথাও ফেলে দিয়ে আসুক। ছাদেও রেখে আসতে পারে। থাক, এতটা দুশ্চিন্তার কোনও মানে হয় না। রড দিয়ে তো আর সে খুন করেনি। শুধু মাথার ওপর তুলেছিল। নাকি একটা বাড়ি মেরেছিল? মনে পড়ছে না। ঠিক মনে পড়ছে না বিশ্বনাথের। আসলে টেনশনে সব গুলিয়ে আছে।

বিশ্বনাথ আবার ব্যাগ থেকে বোতলটা বের করল। গলাটা শুকনো লাগছে। মনে হচ্ছে, আরও কয়েক ঢোক জল খাওয়া দরকার।

একটা ভাল কাজ হয়েছে। ঘটনাটার কথা তেমন কেউ জানে না। অফিসে তো নয়ই, এমনকী ফ্ল্যাটেও নয়। শুধু দোতলার পরিমল, চার তলার কল্যাণ আর দারোয়ান ঝন্টু সিং জেনেছে। ঝন্টুকে পইপই করে বলে দেওয়া হয়েছে, খবর যেন না বেরোয়। বেটা শুনলে হয়। হাতে দশটা টাকা দিলে হত।

লোকটা পড়ে যাওয়ার পর, ঘরে ঢুকে পরিমলের ফ্ল্যাটে ফোন করেছিল বিশ্বনাথ। ফোন বেজে যাচ্ছিল। তখন নিজে গিয়ে দরজা ধাক্কে পরিমলকে ঘুম থেকে তোলে। এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে ডোরবেল বাজানোর কথা মনে ছিল না। চোখ কচলাতে কচলাতে বেরিয়ে এল পরিমল। ঘটনা শুনে বলল, 'বলছেন কী বিশ্বদা! লোকটা বেঁচে আছে তো? তিন তলার ওপর থেকে পড়েছে। বেঁচে থাকা টাফ্।'

'সেটাই তো বুঝতে পারছি না। খুব জোরে আওয়াজ হল। একা নীচে যেতে সাহস হচ্ছে না। পরিমল, তুমি একবার আসবে?'

'আপনি কি ঠেলাটেলা দিয়েছিলেন?'

'না না, সেরকম কিছু নয়। শুধু এগিয়ে গিয়েছিলাম।'

পরিমল জামা গলাতে গলাতে বলল, 'চলুন চলুন, আগে গিয়ে দেখি। পুলিশে একটা ফোন করলে হত। থানার নম্বর জানা আছে?'

বিশ্বনাথ পরিমলের একটা হাত চেপে ধরে বলে, 'থানার নম্বর? কই না তো। কী হবে ভাই? ভীষণ ভয় করছে। কী ফ্যাসাদে পড়লাম দেখুন তো!'

একতলায় নামতে নামতে কল্যাণের সঙ্গে দেখা। সে অন্ধকার থাকতে থাকতে মর্নিংওয়াকে বের হয়। সিঁড়ির মুখে দেখা। চালাকচতুর ছেলে। সংক্ষেপে ঘটনা শুনেই বলল, 'পুলিশ? খেপেছেন নাকি! আগে একটা ট্যাক্সি ডেকে লোকটাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। এখানে মরে পড়ে থাকলে তো কেলেঙ্কারি!'

ঝন্টু সিং পিছনে নিজের ঘরে ঘুমোচ্ছিল। তাকে ডাকা হল। চাতালে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা লোকটাকে পাঁজাকোলা করে ট্যাক্সিতে যখন তোলা হল, তখন সামান্য আলো ফুটেছে।

দুই

'তোমার নাম কী?'

মহিলা মুখ তুলে অল্প হাসল। বলল, 'কনকচাঁপা বউদি। আপনে কনকও ডাকতে পারেন, চাঁপাও ডাকতে পারেন।'

হাসলে এই মহিলার অনেকগুলো দাঁত দেখা যায়। মনে হয়, মাড়িতে কোনও সমস্যা আছে। বয়স কত! তিরিশের কাছাকাছি। আবার একটু বেশিও হতে পারে। গরিব মেয়েদের বয়স চট করে বোঝা যায় না। কালো আর রোগা হলে তো কথাই নেই। তবে এর গায়ের রং একেবারে কালো নয়। ময়লা ময়লা একটা ভাব। নীল পাড়ের রংচটা শাড়ি পরায় সেই ভাবটা আরও বেশি লাগছে।

হাসপাতালে এই মেয়ে নাকি কাঁদছিল? কই সেরকম কোনও লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না! বরং বেশ দিব্যি আছে। একেবারে গোড়ার দিকে যে জড়সড় ভাবটা ছিল সেটা পুরো না কাটলেও অনেকটা কেটেছে। প্রথমটায় ঘরে ঢুকে দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল খানিকক্ষণ। এখন বসার ঘরের মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে আছে। পা ছড়িয়ে বসে পান চিবোচ্ছে। তাকে পান দিয়েছে রান্নার মাসি, গৌরী। নিজেই চেয়ে নিয়েছে।

'এই যে মাসি, একটা পান দাও দেখি। জর্দা দিয়ো না। জর্দা খেলে বিল্টুর বাবায় আবার রাগ করে। বলে, নেশাভাং হল পুরুষের জিনিস। মেয়েমানুষের নেশাভাং করা ভাল না।'

গৌরী ভুরু কুঁচকে তাকায়। রান্নাঘরে এসে শিখাকে ফিসফিস করে জিগ্যেস করে, 'মেয়েছেলেটা কে গো? বসে বসে হুকুম মারে। পাগল-টাগল নাকি? চাউনি তো ভাল না।'

শিখা একটু চুপ করে থেকে, বিশ্বনাথ যেমন শিখিয়ে দিয়ে গেছে সেরকমই বলল, 'ও তোমার দাদাবাবুর অফিসের চেনাজানা। পিয়ন না কেয়ারটেকারের বউ। বেচারির স্বামী অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভরতি হয়েছে। দেশ থেকে দেখতে এসেছে। বিকেলেই চলে যাবে। বেশি কথা-টথা বলার দরকার নেই। একটা পান থাকলে দিয়ে দাও।'

গৌরী মুখ বেঁকিয়ে বলে, 'বয়ে গেছে আমার বেশি কথা বলতে! দাদাবাবুরও বলিহারি, কাকে না-কাকে বাড়িতে এনে তোলে।' তারপর গলা নামিয়ে বলে, 'সময় ভাল নয় বউদি। কে চোর আর কে ছ্যাঁচড় বোঝা মুশকিল। এই মেয়ের মধ্যে একটা ছ্যাঁচড় ভাব আছে। পাগল আর ছ্যাঁচড়। চোখে চোখে রেখো বউদি। দুপুরে আবার ঘুমিয়ে পোড়ো না যেন। উঠে দেখবে সব সাফা।'

'আঃ গৌরী, এত কথা বলো কেন? তোমার কাজ হলে যাও এখন।'

খানিক আগে উচ্ছেসেদ্ধ ছাড়াই লাঞ্চ সেরেছে কনকচাঁপা। তার তরিবত করে খাওয়া দেখে শিখা বেশ অবাকই হয়েছে। 'অল্প করে দেন' বলে শুরু করলেও ভাত নিয়েছে দু'বার।

কে বলবে এই মেয়ের স্বামী হাসপাতালে হাত-পা ভেঙে পড়ে আছে! কে জানে হয়তো এরা এরকমই হয়। অভ্যস্ত। ভাতের মধ্যে ডাল আর কুমড়ো সেদ্ধ মাখতে মাখতে বলল, 'বউদি একটা মাছ ভাজা হবে নাকি? হলে দেন দেখি। পেটির দিক দেখে দেবেন। গাদার মাছ খেয়ে আর গলায় কাঁটা ফুটাতে চাই না। এখন হল গিয়ে আমার সংসারে বিপদের টাইম। এই টাইমে সাবধান থাকাটাই হল আসল কাজ। ঠিক কি না?'

শিখা গম্ভীর হয়ে বলল, 'ঠিক।'

'তা হলে দেন একটা। ভাজা না হলে ঝোল থেকেই তুলে দেন। আপনার রান্নার লোকের হাত কীরকম বউদি! চিনির হাত না ঝালের হাত? চিনির হাত হলে তেমন ক্ষতি নাই। ঝালের হাত হলে ক্ষতি। বিল্টুর বাবায় বলে ঝাল বেশি খেলে পেটে ঘা হয়।'

শিখার মনে হল, এবার একটা ধমক দেওয়ার সময় এসেছে। বড্ড বকছে। শুধু বকছে না, গৌরী মনে হচ্ছে ঠিকই বলে গেল। মেয়েটার ভাবভঙ্গি স্বাভাবিক নয়। একটু পাগলাটে। না কি ভান করছে! দুটোই মারাত্মক। ধমক দিতে গিয়েও, শিখা থমকে গেল। না, থাক। কী থেকে কী হয়ে যাবে! কে জানে, হয়তো ধমক খেয়ে আবার কান্নাকাটি শুরু করে দিল। বিশ্বনাথ যেরকম ভয় ধরিয়ে দিয়েছে।

ফোন বাজছে। শিখা শোওয়ার ঘরে গেল ফোন ধরতে। মাধবী। মাধবী ঘটনা সবই জানে। কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর সে উদ্বিগ্ন হয়ে তার দিদিকে ফোন করছে।

'কী হল দিদি, বউটা কী করছে?'

শিখা ফিসফিস করে বলল, 'কী আবার করছে। খুব ঝামেলা শুরু করেছে।'

মাধবী ভয় পেয়ে বলল, 'বলিস কী? চোরটা মারা গেল নাকি?'

'চোর মারা গেছে কি না জানি না, তবে আমি মারা গেছি। চোরের বউকে এখন আমি মাছের কাঁটা বেছে খাওয়াচ্ছি।'

'কাঁটা বেছে মাছ খাওয়াচ্ছিস মানে! কী বলছিস? কিছুই তো বুঝতে পারছি না।'

শিখা ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'তুই বুঝবি কী করে, আমি নিজেও কিছু বুঝতে পারছি না। বউদি বউদি বলে ওই মেয়ে যা অর্ডার শুরু করেছে তাতে মনে হয় একটু পরে আমাকে হাতপাখা দিয়ে বাতাস করতে বলবে। মাথায় গোলমাল আছে মনে হচ্ছে। তোর জামাইবাবু ভয় পেয়ে আমার ঘাড়ে একটা পাগল গছিয়ে দিয়ে গেছে।'

'তোকে বউদি বউদি করছে! সাংঘাতিক তো! নিশ্চয় কোনও মতলব আছে। আমার তো ভীষণ ভয় করছে রে দিদি।'

'আমার ভয় করছে না। রাগ হচ্ছে। ঠিক করেছি ওর খাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তারপর ঘাড় ধরে বিদায় দেব।'

'খবরদার দিদি, ও কাজও করিস না! বুবুনের বাবা অফিসে যাওয়ার আগে বলে গেছে, তোমার জামাইবাবু খুব বুদ্ধিমানের মতো কাজ করেছে। মহিলাকে হাসপাতাল থেকে সরিয়ে না আনলে বিপদ আরও বাড়ত। এরা বিরাট গোলমাল পাকাতে জানে। দলবল ডেকে হয়তো থানা-টানাও ঘেরাও করে বসত। বলত লোকটাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছে। এবার ক্ষতিপূরণ চাই।'

শিখা অবাক হয়ে বলল, 'থানা ঘেরাও! চোরেরা থানা ঘেরাও করবে কী রে! কী যা-তা বলছিস মাধবী? তোরও মাথাটা গেছে মনে হচ্ছে।'

মাধবী রাগ রাগ গলায় বলল, 'আমাকে বলছিস কেন? সেসব বুবুনের বাবা জানে। সে যা-বলেছে, আমি সেটাই তোকে বললাম। জামাইবাবু তোকে যেমন বলছে, তুই সেইভাবে কর। টাকাপয়সার কথাটা বল। দুম করে বলবি না। আস্তে আস্তে বলবি। গল্প করতে করতে।'

শিখা উঠে দাঁড়াল। উত্তেজিত গলায় বলল, 'আমাকে এখন একটা চোরের বউয়ের সঙ্গে বসে গল্প করতে বলছিস! কী গল্প করব? ওর শাশুড়ি কেমন? ননদ কেমন? আমার এবার কান্না পাচ্ছে মাধবী। সকাল থেকে কী কাণ্ড চলছে! আমার মনে হচ্ছে, বাড়ি ছেড়ে পালাই।'

মাধবী ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'দিদি, মাথা ঠান্ডা রাখ। প্লিজ, জামাইবাবু আসার আগে তুই কিছু করে বসিস না। বউদি বলুক, মাসি বলুক, পিসি বলুক একদম রাগারাগি করিস না। ভাল ব্যবহার কর। আমি যাব?'

শিখা ধমকে বলল, 'খবরদার কেউ আসবি না। তোরা ভেবেছিসটা কী? মজা হচ্ছে! বাবাও ফোন করে বলছিল আসব। বারণ করে দিয়েছি। কী দেখতে আসবে? চোরের বউ দেখতে আসবে? তা ছাড়া আর কত ভাল ব্যবহার করব? ঘরে বসতে দিয়েছি, খেতে দিয়েছি। গাদার বদলে পেটির মাছ দিয়েছি। এবার কি টিভি চালিয়ে দেব?'

শিখা ফোন শেষ করে বসার ঘরে এসে দেখল তাকে টিভি চালাতে হবে না। কনকচাঁপা নিজেই টিভি চালিয়ে নিয়েছে। মাটিতে বসে, সোফায় হেলান দিয়ে টিভি দেখছে। মুখে মিটিমিটি হাসি। শিখাকে দেখে পা গুটিয়ে বলল, 'আসেন বউদি আসেন। বসেন। একটা মজার বই হচ্ছে।'

শিখা একটু দূরে সোফার ওপর বসল। রাগ হলে তার মাথার মাঝখানটা কেমন জ্বালা জ্বালা করে। জ্বালাটা শুরু হয়েছে। না, এরকম হলে চলবে না। ঠান্ডা মাথায় থাকতে হবে। ঘাড়ে এসে যখন পড়েছে...।

'হি হি।'

শিখা চমকে উঠে দেখল, কনকচাঁপা হাসছে!

আশ্চর্য তো! কী নিশ্চিন্তে বসে সিনেমা দেখছে! মেয়েটা সত্যি সত্যি চোরটার বউ তো? এইসব ক্রিমিনালদের আবার অনেকগুলো মেয়েমানুষ থাকে। বউ সেজে ঘুরে বেড়ায়। মওকা বুঝে এসে হাজির হয়েছে। টাকাপয়সা দিয়ে দেওয়াই ভাল। যত দেরি হবে সমস্যা বাড়বে। এই মেয়ে এখন টিভি চালিয়ে হাসছে, এরপর হয়তো বিছানায় নাক ডেকে ঘুমোবে। দু'-চারশোতে যদি আপদ ঘাড় থেকে নেমে যায় যাবে। খেসারতের কপাল ছিল। দু'-চারশোতে হবে?

শিখা গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, 'তোমার বাড়ি কোথায় কনকচাঁপা?'

টিভির থেকে মুখ না ঘুরিয়ে মহিলা বলল, 'কিছু বললেন বউদি? একটু দাঁড়ান। এই সিনটা শেষ হোক। দেখেন দেখেন লোকটা কেমন লাফায় দেখেন। এক্কেবারে হনুমান। হি হি।'

শিখা চুপ করে রইল। মেয়েটা মনে হচ্ছে পাগলই। যত সময় যাচ্ছে, স্পষ্ট হচ্ছে।

সিন শেষ হতে কনকচাঁপা ঘুরে বসল। বলল, 'হ্যাঁ, বলেন বউদি।'

শিখা একটু হাসার চেষ্টা করল। ম্যানেজ করতে হলে দরকার হাসিমুখ। তবে মনে হচ্ছে, হাসিটা ঠিক হল না। থতমত অবস্থায় বলল, 'না, তেমন কিছু নয়। বলছিলাম, তোমার বাড়ি কোথায়?'

'কী যে বলেন বউদি, আমাদের আবার বাড়ি! লাইনের ওপাশে থাকি। রোজই তো বলে তুলে দেব, তুলে দেব। অবস্থা এমন হয়েছে যে তুলে দেব না শুনলে, এখন আর রাতে ঘুম হয় না। আপনের যদি অভ্যেস হয়ে যায় তা হলেও একই কাণ্ড হবে। তুলে দেব শুনলে তবে ঘুম আসবে।'

শিখা কথা ঘোরানোর জন্য বলল, 'তুমি চিন্তা কোরো না। তোমার স্বামী খুব তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবে।'

কনকচাঁপা তার শাড়ির আঁচল গুছিয়ে বসল। বলল, 'আজকাল আমি চিন্তা করি না বউদি। আগে করতাম। খুব করতাম। এই রাতে বেরোলে চিন্তা করতাম। এই পুলিশে ধরল কি না চিন্তা করতাম। এই মার খেয়ে হাত-পা ভাঙল কি না চিন্তা করতাম। এখন করি না। বুঝে গেছি, এই দু'-চারটা দিন এদিক-সেদিক হবে তারপর আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনে কী বলেন, ঠিক হয়ে যাবে না?'

শিখা বুঝতে পারছে না, কী বলা উচিত। সে একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ঠিক হয়ে যাবে। নিশ্চয় ঠিক হয়ে যাবে। তোমার বরের তেমন কিছু হয়েছে বলে তো মনে হয় না।'

কনকচাঁপা হতাশ ভঙ্গিতে বলল, 'আমারও তাই মনে হয় বউদি। তেমন কিছু হয়নি। লোক মারফত খবর পেয়ে হাসপাতালে যখন গেলাম, তখন দেখি বিল্টুর বাপে ইঞ্জেকশন নিয়ে ঘুমায়। আমি নার্সকে চুপিচুপি জিগ্যেস করলাম, ক'টা ইঞ্জেকশন? সে বলল, একটা। তখনই বুঝেছি, মোটে একটা ইঞ্জেকশন নিয়ে যখন অমন নিশ্চিন্তে ঘুমায় তখন তেমন কিছু হয় নাই। আপনি বলেন না বউদি, তেমন কিছু হলে একটা ইঞ্জেকশনে ঘুমাত?'

কথা শুনে মনে হচ্ছে, মাত্র একটা ইঞ্জেকশনে স্বামীর ঘুমিয়ে পড়ায় এই মেয়ে খুশি নয়। সে চাইছে আরও বেশি কিছু। আরও খারাপ। কেন? বেশি টাকা পাওয়া যেত? কী ভয়ানক!

শিখার অস্বস্তিটা বড়ছে। এ কী বিচ্ছিরি ফ্যাসাদ রে বাবা। এরকম কখনও ঘটে? বিশ্বনাথ যাই বলুক, কখনও ঘটে না। মনে জোর আনার চেষ্টা করল শিখা। গলা নামিয়ে বলল, 'চিকিৎসার খরচাপাতি নিয়ে তুমি ভেবো না কনকচাঁপা। ঘটনা যখন আমাদের বাড়িতেই হয়েছে...। তোমার কী মনে হয়? কেমন টাকাপয়সা লাগতে পারে? তুমি তো হাসপাতালে গিয়েছিলে।'

মহিলা নড়েচড়ে বসল।

শিখা আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'ওষুধ-বিষুধের তো একটা খরচ আছে। আছে না?'

কনকচাঁপা মুখ নামিয়ে শাড়ির আঁচলটা আঙুলে পাকাতে পাকাতে বলল, 'তা আছে। খরচাপাতি তো একটা আছেই।'

শিখা একটু থামল। আচ্ছা, এই মেয়ের কাছে কোনও অস্ত্র-টস্ত্র নেই তো? চোরের

বউরা কি ছুরি-টুরি নিয়ে ঘোরে? ঘোরাটাই স্বাভাবিক। এই ফাঁকা ফ্ল্যাটে পেয়ে, তাকে যদি এখন আক্রমণ করে! ঠান্ডা একটা ভয় শিখার শরীরে বয়ে গেল। ঘরে একটা লোহার রড ছিল না? সেটা কোথায় গেল? বিশ্বনাথ কোথাও সরাল? ইস, গৌরীকে আজ দুপুরে ছেড়ে দেওয়াটা ঠিক হয়নি। কিন্তু রাখলেও তো সমস্যা। ঘটনা জানাজানি হয়ে যেত। শিখা শক্ত মনেরই মেয়ে, কিন্তু কী যেন হচ্ছে! ভয়? না, এখন ভয় পেলে চলবে না। এই মেয়ে যদি বোঝে সে ভয় পেয়ে গেছে, তা হলে আরও বড় কোনও বিপদ ঘটে যেতে পারে। কে জানে হয়তো ঝাঁপিয়ে পড়ল। ঝাঁপিয়ে পড়লে কী করবে? চিৎকার করবে?

শিখা কাঁপা গলায় বলল, 'তোমার দাদাবাবু আমাকে বলেছে, যা হওয়ার হয়ে গেছে। দু'-তিনশো টাকা যা খরচা লাগে...।'

শিখা চুপ করল। টাকার পরিমাণ কি কম হয়ে যাচ্ছে? হোক, কম থেকে শুরু করাই ভাল।

'চা খাবে কনক? খাও না এক কাপ চা? করি? তুমি খেলে আমিও এক কাপ খেতে পারি।'

আসলে শিখা এ ঘর থেকে খানিকক্ষণের জন্য সরে যেতে চায়। বিশ্বনাথকে এখনই একটা ফোন করতে হবে। তাকে দুটো কথা জিগ্যেস করা দরকার। এক, কত টাকার কথা বলবে? আর দুই, লোহার রডটা কোথায়?

'বাড়িতে আদা আছে বউদি?'

কনকচাঁপা দু'হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল। এতক্ষণ খেয়াল হয়নি, হাত তোলার পর এবার শিখা বুঝতে পারল, মেয়েটার শরীরের গড়নটা খারাপ নয়। রোগা হলেও কোমরে, বুকে মাংস আছে। হাতে জোর কেমন?

কাঁপা গলায় শিখা বলল, 'কেন, তুমি কি আদা চা খাবে?'

'না, আদা চা খাব না। আদার সঙ্গে দুইটা তেজপাতাও জলে ফেলে দেন। আদা-তেজপাতা চা খাব। বিল্টুর বাবায়ে বলে, গা ম্যাজম্যাজ হলে আদা-তেজপাতা চা হল গিয়ে দারুণ উবকারি। সেরকম খাটাখাটনি হলে আমি সক্কালে বিল্টুর বাবারে আদা-তেজপাতা চা করে দিই।'

'আচ্ছা, দেখছি।'

শিখা রান্নাঘরের দিকে এগোতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আমি চা বানিয়ে আনছি। তুমি ততক্ষণে মনে মনে একটা হিসেবপত্র করে নাও কনকচাঁপা। কত খরচ-টরচ হবে সেই হিসেব। বিকেল তো হয়েই এল। একটু পরেই তোমাকে আবার হাসপাতালে যেতে হবে। ভিজিটিং আওয়ার চারটে থেকে। চারটে থেকে না?'

কনকচাঁপা হাই তুলে বলল, 'চারটে না পাঁচটা কে জানে! কিছু একটা হবে। ও নিয়ে আমার মাথাব্যথা নাই।'

রান্নাঘরে গিয়ে দ্রুত মোবাইলের নম্বর টিপল শিখা। একবার, দু'বার, তিনবার। তিনবারেও বিশ্বনাথকে ধরা গেল না। তবে ফোন বন্ধ। ফোন বন্ধ কেন? নিশ্চয় মিটিং

করছে। উফ, মানুষটার কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই! আজকের দিনে মিটিং কীসের? ওর উচিত এখুনি বাড়ি চলে আসা।

চায়ে কয়েক কুচি আদা দিলেও তেজপাতা ফেলতে ভরসা পেল না শিখা। কনকচাঁপা হাতল ভাঙা কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, 'বউদি বড় লজ্জা লাগে।'

শিখাও চা নিয়েছে। তবে তার খেতে ইচ্ছে করছে না। নিতে হয়, তাই নিয়েছে। সে অবাক হয়ে বলল, 'লজ্জা লাগে! লজ্জা লাগবে কেন?'

'বা, লজ্জা লাগবে না! এত যত্ন-আত্তিতে লজ্জা লাগবে না?'

শিখা যেন খানিকটা নিজের অজান্তেই বলে ফেলল, 'না না, তা কেন?'

মেয়েটা হাসল। বলল, 'বউদি আমরা আরাম করে বসে ভাত, মাছ, চা খাওয়ার মানুষ নই। আমরা হলাম গিয়ে লাথিঝাঁটা খাওয়া মানুষ। মিথ্যে লাথিঝাঁটা নয় বউদি, সত্যিকারের লাথিঝাঁটা। হি হি।'

শিখা মনে মনে সতর্ক হল। মেয়েটা হয় পাগল, নয় সিমপ্যাথি আদায়ের চেষ্টা করছে। টাকা বেশি পাওয়ার মতলব। সাবধান। এখন পাগলের মতো হাসছে, এরপর নিশ্চয় কাঁদবে। কেঁদে পা জড়িয়ে ধরবে। পাগলরা হাসির পরেই কাঁদে। শিখা কিছুটা সরে বসল। কথা ঘোরানোর জন্য বলল, 'চা কেমন হয়েছে কনকচাঁপা?'

কনকচাঁপা কাপে লম্বা চুমুক দিয়ে বলল, 'চা সুন্দর হয়েছে। ভাগ্যিস, কাল রাতে বিল্টুর বাপে আপনার এই ফেলাট থেকে পড়েছিল। নইলে কি দাদায়ে এমন খাতির-খুতির করে ঘরে নিয়ে আসত? না আপনে এমন যত্ন করে খাওয়াতেন? আপনিও দুইটা লাথি দিতেন। চোরের বউরে লাথি দেওয়ার মজা অনেক।'

শিখার ইচ্ছে ছিল না, তবু সে গলা নামিয়ে বলে ফেলল, 'ছিঃ, অমন করে বলে না। কত বড় বিপদ হতে পারত!'

কনকচাঁপা দাঁত দেখানো হাসি হেসে উঠে দাঁড়াল। ফের হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল। বলল, 'রোজই বিপদের মধ্যে আছি। ঘরে মার খাওয়ার বিপদ, বাইরে স্বামী মরার বিপদ। আমার আবার বড় বিপদ, ছোট বিপদ। তবে চিন্তা করেন না বউদি, আর বেশিদিন নয়। একটা ফন্দি করেছি। চেন্‌স একটা পেলেই দেখিয়ে দেব।'

না, আর কোনও সন্দেহ নেই। এই মেয়ে পাগলই। পাগল হলে সুবিধে বেশি না কম? বেশি হওয়াই উচিত। পাগল মানুষ টাকাপয়সা নিয়ে ঝামেলায় যায় না।

শিখার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'কী ফন্দি?'

কোনও উত্তর দিল না কনকচাঁপা। মাথা নামিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল। সময় নিয়ে শাড়ির কুঁচি ঠিক করল। তারপর মুখ তুলে চোখ নাচিয়ে বলল, 'সে একটা জিনিস আছে। আগে বলা যাবে না। ছাড়েন ওসব কথা। বউদি যাওয়ার আগে একটা শাড়ি দেবেন তো। পুরনো হলে ক্ষতি নাই, তবে জমিটা যেন ভাল হয়। ভদ্রলোকের বাড়ি যাওয়ার মতো কোনও শাড়ি নেই ঘরে। ইস দেখেন না, আপনার এখানে কী পরে এসেছি। আপনে খরচাপাতির কথা কী যেন বলছিলেন?'

শিখা উৎসাহ নিয়ে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছিলাম তো। তুমি বলো, কত দিলে মোটামুটি

তোমার... বলো না লজ্জা পাচ্ছ কেন? আহা, ঘটনা যখন একটা ঘটেই গেছে। তোমার দাদাবাবু আমায় বলে দিয়েছেন, যতই হোক গরিব মানুষ। তোমার দাদাবাবুও একবার হাসপাতালে যাবেখণ। আজ না পারলে কাল-পরশু তো যাবেই।'

কনকচাঁপা সত্যি সত্যি যেন লজ্জা পেল। বলল, 'না না, দাদারে আর ব্যস্ত করবেন না। উনি অনেক করেছেন। নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল পুলিশ থানায়, তার বদলে নিয়ে এসেছেন ঘরে। এর বেশি আর কী করবেন? বউদি আপনের ওই ইস্পটটা একবার দেখা যাবে?'

শিখা অবাক হয়ে বলল, 'স্পট! কীসের স্পট!'

'ওই যে, যেখান থেকে বিল্টুর বাবা পড়ছে সেই ইস্পটটা? দেখা যাবে একবার?'

শিখা বিরক্ত হল। মেয়েটা তো বড্ড ফ্যাচাং করে। সহ্যের একটা সীমা আছে!

শিখা বিরক্ত গলায় বলল, 'বারান্দা দেখে কী করবে?'

কনকচাঁপা হেসে বলল, 'রাগ করেন না বউদি। একটু দেখতাম। জায়গাটা কত উঁচু না দেখে টাকাপয়সা ঠিক করি কী করে? মানুষটা বাঁচবে না মরবে, এক পা ভাঙবে না দুই পা-ই ভাঙবে, পায়ের সঙ্গে হাত ভাঙবে না মাথা ফাটবে। সবেরই তো একটা হিসেব লাগে। লাগে না?'

উফ, আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে তো। যাক, কাজটা গুটিয়ে আনার মুখে ভেস্তে দিয়ে লাভ নেই। যা খুশি করুক।

'যাও দেখে এসো। ওই যে দরজা। বেরোলেই ডানদিকে বারান্দা। তোমার বিল্টুর বাবা কি এই কাণ্ডই করে? চুরি করতে লোকের বারান্দা বেয়ে ওপরে ওঠে?' গলায় ইচ্ছে করেই একটা চাপা হুমকির ভাব আনল শিখা।

সেই হুমকিকে পাত্তা না দিয়ে কনকচাঁপা নির্লিপ্ত মুখে বলল, 'এখন তাই ওঠে। বারান্দা দিয়েই ওঠে। তবে সেদিন বলছিল, এবার আগে ছাদে উঠে যাবে। তারপর নামবে। আর তাড়া খেলে ছাদ থেকেই লাফ দেবে নীচে। ছাদ থেকে নীচে পড়লে, পাবলিক নাকি বেশি ঘাবড়ায়। আমার কী মনে হয় জানেন বউদি, বেশিদিন এই টেকনিক বিল্টুর বাবায়ে চালাতে পারবে না। দু'-একবারের পরই ফটাস করে মরে যাবে। আপনে কী বলেন?'

কনকচাঁপা বারান্দার দিকে চলে যাওয়ার পর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শিখা। যা ঘটছে, যা শুনছে তা কি সত্যি? নিশ্চয় সত্যি নয়। এমন কখনও হতে পারে না।

শিখার চমক ভাঙল মোবাইলের আওয়াজে।

'কী হল, ধরছ না কেন?' বিশ্বনাথের গলায় বিরক্তি।

'এই তো ধরলাম। তুমি ফোন বন্ধ করে রেখেছিলে?'

'হাসপাতালের ভেতরে ছিলাম। লোকটার এক্স-রে হল। ডাক্তারের সঙ্গে কথা বললাম।'

শিখা অবাক হয়ে বলল, 'হাসপাতালে! হাসপাতালে গেলে কখন!'

'অফিস থেকে চলে এসেছি। পরিমলও সঙ্গে এসেছে। গুড নিউজ আছে শিখা। মিরাক্যাল বলতে পারো। ভগবান আমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছেন। হারামজাদাটার কিছুই হয়নি। নো হাত-পা ভাঙা, নাথিং। শুধু একটু মাথা ফেটেছে। তিনটে মাত্র স্টিচ। কোনও ব্যাপারই নয়।'

শিখা উত্তেজিত হয়ে বলল, 'বলো কী! সত্যি!'

বিশ্বনাথ হাসতে হাসতে বলল, 'সত্যি না তো কী? হাসপাতাল আজই লোকটাকে ছেড়ে দিচ্ছে। উফ, বেটা যে কী চিন্তায় ফেলেছিল! এখন বেডে বসে গরম দুধ খাচ্ছে আর পা নাড়ছে শালা।'

সারাটা দিন চোরের মতো ফিসফাস করে কেটেছে। আর দরকার নেই। শিখা জোরগলায় বলল, 'লোকটার দলবল কিছু দেখলে? গুন্ডা-টুন্ডা?'

'ধুস, কেউ নেই। একেবারে ভিখিরি। মিছিমিছি ভয় পেয়েছিলাম। বুঝতে পারলাম, শুধু বউটাকে নিয়ে এসব করে বেড়ায়। হারামজাদাটার হাতে একশো টাকা দিয়ে পরিমল বলল, যা, এবারের মতো ছেড়ে দিলাম। তোকে পুলিশের হাতে দিচ্ছি না। ফের যদি...। লোকটা আমাদের পা-টা ধরে একাকার কাণ্ড। ওই মেয়েটা কোথায়? চোরের বউটা?'

শিখা এবার গলা একটু নামাল। বারান্দার দিকে তাকিয়ে বলল, 'যা, ওরকম করে বোলো না। কনকচাঁপা একটা পাগলি।'

'কনকচাঁপা! কনকচাঁপা আবার কে!' বিশ্বনাথের গলায় বিস্ময়।

শিখা হেসে বলল, 'লোকটার বউ। বারান্দায় গেছে। মনে হচ্ছে, ফিতে হাতে মাপছে বর কত উঁচু থেকে পড়েছে। সেই বুঝে টাকার অ্যামাউন্ট ঠিক করবে বলেছে।'

'অ্যামাউন্ট ঠিক করাচ্ছি। এখনই ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দাও। ট্যাঁ-ফুঁ করলে বলো পুলিশ ডাকব। পুলিশ এসে লাথি মারতে মারতে নিয়ে যাবে। দেখবে এইটুকু বললেই কাজ দেবে। ভয়ে কুঁকড়ে যাবে।'

শিখা হালকা ধমক দিয়ে বলল, 'অ্যাই বলছি না ওরকম করে বোলো না। বিপদ কেটে গেছে বলে হম্বিতম্বি খুব বেড়েছে দেখছি! মেয়েটাকে আমি বের করে দিচ্ছি, তবে হাতে কয়েকটা টাকা দিয়ে দেব কিন্তু। বেশি না, এই দশ-কুড়ি টাকা। বেচারি আশা করে আছে।'

বিশ্বনাথ অবাক হয়ে বলল, 'কী বলছ তুমি! টাকা দেবে! খবরদার একদম প্রশ্রয় দেবে না। একটু পরেই আমি আসছি। উফ, বিরাট ফাঁড়া কাটল। অ্যাই শোনো, পরিমল খেতে চাইছে। প্রনপকৌড়া আর দু'পেগ করে ইয়ে। আজ পারমিশান দিতে হবে কিন্তু।'

শিখা খুশি খুশি গলায় বলল, 'যাও, যা খুশি করো।'

বিশ্বনাথের মোবাইল কেটে দিতে দিতে শিখা ঠিক করল, টাকা নয়, কনকচাঁপাকে সে একটা শাড়িই দেবে। ইচ্ছে করলে একটা ভাল শাড়ি সে দিতে পারে। কিন্তু দেবে না। মোটামুটি ধরনের একটা দেবে। ভাল শাড়ি দিলে এই মেয়ে লাই পেয়ে যাবে। ছোটলোকদের সব করতে হয়, লাই দিতে নেই।

শাড়ির জন্য শিখা তার শোওয়ার ঘরের দিকে পা বাড়াতেই বিকট আওয়াজটা হল। ঠিক যেন ভোররাতের সেই আওয়াজ! বারান্দা থেকে ছিটকে কেউ নীচের চাতালে গিয়ে পড়ল! পড়বার আগে ধাক্কা খেল দোতলার কার্নিশে।

অন্য দিন এই বিকেল হব-হব সময়টার ফ্ল্যাটের সামনেই দু'-একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে। আজ নেই। ঝন্টু সিং-এর ডেকে দেওয়া রিকশাতেই হাসপাতালে যাচ্ছে শিখা। তার কাঁধে

কনকচাঁপার মাথা। সেই মাথার মাঝখানে থেকে চুঁইয়ে আসা রক্তে শিখার জামা ভিজে যাচ্ছে। রিকশায় ওঠা পর্যন্ত মেয়েটার জ্ঞান ছিল। এখন আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। তার আগে ফিসফিস করে বলেছে, 'ইস, লাফটা ঠিকমতো হল না বউদি। মনে হচ্ছে, এবারও বেঁচে যাব। আপনের কী মনে হয়?'

দু'হাত দিয়ে কনকচাঁপাকে জড়িয়ে রেখেছে শিখা। তার দু'চোখ বেয়ে দরদর করে জল পড়ছে। সে খুব চেষ্টা করছে কান্না থামাতে। পারছে না। রিকশাওলাকে বিড়বিড় করে বলল, 'তাড়াতাড়ি চলো। আর একটু তাড়াতাড়ি চলো ভাই।'

দেশ, ২ নভেম্বর ২০০৫

ফ্লাইওভার

ঘটনাটা ঘটে বুধবার। বুধবার দুপুরে।

প্রথমে রাস্তার মাঝখানটা ফুলে ওঠে। উঁচু হয়ে ওঠে কুঁজের মতো। মনে হয়, একটা ঢেউ। সেই ঢেউ স্থির হয়ে অল্প কাঁপে। তারপর নিচু হয়ে মাথা নামিয়ে দ্রুত এগিয়ে যায় সামনে। গড়িয়াহাটের দিকে যতটা দেখা যায় কংক্রিট আর পিচে কাঁপুনি তুলে ছুটতে থাকে। ফিরেও আসে আবার। তারপর নবনীদের বাড়ি টপকে, শপিং প্লাজার বাঁক ঘুরে চলে যায় বাইপাসের দিকে। চোখের আড়ালে।

সব মিলিয়ে কয়েক মুহূর্ত। নবনী দৃশ্যটা দেখে স্থির হয়ে। চোখের পলক না ফেলে। তারপর দুটো হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে বারান্দার রেলিং। এটা সে কী দেখল! কী দেখল সে? ফ্লাইওভারটা নড়ে উঠল। যেন দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ পড়ে থাকার পর শরীরে ঢেউ তুলে প্রাণের জানান দিল!

একটু আগেই ঘরের টুকটাক কাজ সেরে স্নান করেছে নবনী। অন্যদিন আরও আগে হয়ে যায়। তথাগত অফিসে বেরিয়ে যাওয়ার পরপরই বাথরুমে ঢুকে পড়ে। তারপর সারাদিন তো একা। যে-কোনও একটা সময় খেয়ে নিলেই চলে। না খেলেও ক্ষতি নেই। ছিপছিপে শরীরটা ধরে রাখতে দু'-একটা দিন লাঞ্চ স্কিপ করা ভাল। এতে অন্য সময়ের হাবিজাবি খাওয়াগুলো কিছুটা ব্যালান্স হয়। নবনীও তাই করে। তথাগত যদিও হুমকি দেয়, নাটুকে ভঙ্গিতে বলে, 'বেশিদিন এ জিনিস চলবে না প্রিয়তমা। অচিরেই তোমার এই ঝাড়া হাতে পায়ে আমি শিকল পরাব। ছেলেমেয়ে হয়ে গেলে মজা টের পাবে। তখন চলতে হবে একেবারে ঘড়ি ধরে। খাওয়া-পরা-শোওয়া সব। এমনকী আমাদের ইয়েও। এই ধরো, ওর জন্য সময় দেওয়া থাকবে রাত দেড়টায়। বাচ্চা ঘুমোনোর পর, মাত্র কুড়ি মিনিট। ফার্স্ট ওয়ার্নিং বেল পড়বে ষোলো মিনিটের মাথায়। হা হা।'

নবনী স্বামীর গায়ে কিল মারে। মেরে বলে, 'অসভ্য কোথাকার। খুব চোখ টাটাচ্ছে, না? এখন কিছুতেই ওসব হ্যাপার মধ্যে যাব না। তোমার মা-ও সেদিন ফোনে বলছিলেন। ছেলেপুলে নাকি অল্প বয়সে হওয়াই ভাল। আমি বললাম, মা, ওসব পুরনো দিনের কথা। আপনার ছেলে আর একটু গুছিয়ে নিক। আজকালকার দিনে ছেলেমেয়ে মানুষ করা অত সহজ নয়। আগে নিজেদের তৈরি হতে হয়।'

বুধবার দুপুরে ভেজা চুলে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল নবনী। দশ তলার এই বারান্দায় হাওয়া অনেক। কোনও কোনও দিন বিকেলের পর মনে হয়, ঝড় দিয়েছে। সিঁথির বাড়িতে দোতলার ছাদে উঠলেও দম চাপা লাগত। এই ফ্ল্যাট কেনার আগে তাই কম পরিশ্রম করেনি

নবনী। তথাগত আর সে গাড়ি নিয়ে চক্কর মেরেছে গোটা শহর। প্রোমোটারদের চকচকে অফিস থেকে শুরু করে দালালদের চায়ের দোকানের আস্তানা— কোথায় না গেছে? কখনও আবার মিস্ত্রি, দারোয়ানকে ম্যানেজ করে উঠে গেছে আধখানা তৈরি বাড়ির টঙে। ইট-বালি লোহা-লক্কড় টপকে ঘুরেছে কঙ্কাল ফ্ল্যাটে। বোঝার চেষ্টা করেছে শেষ পর্যন্ত চেহারাটা কেমন হবে। বেডরুমের মুখ থাকবে কোনদিকে? বাথরুম হবে কত বড়?

তথাগতর ইচ্ছে ছিল ফ্ল্যাট কিনবে ওপরে। অনেক ওপরে। টাওয়ার হলে সবথেকে ভাল। এখন নাকি এটাই স্টাইল। যত ওপরে, তত শুধু ধুলো ময়লা মশা মাছি কম নয়, রোদ বৃষ্টি হাওয়াও পাওয়া যায় ফার্স্ট হ্যান্ড। নবনীর অবশ্য বায়নাক্কা ছিল অন্য জিনিসে। বাথরুমে। সিঁথির ঘুপচি স্যাঁতসেঁতে বাথরুমটা সে ভুলতে চায়। নিজের ফ্ল্যাটের বাথরুম চাই বড়। মেঝে হতে হবে মার্বেলের। সাদা নয়, হালকা গোলাপি মার্বেল। বাথটবও হবে গোলাপি। সেইসঙ্গে থাকবে একটা জানলা। বড় জানলা। বাথটবে শুয়ে শুয়ে যেন আকাশ দেখা যায়। মাথার ওপর শাওয়ার থেকে যখন জল পড়বে তখন মনে হবে সত্যিকারের বৃষ্টি হচ্ছে।

শেষপর্যন্ত অবশ্য অত কিছু দেখা হল না। দেখা হল ফ্লাইওভার।

বাড়ির পাশেই ফ্লাইওভার শুনে তথাগত ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে ওখানেই ফ্ল্যাট নেবে। দাম একটু বেশি হলে হোক, কোনও ক্ষতি নেই। পাশে ফ্লাইওভার থাকলে ফ্ল্যাট বেশি দিন ফ্ল্যাট থাকে না। ক'দিনের মধ্যে সোনা হয়ে যায়। এক শনিবার বিকেলে নবনীকে নিয়ে দেখে গেল তথাগত। ফ্লাইওভার শুধু বাড়ির পাশে নয়, একেবারে তাদের ফ্ল্যাটের গায়ে। হাত বাড়ালেই যেন ছোঁয়া যাবে! রাতে নবনী বলল, 'সব ঠিক আছে, কিন্তু একেবারে বেডরুমের ওপর দিয়ে রাস্তা। বারান্দাটা টপকালেই। কেমন বিচ্ছিরি না?'

তথাগত চোখ কপালে তুলে বলল, 'রাস্তা! ফ্লাইওভারকে তুমি রাস্তা বলছ নবনী! তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? আর ইউ ম্যাড?'

নাইটি পরতে পরতে নবনী বলল, 'পাগলের কী আছে? ঘর থেকে গাছপালা দেখারও তো দরকার। বারান্দায় বসে কেবল পিচের রাস্তা আর গাড়িঘোড়া দেখব নাকি? ইস, মা গো!'

তথাগত উদাস গলায় বলল, 'না, দেখবে না। তুমি বরং একটা কাজ করো। তুমি আমাদের দেশের বাড়িতে গিয়ে সেট্‌ল করো। আমি বাবার সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি। বাইরের দিকের একটা ঘর তোমার জন্য রেনোভেট করে দেওয়া হবে। সেখানে শুধু সবুজ গাছ নয়, তুমি গোরুর গাড়ি, মাটির রাস্তা সবই দেখতে পাবে। ইচ্ছে করলে বৃষ্টির সময় এক হাঁটু কাদা মাড়িয়েও ঘুরে বেড়াতে পারো।'

নবনী রেগে গিয়ে বলে, 'ইয়ারকি করছ? যা খুশি করো। তোমার টাকার ফ্ল্যাট, ফ্লাইওভারের ঘাড়ে কিনবে না বাইপাসের মাথায় কিনবে, তুমি ঠিক করো।'

তথাগত এগিয়ে এসে স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখে। হেসে বলে, 'ডার্লিং, ঠান্ডা মাথায় বোঝার চেষ্টা করো। ফ্লাইওভার মানে এখন আর শুধু একটা শর্টকাট রাস্তা নয়। এটা একটা আধুনিক বিষয়। একটা ডেভেলপমেন্ট। তুমি সেটার পার্ট হচ্ছ। শুধু কি তাই? স্পিডের কথাটা একবার

ভেবে দেখবে না? চোখের সামনে সারাক্ষণ গাড়ি ছুটবে। মনে হবে ছুটছে না, উড়ছে। একটা সময় ইউ ক্যান ফিল দ্যাট স্পিড। মনে হবে, তুমিও সেই গতিটাকে ছুঁতে পারছ। আমাদের ছেলেমেয়েরাও একদিন স্পিডটাকে নিজেদের মধ্যে নিয়ে নেবে। হুইচ ইজ ভেরি ইমপর্ট্যান্ট।'

নবনী চোখ সরু করে বলল, 'বাপ রে, এত লেকচার শিখলে কোথা থেকে? আসল কথাটা বলো না বাপু, ফ্লাইওভারের জন্য ফ্ল্যাটের দাম বাড়বে। রিসেল ভ্যালু যাকে বলে।'

তথাগত হাসল। ধরা পড়ার লাজুক হাসি। হাসতে হাসতেই সে তার নবনীর নাইটির স্ট্র্যাপ কাঁধ থেকে নামাতে যায়। নবনী বলে, 'অ্যাই কী হচ্ছে? আগে আলো নেভাও।'

মাসখানেক হল সিঁথির বাড়িতে শ্বশুর-শাশুড়িকে রেখে নতুন ফ্ল্যাটে উঠে এসেছে তারা। তবে ফ্লাইওভার এখনও চালু হয়নি। চালু হয়ে যাবে যে-কোনও দিন। বাড়ির দারোয়ানের কাছে নিয়মিত খোঁজ নেয় তথাগত। সে জানিয়েছে, মন্ত্রীর ডেট নিয়ে নাকি ঝামেলা চলছে। ডেট পেলেই উদ্বোধন। এদিকে কাজ প্রায় শেষ। ঝকঝকে কালো পিচের ওপর রোজ নতুন করে পিচ ঢালা চলছে। সাদা সিমেন্টের রেলিংগুলো দেখাচ্ছে আলপনার মতো। সারি সারি আলোর পোস্ট নিয়ে সেজেগুজে বসে আছে ফ্লাইওভার। বসে আছে? না পিলারের ওপর ভাসছে? হঠাৎ দেখলে মনে হয়, শূন্যে ভাসছে। উঁচু বাড়িগুলোর মাঝখান দিয়ে এঁকে-বেঁকে, পাক খেয়ে, বাঁক ঘুরে গড়িয়াহাটের দিক থেকে চলে গেছে বাইপাস পর্যন্ত। নবনীর বেশ লাগে। মাঝেমধ্যে মনে হয়, ফ্লাইওভার নয়, একটা সাপ। অজগর সাপ। কঠিন পেশি আর পুরুষালি শরীরটা নিয়ে উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। নিথর হয়ে।

বুধবারই প্রথম অন্যরকম লাগল। অন্যরকম এবং ভয়ের। মনে হল, ফ্লাইওভারটা বুঝি নড়ে উঠল! তবে বেশিক্ষণের জন্য নয়। দ্রুত নিজেকে সামলে নিয়েছে নবনী। বুঝতে পেরেছে, আসলে গোটাটাই মনের ভুল। মন সেই ভুল চালান করেছে চোখে। নিজের মনেই হাসল সে। ঘটনাটা মজার, খুবই মজার। তবে, তথাগতকে বলা যাবে না। চিন্তা করবে। চোখের ডাক্তারও দেখাতে পারে। সুন্দরী বউ হওয়ার এই এক অসুবিধে। স্বামীরা প্রথম প্রথম বড্ড আদিখ্যেতা করে।

তবে, বলতে হল। তথাগতকে বলতে হল ঠিক তিন দিনের মাথায়। আরও দুটো ঘটনার পর।

প্রথমটা ঘটল সন্ধেবেলা। নিজের ঘরে সাজতে বসেছিল নবনী। বিয়ের পর রোজই এটা করে। তথাগত বাড়ি ফেরার আগে গা ধুয়ে সাজগোজ করে। হালকা মেকআপ নেয়। প্রথম প্রথম কেলেঙ্কারি হত। তখন তারা সিঁথির বাড়িতে। তথাগত ঘরে ঢুকেই এমন ধামসা-ধামসি শুরু করত যে পাউডার লিপস্টিক থেবড়ে-টেবড়ে একাকার কাণ্ড। শ্বশুর-শাশুড়ির সামনে বেরোনো যেত না। এখন ফাঁকা ফ্ল্যাটে আরও বেশি করে। নবনী রাগ দেখায়, বকে। তবু তথাগত ফিরে আসার আগে তৈরিও হয়। হালকা করে ভুরু আঁকে, চোখে মাসকারা দেয়। গালে পাউডার বোলায়। দেয়াল জোড়া ওয়ার্ডরোব খুলে বের করে পোশাক। সেই পোশাকে কোনওদিন কাঁধ নেই, কোনওদিন পিঠ নেই, কোনওদিন জামা

থমকে গেছে নাভির ওপরে। তথাগতর মাথা ঘুরে যায়। বেচারি মুখ হাত ধোওয়ারও ফুরসত পায় না। আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ে।

সেদিনও সাজছিল নবনী। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে হাউসকোটের দড়ি খুলতে খুলতে ভাবছিল, কী পরবে আজ? কী পরলে আজও মাথা ঘুরবে তথাগতর? ঠিক এরকম একটা সময় আওয়াজটা শুনতে পায় সে। তখন সাতটাও বাজেনি।

হিস্ হিস্ হিস্...।

নবনী চমকে ওঠে। ঠিক যেন নিশ্বাসের মতো! মানুষের নয়, অন্য কিছুর, অন্য কারও নিশ্বাস। চাপা অথচ গম্ভীর। ব্যস্ত হাতে কোমরে হাউসকোটের দড়ি আটকায় নবনী। কীসের শব্দ? কে ওখানে? মন শক্ত করে এগিয়ে যায়। কাঁপা হাতে লক টেনে বারান্দার দরজা খোলে। এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া ঝাঁপিয়ে পড়ল গায়ে। কোথাও কিছু নেই। কেউ নেই। ফ্লাইওভারের আলোগুলো আজ জ্বলছে। ঝলমল করছে। সুন্দর লাগছে। নবনীর নিজের ওপর রাগ হল। এ আবার কী শুরু হয়েছে তার? এই বয়সেই চোখ, কান, মাথার ভুল! নাকি ভয়! ভয়ের কথা শুনলেই তথাগত বলবে, 'তখনই বলেছিলাম, সন্ধের পর একা এত বড় ফ্ল্যাটে থাকতে পারবে না। আমি বরং বাবা-মাকে রাখি।'

পরের ঘটনাটা কিন্তু ঘটল দিনেরবেলা।

নবনী তখন বাথরুমে। বাথরুমে নয়, বলা ভাল বাথটবে। গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে শুয়ে আছে ফেনার মধ্যে। সপ্তাহে অন্তত চারটে দিন সে এই কাণ্ড করে। তথাগত বেরিয়ে যাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক ফেনার মধ্যে আধশোয়া হয়ে থাকে। শুয়ে শুয়েই সাবান, লোশন, ক্রিম দিয়ে শরীরের পরিচর্যা চালায়। সেদিন নবনী ব্যস্ত ছিল হাতের নখ নিয়ে। মনোযোগ সহকারে ব্রাশ ঘষছিল। হঠাৎই অস্বস্তিটা শুরু হয়। কেমন যেন লাগে। পুরুষমানুষ বিচ্ছিরিভাবে তাকিয়ে থাকলে যেমন হয়, অনেকটা সেরকম। সে মুখ তোলে। চারপাশ দেখে। কই, সবই তো ঠিক আছে। বাথরুমের দরজাও বন্ধ। তা হলে? নবনী ফের নখে মন দেয়। গুনগুন করে গানও শুরু করে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই অস্বস্তিটা ফিরে আসে আবার। ফেরে আরও তীব্র হয়ে। এবার মনে হয় কেউ যেন একেবারে ঘাড়ের ওপর এসে গেছে। অপেক্ষা করছে, বাথটব ছেড়ে নবনী কখন উঠবে। দ্রুত পাশে রাখা তোয়ালের দিকে হাত বাড়ায় নবনী। হাতড়ায় কঠিন মার্বেলে। কোথায় তোয়ালে? কোথায়? বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে ওঠে। তোয়ালেটা তো সে এখানেই রাখে। বাথটবের গায়ে। ডান পাশে, হাতের নাগালে। স্নানের পর জড়িয়ে নেমে আসে। তারপর জল ঝরিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাথরুম থেকে। তা হলে? তা হলে এখন জিনিসটা গেল কোথায়? ও পাশে? পায়ের দিকে? মুখ ফেরাল নবনী। না নেই। কোথাও নেই। বুক পর্যন্ত জলে ঢেকে নবনী উঠে বসল দ্রুত। ফেনায় আওয়াজ হল। চড়চড়, চড়চড়। বিস্ফারিত চোখে সে তাকাল চার পাশে। নেই, কোথাও নেই তার তোয়ালে। তার আবরু! কে সরিয়ে নিয়েছে?

জলের মধ্যে বসেই নবনী বুঝতে পারে তার শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা একটা স্রোত বয়ে চলেছে। সেই স্রোত জলের থেকেও ঠান্ডা। সে কী করবে এখন? হাত দুটো নগ্ন বুকে ঢাকা দিয়ে চিৎকার করে উঠবে? এই দশতলার ফ্ল্যাট থেকে কে শুনবে সেই চিৎকার? সিলিং-এর কাছের আধখোলা ওই জানলা দিয়ে আওয়াজ কি বেরোবে?

খড়কুটো চেপে ধরার মতো করে নবনী মুখ তুলল জানলার দিকে। এবং তখনই দেখতে পেল।

চ্যাপটা মুখ। পিচের মতো ঝকঝকে কালো ও মসৃণ। ছোট ছোট চোখ দুটো কংক্রিটের মতো কঠিন, নিষ্প্রাণ, তবু যেন জ্বলছে! হাসছেও! হাসছে কি? মুখের অন্ধকার থেকে লকলকিয়ে বেরিয়ে আসছে জিভ। লাল জিভ। সেই জিভ মাঝখান থেকে চেরা। সাপের মতো চেরা। জানলার ফাঁক দিয়ে পিছলে গলে আসা কালো শরীরটা দুলছে, ভাসছে, শূন্যেই এঁকেবেঁকে পাক মারছে। যেন বাঁক ঘুরছে ফ্লাইওভারের মতো!

কখন, কীভাবে বাথরুম থেকে বেরোল মনে নেই নবনীর। সে কি তার তোয়ালে খুঁজে পায়? নাকি নগ্ন হয়েই বেরিয়ে আসে? বাইরে এসে তথাগতকে ফোনে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠে, 'চলে এসো। প্লিজ বাড়ি ফিরে এসো। এখনই।'

লিফ্‌ট দিয়ে নামতে নামতে ডাক্তার চৌধুরী বললেন, 'নার্ভাস ব্রেকডাউন। চিন্তার কিছু নেই। অনেক সময় এরকম হয়। যা দেখে ভয় পাওয়ার নয় তাই দেখেও মানুষ ভয় পায়। দু'দিন বিশ্রাম করলে ঠিক হয়ে যাবে। ওষুধ দিয়েছি। এখন ঘুমোবে। কাল একটা রিপোর্ট করবেন।'

'আর ওই দাগগুলো?' তথাগত গলা নামিয়ে বলে, 'ওই যে বুকের পাশে, ঊরুতে। আঁচড়ের মতো। নবনী বলল, তলপেটেও নাকি ফিল করেছে। দাঁত দিয়ে কামড়ের মতো অনুভূতি।'

ডাক্তার চৌধুরী সামান্য হাসলেন। বললেন, 'ভয়টা চেন রি-অ্যাকশনের মতো হয়েছে। একটা মনের ভুল থেকে আর একটা মনের ভুল। ব্যাপারটা ওরকম কিছু নয়। বাথরুম থেকে ছুটে বেরিয়ে আসার সময় ধাক্কা লেগেছে আপনার মিসেসের। বাথটবের কোণে, বেসিনে অথবা দরজার হাতলে। কেটে ছড়ে গেছে। অ্যান্টিসেপটিক ইজ এনাফ।'

এতক্ষণ পরে তথাগত হাসল। বলল, 'ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু। অনেক ধন্যবাদ। নবনী এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিল।' ডাক্তারবাবু গাড়ির দরজা খোলার আগে তথাগতর হাতটা একটু ছুঁলেন। বললেন, 'না না, ভয়ের কিছু নেই। ভয়ের কী আছে?'

তীব্র তেষ্টা নিয়ে তথাগতর ঘুম ভাঙল। কিন্তু চোখ খোলবার পর সে বুঝতে পারল, তেষ্টা নয়, তার ঘুম ভেঙেছে ভয়ে। অজানা এক তীব্র ভয়ে। মনে হচ্ছে, ইট পাথর কংক্রিটের ভারী শরীর নিয়ে কে যেন বুকে ঘষটে নিজেকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে আসছে। নিয়ে আসছে রেলিং টপকে, বারান্দা পার করে। ধারালো ও গা-ছমছমে আওয়াজ তুলে।

পিচের কড়া গন্ধে গা গুলিয়ে ওঠে তথাগতর।

আনন্দবাজার, রবিবাসরীয়, ২০০৭

পেঁচা

মন্দিরার কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে। বেশি নয়, হালকা একটা অস্বস্তি। কীসের অস্বস্তি? একটা গ্রাম্য, রোগাভোগা ছেলেকে দেখে অস্বস্তি হবে কেন? অস্বস্তি কাটানোর জন্য সে মুখ তুলে ভাল করে তাকাল।

ছেলেটার বয়স চোদ্দো-পনেরো, নাকি আর একটু বেশিই হবে? অত্যাধিক রোগা হলে বয়স ঠিকমতো বোঝা যায় না। একতলার এই ড্রইংরুমে আলোর শেডগুলো কায়দার। মন্দিরা নিজে বেছে কিনেছিল। কায়দার আলো তেমন উজ্জ্বল হয় না। এ ঘরেও তাই ঘটেছে। তবে তার মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে, ছেলেটা পরেছে খয়েরি রঙের ফুলপ্যান্ট আর একটা বেখাপ্পা হলুদ রঙের জামা। দুটোই যথেষ্ট সস্তার। জামা সস্তার হলেও হাতায় বোতাম আছে। সেই বোতাম যত্ন করে লাগানো। সঙ্গে একটা পেটমোটা ব্যাগ। ব্যাগ না বলে পুঁটলি বলাই ভাল। হাতলওয়ালা পুঁটলি। সেই পুঁটলি মাটিতে রেখে, ঝাঁকড়া চুলের রোগা ছেলে মাথা নামিয়ে, জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটার কাঁধগুলো কি একটু উঁচু? নাকি দাঁড়ালে উঁচু লাগে? গা থেকে কেমন একটা পাড়াগাঁয়ের বুনো বুনো গন্ধ আসছে।

মন্দিরা বিরক্ত হল। কল্যাণ ছেলেটাকে একেবারে ড্রইংরুমে নিয়ে এল কোন আক্কেলে? এরা রোগের ডিপো হয়। কল্যাণের কি খেয়াল নেই, বাড়িতে তার একটা ছ'বছরের মেয়ে আছে?

কল্যাণ টেবিলের ওপর অফিসের ব্যাগ রাখল। পকেট থেকে মোবাইলটা বের করতে করতে সোফায় বসে পড়ল গা এলিয়ে। বলল, 'মন্দিরা, এর কথাই তোমায় ফোনে বলেছি। অনন্তকাকা পাঠিয়েছে। এই, তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন? এই টুলটা টেনে বসো।'

ছেলেটা বসল না। দরজার পাশে যেমন দাঁড়িয়ে ছিল, তেমন দাঁড়িয়ে রইল।

মন্দিরা ছোট করে বলল, 'ও।'

কল্যাণ পকেট হাতড়ে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করল। স্ত্রীর দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'এই দেখো, অনন্তকাকার চিঠি। অনন্তকাকাকে তোমার মনে আছে? বাবার কাজের সময় এসেছিল?'

মন্দিরা মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'না, মনে নেই। আমি চিঠি দেখে কী করব?'

মন্দিরার চিঠি দেখার কোনও ইচ্ছে নেই। কী হবে দেখে? শ্বশুরমশাই মারা যাওয়ার আগেই দেশের জমি-জমা সব বিক্রি করেছেন। দেশই নেই, সেই দেশের আবার কাকা-জেঠা! তাও নিজের হলে একটা কথা ছিল। কবে কোথায় ঘর-বাড়ি দেখত, সম্পত্তি পাহারা দিত তার জন্য পাতানো সম্পর্ক। এইসব আজকাল চলে নাকি! যত্তসব গেঁইয়া ব্যাপার।

কল্যাণ ঝুঁকে পড়ে বলল, 'আহা, দেখোই না। দেখলে ব্যাপারটা বুঝতে পারবে।'

মন্দিরা বুঝতে পারল, তার স্বামী কৈফিয়ত দেওয়ার চেষ্টা করছে। বোঝাতে চাইছে, খানিকটা বাধ্য হয়েই সে এই ছেলেকে বাড়িতে নিয়ে এসেছে। এটা কোনও কথা হল? আজকালকার দিনে কেউ জোর করে কারও ঘাড়ে একটা আস্ত মানুষ গছিয়ে দিতে পারে না। কল্যাণের মতো চালাকচতুর মানুষের এরকম একটা ভুল হয় কী করে! সন্ধের মুখে যখন অফিস থেকে ফোন করে বলল, তখনই মন্দিরার একবার মনে হয়েছিল, বারণ করি। তারপর ভাবল, থাক, ওর বাবার সেন্টিমেন্ট। তা ছাড়া বলছে, দিন কয়েকের মামলা, যা ভাল বোঝে করুক।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও মন্দিরা হাত বাড়িয়ে কল্যাণের হাত থেকে চিঠিটা নিল।

এক টুকরো লাইন টানা কাগজে কাঁপা হাতে, খুদে খুদে হরফে লেখা। কাগজটা যথেষ্ট নোংরা। জায়গায় জায়গায় কালি ধেবড়ে আছে। ভাষাতেও গোলমাল। মন্দিরার পড়তে বেশ অসুবিধেই হল।

স্নেহের কল্যাণ, তোমার সঙ্গে টেলিফোনে কথা অনুযায়ী মহাদেবকে পাঠাইলাম। আগেই বিস্তারিত সব বলেছি, আবার জানাই, মহাদেবের পিতামাতা অল্প বয়েসে মারা যাওয়ার কারণে সে তার জেঠার কাছে মানুষ। মহাদেবের জেঠা তোমার পিতার বাল্যবন্ধু ছিলেন। তিনি এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। শরীরের অবস্থা খারাপ। আর্থিক অবস্থাও ভয়ংকর। ভাইপোর খরচ চালানো আর তাঁর পক্ষে অসম্ভব। ক'টা দিন নিজের কাছে রেখে ছেলেটিকে যদি কোনও কাজকর্ম জুটিয়ে দিতে পারো তা হলে উপকার হয়। তুমি মহাদেবকে কলকাতায় পাঠাতে বলেছ শুনে উনি অনেকটাই চিন্তামুক্ত হয়েছেন। এখন দেখো যদি কোনও ব্যবস্থা হয়। ছেলেটি খারাপ নয়। এ বৎসর মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করেছে। শান্তশিষ্ট প্রকৃতির। নিজের মনে থাকতে ভালবাসে। তোমাদের কোনও অসুবিধে হবে না। আর কী? ভাল থাকো। ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। তোমার মা কেমন আছেন? ওনাকে আমার প্রণাম জানিয়ো। বউমাকে আমার আশীর্বাদ দিবে। তোমাদের দেখিতে খুব ইচ্ছা হয়। ইতি অনন্তকাকা।

চিঠি ভাঁজ করতে করতে মন্দিরা প্রথমে ঠোঁট বেঁকাল। তারপর চোখ তুলে বলল, 'ও তাই বলো। তুমিই আসতে বলেছিলে? কই এ কথাটা তো আমাকে বলোনি?'

কল্যাণ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। আমতা আমতা করে বলল, 'না, মানে ক্যাজুয়ালি বলেছিলাম। অনেক সময় হয় না, কেউ কোনও রিকোয়েস্ট করল, আর আমরা দুম করে বলে ফেললাম, ঠিক আছে, পাঠিয়ে দেবেন, দেখব। সেইরকম আর কী। ফোন করল, ব্যস্ততার মধ্যে বলে দিলাম। অনন্তকাকা যে সত্যি সত্যি পাঠিয়ে দেবে বুঝতে পারিনি। যাক, যা হওয়ার হয়ে গেছে। ক'টা দিন দেখি কী করা যায়।' কল্যাণ এক মুহূর্ত থামল। সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কিশোরের দিকে একবার আড়চোখে তাকাল। তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'একটা সময় অনন্তকাকা অনেক করে দিয়েছে। অত জমিজমা, বাবারা তো যেতে পারত না। অনন্তকাকা না দেখলে হয়তো বেহাতই হয়ে যেত। সেই জমি টমি বেচেই তো বাবা এত বড় বাড়িটা করে গেছেন। তা ছাড়া মন্দিরা, সামনের

সপ্তাহে আমি ট্যুরে যাচ্ছি। বড় অ্যাসাইনমেন্ট। একসঙ্গে তিনটে কোম্পানির কাজকর্ম ইনস্পেকশন করে ফিরব। প্লিজ, এই ক'টা দিন একটু ম্যানেজ করে নাও। ফিরে এসে ঠিক একটা ব্যবস্থা করে ফেলব।'

ট্যুরের কথা বলার সময় কল্যাণের চোখ চকচক করে। মন্দিরাও খুশি হল। কল্যাণের চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে, ছুটকো ছাটকা নয়, এবার বড় দাঁওয়ের ব্যাপার আছে। হলেই ভাল। সবাই করে নিচ্ছে, তার স্বামীটি বাদ যাবে কেন? তা ছাড়া কল্যাণ বাইরে গেলে অতীনের সঙ্গে একদিন প্রোগ্রাম করা যেতে পারে। অনেকদিন ওর সঙ্গে প্রোগ্রাম হয় না। যেবার কল্যাণ নর্থবেঙ্গল গেল, অতীন ওর কোন এক বন্ধুর খালি ফ্ল্যাটের চাবি জোগাড় করেছিল। উফ, খুব জ্বালিয়েছিল। এবার কি পারবে?

মন্দিরা নিজের খুশি চেপে রেখে বলল, 'আমি কী ম্যানেজ করব? আমাকে এসবের মধ্যে একদম জড়াবে না। পশুপতি আছে, ওকে বলে দাও।'

মন্দিরার কথায় খানিকটা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল কল্যাণ। বলল, 'আমার সব ভাবা হয়ে গেছে। এই ক'টা দিন মহাদেব একতলায় পশুপতির ঘরেই থাকবে।'

মন্দিরা মুখে হাত চাপা দিয়ে হাই তুলল। দুপুরের ঘুমটা ছেড়ে দেওয়ার পর থেকে আজকাল রাত দশটা বাজতে না বাজতেই হাই ওঠে। মাঝে মধ্যে মনে হয়, মৌ স্কুল থেকে ফেরার আগে একটু গড়িয়ে নিলে হয়। কিন্তু উপায় নেই। দুপুরে দশ মিনিটের ঘুমও একেবারে বিষের মতো। ইস, পেটের কাছটা কীরকম ভারী হয়ে আসছিল। কোনওরকমে সামলানো গেছে। বাপ রে, এই বয়েসে একবার শরীর গেলেই হয়েছে।

মন্দিরা সোফা ছেড়ে উঠতে উঠতে বলল, 'এই ছেলে, তুমি রাতে ক'টা রুটি খাও? চারটে? পাঁচটা? সেইমতো গৌরীকে বলে দিই। কথা বলছ না কেন? বলো, ক'টা রুটি খাবে?'

ছেলে মাথা নামিয়ে চুপ করে রইল।

বিরক্ত মন্দিরা এবার ধমকের সুরে বলল, 'তুমি কথা বলতে পারো না? মুখ তোলো. বলো।'

মন্দিরার ধমক শুনে শীর্ণকায় গ্রাম্য কিশোরটি চকিতে একবার মুখ তুলেই নামিয়ে নিল। তারপর বিড়বিড় করে বলল, 'বেশি খাই না। অল্প ক'টা হলেই হবে।'

মন্দিরার শরীরটা শিরশির করে উঠল। ছেলেটার চোখ দুটো অদ্ভুত তো! বড্ড বড়। টানা টানা বড় নয়, অতিরিক্ত গোল। একটুখানির জন্য মুখ তুলল, তাতেই মনে হল, মুখের অনেকটা জুড়ে কেবল চোখ। মণি দুটোও কেমন যেন। ফ্যাকাশে। মনে হল, সে দুটো যেন চোখের মাঝখানে চেপে বসে আছে! নড়াচড়া নেই। সেই স্থির মণি দিয়ে ছেলেটা এক মুহূর্তের জন্য তাকে দেখল!

মন্দিরা গায়ের হাউসকোটটা ভাল করে টেনে নিল।

কল্যাণ বুঝতে পারে মন্দিরার অসুবিধে হচ্ছে। সে উঠে পড়ল। বলল, 'অ্যাই, তুমি আমার সঙ্গে এসো তো। পশুপতির ঘরটা দেখিয়ে দিই।'

এতক্ষণ বোঝা যায়নি, এবার বোঝা গেল, এই ছেলের চটিজোড়া তার পায়ের থেকে

বড়। লম্বায় বড় নয়, চওড়ার দিকে বড়। হাঁটার সময় সে সেই চটি আঁকড়ে আঁকড়ে ধরছে। আঁকড়ানোর কারণে কেমন একটা খরখর ধরনের আওয়াজ হয়।

রাতে খেতে বসে মন্দিরা কল্যাণকে কথাটা বলল।

'ছেলেটার চোখগুলো দেখছ?'

কল্যাণ অন্যমনস্ক। সে ভেতরে ভেতরে ছটফট করছে। সেটাই স্বাভাবিক। খাওয়া শেষ হলেই সে কাগজপত্র নিয়ে বসবে। অনেক রাত পর্যন্ত তিনটে কোম্পানির ফাইল ঘেঁটে তাদের গোলমাল বের করবে। তারপর টেলিফোন করে তাদের জানাতে হবে, 'আমি আসছি। গিয়েই তোমাদের কঁ্যাক করে গলা টিপে ধরব।' ব্যস তা হলেই চলবে। এরপর ঘনঘন ফোন করবে ওরাই। দরদাম শুরু হবে। এ কাজ অফিসে বসে হয় না। রাতে বাড়িতে বসে, গোপনে করতে হয়। হাতে মাত্র ক'টা দিন। সে মন্দিরার চোখ সংক্রান্ত প্রশ্ন শুনতে পেল না।

মন্দিরা আবার বলল, 'ছেলেটার চোখগুলো খেয়াল করেছ?'

কল্যাণ জল খেল। বলল, 'কার চোখ?'

'ছেলেটার চোখ। ইস কী বিচ্ছিরি! বেশিক্ষণ তাকানো যায় না। মনে হয়, সব দেখে ফেলছে!'

কল্যাণ টেবিল ছেড়ে উঠতে উঠতে হাসল। বলল, 'ছেলেটার চোখ দেখব কেন সোনা? দেখলে তোমার চোখ দেখব। তা ছাড়া ওর চোখ তোমাকেই বা দেখতে হবে কেন? নীচে থাকবে, ওর সঙ্গে দেখাই হবে না তোমার।'

মন্দিরা খানিকটা নিজের মনে বলল, 'সে জানি না। আমার বিচ্ছিরি লাগল তাই বললাম। মানুষের আবার অত বড় চোখ হয় নাকি? তাকানোটা বিচ্ছিরি। গা ঘিনঘিন করে।'

কল্যাণ হেসে বলল, 'আমাদের স্কুলে একটা ছেলে ছিল। তার কানগুলো ছিল বেশি বড়। বেচারি সবসময় কানঢাকা টুপি পরে থাকত। গরমেও পরত। সবাই খুব খেপাতাম। মহাদেবকে না হয় বলব, তুমি বাবা এই বাড়িতে যতদিন থাকবে, ততদিন একটা সানগ্লাস পরে থেকো। তোমার পুরনো সানগ্লাস আছে?'

মন্দিরা বিরক্ত গলায় বলল, 'সবকিছু নিয়ে রসিকতা কোরো না। ভেবেছিলাম, মৌকে আজ তিনতলায় ওর ঠাকুমার কাছে শুতে পাঠাব না। ও রাজি হল না। বলল, ঠাম্মার কাছেই শোব। একটা বাজে হ্যাবিট হয়েছে। আমার ভয় করছিল।'

খাওয়ার টেবিলের পাশেই মুখ ধোওয়ার ছোট্ট বেসিন। ডাইনিং টেবিলের সঙ্গে ম্যাচ করিয়ে সেটার রংও গোলাপি। হালকা গোলাপি। কল্যাণ সেখানে মুখ ধুতে ধুতে দেয়ালের একফালি আয়না দিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকাল। বলল, 'ভয় করছে! দূর, ও একটা বোকা, গেঁয়ো ভূত। মুখ তুলে তাকাতেই পারে না। ওকে আবার ভয় কী? দেখলে না নিজেই কেমন সিঁটিয়ে আছে? তুমি একদম চিন্তা কোরো না। পশুপতিকে বলে দিয়েছি, আমি যতদিন বাইরে থাকব, ততদিন গাধাটাকে যেন চোখে চোখে রাখে, ওপরে আসতে না দেয়। ফিরে এসে একটা ব্যবস্থা করে ফেলব। দেখি কাজকর্ম জোটাতে পারলে ভাল, নইলে ফেরত। আসলে কী জানো, অনন্তকাকা বলেছে যখন, চেষ্টা একটা করতে হবে। প্লিজ মন্দিরা, এটা নিয়ে তুমি আর আমাকে বিরক্ত কোরো না।'

মন্দিরা উঠতে উঠতে বলল, 'আমি কিন্তু ওকে বেশিদিন এ বাড়িতে অ্যালাউ করছি না। সেটা তোমাকে আগে থেকেই বলে রাখলাম। তোমার সেন্টিমেন্ট নিয়ে তুমি থাকো। মনে রাখবে বাড়িতে একটা ছোট মেয়ে আছে।'

মন্দিরা ঘরে শুতে চলে গেলে, কল্যাণ ফাইল ঘুলে বসল। দোতলার এই বসবার জায়গাটা ছোট। তবে মন্দিরা মন দিয়ে সাজিয়েছে। নিচু নিচু বেতের চেয়ার। বেতের টেবিল। পাশে লম্বা আলোর স্ট্যান্ড। সেটাও বেতের। জ্বালালে একটা আলোছায়া ভাব হয়। দেয়ালে বেতের ফ্রেমে সারি সারি রাজস্থানি পেন্টিং। রাধা-কৃষ্ণের অনেকরকম মুড। ঘর সাজানোর সময় কল্যাণ বলেছিল, 'বাড়াবাড়ি কোরো না। লোকে কিন্তু সন্দেহ করবে। বলবে, ঘর সাজানোর মতো এত টাকা কোথা থেকে পেল?' মন্দিরা বলেছে, 'ছাড়ো তো তোমার সন্দেহ। রাজ্যের লোক কত কী করে নিল! তা ছাড়া দোতলায় তো আর যাকে তাকে তুলছি না।'

বেতের আলো জ্বেলে কল্যাণ কাজে মন দিল। তিনটে ফাইলের মধ্যে দুটো দেখা শেষ করে ঘড়ি দেখল সে। রাত বেশি হয়নি। কাজ ভাল এগিয়েছে। তিনটেরই হিসেবে অনেক গোঁজামিল। হিসেবে প্রচুর জল। এটা খুব ভাল। ভুল যত বেশি, কাজ তত সহজ। সিগারেট ধরিয়ে কল্যাণ তিন নম্বর ফাইলটা কাছে টানল। আর তখনই আওয়াজটা শুনতে পেল! চাপা, খরখর ধরনের আওয়াজ। কেউ কি হাঁটছে?

সামান্য চমকে পিছনে ফিরল কল্যাণ। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে তাকাল। এ বাড়ির দোতলা আর তিনতলার সিঁড়ির মুখে বড় বড় দরজা। দরজার বেশিটা জুড়ে কাচ। কাচের গায়ে বাহারি গ্রিল। ফুল পাতা আঁকা গ্রিল। দিনেরবেলা দরজা খোলা থাকে। রাতে ভেতর থেকে লক করা হয়।

আবার আওয়াজটা হল। খর্ খর্ খর্...।

কল্যাণ হাতের কাগজপত্র টেবিলের ওপর রেখে উঠে দাঁড়াল। সে কি ভুল শুনছে? মনে হচ্ছে, কেউ পা টেনে টেনে হাঁটছে! হেঁটে সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে আসছে! কে আসছে? পশুপতি। এক পা এগোতেই কল্যাণ বুঝতে পারল, না পশুপতি নয়। এ আওয়াজ তার পায়ের নয়। তবে? ছেলেটা নয় তো? কী যেন নাম? সহদেব না জয়দেব? নামটা মনে পড়ছে না। এত রাতে ওই ছেলেটা অচেনা বাড়ির মধ্যে হাঁটবে কেন? আর অন্ধকারে হাঁটবেই বা কী করে? চেয়ার ছেড়ে উঠে কল্যাণ ঘরের বড় আলোটা জ্বালিয়ে দিল। তারপর এগিয়ে গিয়ে কাচের দরজা খুলল। সিঁড়ির মুখের আলোটা জ্বালাল। না, কেউ নেই। ঝুঁকে দেখল। একতলার ল্যান্ডিং অন্ধকার। আওয়াজটাও থেমে গেছে। তা হলে ভুলই শুনেছে। দরজা আটকে ফিরে আসতে আসতে নিজের মনেই সামান্য হাসল কল্যাণ। আজ সারাটা দিনে অনেক পরিশ্রম গেছে। বেশি পরিশ্রমের পর মানুষ অনেকসময় ভুল শোনে। তার ওপর মন্দিরাটা মাথার মধ্যে হাবিজাবি জিনিস ঢুকিয়ে দিয়েছে। না, আজ আর কাজ হবে না।

কল্যাণ কাগজপত্র গুছিয়ে নিল।

দুই

'বউদি, একটা কথা বলব?'

পশুপতি দাঁড়িয়ে আছে রান্নাঘরের দরজায়। মৌ-কে স্কুলবাসে তুলে দিয়ে সে বাজার করে ফিরেছে। গৌরী এলে মন্দিরা তাকে রান্না বুঝিয়ে দেবে। তার আগে সে দ্রুত হাতে কল্যাণের ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে। গৌরী সারাদিনের রান্নাবান্না করলেও কল্যাণের ব্রেকফাস্ট মন্দিরা নিজেই বানায়। সে স্যান্ডুইচের শশা কাটতে কাটতে বলল, 'বলো, বলো কী বলবে?'

পশুপতি মাথা তুলে বলল, 'বউদি, ওই ছেলের সঙ্গে আমি থাকব না।'

পশুপতি এই তিনতলা বাড়ির একই সঙ্গে পাহারাদার, কেয়ারটেকার, মালি এবং ম্যানেজার। মাঝারি বয়সের গম্ভীর ধরনের মানুষ। এ বাড়িতে আছে অনেক বছর হয়ে গেল। একতলায় গ্যারেজের পেছনে তার জন্য একটা আলাদা ঘর তুলে দিয়েছে কল্যাণ। অ্যাসবেসটসের চাল। গত বছর যখন নতুন টিভিটা কেনা হল, তখন দোতলার ছোট সেটটা তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজকর্ম শেষ হলে পশুপতি ঘরের দরজা আটকে টিভি দেখে। অনেক রাত পর্যন্ত সেই টিভির আওয়াজ পাওয়া যায়।

মন্দিরা অবাক হয়ে মুখ তুলল। সে পশুপতির কথাটা বুঝতে পারছে না। বলল, 'কোন ছেলের কথা বলছ পশুপতি! কার সঙ্গে থাকবে না?'

'ওই যে দাদাবাবু সেদিন যে ছেলেটাকে নিয়ে এল। ওর সঙ্গে থাকব না বউদি।'

এতক্ষণে মন্দিরার মহাদেবের কথা মনে পড়েছে। ওহ্, সেই বড় বড় চোখের ছেলেটা। মন্দিরা মনে মনে হাসল। তাই তো, দু'দিন ধরে ছেলেটা যে এ বাড়িতে আছে সে কথা যেন মনেই নেই! মন্দিরা কেন, কল্যাণও আর প্রসঙ্গটা তোলেনি। কোনও সাড়াশব্দও পাওয়া যায় না। সারাদিন মনে হয় পশুপতির ঘরেই বসে থাকে। যাতায়াতের পথেও চোখে পড়ে না। কিংবা কে জানে হয়তো পড়েছে, খেয়াল হয়নি।

মন্দিরা পশুপতির দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেন, থাকবে না কেন? দু'দিন তো থাকলে।'

'হ্যাঁ, থেকেছি, আর থাকব না। আপনি দাদাবাবুকে বলুন।'

মন্দিরার মজা লাগল। পশুপতিও নিশ্চয় তার মতো মহাদেবের গোল চোখ আর উঁচু কাঁধ দেখে ভয় পেয়েছে। ট্রে-তে স্যান্ডুইচের প্লেট, চায়ের কাপ-ডিশ সাজাতে সাজাতে বলল, 'ছেলেটাকে দেখতে কেমন যেন। কোনও গোলমাল করেছে নাকি?'

'না, ওসব নয়। অন্য ব্যাপার।'

মন্দিরা থমকে দাঁড়িয়ে বলল, 'ব্যাপার! কী ব্যাপার?'

পশুপতি গলা নামিয়ে বলল, 'মহাদেব রাতে ঘুমোয় না।'

'ঘুমোয় না!'

পশুপতি ফিসফিস করে বলল, 'না, ঘুমোয় না। প্রথমদিন ভেবেছিলাম, নতুন জায়গায় বলে ঘুম হচ্ছে না। সেদিন কিছু বলিনি। কিন্তু পরে বুঝতে পারলাম, ঘটনা অত সহজ নয়। এই ছেলে শুধু জেগে থাকে না, সারারাত তক্তপোশের ওপর বসে থাকে। বসে বড় বড় চোখ দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে।'

মন্দিরা ভুরু কুঁচকে বলল, 'দেখে! কী দেখে? অন্ধকারে কী দেখবে পশুপতি?'

'সে জানি না বউদি। কাল রাতে ঘুমের মধ্যেই আমার কেমন একটা অসুবিধে হল। শরীরের অসুবিধে। অম্বল হলে যেমন হয়, অনেকটা সেরকম। গলা জ্বালা, বুকে একটা চাপ মতো। ঘুম ভেঙে গেল। জল খাব বলে উঠে পড়লাম। উঠে দেখি, ও মা, এ ছেলে আজও কাঁধ উঁচু করে বসে আছে! চোখ এতখানি করে তাকিয়ে আছে। অন্ধকারে সে দুটো যেন আরও বড় লাগে! আমি কেমন জানি ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু ঘাবড়ালে তো চলবে না। তখন ধমক দিয়ে বললাম, অ্যাই, বসে আছিস কেন? ঘুমা। সে বলল, ঘুম আসে না। আমি বললাম, ঘুম আসে না তো বসে থাকবি? চোখ বন্ধ করে, ঘাপটি মেরে শুয়ে থাক। জল খাবি? সে বলল, না, খাব না। তারপর দলা পাকিয়ে তক্তপোশের কোণে শুয়ে গেল। আমিও শুলাম। কিন্তু ঘুম আসতে চায় না। খানিক পরে বউদি, কেমন একটা সন্দেহ হয়। মনে হল, গায়ের কাছে কী যেন নড়ে! পাশ ফিরে দেখি, ছেলে ফের উঠে বসেছে। চোখ টান টান করে তাকিয়ে রয়েছে। সেগুলো অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে, আর...।'

মন্দিরা জিজ্ঞেস করে, 'আর! আর কী?'

পশুপতি বিড়বিড় করে বলে, 'আর ঘাড় নাড়ে বউদি। একবার এদিক, একবার ওদিক। বউদি, আমি ওর সঙ্গে শোব না। আপনি আজই দাদাবাবুকে জানিয়ে দেন।'

চা ঢালতে ঢালতে মন্দিরা সংক্ষেপে কল্যাণকে পশুপতির ঘটনা বলল। এমনকী ঘাড় নাড়ার ঘটনাটাও।

কল্যাণ বিরক্ত গলায় বলল, 'কী হল আবার? বেশ তো চলছিল। আসলে পশুপতি গল্প বানাচ্ছে। ওর অন্য জায়গায় লেগেছে। পশুপতি আজকাল রাতে ঘরে বসে একটু-আধটু খায়টায়। আমি একদিন ওর ঘরে মদের গন্ধ পেয়েছি। পুরনো লোক, কিছু বলি না। সারাদিন খাটাখাটনি করে।'

মন্দিরা চোখ বড় করে বলল, 'ও মা, সে আবার কী! বাড়ির মধ্যে বসে নেশাভাং করবে কী গো?'

কল্যাণ হাত নাড়িয়ে বলল, 'সে আর কী বলব বলো। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে দরজা বন্ধ করে খাচ্ছে। এসব লোককে ছোটখাটো কারণে কিছু বলতে নেই। আফটার অল বিশ্বাসী। ছেড়ে চলে গেলে মুশকিল। এত বড় বাড়ি কে সামলাবে বলো? তা ছাড়া, অসুবিধে তো কিছু করছে না। তবে এবার ওর নিজেরই অসুবিধে হয়ে গেছে। ঘরের মধ্যে আর একটা মানুষ এসে গেছে। এখন তাকে তাড়াবার জন্য আজগুবি গল্প ফেঁদেছে। তুমি ওসব একদম কানে নেবে না।'

মন্দিরা অবাক হয়ে বলল, 'আমি কিছুই জানতাম না।'

কল্যাণ চায়ের কাপে লম্বা চুমুক দিল। বলল, 'ফালতু জিনিস তুমি জেনে কী করবে? আর তা ছাড়া তোমাকে বললাম না, ক'টা দিন একদম বিরক্ত কোরো না। এবারের মাছগুলো বড়। আমিও জমিয়ে ছিপ ফেলেছি।' কথা শেষ করে কল্যাণ চওড়া করে হাসল।

মন্দিরা খানিকটা নিশ্চিন্ত হল। বলল, 'তোমার মায়ের চোখের ছানিটা এবার সমস্যা করছে। সকালে বলছিলেন।'

কল্যাণ মুখ তুলে বলল, 'শুয়ে আছে নাকি?'

'না, শুয়ে নেই। ঠাকুরঘরে আছেন। বাইরে যাওয়ার আগে একবার ডা. নন্দীকে দেখিয়ে দিয়ো।'

'এখন হবে না, ফিরে এসে অপারেশনের ব্যবস্থা করব। তুমি বরং আজ থেকে মৌকে নীচে এনে শুইয়ো।'

মন্দিরা বলল, 'নাতনি তো ঠাকুমা ছাড়া রাতে ঘুমোতেই চায় না। অসুবিধে নেই, গৌরীকে রাতে ক'টা দিন এসে থাকতে বলেছি। ও রাজি হয়েছে। কিছু হলে ডাকবে। তবে তুমিও বড্ড বাড়াবাড়ি করছ, যেভাবে রাত জেগে কাজ শুরু করেছ।'

কল্যাণ হেসে বলল, 'ডার্লিং, কিছু কাজ রাতেই করতে হয়। অন্ধকারে। যখন কেউ দেখতে পাবে না সেই সময়। হা, হা। আমি বরং চট করে একবার ওপর থেকে মাকে দেখে আসি।'

কল্যাণ ওপরে যেতেই মন্দিরা উঠতে উঠতে দ্রুত হাতে মোবাইলের নম্বর টিপল। অতীন কি কোনও ব্যবস্থা করতে পেরেছে? না পারলে বলছে, এখানেই আসবে। কল্যাণ যেদিন রওনা দেবে সেদিন সন্ধেতেই আসতে চায়। সেটা কি ঠিক হবে? বাড়িতে এত লোক থাকবে।

মন্দিরা অতীনকে ধরতে পারল না। তার নম্বর ব্যস্ত।

খানিক পরে কল্যাণ যখন তিনতলা থেকে নেমে এল তখন তার মুখ গম্ভীর। মন্দিরা বলল, 'কী হল? মায়ের সমস্যা বেড়েছে নাকি?'

'না, বাড়েনি। বুঝলে মন্দিরা, ভাবছি, একতলায় সিঁড়ির মুখে একটা কোলাপসেবল বসিয়ে দেব।'

মন্দিরা অবাক হয়ে বলল, 'কেন?'

কল্যাণ বলল, 'না কিছু নয়। দুমদাম কেউ ওপরে উঠে আসতে না পারে। একটা প্রিকশান বলতে পারো। আজকাল যা সব হচ্ছে। পশুপতি বাইরে গেলে তো নীচটা ফাঁকাই পড়ে থাকে।'

মন্দিরা বিরক্ত মুখে বলল, 'তোমাকে তো আগেই বলেছিলাম। ভাল, তাও আজ হঠাৎ মনে হল।'

কল্যাণ চুপ করে থাকে। কেননা, জিনিসটা তার হঠাৎ মনে হয়নি। খানিক আগেই তার বাহাত্তর বছরের বৃদ্ধা মা তাকে জানিয়েছেন, ক'দিন ধরে রাতে তিনি নাকি কেমন একটা আওয়াজ শুনছেন। অদ্ভুত আওয়াজ! মনে হয়েছে, বাগানে কে যেন হাত পায়ের নখ দিয়ে গাছ আঁচড়ায়!

আওয়াজ হয়, খর্ খর্...।

তিন

'অন্ধকারে কী করছ মৌ?'

'খেলা করছি মা।'

'কী বোকার মতো কথা বলছ। তুমি ওপরে ঠাকুমার কাছে যাও। নয়তো ড্রইংরুমে গিয়ে খেলো। অন্ধকারে কখনও খেলা করা যায়?'

'কেন যাবে না?'

মন্দিরা বিরক্ত হল। কী সব শিখছে মেয়েটা? ধমকের ভঙ্গিতে বলল, 'আবার বোকার মতো কথা। অন্ধকারে কি কিছু দেখা যায়? কেউ দেখতে পায়?'

'কেন পারবে না? মহাদেবদা তো পায়।'

মন্দিরা অবাক হয়ে বলল, 'কে পায়?'

মৌ শান্ত ভঙ্গিতে বলল, 'মহাদেবদা পায়। অন্ধকারে দেখতে পায়। আমাকে বলেছে, মৌ তুমিও চেষ্টা করো। চেষ্টা করলে, তুমিও দেখতে পাবে। আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব। একবার শিখে গেলে দেখবে, আর অসুবিধে হচ্ছে না, অন্ধকারের সব দেখতে পাচ্ছ। তাই আমি চেষ্টা করছি মা।'

বিকেল থেকে আজ মন্দিরার কপালের মাঝখানটা টিপটিপ করছিল। এটা পুরনো অসুখ। অন্ধকারে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলে এই ব্যথা সেরে যায়। সেই কারণেই খানিক আগে মন্দিরা ঘর অন্ধকার করে শুয়ে আছে। শুধু কপালে ব্যথা নয়, এই মুহূর্তে মন্দিরার মেজাজও ভাল নেই। আজ সে সারাদিন অনেক কাজ নিয়ে বেরিয়েছিল, একটা কাজও ঠিকমতো হল না। দুপুরে গিয়েছিল বালিগঞ্জে বাবার ওখানে। অঞ্জুও এসেছিল। বাবা চেয়েছিল, বারাসাতের জমিটা নিয়ে একটা কিছু ফাইনাল হয়ে যাক। সেই কারণেই যাওয়া। কল্যাণের ইচ্ছে, জমিটা অঞ্জু তার দিদিকে ছেড়ে দিক। কল্যাণ ওখানে ফ্ল্যাটের ব্যাবসা করবে। ব্যাবসা নিজে করতে পারবে না, সামনে অন্য লোক থাকবে। যাকে বলে ফ্রন্টম্যান। মন্দিরা আজ বাবার সামনে এই কথাটাই পেড়েছিল। অঞ্জু চেঁচামেচি শুরু করল। বলল, 'এটা কেমন কথা দিদি? জামাইবাবু আমার অংশটুকু সস্তায় কিনে নিয়ে একগাদা লাভ করবে? আমার বর কী অপরাধ করল? ইচ্ছে করলে সেও তো ফ্ল্যাটের ব্যাবসা করতে পারে। পারে না? জমি তো আমাদের দু'জনেরই। তুই কি তোর বোনকেও ঠকাতে চাস?'

সেই ঝগড়া গড়াল অনেকক্ষণ। সেখান থেকে মন্দিরা গেল গড়িয়াহাট। মৌ-এর একটা ফ্রক পালটানোর ছিল। সেখানে আবার একচোট ঝগড়া। অত বড় দোকান, অথচ কী খারাপ ব্যবহারই না করল। এর মাঝখানে আবার অতীন মোবাইলে ধরে জানাল, এবার কারও ফ্ল্যাট ট্যাট পাওয়া যায়নি। সুতরাং কল্যাণ চলে গেলে সে এ বাড়িতেই আসবে। এটাও একটা টেনশনের ব্যাপার। অতীন যতই বলুক, রিস্ক একটা থেকেই যায়। মেয়েটার জন্যও খচখচ করছে। এদিকে আবার অতীনকে না বলতেও ইচ্ছে করছে না। অতীনের জন্য এখনও মাঝেমধ্যে বোঝা যায়, শরীরটা ঠিক আছে। সুন্দর আছে।

মৌ হাসি হাসি গলায় বলল, 'মা, দু'দিন ধরে চেষ্টা করছি। মহাদেবদা বলেছে, আরও কয়েকটা দিন চেষ্টা করলেই হবে।'

মেয়ের কথা শুনে মন্দিরা উঠে বসল। দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরের আলো এসে মৌ-এর মুখে পড়েছে। হালকা নীল আলোয় ছ'বছরের মেয়েটাকে ভারী সুন্দর লাগছে। এই মেয়েকে তার বাবার মতো দেখতে হয়েছে। মেয়ের সেই মুখের দিকে তাকিয়ে থমথমে গলায় মন্দিরা বলল, 'কী বললে মৌ? কী হবে?'

'ওমা! শুনলে না? ওই যে বললাম, মহাদেবদার মতো অন্ধকারে দেখতে পারব।'

মন্দিরা কড়া গলায় বলল, 'কী যা তা বলছ মৌ? কে তোমায় বলল মহাদেবদা অন্ধকারে দেখতে পায়?'

মৌ অভিমানে ঠোঁট উলটে বলল, 'কে আবার বলবে? ওই তো একদিন অন্ধকারে বাগান থেকে আমার বল কুড়িয়ে এনে ওপরে দিয়ে গেল। বিশ্বাস না হলে গৌরী মাসিকে জিজ্ঞেস করো। গৌরী মাসি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ধমক দিয়ে বলল, 'অ্যাই ছেলে, তুই ওপরে এসেছিস কেন? যা নীচে যা। খবরদার ওপরে আসবি না।' মৌ ঝুঁকে পড়ে তার মায়ের গায়ে হাত দিল। বলল, 'জানো তো মা, মহাদেবদা খুব মজার। এই বড় বড় চোখ। আর খালি ঘাড় ঘোরায় এপাশে ওপাশে। এপাশে ওপাশে। হি হি।'

মন্দিরা বিস্ফারিত চোখে তার মেয়ের দিকে তাকিয়ে দেখল, আবছা অন্ধকারে মৌ তার ঘাড় নাড়াচ্ছে! একবার এপাশে, একবার ওপাশে। নাড়াচ্ছে আর হাসছে!

মন্দিরা বিড়বিড় করে বলল, 'স্টপ ইট মৌ। স্টপ ইট।' তারপর বালিশের তলা থেকে হাতড়ে মোবাইলটা টেনে কল্যাণের নম্বর টিপল।

চার

কল্যাণ সোফায় হেলান দিয়ে শান্ত গলায় বলল, 'নাও বোসো, ওই চেয়ারটায় বোসো। তুমি বিকেলে কিছু খেয়েছ মহাদেব?'

মহাদেব বসল না। দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থাতেই বলল, 'হ্যাঁ, খেয়েছি।'

'কী খেয়েছ? বসে বসে কথা বলো। কী খেয়েছ?'

মহাদেব এবারও বসল না। বলল, 'পশুপতিদা বাটি করে মুড়ি দিয়েছিল। মুড়ি খেয়েছি।'

ছেলেটার গলা ফ্যাসফেসে। এই বয়েসে ছেলেদের গলা ফ্যাসফেসে, ভাঙা ভাঙাই হয়।

'আর কী খেয়েছ? বোসো না মহাদেব, লজ্জা কীসের? আমি তো বলছি।'

'আর চা খেয়েছি।'

বারবার বলা সত্ত্বেও ছেলেটা বসছে না। এটা একটা বিরক্তির বিষয়। কল্যাণ নিজেকে সামলাল। তাকে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। মন্দিরার টেলিফোন শোনার পর থেকেই সে ঠিক করেছে, সে মাথা ঠান্ডা রাখবে। একটা ছ'বছরের মেয়ের কথা শুনে মন্দিরা মাথা গরম করে লাফাতে পারে, সে পারে না। কাল বিকেলে সে ট্যুরে বেরিয়ে যাচ্ছে। এখনই সে এই

সমস্যাটার মোটামুটি একটা সমাধান করে ফেলতে চায়। পাকা সমাধান করতে আর একটু সময় লাগবে। একটা পার্টির সঙ্গে কথা হয়েছে। ওদের অফিসে পিয়ন দরকার। প্রথমদিকে মাইনেপত্র কম। তবে অফিসে থাকতে দেবে। কল্যাণ ট্যুর থেকে ফিরে এলে কাজটা ফাইনাল হয়ে যাবে মনে হচ্ছে। এই ক'টা দিন বাড়ির লোকদের একটু সামলে সুমলে রাখতে হবে। তবে ছেলেটাও গোলমাল পাকিয়েছে। রাতে জেগে থাকাটা না হয় ছেড়ে দেওয়া যায়, কিন্তু অন্ধকারে দেখতে পাওয়ার গল্পটা? হয়তো ছোট মেয়েকে মজা করেই বলেছে, কিন্তু এ ধরনের গ্রাম্য মজা শহরে চলে না। মন্দিরার রেগে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

একতলার ঘরে মহাদেবকে ডেকে নিয়েছে কল্যাণ। মন্দিরাকেও আসতে বলেছিল। সে রেগে বলেছে, 'আদিখ্যেতা করছ? আমি কেন যাব? হয়, ওকে এই মুহূর্তে ঘাড় ধরে বের করে দাও, নয়তো কড়াভাবে বলে দাও যে ক'টা দিন এখানে থাকবে যেন স্বাভাবিক আচরণ করে। আমার মেয়েকে বলে কিনা অন্ধকারে দেখতে শেখাবে! এত সাহস সে পেল কোথা থেকে?'

কল্যাণ ঠান্ডা গলায় বলল, 'তুমি মাধ্যমিকে কোন ডিভিশনে পাশ করেছ মহাদেব?'

'সেকেন্ড ডিভিশন।'

'সেকেন্ড ডিভিশনে! বাঃ। ভেরি গুড। শোনো মহাদেব, এর মধ্যেই তোমার জন্য একটা কাজের কথা বলেছি। ক'টা দিনের জন্য আমি বাইরে যাচ্ছি। ফিরে এসে কাজটা ঠিক করে ফেলব। বেশি ছোটাছুটির ব্যাপার নেই। অফিসে পিয়নের কাজ। পারবে তো?'

মহাদেব এবার মুখ তুলল। হ্যাঁ, কথাটা ঠিকই। চোখ দুটো বড্ড বড়। ভুরু ঘন। মণিগুলোও কেমন যেন। ওগুলো নড়ছে কি? নাকি স্থির?

মণি নড়া দেখা হল না। তার আগেই মহাদেব মাথা নামিয়ে দিল এবং ঘাড় কাত করে বলল, 'হ্যাঁ, পারব।' তারপর কয়েক পা এগিয়ে এসে চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়াল। কল্যাণ একটু থামল। দেশের ছেলে বলে দরদ কি একটু বেশি দেখানো হয়ে যাচ্ছে? কথা কি আরও কঠিনভাবে বলা উচিত? মনে হচ্ছে তাই উচিত। এবার খানিকটা গম্ভীর করে কল্যাণ বলল, 'মহাদেব, রাতে তোমার ঘুমের অসুবিধে হয়?'

মহাদেব এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'রাতে আমি ঘুমোই না।'

'ঘুমোও না!' কল্যাণ চমকে উঠেও নিজেকে সামলাল। বলল, 'ঘুমোও না, তো কী করো?'

মহাদেব বিড়বিড় করে বলল, 'কিছু করি না। এমনি, ঘুমোই না।'

ইনসমনিয়া? অনিদ্রা? তাই হবে। এর চিকিৎসার ভার তাকে দেওয়া হয়নি। বরং ভালই হল, যার সঙ্গে কথা হয়েছে, তাকে বলে দেওয়া যাবে, এই ছেলে পিয়নের সঙ্গে রাতে পাহারাদারের কাজও করতে পারবে। কল্যাণ গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। ঘুম না হতে চাইলে জোর করে ঘুমোতে হবে না। তবে এ বাড়িতে যতদিন থাকবে খেয়াল রাখবে, তুমি রাতে না ঘুমোলেও অন্যরা রাতে ঘুমোয়। তাদের যেন অসুবিধে না হয়। এটা পাড়া গাঁ নয়, যে ঘুম হল না বলে মাঝ রাতে মাঠে গিয়ে খানিকটা হাওয়া খেয়ে এলে। এখানে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকবে।'

মহাদেব ঘাড় নাড়ল। কল্যাণ খুশি হল। ছেলেটা মনে হচ্ছে, বুঝছে।

কল্যাণ ভুরু কুঁচকে বলল, 'তুমি রাতে হাঁটাচলা করো নাকি? স্লিপ ওয়াকিং?'

মহাদেব মুখ তুলল। মনে হয়, প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারল না। না, এ ছেলের চোখ দুটো সত্যি সত্যি অস্বস্তিকর। কে জানে, সেই কারণেই হয়তো বেশিরভাগ সময় মাথা নামিয়ে থাকে। মানুষের যে কতরকম কিছু হয়! কল্যাণ উঠে পড়ল। তাড়াতাড়ি ডিনার সেরে ফাইলগুলো নিয়ে বসতে হবে। আজ শুধু বসা নয়। পার্টিগুলোকে এক-এক করে টেলিফোনে ধরতে হবে। কথা চলছে। ফাইনাল দরদাম হবে আজ রাতেই। এই ছেলের পিছনে আর সময় নষ্ট নয়। যা বলবার বলে দেওয়া হয়েছে। বেশ কঠিনভাবেই বলা হয়েছে। বাকি রইল শুধু একটাই। সে কথা আরও কড়াভাবে বলবার জন্য কল্যাণ মনে মনে প্রস্তুত হল।

'মহাদেব, আজ তুমি একটা খুব বড় অন্যায় করেছ। আমার মেয়েকে মিথ্যে কথা বলেছ। তুমি কি সেটা জানো?'

মহাদেব চুপ করে রইল।

'শুনলাম, তাকে বলেছ, তুমি নাকি অন্ধকারে দেখতে পাও। শুধু দেখতে পাও না, তুমি নাকি তাকে অন্ধকারে কী করে দেখতে হবে তার কায়দা শিখিয়েও দেবে। বলেছ তুমি?'

মাথা নামানো অবস্থায় একদিকে ঘাড় নাড়ল মহাদেব।

কল্যাণ ধমকের ভঙ্গিতে চোখ কুঁচকে বলল, 'ছি, ছি। একটা ছোট মেয়েকে এমন একটা আজগুবি কথা কী করে বললে? তুমি নাকি অন্ধকার বাগান থেকে তার বল কুড়িয়ে দিয়েছ? মৌ তার মাকে বলেছে।'

'আমি অন্ধকারে দেখতে পাই।'

কল্যাণ থমকে গেল। চোখ দেখতে না পেলেও সে মহাদেবের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখতে পাও মানে!'

'আমি অন্ধকারে দেখতে পাই। অন্ধকারও দেখতে পাই।'

ছেলেটা বলছে কী! মাথা খারাপ নাকি? কই এরকম কিছু তো অনন্তকাকা বলেনি। কল্যাণ কষ্ট করে হাসল। সেই হাসিতে একটা ঘাবড়ে যাওয়া ভাব আছে। গলা নামিয়ে বলল, 'সে আমরা সকলেই অল্পবিস্তর দেখতে পাই। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে অন্ধকারে চোখসওয়া হয়ে যায়। আর অন্ধকারে দেখতে পাওয়াটা আবার কী ব্যাপার? তুমি যখন বাগানে মৌ-এর বল খুঁজছিলে তখন নিশ্চয় বিকেলের সামান্য আলো ছিল। সেই আলোতেই তুমি জিনিসটা দেখতে পেয়েছিলে। এই কথাটা তুমি তাকে বলোনি। গোপন করে গিয়েছিলে। সে বেচারি ভাবল, সত্যি সত্যি তুমি অন্ধকারেই বল দেখতে পেয়েছ। কাল মৌ-এর সঙ্গে দেখা হলে, ওকে বলবে, তুমি মোটেই অন্ধকারে দেখতে পাও না। সেও যেন এই খেলাটা আর না খেলে। কেমন?'

সামনের মানুষ একটু যেন নড়ল না। বিড়বিড় করে আবার বলল, 'আমি অন্ধকারে দেখতে পাই।'

এবার কল্যাণের রাগ হচ্ছে। আচ্ছা ঠেঁটা ছেলে তো। সে খুব জোরে একটা ধমক দিতে

গিয়ে নিজেকে সামলাল। বলল, 'আবার একই কথা বলছ? তুমি না লেখাপড়া শিখেছ! লেখাপড়া শিখে এমন বোকার মতো কথা কেউ বলে? না তোমাকে দেখছি কাজকর্ম দেওয়া মুশকিল আছে। ভাববে একটা পাগলকে পাঠিয়েছি। এসব আর যেন না শুনি। বুঝতে পারলে? যাও এখন।'

মহাদেব মাথা নাড়ল। ধীর পায়ে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

সেদিকে তাকিয়ে কল্যাণের মনে হল, ছেলেটাকে এত সহজে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। একে আরও একটু শিক্ষা দেওয়া উচিত। সে গলা তুলে বলল, 'অ্যাই, দাঁড়াও তো। দেখি তুমি কেমন অন্ধকারে দেখতে পাও। তুমি নিজেই জেনে যাও, তুমি যেটা বলছ সেটা একটা আজগুবি, মিথ্যে কথা।'

মহাদেব দাঁড়িয়ে পড়ে।

ক্রুদ্ধ কল্যাণ এগিয়ে গিয়ে দ্রুত হাতে ঘরের জানলা দরজাগুলো বন্ধ করে। দেয়ালের কাছে গিয়ে একের পর এক সুইচ টিপে ঘরের সব আলোগুলোও নিভিয়ে দেয় কয়েক মিনিটের মধ্যে। ঘর অন্ধকার। সেই অন্ধকারেই কল্যাণ সরে আসে ঘরের কোণে। আরও অন্ধকারে। আসতে গিয়ে টেবিলে অল্প ধাক্কা খায়। এবার ডান হাতটা তুলে চ্যালেঞ্জের সুরে বলে, 'নাও এবার বলো, ক'টা আঙুল? বলো, বলে ফেলো। দেখি কেমন অন্ধকারে দেখতে পাও তুমি।' কল্যাণের গলা চড়া এবং উত্তেজিত।

কল্যাণের এই আচরণে মহাদেব কতটা অবাক হয়েছে বোঝা গেল না। কারণ, অন্ধকারে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাকে অস্পষ্ট একটা শরীরের মতো লাগছে। সেই শরীর চুপ করে আছে।

কল্যাণ শব্দ করে হাসল। বলল, 'কী হল? পারলে না তো? এটাই স্বাভাবিক। অন্ধকারে দেখা যায় না মহাদেব। কাল সকালেই তুমি মৌ-এর ভুল ভাঙাবে। আচ্ছা নাও, আর একটা চান্স দিচ্ছি। নাও, এবার বলো। বলো, ক'টা আঙুল?' মজার খেলার মতো করে কল্যাণ এবার তার তিনটে আঙুল মেলে ধরল অন্ধকারে।

নিমেষে সামনের থেকে ফ্যাসফেসে গলায় উত্তর এল— 'তিন, তিনটে।'

কল্যাণ অবাক হল। ঘর এতই অন্ধকার যে সে নিজেই নিজের হাত ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না। ছেলেটা নিশ্চয় আন্দাজে মিলিয়ে দিল। আর একটু পিছনে সরে গেল কল্যাণ। দেয়ালে প্রায় পিঠ ঠেকে গেছে তার। বলল, 'এবার বলো।'

'দুটো।'

কল্যাণ চমকে উঠল। আশ্চর্য! ছেলেটা বলছে কী করে! সত্যি সত্যি দেখতে পাচ্ছে নাকি? কল্যাণ চারটে আঙুল তুলল।

'চার।'

কল্যাণের শিরদাঁড়া দিয়ে একটা স্রোত বয়ে যাচ্ছে। মনে জোর এনে সে আবার একটা আঙুল তুলল। তার আঙুল কি কাঁপছে? হ্যাঁ, কাঁপছে।

খানিক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা অন্ধকার মাখা কিশোর চাপা গলায় বলল, 'এক। একটা আঙুল।'

কাঁপা হাতে কল্যাণ দেয়ালে আলোর সুইচ খুঁজছে। পাচ্ছে না... কল্যাণ আলো জ্বালাতে পারছে না।

পাঁচ

মন্দিরা মৌ-এর গায়ে চাদরটা টেনে দিতে দিতে শুকনো গলায় বলল, 'তুমি সিঁড়ির দরজা ভাল করে আটকে দিয়েছ তো?' তার চোখে আতঙ্ক।

শুধু আটকে দিয়ে আসেনি, মৌ-কে নীচে নিয়ে আসার সময়ই কল্যাণ সেই দরজায় চাবি লাগিয়ে দিয়ে এসেছে। সেই চাবি এখন তার পাঞ্জাবির পকেটে। মৌ তার ঠাকুমার পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কোলে করে দোতলায় নামাতে হয়েছে। সেই অবস্থায় ঘ্যানঘ্যান করছিল, 'ঠাম্মার কাছে শোব। ঠাম্মার কাছে শোব। কেন আমায় নিয়ে যাচ্ছ?'

মন্দিরাকে ঘটনাটা জানানোর পর কল্যাণ শান্তভাবে ডাক্তার নন্দীকে টেলিফোন করে। মায়ের ছানি নিয়ে কথা শেষ হলে বলে, 'আচ্ছা ডাক্তারবাবু, অন্ধকারে দেখা যায়?'

ডাক্তার নন্দী হেসে বললেন, 'হঠাৎ এ প্রশ্ন? আপনার মা কি এই বয়েসে অন্ধকারেও দেখতে চাইছেন নাকি? হা হা।'

কল্যাণ গলা যতটা সম্ভব হালকা করে বলল, 'না, আমার মেয়ে কোথা থেকে সব শিখে এসেছে। বলছে প্র্যাকটিস করলে নাকি অন্ধকারেও দেখা যায়। কী বলি বলুন তো!'

'উফ, আজকালকার বাচ্চারা যে কতরকম প্রশ্ন করে। আমার এক পেশেন্ট সেদিন বলছিল, তার ছেলে নাকি বায়না ধরেছে পা লম্বা করবে। স্কুলের হাই জাম্পে ফার্স্ট হতে হবে। হা হা। আপনার মেয়ে কতটা অন্ধকারের কথা বলছে?'

'মানে?'

'মানে অন্ধকারের পরিমাণ কত। অল্প অন্ধকার হলে দেখা যায় বই কী! আলোর কোনও সোর্স আছে?'

'না, বেশ অন্ধকার। একদম অন্ধকার।'

'মেয়েকে বলবেন, কোনও চান্স নেই। অন্তত মানুষ পারবে না। নিশাচর জন্তুজানোয়ারদের চোখের সেল খুব সেনসেটিভ হয়। স্পর্শকাতর। তারা চোখের মণি বড় টড় করে খুব অল্প আলোতেও অনেকটা দেখতে পারে। ওদের আলাদা মেকানিজম আছে। মানুষ পারবে কী করে? তবে এক ধরনের নাইট বাইনোকুলার আছে... আপনি একটা কাজ করুন কল্যাণবাবু, একদিন ছুটির দিন দেখে মেয়েকে নিয়ে চলে আসুন। গল্প করে বুঝিয়ে দেব।'

এরপরই কল্যাণ পশুপতিকে ডেকে বলে, 'কাল খুব সকালে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে পশুপতি। পারলে মহাদেবকে নিয়ে সোজা শ্যামবাজারে চলে যাবে। দেখবে সেখান থেকে বাদুড়িয়া যাওয়ার বাস ছাড়ে। ছেলেটাকে টিকিট কেটে বাসে উঠিয়ে দেবে। আমি ওকে বলেছি, তুমি এখন ফিরে যাও। আমি ট্যুর থেকে ফিরে এসে আবার না হয়

ডেকে নেব। মনে হল, দেশে যাওয়ার কথায় ও খুশিই হয়েছে। যাক, পশুপতি এই নাও, টাকা রাখো। সকালে ফাঁকা রাস্তা, ট্যাক্সিতে তাড়াতাড়ি পৌঁছে যাবে।'

মহাদেবকে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে শুনে পশুপতি খুবই আনন্দিত। সে অনেকটা মাথা হেলিয়ে বলল, 'সে আপনাকে কোনও চিন্তা করতে হবে না দাদাবাবু। আপনাদের ঘুম ভাঙার আগেই আমি ওই ছেলেকে রওনা করিয়ে দিয়ে আসব। তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'কিছু হয়েছে নাকি দাদাবাবু? চুরি টুরি করেছে? আমি বউদিকে বলেছিলাম, ছেলে সুবিধের নয়। রাতে জাগে।'

কল্যাণ অন্যমনস্ক হয়ে বলছে, 'না, কিছু হয়নি। তুমি এখন যাও।'

মন্দিরা মেয়ের গায়ে একটা হাত রেখে বলল, 'আজ কিন্তু ঘরে আলো জ্বালিয়ে ঘুমোব।'

একটু আগে কল্যাণ ভেবেছিল বেডরুমে বসেই ফাইলগুলো নিয়ে কাজ করবে। এখন মনে হচ্ছে, থাক, দরকার নেই। কাল ছেলেটা চলে যাক তারপর সকালে দেখা যাবে।

মন্দিরা গলা নামিয়ে বলল, 'হ্যাঁগো, সত্যি সত্যি ছেলেটা অন্ধকারে দেখতে পায়?'

কল্যাণ হাসার চেষ্টা করল। পরিস্থিতি হালকা করার ঢঙে বলল, 'দূর, তা কখনও হয়? নিশ্চয় কোনও ভেলকি টেলকি দেখিয়ে আমাকে ঘাবড়ে দিয়েছে। পাড়াগাঁয়ের মানুষ নানারকম বুজরুকি পারে। যাই হোক, পশুপতি কাল সকালেই ওকে বাসে তুলে দিয়ে আসবে। আমি অনন্তকাকাকে চিঠি লিখে দেব, মাপ করবেন, আমার মেয়েকে অঙ্ক, ইংরেজি শেখানোর জন্য গৃহশিক্ষক রাখতে পারি, কিন্তু অন্ধকারে দেখা শেখানোর জন্য কোনও গৃহশিক্ষককে রাখতে পারছি না। শুধু অন্ধকারে দেখতে পায় না, বেটা বলছে, সে নাকি অন্ধকারও দেখতে পায়! একদম পাগল।'

কল্যাণ গলা খুলে হাসল। কিন্তু সে হাসিতে যেন জোর নেই।

মন্দিরা মনে মনে শিউরে উঠল। ভাগ্যিস কল্যাণ আজ ছেলেটার সঙ্গে কথা বলেছে। নইলে কী হত? কিছু না জেনে ও তো বাইরে চলে যেত। তারপর? তারপর অতীন যদি সত্যি সত্যি এ বাড়িতে আসত? এই ছেলে কি সেই অন্ধকারেও...

ঘটনাটা কল্পনা করতে গিয়ে মন্দিরার মুখ আতঙ্কে, লজ্জায় ফ্যাকাশে হয়ে গেল। কল্যাণ সেদিকে তাকিয়ে শুকনো হেসে বলল, 'কী হল আবার? তুমি অত ঘাবড়াচ্ছ কেন? বললাম তো ও কিছু নয়। ঘুমোও তো।'

দু'জনের কেউ ঘুমোতে পারল না অনেকক্ষণ। ঘুমন্ত মেয়েকে মাঝখানে রেখে চুপ করে শুয়ে রইল। গোটা বাড়ি নিঃশব্দ। শুধু এসি মেশিনের চাপা আওয়াজ ফিসফিস, ফিসফিস করে ঘুরপাক খাচ্ছে ঘরের ভেতর।

দুপুরে কল্যাণ রওনা হওয়ার সময় মন্দিরা ঝুঁকে পড়ে তার গালে চুমু খেল। সুটকেসটা এগিয়ে দিতে দিতে বলল, 'অ্যাই, পৌঁছে ফোন কোরো। সাবধানে থাকবে। কাগজে ভিজিলেন্স টিজিলেন্সের কতরকম খবর পড়ি। ভয় করে।'

কল্যাণ চোখ নাচিয়ে বলল, 'আমি সাবধানেই থাকি ম্যাডাম। প্লিজ নো টেনশন। কোনও দুশ্চিন্তা কোরো না।'

না, মন্দিরার আর কোনও দুশ্চিন্তা নেই। কল্যাণ বেরিয়ে যেতে মন্দিরা গেল শাশুড়ির

চোখের খোঁজ নিতে। চোখ ভালই আছে। আরও নিশ্চিন্ত মনে মন্দিরা নেমে এল দোতলায়। গৌরীকে চা দিতে বলে সিডি প্লেয়ারে হালকা করে রবীন্দ্রসংগীত চালাল। অনেকদিন গান শোনা হয় না।

মন্দিরা টেলিফোনটা কাছে টেনে নিয়েছে। সে এখন পরপর দুটো ফোন করবে। অঞ্জুকে একটা কথা বলতে হবে। কল্যাণ বলে গেছে, ওই জমিটার জন্য বাজারের থেকে কিছুটা বেশি দাম দিতে সে রাজি আছে। এই কথাটাই জানাতে হবে অঞ্জুকে। অঞ্জুর সঙ্গে কথা সেরে দ্বিতীয় ফোনটা করবে অতীনকে।

কে বলবে, গত দু'দিন ধরে মহাদেব নামের একটা গ্রাম্য কিশোরকে নিয়ে এ বাড়িতে কিছু ঘটে গেছে? সে নেই। তার কথা কারও মনেও নেই। সব আবার স্বাভাবিক, আবার আগের মতো। এমনকী ছোট্ট মৌ বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে প্রতিদিনকার মতো আপন মনে খেলছে। খেলতে খেলতে খানিক আগে সে দোতলার সিঁড়ির কোণে একটা অদ্ভুত জিনিস কুড়িয়ে পেয়েছে। একটা লম্বা, ধূসর পালক। শালিখ, চড়ুইয়ের পালক নয়, অন্যরকম পালক। এমন পালক সে আগে কখনও দেখেনি। পশুপতিকাকাকে দেখাতে ভুরু কুঁচকে বলল, 'এ মা, এই জিনিস বাড়ির ভেতর এল কী করে? এ তো মনে হয়, পেঁচার পালক!'

কোথা থেকে এল তা নিয়ে মৌ-এর কোনও মাথাব্যথা নেই। সে এখন মহা আনন্দে পেঁচার পালক নিয়ে খেলছে।

শারদীয় দেশ, ১৪১২

নদী

দূরে কোথায় যেন ঢাক বাজছে।

কোথায় বাজছে? ওপারে? হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। নদীর কাছে এরকম হয়। আলো, বাতাস, শব্দরা অনেক সময় ধাঁধায় ফেলে। কোনটা কোন পারের বোঝা যায় না। এই নদীটা তেমন চওড়া নয়। ওদিকের অনেকটা দেখা যাচ্ছে। এই তো খানিক আগে সাইকেল চালিয়ে একটা লোক চলে গেল। যাওয়ার সময় হাঁক দিল—

'ফকির। অ্যাই ফকির...'

কে ফকির, ফকির কোথায় থাকে, কিছুই জানা গেল না, তবু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই হাঁক জলে ভেসে এদিকে চলে এল। ওপারের 'ফকির' কাউকে কিছু না বলে এপারের হয়ে গেল!

ঢাকের বেলাতেও সেরকম কিছু হচ্ছে। পাড় এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

তবে যেখানেই বাজুক, দুর্গাপুজোর দিনে ঢাকের আওয়াজ খুবই সুন্দর একটা জিনিস। শুনলেই আনন্দ হয়। এখন কিন্তু হচ্ছে উলটোটা।

ঢাকের বাজনায় মন তেতো হয়ে যাচ্ছে। শুধু তেতো নয়, রাগে গা চিড়বিড় করছে। বাবলুর ইচ্ছে করছে, খানিকটা তুলো জোগাড় করে দুটো কানে ভাল করে গুঁজে বসে থাকে। তা হলে আর এই বাজনা শুনতে হবে না।

বাবলু বাংলোর বারান্দা থেকে সরে এল। আসার সময় শুনল সাহেব চিৎকার করে বলছে, 'মা, মা নদীতে একটা হিপোপটেমাস! বিগ হিপোপটেমাস। দেখো দেখো। বাইনোকুলারটা দিয়ে একবার তাকাও। দেখো... ওই তো... ওই যে।' সাহেব তপনদা-চন্দনাবউদির ছেলে। ক্লাস ফোরে পড়ে। চোখে একটা দূরবিন লাগিয়ে ঘুরছে এবং কিছুক্ষণ পর অদ্ভুত অদ্ভুত সব জিনিস দেখছে।

চন্দনাবউদি ছেলের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বললেন, 'চুপ, একদম চুপ। আর একটা কথা বললে চড় মেরে দূরবিনটা কেড়ে নেব, তারপর নদীর জলে ফেলে দিয়ে আসব।'

বাবলু আরও নার্ভাস হয়ে দরজার আড়ালে সরে গেল। বলা ভাল লুকিয়ে পড়ল। সেখান থেকেই শুনল শর্মিষ্ঠা গম্ভীর গলায় বলছে, 'আঃ দিদি, ওকে কেন বকছিস? ছোট ছেলে। যাকে বকা উচিত তাকে বক। দরকার হলে তাকে নদীতে ফেলে দিয়ে আয়। দে সাহেব আমাকে বাইনোকুলারটা দে তো। দেখি তোর হিপোপটেমাস কী বলছে। সে কি মানুষ খেতে চাইছে?'

বাবলু চমকে উঠল। ভয়ংকর! এই মেয়েকে যতটা ভয়ংকর ভাবা গিয়েছিল এ তার থেকেও ভয়ংকর! শুধু নদীতে ফেলে দিতে চায় না, জলহস্তি দিয়ে খাওয়াতেও চাইছে!

বাবলুর হাত পা ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছে। এই কার্তিকে সে চব্বিশ বছরে পা দেবে। চব্বিশ বছর বয়সের কোনও যুবকের ভয়ে হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসাটা মোটেই কাজের কথা নয়। কিন্তু উপায় নেই। ঘটনা যা তাতে শুধু হাত-পা কেন, বাবলুর সারা শরীর ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার কথা। উফ! কেন সে এই দায়িত্ব নিতে গিয়েছিল? তখন বোঝেনি। এখন বুঝতে পারছে, বোকামি হয়ে গেছে। বিরাট বোকামি হয়ে গেছে।

অথচ খানিক আগেই পরিস্থিতি ছিল একেবারে অন্যরকম। কলকাতা ছাড়াতেই তপনদা জোরে গান চালিয়ে দিলেন। চন্দনাবউদি গুনগুন করতে লাগলেন। সাহেব হাততালি দিয়ে উঠল। পথে দু'বার চা আর একবার কচুরি খাওয়ার জন্য গাড়ি থেকে নামা হল। অতিরিক্ত উৎসাহের কারণে গোটা পথটাই বাবলু হাত টাত নেড়ে বিভিন্ন বিষয় ভাষণ দিতে থাকে।

একসময় শর্মিষ্ঠা গম্ভীর মুখে বলে, 'বাবলুবাবু, আপনার কি কোনও সমস্যা হয়েছে?'

মেয়েটা পিছনের সিটে তার দিদির পাশে বসেছে। কী যেন খাচ্ছে। কী খাচ্ছে? চুইংগাম? চুইংগাম হলে ঠিক আছে কিন্তু পান হলে খুব খারাপ হবে। একটা সুন্দরী মেয়ে প্যান্ট শার্ট পরে কচরমচর করে পান খাবে এটা মানা যায় না। বাবলুর খুবই জানতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সাহস হচ্ছে না। শর্মিষ্ঠাকে সে মোটে দু'দিন হল দেখছে। দিল্লিতে পড়াশোনা করে। পুজোর ছুটিতে কলকাতায় দিদির বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। বাবলুর অভিজ্ঞতা বলছে, বাইরে একা থেকে পড়াশোনা করা মেয়েরা রাগী ধরনের হয়। তার চণ্ডীগড়ে পড়া এক ভাগনি এরকম ছিল। রগচটা। তার ওপর ক্যারাটে জানত।

এই মেয়েও কি সেরকম? রাগী আর ক্যারাটে জানে?

'কী হল বললেন না? আপনার কি কোনও সমস্যা হচ্ছে?'

বাবলু নার্ভাস হয়ে হাসল। বলল, 'সমস্যা! কই না তো! সমস্যা কী? চমৎকার রাস্তা।'

শর্মিষ্ঠা কঠিন গলায় বলল, 'সমস্যা না হলে একটু চুপ করে বসুন এবং চমৎকার রাস্তা দেখুন।'

বাবলু নিশ্চিত হল, এই মেয়ে রগচটা। সম্ভবত ক্যারাটেও জানে। সে দ্রুত তার ভাষণ বন্ধ করে।

শরতের কিছু কিছু সকালে আকাশ এক ধরনের নীল রং গায়ে মেখে বসে থাকে। বৃষ্টি ধোয়া নীল। হাত বাড়ালেই সেই রং খানিকটা আঙুলে লেগে যায় এবং চট করে তোলা যায় না। আজও সেরকম একটা সকাল। সেই সকালে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়া হয়েছে। তপনদাই গাড়ি চালাচ্ছেন। দূরের কোনও ট্যুরিস্ট স্পট নয়, মাত্র ঘণ্টা তিনেকের রাস্তা। একদিনের বেড়ানো। আজ রাত কাটিয়ে কাল বিকেলে ফেরা হবে। ঠিক হয়েছে, ফেরার পথে আরতি দেখা হবে গ্রামের কোনও পুজো মণ্ডপে বসে। সেই মণ্ডপ বাছাইয়ের সময় লক্ষ রাখা হবে যাতে খানিকটা পথ আল দিয়ে হেঁটে যেতে হয়। শর্মিষ্ঠা দিল্লিতে গল্প শুনে এসেছে, আলপথ ধরে হেঁটে পুজো দেখতে যাওয়া নাকি একটা দারুণ ইন্টারেস্টিং ঘটনা। আলপথে হাঁটার রোমাঞ্চ এবং পুজো দেখার মজা দুটোই একসঙ্গে পাওয়া যায়।

তপনদা চন্দনাবউদিদের এই পারিবারিক ভ্রমণে বাবলুর জায়গা হওয়ার কোনও কারণ নেই। সে এই পরিবারের কেউ নয়। একজন সামান্য পরিচিত মাত্র। ছুটিছাটার দিনে তাদের

বাড়িতে ঘুরঘুর করে। তপনদা বড় চাকরি করেন। যদি একটা কিছু যোগাযোগ হয়ে যায় এই আশায় ঘুরঘুর। তপনদা প্রশ্রয় দিলেও চন্দনাবউদি বাবলুকে একেবারেই পছন্দ করেন না। তিনি মনে করেন, বাবলু একটি বড়সড় অপদার্থ। এই ছেলের চাকরি বাকরি জোটা তো দূরের কথা, এই ধরনের অপদার্থ ছেলের আশেপাশে থাকাটাও বিপদের। একদিন বড় বিপদ হলে তার স্বামীর শিক্ষা হবে।

মনে হচ্ছে, আজ সেই বিপদই হয়েছে।

বাবলুকে আজ সঙ্গে নেওয়ার কারণ বেড়ানোর এই জায়গাটা তারই ব্যবস্থা করা। শর্মিষ্ঠা দুম করে আবদার করে বসছে, পুজোর মধ্যে একদিন সে কলকাতার ভিড় থেকে পালাতে চায়। চন্দনাবউদিদের মাথায় হাত পড়ল। সর্বনাশ! কোথায় পালাবে? এইসময় সব পাওয়া যায়, কিন্তু হুট করে বেড়ানোর জায়গা পাওয়া যায় না।

ড্রইংরুমে বসে বাবলু চা খাচ্ছিল। এমনি দিনে তাকে শুধু চা দেওয়া হয়। পুজোর সময় বলে একটা সন্দেশও দেওয়া হয়েছে। ঘটনা শুনে সন্দেশটা হাতে নিয়ে তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠল। বলল, 'আমি দেখছি।'

বাবলু বেরিয়ে যাওয়ায় চন্দনাবউদি মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'দূর, ওই ছেলে কী পারবে? ও গাধা বেড়ানোর কী জানে?'

তপনদা বলেন, 'আহা, দেখা যাক না।'

সত্যি দেখা গেল। বিকেলে একগাল হাসি নিয়ে বাবলু হাজির। জানাল, ব্যবস্থা হয়ে গেছে। মোটে তিন ঘণ্টার ঝাঁ চকচকে গাড়ির পথ। পথ যেখানে শেষ সেখানেই নদী। নদীর নামটা মনে পড়ছে না, তবে নদী বড় নয়, ছোট। বড় কথা হল, চারপাশে কিছু নেই। কেউ নেই। ঠিক যেমনটি চাওয়া হচ্ছে। শুধু একটা বাংলো আছে। একতলা বাংলো। সেই বাংলো ছবির মতো সুন্দর। বড় বড় ঘর। প্রতিটি ঘর থেকে শুধু নদীই দেখা যায় না, ঘরের পিছনে নদী পর্যন্ত যাওয়ার জন্য আলাদা সিঁড়িও আছে। প্রাইভেট সিঁড়ি। ইচ্ছে করলে মাঝরাতে পা টিপে টিপে বেরিয়ে নদী পর্যন্ত ঘুরে আসা যাবে। কেউ জানতে পারবে না।

চন্দনাবউদি চোখ সরু করে বললেন, 'এই বাংলো তুমি কী করে জোগাড় করবে?' তাঁর গলা শুনেই বোঝা গেল, তিনি বাবলুর কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না।

বাবলু গদগদ ভঙ্গিতে জানায়, 'জোগাড় করব কী? অলরেডি জোগাড় হয়ে গেছে। এই জায়গার খোঁজ লোকজন বিশেষ জানে না। সবসময়ই ফাঁকা পড়ে থাকে। আমার ছোটমামার এক বন্ধু ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টে বালির বস্তা সাপ্লাই করেন। তিনিই খবর দিলেন। ওখানেও খবর চলে গেছে। বাংলো এখন একদিনের জন্য আমাদের। শুধু আমাদের।'

তপনদা চিন্তিত মুখে বলল, 'দেখো বাবা শুধু তোমার ছোটমামার বন্ধুর ভরসায় চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? গিয়ে যদি দেখি...'

বাবলু আবার হাসল। এবার হাসির মধ্যে একটা যুদ্ধজয়ের কায়দা আছে। বলল, 'গিয়ে দেখবেন গঙ্গা মুরগির ঝোল আর ভাত করে রেখেছে। আমি রান্নায় ঝাল কম দিতে বলেছি। সঙ্গে ছোট ছেলে আছে।'

শর্মিষ্ঠা চোখ সরু করে বলল, 'গঙ্গা! গঙ্গা কে?'

বাবলু উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'গঙ্গা হল বাংলোর কেয়ারটেকার কাম রাঁধুনি কাম চৌকিদার। একটা খবর শুনলে আপনারা সবাই খুশি হবেন।'

শর্মিষ্ঠা চোখ আরও সরু করে বলল, 'কী খবর?'

'গঙ্গা ভাটিয়ালি জানে।'

চন্দনাবউদি বিস্মিত গলায় বলল, 'ভাটিয়ালি জানে! ভাটিয়ালি জানে মানে?'

'ভাটিয়ালি মানে ভাটিয়ালি গান। ফোক সঙ। এখন নিয়ম হয়েছে, নদীর পাশের বাংলোর কেয়ারটেকার হতে গেলে ভাটিয়ালি গান জানা মাস্ট। ইন্টারভিউয়ের সময়তেই গান শুনে নেওয়া হয়। চন্দনাবউদি আপনার জন্য সাউথ ফেসিং ঘরটা রেডি করতে বলেছি। ছোটমামার বন্ধুর কাছে শুনলাম, ওই ঘরটা নাকি বেস্ট। রাতে শোওয়ার পর একটা দুলুনি এফেক্ট আসে। মনে হয় নদীর ওপরই আছি।' বাবলু একটু থামল। তারপর শর্মিষ্ঠার দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি নিশ্চয় রাতে পড়াশোনা করবেন। সামনেই ফাইনাল। সেই কারণে আপনার জন্য ব্যবস্থা করতে বলেছি পশ্চিমের ঘর। রাত জাগার পর বেলা পর্যন্ত ঘুমোতে পারবেন। পুবদিকের আলোয় অসুবিধে হবে না। আপনার কী মনে হয়?'

কথা শেষ করে বাবলু হাসিমুখে শর্মিষ্ঠার দিকে তাকায়। শর্মিষ্ঠা গম্ভীর মুখে বলল, 'মনে হয় আপনার এবার চুপ করা উচিত। আপনি একটু বেশি কথা বলছেন।'

দুপুরের মুখে মুখে পৌঁছে দেখা গেল, বাবলুর কথা সত্যি। সত্যি পথের শেষে নির্জন নদী আছে। নদীর পাশে ছবির মতো নয়, ছবির থেকেও সুন্দর একটা বাংলো আছে। সেই বাংলোর ভেতরে ঢুকে দেখা গেল, বাবলুর কথা আরও খানিকটা সত্যি। বাংলোতে ঘরও আছে। ঘরগুলোও বড় বড়। কিন্তু তারপর? তারপরটাই ভয়াবহ। সেই ঘরের অবস্থা মারাত্মক। রাত্রিবাস তো দূরের কথা। সেখানে দিন কাটানোই অসম্ভব। দেয়ালে উই। একটা জানলাতেও ছিটকিনি লাগছে না। খাট শুধু নড়বড়ে নয়, দুটো ঘরে ভাঙাও। একদিকে কাত হয়ে আছে। মাঝরাতে ভেঙে পড়ার জন্য একেবারে তৈরি। বিছানার চাদর-টাদরের দিকে তো তাকানোই গেল না।

চন্দনাবউদি আর শর্মিষ্ঠা ছিটকে বেরিয়ে এসেছে বাইরে। এসে বসেছে বারান্দায়।

বাংলো থেকে কয়েক হাত দূরে তখন নদী উলটোদিকে মুখ ফিরিয়ে রোদের সোনালি আঁচল বিছিয়ে স্নানে বসেছে। একসঙ্গে অতগুলো মানুষ দেখে সে বুঝি লজ্জা পেল। তাড়াতাড়ি আঁচল তুলতে গিয়ে জলে ঢেউ উঠল।

ক্যাটক্যাটে সবুজ রঙের একটা স্টিমার ভোঁ তুলে, জল কেটে চলে গেল নদীর মাঝবরাবর।

সাহেব দূরবিন চোখে চিৎকার করে উঠল, 'পাইরেটস, পাইরেটস।'

চন্দনাবউদি জানিয়ে দিলেন, তিনি ঘরে ঢুকবেন না। এই মুহূর্তে কলকাতায় ফিরে যাবেন। তপনদা বললেন, অসম্ভব এখনই আবার অতটা গাড়ি চালানো অসম্ভব। গাড়িকে বিশ্রাম দিতে হবে। বিকেলটা এখানে কাটিয়ে সন্ধে নাগাদ রওনা দেওয়া যেতে পারে।

শর্মিষ্ঠা বলছে, তা হলে সন্ধে পর্যন্ত সে বারান্দাতেই বসে থাকবে। এই জঘন্য বাংলোর বিরুদ্ধে এটাই হবে তার প্রতিবাদ। ব্যালকনি প্রোটেস্ট। বারান্দা প্রতিবাদ।

তপনদা গলা নামিয়ে বললেন, 'কী ছেলেমানুষি করছ তোমরা? ছেলেটা শুনতে পাচ্ছে। আহা, ওর কী দোষ? বাবলু কি আগে এখানে এসেছে না এই বাংলোয় থেকে গেছে। তোমাদের জন্যই তো ব্যবস্থা করল। একটা রাতের তো মামলা। বেড়াতে এসে অত খুঁতখুঁতুনি চলে না।' তারপর গদগদ গলায় চন্দনাবউদিকে বললেন, 'আহা, কী সুন্দর নদী দেখেছ চন্দনা? ভাল করে তাকিয়ে দেখো একবার।'

চন্দনাবউদি কোলের ওপর রাখা হাতব্যাগটা চেপে ধরে বিড়বিড় করে বললেন, 'হ্যাঁ, দেখছি। খুবই ভাল লাগছে। এত ভাল লাগছে যে ইচ্ছে করছে, তোমার ওই বাবলু আহাম্মকটাকে ধরে নিয়ে গিয়ে নদীতে কুড়িবার চুবিয়ে আনি।'

সাহেব হাততালি দিয়ে বলে উঠল, 'কী মজা বাবলুমামাকে চোবানো হবে, কী মজা, কী মজা।'

প্রথমদিকটায় গঙ্গাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাকে আবিষ্কার করা গেল খানিক পরে। রান্নাঘরে। সে খুবই লাজুক প্রকৃতির মানুষ। অতি বিনয় এবং লজ্জার সঙ্গে সে অতিথিদের তিনটি তথ্য জানায়।

তথ্য নম্বর এক. মুরগি পাওয়া যায়নি। তবে চিন্তার কোনও কারণ নেই। ডিমের ঝোল চাপানো হয়ে গেছে। খরচ একটু বেশি পড়েছে এই যা। **তথ্য নম্বর দুই**. ঘর পছন্দ হয়নি তো কী হয়েছে? ঘরেই যে থাকতে হবে এমন মাথার দিব্যি তো কেউ দেয়নি। দশ-বিশ টাকা পেলে গঙ্গা রাতে হলঘরে মেঝেতে চমৎকার বিছানা পেতে দিতে পারে। ঢালা বিছানা। আরও দশ-বিশ টাকায় কাচা চাদর-টাদরও সব বেরিয়ে আসবে। কোনও সমস্যা নেই। শুধু একটু সাবধানে ঘুমোতে হবে। কারণ হলঘরে 'ইন্দুর' আছে। সেই ইন্দুর নাকি আবার রাতে বিছানায় উঠে পড়ে। তবে দু'-পাঁচ টাকা খরচ করলে 'ইন্দুর' ঠেকানোর ব্যবস্থাও হবে। সে পথও নাকি আছে। সম্ভবত হ্যামলিনের বাঁশিওলা ধরনের কাউকে ডেকে আনা হবে। **তথ্য নম্বর তিন**. এই একমাত্র বিষয় যাতে গঙ্গা কোনও অতিরিক্ত টাকা পয়সার কথা বলেনি এবং বলার সময় লজ্জায় মুখ-টুখ নামিয়ে একাকার কাণ্ড করে। তার খুবই ইচ্ছা, ডিমের ঝোল শেষ হওয়ার আগেই অতিথিদের দু'লাইন ভাটিয়ালি শোনায়।

বাবলু আঁতকে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে গান! তপনদা ফিসফিস করে বলেন, 'বুঝতে পারছ না, গান না শুনলে বেটা রান্না শেষ করবে না। কোনও উপায় নেই। তুমি ওদের একটু বুঝিয়ে বলো।'

হলঘরে আসর বসেছে। বাইরে কড়কড়ে রোদের দুপুর। নদী ঝলসাচ্ছে খাপ তোলা তলোয়ারের মতো। অতিথিদের জন্য শতরঞ্জি পেতে গঙ্গা মাটিতে বসল। হাত রাখল কোলের ওপর। তারপর চোখ বুজে বিকট চিৎকার দিল 'ও মাঝি ভাই রে......।'

শর্মিষ্ঠা কঠিন চোখে তাকাল বাবলুর দিকে। চন্দনাবউদির মুখ দেখে মনে হল, তিনি শোকে পাথর হয়ে গেছেন।

গান শুনতে শুনতেই বাবলু সিদ্ধান্ত নিল, অনেক হয়েছে। অনেক বেশি হয়েছে। আর

নয়। এই অপরাধের সাজা তাকে পেতে হবে। নিজেই নিজেকে শাস্তি দেবে। সেই শাস্তি হবে মৃত্যুদণ্ড। হারিকিরির কায়দায় একটু পরেই সে গিয়ে নদীর জলে ডুবে আত্মহত্যা করবে। ভালই হবে। ফালতু মানুষের জন্ম মৃত্যুর দিনক্ষণ কারও মনে থাকে না। থাকার কথাও নয়। তবে তারটা মনে থাকবে। উৎসবের দিনে, আনন্দের দিনে মৃত্যু তো, তাই মনে থাকবে। ডুব দেওয়ার সময় ঢাকের আওয়াজ কি পাওয়া যাবে? পেলে ভাল। একটা বিসর্জন বিসর্জন এফেক্ট হবে। আত্মহত্যার সময় একটা চিঠি লিখে যাওয়া উচিত। কাকে লিখবে? শর্মিষ্ঠাকে লিখলে কেমন হয়? সাহস হচ্ছে না। মেয়েটা খুবই রগচটা। বাবলু ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল। এইজন্যই বলে উৎসবের সময় কখন যে কী ঘটে কেউ বলতে পারে না।

না, পারে না। পারলে ওরকম একটা ভয়াবহ গানের পরও গঙ্গার ডিমের ঝোল 'দারুণ, দুর্দান্ত, ফ্যান্টাস্টিক' বলে সবাই হাপুস হুপুস করে খেয়ে নিতে পারত না। শুধু তাই নয়, বিকেলে রগচটা শর্মিষ্ঠা আবদার করল, 'জামাইবাবু নৌকো চড়ব। ফিরে যাওয়ার আগে নৌকো চড়ে নদীতে খানিকক্ষণ ঘুরব।'

তপনদা বললেন, 'অসম্ভব। দেরি হয়ে যাবে।' চন্দনাবউদি ধমকে বললেন, 'হোক দেরি। লজ্জা করছে না বলতে? এরকম একটা জঘন্য জায়গায় নিয়ে এসেছ...... যাও এখনই ওই গাধাটাকে নৌকো ঠিক করতে বলো। নৌকো যেন ভাল হয়।'

বাবলু আত্মহত্যার প্রোগ্রাম স্থগিত রেখে এখন নৌকো খুঁজছে। খুবই উৎসাহের সঙ্গে খুঁজছে। বাংলো কেলেঙ্কারির পরেও যে তাকে এরকম একটা দায়িত্ব দেওয়া হবে সে ভাবতেও পারেনি। সমস্যা এই নদীতে নৌকোও তেমন নেই। থাকলেও ছোট ছোট ডিঙি ধরনের জিনিস। এসবে চলবে না। হাবিজাবি কিছুতে ওদের তোলা যাবে না। নৌকো সাবধানে বাছতে হবে। বাংলোর মতো যেন না হয়। একটা ভেলকি দেখিয়ে দিতে হবে। লাস্ট চান্স। শেষ সুযোগ। একটা বড় নৌকো চাই। সাজানো গোছানো নৌকো। পাল তোলা কি পাওয়া যাবে? পেলে খুব ভাল হয়। শর্মিষ্ঠা চমকে যেত। এই মেয়েকে চমকে দেওয়া দরকার।

পছন্দমতো নৌকো পাওয়া গেল সন্ধের মুখে। পাল না থাকলেও গায়ে নকশা আছে। রঙিন নকশা। ছইয়ের মাথায় খড়। ভেতরে পাতলা গদি। তাতে সাদা চাদর, তাকিয়া। বাইরে পাটাতনের ওপর বসার জায়গাও সুন্দর। তপনদা, চন্দনাবউদি সেখানে বসলেও শর্মিষ্ঠা বসেনি। সে ছইয়ের ওপাশে গেছে। গিয়ে বসেছে নৌকোর গায়ে। নৌকোর গায়ে না বসলে দুলুনির মজাটাই নাকি পাওয়া যায় না। আপত্তি করায় বলেছে, সে নাকি ইউনিভার্সিটির সুইমিং চ্যাম্পিয়ন। বাবলুর একথা পছন্দ হয়নি। জলে পড়লে ঠেলা বুঝবে। চ্যাম্পিয়নগিরি বেরিয়ে যাবে।

সাহেব দূরবিন চোখে লাগিয়ে চিৎকার করে উঠল, 'পক্ষিরাজ! পক্ষিরাজ!'

নৌকো ছাড়লে চন্দনাবউদি তাঁর স্বামীর কানের কাছে ফিসফিস করে বললেন, 'গাধাটা, ব্যবস্থা খারাপ করেনি।'

নৌকোর এদিকটায় কেউ নেই। সাহেব ঢুকেছে ছইয়ের ভেতর। শর্মিষ্ঠা আর বাবলু ওদিকে। তাদের দেখা যাচ্ছে না। তপনদা চন্দনাবউদির দিকে সরে এলেন।

সন্ধে নামছে। জলের রং এখন স্লেটের মতো। মাথার ওপর দিয়ে ব্যস্ত হয়ে উড়ে গেল কয়েকটা পাখি। চন্দনাবউদি মুখ তুলে উড়ে যাওয়া পাখি দেখতে দেখতে বললেন, 'ভাবছি রাতটা ওই হতচ্ছাড়া বাংলোতেই থেকে যাব।'

'ওই বাংলোয়! পাগল নাকি!'

'তোমাদের পাল্লায় যখন পড়েছি, পাগল না হয়ে উপায় আছে? গঙ্গা তো বলল, টাকা পেলে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বেশি করে দিয়ো। দেখবে ইঁদুর-টিদুর সব পালিয়েছে। রাতে কিন্তু চিকেন খাব। এই দেখো, দেখো পাখিগুলো আবার ফিরে আসছে। মনে হয় পথ হারিয়ে ফেলেছে। তাই না গো? আরে, দেখবে তো। কী আমার মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছ। ন্যাকা।'

তপনদা মুচকি হেসে মুখ তুললেন। অন্ধকার আকাশে সত্যি সত্যি উড়ে গেল ক'টা সাদা পাখি! আচমকা দুলুনি সামলাতে তপনদা স্ত্রীর হাত ধরলেন এবং ছাড়লেন না।

ছইয়ের ওপাশে তখন শর্মিষ্ঠা বাবলুকে ধমক দিচ্ছে। চোখ পাকিয়ে বলছে, 'অ্যাই, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন কেন? জোরে একটা ঢেউ এলেই টুপ করে জলে পড়বেন। আকাশের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে পাখি দেখা বেরিয়ে যাবে তখন। কায়দা না করে চলে আসুন, এখানে এসে বসুন।'

বাবলু আমতা আমতা করে বলল, 'বাপ রে ওখানে বসব? আমি তো সাঁতার জানি না। পড়ে টড়ে যাই যদি?'

শর্মিষ্ঠা কঠিন গলায় বলল, 'কোনও অসুবিধে নেই। আমিও সাঁতার জানি না। আসুন।'

ছই ধরে নিজেকে সামলে বাবলু ভয়ে শর্মিষ্ঠার পাশে গিয়ে বসে।

একটা চাঁদ উঠছে নদীর ওপর। মস্ত বড় চাঁদ। নদীর চাঁদ। হাসি হাসি মুখে সে তাকিয়ে আছে চুপিচুপি ভেসে যাওয়া এই নৌকোটার দিকে। নদীর চাঁদের মজা হল, যেদিন তার মন খুব ভাল হয়ে যায় সেদিন সে লম্বা সিঁড়ি নামিয়ে দেয় একেবারে সেই জল পর্যন্ত। কেউ চাইলে সেই সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে পারে। ঘুরে আসতে পারে তার কাছে।

আজ মনে হচ্ছে সেই ঘটনাই ঘটবে। এই নৌকোর মানুষগুলোর জন্য খানিক পরেই চাঁদ নদীতে নামিয়ে দেবে তার রুপোলি আলোর সিঁড়ি।

দূরে কোথায় যেন ঢাক বাজছে। উৎসবের ঢাক। কোথায় বাজছে? কোন পাড়ে?

বর্তমান রবিবাসর, ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০০৬

সখী

সুপর্ণার গোটা শরীরটা কেঁপে উঠল। মনে হল, ব্যালান্স হারিয়ে এখনই পড়ে যাবে। সোফার হাতলটা কোনওরকমে চেপে ধরল সে।

মহিলা মাথা নামিয়ে টেবিল থেকে কাপ-ডিশ তুলতে তুলতে বলল, 'বউদির কি শরীর খারাপ লাগে? মাথা ঘোরে?'

সুপর্ণা সোফায় বসে পড়েছে। নিজেকে সামলাতে চেষ্টা করছে। মুখ না তুলে বলল, 'না না, আমি ঠিক আছি। আমি ঠিক আছি।'

মহিলা শান্ত গলায় বলল, 'দাদাবাবুর রাতের রুটি করে রাখব?'

কী উত্তর দেবে সুপর্ণা বুঝতে পারছে না। তার মাথার ভেতরটা তালগোল পাকিয়ে গেছে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। জল খাওয়া দরকার। ঠান্ডা এক গেলাস জল। কিন্তু তার থেকেও আগে দরকার এই মানুষটাকে সামনে থেকে সরানো। কীভাবে সরাবে? চলে যেতে বলবে? বললে, কী বলবে? তুমি আমার সামনে থেকে যাও?

মহিলা আবার বলল, 'আমি কি রুটি করে রাখব বউদি?'

সুপর্ণা অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে কোনওরকমে বলল, 'হ্যাঁ, করে রাখো।'

'আপনি কি রাতে রুটি খান?'

সুপর্ণার কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। তবু তাকে বলতে হল। নিজেকে সামলাতে সামলাতে বলল, 'না, শুধু দাদাবাবু খান।'

'তা হলে আপনার জন্য ভাত বসাই?'

'না, থাক, আমি আজ রুটি খাব।'

সকালে মহিলা যখন আসে তখন সুপর্ণা ভীষণ রকমের ব্যস্ত। অফিসের দেরি হয়ে গেছে। আজকাল অফিসে দেরি হয়ে গেলে ম্যানেজ দেওয়ার উপায় নেই। অনেকরকম ফ্যাকড়া হয়েছে। খাতা-টাতার বালাই উঠে গেছে। কার্ড পাঞ্চ করে ঢুকতে হয়। তা ছাড়া কিছুদিন হল, কাজের চাপ খুব বেড়েছে। অনেকেই বলছে, কাজের চাপ বেড়েছে মানে, এবার প্রমোশন হবে। প্রমোশন না ছাই। প্রতিদিন একটা করে প্রজেক্ট রিপোর্ট দেখতে হচ্ছে। মুখ তোলবার সময় নেই। রোজই সাড়ে সাতটা, আটটা বেজে যায়। যাওয়ার সময় নির্মল অফিসে নামিয়ে দেয়। ফেরবার সময়ও এতদিন নির্মল তুলে আনত। আজকাল আর হয় না। বাড়ি ফিরে নির্মল ড্রাইভারকে দিয়ে আবার গাড়ি পাঠায়। নইলে মেট্রো ধরে সুপর্ণা নিজেই চলে আসে।

আজ সকালে যখন ফ্ল্যাটের বেল বাজল, তখন সুপর্ণা অফিসের কাগজপত্রে চোখ বোলাচ্ছে।

নির্মল সকালে বেরিয়ে গেছে। অফিস থেকে গাড়ি এসেছিল। ওদের বস এসেছে চেন্নাই থেকে। তাকে নিয়ে হাওড়ার কোথায় সাইট দেখতে যাওয়ার কথা। এ-ক'টা দিন ওরও ঝামেলা আছে। ছুটে ছুটে বেড়াতে হবে।

বিরক্ত মুখে সুপর্ণা দরজা খুলল। অফিস বেরোনোর মুখে কারও আসা সব থেকে বিরক্তিকর। এইসময় এক-একটা মুহূর্তের দাম অনেক।

রোগাপাতলা ধরনের এক মহিলা দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে একটা চটের থলি। ঢোঁক গিলে বলল, 'আমাকে সন্তোষপুরের মাসিমা পাঠিয়েছেন। আপনিই এ-বাড়ির বউদি তো? মাসিমা আপনাকে এই চিঠিটা দিয়েছেন।'

মহিলার মুখের দিকে ভাল করে না তাকিয়ে সুপর্ণা দ্রুত কাগজের টুকরোটা খুলল। তাতে লেখা— 'কাল রাতের কথামতো একে পাঠালাম। তুমি কথা বলে, দেখে শুনে বুঝে নাও। প্রয়োজনে আমাকে ফোন করবে। আশীর্বাদ জানবে, মা।'

নিমেষে সুপর্ণার মুখ থেকে বিরক্তি ভাব উধাও। উফ, শেষপর্যন্ত পাওয়া গেল তা হলে। না, এই বয়সেও মা করিতকর্মা আছে। মুখে সামান্য হাসি নিয়ে সে এবার মহিলার দিকে ভাল করে তাকাল। বলল, 'এসো, ভেতরে এসো।'

দশ দিন হল, আগের মেয়েটি কাজ ছেড়ে চলে গেছে। তার নাকি হঠাৎ বিয়ে ঠিক হয়েছে। তারপর থেকে চোখে অন্ধকার দেখছিল সুপর্ণা। কীভাবে ঘর আর অফিস সামলাবে বুঝতে পারছিল না। স্বামী, স্ত্রী দু'জনকেই বেরোতে হয় সকালে। অফিসেই লাঞ্চ। কোনওদিন তাও হয় না। কিন্তু শ্বশুরমশাই তো আছেন। তাঁর খাওয়াদাওয়া আছে। দু'দিন অফিসে বেরোনোর আগে শ্বশুরমশাইয়ের জন্য রান্না করতে গিয়ে নাজেহাল অবস্থা সুপর্ণার। আপাতত পাড়ারই এক হোম সার্ভিসের সঙ্গে ব্যবস্থা হয়েছে। টিফিন ক্যারিয়ারে একবেলার খাবার দিয়ে যাচ্ছে। দুপুরে নিজে নিয়ে শ্বশুরমশাই খেয়ে নিচ্ছেন। তবে সে-খাবার তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়। সুপর্ণা বাড়ি ফিরলেই অভিযোগ শুনতে হচ্ছে। নুন, ঝালের অভিযোগ। নির্মলও চাইছে না, এটা বেশিদিন চলতে থাকুক। কিন্তু উপায় কী? তা ছাড়া শুধু তো রান্না নয়, বাকি কাজও তো আছে। বাসন ধোওয়া থেকে ঘর ঝাড়পোঁছ, সবই তো পড়ে রইল। ফ্ল্যাটবাড়িতে হুট বলতে আলাদা আলাদা লোক নিয়ে নেওয়া যায় না। রাতে ফিরে এসে খানিকটা সামলাচ্ছিল সুপর্ণা, বেশিটাই পড়ে থাকছিল। সব মিলিয়ে একটা বিপর্যয়ের মতো।

সন্তোষপুরে বারবার টেলিফোন করে মাকে তাগাদা দিয়েছে সুপর্ণা— 'এখনও পেলে না? একটা কাজের লোক পেতে এত সময় লাগছে তোমার? সত্যি মা, তোমার বয়স হয়ে গেছে। বলেছি তো, এনি অ্যামাউন্ট। যা টাকা লাগে দেব। গুছিয়ে সব কাজ করবে। রাতদিনের একটা কাজের লোক না হলে এবার কিন্তু আমাকে চাকরি ছাড়তে হবে।'

মলিনাদেবী মেয়ের কাজের লোক নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে খুবই চিন্তিত ছিলেন। মাত্র সাত দিনে তিনি সতেরো জনের ইন্টারভিউ নিয়ে ফেলেছেন। কাউকেই পছন্দ হয়নি। মেয়ের বাড়িতে লোক দেওয়ার অনেক ঝামেলা। যাকে-তাকে পাঠিয়ে দিলে চলবে না। তিন মাস আগে নাতনি পুনেতে পড়তে চলে যাওয়ার পর, অত বড় ফ্ল্যাটে এখন লোক বলতে

মোটে তিন জন। মেয়ে, জামাই বেরিয়ে যাওয়ার পর বুড়ো শ্বশুর একা। তাঁর থাকা না-থাকা সমান। চোখে কম দেখেন। ইদানীং নাকি কানে শুনতেও অসুবিধে হচ্ছে। একটা কথা দু'বার বলতে হয়। সুতরাং সবার আগে খেয়াল রাখতে হবে, কাজের লোক যেন চোর-ডাকাত না হয়। বাপ রে, কাগজে রোজ যা-সব বের হয়। মলিনাদেবী তাই সাবধানে এগোতে লাগলেন। দিন তিনেক বাদে মেয়েকে অফিসেই ফোনে ধরলেন তিনি।

'একটা বাচ্চা মেয়ে পেয়েছি। বছর বারো বয়স। ওর মা আমাদের পাশের বাড়িতেই ঠিকে কাজ করে। ভয় নেই। চুরিচামারি করবে না। রাখবি সুপু?'

সুপর্ণা বিরক্ত হয়ে বলল, 'বাচ্চা দিয়ে কী হবে আমার? তাকে কাজ শেখানোর সময় কোথায়? তা ছাড়া বারো বছরের মেয়ে কী শিখবে? মা, উই নিড অ্যান এজেড পার্সন। একজন বয়স্ক কেউ। যে রান্না জানবে, সংসারের আর পাঁচটা কাজ জানবে। শ্বশুরমশাইকে দরকার হলে ওষুধটুকু এগিয়ে দিতে পারবে। ছোট মেয়ে এসব পারবে? ট্রেনিং-এর কোনও ব্যাপার নেই। রেডিমেড একজনকে দাও।'

'থাম তো। রেডিমেড রেডিমেড বলে চেঁচালেই তো হবে না। তুই যেরকম বলছিস, সেরকম পেতে গেলে কত মাইনে চাইবে বল তো?'

সুপর্ণা এবার রেগে গিয়ে বলল, 'এনি অ্যামাউন্ট। যত খুশি মাইনে হোক। টাকাপয়সা নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে বলেছি? তুমি শুধু খোঁজ করে পাঠিয়ে দাও।'

সেই খোঁজ অবশেষে পাওয়া গেছে। কাল রাতে অফিস থেকে ফেরবার পর পরই সুপর্ণা মায়ের ফোন পেল।

মলিনাদেবীর উত্তেজিত অথচ হাসি হাসি গলা।

'একজনকে পেয়েছি সুপু। ঠিক তোদের যেমন দরকার তেমন। ঘরের কাজ জানে সব। শুনলাম, নিরামিষ রান্নার হাত নাকি ভাল। তোর শ্বশুরমশাই তো আবার ওসব খেতে ভালবাসেন। বাটিচচ্চড়ি, ছেঁচকি, ধোঁকার ডালনা। উনি খুশি হবেন। মেয়েটা আজ এসেছিল। মেয়ে না বলে মহিলা বলাই ভাল। এই ধর প্রায় তোরই বয়সি। দু'-এক বছর এদিক-ওদিক হতে পারে। তবে আজকাল তো আর চেহারা দেখে মেয়েদের বয়স ধরা যায় না!'

'উফ মা, কাজের লোকের বয়সের এত ডিটেলস্ দিয়ে আমার কী হবে বলো তো! ছেলেমানুষ নয়, এটাই আসল কথা। বয়স বেশি মানে সংসার বুঝতে পারবে। আমি তো ওরকমই খুঁজছি।'

মেয়ের বাধাতে মলিনাদেবী বিন্দুমাত্র দমলেন না। তিনি বলেই চললেন, 'শুধু বয়স্ক নয়, দেখে তো মনে হল বেশ ভদ্র সভ্য। আজকাল অবশ্য মনে হয় এক, পরে দেখা যায় আসল ঘটনা অন্যরকম। তবে কথা বেশি বলে না। চুপচাপ ধরনের। কাজের লোক বেশি ট্যাকট্যাক করলে আমার অসহ্য লাগে।'

সুপর্ণা খুশি হয়ে বলল, 'তোমার অসহ্য লাগবার কী আছে মা? কাজ তো তোমার বাড়িতে করছে না, আমার বাড়িতে করবে। অসহ্য লাগলে আমাদের লাগবে। তা ছাড়া, এ-বাড়িতে ট্যাকট্যাক করবার মতো কে আছে? শ্বশুরমশাই তো নিজের মতো বই আর টিভি নিয়ে থাকেন। ঠিক সময় খাবার পেলেই সন্তুষ্ট। ওসব তুমি ভেবো না।'

মলিনাদেবীর সমস্যা হল, মেয়েকে টেলিফোন করলেই তিনি গল্প ফেঁদে বসবার ঢঙে কথা শুরু করেন। যে-কথা চট করে সেরে নেওয়া যায়, সে-কথা তিনি শুরু করতেই দীর্ঘক্ষণ লাগিয়ে দেন। আজও তাই করছেন। বললেন, 'তা অবশ্য ঠিকই বলেছিস। তোদের বাড়িতে আর এখন কথা বলবার তেমন লোক কই। মিমি চলে যাওয়ার পর তো বাড়ি ফাঁকা। এইটুকু মেয়েকে বাইরে পড়াতে পাঠাবার যে কী আছে, আমি বাবা বুঝি না। এই তো সে দিনও স্কুলে যাচ্ছিল। যাই হোক, ফাঁকা বাড়িতে আবার লোক দেওয়া বিপদের। আমি অবশ্য এই মহিলার ঠিকানা ফিকানা সব লিখে রেখেছি। বাইপাসের আশেপাশে কোথায় যেন থাকে বলল। ভেবেছি একদিন লোক পাঠিয়ে খবর নেব। সত্যি বলছে না মিথ্যে।'

'ওসব কথা এখন ছাড়ো তো মা, তোমার সবটাতেই ভয়। কালই তুমি পাঠিয়ে দাও। কাল থেকেই শুরু করুক। আজকাল এফিশিয়েন্ট কাজের লোক ফাঁকা বসে থাকে না। আমি এখন ছাড়ছি, এইমাত্র অফিস থেকে ফিরলাম। টায়ার্ড হয়ে আছি, তোমার সঙ্গে আর বকরবকর করতে পারছি না।'

সুপর্ণা চাইলেও, মলিনাদেবী টেলিফোন ছাড়তে চাইছেন না। বললেন, 'আহা, আগে ভাল করে শুনে নিবি তো। মাইনেটাইনের কথা তুই আবার আগ বাড়িয়ে বলতে যাস না। ক'দিন কাজটাজ দেখে তারপর বলবি। বললি একগাদা টাকা, তারপর দেখলি কাজে লবডঙ্কা। সেরকম হলে আমিই বলে দেব।'

সুপর্ণা তাড়াতাড়ি বলল, 'সে বিলক্ষণ। তবে দেখো দরাদরিতে বেঁকে না বসে।'

মলিনাদেবী টেলিফোন ছাড়বার আগে বললেন, 'একটা ভাল কথা সুপু, এই মেয়ের পেটে আবার বিদ্যে আছে।'

'বিদ্যে আছে!'

'হ্যাঁ রে, বলল ক্লাস এইট না নাইন অবধি পড়েছে। তোর শ্বশুরমশাইয়ের ওষুধের নামটাম পড়তে পারবে। মিথ্যেও হতে পারে। হলেই বা কী, ওকে দিয়ে তো আর তুই মেয়ে পড়াচ্ছিস না।'

নির্মল আসতেই সুপর্ণা খবরটা জানাল। নির্মল বলল, 'শুনে তো ভালই লাগছে। এখন দেখো শেষ পর্যন্ত করে কি না। করলেও বেশিদিন থাকবে না। যা কোয়ালিফিকেশন শুনছি, তাতে এ ধরনের লোক এক জায়গায় বেশিদিন থাকে না। বেশি টাকায় কাজ চেঞ্জ করে। তুমি মাইনে টাইনে নিয়ে বেশি বারগেন করতে যেয়ো না যেন। তোমার মাকেও বলে দিয়ো। উনি আবার বেশি কড়া হতে গিয়ে কেঁচিয়ে না ফেলেন।'

সুপর্ণা চোখ পাকিয়ে বলল, 'অ্যাই, আমার মায়ের নামে একটা কথাও বলবে না। এমন চমৎকার একটা লোক কে খুঁজে দিল শুনি!'

সেই 'চমৎকার লোক' এসে গেছে। সুপর্ণার অনেকটা নিশ্চিন্ত লাগছে। কাগজপত্র ব্যাগে ঢোকাতে ঢোকাতে সে দ্রুত কথা বলতে লাগল, 'নাম কী তোমার?'

'শান্তি। আপনি বউদি আমায় বাতাসির মা বলে ডাকবেন।'

ফাইল ওলটাতে ওলটাতে সুপর্ণা বলল, 'তোমার মেয়ের নাম বুঝি বাতাসি?'

'হ্যাঁ, বউদি। বড় মেয়ের নাম বাতাসি। আরও দুটো আছে।'

'বাঃ, তা হলে তোমার সংসার তো বেশ বড়ই দেখছি। তা বাতাসির মা, আজ থেকেই কাজ শুরু করে দাও। এ-বাড়িতে নিজের মতো করে কাজকর্ম সব বুঝে নিতে হবে। একটু দেখিয়েটেখিয়ে দিচ্ছি। ব্যস, এই পর্যন্ত। মায়ের কাছ থেকে সব শুনেছ তো?'

'হ্যাঁ, শুনেছি।' ঘরের একপাশে হাতের থলিটা রাখতে রাখতে বাতাসির মা বলল। সুপর্ণা আড়চোখে একবার সেদিকে তাকাল। মনে হচ্ছে, ভেতরে কিছু আছে। নিশ্চয় শাড়িটাড়ি নিয়ে এসেছে।

'আজ সকালে তেমন কিছু করতে হবে না তোমাকে। শুধু ঘরটরগুলো চিনে নাও। ওপাশে একটা ঝাড়ন আছে। পারলে বুক র‍্যাক, শোকেস, টেবিল একটু ঝেড়েটেড়ে রেখো। তবে জিনিস কিছু সরিয়ো না। তোমার দাদাবাবু রাগ করেন। এসো রান্নাঘরটা আগে দেখিয়ে দিই। তুমি গ্যাস জ্বালাতে পারো তো, বাতাসির মা?'

'হ্যাঁ বউদি। গ্যাসওভেন, কাপড় ধোওয়ার মেশিন, সব পারি। আগের বাড়িতে মশলা বাটার মেশিন ছিল। সেটাও আমি চালাতাম।'

'ভেরি গুড। তুমি মিক্সিও চালাতে জানো! তা হলে তো কোনও চিন্তাই রইল না। তবে সব কাজই সাবধানে করবে। অনেকটা সময় আমরা বাড়িতে থাকি না। চট করে কাউকে দরজা খুলে দেবে না। শ্বশুরমশাইকে বিকেলে চা করে দিয়ো। ক'টা দিন ফ্লাস্কের চা খেতে হয়েছে মানুষটাকে। ওনার সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমি এবার বেরিয়ে যাব। অলরেডি আমি লেট। বাকি কথা সন্ধেবেলা ফিরে এসে হবে।'

'একটা কথা ছিল বউদি।'

এতক্ষণ পর মহিলার দিকে ভাল করে তাকাল সুপর্ণা। তাকাতেই চমকে উঠল। মুখটা যেন চেনা লাগছে! আগে কোথাও দেখেছে নাকি? কালোর ওপর দেখতে খারাপ নয়। চটক না থাকলেও, আলগা একটা শ্রী আছে। দীর্ঘ অভাব-অনটনে এই ধরনের মেয়েরা সাধারণত সবরকম সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলে। এই মহিলা পুরোটা হারায়নি। তবে খুব ভাবলে মনে হচ্ছে, এই মুখ তার আগে যেন দেখা! কোথায় দেখেছে?

বাতাসির মা আবার বলল, 'একটা কথা ছিল বউদি।'

চমক ভেঙে সুপর্ণা বলল, 'বলো, কী কথা। মাইনের কথা তো? সে না হয় সন্ধেবেলা ফিরে এসে বলব।'

'না, মাইনের কথা নয়। বউদি, আমি কিন্তু রাতে বাড়ি চলে যাব। মাসিমাকে আমি বলেছি। মেয়েরা বাড়িতে থাকে। যাদবপুরের ওদিকটা ভাল নয়।'

সুপর্ণা খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে বলল, 'ঠিক আছে তাই যেয়ো। সকাল সকাল চলে আসতে পারবে তো? খুব সকালে আসতে হবে কিন্তু। আমাদের ব্রেকফাস্ট করতে হবে।'

'হ্যাঁ, পারব।'

সুপর্ণা আরও নিশ্চিত হল। না, বাতাসির মাকে সে অবশ্যই আগে কোথাও দেখেছে। কোথায় দেখেছে, জায়গাটা মনে পড়ছে না। মায়ের ওখানে? জিগ্যেস করবে? থাক, প্রথমদিন এ ধরনের কথা বললে সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। পরে কোনও সময় করা যাবে। তার আগে নিজে থেকে মনে পড়ে গেলে তো ভালই। অনেক সময় এরকম হয়, মানুষকে

চেনা লাগে, কিন্তু কিছুতেই মনে পড়ে না মানুষটা কে। একটা খচখচ করতে থাকে। করতেই থাকে।

অফিসে সারাক্ষণ এই খচখচ ভাবটা রয়ে গেল সুপর্ণার। একটা চাপা ধরনের অস্বস্তি। কাজে মন দিলেও চোখের সামনে মুখটা ভেসে উঠছে বারবার। এইসময় মোবাইলে নির্মলকে ধরল।

ফোন ধরেই নির্মল বলল, 'লোক এসেছে?' বিষয়টা নিয়ে সেও উদ্বিগ্ন।

'এসেছে। সকালে অফিসে বেরোনোর সময় এল।'

'কেমন বুঝলে?'

'ভালই তো মনে হল। কাজকর্ম সব জানে তো বলছে। বাবার ওষুধ, খাবারদাবার সব বলে দিলাম। আজকের দিনটা হোম সার্ভিস কন্টিনিউ করেছি। তুমি আজ ফেরবার সময় বাজার করে এনো। কাল থেকে ও-ই রান্না করবে। ক'দিন গেলে আরও বুঝব।'

'ভেরি গুড। টিকে গেলে ভাল।'

'একটা ঘটনা হয়েছে।'

নির্মল চিন্তিত গলায় বলল, 'এর মধ্যেই ঘটনা?'

'জানো, মেয়েটাকে কেমন চেনা চেনা লাগল।'

নির্মল বিরক্ত গলায় বলল, 'এটা আবার ঘটনা কী? চেনা চেনা লাগতেই পারে। হয়তো আগে কোথাও দেখেছিলে।'

'সেটাই তো সমস্যা। কোথায় দেখেছিলাম মনে করতে পারছি না। একটু আগে সন্তোষপুরে ফোন করেছিলাম। মাকে জিগ্যেস করলাম, ও বাড়িতে কখনও দেখেছি কি না, মা বলল, না, আগে আসেনি কোনওদিন। একটা আনইজি ফিলিংস হচ্ছে।'

'উফ ছাড়ো তো সুপর্ণা। তোমার যত্তসব পাগলামি। মনে করতে পারছ না তো পারছ না। এটা মাথা ঘামানোর মতো কোনও সাবজেক্ট হল? এরকম আমাদের কত হয়! তোমার হয় না? চেনা লাগলেও স্পট করা যায় না। রাস্তাঘাটে, অফিসে হরদম হচ্ছে। ফালতু জিনিস নিয়ে আননেসেসারি মাথা ঘামিয়ো না।'

সুপর্ণা ফোন ছেড়ে ভাবল, সত্যি, এটা নিয়ে ভাবনার কী আছে? একটা কাজের মহিলাকে চেনা চেনা লেগেছে বলে চিন্তিত হওয়া সত্যিই হাস্যকর একটা ব্যাপার। বিষয়টা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে ফাইল খুলে প্রজেক্ট রিপোর্টটা বের করল সুপর্ণা। রিপোর্ট অনেক বড়। এত বড় রিপোর্ট পড়ে শেষ করতে অনেক সময় লেগে যাবে। অর্থাৎ আজও বাড়ি ফিরতে দেরি।

চেষ্টা করলেও বিষয়টা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারল না সুপর্ণা। লাঞ্চ টাইমে মিসেস সান্যালকে ধোসা খেতে খেতে ঘটনাটা বলে ফেলল।

মিসেস সান্যাল হেসে বললেন, 'আচ্ছা এরকমও তো হতে পারে সুপর্ণা, তোমার ওই বাতাসা না বাতাসির মাকে আসলে তুমি চেনোই না। তোমার অন্য কোনও চেনা মহিলা হয়তো ওরকম দেখতে। হতে পারে না? তুমি যা বলছ তাতে তো মনে হচ্ছে, দ্যাট ওম্যান ইজ নট লাইক সো কলড্ মেডসারভেন্ট। আর পাঁচজন কাজের লোকের মতো নয়। একটা ভদ্র সভ্য, আমাদের ঘরের মতো ব্যাপার আছে। তা হলে সেটা হতেই পারে।'

সুপর্ণার যুক্তিটা খারাপ লাগল না। অনেক সময় দুটো মানুষকে অনেকটা একইরকম দেখতে হয়। পুরোটা একরকম নয়, খানিকটা। চোখটা বা চিবুকের কাছটা, অথবা তাকানোর কায়দা। হয়তো সেই কারণে অন্য কারও সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছে। কফির মগ নিয়ে নিজের ডেস্কে ফিরে এল সুপর্ণা। রাঁচিতে থাকার সময় এরকম একটা মজার ব্যাপার ছিল। নির্মলের অফিসের দু'জন পিয়নেরই ভুরু ছিল জোড়া। চট করে আলাদা করা যেত না। একজন কোনও দোষ করলেই বলত, 'হাম নেহি, উসনে কিয়া।' প্রথম প্রথম তো নির্মলরা মহা ঝামেলায় পড়ত। গলার আওয়াজ শুনে বুঝতে হত কোনটা কে। আচ্ছা, মহিলার গলার আওয়াজ শুনলে কিছু মনে পড়বে না? পড়তেও তো পারে।

সুপর্ণা অপারেটরকে বাড়ির লাইন ধরে দিতে বলল।

অনেকক্ষণ বেজে যাওয়ার পর শ্বশুরমশাই টেলিফোন তুললেন। ইদানীং এই একটা মুশকিল হয়েছে। শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে হলে বেশ জোরে বলতে হয়। অফিসে সবার মাঝখানে বসে জোরে কথা বলা যায় না। তবু সুপর্ণা যতটা সম্ভব চেঁচিয়ে বলল, 'বাবা, সব ঠিক আছে তো?'

বৃদ্ধ রাগরাগ গলায় বললেন, 'একেবারেই ঠিক নেই। কী লোক রেখেছ বউমা? চায়ে গাদাখানেক চিনি দিয়েছে। এখন আবার লুচি করতে রান্নাঘরে গেছে। আমি বলেছি, খবরদার, চারটের বেশি করবে না। বেশি কড়া ভাজার দরকার নেই। সঙ্গে কয়েকটা আলু ভেজে দাও। ভাজা আলুতে একটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ো।'

সুপর্ণা খুশি হল। বাতাসির মা শ্বশুরমশাইকে দেখছে। এটা অনেকখানি। টেলিফোন ছেড়ে সুপর্ণা ভাবল, এবার সত্যি সত্যি অফিসের কাজে মন দিতে হবে। চেনা-অচেনা নিয়ে পাগলামি করবার সময় নেই। যদি মনে পড়বার হয়, নিজে থেকেই পড়বে। না-পড়লেও কোনও ক্ষতি হবে না। মহিলার কাজ ভাল এটাই আসল। চেনা না অচেনা সেটা আসল নয়। মন স্থির করে সুপর্ণা রিপোর্টের পাতা ওলটাল। রিপোর্টে অজস্র ফাঁক। কাজের হিসেবের সঙ্গে টাকার হিসেব মেলেনি বহু জায়গায়। রিপোর্টগুলো দেখবার সময় এদিকে খুব খেয়াল রাখতে হয়। সামান্য চোখ এড়ালে অনেক টাকা এদিক-ওদিক হয়ে যাওয়ার ভয়। আরও একবার খুঁটিয়ে দেখে নোট লিখতে শুরু করল সুপর্ণা।

মনে পড়ল সন্ধেবেলা। বাড়ি ফেরার পথে। গাড়ি তখন বালিগঞ্জ ফাঁড়ির কাছে। ছবির মতো স্পষ্ট সব মনে পড়ে গেল সুপর্ণার। কত বছর আগের কথা? সাতাশ? আঠাশ? নাকি আরও বেশি? সুপর্ণার বিশ্বাস হচ্ছে না। ঠিক মনে পড়েছে তো? ভুলও তো হতে পারে। দেখতে হবে, এখনই দেখতে হবে। মনে-পড়া মুখটার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।

সে ড্রাইভারকে বলল, 'একটু তাড়াতাড়ি চালাও মহেশ। বাড়িতে একটা জরুরি কাজ আছে।'

বাতাসির মা দরজা খুলে বলল, 'বউদি এসে গেছেন? আসুন। চা বসাই?'

একদম সেই মেয়ে। সেই চাপা নাক, সেই পানপাতার মতো মুখ, সেই সামান্য ঘাড় কাত করে কথা বলা। শুধু বয়সটা বেড়ে গেছে।

শরীর কেঁপে উঠল। সোফার হাতল ধরে নিজেকে কোনওরকমে সামলাল সুপর্ণা।

রাতে চারটে রুটি খায় নির্মল। আজ আরও একটা নিল।

'বাঃ, রুটি তো বেশ নরম বানাতে পারে। সবজিটাও খারাপ করেনি। শুধু একটু ঝাল কম দিতে বলবে। বুঝলে সুপর্ণা, আমি দেখেছি, গরিব মানুষের ঝালের হাতটা একটু বেশির দিকে হয়। ঝালটা ঠিক মাপমতো দিতে পারে না। অথবা কে জানে, আগে যে-বাড়িতে কাজ করেছে, তারা বোধহয় বেশি ঝাল খেত। সেখান থেকেই ঝাল বেশি দেওয়ার অভ্যেস।'

কথা বলতে বলতে নির্মল স্ত্রীর দিকে তাকাল। সুপর্ণা মুখ নামিয়ে খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। মুখে তুলছে না।

'কী হল? খাচ্ছ না? আঃ সুপর্ণা, সব বিষয় নিয়ে বাড়াবাড়ি করাটা ছাড়বে? অনেক বয়স হয়েছে, ডোন্ট বি সিলি। এখন আর ছেলেমানুষি মানায় না। কী দেখতে কী দেখেছ, তাই নিয়ে মাথা খারাপ করছ? তুমি শিয়োর?'

সুপর্ণা মুখ নামিয়েই বলল, 'হ্যাঁ, আমি নিশ্চিত।'

'কী নিশ্চিত? এই মহিলা তোমার সঙ্গে স্কুলে পড়ত?'

'হ্যাঁ, পড়ত। আমাদের ক্লাসেই পড়ত। ক্লাস সেভেন না এইট পর্যন্ত শান্তিকে দেখেছি আমি। তারপর আর মনে নেই। তা ছাড়া ক্লাস নাইনের গোড়াতেই তো বাবার ট্রান্সফার হয়ে গেল। আমরা, ভাইবোন কলকাতায় এসে বড় স্কুলে ভরতি হলাম।'

'ভুল দেখেছ। কাকে দেখতে কাকে দেখেছ।' নির্মল বিরক্ত হয়ে বলল, 'দয়া করে এসব ভুল ভেবে এটিকে আবার তাড়িয়ো না। অনেক কষ্টে একজন জুটেছে। তাড়ালে নিজেই ঝামেলায় পড়ে যাবে।'

সুপর্ণা প্লেট সরিয়ে দিয়ে অন্যমনস্কভাবে বলল, 'একটা কালোমতো মেয়ে পেছনের দিকে বসে থাকত। কথাটথা কম বলত। কারও সঙ্গেই বেশি ভাবটাব ছিল না। আমার সঙ্গেও নয়। বেশিরভাগ সময়ই জামা আয়রন করা থাকত না। পিটি ক্লাসে যে-কেডস্‌টা পরত সেটার বুড়ো আঙুলের কাছটা ছিল ছেঁড়া। আমার খুব ভাল করেই মনে পড়ছে, সেই মেয়েটার নাম ছিল শান্তি। রোল নম্বরটা ঠিক মনে পড়ছে না। আর একটু ভাবলে হয়তো সেটাও মনে পড়বে।'

নির্মল চাপা গলায় হিসহিস করে উঠল, 'স্টপ ইট সুপর্ণা, প্লিজ স্টপ ইট। দয়া করে আর রোল নম্বর মনে করতে হবে না। অনেক হয়েছে, এনাফ ইজ এনাফ। এবার গল্পটা থামাও।'

সুপর্ণা ম্লান হেসে বলল, 'গল্প নয়, সত্যি বলছি। আমাদের এই নতুন ঝি একসময় আমার সঙ্গে স্কুলে পড়ত। ওয়ান্স আপন আ টাইম শি ওয়াজ মাই ক্লাসমেট।'

নির্মল ঝুঁকে পড়ে স্ত্রীর কাঁধে বাঁ হাতটা রাখল। শান্ত গলায় বলল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে তর্কের খাতিরে ধরে নিচ্ছি বাতাসির মা তোমার স্কুলের সহপাঠী ছিল। কিন্তু তা হলে তো তারও তোমাকে মনে পড়বার কথা। তুমি যেমন তাকে চিনতে পেরেছ, সেও তোমাকে চিনেছে। তাই না? তার পরেও তোমাকে বউদি বউদি করছে?'

সুপর্ণা অবাক হয়ে বলল, 'কী বলতে চাইছ তুমি? ঠিক বুঝতে পারছি না।'

নির্মল হেসে বলল, 'কিছুই বলতে চাইছি না ডার্লিং। শুধু বলতে চাইছি, এর থেকেই প্রমাণ হয়, তোমার ভুল হচ্ছে। লজিক তো তাই বলছে। বলছে না?'

'হয়তো চিনেও বলছে না। লজ্জা পাচ্ছে। যার বাড়িতে বাসন মাজতে ঘর মুছতে এসেছে, তাকে কখনও বলা যায়, আমি আপনার সঙ্গে পড়তাম।'

'ঠিক আছে, না হয় বলা যায় না, কিন্তু আচরণ? আচরণে তো কিছুটা আঁচ করতে। সেটা কি পেরেছ? পারোনি। পারোনি কারণ, হয় তুমি ভুল চিনেছ, নয় সে তোমাকে মনে করতে পারেনি। সুতরাং আপাতত বিষয়টা মুলতুবি রাখাই ভাল। কালকে বরং জিজ্ঞেস করে শিয়োর হওয়া যাবে।'

সুপর্ণা উঠে রেফ্রিজারেটর থেকে পুডিং বের করল। নির্মলকে প্লেটে দিতে দিতে বলল, 'যাঃ! তা কখনও করা যায়?'

নির্মল হেসে বলল, 'না, করা যায় না। আর দয়া করে করতে যেয়ো না। ভাববে পাগলের বাড়িতে এসে পড়েছি। ভেবে ভয় পেয়ে কাজ ছেড়ে পালাবে। তার থেকে বরং তুমি ছুটির দিনে স্পেশাল কয়েকটা রান্নার প্রিপারেশন শিখিয়ে দাও ওকে। এই ধরো মোচার চপ, পোস্তর বড়া। তারপর তোমার ওই ধনেপাতার আলুর দমটা। ইটস আ বিউটিফুল ডিশ। ও ভাল কথা সুপর্ণা, মিমির ঘরটা রোজ একটু পরিষ্কার করতে বোলো তো। সকালে দেখলাম, খাটের তলায় অনেক ধুলো হয়েছে। নাও পুডিং খাও। প্লিজ খাও।'

ইচ্ছে না করলেও খানিকটা পুডিং খেল সুপর্ণা। অনেকদিন পর রাতে ঘুমের ট্যাবলেট খেতে হল তাকে।

সকালে ঘুম ভাঙল টেলিফোনের আওয়াজে। পুনে থেকে মিমি ফোন করেছে। তার গলায় উদ্বেগ।

'মা, এনিথিং রং উইথ ইউ?'

সুপর্ণা ঘুম-জড়ানো গলায় হেসে বলল, 'নাথিং সোনা। নো প্রবলেম।'

'উফ বাঁচালে। বাবা কাল রাতে ফোন করে যা ঘাবড়ে দিয়েছিল। তুমি ঘুমের ওষুধ খেয়েছ শুনে আর ফোন করিনি, নইলে তখনই তোমাকে ধরতাম।'

সুপর্ণা রেগে গেল। নির্মলের কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। ছোট মেয়ে, পড়াশোনা করতে দূরে গেছে। তাকে এসব বলার কী মানে! অযথা চিন্তার মধ্যে ফেলা। নির্মলের এই একটা বড় দোষ। মেয়েকে সব বলা চাই। সুপর্ণা বলল, 'তোমার বাবাকে তো জানোই মিমি, সব বিষয়ে বেশি চিন্তা করে। কিছু হয়নি।'

'বাবা বলল, একজন নতুন কাজের মাসি নাকি জয়েন করেছে আমাদের বাড়িতে। অ্যান্ড দ্যাট লেডি ওয়াজ ইয়োর ক্লাসফ্রেন্ড। ইজ ইট কারেক্ট মা? সত্যি মা?'

এতটা যখন মেয়ে জেনে গেছে, বাকিটাও বলে দেওয়া ভাল। সমস্যাটা ওর কাছে পরিষ্কার হোক। সুপর্ণা বলল, 'এখন পর্যন্ত বিষয়টা সত্যি, না মিথ্যে, বলার জায়গায় আসেনি মিমি। আমাকে আর-একটু জানতে হবে। প্রথমে সত্যিই মনে হয়েছিল। তবে কাল রাতে ডিনারের সময় তোমার বাবা একটা লজিক দেখিয়েছে। লজিকটা খুব খারাপ নয়। সেটাতে আমি খানিকটা কনভিনসড্ হয়ে পড়েছি। যাক, ওসব কথা, তুমি কেমন আছ? পড়াশোনা কেমন চলছে?'

'ওমা, কেমন আছি তো পরশুদিনই বললাম! ভুলে গেলে নাকি? ঠিক আছে, আবার বলছি। তোমাদের ছেড়ে খুব খারাপ আছি। যাকে বলে ভেরি ব্যাড। আবার নতুন পড়াশোনা, আড্ডা, হস্টেল লাইফ নিয়ে দারুণ আছি। একেবারে ভেরি গুড বলতে পারো। সব মিলিয়ে গুড-ব্যাড আছি। হি হি। তোমার মেলে একটা লিস্ট পাঠিয়েছি, আজই দেখে নেবে। জিনিসগুলো কিনে রাখবে। ওর মধ্যে সব থেকে ইমপর্টান্ট হল মাটির দুল আর হারটা। আমাদের ইনস্টিটিউটে এবার রবীন্দ্রজয়ন্তী হবে। আমি ঠিক করেছি ওতে মাটির অর্নামেন্টস পরে গান গাইব। এখানে সবার চোখ কপালে উঠে যাবে। মনে থাকে যেন মা, সেরকম বুঝলে শান্তিনিকেতন থেকে আনিয়ে রাখতে হবে কিন্তু।'

সুপর্ণা হেসে বলল, 'আচ্ছা,আনিয়ে রাখব। তোমার কোর্স কীরকম এগোচ্ছে মিমি?'

মিমি হাসতে হাসতে বলল, 'এগোচ্ছে কী, একেবারেই হইহই করে ছুটছে। কাল থেকে আমাদের সফটওয়্যার প্রোগ্রামিং শুরু হয়ে গেল। ভেরি ইন্টারেস্টিং। বাই মা। আমার ক্লাসের টাইম হয়ে গেল। আশা করি, নেক্সট টাইমে বাড়ি গেলে তোমার ক্লাসফ্রেন্ডের সঙ্গে দেখা হবে। হি হি।'

সুপর্ণা হেসে ফেলে বলল, 'এবার কিন্তু চড় খাবে মিমি।'

ব্রাশ করতে করতে সুপর্ণার মনে হল, নির্মলের কথাটা উড়িয়ে দেবার মতো নয়। যার সঙ্গে এতগুলো বছর স্কুলে পড়াশোনা করেছে, সে চিনতে পারবে না! ঘটনা সত্যি হলে একটা জড়তা থাকত না? সে নিজেই অন্য কোনও মেয়ের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলছে। তার নামও হয়তো শান্তি ছিল। শান্তি এমন কিছু অভিনব নাম নয় যে, একজনেরই থাকতে হবে। মুখ ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসার পর সুপর্ণার নিজেকে বেশ হালকা লাগল। মনে হচ্ছে, একটা বিচ্ছিরি চিন্তা সে ঘাড় থেকে নামাতে পেরেছে।

নির্মল আজও বেরিয়েছে ভোরে। সুপর্ণাকে ঘুম থেকে তোলেনি। নিজেই চা বানিয়ে নিয়েছে। কাল রাতেই বলে রেখেছিল, আজ সে তার বসকে নিয়ে যাবে আসানসোল। রাতে থাকবে। দুর্গাপুর ঘুরে ফিরতে ফিরতে সেই কাল বিকেল।

সুপর্ণা ব্রেকফাস্ট তৈরি করছে। শ্বশুরমশাইকে দিয়ে, কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতে নিজেও খেয়ে নিল। ঠিক ছিল, বাতাসির মা আজ থেকেই শ্বশুরমশাইয়ের জন্য রান্না শুরু করবে। নির্মল কাল বাজার এনে রেখেছে। কিন্তু বাতাসির মা এখনও আসেনি। টুকটাক দু'-একটা ঘরের কাজ সেরে একসময় অফিসের জন্য তৈরি হতে উঠল সুপর্ণা। দ্বিতীয় দিনেই দেরি করবে কেন? তা হলে কি কাজ করবে না? নাকি চিনতে পেরে কাজ ছেড়ে দিল? যে-চিন্তা কিছুক্ষণ আগে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছিল সুপর্ণা, সেটাই যেন আবার ফিরে আসছে। মা'র ওখানে একবার ফোন করবে? হয়তো এতক্ষণে সেখানে গিয়ে বলে এসেছে। থাক, দরকার নেই, না এলেই ভাল। একে না রাখাই উচিত। হয়তো দেখলে আবার আজেবাজে সব মনে হবে। আজ না-হোক, কাল আর একজনকে পাওয়া যাবে। টাকা খরচ করলে সব পাওয়া যায়। কাজের লোকও পাওয়া যাবে। সুপর্ণা টেলিফোন তুলে হোম সার্ভিসের নম্বর টিপল। বলল, 'নিন, আমার শ্বশুরমশাইয়ের

লাঞ্চের অর্ডারটা লিখে নিন। কাল গাদার মাছ দিয়েছিলেন কেন? বুড়ো মানুষ, কাঁটা বাছতে অসুবিধে হয়েছে...।'

অফিসের ব্যাগ গোছাতে গোছাতে সুপর্ণার মনে হল, বাতাসির মা না-আসায়, সে একই সঙ্গে খুশি এবং বিরক্ত। খুশি হওয়ার কারণ বুঝতে পারলেও, বিরক্তির কারণ সে বুঝতে পারছে না।

বেরোনোর মুখে বেল বাজল।

দরজা খুলতেই মুখ কাঁচুমাচু করে বাতাসির মা বলল, 'দেরি হয়ে গেল বউদি। মেয়েটার খুব জ্বর। বমি করছিল।'

কাজের লোকের সাজগোজ খেয়াল করবার সময় বা ইচ্ছে দুটোর কোনওটাই সুপর্ণার নেই। তবু আজ সে খেয়াল করল। শান্তি পরেছে বেগুনি রঙের শাড়ি, তাতে লাল পাড়। ব্লাউজের রং বেগুনি বা লাল কোনওটাই নয়। হালকা সবুজ। এমনি সবুজ নয়, রংচটা সবুজ। কপালে একটা ছোট্ট টিপ। মনে হয় কালো। অন্য কোনও ঘন রংও হতে পারে। হাতে, গলায় কিছুই নেই। তবে কানে দুলের মতো একটা কী যেন রয়েছে। সে জিনিস এত ছোট যে, চোখে পড়ে না। চোখে রাত জাগার ক্লান্তি।

সুপর্ণার মাথায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল সে। তারপর দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'দেখো বাতাসির মা, কাজের লোকদের সঙ্গে ঝগড়া করবার মতো রুচি বা সময় আমার নেই। গোড়াতেই একটা জিনিস ঠিক করে দেওয়া ভাল। মাইনে যেমন চাইবে, তেমনই পাবে। আমি কোনও দরাদরিতে যাব না। কিন্তু মেয়ের জ্বর ছেলের পা মচকে যাওয়ার কথা আমাকে শোনাবে না। কাজে ঠিক সময় আসতে হবে, ঠিকমতো কাজ করতে হবে। সেটা যদি পারো করবে, না পারলে আমার এখানে কাজ না-করাই ভাল। দ্বিতীয় দিনেই কড়া কথা বলতে হল বলে খারাপ লাগছে। আমার কিছু করার নেই। তাড়াহুড়োর কিছু নেই, তুমি সন্ধে পর্যন্ত ভাবো। অফিস থেকে ফিরে এলে আমাকে জানাবে। যদি তার আগে চলে যেতে চাও, তাও যেতে পারো। যাওয়ার আগে শ্বশুরমশাইকে বলে দেবে উনি যেন দরজাটা আটকে দেন। চিন্তা কোরো না, আমি তোমার দু'দিনের মাইনে হিসেব করে সন্তোষপুরে মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেব।'

অফিসে পৌঁছোনোর কিছুক্ষণের মধ্যেই সুপর্ণা দুর্দান্ত খবরটা পেল। জোনাল ডিরেক্টর নিজে ডেকে তাকে খবরটা দিলেন। তার প্রমোশন হয়েছে। আজ থেকেই আলাদা ঘর। অফিসের গাড়ি। মাসে একবার করে প্লেনে চেপে মুম্বই যেতে হবে হেড অফিসে মিটিং করতে।

সুপর্ণা দারুণ খুশি হল। এত খুশি যে, নির্মলের মোবাইল নম্বরটাই ভুল টিপে বসল। ওপাশ থেকে গম্ভীর গলায় কে যেন বলল, 'কৌন হ্যায় জি? কিসকো চাইয়ে জি?' বলার ধরন শুনে সুপর্ণা হেসে ফেলল।

নির্মলকে ধরার পরও সুপর্ণার সেই হাসি থামেনি। নির্মল বলল, 'অ্যাই হাসছ কেন? আঃ, বসের পাশে বসে আছি। হাসি থামিয়ে তাড়াতাড়ি বলো। এনি প্রবলেম?'

'নো প্রবলেম। একটা গুড নিউজ আছে জি। ভেরি গুড নিউজ জি।'

প্রমোশনের কথা শুনে নির্মল বলল, 'ইস, এখুনি কলকাতায় ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সেটা তো সম্ভব নয়। কাল বিকেলের আগে কিছুতেই ফিরতে পারছি না। মেনি মেনি কনগ্র্যাচুলেশন সুপর্ণা। আই অ্যাম প্রাউড অব ইউ।'

নির্মলের পর সুখবরটা মাকে জানাল সুপর্ণা। মলিনাদেবীর এই একটা গোলমাল। ছেলেমেয়েদের একটা কিছু ভাল হলেই হল। অমনি ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলবেন। আজও ফেললেন। বললেন, 'সুপু, আজ যদি তোর বাবা বেঁচে থাকতেন...।'

মিমিকে এখন ধরা যাবে না। সে এখন ক্লাসে। মোবাইল বন্ধ করা আছে। সুপর্ণা মেয়েকে এস এম এস পাঠাল— 'ছোট্ট মিমির মা এখন মস্ত অফিসার।' মিমি মোবাইল খুললেই মেসেজ পেয়ে যাবে। পেয়ে নিশ্চয় লাফিয়ে উঠবে।

লাঞ্চের পর নিজের ঘরে এসে বসেছে সুপর্ণা। ঘর সুন্দর। জানলায় বড় বড় পরদা। এসি মেশিনের চাপা আওয়াজ। শুধু নতুন চেয়ারে একটু অসুবিধে হচ্ছে। ক'দিনে ঠিক হয়ে যাবে। অফিসের প্রায় সকলেই এসে অভিনন্দন জানিয়ে যাচ্ছে। মিসেস সান্যাল বললেন, 'যাক, আজ থেকে আর সুপর্ণা বলা যাবে না। ম্যাডাম বলতে হবে!' সুপর্ণা হাত জড়িয়ে ধরে বলল, 'যাঃ কী যে বলেন।' তপতী বলল, 'ওসব জানি না, বাইরে ডিনার খাওয়াতে হবে।' অজন্তা ন্যাকা ন্যাকা গলায় বলল, 'বয়ে গেছে বাইরে খেতে। সুপর্ণাদি, বাড়িতে নেমন্তন্ন করতে হবে কিন্তু। কর্তা আর ছেলেকে নিয়ে যাব। তুমি এখন বস। বসের বাড়িতে নেমন্তন্ন খাওয়ার মজাই আলাদা।'

এতক্ষণ বাড়ির কথা মাথা থেকে উবে গিয়েছিল। মনে পড়ল অজন্তার কথা শোনার পর। বাতাসির মা আছে, না চলে গেছে? নিশ্চয় চলে গেছে। চেনা-অচেনা যা-ই হোক ওরকম কথার পর থাকাটা খুবই অপমানের। বাড়িতে একটা ফোন করে দেখলে কেমন হয়? এখন তো নিজের ঘর। জোরে কথা বললে কোনও অসুবিধে নেই। ঘর ফাঁকা হোক।

ঘর ফাঁকা হতে বিকেল গড়িয়ে গেল। এখন নিজের টেবিলে দুটো ফোন। তবু পুরনো অভ্যেসে সুপর্ণা অপারেটরের কাছে বাড়ির লাইন চাইল।

'সব ঠিক আছে তো বাবা?'

বৃদ্ধ চাপা গলায় বললেন, 'না, সব ঠিক নেই। তোমার এই কাজের লোক অতসী না বাতাসি, তার কিন্তু গোলমাল আছে বউমা।'

সুপর্ণা চিন্তিত হয়ে বলল, 'কেন, কী হল? গোলমাল কীসের? সে এখনও আছে?'

'আছে মানে? খুব ভাল করেই আছে। একটু আগে দেখলাম, রান্নাঘর থেকে কী যেন এনে নিজের ব্যাগটায় পুরছে। লক্ষ করে দেখি, একটা বেগুন আর ক'টা আলু রয়েছে হাতে।'

সুপর্ণা এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর থমথমে গলায় বলল, 'আপনাকে চা করে দিয়েছে?'

'দিয়েছে। চা দিয়েছে, চায়ের সঙ্গে সুজি দিয়েছে। আজও চায়ে চিনি বেশি। তবে সুজি ভাল হয়েছে। কিশমিশ ছিল। কাল বলেছে মোচার চপ করে খাওয়াবে। আমি বলেছি, কোরো, তবে ওতে কিশমিশ দিয়ো না।'

ফোন ছেড়ে দেওয়ার পর, চুপ করে বসে রইল সুপর্ণা। এরকম একটা আনন্দের দিনে হঠাৎ করেই মনটা যেন খারাপ হয়ে গেল। কাজের লোক একটু-আধটু চুরি করবে। এতে মন খারাপ

করার কিছু নেই। তবু হল। কেন হল? সে কি ভেবেছিল, বাড়িতে ফোন করে শুনবে, অপমানিত বাতাসির মা কাজ ছেড়ে চলে গেছে? তা হলে খুশি হত সে? কেন খুশি হত?

সুপর্ণার মন খারাপ বাড়তেই লাগল।

মন খারাপের মধ্যেই সুপর্ণা কম্পিউটার চালু করে মিমির মেল খুলল। এ ঘরের কম্পিউটারটা দেখতে আরও সুন্দর। মেশিন, কী বোর্ড, মাউস, এমনকী মাউস প্যাডটাও কালো। একেবারে জেড ব্ল্যাক। কালো রং এত সুন্দর হয়!

মিমির তালিকা লম্বা। হাবিজাবি অনেক জিনিসের কথা লিখেছে। শেষে পাঁচটা বইয়ের নাম। পাশে স্টার দেওয়া। খুব জরুরি হলে মিমি পাশে স্টার দেয়। এর মধ্যে প্রথম চারটে সফটওয়্যার বিষয়ক বই, শেষেরটা গীতবিতান। একটা নিয়ে গেছে, আবার একটা চায়। নিশ্চয় কাউকে দেবে। পাগল মেয়ে।

বাড়ি ফেরার সময় একটা ভয়ংকর সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সুপর্ণা।

অফিস থেকে ফিরে গা না-ধুয়ে সুপর্ণা কিছু করতে পারে না। আজও ধুল। তারপর ড্রইংরুমে বসে শান্তভাবে সুজি খেল। চা খেল। মুখ তুলে বলল, 'বাঃ, বেশ হয়েছে তো। এত সুন্দর সুজি করতে তুমি কোথা থেকে শিখলে বাতাসির মা? আগে যে-বাড়িতে কাজ করতে সেখান থেকে?'

বাতাসির মা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মাথা নামিয়ে। প্রশংসা শুনে সে বোধহয় লজ্জা পেয়েছে। নিচু গলায় বলল, 'বউদি, আমি জানি। সুজি জানি, গাজরের হালুয়াও জানি। বলেন তো একদিন করতে পারি।'

সুপর্ণা অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে ভুরু তুলে বলল, 'বাঃ গাজরের হালুয়াও জানো! তোমার দাদাবাবু গাজরের হালুয়া খেতে খুব ভালবাসে। আমি বাবা অতসব পারি না। তা ছাড়া, সময় কোথায়? দেখছই তো, অফিসের কাজেই পাগল পাগল অবস্থা। যাক বাতাসির মা, আমি একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমাকে আর এখানে কাজ করতে হবে না। আমি তোমাকে রাখছি না। কাল থেকে আর আসতে হবে না। এখনও তোমার মাইনে ঠিক হয়নি। তবু আমি এই একশো টাকাটা দিচ্ছি। জানি দু'দিনের কাজের পক্ষে এই টাকা বেশি। তাও রাখো।'

মহিলা মুখ তুলে তাকাল। তার চোখে কি বিস্ময়? নাকি রাগ? সুপর্ণার খুব ইচ্ছে করছে তাকিয়ে দেখে। পারল না। মুখ নামিয়ে নিল। টেবিল থেকে একটা পত্রিকা তুলে 'কিছু ঘটেনি' ভঙ্গিতে পাতা ওলটাতে ওলটাতে বলল, 'যাও, আর রাত কোরো না। অসুস্থ মেয়ে বাড়িতে আছে। যাওয়ার আগে এই কাপ-প্লেটগুলো ধুয়ে দিয়ে যেয়ো। আর ও হ্যাঁ, শোনো বাতাসির মা, রান্নাঘর থেকে তুমি নাকি বেগুন আর আলুটালু কী সব নিয়েছ? জানি না সত্যি নিয়েছ কি না, যদি সত্যি নিয়ে থাকো, তা হলে ওগুলো রেখে দিয়ে যেয়ো। তোমার দাদাবাবু আবার রাতে বেগুনভাজা ছাড়া রুটি খেতে পারে না। কী ছেলেমানুষের মতো স্বভাব বলো তো!'

রাতে মিমি তার 'মস্ত অফিসার' মাকে ফোন করে অবাক হয়ে গেল।

'মা, তুমি কি কাঁদছ?'

সুপর্ণা ইচ্ছে করলে মিথ্যে বলতে পারত। সে তা করল না। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'হ্যাঁ রে সোনা, আমি কাঁদছি।'

মায়ের কাছ থেকে ঠিকানা নিয়ে বাড়ি খুঁজে বের করতে অসুবিধে হল। বাইপাস থেকে অনেক ভেতরে। এসব জায়গায় ঠিকানা থাকা না-থাকা সমান। তা ছাড়া, গাড়ি রাখতে হয়েছে দূরে। ড্রাইভার বলল, এই সরু পথে গাড়ি ঢুকবে না। তার ওপর আবার কাদা। এই সন্ধেবেলা চাকা ফেঁসে গেলে কেলেঙ্কারি। মহেশ হলেও একটা কথা ছিল, অফিসের গাড়ি, চট করে কিছু বলা যায় না। সুপর্ণা নেমে পড়ল।

কিছুটা হেঁটে, একে ওকে জিজ্ঞেস করে একটা টিনের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সুপর্ণা। বিচ্ছিরি অন্ধকার। এখানে কি আলো আসেনি? নাকি লোডশেডিং? একটা টর্চ আনলে ঠিক হত।

সুপর্ণা দু'বার দরজায় টোকা দিল, তারপর ফিসফিস করে ডাকল, 'শান্তি, শান্তি।'

দরজা খুলল বাতাসির মা। তার হাতে একটা হ্যারিকেন। চিমনিতে কালি পড়ে আলোটা কেমন ছায়া ছায়া। সেই আলো-ছায়া পড়েছে বাতাসির মায়ের মুখে। বেশ লাগছে। ছবির মতো। সামান্য হেসে সে বলল, 'আয়, সুপর্ণা, ভেতরে আয়। মেয়েটার আজও খুব জ্বর।'

দেশ ১৭ মে, ২০০৫

কথা

অর্কর বাঁ দিকের বুকের কাছটা কেঁপে উঠল। প্রথমে অল্প, তারপর মাঝারি ধরনের দু'বার ঝাঁকুনি দিয়ে থমকে দাঁড়াল। অর্ক বুকে হাত দিয়ে মুখ তুলে তাকাল। কেউ বুঝতে পারেনি তো? পারলে সর্বনাশ। তবে মনে হয় না পেরেছে। সারি সারি টেবিলে কাজ চলছে নিঃশব্দে।

ছাব্বিশ বছরের তরতাজা যুবকের বুক কাঁপা ভাল লক্ষণ নয়। দুশ্চিন্তা হয়। হার্টের কিছু হল না তো? তবে অর্কর দুশ্চিন্তা হল না, তার হল বিরক্তি। বিরক্তিতে তার ভুরু দুটো কুঁচকে গেল। কারণ, এই কম্পন হার্টের নয়, কম্পন তার মোবাইল ফোনের। শার্টের পকেটে ফোন রাখা আছে ভাইব্রেট মোডে। ফোন এলে আওয়াজ হয় না, শুধু কাঁপে। এই সময় কেঁপে ওঠার অর্থ উৎসা তাকে ফোন করছে। এখন একবার করে থেমেছে, উত্তর না দিলে বারবার করতে থাকবে। এটাই তার স্বভাব। জবাব না পাওয়া পর্যন্ত ঘনঘন ফোন করে। মনে হয়, বড় ধরনের কোনও বিপদে পড়েছে।

অথচ আজও অর্ক বেরোনোর সময় স্ত্রীকে পইপই করে বলে এসেছিল, 'আমাকে ফোন করবে না, উৎসা।'

উৎসা সোফায় পা গুটিয়ে বসে পত্রিকা পড়ছিল। সাজগোজের পত্রিকা। বিয়ের পর থেকে গত সাত মাস প্রতিদিন সকালেই সে অনেকটা সময় মনোযোগ দিয়ে সাজগোজের পত্রিকা পড়ে। এক-এক দিন এক-একটা বিষয়। কোনওদিন চুল, কোনওদিন হাত, কোনওদিন ঠোঁট। আজ পড়ছিল চোখের পাতা। চোখের পাতা কীভাবে দীর্ঘক্ষণ ভেজা ভেজা রাখা যায় তার পরামর্শ। যিনি পরামর্শ দিয়েছেন তিনি রসিকমানুষ। লেখার শুরুতেই বলেছেন, 'মেয়েদের চোখ ভেজা রাখার সহজ ও শর্টকাট উপায় হল কান্না। কাঁদলে আপনার চোখ থাকবে গভীর, নরম আর মায়াময়। মনে রাখবেন, লজ্জা যেমন নারীর ভূষণ, কান্না তেমন নারী-চোখের অলংকার। এই সহজ কাজটাও যাঁরা পারবেন না তাঁদের জন্য বলি...।'

স্বামীর কথা শুনে উৎসা পত্রিকা থেকে মুখ তুলে বলল, 'কেন? ফোন করব না কেন?'

অর্ক শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে বলল, 'আমাদের ওখানে মোবাইল অ্যালাউড নয়। বাইরে জমা রেখে ঢুকতে হয়।'

উৎসা ফিক করে হেসে বলল, 'কেন, অ্যালাউড নয় কেন? ওটা কি স্কুল?'

রেগে যেতে গিয়েও অর্ক নিজেকে সামলায়। বিয়ের এত অল্প দিনের মধ্যে স্ত্রীর ওপর রেগে যাওয়া ঠিক নয়। তবে বেশি দিন পরেও সে উৎসার ওপর রাগতে পারবে না। কারণ, উৎসা শুধু সুন্দরী নয়, সে একজন নরম স্বভাবের মেয়ে। নরম স্বভাবের মেয়ের ওপর রাগ

করা কঠিন। অর্ক শান্ত গলায় বলল, 'না, স্কুল নয় উৎসা, ল্যাবরেটরি। আর সেই ল্যাবরেটরিতে আমাদের কাজ হল শব্দ নিয়ে। সাউন্ড। এই সময় বাইরের অন্য সাউন্ড ঠিক নয়। তোমাকে তো কথাটা বলেছি।'

রাত্রিবাসের ওপর ড্রেসিংগাউন জড়িয়ে আছে উৎসা। ভারী সুন্দর গাউন। এই ধরনের সুন্দর পোশাকের মজা হল, এরা যেমন শরীর ঢাকতে পারে, তেমন দেখাতেও পারে। সরাসরি দেখায় না, ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দেয়। উৎসার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। তার মেদহীন পাতলা শরীরের সব ক'টা চড়াই-উতরাই বোঝা যাচ্ছে। অর্ক চোখ সরিয়ে নিল। এই শরীর তাকে যে কত বার বিপদে ফেলেছে। ইতিমধ্যেই তার তিন দিন লেট হয়ে গেছে। অফিসের গাড়ি এসে নীচে হর্ন বাজিয়েছে, তবু অর্ক জুতো টাই খুলেছে। স্বামীর আদরে উৎসা কখনও 'না' বলে না। তবে জুতো টাই পরে খাটে উঠতে দেবে না কিছুতেই।

উৎসা একটা হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল। বলল, 'কাল তো আমার ফোন ধরেছিলে, আজ কেন পারবে না?'

'কাল আমি একটা অন্যায় কাজ করেছিলাম উৎসা। মোবাইলটাকে লুকিয়ে শার্টের পকেটে রেখেছিলাম। ভাইব্রেট মোডে। তুমি কল করতে বেরিয়ে বাথরুমে চলে যাই।'

উৎসা হিরের মতো উজ্জ্বল দাঁতের সারি সাজিয়ে হাসল। বলল, 'আজও তাই করবে। বাথরুমে চলে যাবে। তারপর আমরা দু'জনে গল্প করব। খুব ইন্টারেস্টিং হবে। আমি বেডরুমে তুমি বাথরুমে। বেডরুম টু বাথরুম কথা হবে।'

উৎসার এই উচ্ছলতা চমৎকার। অর্কর কানে বাজে সারাক্ষণ। এমনকী রাতে ঘুমের মধ্যেও বাজে। তবু অর্ক গম্ভীর হওয়ার ভান করল। বলল, 'অন্যায় কাজ রোজ করা যায় না।'

উৎসা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে আদুরে গলায় বলল, 'আমার সঙ্গে গল্প করাটা তুমি অন্যায় কাজ বলছ?'

অর্ক হাত ছড়িয়ে বলল, 'উফ, গল্প করাটা অন্যায় বলিনি, ল্যাবরেটরিতে মোবাইল নিয়ে ঢোকাটাকে অনায় বলেছি। তা ছাড়া ওখানে যে-কোনও ধরনের সাউন্ড ওয়েভ চট করে ধরা পড়ে যায়। আমার মোবাইলের ভাইব্রেশনই বলো, তোমার কথাই বলো। কথা ধরার মেশিন আছে আমাদের।'

উৎসা তার বড় বড় ছেলেমানুষি চোখ দুটো আরও বড় করে বলল, 'কথা ধরা! তোমরা কি ফোন ট্যাপ করো? বাপ রে!'

অর্ক হেসে ফেলল। বলল, 'না, না, ফোন ট্যাপ করব কেন? আমাদের কাজটা তার থেকেও অনেক কমপ্লিকেটেড, জটিল। জট পাকানো কথার জট খুলি আমরা।'

উৎসা কৌতুকভরা চোখে বলল, 'ওমা! হাউ ফানি! সে আবার কী! কথা আবার জট পাকায় কী গো? কথা কি মাথার চুল, যে সাবান, শ্যাম্পু দিয়ে জট ছাড়াবে?'

নীচ থেকে গাড়ির হর্ন ভেসে আসে। অফিসের গাড়ি একটা বিচ্ছিরি জিনিস। তার সময়ে চলতে হয়। অর্কর মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে অফিসের গাড়ি বাদ দিয়ে নিজের গাড়ি নিয়ে বেরোয়। সেটা সম্ভব নয়। বিয়ের পর থেকে ওই গাড়ি উৎসার। তার বাপের বাড়ি, শপিং মল, বান্ধবীদের সঙ্গে সিনেমা যাওয়া আছে।

তবে প্রোগ্রাম আগে থেকে কিছু ঠিক থাকে না। উৎসার মতে হুটহাট বেরোনোয় আসল মজা। শপিংও তখন অ্যাডভেঞ্চারের মতো মনে হয়। অর্ক দ্রুত হাতে জুতোর ফিতে বাঁধতে বাঁধতে বলে, 'জটের গল্প তোমাকে ফিরে এসে বুঝিয়ে বলব উৎসা। এখন চলি, গাড়ি ডাকছে। আজ আর ফোন কোরো না ডার্লিং। আমি কিন্তু ফোন নিয়ে ল্যাবে ঢুকছি না, এ বলে গেলাম।'

কিছু মেয়ের সৌন্দর্য হয় নদীর মতো তরতরে। কিছু মেয়ের সৌন্দর্য দিঘির মতো শান্ত। উৎসার সৌন্দর্য হল সমুদ্রের সৌন্দর্য। সে শরীরে নানা ধরনের ঢেউ তুলতে জানে। এখনও তুলল। বুকে পেটে তরঙ্গ তুলে উঠে দাঁড়াল। স্বামীর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হেসে বলল, 'ফ্ল্যাটে একা থাকি। দুপুরে যদি দস্যু আসে? এসে আমাকে মুখ বেঁধে... হি হি। তা হলেও ফোন করব না?'

অর্ক ভেবেছিল, সত্যি মোবাইলটা বাইরে জমা রেখে ল্যাবরেটরিতে ঢুকবে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে উৎসার কল্পিত 'দস্যু'র কথা মনে পড়ে গেল। ছেলেমানুষির মনে পড়া। তবু পড়ল। বিয়ের পর পর ছেলেমানুষি বেশ লাগে। সে ভাইব্রেট মোড চালু করে মোবাইল লুকোল বুক পকেটে। অ্যাপ্রন পরল। শুধু অ্যাপ্রন নয়, এখানে হাতে রবারের স্বচ্ছ গ্লাভস পরতে হয়। নাক, মুখ ঢাকতে হয় কাপড়ে। মাথায় টুপির মতো প্লাস্টিক কভার। হঠাৎ দেখলে মনে হবে অপারেশন থিয়েটারের সার্জেন। ঘটনা যদিও তা নয়। ঘরের টেবিলগুলোতে নানা ধরনের আধুনিক আর জটিল যন্ত্রপাতি সাজানো। ল্যাপটপ, সাউন্ড বক্স, হেড ফোন, সাউন্ড এডিটিং সিস্টেম থেকে শুরু করে অচেনা, অজানা অনেক কিছু। প্রথম দিন এসে অর্কর মতো ছেলেও ঘাবড়ে গিয়েছিল।

শুধু যন্ত্র নয়, কাজও ঘাবড়ে দেওয়ার মতো। গত মাসে কোম্পানির নতুন রিসার্চ উইং-এ যখন তাকে বদলি করা হয়, অর্ক বেশ অবাকই হয়েছিল। প্রফেসর সোহম তালুকদার তাকে অ্যাসাইনমেন্ট বুঝিয়ে বললেন। অর্ক অবাক হয়ে বলল, 'বলেন কী স্যর! এরকমও হয়!'

প্রফেসর তালুকদার মৃদু হেসে বললেন, 'আগে হত না। সমস্যাটা ছিল শুধু বিদেশের। এখন আমাদের এখানেও হচ্ছে।'

সোহম তালুকদার শিক্ষিত মানুষ। বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু বছর পড়ে এবং পড়িয়ে দেশে ফিরেছেন। শব্দের প্রকৃতি এবং রহস্য নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে তাঁর। এখানে এসে উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দিয়েছেন নামকরা কর্পোরেট হাউসে। তারাও মাথায় করে রেখেছে। তাঁর কথা মতো বিপুল খরচ করে ল্যাবরেটরি তৈরি করে দিয়েছে।

অর্ক অবাক গলায় বলল, 'এখানে কেন এই সমস্যা শুরু হল স্যার?'

সোহম তালুকদার বললেন, 'কেন হল এখনও ধরা যায়নি। ধরার চেষ্টা চলছে। সম্ভবত কথা বেড়ে যাওয়ার কারণে এই সমস্যা।'

'কথা বেড়ে গেছে!'

পক্ককেশের সৌম্যদর্শন সোহম অল্প হাসলেন। বললেন, 'বাঃ, বাড়েনি? পথে, বাসে, ট্রামে, গাড়িতে, বাড়িতে দেখছি শুধু কথা আর কথা। হাতে হাতে মোবাইল। বিরামহীন, অন্তহীন কথা চলছে তো চলছেই। যদি গোনা যেত তা হলে হয়তো দেখতে সেকেন্ডে কথার

সংখ্যা কয়েক কোটি ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ক'বছর আগেও এই দৃশ্য দেখা যেত না। বাতাসের যে তরঙ্গগুলো দিয়ে কথারা যাতায়াত করছে তাদেরও তো একটা ক্ষমতা আছে। খুব সহজ ভাবেই ধরো না, একটা রাস্তায় যদি হঠাৎ গাড়ির সংখ্যা বেড়ে যায়, তখন তো ট্রাফিক জ্যাম হবেই। এখানেও তাই হচ্ছে। কথারা জট পাকিয়ে যাচ্ছে। আমরা এ প্রান্তে যা বলছি, সবটা অন্য প্রান্তে যাচ্ছে না। মাঝখানে জট পাকিয়ে থাকছে।'

'জট পাকিয়ে থাকছে!' অর্কর বিস্ময় বাড়তে থাকে।

'থাকবে না? একটা ওয়েভ, আর একটার ঘাড়ে চেপে বসেছে। আমরা বাইরে থেকে বুঝতে পারছি না। যে শুনছে সে ভাবছে সবটাই শুনলাম, আবার উলটো দিকেও এক কাণ্ড। যে বলছে, সে-ও ভাবছে সবটা বলতে পেরেছি। মাঝপথের খবর কে রাখে? আমাদের চেষ্টা হবে মাঝপথের এই জটগুলো খুঁজে বের করা এবং সেগুলো খোলা।'

অর্ক খানিকটা ঘোরের মধ্যে বলে, 'এটা কি সম্ভব স্যর?'

'জানি না, তবে চেষ্টা করতে হবে। প্রথম পর্যায় আমরা অ্যান্টেনা দিয়ে জট পাকানো শব্দ তরঙ্গগুলোকে ধরতে চেষ্টা করব। সেগুলো আলাদা করে আবার ছেড়ে দেওয়া যায় কি না, সেটা পরের চিন্তা। আগে তো জট ছাড়াই।'

অর্ক নিজের মনেই বলল, 'ইন্টারেস্টিং। হাইলি ইন্টারেস্টিং।'

প্রফেসর তালুকদার বললেন, 'পৃথিবীর অনেক দেশেই এটা নিয়ে কাজ চলছে। এখানে এটাই প্রথম। যেহেতু কাজটা অন্যের কথা নিয়ে, তাই সকলেই বিষয়টা গোপন রাখে। নেটে বা জার্নাল ঘাঁটলে পাবে না। আমরাও গোপন রাখব। বাইরে থেকে যন্ত্র আনিয়েছি, সফটওয়্যার আনিয়েছি। কথা ছাড়ানোর সফটওয়্যার। অর্ক, তোমার ফাইল খুলে দেখলাম, তুমি ফিজিক্সের স্টুডেন্ট ছিলে। রেজাল্টও খুব ভাল। আমার ইচ্ছে, তুমি ম্যানেজমেন্ট ছেড়ে এই কাজে শিফট করো।'

অর্ক সোজা হয়ে বসে বলল, 'অবশ্যই করব স্যার। এরকম একটা কাজে থাকব না? আমার স্যার ম্যানেজমেন্টের থেকে ফিজিক্সেই বেশি ইন্টারেস্ট। নেহাত কেরিয়ার...।'

ভারী হেডফোনটা কানে ঠিক করে নিয়ে অর্ক টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ল। ল্যাপটপে হাত দিয়ে প্রোগ্রাম চালু করল। পরদায় ভেসে উঠল ছায়ার মতো আবছা কালো একটা পিণ্ড। উলের বল যেন! উলগুলো একটা আর একটার ঘাড়ে চেপে, জড়িয়ে পেঁচিয়ে আছে। ছায়ার বলটা পরদায় অল্প অল্প কাঁপছে। 'সাউন্ড' অপশনে গিয়ে দু'বার মাউস ক্লিক করতেই অর্কর হেডফোনে হট্টগোল শুরু হয়। হাজার কথা জড়িয়ে থাকার হট্টগোল। বাজারের মতো। কোনও কথাই আলাদা করে বোঝার উপায় নেই। সবাই নিজের মতো আলাদা হতে চাইছে, পারছে না। না পেরে জালে জড়িয়ে পড়া জন্তুর মতো ছটফট করছে।

বুকের কাছে আবার কাঁপুনি। মুহূর্তের জন্য অর্ক ভেবেছিল পকেটে হাত দিয়ে ফোনের সুইচ বন্ধ করে দেবে। 'দস্যু'র কথা মনে পড়ল। সত্যি তো ফ্ল্যাটে মেয়েটা একা থাকে। আজকাল খবরের কাগজে রোজই কিছু না কিছু বেরোচ্ছে। চুরি, ডাকাতি, মুখ বেঁধে ধর্ষণ। হেডফোন টেবিলের ওপর খুলে রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল অর্ক। পাশের টেবিলের রঞ্জন মুখ তুলে তাকাল। অর্ক বাঁ হাত তুলে কড়ে আঙুল দেখায়। বাথরুম। কাচের দরজা

ঠেলে ল্যাবরেটরি থেকে বেরিয়ে সরে আসে করিডরের আড়ালে। পকেট থেকে মোবাইল বের করে নম্বর টেপে।

'কী হয়েছে উৎসা?'

'অনেক কিছু হয়েছে, তোমার জন্য মন কেমন হয়েছে।'

উৎসার হাসি ও কথায় স্বস্তি পেল অর্ক। যাক বাবা, সব ঠিক আছে। তবু বানানো বিরক্ত গলায় সে বলল, 'উফ তোমাকে এত করে বললাম না ফোন করবে না? তার পরেও...।'

উৎসা বিরক্তি গ্রাহ্য করল না। হাসি হাসি গলায় বলল, 'অ্যাই, আজ কী কী কথার জট ছাড়ালে গো?'

অর্ক বুঝতে পারল উৎসার সঙ্গে কথা বলতে তার খারাপ লাগছে না, বরং ভালই লাগছে। সে গলা নামিয়ে বলল, 'এগুলো গোপন বিষয়। একজনের কথা অন্য কাউকে বলা যায়? ছিঃ। আমাদের কাজের এথিক্স আছে, প্রফেসর রাগ করবেন।'

'আমি কি অন্য কেউ?' উৎসার গলায় অভিমান। মনে হচ্ছে এখুনি কেঁদে ফেলবে।

অর্ক তাড়াতাড়ি বলল, 'যা বাবাঃ, আমি কি সে কথা বলেছি? দেখো কাণ্ড! তুমি অন্য হতে যাবে কেন?'

'যাও, কিচ্ছু বলতে হবে না, অন্যের কথা নয়, নিজের কথা নয়, কিচ্ছু নয়।'

অর্ক আরও সরে আসে। কাচে ঢাকা বিশাল জানলার সামনে দাঁড়ায়। দশ তলা নীচে সেক্টর ফাইভের পিচের রাস্তা দুপুরের রোদে লিকলিকে চাবুকের মতো এঁকেবেঁকে পড়ে আছে। গাড়ি ছুটছে, মানুষ ছুটছে। এত ওপর থেকে শুধু দৃশ্য আছে, গতি আছে, শব্দ নেই। যেন সায়লেন্ট মুভি। স্ত্রীর হাসিতে স্বস্তি পেয়েছিল, অভিমানে গর্ব বোধ হল অর্কর— যতই হোক অভিমান তো তার ওপরই। সে হেসে ফিসফিস করে বলল, 'ঠিক আছে বাবা বলছি বলছি। অমন দুমদাম রাগ করো কেন উৎসা? তুমি রাগলে সারাদিন কাজ করব কী করে বলো তো?'

উৎসা গলা থেকে অভিমান সরিয়ে বলল, 'ভুল করবে। শাস্তি হবে, বেশ হবে।'

'সকাল থেকে এখন পর্যন্ত একটা জট খুলেছি। এমন কিছু নয়, সাধারণ কথা সব। ছেলে, মেয়ে, ধেড়ে বুড়ো সবার গলাই আছে। যেমন ধরো, আজ যেতে পারলাম না দাদা, অফিসে আটকে পড়েছি ভাই, বাজার করে ফিরবে গো, পলিটিকাল সায়েন্সের নোটস আনবি কিন্তু। আরও আছে। শেয়ার মার্কেটের বিড, মাল্টিপ্লেক্সের টিকিট বুকিং, নেতাদের হুমকি, লেট করার জন্য বসের ধ্যাতানি, রাজ্যের হাবিজাবি।'

উৎসা নিচু গলায় বলল, 'অ্যাই, প্রেমের কথা কিছু পেয়েছ?'

অর্ক করিডরের দিকে তাকিয়ে, ডান হাত দিয়ে মোবাইল ঢাকল। হেসে বলল, 'আজ নয়, কাল পেয়েছি। তবে কথা নয়, ওনলি আওয়াজ। চুমুর আওয়াজ। এইরকম...। এখন ছাড়লাম। আর নয়। বস আসছে এদিকে।'

উৎসাকে কিছু বলতে না দিয়ে হাসতে হাসতে ফোনের সুইচ বন্ধ করল অর্ক। খুব মজা হয়েছে একটা। হাসতে হাসতেই ফিরে গেল সে নিজের টেবিলে। সত্যি কি প্রেমের কিছু পাওয়া যাবে না? পেলে বেশ হয়। ফিরে গিয়ে উৎসাকে জমিয়ে গল্প করা যাবে। বিয়ের

পর সন্ধেবেলা বাইরে বেরোনো একেবারে বন্ধ করে দিয়েছে অর্ক। বন্ধুবান্ধব, ক্লাব, আড্ডা— সব। এমনকী কামারডাঙায় বাবার ওখানেও যেতে ইচ্ছে করে না। যাব যাব করেও তিনটে রবিবার যাওয়া হয়নি। ছুটির দিন উৎসাকে ছাড়তে মন চায় না। কথাটা মাথায় আসতে লজ্জা পেল অর্ক। কাপড়ে ঢাকা লাজুক মুখে হেডফোনের ভলিউম বাড়িয়ে দেয় সে। একটা কিছু পেতে হবে। হাবিজাবি নয়, জমজমাট কিছু। পাওয়া কি যাবে?

পাওয়া গেল একেবারে শেষ পর্যায়ে। সন্ধের মুখে মুখে। ল্যাপটপের পরদায় ভেসে বেড়ানো কালো বল তখন জট ছাড়িয়ে ফিকে হয়ে এসেছে। শুধু একটা-দুটো গিঁটে সমস্যা। সেই সমস্যা কাটতে হেডফোনে বেজে উঠল অর্কর। রিনরিনে নারীকণ্ঠ— 'কখন আসবে? না, না, একটা নয়, দুটো... লাঞ্চের পর আমি ন্যাপ নিই জানো না?... দূর বোকা, ও তখন কোথায়?... ল্যাবরেটরিতে... হি হি... দস্যু একটা... ফাঁকা ফ্ল্যাটে এসে যদি আমার মুখ বেঁধেছ... হি হি...।'

অর্কর বুক কেঁপে উঠল। এই গলা, এই হাসি তার চেনা!

আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয় ২ নভেম্বর ২০০৮

হলুদ গোলাপ

আমি খুবই বিপদের মধ্যে পড়েছি।

শুরুতে বিপদের চেহারা ছোট ছিল, কিন্তু যত সময় যাচ্ছে বিপদ বড় আকার ধারণ করছে। চৈত্র মাসের এই ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে কারও হাত-পা ঠান্ডা হয়ে আসার কথা নয়। তবু মনে হচ্ছে, আমার ঠান্ডা হয়ে আসছে। কী করব বুঝতে পারছি না। একটাই সান্ত্বনা, এই বিপদের সঙ্গে খুব সুন্দর একটা জিনিস জড়িয়ে আছে। সেদিক থেকে বলা যেতে পারে, আমার এই বিপদ হল সুন্দর বিপদ।

আগে করলেও আজকাল বিপদ নিয়ে আমি দুশ্চিন্তা করি না। কারণ বেশিরভাগ সময়েই বিপদ থেকে আমি বেরোতে পারি না। কারণ বিপদের হাত থেকে বাঁচতে পথ খুঁজে পাওয়া দরকার। এর জন্য মাথা খাটাতে হয়। ইদানীং আমাকে বিপদ থেকে বের করার জন্য আমার মাথা কোনও পরিশ্রম করতে চায় না। একটা বেকার, ফালতু এবং অলস ছেলের জন্য মাথা খাটবে কেন? 'মরুক গে যাক' বলে সে ঘুমিয়ে পড়ে। অনেকবারই এরকম হয়েছে। আমাকে বিপদে ফেলে আমার মাথা ঘুমিয়ে পড়েছে। এটা খুবই অপমানের একটা ব্যাপার। নেহাত আমি মান অপমান তেমন গায়ে মাখি না। ফলে বিপদে আমি চিন্তাহীন থাকতে চেষ্টা করি। বিপদ যত বাড়তে থাকে আমার মন তত ফুরফুরে হয়ে ওঠে। বিপদ কাঁধে নিয়ে দিব্যি ঘুরে ফিরে বেড়াই আর গুনগুন করে আওড়াই— 'আমারে সে ভালবাসিয়াছে, আসিয়াছে কাছে...।'

কিন্তু আজকের এই বিপদ থেকে আমাকে বেরোতে হবে। না পারলে আমার যতটা না সমস্যা তমালের সমস্যা অনেক বেশি। এই ঘটনার সঙ্গে তমালের অফিসের প্রোমোশন জড়িয়ে আছে। তমাল আমার অনেকদিনের বন্ধু। তাকে সমস্যায় ফেলা আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়। আমি তাকে কথা দিয়েছি, কাজটা করে দেব। যদিও আজকাল কথা দেওয়া কোনও ব্যাপার নয়। কথার দাম এখন খুবই নীচের দিকে। খবরের কাগজগুলো যদি নিয়মিত বাজারদরের লিস্টে আলু, পটল, মুসুর ডালের সঙ্গে কথার পাইকারি এবং খুচরো মূল্য ঘোষণা করত তা হলে ব্যাপারটা সকলের কাছে স্পষ্ট হত। দাম হুড়মুড় করে পড়ছে। তবে এক্ষেত্রে শুধু 'কথা' নয়, অন্য ঘটনাও আছে।

কাজটা করে দেওয়ার জন্য তমাল আমাকে কিছু টাকা দিয়েছে। তার এই বেকার বন্ধুকে সে সুযোগ পেলেই নানা কায়দায় খানিকটা করে টাকা পাইয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে। এটা তার অনেকগুলো বাজে অভ্যেসের একটা। আমাকে বহুবার চাকরি-বাকরিতেও ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আমি দু'-একবার ঢুকেছিও। টিকতে পারিনি। একবার অফিসে

যাওয়ার বদলে এসপ্ল্যানেড থেকে বাস ধরে ঝাড়গ্রাম চলে গিয়েছিলাম। যেতাম না। আমি বিরাট কোনও প্রকৃতিপ্রেমিক নই, কবিও না। তাদের মতো কাঁধে ঝোলা নিয়ে দুমদাম বেরিয়ে পড়ার মতো সাহস বা ক্ষমতা কোনওটাই আমার নেই। বাস গুমটির কাছে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিলাম। চা শেষ করে একটা সিগারেট ধরাব, তারপর রাস্তা টপকে অফিসের দিকে হাঁটা দেব— এই ছিল পরিকল্পনা। হঠাৎ পাশে একটা দূরপাল্লার বাস এসে দাঁড়ায়। সেই বাসটার গা থেকে দেখি কেমন যেন গন্ধ আসছে। বুনো গাছপালার গন্ধ। বাস থেকে আসবে ধোঁয়া, ডিজেলের গন্ধ, গাছপালার গন্ধ আসবে কেন! আমি খানিকটা অবাক হয়েই বাসটায় উঠে দেখতে যাই এবং ঝাড়গ্রাম চলে যাই। সেখান থেকে কাঁকড়াঝোড়ের জঙ্গল। ব্যাগে জামা-কাপড়ের বদলে অফিসের জরুরি তিনটে ফাইল ছিল। ফেরার সময় ঘাটশিলা হয়ে ফিরছিলাম। সুবর্ণরেখার জলে ব্যাগ পড়ে গেল এবং ফাইলগুলো ভিজে ঢোল হয়ে গেল। কলকাতায় ফিরে আমি সেই ভেজা ফাইল অফিসে জমা দিতে গেলে... যাক সে অন্য গল্প।

আসলে বাঁধাধরা চাকরি জিনিসটা আমার ধাতে সয় না। নিজেকে ক্রীতদাসের মতো মনে হয়। আমি একজন অলস মানুষ। আমার শুয়ে থাকতে বেশি পছন্দ। শুয়ে শুয়ে পা নাড়ানোর মতো আনন্দ কিছুতেই খুঁজে পাই না। বেঁচে থাকার জন্য যেটুকু না করলেই নয়, সেটুকু করলেই যথেষ্ট। এর বেশি আমার দ্বারা হবে না। নিজের এই আলসেমির সপক্ষে তমালকে অনেক লেকচার দিয়েছি। জ্ঞানগর্ভ সব লেকচার। তাতে বড় বড় ঋষি মনীষীদের উদাহরণ আছে। বলেছি, শ্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে কেউ ইতিহাসে নাম রাখতে পারেনি। 'শ্রেষ্ঠ চাকুরে' বলে কোনও পদক চালু হয়নি দুনিয়াতে। তমাল বুঝতে চায় না। ধমক লাগায়।

'চোপ। এসব তোর আলসেমির কথা। ফালতু ছেলের কুঁড়েমি। এসব শোনার মতো সময় আমার হাতে নেই।'

আমি চোখ দুটো আধবোজা করে 'চুক চুক' আওয়াজ করি। বলি, 'ছি ছি তমাল, তুই আলসেমিকে তুচ্ছ করছিস! হেয় জ্ঞান করছিস! এ কাজও করিস না ভাই। আলস্যকে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ছোট করে দেখেননি। বরং উলটোটাই করেছেন। আলস্য তিনি মহান করেছেন।'

তমাল ভুরু কুঁচকে বলে, 'মহান করেছেন!'

আমি অবাক হওয়ার ভান করে বলি, 'ছিন্নপত্র পড়িসনি? নিশ্চয় পড়িসনি। পড়লে একথা বলতিস না। মন দিয়ে শোন। সেটা ছিল নিঝুম দুপুর। কালিগ্রাম নামের একটা জায়গায় নদীর ওপর বোট ভাসছে। সেই বোটের ওপর বসে কবি লিখছেন...।'

তমাল হাত তুলে ধমক মারে, 'থাক, আর বলতে হবে না। সাগর, তুই রবি ঠাকুর নোস, তুই হলি অকর্মণ্য ফাজিল প্রকৃতির একটা ছেলে। এটা তোর ওই কালিগ্রাম না কলমগ্রাম নয়, এটা অফিসপাড়া, আর আমার অফিসটাও নদীর ওপর ভেসে বেড়ানোর বোট নয়। কাজ করবি না সেটা বল। রবীন্দ্রনাথ কপচাচ্ছিস কেন? তুই কি ভেবেছিস ছিন্নপত্র আওড়ে আমাকে ঘাবড়ে দিবি আর আমি তোকে মাথায় করে নাচব? আমাকে গাধা পেয়েছিস?'

তমালের কথায় আমি মুখটা এমন করি যেন খুবই আহত হয়েছি। আহত গলায় বলি,

'ঠিক আছে, তা হলে তুই বরং দেখ আমার আলসেমির যোগ্যতায় যদি কোনও চাকরি পাওয়া যায়। পরিশ্রমের জন্য যা মাইনে আলসেমির জন্য তার হাফ হলেও চলবে। আমি না হয় তখন দুটো আলসেমির চাকরি করব। আদ্দেকে আদ্দেকে এক হয়ে যাবে। সহজ পাটিগণিত।'

তমাল চোখ পাকিয়ে বলে, 'অসহ্য! সাগর, তুই কি চাস এখনই তোকে ঘর থেকে বের করে দিই? আমাদের অফিসের দারোয়ান পাণ্ডে অর্ডার পেলে চমৎকার ঘাড়ধাক্কা দিতে পারে। তুই যদি বলিস ঘণ্টা বাজিয়ে ডেকে পাঠাই।'

আমি এবার খুশি মুখে বলি, 'হ্যাঁ, চাই। খুবই চাই। তোর যেমন আমাকে অসহ্য লাগছে, আমারও তেমন তোকে অসহ্য লাগছে। একশোটা টাকা দে। ধার হিসেবে দিবি না। ফেরত দিতে পারব না। ছিন্নপত্র পড়িসনি বলে ফাইন হিসেবে দে। টাকা নিয়ে আমি নিজেই কেটে পড়ছি। আর যদি তুই ঘাড়ধাক্কার জন্য পাণ্ডেকে ডাকতে চাস তাও ডাকতে পারিস। তবে দশ টাকা বেশি দিতে হবে। ঘাড়ে ধাক্কা খাওয়ার পর তাকে টিপ্‌স দেব। আমি টিপ্‌স ছাড়া কোনওরকম সার্ভিস নিই না।'

তমাল আরও রেগে যায়। দাঁতে কিড়মিড় জাতীয় আওয়াজ করে বলে, 'একশো টাকা কেন? একশো পয়সাও পাবি না। গত সপ্তাহে তোকে মিস্টার রামদাস পানুড়িয়ার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলাম না? মনে আছে? ওদের আক্রাফটকের গোডাউনে একজন ম্যানেজার লাগবে বলেছিল। আমি তোর কথা বললাম। পানুড়িয়াজি মানুষটা আমাকে খুবই ভক্তি শ্রদ্ধা করে। আমার বন্ধু শুনে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। তুই গেলি না কেন?'

লোকে চাকরি পাওয়ার জন্য যে-কোনওরকম মিথ্যে বলতে পারে। আমি চাকরি না পাওয়ার জন্য যে-কোনওরকম মিথ্যে বলতে পারি। এবারও নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে মিথ্যে বললাম।

'কে বলল যাইনি? আলবাত গিয়েছিলাম। পানুড়িয়াজি সত্যি একজন চমৎকার মানুষ। অফিসে যেতেই আমাকে খাতির করে বসাল। ওর দিকে একটা টেবিল-ফ্যান ঘুরছিল। সেটা আমার দিকে ঘুরিয়ে দিল। তোর নাম শুনে বরফের কুচি দেওয়া ছাতুর শরবত খাওয়াল। লেবু দেওয়া। ফ্যানটাস্টিক খেতে। এক গ্লাস খেয়ে আমি আরও এক গ্লাস চাইলাম। বললাম, পানুড়িয়াজি, অসুবিধে না হলে গ্লাসে ডবল লেবু মেরে দিতে বলুন। ভিটামিন সি শরীরের পক্ষে অতি জরুরি। উনি তাই দিতে বললেন। আমি অবাক। চাকুরিপ্রার্থীকে এত যত্ন, এত সম্মান কেউ করে!'

তমাল গর্ব মেশানো হাসি দিয়ে বলল, 'এ আর এমন কী, খাতির তো করবেই। তুই আমার লোক না? যাক, কাজের কথা কী হল?'

'উনি বললেন, সাগরজি আমাদের এখানে কিন্তু খাটনি আছে।'

তমাল চোখ গোল করে বলল, 'সে তো হবেই, চাকরি করবি, মাইনে নিবি, খাটনি থাকবে না? কেউ কি বসে থাকার জন্য মাইনে দেয়? যতই তুমি আমার বন্ধু হও, কাজ তোমাকে করতেই হবে বাছাধন।'

'অবশ্যই করতে হবে। একশোবার করতে হবে। পানুড়িয়াজি কাজের কথা বললেন। খুবই

হালকা কাজ। ম্যানেজারের হিসেবপত্র, স্টক মেলানো, চালান লেখার কাজ তো আছেই, দরকার পড়লে মাঝেমধ্যে বস্তা, ড্রাম, পেটি টানাহেঁচড়াও করতে হবে।'

'মানে!'

আমি হেসে বললাম, 'মানে সামান্য। অনেক সময় লেবাররা অ্যাবসেন্ট করে। বাড়িতে গেলে ব্যাটারা ফিরতে চায় না। তিনদিনের জায়গায় সাতদিন পার করে দেয়। তখন গাড়িতে মাল লোড করা আর কী। বিকেলের দিকটায় ঘাড়ে করে টেম্পোতে মাল তুলে দেব।'

তমাল খানিকক্ষণ থম মেরে রইল। তার বন্ধুকে মালবাহকের কাজ করতে বলায় সে যে অপমানিত হয়েছে তার চোখ মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম। আমি মনে মনে খুশি হলাম। তমাল বলল, 'হারামিটার এত বড় সাহস! তোকে কুলিগিরি করতে বলল? তুই কী বললি? মুখের ওপর না বলে চলে এসেছিস তো?'

'ছিঃ অমন কথা বলতে নেই তমাল। পানুড়িয়াজি খুবই ভাল মানুষ। তাঁকে খামোকা গাল দিচ্ছিস কেন? আর আমিই বা না বলে আসব কেন? বসে বসে বেতন নেব নাকি? বললাম, অবশ্যই মালপত্র বইব, তবে ঘাড়ে করে পারব না পানুড়িয়াজি। ঘাড়ে ব্যথা আছে, যদি ঝুড়ির ব্যবস্থা করে দেন, মাথায় করে তুলে দেব।'

তমাল আমার দিকে সন্দেহের চোখে তাকিয়ে বলল, 'ফাজলামি করছিস?'

আমি চুপ করে রইলাম। তবে বেশ কিছুদিন তমালের চাকরি দেওয়ার অত্যাচার থেকে রক্ষা পেলাম। সে কথা বলা তো দূরের, আমার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎই বন্ধ করে দিয়েছিল। বহুদিন পর আবার সেদিন অফিসে ডেকে পাঠাল। আমিও সকাল সকাল চলে গেলাম। টাকা পয়সার ভয়ংকর টানাটানি চলছে। পরীক্ষা সিজন শেষ করে যাওয়ায় তিনটে টিউশন গন। ছেলেমেয়ের মায়েরা গদগদ গলায় মাসখানেক ছুটি দিয়েছে। একমাস মাইনে বাঁচানোর ফন্দি আর কী। বইপাড়ায় প্রুফ দেখার কাজও সামান্য। আগে বাংলা নববর্ষে নতুন বই হত। এখন সে পাট নেই। সব মিলিয়ে অবস্থা জটিল। বিভিন্ন পর্যায়ে ধার-বাকির মধ্যে ঢুকে পড়েছি। বাড়িভাড়া থেকে শুরু করে ডালভাতের রেস্টুরেন্ট, সিগারেটের দোকান থেকে কাপড়কাচা, চুল কাটা সর্বত্র ঋণ। কোনও কোনও রাতে চা বিস্কুট দিয়ে ডিনার সারছি। বিস্কুট না থাকলে শুধু চা। বিছানায় শুয়ে নিজেকে ধনী মানুষ হিসেবে কল্পনা করি। ধনী মানুষের ধার-বাকিতে কোনও সমস্যা নেই। যার যত টাকা তার তত ঋণ। উলটোদিক দিয়ে দেখলেও সত্যি। যার যত ঋণ সে তত ধনী। সেই হিসেবে আমি ক্রমশ একজন ধনী মানুষ হয়ে উঠছি।

শেষ ধার পেয়েছি রামেশ্বরের কাছ থেকে। রামেশ্বর আমাদের পাড়ার মুচি। গলির মুখে, ফুটপাথের ধার ঘেঁষে বসে। পাশে সবসময় একটা ছাতা খোলা। রোদ-বৃষ্টি থাকলেও খোলা, না থাকলেও খোলা। তাতে ছোট বড় মেজ সেজ নানা আকার-প্রকারের তাপ্পি। গরিবের ছাতায় তাপ্পি থাকবে এতে অবাক হওয়ার কী আছে? কিন্তু রামেশ্বরের তাপ্পিগুলোর মজা হল সবকটার রংই হলুদ। নানান শেডের হলুদ। কোনওটা লেমন ইয়েলো, কোনওটা ইয়েলো অকার, কোনওটা আবার ক্যাডমিয়াম ইয়েলো বা গ্যামবোজ। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, গোটা ছাতাটাই হলুদ। রামেশ্বর কেন যে শুধু হলুদ কাপড় দিয়ে ছাতায় তাপ্পি বসায়!

অনেকদিন ধরে ভেবে রেখেছি, জিজ্ঞেস করব। করা হয়নি। পরে নিজেই ভেবে ভেবে বের করলাম। ঠিক করেছি, একদিন রামেশ্বরকে বলে চমকে দেব।

বিষণ্ণ ধরনের মানুষ রামেশ্বর। এই বিষণ্ণতার কারণ আমি জানি। তার মুখ থেকেই শোনা। তার একমাত্র মেয়ে মেরুদণ্ডে বড় ধরনের গোলযোগ নিয়ে জন্মেছে। স্নায়ুর যে অংশগুলো মানুষকে সোজা হয়ে বসতে দাঁড়াতে শেখায় এই মেয়ের সেগুলো অকেজো। মেয়ের বয়স নয় হতে চলল। জন্ম থেকেই শয্যাশায়ী। শুয়ে শুয়েই সে পৃথিবী দেখছে। গোটা দুনিয়া জুড়ে মানুষ যখন ছেলেমেয়েকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে উন্মাদের মতো ছোটাছুটি করছে, দরিদ্র রামেশ্বর তখন তার শুয়ে থাকা একমাত্র সন্তানকে নিয়ে বেঁচে রয়েছে লড়াই করে। এই মানুষটার মন বিষণ্ণ থাকবে না তো কার থাকবে?

কোনও দরকার ছাড়াই আমি রামেশ্বরের কাছে মাঝেমধ্যে চলে যাই। সে আমাকে 'সাগরভাই' ডাকে। কলকাতায় দীর্ঘদিন থাকার কারণে হিন্দিভাষী হলেও ভারী সুন্দর বাংলা বলে। আমি গেলে ফুটপাথের একপাশে রাখা ব্যাটারির খোল টেনে দেয় রামেশ্বর। আমি সেখানে বসে তার কাজ দেখি। সত্যি কথা বলতে কী কাজ দেখি না, মানুষটাকে দেখি। দেখি, মনখারাপ করা একজন মানুষ কীভাবে পালিশ করে, পেরেক মেরে, সেলাই ফুঁড়ে অন্যের মন ভাল করে দেয়। অবাক লাগে। রামেশ্বর কথা প্রায় বলে না বললেই চলে। আমি পাশে বসে থাকি, সে নিজের মনে কাজ করে। একসময় জিজ্ঞেস করে, 'সাগরভাই চা বলি?' আমি মাথা নাড়ি। সামনের দোকান থেকে ছোট ভাঁড়ে চা আসে। আমি অতিরিক্ত সময় নিয়ে সেই চা খাই। বেলা বাড়লে রামেশ্বর শান্ত গলায় বলে, 'এবার যান। বাড়ি গিয়ে মাথায় জল ঢেলে দুটো মুখে দেন।' প্রথম প্রথম সে বিস্মিত হত। আমার মতো একজন চেহারায় মোটামুটি 'ভদ্রলোক' ধরনের মানুষ ফুটপাথে মুচির পাশে বসে থাকে, চা খায়, এটা তার কল্পনার মধ্যে ছিল না। এখন অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। সম্ভবত বুঝে গিয়েছে, চেহারা যা-ই হোক, আমি আসলে সত্যিকারের 'ভদ্রলোক' নই।

এই রামেশ্বরই শনিবার আমার চটিতে উঠে যাওয়া পেরেকে হাতুড়ি মেরে দিল। আমি পয়সা দিতে গেলে বিরক্ত গলায় বলল, 'যান দেখি।'

আমি হেসে বললাম, 'কী হল?'

রামেশ্বর আরও বিরক্ত হয়ে বলল, 'বললাম তো যান।'

'তা কী করে হয় রামেশ্বর? কাজ করে পয়সা নেবে না? তা ছাড়া এইটুকু পয়সা আমার আছে। নাও রাখো।'

রামেশ্বর এবার যেন ধমক দেয়। বলে, 'এখন ধার থাক, পরে দেবেন।'

আমি নরম গলায় বলি, 'রামেশ্বর আজ তোমার মন কি বেশি খারাপ? তোমার মেয়ে আছে কেমন?'

রামেশ্বর আমার কথার উত্তর দেয় না। সামনে পড়ে থাকা জুতোয় সুচ গাঁথে। আমি বলি, 'একদিন তোমার মেয়েকে দেখতে যাব।' রামেশ্বর এতেও কিছু বলে না। আমি সামান্য হেসে বলি, 'তোমার মেয়ের বুঝি হলুদে রং খুব পছন্দ?' এবার সে মুখ তোলে। অবাক হয়ে আমার দিকে তাকায়। বলে, 'আপনি বুঝলেন কী করে?'

আমি আবার অল্প হাসি। বলি, 'আমি বুঝতে পারি। তোমার মেয়ের প্রিয় রং হল হলুদ। আর সেই কারণে তুমি তোমার ছাতা ভরতি করে হলুদ রঙের কাপড় লাগিয়ে রেখেছ। তাই না?'

রামেশ্বরের চোখে গভীর বিস্ময়। আমার ভাল লাগে। অন্তত কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও এই সামান্য মানুষটার বিষণ্ণতা কাটাতে পেরেছি। বড় মানুষদের শোক দুঃখ ভোলানোর আয়োজন অজস্র। সামান্য মানুষের বেলায় সেরকম কিছু নেই। তাকে ছোট ছোট আয়োজন করে মন ভাল করতে হয়। রামেশ্বর ঠোঁটের ফাঁকে হেসে বলে, 'ঠিক বলেছেন সাগরভাই। মেয়েটা হল গিয়ে আমার হলুদ পাগলা মেয়ে। হলুদ জামা চাই, হলুদ রঙের বিছানার চাদর চাই, হলুদ রঙের দরজা জানলা চাই। বলুন দেখি ভাই কী পাগলামি, দরমা বেড়ার ঘরে থাকি, হলুদ দরজা জানলা পাই কোথা থেকে? ওর মা তো খুবই রাগারাগি করে।'

আমি দেখলাম মেয়ের পাগলামির কথা বলতে বলতে রামেশ্বরের চোখ আনন্দে জ্বলজ্বল করে উঠছে। আচ্ছা, এই পৃথিবীতে কি এমন কোনও বাবা আছে মেয়ের পাগলামির কথা বলতে গিয়ে যার চোখ আনন্দে জ্বলজ্বল করে ওঠে না? আমি নিশ্চিত এমন কাউকে পাওয়া যাবে না।

আমি মিটিমিটি হেসে বললাম, 'ও কিছু নয়, সব ছোট ছেলেমেয়েদেরই একটা করে পছন্দের রং থাকে। আমার ছিল বেগুনি। সবাই আমাকে বেগুনি বলে খেপাত। তবে যতই পয়সাকড়ির অসুবিধে হোক রামেশ্বর, আমি কিন্তু জানি তুমি ওই বেড়ার ঘরেই কয়েক পোঁচ হলুদ রং লাগিয়ে দিয়েছ। সেই রং খুব ভাল হয়নি, আধাখেঁচড়া হয়েছে, তবু তোমার মেয়ে খুব খুশি হয়েছে। ঠিক না?'

রামেশ্বর আরও বিস্মিত হল। মুগ্ধ গলায় বলল, 'এই খবরটা আপনি জানলেন কী করে? আপনি তো আমার বাড়ি কোনওদিন যাননি!'

আমি শান্ত গলায় বললাম, 'সব খবর কি গিয়ে জানতে হয় রামেশ্বর? তা হলে তো মানুষের মনের খবর কেউ কোনওদিনও জানতে পারত না। মানুষের মনের ভেতর কি যাওয়া যায়? বাদ দাও ওসব, ঠিক করেছি, এবার একদিন তোমার মেয়ের সঙ্গে দেখা করে আসব। খানিকটা হলুদ রং নিয়ে দুম করে একদিন চলে যাব।'

রামেশ্বর আমার দার্শনিক ধরনের কথা বুঝতে পারল বলে মনে হয় না, শান্ত গলায় বলল, 'আমাদের মতো ছোট মানুষের ঘরে কি আপনি যাবেন? আপনার কথা ওকে অনেক বলেছি। ওর আপনাকে দেখতে ইচ্ছা করে।'

আমি কৌতূহলে বলি, 'কী বলেছ?'

রামেশ্বর কাজে মন দিতে দিতে লজ্জা ধরনের হাসে। বলে, 'বলেছি, সে একটা মানুষ বটে, তোর মতো শুয়ে না থাকলেও মনে হয় সবসময় শুয়েই আছে। কুঁড়ের বাদশা একটা। হা হা। ভুল বলেছি?'

তমালের অফিসে গিয়ে দেখলাম কেলেঙ্কারি কাণ্ড। পুরনো ঘরদোর ভেঙেচুরে ভোল একেবারে পালটে ফেলেছে! এসি-র ফিনফিনে ঠান্ডা। ঝকঝকে টেবিল। ওপরে চকচকে কম্পিউটার। সবথেকে মারাত্মক হল, বাড়ির অনেকটাই এখন কাচে কাচে ছয়লাপ! বড় বড়

কাচের জানলা দরজা, মাঝে মাঝেই উঁচু কাচের দেওয়াল। 'আছে কিন্তু নেই' কায়দায় সেই দেওয়ালগুলো দাঁড়িয়ে আছে। আমি তো একটায় ধাক্কাই খেলাম। তিনতলায় তমাল পর্যন্ত পৌঁছোতেও অনেকরকম কসরত করতে হল। খাতায় নামটাম লিখে বিস্তর হ্যাপা। তমাল দেখলাম টাই পরেছে। মুখটাও গম্ভীর গম্ভীর। এটাই স্বাভাবিক। অফিসবাড়ির ভোল পালটেছে আর ভেতরের মানুষগুলোর ভোলও পালটাবে না? আচ্ছা, মানুষগুলোও খানিকটা করে কাচের হয়ে যায়নি তো? দেওয়ালের মতো?

আমি তমালের টেবিলের উলটোদিকের গদি আঁটা চেয়ারে গা এলিয়ে বললাম, 'কী ব্যাপার, ডেকেছিস কেন?'

তমাল চাপা গলায় দাঁত কিড়মিড় করে উঠল, 'ওভাবে বসেছিস কেন? ঠিক করে বোস। এটা তোর ঘরের তক্তপোশ নয়। অফিসের চেয়ার।'

আমি চমকে ধড়ফড় করে উঠে পড়লাম। বললাম, 'এই রে, চেয়ারটাও কাচের নাকি?'

তমাল আরও গলা নামিয়ে বলল, 'বাজে কথা বন্ধ কর। সাগর, তোকে একটা কাজ করতে হবে।'

আমি কুঁকড়ে গেলাম। খেয়েছে, আবার কাজ! চাকরি নাকি? নিশ্চয় তা-ই হবে। কী জ্বালাতন। আবার পালাতে হবে। একবার চাকরির তাড়ায় জঙ্গলে পালিয়েছি, এবার কোথায় যাব? সমুদ্রে? শুধু পালালে হবে না, পালানোর আগে তমালের কাছ থেকে কিছু টাকাপয়সা বাগাতে হবে। অবস্থা খুবই কঠিন। এখন ডিনারে চা-বিস্কুট চলছে, এরপর লাঞ্চেও হয়তো একই মেনু হয়ে যাবে। কাঁচুমাচু গলায় বললাম, 'আবার চাকরি? ঠিক আছে তুই যখন বলছিস আই এগ্রি। কিছু অ্যাডভান্স পাওয়া যাবে? ধার হিসেবে দে। কথা দিচ্ছি প্রথম মাসের বেতন পেয়েই শোধ। টাকাপয়সার বিচ্ছিরি কন্ডিশন চলছে। মনে হয়, ওয়ার্ল্ড রিসেশনে ধাক্কা খেয়েছি।'

তমাল কটমট চোখে তাকিয়ে হিসহিসিয়ে উঠল।

'তিনটে কথা বলব। ওয়ান, টু, থ্রি। এক নম্বর, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি তোর সঙ্গে আর কখনও চাকরির ব্যাপারে কোনও কথা বলব না। দু'নম্বর, মন্দা তোকে কড়ে আঙুল দিয়েও ছুঁয়ে দেখবে না। তার একটা ডিগনিটি আছে। ভিখিরিদের সে টাচ করে না। তিন নম্বর হল, আমার কাজটা করে দিলে কিছু টাকা পাবি। রাজি কি না এবার চটপট বল।'

আমি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলি। যাক বাবা, চাকরি ছাড়াই টাকা। একগাল হেসে হাত বাড়িয়ে বললাম, 'রাজি।'

তমাল হাত বাড়াল না। শুধু ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী রাজি!'

'কাজটা করব।'

তমাল মুখ পাকিয়ে বলল, 'আগে শুনবি তো।'

'শোনার দরকার নেই। বললাম তো আমি রাজি। নে এবার চা বল। না চা নয়, কফি বল। এ ঘরে ছেঁদো চা মানাবে না।'

'অফিসের ভেতরে চা কফি খাওয়ার নিয়ম নেই। করিডরে কিয়স্ক আছে। ওখানে গিয়ে খেতে হবে।'

আমি বললাম, 'বাপ রে! করেছিস কী কাণ্ড! অ্যাঁ, এ তো ডালহৌসিতে জাপান বানিয়ে বসে আছিস রে!'

তমাল হাত বাড়িয়ে খিমচি দিল, বলল, 'চুপ। নো ফাজলামি। চল চা খেতে খেতে কাজটা বলছি।'

'তোদের করিডরে ব্যাটারির খোল আছে?'

'মানে!'

আমি নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলি, 'না কিছু নয়। থাকলে ভাল হত। খোলে বসে চা খেতাম। ব্যাটারির খোলে বসলে চায়ের টেস্ট বাড়ে। যাক, কাজ কি কঠিন?'

'হ্যাঁ কঠিন।' তমাল থমথমে মুখে বলে।

না কাজ কঠিন নয়, কাজ অতি সহজ এবং সংক্ষিপ্ত।

তমালের বসের মেয়ে লেখাপড়ায় মারাত্মক। এখানকার কলেজ-ইউনিভার্সিটিকে চমকে দিয়ে এবার চলল আমেরিকা। সেখানকার কোনও এক নামজাদা ইউনিভার্সিটিতে ভজকট বিষয় নিয়ে গবেষণা করবে। গবেষণা শেষে সে-দেশেই বিবাহ এবং বসবাস। গবেষণা মাঝখানে বন্ধ করেও বিয়ে হতে পারে। পাত্র সেমিফাইনাল স্তরে রয়েছে। মেয়ে নিজের চোখে ছেলের ফ্ল্যাট দেখে ফাইনাল সিদ্ধান্ত নেবে। সিদ্ধান্ত নির্ভর করছে ফ্ল্যাট দক্ষিণমুখী না উত্তরমুখী তার ওপর। উত্তরমুখী হলে মেয়ে এখনই বিয়ে করে সংসার পাতছে না। ভাবী বরকে নতুন ফ্ল্যাট কিনতে হবে। দক্ষিণমুখী হলে সে ঝামেলা নেই। গবেষণা মাঝপথেই মুলতুবি রেখে ঘর গোছাতে ব্যস্ত হবে। রবিবার দুপুরে দমদম এয়ারপোর্ট থেকে মেয়েটির একই সঙ্গে শিক্ষাযাত্রা এবং বিবাহযাত্রা শুরু। আমার কাজ হবে এয়ারপোর্টে পৌঁছে তার হাতে একটি ফুলের তোড়া পৌঁছে দেওয়া। তোড়ার গায়ে একফালি কার্ড ঝুলবে। তাতে লেখা থাকবে 'বিদায়। দেশের মুখ উজ্জ্বল করো। তমালরঞ্জন সেনগুপ্ত, ডেপুটি চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট। কলকাতা শাখা।'

কফির কাপ কাগজের। আমি সেই কাপ ফেলে বললাম, 'আমার তিনটে কথা আছে তমাল। ওয়ান টু থ্রি।' তমাল কিছু বলল না। শুধু ভুরু তুলল। আমি বললাম, 'এক নম্বর হল, তুই নিজে যাচ্ছিস না কেন? সকাল সকাল বাড়ি গিয়ে বসের মেয়েকে নিজের হাতে ফুল তুলে দিবি। যদি বলিস আমিও না হয় তোর সঙ্গে থাকলাম। ফুল ক্যারি করাও হল, আবার গুণী মেয়ে দর্শনও হল। হ্যাঁরে, মেয়ে দেখতে কেমন?'

তমাল খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'মেয়ে কেমন দেখতে তা দিয়ে তোর দরকার কী? তবে বাড়ি-ফাড়ি যাওয়া যাবে না। বস একেবারেই গায়ে পড়া পছন্দ করে না। তা ছাড়া অন্য ব্যাপারও আছে।'

আমি গলা নামিয়ে বললাম, 'কী ব্যাপার? ওই মেয়ের সঙ্গে তোর প্রেম-ফ্রেম চলছে নাকি? বসের মেয়ের সঙ্গে প্রেম হিন্দি সিনেমার ফেভারিট থিম। তবে মিউজিক ঠিকমতো দিতে হবে। আজকাল প্রপার মিউজিক ছাড়া ছবি চলে না। ছবি না চললেও মিউজিক যেন চলে যায়।'

তমাল আর পারল না। ফিসফিসে গলায় আমাকে গাল দিয়ে বলল, 'শালা থামবি?

আসলে আমার সামনে একটা প্রোমোশনের চান্স এসেছে। দেখলি না বললাম ফুলের কার্ডে 'বিদায়'-এর সঙ্গে নিজের পোস্টটাও লিখব? ডেপুটি চিফ অ্যাকাউন্টেন্ট। ডেপুটি বাদ দিয়ে ফুলফ্লেজেড চিফ্ হওয়ার চেষ্টা করছি। এখন আমি যদি নিজে ফুল নিয়ে যাই তা হলে অফিসে জানাজানি হয়ে যাবে। ঝামেলা লেগে যাবে। অফিস পলিটিক্স তো জানিস না। হাড় ভাজা ভাজা করে দেয়। তাই ঠিক করেছি ফুলও দেব, নিজেও যাব না।'

'বিউটিফুল। কোয়েশ্চেন নাম্বার টু। আজকাল যে-কোনও ফ্লাওয়ার শপ বা বুটিকে ফোন করলেই তারা গিয়ে ফুল পৌঁছে দেয়। তুই সেরকম কিছু করছিস না কেন?'

তমাল চক্রান্ত করার ঢঙে গলা নামিয়ে বলল, 'গাধার মতো কথা বলিস না। তোর কি ধারণা এটা আমি জানি না? আমি কেন, অফিসের সবাই জানে। আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিয়োর অফিসের সবাই এই কাজটা করবে। ফোনে অর্ডার দিয়ে ফুল, গিফট পাঠাবে। সকাল থেকে বসের বাড়িতে গাদা ফুল পৌঁছোবে। যত পৌঁছোবে স্যার তত বিরক্ত হবে। মেয়েটা নাক সিঁটকোবে। এমন একটা সময় আসবে যখন ঘরে ফুলের বুকে ঢুকতেই দেওয়া হবে না, বাইরে বারান্দায় হেলাফেলা করে পড়ে থাকবে। কার্ড খুলে দেখা তো দূরের কথা, ফুলের দিকেও কেউ তাকাবে না।'

'সে কী! তা হলে তুই পাঠাচ্ছিস কেন?'

তমাল ঠোঁটের ফাঁকে বিজয়ীর হাসি দিল। বলল, 'সেইজন্যই তো পাঠাচ্ছি না। তোকে ডেকে পাঠিয়েছি। ফুল নিয়ে যাবি তুই। নিয়ে যাবি ওই মেয়ের বাড়িতে নয়, একেবারে এয়ারপোর্টে। আমি হব সেই ব্যক্তি যার বিদায়-ফুল একেবারে শেষ মুহূর্তে হাতে গিয়ে পৌঁছোবে। আগেও না, পরেও না। কথায় আছে লাস্ট মোমেন্ট ইজ দ্য বেস্ট মোমেন্ট। শেষ মুহূর্তই সেরা মুহূর্ত।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'এ কথা কোথায় আছে!'

তমাল চাপা ধমক দিল, 'যেখানেই থাকুক, তোর কী? তুই তোর কাজ করবি। এয়ারপোর্টের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবি। পাঁচটা বাইশের ফ্লাইট। হিসেবমতো সিকিউরিটিতে ওই মেয়ে ঢুকবে তিনটে বাইশে। তুই ঠিক তিনটে কুড়িতে গিয়ে ফুলের তোড়া হাতে তুলে দিবি। মেয়ে চমকে উঠবে। আমি নিশ্চিত বিদায়বেলায় পাওয়া পুষ্পস্তবকের প্রতি কোনও মেয়ে অবহেলা দেখাতে পারে না।'

তমালের গলায় কি আবেগ? মনে হচ্ছে আবেগ। আমি বললাম, 'তুই কি বলছিস তোর বসের মেয়ে ওই ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে আমেরিকা পর্যন্ত চলে যাবে!'

তমাল গম্ভীর গলায় বলল, 'তা বলিনি। মেয়েটি ছলছল চোখে ওই ফুল তার বাবার হাতে তুলে দেবে। তার বাবা আমাকে মনে রাখবে। মেয়েকে যে শেষ শুভেচ্ছা জানায় তার কথা বাবারা ভুলতে পারে না। কার্ডটা এমনভাবে ফুলের ওপর রাখবি যাতে বস চট করে পড়তে পারে।'

'এত ঘোরপ্যাঁচ কি ঠিক হবে তমাল? বুকেটা সরাসরি তোর বসকে দিলেই হত না? প্রোমোশন তো তোর বসই তোকে দেবে, তার মেয়ে তো দেবে না। বিষয়টা খামোকা এত জটিল করা কি ঠিক হচ্ছে?'

তমাল ফের ধমক দিল, 'চোপ। ঠিক-ভুল তোকে বুঝতে হবে না। যা বলছি তুই তা-ই করবি। মনে রাখবি, ফুলটা এখানে আসল নয়। টাইমিংটাই আসল। বিদায়বেলার টাইমিং। আগেও নয়, পরেও নয়। কত টাকা দেব বল?'

আমি বুঝতে পারছি, প্রোমোশনের লোভে তমাল একটা বিচ্ছিরি গোলমালে ঢুকে পড়ছে। এটাই হয়। কেরিয়ার অতি ভয়ানক জিনিস। শয়তানের মতো। যে-কোনও মানুষকে সে গোলকধাঁধায় ঢুকিয়ে দিতে পারে। সেখান থেকে মানুষ বেরোতে পারে না। ঘুরতে থাকে, ঘুরতে থাকে, ঘুরতেই থাকে। সাধে কি আমি চাকরিবাকরির মধ্যে যেতে চাই না! যাক, তমাল যা ভাল বোঝে করুক। আমার টাকা পেলেই হল।

'কী রে বললি না কত টাকা দেব?'

আমি একটা ছোট করে হাই তুললাম। ঠোঁটে চাপড় মেরে বললাম, 'সময় নিয়ে কারবার। খরচাপাতি তো একটু বেশিই হবে মনে হচ্ছে। আগে হলে একরকম রেট হত, পরে হলে আরেকরকম। এটা তো আগে পরে কোনওটাই নয় দেখছি। একেবারে লাস্ট মোমেন্ট। শেষ মুহূর্ত অতি কঠিন জিনিস রে তমাল। শেষ মুহূর্তের জন্য পৃথিবীতে কত বড় বড় সব কাণ্ড ঘটেছে এবং ঘটছে না। শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত হচ্ছে না বলেই তো থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার শুরু হয়েও হতে পারছে না, তেমনি শেষ মুহূর্তের বায়োলজিক্যাল চেঞ্জে শুঁয়োপোকার মতো কদাকার একটা কীট প্রজাপতির মতো সুন্দর হয়ে যাচ্ছে। শেষ মুহূর্ত নিয়ে কাজ করা অত সহজ নয়।'

'বাজে কথা বলিস না সাগর। আমার টেনশন হচ্ছে। যত খরচ হয় হোক। কাজটা হওয়া চাই।'

'আমার তিন নম্বর প্রশ্ন এবং শেষ প্রশ্ন, ফুল কি আমাকে কিনতে হবে? না কি তুই কিনে দিবি? যদি আমাকে কিনতে হয়, ফুলের রং কী হবে?'

তমাল ঝুঁকে পড়ে নিচু গলায় বলল, 'ফুল তুই কিনবি। হলুদ গোলাপ। বসের মেয়ের কোন রং ফেভারিট জানার জন্য আমি গোপনে স্পাই লাগিয়েছিলাম। সে খবর দিয়েছে, হলুদ। এটাও অফিসের আর কেউ জানে না।' কথাটা বলে তমাল দুলে দুলে হাসতে লাগল। যেন বসের মেয়ের ফেভারিট রং বের করে সে বিরাট একটা কৃতিত্ব করেছে। আমি কিন্তু থমকে গেলাম। হলুদ!

এই ঝাঁ ঝাঁ চৈত্রের দুপুরে হলুদ গোলাপ কোথাও পাচ্ছি না। আমি পড়েছি বিপদে। যেহেতু গোলাপের মতো সুন্দর একটা জিনিস এই বিপদের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, তাই এই বিপদ হল বড় সুন্দর বিপদ। সুন্দর বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি। আমার পকেটে টাকা কচকচ করছে। হাতে ধার করা ঘড়ি। আমি ট্যাক্সি নিয়ে শহরের বাজারে বাজারে ঘুরছি গত দু'ঘণ্টা ধরে। ফুলের দোকান দেখলেই ছুটে যাচ্ছি। শপিং মল, ফুটপাথ, বুটিক, শ্মশানের আশপাশ কিচ্ছু বাদ দিচ্ছি না। পার্ক স্ট্রিটে কবরস্থানের চারপাশেও চক্কর দিলাম। লাল, সাদা, মেজেন্টা, মেরুন, এমনকী বাইপাসের শপিং মলে অসম্ভব দামি কালো গোলাপও পেলাম। কিন্তু হলুদ নেই! কোথাও নেই। কী হল! বেছে বেছে আজই কি দেশে হলুদ গোলাপ ফোটেনি? নাকি শহরে সাপ্লাই নেই? বেলেঘাটার

মোড়ের এক দোকানে দোকানদার বলল, 'দাদা প্লাস্টিকের হবে। দেব?' ইচ্ছে করল, ছোকরার মুখে একটা চড় কষাই। প্লাস্টিকের ফুল দেওয়ার মানে তমালের প্রোমোশনও হবে প্লাস্টিকের। ঘড়ির কাঁটা বাঁইবাঁই করে ঘুরছে। আর সময় নেই। তিনটে বাইশ হতে বাকি মোটে অল্পক্ষণ। সময় এত তাড়াতাড়ি ছোটে! নাকি আজ সে স্পিড বাড়িয়ে দিয়েছে? হতে পারে। একটা অলস মানুষকে এতদিনে বাগে পেয়েছে। পেয়ে খেলছে।

'দেখ ব্যাটা কেমন লাগে। এতদিন আমাকে নিয়ে খেলেছিস, এবার ঠেলা বোঝ।'

আমি জামার হাতা দিয়ে ঘনঘন কপালের ঘাম মুছছি। না, কাজটা নেওয়া উচিত হয়নি। একেবারেই উচিত হয়নি। এতক্ষণে নিশ্চয় তমালের বস মেয়েকে নিয়ে এয়ারপোর্টে পৌঁছে গেছে। কান্নাকাটির পাটও শেষ। চূড়ান্ত বিদায়ের সময় এল বলে। সবকিছুর সঙ্গে ফাজলামি চলে, বিদায়বেলার সঙ্গে ফাজলামি চলে না। হাসি এবং চোখের জলে সে খুবই পবিত্র একটা জিনিস। সামান্য ক'টা টাকার লোভে আমার মতো অপবিত্র একটা মানুষ তার মধ্যে ঢুকে পড়তে চেয়েছিল। এখন সে আমাকে শাস্তি দিচ্ছে। শহর থেকে হলুদ গোলাপ লুকিয়ে ফেলে শাস্তি দিচ্ছে।

ট্যাক্সি ড্রাইভার আমার উদ্বেগ জেনে গেছে। বলল, 'একবার হাওড়ার দিকে যাব স্যার? মঙ্গলাহাটে খোঁজ করে দেখতেন।' আমি হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখলাম। অসম্ভব। হাওড়া পৌঁছোনোর আগেই ওই মেয়ে আকাশ দিয়ে শহর টপকে যাবে। তার থেকে এয়ারপোর্টে পৌঁছোই। দেখিনি কখনও, শুনেছি এয়ারপোর্টের ভেতরেও ফুলের দোকান আছে। বিদায় এবং স্বাগতম— দু'ধরনের ফুল পাওয়া যায় সেখানে। তবে আমি নিশ্চিত আজ সেখানেও হলুদ গোলাপ পাব না। না পাওয়া যাক। যা পাই তাই কিনব। লাল, সাদা, মেজেন্টা। কালো পেলে কালো। তারপর তমালের বসের মেয়ের সামনে গিয়ে বলব, 'ম্যাডাম ক্ষমা করবেন, তমালের কোনও দোষ নেই। দোষ আমার...।'

আমি ট্যাক্সিচালককে বিড়বিড় করে বললাম, 'দরকার নেই। আপনি জোরসে চালান। এয়ারপোর্ট।'

ট্যাক্সি জোরে ছুটল এবং অল্পক্ষণের মধ্যে উলটোডাঙার মোড়ে এসে ব্রেক কষল। সামনে কয়েকশো গাড়ি জট পাকিয়ে আছে। নড়াচড়ার উপায় নেই। না সামনে, না পিছনে। চালক খবর আনল, সামনে গোলমাল শুরু হয়েছে। অটো এবং বাসের ধাক্কাধাক্কিতে প্রথমে ঝগড়া, পরে হাতাহাতি এবং শেষ পর্যন্ত পথ অবরোধ শুরু হয়েছে। তবে অবরোধ হচ্ছে পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে। প্রথমে অটোচালকরা করছেন, তাঁদেরটা শেষ হলে বাসের কর্মীরা নামবেন। এর মাঝখানে যাত্রীরাও পুলিশের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন। সেরকম হলে তৃতীয় পর্যায়ে তাঁরা অবরোধ শুরু করতে পারেন। মনে হচ্ছে, সব মিলিয়ে ঘণ্টা তিনেকের মামলা।

আমি ট্যাক্সির সিটে মাথা এলিয়ে দিলাম। মনে মনে নিজেকে বললাম, ছি সাগর, এ তুমি কী করছ! তুমি বিপদ থেকে পালিয়ে যেতে চাইছ! বিপদ থেকে তোমার মতো ছোট মানুষরা কখনও পালাতে পারে? পারে না। সেই বিপদ সুন্দর হলেও পারে না, অসুন্দর হলেও পারে না। বিপদ সঙ্গে নিয়েই হাসিমুখে তোমাকে বেঁচে থাকতে হবে। থাকতেই হবে।

আমি বসের মেয়ের বিদায়বেলার সময় মানলাম। ধার করা ঘড়ি দেখে ঠিক তিনটে কুড়িতে ট্যাক্সির সিটে মাথা রেখে পরম নিশ্চিন্তে গভীর ঘুমের মধ্যে ডুবে গেলাম।

বসে আছি ভাঙা মোড়ার ওপর। যে-কোনও মুহূর্তে মোড়া একপাশে কাত হয়ে পড়তে পারে। আবার নাও পড়তে পারে। সামনের তক্তপোশের ওপর শুয়ে আছে আট বছরের এক ফুটফুটে বালিকা। তার বড় বড় চোখ। চোখের তলায় থ্যাবড়ানো কাজল। একমাথা চুল ছড়িয়ে আছে তেলচিটে বালিশের ওপর। মেয়েটি পরে আছে একটা হলুদ-রঙা ফ্রক। বহুবার ধোয়ার ফলে রং ফ্যাকাশে মেরে গেছে। দরমা বেড়ার ফাঁক দিয়ে শেষ বিকেলের আলো ছিটকে এসে পড়েছে এই সুন্দর মেয়েটির মুখে। তাকে আরও সুন্দর দেখাচ্ছে।

আমি ঝুঁকে পড়ে বললাম, 'তুমি কেমন আছ?'

মেয়েটি হেসে মাথা নাড়ল। ফিসফিস করে বলল, 'ভাল। তুমি কেমন আছ?'

আমিও হাসলাম। বললাম, 'আমিও ভাল আছি। একটু আগে পর্যন্ত ছিলাম না, এখন খুব ভাল আছি।'

রামেশ্বর এবং রামেশ্বরের বউ আমাকে নিয়ে খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। রামেশ্বর গিয়েছে চা আনতে। ঘরে চা-পাতা নেই। রামেশ্বরের বউ গিয়েছে সেই চায়ের জন্য কাপ জোগাড় করতে। অতিথিকে তো আর মাটির ভাঁড়ে চা দেওয়া যায় না। আমারও আসতে অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছে। উলটোডাঙার অবরোধ শেষ হওয়ার পর ট্যাক্সি ছাড়ল। মাঝখানে তমালের দেওয়া টাকায় কিছু কেনাকাটা করলাম। এক বাক্স মিষ্টি, কিছুটা বিস্কুট, লজেন্স, আচার এক শিশি, হজমিগুলি কয়েক প্যাকেট, চানাচুর খানিকটা আর খানকতক পুতুল। এমন পুতুল যা নিয়ে শুয়ে শুয়ে খেলা যায়। এন্টালি মোড়ে ট্যাক্সি থেকে নামলাম।

নামতেই দেখি...। চমকে উঠলাম। এ কী! ফুটপাত আলো করে বসে আছে ফুলওয়ালা! যেন আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

পুতুলগুলো মেয়েটার হাতের কাছে রেখে বললাম, 'তুমি খেলবে। কেমন?' মেয়েটা একগাল হেসে মাথা নাড়ল। আমি বললাম, 'আর একটা জিনিসও তোমার জন্য এনেছি।'

'কী?'

'দাঁড়াও দেখাচ্ছি।'

আমি শুধু গাদাখানেক গোলাপই কিনিনি, একটা সুন্দর ফুলদানিও কিনেছি। সাদা চিনামাটির ফুলদানি। শালপাতার মোড়ক থেকে বের করে হলুদ গোলাপগুলো সেখানে রাখতেই গোটা ঘরটা ঝলমল করে উঠল। সেদিকে তাকিয়ে আমি ফিসফিস করে বললাম, 'বিদায় নয়, আমি আবার আসব। বারবার আসব।'

প্রতিদিন রোববার, ১২ এপ্রিল ২০০৯

নীল

রাগে আমার শরীর ঝনঝন করে উঠল। লোকটা কে? নাকি ছাত্রীরা কেউ মজা করেছে? এত সাহস! মেয়েরা আমাকে আড়ালে 'যম দিদিমণি' বলে ডাকে।

যমের মতো ভয় পায় বলে 'যম দিদিমণি'। 'যম দিদিমণি'র সঙ্গে এই ভয়ংকর ঠাট্টা করবার সাহস ওদের হতেই পারে না।

আমি আবার কাগজটা খুললাম। মোটে কয়েকটা লাইন। সেটাই যথেষ্ট। রাগে গোটা শরীরটা আবার ঝনঝন করে উঠল।

আজকাল এরকম হয়। রাগলে চোখমুখ লাল হয়ে যায়। গায়ের রং ফরসা বলে সেই লাল গালে, নাকের ডগায় চলে আসে। চোয়াল কঠিন হয়ে যায়। বাইরে থেকে বোঝা যায়। শুধু বোঝা যায় না, আমি সেরকম আচরণও করি। সেই আচরণ কোনও কোনও সময় মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। গত সপ্তাহেই একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড করেছি। ক্লাস টেনের ফার্স্ট গার্ল ক্লাসে হাসছিল। ঘসঘস করে ডায়েরিতে লিখে গার্জেন কল করলাম। বাবা-মাকে ডেকে যাচ্ছেতাই করে বকলাম।

'শুধু লেখাপড়ায় নম্বর পেলেই হয় না। মেয়েকে ঠিকমতো মানুষ করবেন। আমার মেয়ে পড়ার সময় হাসাহাসি করলে চড় মেরে দাঁতগুলো ফেলে দিতাম।'

আমি জানি এটা বাড়াবাড়ি। একটা ফুটফুটে কিশোরী সামান্য হাসাহাসি করছে বাড়ির লোককে ডেকে পাঠানো বাড়াবাড়ি ছাড়া আর কী?

অথচ আমি এমন ছিলাম না। রাগ লুকিয়ে রাখতে পারতাম। মেজাজ খারাপ হলেও মিষ্টি করে হাসতে পারতাম। ছাত্রীরা খুব পছন্দ করত। বলত, 'বীণাদি দারুণ! একদম রাগ করে না। হোমটাস্ক না করলে এমন সুন্দর করে হাসে যে আমরাই লজ্জা পেয়ে যাই।'

শুধু ছাত্রীরা নয়, কলিগরাও অবাক হত।

'এই হাসির অভিনয় তুই কোথা থেকে শিখেছিস বীণা? ছুটির পর স্কুলে বসে খাতা দেখতে হবে শুনে আমরা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলাম, আর তুই মিটিমিটি করে হাসলি! যেন বিরাট খুশির খবর! কায়দাটা আমাদেরও শিখিয়ে দে।'

আমি বলতাম, 'এমনি হবে না, খরচ করতে হবে।'

'হাসি শেখার জন্য আবার খরচ কীসের! দাঁত বের করে থাকলেই তো হল।'

আমি বলতাম, 'না, হল না। রাগ লুকোনোর একটা ম্যাজিক আছে। সেটাই আসল। নইলে দাঁতের ফাঁক দিয়ে রাগ বেরিয়ে আসবে, তখন হাসিকে আর হাসি মনে হবে না। আমি হলাম রাগ লুকোনোর ম্যাজিশিয়ান।'

আমার কথা শুনে সবাই জোরে হেসে উঠত।

আসলে ম্যাজিক-ট্যাজিক কিছুই নয়। ছেলেবেলা থেকেই আমি এমন। চেঁচামেচি, ঝগড়া সহ্য হত না। বাবা-মা'র সঙ্গে গোলমাল হলে ঘরের দরজা বন্ধ করে এক, দুই, তিন করে গুনতাম। এই পদ্ধতিতে রাগ পড়তে সাধারণত কুড়ি পর্যন্ত গুনতেই হয়। আমার পনেরো-ষোলোতেই কাজ হত। সব ভুলে যেতাম। আরও বেশি কিছু হলে বাথরুমে লুকিয়ে খানিকটা ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে কেঁদে নিতাম। তারপর চোখের জলটল মুছে মা'র কাছে গিয়ে একগাল হেসে বলতাম, 'খেতে দাও।'

'ওমা! এই তো খেলি।'

'আবার দাও। বকেছ তার ফাইন।'

মা হেসে ফেলত। বলত, 'পাগল মেয়ে।'

সেই পাগল মেয়ে স্বাভাবিক হতে শুরু করল বিয়ের পর। লুকোনোর বদলে রাগকে বের করে আনতে শিখলাম। এও কি একরকমের ম্যাজিক? কে জানে। তবে হুট করে হয়নি, সময় লেগেছে। এ ব্যাপারে আমাকে সবথেকে বেশি সাহায্য করেছে আমার স্বামী। সুপর্ণ। সুপর্ণকে ভারী সুন্দর দেখতে। লম্বা, স্বাস্থ্যবান, মাথা ভরতি চুল। তবে গায়ের রং খানিকটা ময়লার দিকে। ময়লাই ভাল। ফ্যাটফ্যাটে সাদা পুরুষমানুষ আমার দু'চক্ষের বিষ।

এই ধরনের চিঠির তলায় সাধারণত নাম থাকে না। এটায় আছে। অপূর্ব। অপূর্ব মুখার্জি। হাতের লেখা দেখে বয়স বোঝা যাচ্ছে না। তবে পাকা হাতের লেখা। সেই লেখা যে সুন্দর এমনও নয়। প্রেমপত্র ধরে ধরে লেখা হয়। স্কুল-কলেজে আর পাঁচজন মেয়ের মতো আমিও কয়েকটা প্রেমপত্র পেয়েছিলাম। কিছুই মনে নেই, একটার শুধু হাতের লেখা মনে আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নকল। তার ওপর আবার ইচ্ছে করে কতকগুলো জায়গা কেটে কেটে নকশা আঁকা। 'শেষের কবিতা'র পাণ্ডুলিপির মতো। নকলটা খারাপ করেনি, তবে বানানে অজস্র ভুল ছিল। বন্ধুরা আমাকে কিছুদিন 'কবিগুরুর প্রেমিকা' বলে খেপাল।

এটাও কি প্রেমপত্র? চল্লিশ ছুঁতে বেশি দেরি নেই এমন একজন মহিলাকে কে প্রেমপত্র দিল? ছি ছি।

আমি হাতের রুমাল দিয়ে নাকের দু'পাশ, গলা মুছলাম। ক'দিন হল দেখছি, মেজাজ খারাপ হলে একটু ঘেমে ঘেমে যাচ্ছি। প্রেশার হচ্ছে।

সুপর্ণর সঙ্গে যখন বিয়ে হয় তখন আমি পরীক্ষায় দুর্দান্ত রেজাল্ট করে স্কুলের চাকরিতে ঢুকে পড়েছি। দু'বছর হয়েও গেছে। মজার ব্যাপার হল যে রবিবার কাগজে আমার জন্য 'পাত্র চাই' বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল সেই রবিবারই আমার বিয়ে পাকা হয়ে গেল। মাত্র একবেলা সময় লাগল। তবে বিজ্ঞাপনের কারণে নয়। সেদিন সকালে আমার দূর সম্পর্কের এক মামিমা সম্বন্ধ নিয়ে উপস্থিত হলেন। ছেলে আর ছেলের মা নাকি কোন বিয়েবাড়িতে আমাকে দেখেছে। সেদিনই মা-বাবার সঙ্গে কথা বলত, কিন্তু আমরা গাড়িতে হুস করে বেরিয়ে যাওয়ার কারণে বলতে পারেননি। তখন মামির কাছে খোঁজখবর নিয়েছে। রাজি থাকলে রবিবার সন্ধেবেলা কথা ফাইনাল করতে আসবে। বাবার তো মাথায় হাত।

'ইস দেখো দেখি, গাদাখানেক টাকা নষ্ট হল, মিছিমিছি বিজ্ঞাপনটা দিলাম। বিয়েবাড়িটা যদি দুটোদিন আগে থাকত...।'

মামিমা বড় করে হেসে বললেন, 'এটা একটা শুভ লক্ষণ। এখন ঠাকুরের কৃপায় যদি সবকিছু ঠিকঠাক হয়। ছেলে পাত্র হিসেবে অতি চমৎকার।'

পাত্র হিসেবে সুপর্ণ সত্যি চমৎকার। শুধু ভাল চাকুরে নয়, সুদর্শন, বিনয়ী এবং হাসিখুশি। কথাবার্তা হওয়ার পর বাবার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। এই যুগে ভাবী শ্বশুরের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম চাট্টিখানি কথা নয়। বাড়ির সবাই গলে গেল। আমিও গলে গেলাম। এরকম একটা মানুষই যেন আমি মনে মনে চাইছিলাম। ঠোঁট টেপা গম্ভীর লোক আমার মোটে পছন্দ নয়। ওই লোকগুলো ভেতরে ভেতরে মহা পাজি হয়।

বাসরঘরে সুপর্ণ জমিয়ে দিয়েছিল। আমার পিসতুতো, মাসতুতো, খুড়তুতো বোনেরা বলল, 'গান শোনাতে হবে জামাইবাবু। শোনাতেই হবে।'

ও বলল, 'গান জানি না, তবে কবিতা বলতে পারি। দিদিমণি বউ তাই তার সঙ্গে মিলিয়ে কবিতা। চলবে?'

সবাই হইহই করে উঠল, 'খুব চলবে।'

সুপর্ণ হাতমুখ নেড়ে শোনাল— 'আমি আজ কানাই মাস্টার পড়ো মোর বিড়াল ছানাটি, আমি ওকে মারিনে মা মিছে...।'

বাসররাতে কনের হাসার ওপর কোনও নিষেধাজ্ঞা থাকে না। সে হেসে কুটোপাটিও খেতে পারে। একটাই শুধু নিয়ম, যতই হাসো মুখে আঁচল রাখতে হবে। আমি হাসতে হাসতে মুখে আঁচল রাখতেও ভুলে গেলাম।

সত্যিই পাত্র চমৎকার।

পাত্র হিসেবে চমৎকার এই মানুষটা স্বামী হিসেবে কতখানি গোলমেলে বুঝতে পারলাম ঠিক দশদিনের মাথায়। সেদিন সুপর্ণ দত্ত তার নববিবাহিতা স্ত্রীকে চড় মারে।

চিঠিটা এসেছে কাল বিকেলের ডাকে। আজ ফার্স্ট পিরিয়ডের পর কানাই দিল। কানাই আমাদের অফিস স্টাফ। অফিসের ঠিকানায় চিঠিপত্র এলে গুছিয়ে রাখে। আমি এইট বি-র ক্লাস করে রেজিস্টার জমা দিতে গিয়েছিলাম। কানাই বলল, 'ম্যাডাম, আপনার চিঠি। আর এই ম্যাগাজিনটাও আছে।' ম্যাগাজিন না কচু। এসব কলকাতার পাবলিশার্সদের বুলেটিন। স্কুল বইয়ের সিজন শুরুর তিনমাস আগে থেকে জ্বালাতন শুরু করবে। শিক্ষা, শিক্ষা পদ্ধতি, সিলেবাস এইসব নিয়ে হাবিজাবি ক'টা লেখা, বাকি সব বইয়ের বিজ্ঞাপন। আমি শুধু চিঠিটা নিলাম। বিয়ের পরে প্রথমদিকে কোয়ার্টারেই চিঠি নিতাম। যেদিন দেখলাম, সব চিঠির সঙ্গে সুপর্ণ আমার মায়ের চিঠিও পড়ছে সেদিন থেকে ঠিকানা বদলে স্কুলে করেছি। সুপর্ণর অবশ্য একটা গুণ ছিল। সে কখনও লুকিয়ে চিঠি পড়ত না। আমার সামনেই পড়ত। তারপর হেসে বলত, 'বীণা, তোমার মা কিন্তু বেশ গুছিয়ে বাংলা লিখতে পারেন। তাই না?'

সাদা লম্বা খাম। তবে খানিকটা ভেজা ভেজা। কানাইয়ের কাণ্ড। জলের ওপর খামটা রেখেছিল। আমি কড়া চোখে কানাইয়ের দিকে তাকালে সে জিব কাটল। আমি দ্রুত খামের মুখ ছিঁড়ে কাগজটা বের করলাম।

এই ফাঁকে চড়ের গল্পটা বলে নিই। যে দিদিমণি ভুলেও কখনও ছাত্রীদের গায়ে হাত তোলেনি তার চড় খাওয়ার গল্পটা নিশ্চয়ই ইন্টারেস্টিং হবে। বিয়ের পর পর আমাদের তখন গাদাগুচ্ছের নেমন্তন্ন। প্রায় সন্ধেতেই সেজেগুজে ওর মোটরবাইকের পেছনে চেপে বেরিয়ে পড়ি। সুপর্ণ বিকেলে অফিস থেকে ফোন করে।

'মনে আছে বীণা?'

'হ্যাঁ, মনে আছে। আজ তো তোমার বন্ধুর বাড়ি।'

'বন্ধু নয়, কলিগ। আমাদের অ্যাকাউন্টসে আছে। বিয়ের সময় কলকাতায় যেতে পারেনি।'

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, 'আমার টায়ার্ড লাগছে। পরপর এতগুলো...। আজকের দিনটা ক্যানসেল করা যায় না? শরীরটা ভাল লাগছে না।'

সুপর্ণও চুপ করে থাকে মুহূর্তখানেক। তারপর বলে, 'না, করা যায় না।'

আমি একটু আপসেট হই। নরম গলাতেই বলি, 'কেন? নেক্সট শনিবার যদি যেতাম?'

সুপর্ণ কঠিন গলায় বলে, 'না, আজই যাব।'

আমি তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিই। হেসে বলি, 'ঠিক আছে বাবা, আজ যাচ্ছি, তবে এই উইকে কিন্তু আর নয়। আবার কটাদিন গ্যাপ দিয়ে।'

সুপর্ণ তীক্ষ্ণ গলায় বলে, 'না, রোজই তোমাকে যেতে হবে। যতক্ষণ আমি বলব, ততক্ষণ যেতে হবে। বীণা, এ বাড়িতে তুমি আমার কথামতো চলবে, তোমার কথামতো নয়। আর হ্যাঁ, শোনো, আজ তোমার শাড়ি আমি বেছে দেব। পরশু তুমি নীল রং বেছেছিলে। আমি লক্ষ করে দেখেছি, ব্লু-তে তোমায় মানায় না। এরপর থেকে সাজগোজের আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবে।'

মোবাইল রেখে দিয়ে সারা বিকেল আমি চুপ করে বসে রইলাম। খুব কান্না পেল। তার থেকেও বেশি রাগ হল। দাঁতে দাঁত চেপে সেই রাগ লুকোলাম। সন্ধের মুখে গা ধুলাম, চুল বাঁধলাম। ওয়ার্ডরোব খুলে শাড়ি, জামা, হাতের ব্যাগ, রুমাল বের করলাম।

সবকিছুর রং নীল।

সুপর্ণ সেদিন বাড়ি ফিরে এসে আমাকে চড় মারে। তারপর ঠান্ডা গলায় বলে, 'যাও, শাড়িটা বদলে এসো।'

অন্য কোনও মেয়ে হলে তুলকালাম কাণ্ড করত। আমিও হয়তো করতাম, কিন্তু পারলাম না। রাগতে গিয়ে দেখলাম, রাগ খুঁজে পাচ্ছি না। লুকোতে লুকোতে হারিয়ে ফেলেছি! আমি নিঃশব্দে শাড়ি বদলাতে গেলাম।

চিঠিতে কোনও সম্বোধন নেই—

'সেদিন তোমাকে দেখার পর থেকেই আমার ইচ্ছে হয়েছিল, একটু কথা বলি। কিন্তু চারপাশে এত লোক ছিল যে পারলাম না। তোমার মোবাইলে কয়েকবার ফোন করে দেখলাম সুইচ অফ। মনে হয় নম্বরটা ভুল। তখন ভাবলাম চিঠি লিখব। তাও দুটো সপ্তাহ পার হয়ে গেল। চিঠি লিখতে অস্বস্তি হচ্ছিল। ভয়ও পাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম, যদি কিছু মনে করো। আজ সাহস করে লিখে ফেললাম। সেদিন তোমাকে নীল রঙে দারুণ দেখাচ্ছিল। খুব সুন্দর। বিউফুল। ইতি তোমার অপূর্ব।'

প্রথম ধাক্কাটা সামলে নেওয়ার পরই কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। আমি করিডরে দাঁড়িয়েই আরও একবার কাগজটার ওপর চোখ বোলালাম। এপাশ-ওপাশ তাকালাম। কেউ দেখছে না তো? দুটো মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এদিকে আসছিল, আমাকে দেখে আবার নেমে গেল। নিশ্চয় ভয় পেয়েছে। গত কয়েক বছরে আমি এই ব্যাপারটা করতে পেরেছি। ছাত্রীরা আমার কাছে ঘেঁষতে চায় না। কলিগরা পারলে অ্যাভয়েড করে। পুরনোরা কেউ কেউ ছেড়ে চলে গেছে। নতুনরাও অস্বস্তি পায়। কেন পাবে না? তারা আমার রাগ, বিরক্তি, খিটখিটেপনা সহ্য করবে কেন? কারও বাড়িতে নেমন্তন্ন হলে সবার আগে আমাকে বলা হত। আমি হতাম লিডার। হইচই বাধিয়ে দিতাম। সবার কাছ থেকে চাঁদা তুলে দোকানে ছুটতাম, উপহার কিনতাম। সবাই বলত, 'বীণার টেস্ট খুব ভাল।' একবার তো কী কেলেঙ্কারি। ছন্দার বিয়ের সময় চাঁদার পুরো টাকাটাই হারিয়ে বসলাম। বিয়ে বলে কথা, একটু-আধটু নয়, অনেকটা টাকা। আমার চোখে জল চলে এল। শুধু টাকার শোকে নয়, খুব চিন্তা হল। চিন্তা হবে না? বিয়ে দু'দিন বাদেই। নিজের এটিএম থেকে যে তুলে সেই সময়ের মতো ম্যানেজ করব তার উপায় নেই। বিয়ের পর আমার এটিএম কার্ড, চেকবই, ব্যাঙ্কের কাগজপত্র সব সুপর্ণর কাছে থাকত।

'ওসব তোমার রেখে দরকার নেই। মেয়েরা আবার হিসেবপত্র বোঝে নাকি? যখন লাগবে চেয়ে নেবে।'

আমি বললাম, 'ক্রেডিট কার্ডটা অন্তত দাও।'

সুপর্ণ হেসে বলল, 'খেপেছ? বাড়িতে কাবুলিওয়ালা চলে আসবে।'

বাধ্য হয়ে রাতে ওকে সব বললাম। সুপর্ণ বলল, 'একটা টাকাও দেব না।'

আমি বললাম, 'কেন?'

সুপর্ণ বলল, 'চাঁদার টাকাগুলো নিজের কাছে রাখার আগে একবারও আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে?'

'এতে জিজ্ঞেস করার কী আছে? স্কুলের ব্যাপার।' আমি অবাক হলাম।

'জিজ্ঞেস করার আছে। সবই আমাকে জিজ্ঞেস করার আছে। আর যদি না থাকে তা হলে এখন বলতে এসেছ কেন? যাও বিরক্ত কোরো না।'

মনে পড়ে অনেক কষ্টে ধার করে সেই টাকা জোগাড় করেছিলাম। মাসে মাসে একশো-দুশো করে মিটিয়েছি। তারপর থেকে আর ওসবের মধ্যে যাই না। শুধু চাঁদা নয়, নেমন্তন্ন বাড়িতে যাওয়াও কমিয়ে দিয়েছি। আর এখন তো কলিগরাই আমাকে বাদ দিয়েছে। যেটুকু নয়, শুধু সেটুকু বলে। আমি জানি, দু'-একটা লুকোয়ও। স্কুলের ফাংশন-টাংশনেও আমি একঘরে। দর্শক আসনে বসে চলে আসি। শুধু অনেক বছর পর গতমাসে...।

কে অপূর্ব? কার এত সাহস? কে আমার সঙ্গে এই ঠাট্টা করল? আমাকেই করেছে তো? আমি খাম উলটে দেখলাম। না, কানাই ডুবিয়েছে ভালই। নাম ঠিকানার জায়গাটাই ভিজিয়েছে। থেবড়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। তবু 'বীণা দত্ত'ই তো মনে হচ্ছে। এই তো স্পষ্ট 'দত্ত' লেখা। অবন্তীনগর উচ্চবালিকা বিদ্যালয়টাও পড়তে পারছি।

সরস্বতী পুজোর দিন জন্মেছিলাম বলে মা শখ করে নাম রেখেছিল বীণা। নাম হিসেবে

খুবই বিচ্ছিরি আর প্রাচীন। বন্ধুরা ঠাট্টা করে বলত, 'ভাগ্যিস সরস্বতী পুজোর দিন হলি, একটু এদিক-ওদিক হলে বিরাট ঝামেলা হত। লক্ষ্মী পুজোয় জন্মালে তোর নাম রাখতে হত পেঁচা। আমরা তোকে ডাকতাম মিস পেঁচা।'

ঠাট্টা হলেও একথায় রাগ হত। ফরসা, টানা টানা চোখ, টিকলো নাকের বালিকাকে পেঁচা বললে রাগ হবে না। আমি রাগ লুকিয়ে জোরে জোরে হাসতাম। বন্ধুরাও জানত, আমি রাগতে পারি না। তবে নাম একেবারে ব্যর্থ হল না। গান শিখলাম। বেশি কিছু নয়, মোটামুটি। গলা যে মারাত্মক কিছু তা নয়। বিয়েটিয়ের জন্য যতটা দরকার হয়। তবে আমার দরকার হয়নি। সুপর্ণর বাড়ি থেকে যখন দেখতে এসেছিল, মা লজ্জা লজ্জা মুখ করে একবার বলল, 'মেয়ের গান শুনবেন না?'

আমার শাশুড়ি সুন্দর করে হেসে বলেছিলেন, 'শুনে কী করব দিদি? ওর নামেই তো গান। কী বীণা, তাই না মা?'

আমার এত ভাল লাগল! যে নামের জন্য একসময় বন্ধুরা খেপিয়েছিল, সেই নামকে যে কেউ এমন চমৎকার করে ভাবতে পারে! সেদিন ভেবেছিলাম, বিয়ের পর গানটা নতুন করে শুরু করলে কেমন হয়?

শুরুও করেছিলাম। বাড়িতে হারমোনিয়াম নিয়ে বসতাম। স্কুলে অনুষ্ঠান হলে লজ্জা লজ্জা মুখে একটা-দুটো গাইতে শুরু করলাম। একদিন সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে এসে সুপর্ণ বলল, 'শুনলাম, তুমি নাকি আজ স্কুলে গান করেছ?'

আমি উৎসাহী গলায় বললাম, 'নবনীতাদির ফেয়ারওয়েল ছিল। তুমি কোথা থেকে শুনলে?'

সুপর্ণ শুকনো হেসে বলল, 'ছোট জায়গা, খবর চলে আসে।'

আমি আহ্লাদি গলায় বললাম, 'কী গান গেয়েছি বলো তো?'

'জানি না। কী গান?'

আমি বললাম, 'যারা কাছে আছে তারা কাছে থাক, তারা তো পারে না জানিতে—/ তাহাদের চেয়ে তুমি কাছে আছ, আমার হৃদয়খানিতে। গানটা সুন্দর না?'

'গানটা সুন্দর।'

আমি একটু সরে এসে বললাম, 'শুনবে?'

সুপর্ণ মুখ তুলে বলল, 'হ্যাঁ শুনব।'

আমি খুব খুশি হলাম। বললাম, 'জানো কোয়ার্টারের সবাই ধরেছে পুজোর সময় গাইতে হবে। ষষ্ঠীর দিন। এখানে স্টেজ হবে, রিহার্সাল হবে। ভাল হবে না?'

সুপর্ণ গম্ভীর গলায় বলল, 'তুমি গাইবে না বীণা।'

আমি চমকে উঠলাম, 'মানে!'

'টিচার মানুষ বাইরে নাচগানের মধ্যে থাকাটা ঠিক নয়।'

'রবীন্দ্রসংগীত তো খারাপ কিছু নয়।'

'খারাপ ভালর প্রশ্ন উঠছে না। প্রশ্ন হল, আমার পছন্দ কি পছন্দ নয়। আমার বউ রাস্তায় রাস্তায় গেয়ে গেয়ে বেড়াক এটা আমার পছন্দ নয় বীণা।'

আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, 'আমার তো পছন্দ।'

সুপর্ণ সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'এখন আর তার কোনও দাম নেই।'

শুধু বাইরে নয়, এমনকী বাড়িতেও গান বন্ধ করে দিলাম। যত দিন গেল আমার কাছে পরিষ্কার হতে থাকল, মানুষটার কাছে সত্যি আমার মতামতের আলাদা কোনও মূল্য নেই। তার ইচ্ছেই আমার ইচ্ছে। তার পছন্দই আমার পছন্দ। জামাকাপড়, গয়নাগাটি থেকে বকাঝকা আদর সবটাই পরিমাণে হয়তো অনেক, কিন্তু তার খুশিমতো। সেই খুশিতে আমাকে খুশি হতে হবে। মাঝরাতে ঘুম ভাঙিয়ে আমাকে আদরে সোহাগে ব্যতিব্যস্ত করে তুলত সুপর্ণ। একবারও জিজ্ঞেস করত না আমার ভাল লাগছে কি না, আমি ক্লান্ত কি না। আবার সারা সপ্তাহ অপেক্ষা করে থাকলেও গায়ে হাত দিত না। আমি ছটফট করলে বিরক্ত হত। এমনও হয়েছে, যখন না পেরে জোরাজুরি করেছি বালিশ আর চাদর হাতে ড্রইংরুমে শুতে চলে গেছে। আমার অপমানের দিকে ফিরেও তাকায়নি। সকালে স্বাভাবিক গলায় বলেছে, 'চা দাও বীণা। তোমার বানানো চা না খেয়ে দিন শুরু করতে আজকাল ভাল লাগে না। ব্যাড হ্যাবিট করে দিয়েছ ডার্লিং।'

আমি বলতাম, 'আদিখ্যেতা।'

বলে হাসতাম। হাসা উচিত নয়, তবু হাসতাম। কী করব? আমি যে রাগ লুকোতে পারি।

অনেকদিন পর গতমাসে আবার বাইরে গান করতে হল। টাউন হলে স্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশন ছিল। আমাদের নিয়ম হল প্রতি বছরই শিক্ষিকাদের কেউ গান গেয়ে অনুষ্ঠান শুরু করবে। এবার পৌষালির গাওয়ার কথা ছিল। সকাল থেকে ওর ছেলের ধুম জ্বর। বড়দি আমাকে ডেকে বলল, 'বীণা, তোমাকে ম্যানেজ করতে হবে।'

'আমি! আমি তো কত বছর গানটানের মধ্যে নেই বড়দি। আমাকে ছেড়ে দিন।'

'ইমপসিবল, এতদিনের একটা নিয়ম, যা পারো করে দাও। প্লিজ। পুরোটা গাইতে হবে না, দু'-চারটে লাইনই যথেষ্ট। পৌষালি পারবে না শুনে ভেবেছিলাম শাল্মলীকে বলব। সে বেচারিরও কী অবস্থা তো দেখছ, গলাটলা বসে যাচ্ছেতাই অবস্থা।'

আমি চুপ করে রইলাম। বড়দি নিচু গলায় বলল, 'আমি তোমার সমস্যাটা জানি। ইফ ইউ ওয়ান্ট আই ক্যান টক উইথ সুপর্ণ। বলব?'

আমার শরীর ঝনঝন করে উঠল। চোয়াল কঠিন হয়ে গেল। আমি ঠোঁট কামড়ে বললাম, 'না, আমি গাইব।'

আমি গাইলাম। তিন-চার লাইন নয়, পুরো গানই গাইলাম। বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা। গান খুব ভাল হল না। জড়তা ছিল। আবার একেবারে খারাপও নয়। সকলেই প্রশংসা করল। আমি অবশ্য গায়ে মাখিনি। বাড়ি ফিরে এসে সুপর্ণকে বলিনিও। আমার ধারণা ও খবর পেয়ে গেছে। তা ছাড়া এটা কোনও প্রয়োজনীয় কথা নয়। আজকাল সুপর্ণর সঙ্গে প্রয়োজন ছাড়া আমি কথা বলি না। সেও বলে না। দু'জনে চুপ করে টিভি দেখি। চুপ করে খাই। চুপ করে বসে থাকি ও চুপ করে শুতে যাই। আমাদের শোওয়ার জায়গা এখন আলাদা। সুপর্ণ ড্রইংরুমে ব্যবস্থা করেছে। বাবুকে নিয়ে আমি শুই। ছেলেটার বড্ড খারাপ স্বভাব হয়েছে, রাতে হাত-পা ছোড়ে। অনেকটা জায়গা লাগে।

মজার কথা হল, সুপর্ণ যে বিয়ের পর আমার সবকিছুতে 'না' বলত এমন নয়। বহু কিছুতেই সায় দিয়েছে। সিনেমা, থিয়েটার, বন্ধুর বাড়ি বা বাবার ওখানে যাব বললে নিজেই ব্যবস্থা করে দিত। নিয়েও যেত। শুধু এইটুকু নয়, বাইরে কোথাও বেড়াতে যেতে চাইলেও এক পায়ে খাড়া। এক দিনের নোটিশে অফিস ছুটি নিয়ে বসে আমাকে চমকে দিত।

'চলো পাহাড়ে যাই। ছোড়দিরা পেলিং ঘুরে এল।'

'খেপেছ, সি বিচ ফেলে পাহাড়! আমি ভাইজ্যাকের টিকিট কাটতে দিয়েছি।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'টিকিট কাটতে দিয়েছ! সে কী, আমাকে একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলে না?'

সুপর্ণ অবাক হয়ে বলল, 'এতে জিজ্ঞেস করার কী আছে? আই লাইক সি। সমুদ্র স্নান করার মতো মজা আর কীসে আছে? আই ট্রাভেল এজেন্টকে টিকিট করতে বলে দিলাম।'

আমি বাথরুমে গিয়ে মনে মনে গুনলাম। ষোলো, সতেরো, আঠেরো...। খেয়াল করলাম রাগ লুকোতে দেরি হচ্ছে। সময় লাগছে।

আমি বদলাতে শুরু করলাম। বাবু হওয়ার পর সেই বদলটা চোখে পড়ার মতো হল। সন্তান হওয়ার পর রাগী মানুষের রাগ কমে। শান্ত মানুষ আরও শান্ত হয়। আমার হল উলটো। দুম করে হল না, হল ধীরে ধীরে।

একদিকে সুপর্ণর সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হল, অন্যদিকে একটা খিটখিটে মেজাজ, বিরক্তি, চাপা রাগ থাবা গেড়ে ভেতরে বসতে লাগল। গত দু'বছরে সেটা বড় আকার নিয়েছে। আমার বকুনিতে পরপর মোট চারজন কাজের মাসি কাজ ছেড়ে দিয়েছে। স্কুলেও একই কাণ্ড। মেয়েরা সামান্য দুরন্তপনা করলে বকুনি, মারধর শুরু করলাম। একটা সময় সব টিচাররা কামাই করলে সাবস্টিটিউশন ক্লাসগুলো আমি কেড়ে নিতাম। হাসিমুখে চক ডাস্টার হাতে চলে যেতাম। পড়াতে ভালবাসতাম। এখনও বাসি, কিন্তু, এখন আর যাই না। একটার বেশি দুটো এক্সট্রা ক্লাস ঘাড়ে চাপলেই কলিগদের সঙ্গে ঝগড়া করি। গটগট করে হেডমিস্ট্রেসের ঘরে চলে যাই।

চিঠিটা কী করব? ফেলে দেব? সেটাই উচিত। অসভ্যতামিটা কে করেছে খুঁজতে শুরু করলে বিপদ হতে পারে। খবর ছড়িয়ে পড়বে। একটা স্ক্যান্ডালের মতো। আজকাল মেয়েরা অন্যরকম হয়ে গেছে। দশ বছর আগের মতো নেই। এরকম একবার হয়েছিল। আমাদের বাংলার টিচার তপতীর বিয়ের পর মেয়েরা বাথরুমে লিখেছিল— 'তপতী ম্যাডাম আজ বরকে চুমু খেয়ে স্কুলে এসেছে।'

কথাটা দ্রুত স্কুলে ছড়িয়ে পড়ে। আমরাও জেনে যাই। 'মাথা ধরেছে,' বলে তপতী স্কুল থেকে হাফছুটি নিয়ে চলে গেল। কাজটা কে করেছে জানা যায়নি, তবে ক্লাস ইলেভেনের কোনও মেয়ের কাণ্ড, এটা ধরা গিয়েছিল। বড়দি বাথরুমের দেয়াল চুমকাম করালেন। গোটা ইলেভেন ক্লাসকে একদিনের জন্য সাসপেন্ড করলেন। তাতে আরও কেলেঙ্কারি হল। স্কুলের বাইরেও ঘটনা জানাজানি হয়ে গেল। আমার বেলায় কী হবে? মেয়েরা কী লিখবে? বীণাদি লাভলেটার পেয়েছে? ইস।

ভাবতে ভাবতে খামটা দুমড়ে মুচড়ে ফেলে দিলাম করিডরের পাশের পাঁচিলের বাইরে।

স্টাফরুমে এলাম ধীর পায়ে। খাম ফেললেও চিঠির কাগজটা যে কখন ব্যাগে ঢুকিয়ে রেখেছি খেয়াল করিনি। অথবা কে জানে হয়তো খেয়াল করেছি।

স্টাফরুমে তন্দ্রা এককোণে বসে খাতা দেখছে। পায়ের আওয়াজে মুখ তুলে বলল, 'কী হল বীণাদি, শরীর খারাপ নাকি?' আমি মাথা নাড়লাম। জল খেলাম। এক কাপ চা পেলে হত। উঠে গিয়ে বলতে ইচ্ছে করছে না।

লোকটা আমাকে কোথায় দেখল? কবে দেখল? নাকি সবটাই বানানো? বানানোই হবে। আমার মতো বুড়ি মহিলাকে 'সুন্দর' বলতে হলে বানিয়েই বলতে হয়। তার ওপর আবার 'বিউটিফুল'! ঠাস করে একটা চড় লাগালে আমি কত বড় বিউটিফুল টের পেত।

বুধবার এই সময়টা আমার পরপর দুটো ক্লাস অফ। ফাঁকা স্টাফরুমে বসে থাকি। বসে বসে বিরক্তও লাগে। খাতাটাতা দেখার না থাকলে চুপ করে কতক্ষণ বসে থাকা যায়? আগে খুব বই পড়তাম। আজকাল ভাল লাগে না। মনে হয় সব গল্পই একরকম। নিজের জীবনের মতোই একঘেয়ে।

মুখ তুলে বাইরে তাকালাম। এদিকটায় অনেক গাছপালা। স্টাফরুমের জানলা জুড়ে কৃষ্ণচূড়া লাল হয়ে আছে। রোদ পড়ে ঝলমল করছে। বাঃ ভারী সুন্দর তো! গোটা গাছটা যেন লজ্জায় রাঙা! সামান্য কৃষ্ণচূড়া এত সুন্দর হয়?

সাধারণভাবে বাড়িতে এবং বাইরে রাগ, মেজাজ খারাপ, বিরক্তি এসব দেখাচ্ছিলাম, কিন্তু জিনিস ভাঙার কড়া রাগ আমি প্রথম দেখালাম বাবুর জন্মদিনের দিন। পাঁচ বছরের জন্মদিন। একটা কাচের ডিনার সেট ভেঙে ফেললাম। জিনিসটা ভারী সুন্দর ছিল। চারপাশে গোল করে ফুল পাতা আঁকা। পাতাগুলো সব ডিশের গায়ে, ফুলগুলো বাটিতে। টেবিলে মিলিয়ে মিলিয়ে সাজালে মনে হত টেবিল জুড়ে একটা গোটা বাগান!

গেস্টরা চলে গেলে সুপর্ণ আর আমি খেতে বসেছিলাম সেদিন। রাত এগারোটা বেজে গেছে। ওইসব এলাকা ন'টার পরই নিঝুম হয়ে যায়। গাদাখানেক রান্নাবান্না করে ক্লান্ত লাগছিল। খেতে ইচ্ছে করছিল না। তার ওপর বাবুর শরীরটাও ভাল ছিল না। সকাল থেকেই ঘ্যানঘ্যান করছে। সুপর্ণ খেতে খেতে বলল, 'এবার স্কুলটা ছেড়ে দাও বীণা।'

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। খাওয়া থামিয়ে বললাম, 'চাকরি ছাড়ব! কেন? এতদিনের চাকরি ছেড়ে দেব!'

'হ্যাঁ দেবে। ছেড়ে বাবুকে দেখবে।'

'তার জন্য তো আয়া আছে।'

সুপর্ণ বলল, 'আয়া দিয়ে ছেলের কাঁথা পরিষ্কার হয়, ছেলে মানুষ হয় না। সেই কারণেই চাকরি ছাড়বে।'

আমি শান্ত গলায় বলি, 'না, ছাড়ব না।'

সুপর্ণ মুখে তুলে তাকাল। শক্ত ভঙ্গিতে বলল, 'তুমি কিন্তু বাড়াবাড়ি করছ বীণা।'

'চাকরি করাটা বাড়াবাড়ি নয়। আর সবই তো ছেড়েছি।'

সুপর্ণ ঠান্ডা গলায় বলল, 'কালই রেজিগনেশন লেটার জমা দিয়ে আসবে।'

আমার রাগ বাড়তে লাগল। খুব চেষ্টা করলাম পুরনো ম্যাজিকে সেই রাগ লুকোতে। পারলাম না। সুপর্ণর থেকেও ঠান্ডা গলায় বললাম, 'না। দেব না।'

সুপর্ণ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'শাট আপ। আমি কাল থেকে তোমায় যেতে দেব না।'

আমি চিবিয়ে চিবিয়ে বললাম, 'তা হলে সমস্যা হবে।'

'কী সমস্যা?' সুপর্ণর ঠোঁটের ফাঁকে বিদ্রূপের হাসি।

আমিও মুখ তুলে তাকালাম। বললাম, 'দেখবে কী সমস্যা?'

'হ্যাঁ দেখব।'

এক মুহূর্তও দেরি না করে হাতের ধাক্কায় টেবিলের পাশে সাজানো ডিনার সেটটা মেঝেতে ফেলে দিলাম। খুব যে কিছু ভেবে ফেললাম এমন নয়। লতাপাতা, ফুলসুদ্ধু প্লেট, বাটি খানখান আওয়াজে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল। পাশের ঘরে বাবু ঘুম ভেঙে কেঁদে উঠল ফুঁপিয়ে। আমি শান্তভাবে উঠে পড়লাম। হাত ধুয়ে ছেলেকে ঘুম পাড়াতে গেলাম বেডরুমে। গুনগুন করে গান করলাম, এই ঘুম ঘুম চাঁদ, ঝিকিমিকি তারা...। বাচ্চারা গান শুনলে চট করে ঘুমিয়ে পড়ে। বাবু ঘুমোত না, দেরি করত। একসময় এসে দেখি সুপর্ণ তখনও ডাইনিং-এ বসে আছে। তার মুখ রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে। আমি ভাঙা কাচ তুলতে তুলতে নরম গলায় বললাম, 'যাও শুয়ে পড়ো। জল খেয়েছ?'

বাবু হওয়ার পর থেকেই সুপর্ণর সঙ্গে যে ব্যবধান তৈরি হচ্ছিল, ভাঙা ডিনার সেট সেই ব্যবধান এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়িয়ে দিল। আমি বুঝতে পারলাম, এবার সুপর্ণর পালা। সে আমার কাছে রাগ লুকোতে শুরু করেছে। সে ম্যাজিক শিখছে।

চিঠিটা আর একবার পড়লে কেমন হয়? আচ্ছা, কাজটা কোনও স্টুডেন্টের বাবা-কাকার নয় তো? মাঝবয়সি পুরুষমানুষগুলো বদ হয়। চান্সটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কয়েক বছর আগে এরকম একটা ঘটনা হয়েছিল। ক্লাস নাইনের এক ছাত্রীর বাবা আমাদের ইংলিশ টিচার বিদিশার জন্য রোজ মেয়েকে স্কুলে দিতে আসত। যতক্ষণ না বিদিশা আসে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত গেটের সামনে। বেচারির দোষ নেই। বিদিশা ছিল মারাত্মক ধরনের সুন্দরী। তার ওপর আবার রোজ রোজ চুলে ফুল লাগাত। শিমুল, পলাশ, টগর— যখন যেটা পেত। বিয়ে করে, চাকরি ছেড়ে বিদিশা চলে গেল আমেদাবাদ। তারপর সেই লোক আসা বন্ধ করল।

এই 'অপূর্ব' না কে সেও কি আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে? মা গো!

কানদুটো গরম লাগছে। রাগের গরম নয়, অন্যরকম গরম।

আমি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে জগ থেকে গ্লাসে জল ভরে আনলাম। তন্দ্রার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে বললাম, 'অ্যাই তন্দ্রা, চা খাবি?'

তন্দ্রা খাতা থেকে মুখ তুলে অবাক হয়ে তাকাল। কতদিন পরে সে আমাকে হাসতে দেখছে! কতদিন স্টাফরুমে কাউকে আমি চা খেতে বলিনি! অথচ আমিই ছিলাম চপ কাটলেট আনানোর পাণ্ডা। টিচাররা বলত, 'বীণা, তুই হলি আমাদের তেলেভাজা রানি।'

সুপর্ণ তেলেভাজা পছন্দ করে না। ও ভালবাসে মিষ্টি। বাড়িতে তৈরি মিষ্টি। বিয়ের বছরখানেক পর একদিন আমি ওর মায়ের কাছ থেকে টেলিফোনে মুগ ডালের মিষ্টি শিখে

নিলাম। সারা দুপুর ধরে অনেক পরিশ্রম করে বানিয়েও ফেললাম। সুপর্ণ অফিস থেকে ফিরলে বললাম, 'তুমি মুখ হাত ধুয়ে নাও, একটা সারপ্রাইজ আছে।'

সুপর্ণ ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী সারপ্রাইজ?'

'আছে। এখন বলব না।'

সুপর্ণ জামাকাপড় ছাড়তে ছাড়তে বলল, 'বীণা, তুমি জানো না, আমি সারপ্রাইজ পছন্দ করি না?'

আমি হেসে বললাম, 'জানি, কিন্তু এটা করবে।'

পছন্দ করল না। গম্ভীর মুখে মিষ্টির প্লেট সরিয়ে রাখল সুপর্ণ।

'কী হল?'

'হজমের প্রবলেম চলছে।'

'একটা খেলে কিছু হবে না। এত কষ্ট করে বানালাম।'

সুপর্ণ চায়ের কাপ টেনে নিয়ে বলল, 'হবে না আমি জানি, কিন্তু খাব না। এরপর থেকে রুটিনের বাইরে কোনও টিফিন করার আগে টেলিফোনে আমাকে জিজ্ঞেস করে নেবে। জিনিসগুলো নষ্ট হল মিছিমিছি।'

তারপর আর কোনওদিন আমি বাড়িতে মিষ্টি বানাইনি।

শুধু স্কুল গেটের কথা ভাবছি কেন? পাজি লোকটা তো অন্য কোথাও আমাকে দেখতে পারে। বাজারে? আমাদের কোয়ার্টারের আশপাশে নয় তো? না না, তা হবে না। আমাদের চারপাশে সব ভদ্রলোকের বাস। অফিসার্স কোয়ার্টার। এখানে এরকম নোংরামি কখনও হতে পারে না। তবে লোকটা যে আমার ওপর নজর রাখে এটা বোঝা যাচ্ছে। নইলে নীল রংটার কথা বলল কী করে? নীল রঙের কী? শাড়ি? নাকি সালোয়ার কামিজ? শাড়ি হলে স্কুল। সালোয়ার হলে তাও দোকান-বাজার হতে পারে। নীল রঙের আর আমার কী আছে? না আর কিছু নেই।

উঠে গিয়ে তন্দ্রার পাশে বসলাম। চা খেলাম। গল্প করলাম। বাবুর গল্প, ওর মেয়ের গল্প। তন্দ্রা ওর এক ননদের কথা বলল। মেয়েটা নাকি ভীষণ কুচুটে আর লাগানি ভাঙানি। শাশুড়ির কান ভাঙায়। আমি বললাম, 'একদিন আচ্ছা করে দিবি। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

তন্দ্রা হাসতে হাসতে বলল, 'তোমাকে নিয়ে যাব।'

'তাই যাস।'

'বীণাদি, সেদিন কিন্তু তুমি ভারী ভাল গাইলে।'

আমি লজ্জা পেলাম। হেসে বললাম, 'দূর, বড়দি জোর করল।'

'ঠিক করেছে। শুনেছি, একসময় তুমি এসব খুব করতে। গান, নাচ মেয়েদের নিয়ে নাটকও করেছ। তখনও তো আমি জয়েন করিনি।'

'রাখ তো, ওসব ছেলেমানুষ বয়েসের ব্যাপার। বুড়ি হয়ে গেছি। ভাবছি কীর্তন শিখব।'

তন্দ্রা হেসে উঠল। আমিও হাসলাম। অনেকদিন পর স্টাফরুমে বসে হাসলাম। শুধু স্টাফরুমে হাসলাম না, পরের ক্লাসে গিয়ে একটা কাণ্ড করলাম। মেয়েদের বললাম, 'আজ হিস্ট্রি বই খুলতে হবে না। আজ আমি তোমাদের কাছ থেকে গল্প শুনব। রাজি?' মেয়েরা

আতঙ্কে এর ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে মাথা নাড়ল। আমি হেসে বললাম, 'উঁহুঁ শুধু মাথা নাড়লে হবে না, গল্প কিন্তু হাসির হতে হবে।'

ফুটফুটে একটা মেয়ে উঠে দাঁড়িয়ে গল্প শুরু করতেই আমার একটা সাংঘাতিক কথা মনে পড়ল।

আমার একটা নীল রঙের নাইটি আছে না? আছে তো। তবে ওটা আমি পরি না। পরি না তার কারণ আছে। ঘরের আলো না নিভিয়ে ওই জিনিস পরা যায় না। শরীরের সব বোঝা যায়। ছেলে বড় হচ্ছে। কোনওদিন ভুল করিনি তো? আলো জ্বেলে, জানলা খুলে... এখন তো গরম, সাউথের জানলাটা তো খোলা থাকে... এ মা! বাইরে থেকে কেউ... না না, এসব আমি বেশি ভাবছি। আমার মাথাটি কি একেবারেই গেল নাকি? তা ছাড়া এরকম একটা বাজে বিষয় নিয়ে আমি এত ভাবছিই বা কেন? আমার বয়স কি চোদ্দো? নাকি ষোলো? ছি ছি!

মেয়েরা গল্প বলে বেশি হাসাতে পারল না। তবু খুব হাসলাম। না হাসলে ওরা দুঃখ পাবে। ক্লাস থেকে বেরিয়ে ঠিক করলাম বাড়ি ফেরার পথে খামের মতো কাগজটাও ফেলে দেব।

ফেলেও দিলাম। বাজার পেরোনোর সময় ব্যাগ খুলে, কাগজটা দলা পাকিয়ে ছুড়ে ফেললাম রাস্তার ধারে। বিকেলের আলো মরতে শুরু করেছে। আমার এরকমই হয়, বাড়ি ফিরতে সন্ধে হয়ে যায়।

বাবুর ক্লাস সেভেন চলছে। পড়াশোনায় একদম মন নেই। সারাদিন খেলবে আর সন্ধে হলেই পড়ার টেবিলে মাথা রেখে ঘুম। প্রথম প্রথম 'বাবা বাছা' করতাম। আজকাল মেজাজ ঠিক থাকে না। ধৈর্য হারাই। থাকবে কী করে? গতবার ফেল করতে করতে বেঁচে গেছে। চুলের মুঠি ধরে ছেলেকে টেনে তুলি। তাতেও না হলে পিঠে চড় থাপ্পড় দিই।

বাবু খোলা বইয়ের ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। বইটা সরিয়ে ভাঁজ করে রাখলাম। একটু ঘুমিয়ে নিক। সুপর্ণ এখনও ফেরেনি। ও আজকাল যতটা পারে দেরি করে ফেরে। অফিসের পর আড্ডা জুটিয়েছে। বাঁচা গেছে।

শাওয়ার খুলে স্নান করতে একসময় ভাল লাগত। এখন সময় নষ্ট মনে হয়। তাড়াহুড়ো করে কয়েক মগ মাথায় ঢেলেই পালিয়ে আসি। বাথরুমে ঢুকে জামাকাপড় ছেড়ে শাওয়ার খুললাম। কাগজটা কি ফেলার আগে ছিঁড়ে কুটিকুটি করা উচিত ছিল? কেউ যদি তুলে দেখে? কী দেখবে? নামধাম তো কিছু নেই। একটা মেয়েকে একটা ছেলের লেখা চিঠি। সেই ছেলের নাম অপূর্ব কিন্তু মেয়েটা কে? যে পড়বে সে বেচারি খুব ঘাবড়ে যাবে।

আমি হাসতে হাসতে স্নান করতে লাগলাম। প্রথমে আস্তে, তারপর জোরে হাসতে লাগলাম। সমস্যা কী? বাইরে তো আওয়াজ যাচ্ছে না। এক চিলতে শাওয়ার থেকে যেন সহস্র ধারায় জল পড়ছে। বৃষ্টির মতো। তারা গড়িয়ে নামছে আমার মুখ, ঠোঁট, কাঁধ বেয়ে। ভিজিয়ে দিচ্ছে আমার স্তন, পেট, নাভিমূল। ছুঁয়ে যাচ্ছে আমার কটিদেশ, জঙ্ঘা, যোনিপথ। যেন আমাকে আদর করছে। আমাকে ভালবাসছে।

আমি ফিসফিস করে বললাম, 'অপূর্ব, অপূর্ব, অপূর্ব...।'

অনেকদিন পর বালিশ হাতে গভীর রাতে সুপর্ণর কাছে গেলাম।

'এ কী! তুমি?'

'সরে শোও। আমি শোব।'

'এইটুকু বিছানায়?'

আমি ফিসফিস করে বললাম, 'হ্যাঁ সরো।'

সুপর্ণ অবাক গলায় বলল, 'বাবু?'

'ঘুমোচ্ছে।'

অনভ্যাসের অস্বস্তি সরাতে সুপর্ণর খানিকটা সময় লাগল। তারপর জড়িয়ে ধরল আমাকে। বহুদিন পর তো, তাই ব্যথা পেলাম। ভুলে যাওয়া ভাল লাগায় শিউরে উঠি।

কানাই মাথা চুলকে বলল, 'একটা ভুল হয়ে গেছে ম্যাডাম।'

আমি খাতাগুলো গোছাতে গোছাতে বললাম, 'কী হল?'

'কাল আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম...'

থমকে দাঁড়ালাম। ভুরু তুলে তাকালাম। কানাই ঢোক গিলে বলল, 'চিঠিটা আপনার নয় ম্যাডাম। খামের ওপর লেখা ছিল রীণা দত্ত, জল লেগে এমন হয়ে গেল যে আমি রীণার বদলে ভুল করে পড়লাম বীণা...। খেয়াল হল, ছুটির পর, আপনি তখন বাড়ি চলে গেছেন।'

আমার পায়ের তলায় মাটি কি একটু কেঁপে উঠল? আমি নই! আমার চিঠি নয়? রীণা দত্ত! সে কে? নতুন আসা কোনও অল্পবয়সি টিচার? সুন্দরী ছাত্রী কেউ? কে?

কানাইকে প্রশ্নটা করতে গিয়ে নিজেকে সামলালাম। এ প্রশ্ন করা যায় না। অন্তত ওই চিঠি পড়ার পর কখনওই করা যায় না।

'ম্যাডাম, খামটা ফেরত দেবেন?' কাঁচুমাচু গলায় বলল কানাই।

ঘুরে দাঁড়িয়েও এক মুহূর্ত থমকালাম। স্বভাব অনুযায়ী একথা শোনার পর আমার শরীর ঝনঝন করে ওঠবার কথা। হল না। মুখ ফিরিয়ে নিচু গলায় বললাম, 'সরি কানাই, ওই চিঠি আমি ফেলে দিয়েছি। খুলে পড়িওনি।'

কথাটা ঠিক নয়। ওই চিঠি আমি ফেলে দিইনি। আমি রেখে দিয়েছি।

দীর্ঘ করিডর ধরে আমি হাঁটছি। হাঁটছি নীল শাড়ি পরে, ক্লান্ত পায়ে।

আমার সময়, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৮

আহা! আজি এ বসন্তে

১

কৃষ্ণ বলিল, 'হুঁ।'

রাধা তার গোলাপি উত্তরীয়টি মাথার উপর টানিয়া সামান্য আড় ঘোমটা দিয়া মিষ্টি হাসিয়া বলিল, 'হুঁ নয়, উঁহুঁ।'

আসলে সে ঠিক করিয়া আসিয়াছে আজ কৃষ্ণের সঙ্গে খেলিবে। তাহার চিত্ত অস্থির করিয়া তুলিবে। মিলনের তাড়নায় সে ছটফট করিবে, রাগিবে, হাসিবে। তথাপি নিজেকে সমর্পণ করিবে না।

সেই খেলাই চলিতেছে।

কৃষ্ণ অভিমানারত মুখ ফিরাইয়া বলিল, 'আমি কতটা তৃষ্ণার্ত, সে কথা কি তুমি বুঝতে পারছ না রাধিকে? নাকি বুঝেও না বোঝার ভান করো?'

কৃষ্ণের কথা শুনিয়া রাধার যেমন লজ্জা হইল, তেমন আমোদও হইল। মুখ টিপিয়া বলিল, 'কীসের তৃষ্ণা?'

কৃষ্ণ কহিল, 'জানোও না বুঝি?'

রাধা অধর দংশন করিয়া কহিল, 'না, জানি না। তবে আজ কিছুতেই নয়।'

'কেন? নয় কেন? সমস্যা কোথায় প্রিয়তমে।'

'সমস্যা সর্বত্র। গোটা বৃন্দাবনে যে ঢি ঢি পড়ে গেল।'

বসন্তের এই মনোরম বৈকালে সূর্যাস্তের নিস্তেজ আলো যমুনা নদীর উপর দিয়া লঘু পদক্ষেপে পশ্চিম দিগন্তে মিলাইয়া যাইতেছে। দূর কাননের সুগন্ধি ভাসিয়া আসিতেছে। অস্তমান সূর্যের কনকচ্ছটা প্রথমেই বিচ্ছুরিত হইতেছে বৃক্ষরাজির পত্রে পত্রে, তাহার পর ঝরিয়া পড়িতেছে অলস ভঙ্গিমায়। দেখিলে মনে হইতেছে, যেন আলো নয়, স্বর্ণকণা। সেই কণার কিছু পড়িতেছে এই কদমতলেও।

রাধা হাসি গোপন করিয়া বলিল, 'বুঝলে?'

কৃষ্ণ ক্রোধে গরগর করিয়া বলিল, 'না বুঝলাম না। বুঝতে চাইও না। লোকনিন্দার ভয় আমি করি না।'

'তুমি না করো, আমি তো করি। তা ছাড়া কী?'

রাধা মুহূর্তকাল নিশ্চুপ থাকিল। চক্ষু ভূমি সংলগ্ন করিয়া বলিল, 'আমি সম্পর্কে তোমার কে হই, তুমি জানো না যেন। এই সম্পর্কে মিলন মহাপাপ।'

কৃষ্ণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, 'কে বলে?'

কৃষ্ণের তর্ক শুনিয়া রাধার আরও হাসি পাইল। ভালমানুষের মতো মুখ করিয়া বলিল, 'অত সব তর্কের কথা আমি বুঝি না।'

কৃষ্ণ গজগজ করিল, 'এ সব তোমার ছলনা। প্রত্যাখ্যানের ফন্দি। স্পষ্ট করে বলো দেখি রাধা তুমি কি মিলন চাও না?'

রাধার লজ্জা বাড়িল। অস্ফুটে বলিল, 'না চাই না। যাও।'

'তবে আজ এসেছ কেন?'

'এসেছি এই কথাটুকুই বলতে।'

কৃষ্ণ এবার ক্রুদ্ধ গলায় বলিল, 'বাজে কথা রাখো। এ তোমার বড় নিষ্ঠুর খেলা রাধিকে। শুধু এখন নয়, আগেও তুমি এই খেলায় মেতেছ। এর শাস্তি জানো? এককে দিন এককেটা বাহানা তোমার।'

রাধা আর পারিল না। হাসিয়া বলিল, 'শাস্তি জানি না, তবে খেলায় যে মজা আছে, সেটা জানি।'

দূর আকাশে নবীন চাঁদের ফলক উঁকি মারিতেছে। যমুনা তীরের স্নিগ্ধ বাতাসে দুইটি মন ভরিয়া উঠিতেছে ধীরে ধীরে। কদমতলে সুনিবিড় ছায়া নামিয়াছে। নীড়ে ফেরা পক্ষীকুলের কুহুতানে চারিপাশ সংগীতমুখর।

কৃষ্ণ কঠিন মুখে বলিল, 'অনেক সহ্য করেছি, আর নয়। এখনই যদি আমার আলিঙ্গনে না আসো, তোমার কপালে দুঃখ আছে প্রাণেশ্বরী। আমি কিন্তু এবার জোর দেখাব। তোমার কলসের দধি দুধ নষ্ট করব, সনাতনী হার কেড়ে নেব, কাঁচুলি ফেলব ছিঁড়ে। তখন বুঝবে মজা কাকে বলে এবং কয় প্রকার। তার আগেই ভালয় ভালয় আমার আলিঙ্গনে এসো।'

রাধা কাজলে ভাসা ভাসা চোখে অধর ঈষৎ স্ফুরিত করিয়া বলিল, 'না।'

'আবার না! কেন? এত করে যে চাইছি তোমায়, আমার আলিঙ্গনে আসতে তোমার বাধা কোথায়? তা হলে জোর খাটাই।'

রাধার বুকে শিহরন জাগিল। আনন্দের শিহরন। এত রং ঢঙে সে যে এই জোরই কামনা করিতেছিল এতক্ষণ। ইতিমধ্যেই আড় চোখে সে দেখিয়াছে প্রিয়তমের হরিণায়ত চক্ষু দুটি কামনার ছটায় আরও মধুর, আরও আপন হইয়া উঠিয়াছে। মিলন আকাঙ্ক্ষায় অধর হইয়াছে পক্ক-বিল্বফলের ন্যায় পুষ্ট, গাঢ়, রক্তাভ। সরল মুখখানিতে সৌন্দর্য ছাড়াও যেন আরও কিছু যুক্ত হইয়াছে। সেই 'আরও কিছু' স্নায়ু-শরীরে আগুন ধরাইয়া দিতে জানে।

রাধা মুখ নামাইল। বুঝিল, পালাইবার পথ নাই আর। খেলা সাঙ্গ হইবে এখনই। এবার শুরু সর্বনাশের পালা। যে সর্বনাশের জন্যই এত ছলচাতুরি, এত সাজ। প্রাণাধিক বড় বেশি কামোন্মত্ত হইয়া পড়িয়াছে। রাধার রাঙা মুখখানিও দ্রুত রাঙা হইল। ওষ্ঠাধর ঈষন্মুক্ত, আঁখিতারকা নিশ্চল। পল্লবে আসিল কাঁপন। হায় রে, সে নিজেও বুঝিতে পারে নাই, কামনার শিখা কখন তাহার মনেও সঞ্চারিত হইয়াছে! কিছু করিবার নাই আর।

নিজের ওপর যেমন ক্রোধ হইল, তেমন তৃপ্তির আগাম আনন্দে অন্তরে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল রাধা। স্খলিত আঁচলটি তুলিয়া কাঁচুলির উপর রাখিল। হাঁটু মুড়িয়া, কোলের

উপর রাঙা হাত দুটি রাখিয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, 'সে আর নতুন কথা কী? এতকাল যেন জোর খাটাওনি।'

কৃষ্ণ মৃদু হাসিয়া রাধার হাত ধরিল। গাঢ় স্বরে কহিল, 'আজ এত সাজ কীসের প্রিয়া?'

রাধা অস্ফুট বলিল, 'ওমা, সাজ কই!'

সত্যি রাধা সাজিয়াছে। মথুরা হাট হইতে ফিরিবার পথে দীর্ঘ সময় ধরিয়া রাধা সাজিয়াছে পুষ্প সাজে। পথের ধারে ফুলের সাজি লইয়া বসিয়া ছিল মালিনী। সে রাধার দুই বেণিতে জড়াইয়া দিয়াছে কুন্দকলি। স্বর্ণ অঙ্গে পুষ্পভূষা আর কর্ণে দিয়েছে শিরীষের কাঁপন। কণ্ঠে ফুলহার রাখিয়াছে এমনভাবে, যাহাতে সে দুলিতে পারে বক্ষযুগলের মৃদু ছন্দে। নিতম্ব অশোকপুষ্পের কাঞ্চীতে সুন্দর। তবে চরণে ফুলের অলংকার দেয় নাই মালিনী। সেখানে আছে অলক্তরাগের উপর সোনার গুঞ্জরী নূপুর। সুন্দরীর অঙ্গে ফুলের আভরণ শোভা বৃদ্ধি করে ঠিকই; কিন্তু পায়ে গুঞ্জরী নূপুর না থাকিলে প্রতি পদক্ষেপে ঝংকার উঠিবে কেমন করিয়া? রাধার নিতম্ব, জঘন, পয়োধর যুগল পত্রপুষ্পে ঝলমল করিতে লাগিল। জীবন্ত কানন যেন! রূপ, সৌরভ আর মন ভোলানোর মায়া লইয়া গুঞ্জরীতে রিনিঝিনিতে আওয়াজ তুলিয়ে হাঁটিতেছে।

মালিনী রাধার মৃণালভুজে ফুলের অঙ্গদ পরাইতে পরাইতে হ্রস্বস্বরে বলিল, 'কোন ভ্রমরের কাছে যাবে গো দিদি?'

রাধা কিল তুলিয়া দেখাইল। হাসিয়া বলল, 'চুপ কর মুখপুড়ি।'

মালিনী ঝরঝর করিয়া হাসিয়া উঠিল।

কদমতলে কৃষ্ণ শুইয়া ছিল ঊর্ধ্বমুখে। বিরহে মনমরা। দীর্ঘদিন রাধার সহিত তাহার দেখা নাই। মনে হইতেছিল কোমল শুষ্কপত্রের শয্যায় কে যেন কন্টক বিছাইয়াছে। কন্টক গোধূলির স্নান আলোতে মনমরা ভাব আরও বাড়িয়াছে। কেবলই মনে হইতেছে সে কি আসিবে? নাকি, সে আসিবে না? ভাবিতে ভাবিতে খানিকটা তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছিল কৃষ্ণ। হঠাৎই গুঞ্জরীর রিনিঝিনি শব্দ! চারিপাশের বাতাস সুগন্ধ! ব্যাকুল চিত্তে উঠিয়া বসিল কৃষ্ণ। চমকিয়া উঠিল। সে পত্রপুষ্পে সজ্জিত অপরূপা রাধাকে দেখিয়া তাহার নিশ্বাস বহিতে লাগিল ঘনঘন।

এত সুন্দর! এ কি সত্য? নাকি এ মায়া?

'রাধিকা! কোথায় ছিলে এতদিন? কোথায় ছিলে প্রাণাধিকা?'

নতচক্ষুতে অল্প হাসিয়া রাধা কৌতুক করিল। বলিল, 'কোথায় আর ছিলাম? তোমার পাশেই।'

কৃষ্ণ আরও ঘন হইয়া রাধার হাত ধরিল। সেই মুঠিতে শুধু প্রেম নয়, জোরও রহিয়াছে। এই জোর ভাঙিয়া ফিরিয়া যাওয়া অসম্ভব। যাওয়া অনর্থক। রাধার অন্তর বাজিয়া উঠিল। ফিসফিস করিয়া বলিল, 'আঁধার নামুক।'

খানিক পরেই রাত্রি আসিল। আসিল তারা নক্ষত্রের রত্ন খচিত নীল আঁচলের মতো। ঘন হয়ে আসা প্রণয়ী যুগলকে সযত্নে, স্নেহভরে আবৃত করিল। কৃষ্ণ চক্ষু দিয়া প্রাণেশ্বরীকে

আহ্বান করিলে, রাধা তাহার লজ্জা-ভূষণের বাধা সরাইয়া বলিল, 'তুমি বড় দুষ্ট'। বলিয়া কোমল পেলব বাহু দিয়া জড়াইয়া ধরিল কৃষ্ণের কণ্ঠ। দুরন্ত আবেগে চক্ষু, গ্রীবা, অধর ও সর্বাঙ্গে চুম্বন করিতে লাগিল প্রেমে ও পরম আশ্লেষে। আর কৃষ্ণ? সে অতি যত্নে একটি একটি করিয়া পুষ্প আভরণ থেকে মুক্ত করিতে লাগিল রাধাকে। তাহার পর প্রতিদান দিল চুম্বনে।

'চলো পালাই।'

'কোথায়?'

'যেখানে দু'চোখ যায়। যমুনায় নৌকো ভাসাই।'

'উঁ উঁ চলো, চলো, চলো...।'

নব নব অনুভবের বিস্ময়-পুলক-ভরা মোহ বিহ্বল সন্ধ্যা থমকিয়া দাঁড়াইল। যেন সময় দিল। মিলন ঘটিল দুটি শরীরের।

আর এই সময়েই এক কাণ্ড হইল!

রাধা কৃষ্ণের শিহরিত, চঞ্চল, উদ্বেলিত শরীরের ধাক্কায় একপাশে রাখা কৃষ্ণের মোহনবাঁশিটি গড়াইয়া পড়িল নিঃশব্দে। পড়িল কদমতলা হইতে। তাহার পর পড়িতে লাগিল। পড়িতে লাগিল। পড়িতেই লাগিল...।

আকাশ পথে স্বর্গের সীমানা বড় কম পথ নহে, সেই সীমানা শেষ করিয়া মোহনবাঁশি যখন মর্তের আওতায় ঢুকিল, তখন সে তাহার রত্নখচিত রূপ, মুক্তার ঝালর, হীরক শোভিত মকর মুখ, স্বর্ণের আভা— সবই হারাইয়া ফেলিয়াছে।

তখন সে একটি অতি সাধারণ খেলনা বাঁশি মাত্র!

২

আজ ভোরের গাড়িতে বাবা-মা আর বোন ইতি গিয়েছে জামশেদপুর। মামাতো দাদার বিয়ে। দিতিরও যাওয়ার কথা ছিল। সেইমতো গোছগাছ কমপ্লিট করেছিল। বিয়ে বলে শাড়ি বেশি। দুটো টাঙাইল, একটা তসর, ধনেখালি একটা, শিফন আর সুতি একটা করে। তারপরেও মন খুঁতখুঁত করছিল। জিনস, টপস, সালোয়ার আর ক্যেপরি নিয়ে খুঁতখুতানি। ডিসিশন নিতে পারছিল না। ব্যাগে জায়গা নেই, কোনটা বাদ দেবে? এমন সময় খবর এল। সেই খবর জানার পরই দিতি প্রোগ্রাম বাতিল করেছে। খবর ভয়ংকর।

জামশেদপুরে মামাতো দাদার বিয়ের আড়ালে দিতির বিয়েরও তোড়জোড় চলছে!

এই তোড়জোড়ের মূল উদ্যোক্তা দিতির মেজমামিমা। তিনি সেখানে পাত্রী 'দেখানো'র ব্যবস্থা করেছেন। পাত্র অতি লোভনীয়। ইঞ্জিনিয়র এবং সুপুরুষ। হাইট একটু শর্টের দিকে তবে গায়ের রং ফরসা। অতিরিক্ত ফরসা। মাথা ভরতি ঘন চুল। নাক টিকলো। শুধু রূপ নয়, পাত্র গুণেও মনভোলানো টাইপ। খুব অল্পদিনের মধ্যে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। সবথেকে বড় কথা হল, ছেলের চা-কফি, মদ, সিগারেট কোনও কিচ্ছুর নেশা নেই। মেজমামিমার

মতে, এত বড় পৃথিবীতে ভাল-মন্দ অনেক ধরনের পাত্র পাওয়া যায়, কিন্তু নেশাহীন পাত্র পাওয়া যায় না। মেজমামিমা এতেই মজেছেন। মজেছেন এবং খেপেছেন। দিতির মাকে ফোনে বললেন—

'তুমি শুনলে খুব আনন্দ পাবে, তোমার হবু জামাইয়ের নেশা শুধু সুক্ততে। ছোটবেলা থেকেই শ্রীমান তেতোর ভক্ত। সুক্ত ছাড়া উনি খেতেই বসবেন না। পরশুদিনই তো নাকি এক কাণ্ড হয়েছে। ভাতের পাতে নিমপাতা না পেয়ে বাবু তো রেগে আগুন। এক বিচ্ছিরি অবস্থা। বোঝো কাণ্ড একবার! হা হা। নিমের জন্য রাগ! সত্যি কথা বলতে কী, এই কারণেই বাইরে যাওয়ার আগে বিয়েটা সেরে ফেলতে চাইছে। বুঝলে সীমা, বিদেশে সব পাওয়া যায়, সুক্ত পাওয়া যায় না। পাত্রের শখ, লাঞ্চে বউ সুক্ত রেঁধে খাওয়াবে।'

দিতির মা আমতা আমতা করে বলে, 'কিন্তু, কিন্তু দিতি তো রান্নাবান্নার তেমন কিছুই জানে না। সুক্ত তো দূরের কথা...।'

মামিমা চাপা গলায় ধমক দেন।

'চুপ, এসব একদম বলবে না। সব ম্যানেজ হয়ে যাবে। ওরকম পাত্রের জন্য সুক্ত কেন, শিম বেগুন দিয়ে আরশোলার ঝোল পর্যন্ত শিখিয়ে দেব। এখন কাউকে কিছু বলার দরকার নেই, দিতিকেও নয়। ওকে সারপ্রাইজ দেব।'

এই খবর জানার পরই জামশেদপুর ক্যানসেল করল দিতি।

কাল রাতে মা ঘরে এল। থমথমে মুখে।

'শুনলাম, তুমি নাকি জামশেদপুরে যাচ্ছ না, ঘটনা কি সত্যি?'

দিতি শান্ত ভঙ্গিতে ব্যাগ খালি করতে করতে বলল, 'হ্যাঁ মা সত্যি।'

'কেন?'

'ওমা! বললাম না, পরীক্ষা পড়ে গিয়েছে।'

'পরীক্ষা কি হঠাৎ পড়েছে?'

দিতি মুখ তুলে হেসে বলল, 'কেন হঠাৎ পড়লে আপত্তি কোথায়? ইউনিভার্সিটি তার পরীক্ষা হঠাৎ নেবে, না রয়ে-সয়ে নেবে, সেটা তারা বুঝবে।'

মা কঠিন মুখে বলল, 'ওসব বাজে কথা রাখো, পরীক্ষা টরিক্ষা কিছু নয়। আমি জানি, তুমি কেন যাচ্ছ না।'

দিতি তার ব্যাগ থেকে শাড়িগুলো বের করে মন দিয়ে ওয়ার্ডরোবে ঢোকাতে লাগল। শাড়ি পরতে একবারে ভাল লাগে না দিতির। নেহাত বিয়েবাড়ি বলে শাড়ি নিয়েছিল।

মা বলল, 'কী হল, উত্তর দিচ্ছ না কেন?'

দিতি চুপ করে থাকে।

'দিতি, তুমি কি জানতে ওখানে তোমার মামিমা তোমার জন্য...?'

দিতি হেসে বলল, 'জানতাম না মা, জেনেছি। শুনেছি, ছেলে খুব ভাল। একটু বেঁটের দিকে, কিন্তু ফরসা। আজকাল ফরসা ছেলেদের খুব ডিমান্ড। একসময় আমেরিকায় ব্ল্যাকদের জন্য এমন ছিল।'

মা চাপা গলায় হিসহিস করে উঠল।

'চুপ। একদম চুপ। সবকিছু রসিকতা করার জিনিস নয় দিতি। এরকম একটা ভাল সুযোগ তুমি হারাতে পারো, আমরা হারাব না। সামনের অক্টোবরে ওই ছেলের পেনসিলভেনিয়া চলে যাওয়ার কথা পাকা। ততদিনে তোমার ফাইনাল হয়ে যাচ্ছে। তুমি যদি এম বি এ পড়তে চাও, সেখানে গিয়েও পড়তে পারো। সবদিক ভেবেই আমরা রাজি হয়েছি। ইতিমধ্যেই তারা তোমার ফটো দেখে পছন্দ করে ফেলেছে। এবার তোমাকে দেখবে। তারপর একটা...'

দিতি নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলল, 'আমি শুনেছি মা, মোট তিন পর্যায়ের পরীক্ষা। শেষে একটা ইন্টারভিউ হবে তো? সুক্তুর ওপর ইন্টারভিউ।'

মা কঠিন গলায় বলল, 'চুপ করো। দিতি, স্বাধীনতা মানে নিজের গলা কাটার স্বাধীনতা নয়। আমরা চাই তুমি এই বিয়ে করো। আশা করি, তুমিও চাইবে। কারণ তুমি বুদ্ধিমতী। নিজের ভাল বোঝার সঙ্গে বুদ্ধি, স্বাধীনতা বা আধুনিকতার কোনও ঝগড়া নেই। যাক, তাড়াহুড়োর কিছু নেই। হাতে ক'টা দিন সময় রইল। ঠান্ডা মাথায় ভাবো। আমি এখনই কাউকে কিছু বলছি না। আমি চাই না, এটা নিয়ে একটা শোরগোল বাধুক। ভাবা হয়ে গেলে, তোমার বাবাকে একটা ফোন কোরো। সে এসে তোমাকে জামশেদপুরে নিয়ে যাবে।' এই পর্যন্ত বলে মা থামল। তারপর চশমার ফাঁক দিয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অনেক খবর পেয়ে গিয়েছ দেখছি। ছেলের নাম কী, জেনেছ? মনে হয় না জেনেছ। খুবই সুন্দর নাম। সিঞ্চন। ভোম্বল, কম্বল বা ডাম্বেলের থেকে যে সুন্দর, সেটা তো মানবে?'

কথা শেষ করে মা ঘরের বাইরে চলে গেল।

দিতি ঠান্ডা মাথায় ভেবেছে এবং ফোন করেছে। তবে বাবাকে নয়, ভোম্বলকে।

'অ্যাই, তুমি বিকেলে একবার আসবে।'

'ইমপসিবল, বিকেলে তিন-তিনটে টিউশন দিতি। আর মধ্যে একটা বাড়িতে মাইনে দেওয়ার কথা। দু'মাসের মাইনে বাকি।'

দিতি ঠান্ডা গলায় বলল, 'টিউশন কামাই করবে। মাইনে আমি দেব। কত টাকা? হাউ মাচ?'

ভোম্বল হাল ছাড়া গলায় বলল, 'ঠিক আছে, কোথায় যাব?'

দিতি বলল, 'আমার বেডরুমে। কী চুপ করে আছ কেন? ভয় পেলে? ঠিক আছে বেডরুম দরকার নেই ডার্লিং, তুমি আমাদের ড্রইংরুম পর্যন্ত এসো, তা হলেই চলবে।'

ভোম্বল অবাক গলায় বলল, 'তোমার বাড়িতে! মাথা খারাপ হল নাকি?'

'মনে হচ্ছে, হয়েছে। মাথা খারাপ হয়ে তোমাকে জড়িয়ে বসে থাকব ঠিক করেছি।'

'এসব কী বলছ দিতি! আমার তো ইচ্ছে করছে এখনই ছুটে চলে যাই।'

দিতি এতক্ষণ নিজের খাটে শুয়ে ছিল হাত পা ছড়িয়ে। বাবা-মা বেরিয়ে যাওয়ার পর থেকেই সে শুয়ে আছে। শুয়ে শুয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কাল সকালেই ভোম্বলকে নিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে যাবে। সেখান থেকে বেরিয়ে বাইরে কোথাও লাঞ্চ করবে। তারপর, মামিমাকে মোবাইলে ধরবে।

'মামিমা, সারপ্রাইজ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ। বলতে লজ্জা করছে, কিন্তু ছেলে আমার

খুবই পছন্দ হয়েছে। আমি তার জন্য উচ্ছে বেগুন আর নিমপাতা দিয়ে সুক্তর একটা চমৎকার প্রিপারেশন শিখেছি। প্রথমে উচ্ছের বিচি বের করে পেট চিরে নিতে হবে, তারপর, বেগুনগুলো ডুমো ডুমো করে কেটে কড়াইতে অল্প তেলে সাঁতলে... থাক, তুমি কলকাতায় এলে রেঁধে দেখাব। একেবারে হাতেকলমে পরীক্ষা দেব। আমি শিয়োর, আমার রাঁধা সুক্ত পাত্রের খুবই পছন্দ হবে। সমস্যা শুধু একটাই। ঘণ্টাখানেক আগে আমি হুট বলতে নিজের পছন্দমতো একটা বিয়ের ব্যবস্থা করে ফেলেছি। পাত্র ভাল নয়, বেকার, টিউশন মাস্টার। তবে কম্পিউটার শিখছে, মনে হয় একটা কিছু হয়ে যাবে। খুব শিগগিরই ফটো পাঠাব। ফটোতে গায়ের রং ময়লা মনে হবে, তবে আসলে ময়লা নয়, কাজের ধান্দায় রোদে ঘুরে... নাম শুনে তো হাসতে হাসতে মরে যাবে। ভোম্বল। এই যুগে একটা রেয়ার নাম। যাক, বাবা-মাকে এখনই কিছু বোলো না। বিয়ে টিয়ে মিটে আমি নিজে ফোন...।'

দিতি উঠে বসল। ফোনে হেসে বলল, 'ভয়ের এখনই কী দেখছেন ভোম্বলবাবু, আরও ভয় আসছে। কামিং। তবে তুমি যা ভাবছ, সেরকম কিছু নয়। বাড়ি ফাঁকা। বাবা-মা, ইতি জামশেদপুরে গিয়েছে আজ সকালে। তাড়াতাড়ি চলে এসো, একটা মারাত্মক পরিকল্পনা করেছি।'

ভোম্বল ওপার থেকে ফিসফিস করে বলল, 'চুমু খাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে বলো।'

'অসভ্য কোথাকারে, আগে জরুরি কথা।'

'কেন আগে মিষ্টি মুখ দিয়ে শুরু করলে ক্ষতি কী?'

দিতি খিলখিল করে হেসে বলল, 'মিষ্টি না ঝাল বুঝতে পারবে স্যার। আরও বেশি হতে পারে।'

ভোম্বল বলে, 'ফ্যানটাস্টিক। এখন যাব?'

দিতি গম্ভীর গলায় বলে, 'না, এখন নয়। এখন আমি সুক্তর প্রিপারেশন শিখব। তারপর তোমার জন্য একটা নাম ভাবব।'

শ্রীমান ভোম্বল আসে বিকেলের একটু পরে পরে। চোখ মুখে আনন্দ, চাপা উত্তেজনা। এই প্রথম সে প্রেমিকার বাড়িতে এত স্বচ্ছন্দে ঢুকছে। যে এক-দু'বার এসেছে, দিতির মা তার সঙ্গে খুবই ঠান্ডা আচরণ করেছেন। তার মতো একটা বেকার, অপোগণ্ড ছেলের সঙ্গে প্রেমিকার মা হেসে হেসে কথা বলবে, আশা করাটা ঠিক নয়, তবু...।

দিতি সেজেছে। আকাশ নীল জিনসের সঙ্গে 'স্যান্ডেল উড' রঙের টপ। থাই পর্যন্ত ঝুল। চাইনিজ কলার, থ্রি কোয়ার্টার স্লিভস। এই টপ বাছতে তার সময় লেগেছে। টপের কোমর, গলা আর হাতে সুতো দিয়ে ফুল আঁকা। হঠাৎ দেখলে মনে হবে ফুলের সাজ। গলায় ব্ল্যাক স্টোনসের মালা। মালায় বিডস আর মেটাল। কানেও তাই। বড় বড় স্টোন। খুব দুলছে। দক্ষিণাপণ ঘুরে কিনতে হয়েছে। সময় লেগেছে। দিতির খুব ইচ্ছে ছিল, মাথাতেও একটা কিছু দেয়। ব্যান্ড ধরনের কিছু। কিন্তু মনের মতো কিছু পাওয়া যায়নি। যে দু'-একটা ভাল ছিল, ইতি নিয়ে চলে গিয়েছে।

ভোম্বল গদগদ মুখে বলল, 'এত সেজেছ কেন মাইরি?'

দিতি হেসে বলল, 'শাট আপ, ডোন্ট ইউজ স্ল্যাংস।'

'সরি, ভেরি সরি। হেভি লাগছে কিন্তু। স্লিম অ্যান্ড সেক্সি।'

দিতি চোখ পাকিয়ে বলল, 'খুব সাহস, না?'

ভোম্বল পা নাচাতে নাচাতে বলল, 'বেশি নয়, একটু।'

'আজ যে কথাটা তোমাকে বলব সেটা না সেজে বলা যায় না। নাও কফি খাও। আমি নিজে হাতে করেছি।'

বাইরে সন্ধে নামছে। আজকাল আর যাদবপুরের এদিকটায় সন্ধে অন্ধকারে বোঝা যায় না। বোঝা যায় ঝলমলে আলোয়।

ভোম্বল কফির মগে চুমুক দিয়ে বলে, 'কথা পরে, আগে পাশে এসে একটু বসো দেখি। বাড়িতে কেউ নেই তো?'

দিতি উঠে গিয়ে ভোম্বলের পাশে বসল। ভোম্বলের নাকটা ধরে এক গাল হেসে বলে, 'আছে। ভূত আর পেতনি। রান্নার মাসিকে পর্যন্ত ছুটি দিয়ে দিয়েছি।'

ভোম্বল দিতির কোমরে হাত রাখে। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, 'একটা চুমু খাব?'

দিতি চোখ পাকিয়ে বলে, 'খেপেছ? এখন কী ঋতু জানো।'

'কী?'

'একটা গাধা। এখন হল বসন্ত ঋতু। এইসময় ওসব করলে কেলেঙ্কারি হয়।'

ভোম্বল চট করে দিতির রসিকতা ধরতে পারে না। ভুরু কুঁচকে বলে, 'কী কেলেঙ্কারি হয়?'

দিতি ঠোঁট কামড়ে বলে, 'কী আবার, সব উলটেপালটে যায়।'

'মানে? ইয়ারকি হচ্ছে? আমাকে বোকা পেয়েছ না? আগে এসো, এসো বলছি। নইলে কিন্তু জোর করব।'

ভোম্বল মুখ বাড়ায়।

দিতি হেসে ফেলে। নিজের মুখ সরিয়ে হাত তুলে হাসতে হাসতে বলে, 'অনেক সময় পাবে, হাঁদারাম। এখন কাজের কথাটা শোনো। কাজের কথা হয়ে গেলেই...।'

ভোম্বল সোফায় হেলান দেয়। আবছা অন্ধকারেই তার চোখ চকচক করে ওঠে।

'ঠিক তো। প্রমিস?'

'প্রমিস। বসন্তকালের প্রমিস। সব প্রমিস ভাঙা যায় কিন্তু সিজনের নামে প্রমিস ভাঙা যায় না। নাও এবার শোনো দেখি। একটা বিপদে পড়েছি। মা আর মেজমামিমা মিলে আমার বিয়ে ঠিক করেছে।'

'বিয়ে!' ভোম্বল সোজা হয়ে বসে।

'হ্যাঁ, পাত্র লেখাপড়ায় খুবই ভাল। সুক্তর ওপর ডক্টরেট আছে। এবার মন দিয়ে শোনো।'

মন দিয়ে শোনার পর মিনিট খানেক সময় নেয় ভোম্বল। প্রথমে নাকটা ফুলে ওঠে। তারপর ঠোঁট কাঁপতে থাকে। চোখ বিস্ফারিত হয়। মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে নিজে থেকেই। কফির মাগ হাতে লাফিয়ে ওঠে সে। কফি চলকে পড়ল সোফায়, কার্পেটে।

'খেপেছ? পাগল হয়েছ? বিয়ে! ওরে বাবা! অসম্ভব... ইমপসিবল। জানাজানি হয়ে গেলে কেলেঙ্কারি... আমার বাবা, তোমার মা...। তোমার মা... আমার বাবা...। একটা সামান্য

সুক্তর জন্য তুমি এতবড় একটা সিদ্ধান্ত নিতে চলেছ দিতি? আমাকে বিয়ে করতে বলছ দিতি... ফরগিভ মি, ফরগেট মি... উফস...। না, নো, নেভার...।'

দিতি অবাক হয়ে দেখে 'স্মার্ট ভোম্বল'-এর ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে অন্য একটা ভোম্বল!

অবাক ভাব কেটে গেলে দিতির দুঃখ হতে থাকে। চোখ ফেটে জল আসে। কী হবে? গলার ব্ল্যাক স্টোনসের হার আঙুল দিয়ে পেঁচাতে পেঁচাতে কান্না কন্ট্রোল করে দিতি। উঠে দাঁড়ায়। বানানো হেসে বলে, 'কফি শেষ করো। তোমার টিউশনে দেরি হয়ে যাচ্ছে না?'

ভোম্বল গুম মেরে বসে থাকে এবং একসময় ঠান্ডা কফিতে লম্বা চুমুক দিয়ে উঠে পড়ে।

রাত পর্যন্ত ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকে দিতি। খোলা জানলা দিয়ে বাতাস আসা-যাওয়া করে। বসন্তের বাতাস? বেশ লাগে দিতির। একা একা বাড়িতে থাকা তো হয় না।

সে অন্ধকারেই জামশেদপুরে বাবাকে টেলিফোনে ধরে।

'হ্যালো বাবা, পরশু বিকেলে পরীক্ষা দিয়ে যদি রওনা হই? তুমি আসতে পারবে না?'

কথা শেষ করে খাট থেকে নেমে পড়ে দিতি। বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দেয়। পেনসিলভেনিয়ায় এম বি এ এন্ট্রান্সের পরীক্ষা কেমন? হার্ড? শুধুই কি রিটন? নাকি ভাইভাও দিতে হয়? বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে গুনগুন করে গান ধরে। ঘরের আলো জ্বালায়। আর তখনই দরজার গোড়ায় জিনিসটা চোখে পড়ে!

আরে ওটা কী! এখানে এল কী করে!

একটা বাঁশি! অতি সাধারণ একটা বাঁশি!

৩

বাঁশরী ধ্বনিতে রাধা চমকিয়া উঠিল। ডাক আসিয়াছে, ডাক আসিয়াছে।

রাধা চারপাশে তাকাইল সচকিত ভঙ্গিতে। সখি ও মাঝিদের আড়াল করিয়া ঘাটের পাশে সরিয়া আসিল দ্রুত। কেহ যেন দেখিতে না পায়, বুঝিতে না পারে।

লাজুক নয়নে, রাঙা মুখে কাঁচুলির ভিতর হইতে মোবাইলটি বাহির করিল রাধা। রিংটোনে মধুর বাঁশরী ধ্বনি বাজিয়া উঠিল ফের।

প্রতিদিন রোববার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৯

ধর্ষিতা

ঠান্ডা একটা শিরশিরানি পিঠ থেকে পা পর্যন্ত নেমে গেল বিদিশার। নিচু গলায় বলল, 'মানে! কী বলছ তুমি!'

মোবাইলের ওপ্রান্তে ক্রুদ্ধ অনিকেত দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'মানে আবার কী, রেপ্‌ড মানে জানোও না? ধর্ষিতা। সি ওয়াজ রেপ্‌ড। একজনও করতে পারে, মে বি মোর দেন ওয়ান।'

মুহূর্তখানেক থমকে বিদিশা বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করে। না, পারে না। ভয়ার্ত গলায় বলল, 'আস্তে বলো। আমাকে ধমকাচ্ছ কেন? আমার কী দোষ?'

চাপা গলায় হিসহিসিয়ে ওঠে অনিকেত। বলে, 'না, তোমার দোষ নয়। দোষ আমার। লোক তো তুমি রাখোনি, আমি রেখেছি।'

মাথার ভেতর সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে, তবু নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল বিদিশা।

'আমরা দু'জনেই রেখেছি অনিকেত। দু'জনেরই দরকার ছিল।'

বিদিশার শান্ত গলা শুনে অনিকেত আরও রেগে গেল। দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'আমার দরকার ছিল না, দরকার ছিল তোমার। তুমি ভয় পাচ্ছিলে। পাছে চাকরি ছাড়তে হয় সেই ভয়। ওই তো দু'পয়সার চাকরি। প্রাইভেট কোম্পানিতে পেটি ক্লার্ক।'

বিদিশা আবার নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করল। মোবাইলে প্রায় মুখ ঠেকিয়ে বলল, 'কী হচ্ছে কী অনিকেত? তোমার ওখানে সবাই শুনতে পাচ্ছে। তুমি কি ঝগড়া করতে চাইছ? খবরটা কে বলল?'

অনিকেত নিজেকে খানিকটা ধাতস্থ করল। গলা নামিয়ে বলল 'শিবু'।

'শিবু কে?'

'আমাদের ওয়ার্কশপের স্টোরকিপার। বলেছিলাম না, শিবুকে দিয়ে খোঁজ নেব? মনে পড়ছে? মেয়েটার গ্রামেই শিবুর শ্বশুরবাড়ি। ক'দিন আগে বলেছিলাম। আজ বলল।'

'কী বলল?'

'বললাম তো কী বলল। এত এখন বলতে পারব না। ও সব জেনেছে। নামধাম ঘটনা সব। পাটখেত না ধানখেতে পড়ে ছিল। ফুল অব ব্লাড। বাকিটুকু ফিরে বলব। এইজন্যই বলেছিলাম, লোকটোক রাখার আগে ভেবেচিন্তে রেখো। এখন কী হবে বুঝতে পারছ?'

অনিকেতের গলা নার্ভাস।

মুঠোয় ধরা ফোনটাকে কানে চেপে ধরে চারপাশে দ্রুত তাকিয়ে নিল বিদিশা। অন্যদের

নিয়ে চিন্তা নেই, চিন্তা পাশের টেবিলের মঞ্জুদিকে নিয়ে। অন্যের টেলিফোনে আড়িপাতায় এই মহিলা নিজেকে একটা চূড়ান্ত দক্ষতায় নিয়ে গেছে। শুধু অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে নয়, গোটা অফিসেই এ ব্যাপারে তার সুখ্যাতি ছড়িয়ে আছে। একজন বয়স্ক মহিলা কীভাবে যে এমন ছেলেমানুষি করে! ফোনে কথা বলার সময় মহিলা কাছাকাছি থাকলে সবাই সাবধান হয়ে যায়। বিদিশাও সাবধান হল।

ফিসফিস করে বলল, 'আমি তো দেখেশুনেই রেখেছি। কাশীপুরের রান্নার মাসি তো এর আগেও লোক দিয়েছিল। রিচি হওয়ার সময়।'

নার্ভাস গলাতেই অনিকেত ঝাঁঝিয়ে ওঠে। বলল, 'কাশীপুরের রান্নার মাসির কথা বলে কী হবে? এই মেয়ে তো তার বাড়িতে বাক্সপ্যাঁটরা নিয়ে ওঠেনি, আমাদের ফ্ল্যাটে উঠেছে। ছি ছি! আমি ভাবতেও পারছি না, একটা রেপ্ড মেয়ে বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে!'

বিদিশা ঢোঁক গিলে বিপন্ন গলায় বলল, 'বাইরে থেকে দেখে এ জিনিস বোঝা যায়?'

অনিকেত বিরক্ত গলায় বলল, 'বাইরে থেকে কোন জিনিস বোঝা যায় আর কোন জিনিস বোঝা যায় না, আমি জানি না। চেনো না, জানোও না একটা ওই বয়েসের মেয়েকে হুট বলতে বাড়িতে ঢুকিয়ে দিলে কোন আক্কেলে? তোমার তাড়াহুড়োর জন্যই এরকম হল। যে-ভাবে চাকরিটা রাখব। দরকার হলে চোর ডাকাত খুনির হাতে রেখে তুমি অফিসে ছুটবে। এ তার থেকে কমই বা কীসের? বরং অনেক বেশি। ভাগ্যিস লালগোলা নামটা চেনা লেগেছিল। মনে পড়ে গেল, শিবুর শ্বশুরবাড়ি ওখানে।'

স্বামীর ধমকে বিদিশার একই সঙ্গে ভয় করছে, আবার রাগও হচ্ছে। হাতের পেনটা টেবিলের ওপর রেখে বলল, 'কী খোঁজ নেব? রেপ্ড কি না? কাজের লোক চোর কি না খোঁজ নেওয়া যায়, রেপ্ড কি না খোঁজ নেওয়া যায় না। তা ছাড়া ওই মেয়ে তো কাজের লোক নয়, রিচির অ্যাটেনডেন্ট।'

অনিকেত উদ্বিগ্ন গলায় বলল, 'সেই কারণেই তো চিন্তা। একটা আট বছরের মেয়ের অ্যাটেনডেন্ট যদি একটা... যাক যা ভাল বোঝো করো। তোমার মেয়ে, তোমার চাকরি, তোমার লোক— সবই তুমি ডিসাইড করছ, এটাও করো।'

অনিকেত ফোন কেটে দেওয়ার পর বিদিশা পাশের টেবিলের দিকে তাকাল। মঞ্জুদি টেবিলের ওপর পানের কৌটো খুলে খিলি পরীক্ষা করছে। আগে অফিসে বসেই পান সাজত, এখন কৌটোতে সেজে নিয়ে আসে। মুখে দেওয়ার আগে খিলি খুলে পরীক্ষা করে নেয়, চুন সুপুরি, খয়েরের ভাগে গোলমাল হয়ে গেছে কি না। বিদিশার দিকে তাকিয়ে অল্প হাসল। কিছু শুনল কি? শুনলে শুনবে। মঞ্জুদির আড়িপাতা নিয়ে ভাববার সময় নয় এখন। কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে বিদিশার। সে কী করবে? এইসময় কী করা উচিত?

টেবিলে পড়ে থাকা পেনটা তুলতে গিয়ে বিদিশা বুঝতে পারল তার হাত কাঁপছে। ভয়ে? বাথরুমে গিয়ে চোখে মুখে জল দিয়ে এলে হত। এই সবে টিফিন শেষ হল, এখনই আবার উঠবে? আজকাল অফিসে ঘনঘন টেবিল ছাড়া মুশকিল। সেকশন অফিসার খিটিরমিটির করে। বেচারি চাপে আছে। চাপে শুধু সে নয়, সকলেই আছে। নতুন ম্যানেজারের চাপ। অফিসে ম্যানেজার বদলালে প্রতিবারই এরকম হয়। কিছুদিন চাপাচাপি চলে। এবার একটু

বেশি সময় ধরে চলছে। তিনমাসের ওপর হয়ে গেল। অ্যাটেনডেন্স নিয়েও কড়াকড়ি চলছে খুব। এই তিনমাসে ম্যানেজার নিজে সারপ্রাইজ ভিজিট দিয়েছে অন্তত সতেরোবার। টেবিল ফাঁকা দেখলেই ধরে ধরে খাতায় লাল কালি মেরেছে। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি কঠিন। ইতিমধ্যে দু'জনকে কলকাতার বাইরে ট্রান্সফার করেছে। সকলেই ভয়ে ভয়ে আছে।

এই কারণেই রিচির জন্য পাগলের মতো লোক খুঁজছিল বিদিশা। মেয়েটার জন্য সপ্তাহে তিনদিন পর্যন্ত লেট হয়ে যাচ্ছিল। সাড়ে আটটার মধ্যে বেরোতে হয়। তার আগে মেয়েকে তৈরি করে শুধু স্কুলে পাঠানো নয়, ফিরলে কী খাবে, কী পরবে সব গুছিয়ে রাখতে হবে। ওইটুকু মেয়েকে বাড়িতে কার কাছে রেখে আসবে? শিলিগুড়ি থেকে মা এসে একমাসের ওপর রইল। কতদিন থাকবে? ওখানেও তো সংসার আছে। বাবার শরীর ভাল নয়, বয়স হয়েছে। কিছুদিন অফিসে আসার পথে রিচিকে শ্বশুরবাড়িতে রেখে আসত। আবার ফেরার পথে নিয়ে যেত। সেও সমস্যা। সল্টলেক থেকে কাশীপুর একদম উলটোপথ হয়ে যায়। পরিশ্রম হত খুব। মেয়ে বড় হচ্ছে। স্কুলের টাইম বেড়েছে। অত টানাহেঁচড়া তারও পোষাচ্ছিল না। তার ওপর রিচিও সমস্যা করছিল। বুড়ো দাদু-দিদার কাছে এখন আর বেশি থাকতে চায় না। দুরন্ত মেয়েকে ওরাও সামলাতে পারে না। সবসময় অ্যাটেনশন চায়।

পেন বন্ধ করে বিদিশা উঠে পড়ল। করিডর পেরিয়ে বাথরুমে এল। বেসিন খুলে চোখে মুখে জলের ছিটে দিল। বেশি দিতে পারল না। পাউডার, লিপস্টিক সব উঠে বিশ্রী দেখাবে। মনে হবে কান্নাকাটি করেছে।

টেবিলে ফিরে এসে ফাইল খুলে বিদিশা বুঝতে পারল, তার কান্নাই পাচ্ছে। এই অবস্থায় কাজে মন দেওয়া অসম্ভব। অনিকেত যা বলল তা যদি সত্যি হয় তা হলে মারাত্মক।

অনেক কষ্টে উমাকে পাওয়া গেছে। একটা সবসময়ের লোকের জন্য বিদিশা কাকে না বলেছিল? প্রতিবেশী, অফিসের কলিগ, আত্মীয়স্বজন, বাড়ির ঠিকে কাজের লোক, এমনকী বাজারের সবজিওলাকে পর্যন্ত।

'দেখো না কাউকে যদি পাও। অন্য কাজ করতে হবে না, শুধু মেয়েটাকে দেখবে। দিনরাত থাকবে, খাওয়া-পরা তো দেবই, পুজোআচ্চায় জামাকাপড় সব পাবে। ছোটখাটো মেয়ে হলে সবথেকে ভাল। রিচির সঙ্গে গল্প করতে পারবে, খেলতে পারবে। বন্ধুর মতো থাকবে। স্কুল থেকে ফিরলে খেতে দেবে, দুপুরে ঘুম পাড়াবে, বিকেলে ছাদে নিয়ে যাবে। তারপর তো আমি অফিস থেকে ফিরেই আসছি।'

একেবারে ছোট মেয়ে পাওয়া গেল না। কাশীপুরের রান্নার মাসি উমার কথা বলল।

'বয়স কিন্তু একেবারে কম নয় গো দিদি।'

বিদিশা আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কত?'

'কমও নয় যেমন, তেমন আবার খুব বেশিও নয়, চোদ্দো-পনেরো হবে।'

বিদিশা বলল, 'ওমা, সে তো বেশিই হল।'

'দেখলে বুঝতে পারবে না। রোগাভোগা চেহারা।'

'কাজকর্ম পারবে?'

'করেনি কখনও, শিখে নেবে। তুমি তো বলছ ভারী কিছু করতে হবে না।'

বিদিশা ভুরু কুঁচকে বলল, 'ভারী না হোক, রিচিরটা তো করতে হবে। সকালে টিফিন করে দেওয়া, ড্রেস পরিয়ে স্কুল বাসে তুলে দেওয়া। দুপুরে ফিরলে স্নানটান করিয়ে ঠিকমতো খেতে দেবে, তার ওপর এটা-সেটা টুকটাক তো থাকবেই।'

'সে কেন পারবে না? খুব পারবে।'

'রিচি কিন্তু খুব ছটফটে। তুমি তো জানোই। দুরন্ত মেয়েকে সামলাতে হলে গায়ে জোর লাগে। একটুতে হাঁপিয়ে পড়লে চলবে না।'

রান্নার মাসি হেসে বলে, 'ওমা, কিছু না পারলে চলবে কেন? টাকা যখন পাবে কাজ তো করতেই হবে।'

বিদিশা মনে মনে খুশি হল। একটু বড় হলেই ভাল। ভরসা করা যাবে। শুধু রিচির জন্য রাখলেও, সংসারের আর পাঁচটা কাজ পারবে। অফিস থেকে ফিরে আর নিজে চা বানিয়ে খেতে ইচ্ছে করে না। ক্লান্ত লাগে। প্রাইভেট কোম্পানিগুলোতে আজকাল খাটায় খুব। ছুটিছাটার দিনে সঙ্গে থেকে ঘরদোর গোছাবে। ফ্ল্যাটের ঝুল ঝাড়তে হাঁপ ধরে যায়। তার ওপর মাসে একদিন করে রান্নাঘর, বাথরুম পরিষ্কার। অনিকেত তো কুটোটি নাড়ায় না। দোকান বাজার করতে বললেও বিরক্ত হয়। তার ওপর মাসের মধ্যে দশদিন টুরে থাকে। মনের খুশিভাব লুকিয়ে বিদিশা বলল, 'মাসি, ওই মেয়ে আবার পাকা নয় তো? এই বয়সের মেয়ে, ভয় করে। পাড়া বেড়ানো, সিনেমা, টিভি দেখা মেয়ে হলে কিন্তু আমার চলবে না। দাদাবাবু রাগ করবেন।'

'গ্রামের মেয়ে, ওসব এখনও শেখেনি।'

'কোন গ্রাম?'

'আমার ননদের যেখানে বিয়ে হয়েছে। লালগোলার কাছে। মেয়ের বাবা খুব করে কাজ খুঁজছে। মেয়ে বড় হচ্ছে, রোজগারপাতি ছাড়া ঘরে বসে গিললে সংসারে চলে? পাড়াগাঁয়ে মেয়েদের রোজগারের পথ কই? বিয়ে থা ছাড়া বেশিদিন পড়ে থাকলে গোল্লায় যায়। আমি শুনে বললাম, দাঁড়া দিদিকে আগে জিজ্ঞেস করি। দিদি লোক খুঁজছে।'

বিদিশার খুশিভাবটা বাড়ল। সদ্য গ্রাম থেকে এলে একদিক থেকে ভাল। ক'দিন একটু হয়তো শিখিয়ে পড়িয়ে নিতে হবে, তা হোক। পাঁচ বাড়ির কাজ করে আসা হলে প্যাঁচ পয়জার বেশি থাকে। দরদাম বোঝে। অল্পে মন ভরে না। কথায় কথায় হাত পাতে। এটা চাই, ওটা চাই। প্রথমে সাবান দিয়ে শুরু হয়, তারপর পাউডার, লিপস্টিক পর্যন্ত চলবে। তাদের অফিসের বটুকবাবুর এই কাণ্ড হয়েছে। ড্রাইভারকে মাসে একবার সিনেমা দেখার ছুটি দিতে হয়। সেই সঙ্গে টিকিটের দাম। এরও হবে, তবে সময় লাগবে। ততদিনে রিচি আরও একটু বড় হয়ে যাবে।

বিদিশা বলল, 'আর জিজ্ঞেস করার কিছু নেই মাসি, তুমি ওই মেয়েকে নিয়ে আসতে বলো। ক'দিন রেখে দেখি কাজকর্ম ঠিকমতো পারে কি না, টাকা-পয়সার কথা পরে হবে। আচ্ছা, মেয়ের স্বভাবচরিত্র কেমন? হাতটানের অভ্যেস নেই তো? আমরা কিন্তু বাড়ি ওর হাতে ফেলে বেরিয়ে যাব।'

'সেসব আমি বলেই নিয়েছি দিদি, সেদিক থেকে কোনও গোলমাল নেই।'

সেদিক থেকে যে গোলমাল নেই, উমাকে দেখে প্রথমদিনই বুঝেছিল বিদিশা। সত্যি রোগা চেহারা। বয়স চোদ্দো বলে মনেই হয় না। পনেরো তো নয়ই। বিদিশা তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নেয়, এই বয়েসে যে স্বাভাবিক বাড়বাড়ন্ত হওয়ার কথা এই মেয়ের তা প্রায় কিছুই নেই। থাকলেও চট করে চোখে পড়ার মতো নয়। এটাও ভাল। চেহারা ছবি সেরকম হলে দোকান বাজারে পাঠানো যেত না। রাস্তায় ছেলেপিলে থাকে। অপুষ্টির শরীরে সেদিক থেকে নিশ্চিন্তই করল বিদিশাকে। শুধু অপুষ্টি নয়, গায়ের রংও ময়লা। সাধারণ ময়লা নয়, অতিরিক্ত ময়লা। তবে গরিব ঘরের কালো মেয়েরা কোনও এক আশ্চর্য কারণে লুকিয়েচুরিয়ে খানিকটা সৌন্দর্য পেয়ে যায়। এই মেয়েও পেয়েছে। উমার চোখে মুখে একটা আলগা শ্রী আছে। বালিকাসুলভ নিষ্পাপ ভাব। একমাথা জট পাকানো চুল, আর বড় বড় দুটো চোখ থাকায় ভাবটা যেন আরও বেড়েছে। সবথেকে আনন্দের বিষয় হল, প্রথম দর্শনেই উমাকে রিচির পছন্দ হয়ে গেল। লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। রোববার সকালে ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে বাড়িতে গুটিগুটি পায়ে ঢোকার মিনিট পনেরোর মধ্যে রিচি তার 'উমাদিদি'কে পুতুল সাম্রাজ্য চেনাতে বসে গেল। বিদিশা অবশ্য অ্যালাউ করেনি। জট পাকানো চুল থেকে উকুন মারতে গোটা বেলা মাথায় কেরোসিন মাখিয়ে বারান্দায় বসিয়ে রেখেছিল ঠায়ে।

অনিকেত ঘরে ডেকে নাক সিটকে বলে, 'শুধু উকুন নয়, তুমি ওই মেয়ের জন্য নতুন জামাকাপড়ের ব্যবস্থাও করে দাও বিদিশা। এখনই দোকানে যাও। রিচির কাছে সারাক্ষণ থাকবে, ওর ওইসব ছেঁড়া, নোংরা জামা তো জার্মসে ভরতি মনে হচ্ছে।'

বিদিশা তৃপ্তির হাসি হেসে বলল, 'আরে বাবা যাচ্ছি। যাক, রিচি যে ওকে অ্যাকসেপ্ট করে নিয়েছে এটাই নিশ্চিন্তি।'

অনিকেত খবরের কাগজে চোখ রেখে ঠাট্টার সুরে বলল, 'নিশ্চিন্তে অফিসে যেতে পারবে বলছ তো? তবে এত তাড়াতাড়ি নিশ্চিন্ত না হওয়াই ভাল বিদিশা। ক'দিন যাক, চুরিটুরির অভ্যেস আছে কি না দেখো।'

বিদিশা মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'সে আমার দেখা হয়ে গেছে। টেবিলে দশটা টাকা আর খুচরো ক'টা পয়সা পড়ে ছিল। আমি আড়াল থেকে নজর করেছি, ওই মেয়ে তাকিয়েও দেখল না।'

'ফুঃ' ধরনের আওয়াজ করে অনিকেত বলল, 'দশ টাকা দিয়েই বুঝে গেলে!'

'যা বোঝার দশ টাকা কেন, দশ পয়সাতেও বোঝা যায়। মেয়েরা লোভের চোখ চিনতে পারে। ওই মেয়ে চোর নয়।'

অনিকেত খবরের কাগজ সরিয়ে মিটিমিটি হেসে বলে, 'আমার লোভের চোখ কি তুমি চিনতে পারছ বিদিশা? যদি পারো তা হলে খুবই ভাল, না পারলেও ক্ষতি নেই। দরজাটা বন্ধ করে এদিকে এসো আমি চিনিয়ে দিচ্ছি।'

বিদিশা চোখ পাকিয়ে বলে, 'অ্যাই সাতসকালে অসভ্যতামি হচ্ছে?'

মুখে যা-ই বলুক, মনে মনে খুশি হল বিদিশা। আসলে উমাকে পাওয়ার কারণে অনিকেতেরও টেনশন অনেকটা রিলিভড হয়েছে। রিচিকে নিয়ে সেও কম দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিল না। প্রতিদিন কাজে বেরোনোর আগে বলত, 'তুমি চাকরিটা এবার ছেড়ে দাও বিদিশা।

মেয়েকে দেখো।' সে কি জানে না, এই বাজারে চাকরি ছাড়া মুখের কথা নয়। যতই কম হোক, টাকা তো। তা ছাড়া বিদিশাও পারবে না। সবসময় স্বামীর কাছে হাত পাতা যায় না।

প্রথমদিনই বিকেলে সস্তার ডোরাকাটা নতুন স্কার্ট ফ্রক পরে উমা ছাদে রিচির সঙ্গে বেদম ছোটাছুটি করল। কে বলবে, এই মেয়ে মাত্র কয়েক ঘণ্টা হল এ বাড়িতে এসেছে!

বহুদিন পর সেই রাতে, রিচি ঘুমিয়ে পড়ার পর, বিদিশা শাড়ি ছেড়ে রেখে স্বামীর কাছে উঠে এল। অনিকেত দ্রুত হাতে তার ব্লাউজ খুলতে খুলতে বলল, 'তোমার ওই উমা না রমা শুয়েছে কোথায়?'

'বসার ঘরে বিছানা করে দিয়েছি।'

বউয়ের ব্রায়ের হুকে হাত দিয়ে অনিকেত বলে, 'দেখো, যদি টেকে।'

'পিছনে বেশি টিকটিক না করলেই টিকবে। উফ আস্তে খোলো, খোঁচা লাগছে।'

অনিকেত খানিকটা উঁচু হয়ে বিদিশার পিঠ দেখতে চেষ্টা করে। হুকটা কোথাও গোলমাল করছে। আটকে যাচ্ছে।

'তোমার মা এসে টিকটিক না করলেই হবে। এবার এইসব কেরানি মার্কা ব্রায়ের হ্যাভিট ত্যাগ করো বিদিশা, রাতে নাইটি পরে শোবে। চট করে খোলা যায়।'

নিজেকে অন্তর্বাস থেকে মুক্ত করতে করতে বিদিশা ঠোঁট টিপে হাসে। বলে, 'কেরানির কাজ করি, অভ্যেস ছাড়ব কী করে? আর আমার মাকে একাই বা দোষ দিচ্ছ কেন বাপু, তোমরা বাড়ির লোকই বা কম কী? এই তো সেদিন রান্নার মাসি বলছিল...।'

বহুদিন পর স্ত্রীর বুকে আদর করতে লাগল অনিকেত। বিদিশা গাঢ় স্বরে বলল, 'অ্যাই তাড়াতাড়ি করো, রিচি উঠে পড়বে।'

'পড়লে পড়ুক, এই সুন্দর জিনিস আমি ছাড়ছি না।' জড়ানো গলায় বলে অনিকেত।

বিদিশা আদর খেতে খেতে ফিসফিসিয়ে বলে, 'অ্যাই জানো, ওই মেয়েটার শরীর এখনও ডেভেলপই করেনি।'

'সে আবার কী!'

'কী আবার, বুকটুক বোঝাই যায় না। ভাল করে একবেলা খাওয়াই জোটে না, বুক হবে কোথা থেকে? আমার অবশ্য সুবিধেই হল।'

ডান পা দিয়ে বউয়ের কোমর জড়াতে জড়াতে অনিকেত বলল, 'তোমার আবার কী সুবিধে হল?'

ভরা বুক, ভারী নিতম্ব, সুডৌল উরু স্বামীর শরীরে পেতে দিতে দিতে বিদিশা বলল, 'বাঃ, সুবিধা নয়! পুরুষমানুষের কু-নজরে পড়বে না।'

অনিকেত বউয়ের কাঁধে আলতো কামড় বসিয়ে বলে, 'তোমার ওপর আমার নজর কেমন?'

স্বামীর গালে নিজের নাক ঘষে বিদিশা বলে, 'খুব খারাপ, একদম কু।'

'আমি কিন্তু তোমার মতো এখনই মার্কশিট দিতে পারছি না বিদিশা। ওই মেয়ে সম্পর্কে খোঁজখবর নেব। আমাদের ওয়ার্কশপের কার যেন শ্বশুরবাড়ি ওই লালগোলার দিকে। কার যেন? এখনই মনে করতে পারছি না। মনে পড়লে বলব, বাপু একটু খোঁজখবর দিয়ো দেখি।'

বিদিশা চাপা শীৎকার দিয়ে বলে, 'তুমি এখন আমার দিকে মন দাও তো...।'

একটা সময় তৃপ্ত বিদিশা চিত হয়ে শুয়ে অনুভব করে, উমা নামের রোগাভোগা, কালো মেয়েটি তাদের মনের টেনশন শুধু কমিয়ে দেয়নি, শরীরের টেনশনও কমিয়েছে। শরীর শিথিল হয়েছে। দরিদ্র মেয়েটির প্রতি তার এক ধরনের কৃতজ্ঞতা তৈরি হয়! অন্ধকারে ঠোঁটের ফাঁকে হেসে নগ্ন শরীর চাদরে ঢেকে পাশ ফিরে শোয়।

সেই মেয়ের এই ভয়ংকর কাণ্ড! মাথায় যেন বাজ ভেঙে পড়েছে বিদিশার।

অন্যমনস্কভাবে হাতের ফাইলটা দেখা শেষ করে পাঠিয়ে দিল বিদিশা। আচ্ছা, অনিকেত ভুল করছে না তো? হতেও তো পারে। শিবু না কী নাম যেন লোকটার? সে হয়তো গোলমাল করছে। একজনের ঘটনা অন্যজনের ঘাড়ে ফেলছে। লালগোলার গ্রামে একজনই উমা থাকে তার কী মানে আছে? টেবিলে ছড়ানো কাগজপত্রের আড়ালে মোবাইলে দ্রুত অনিকেতের নম্বর টেপে বিদিশা। তারপর হাতের মুঠোয় যতটা সম্ভব লুকিয়ে ফোনটাকে কানে চেপে ধরে।

'আবার কী হল?'

'অ্যাই শোনো, খবরটা ঠিক তো?'

'হান্ড্রেড পার্সেন্ট কারেক্ট। আমি আবার শিবুকে জিজ্ঞেস করলাম, ও ডিটেইলসে বলল।' এই পর্যায়ে অনিকেতের গলা বেশ নার্ভাস।

বিদিশা কাঁপা গলায় বলল, 'কী ডিটেইলস?'

'তিন মাস আগের ঘটনা। ভোরবেলা পুকুরে স্নান সেরে ফিরছিল, পাটখেতে টেনে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে বাড়ির লোক এসে দেখল, শি ওয়াজ ন্যুড। রক্তে মাখমাখি।'

বর্ণনা শুনে শিউরে উঠল বিদিশা।

'থাক, থাক, আর বলতে হবে না ইস, ওই সকালে?'

'রেপের সকাল বিকেল বলে আলাদা কিছু হয় না। বাড়িতে ফোন করেছিলে?'

'বাড়িতে ফোন করব কেন?' কাঁপা গলায় বলে বিদিশা।

'না, রিচি আছে। তাই বলছিলাম।'

'রিচির এখনও স্কুল থেকে ফেরার সময় হয়নি, তা ছাড়া থাকলেই বা কী?' আতঙ্কে চোখমুখ কুঁচকে যায় বিদিশার।

অনিকেত চিন্তিত গলায় বলে, 'ওই মেয়ের সঙ্গে থাকলে অনেক কিছু হতে পারে।'

বিদিশা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'উমার বাড়ির লোক পুলিশে কমপ্লেইন করেনি?'

'গ্রামে চট করে ওসব পুলিশ-টুলিশ হয় না। কেলেঙ্কারির ভয় থাকে। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে না! নিশ্চয় মেয়ের বাবা-মা ভয় পাচ্ছিল। কে জানে যে লোক করেছে, তার হয়তো পলিটিক্যাল কানেকশন আছে। এসব নরমাল ব্যাপার। নিশ্চয় ওই কারণেই কলকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছে। এক ধরনের শেল্টার। পরে এখানেই ছেলে জুটিয়ে বিয়ে দেবে।'

বিদিশার ভয় বাড়ছে। কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, 'কী করা যায় বলো তো? আমার তো রান্নার মাসির ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছে। আজই ফেরার সময় কাশীপুরে যাব। ওকে সব বলব।'

অনিকেত চাপা গলায় ধমক দিল।

'ও কাজটি করতে যেয়ো না। অনেক করেছ, দয়া করে আর জিনিসটা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না। বাবা-মা জেনে যাবে, টেনশন করবে। তা ছাড়া রিচিকে দেখার জন্য একটা রেপ হওয়া মেয়েকে বাড়িতে এনে তুলেছি এটা ঢাকপিটিয়ে বলার মতো কিছু নয়। যদি জানাজানি হয়ে যায়, বিচ্ছিরি হবে। ঠান্ডা মাথায় কেসটা সামলাতে হবে।'

কান্না চেপে বিদিশা বলে, 'ঠান্ডা মাথায় কী করব সেটাই তো বুঝতে পারছি না।'

'কী আবার করবে? বাড়ি গিয়ে মেয়েটাকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে। তা ছাড়া আরও ঘটনা থাকতে পারে।'

'কী ঘটনা?' মোবাইলের ভেতর প্রায় মুখ গুঁজে দিয়েছে বিদিশা।

'এসব মেয়ে অনেক সময় নিজে থেকেই এসব কাণ্ড ঘটায়, বাড়ির লোক তারপর মেয়েকে সরিয়ে ফেলে। গ্রামগঞ্জে কত কী হয় তুমি জানো না বিদিশা।'

'নিজে থেকে করেছে! এটা আমি বিশ্বাস করতে পারছি না অনিকেত। ওই মেয়েকে আমি এতদিন দেখছি।

ও প্রান্তে অনিকেত ফের রেগে ওঠে।

'এতদিন মানে? কতদিন? কুড়ি-বাইশ দিনও তো হয়নি, এর মধ্যে চিনে ফেললে! রাবিশ। এইজন্যই তোমাদের নিয়ে বিপদে পড়তে হয়। বিদিশা, বাড়ি ফিরে ওই মেয়ের মুখ যেন আমি না দেখি। তুমি ওকে তাড়াবে। তুমি না পারলে, আমি বাড়িতে থেকে রিচিকে পাহারা দেব।'

দুম করে ফোন কেটে দিল অনিকেত। বিদিশা বাড়িতে রিং করল। ফোন বেজে গেল। ধরছে না কেন! প্রথম প্রথম ফোন ধরতে ভয় পেত মেয়েটা। কিছুদিনের মধ্যে শিখে নিয়েছে। মাথা পরিষ্কার। শুধু ফোন নয়, এখন গ্যাস, টিভি, গিজার পর্যন্ত চালাতে পারে। যত্নও আছে। কাজের লোকেরা ফ্রিজের দরজা জোরে বন্ধ করবেই। ক'দিনের মধ্যে দরজার দফা রফা হয়। রাবার প্যাড, ম্যাগনেট গোলমাল করে। এই মেয়ের বেলায় তা হচ্ছে না। শহুরে কায়দাকানুনে দ্রুত অভ্যস্ত হচ্ছে। বিদিশা আবার বাড়ির নম্বর টিপল। না, ধরছে না। কী হল? ভেতরে ভেতরে সামান্য কাঁপুনি অনুভব করল বিদিশা। কবজি উলটো ঘড়ি দেখল। রিচির ফেরার সময় হয়ে এসেছে। আজকাল রিচির খাওয়ার সময় উমা গল্প বলে। নিজের গ্রামের গল্প। খেত, মাঠ, পুকুর, ঝুরিনামা বুড়ো বটগাছ। অবস্থা এমন হয়েছে, 'উমাদিদি'র গল্প না শুনলে রিচি এখন মুখে ভাত তুলতে চায় না। নিশ্চিন্ত হয়েছিল বিদিশা। তার নিজের গল্পের স্টক ফুরিয়ে আসছে। সারাদিন এত কাজের পর মেজাজও ঠিক রাখতে পারে না। রাতে বকাঝকা করে মেয়েকে খাওয়াতে হত। উমার গল্প একটা সুন্দর অভ্যেস তৈরি করেছে।

এখন অন্যরকম মনে হচ্ছে বিদিশার। গ্রামের গল্প বলতে গিয়ে মেয়েটা ওইসব ঘটনা বলবে না তো? খারাপ লোকের গল্প? পরক্ষণেই মনে হল, ছি ছি, এসব কী ভাবছে? কেন ভাবছে? ভয় পেলে মাথায় হাবিজাবি চিন্তা আসে। ওইটুকু বাচ্চার কাছে অমন নোংরা ঘটনা কেউ বলতে পারে? অসম্ভব! রুমাল দিয়ে কপাল, ঘাড়ের ঘাম মুছল বিদিশা। কল্পনাও করা যায় না। ওরকম রুগ্‌ণ চেহারার একটা মেয়েকে...।

শরীরের ভেতর অস্বস্তি হচ্ছে। গা-টা কেমন গুলোচ্ছে। বমি পাচ্ছে? আবার মোবাইলের নম্বর টিপল। উমা ফোন ধরছে না কেন? খারাপ কিছু হয়নি তো?

এবার হাত দিয়েই কপাল মুছল বিদিশা।

তিনবারের বার ফোন ধরল। তবে উমা নয়, ফোন ধরল রিচি। তার গলায় হাসি। সম্ভবত আগে থেকেই হাসছিল, ফোন ধরেও হাসি থামাতে পারছে না। বিদিশা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে।

'এ কী, তুমি স্কুল থেকে ফিরে এসেছ সোনা!'

'হি হি, হ্যাঁ মা, আজ হাফ ছুটি দিয়েছে, হি হি।'

বিদিশা কষ্ট করে হেসে বলল, 'তুমি হাসছ কেন সোনামণি? খেয়েছ? উমাদিদি কোথায়?'

রিচি হাসি না থামিয়েই বলল, 'আমি খাচ্ছি মা, উমাদিদি একটা খুব মজার গল্প বলছে। হি হি।'

মেয়ের হাসিতে বিদিশা খানিকটা আশ্বস্ত হল। ফিসফিস করে বলল, 'তাই নাকি! কী গল্প?'

'রাক্ষসের গল্প মা, একটা রাক্ষস একদিন উমাদিদির গ্রামে পন্ডের পাশে ঘাপটি মেরে বসে ছিল, হি হি... যেই রাজকন্যা স্নান সেরে পন্ড থেকে উঠেছে... হি হি... মা, আমি এখন ফোন ছাড়ছি, গল্প শুনতে যাচ্ছি। গল্প শেষ হলে তোমায় ফোন করব, কেমন?'

থম মেরে বসে রইল বিদিশা। শরীরটা ঝিমঝিম করছে। দুর্বল লাগছে। হাতের তালুদুটো মনে হচ্ছে বরফের মতো ঠান্ডা। উমা তার মেয়েকে পুকুড়পাড়ের গল্প বলছে! সেই গল্প!

পাশের টেবিল থেকে মঞ্জুদি গলা বাড়িয়ে বলল, 'কী হল, আজ যে কর্তার সঙ্গে ম্যারাথন ইয়ে চালাচ্ছ। ব্যাপারটা কী ভাই? ঝগড়া না প্রেম?'

বিদিশা চুপ করে রইল। উত্তর দিতে ইচ্ছে করছে না। মাথাটা অল্প ঘুরছে। প্রেশারের গোলমাল হল? এর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেকশন অফিসার ডেকে পাঠায়।

'আপনার কি শরীরটা খারাপ বিদিশাদেবী?'

'কেন বলুন তো স্যার?' ভুরু কুঁচকে বলল বিদিশা।

'না, সেরকম কিছু নয়, আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে। তা ছাড়া এইটুকু ফাইলে সাত জায়গায় ভুল করেছেন। তার মধ্যে তিনটে ভুল তো মারাত্মক। তাই ভাবছিলাম নিশ্চয় কোনও সমস্যা হয়েছে। এই ফাইল যদি সাহেবের হাতে চলে যেত কী কাণ্ড হত বলুন দেখি?'

খানিকটা সময় মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল বিদিশা। বিড়বিড় করে বলল, 'স্যার, আমি বাড়ি যাব। প্রেশারটা মনে হচ্ছে গোলমাল করছে। আপনি কি একটা ট্যাক্সি ডেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন?'

ট্যাক্সির সিটে মাথা এলিয়ে দিল বিদিশা। খানিক আগে পর্যন্ত মেয়েটার ওপর মায়া হচ্ছিল, এখন ঘেন্না হচ্ছে। গল্পটা কি ইতিমধ্যে রিচিকে ওর বলা হয়ে গেছে। রাজকন্যা পুকুর থেকে স্নান সেরে ওঠার পর...। ইস, তারই দোষ। অনিকেত ঠিকই বলেছে, তাড়াহুড়ো করে ফেলেছে। অফিসের চাপে নিজের চাকরি সামলাতে গিয়ে দুম করে অচেনা অজানা কাউকে রেখে দেওয়াটা ঠিক হয়নি। আরও অপেক্ষা করা উচিত ছিল। চেনাজানা কাউকে রাখা

উচিত ছিল। সেরকম হলে না হয় নিজে চাকরি ছেড়ে দিত। ছেলেমেয়ে মানুষ করার জন্য কত মেয়েকেই চাকরিবাকরি ছেড়ে ঘরে ঢুকে যেতে হয়। হয় না? ভাগ্যিস খবরটা অনিকেত জেনেছে। নইলে আরও ভয়ংকর কিছু হতে পারত। শুধু গল্প বলা নয়, উমা যদি নিজে থেকে ওই কাণ্ড ঘটিয়ে থাকে তা হলে খারাপ লোকের সঙ্গে নিশ্চয় এখনও তার যোগাযোগ আছে। না থাকলেও বা কী? মেয়েটা লুকিয়ে থাকবে কতদিন? ওরা ঠিক এখানকার ঠিকানা পেয়ে যাবে। এই তো ওর অফিসের শিবু জেনে গেছে। ওই লোকও জানবে। পুকুরের পাশে একটা লোক না পাঁচটা লোক অপেক্ষা করেছিল কে জানে। যটাই হোক, ঠিক খবর পেত— উমা অনেকটা সময় কলকাতার একটা ফ্ল্যাটে একলা থাকে। সঙ্গে রিচি নামের একটা শিশু। তারপর একদিন দুপুরে এসে...। পশুগুলো কি রিচিকে ছাড়ত?

মাগো! শিউরে উঠে চোখ বুজল বিদিশা। এই ক'দিনে যে কিছু হয়নি তাই যথেষ্ট। হাত জোড় করে কপালে ঠেকাল বিদিশা।

বড় রাস্তা ছেড়ে বাড়ির গলিতে ঢোকার মুখে বিদিশা সিদ্ধান্ত নিল, আজই উমাকে কাশীপুরে রেখে আসবে। এই ট্যাক্সিতেই যাবে। পরে রান্নার মাসি যেমন পারবে মেয়েটাকে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। কাউকে কিছু বলার দরকার নেই। শুধু বলবে, মেয়েটাকে আর রিচির পছন্দ হচ্ছে না, মানিয়ে নিতে পারছে না। ব্যস। কুড়ি দিনের বদলে না হয় পুরো মাসের মাইনেটাই দিয়ে দেবে।

কাশীপুর থেকে ফিরে রিচিকে খাওয়াতে বসলে মেয়েটা কান্না জুড়ল। বারকয়েক বারণ করার পরও সেই কান্না থামাল না। ভাত মাখা এঁটো হাতেই মেয়ের গালে কষে চড় মারল বিদিশা।

খবরটা যে ভুল ছিল জানা গেল একমাস পর। রাতে খাওয়াদাওয়ার পর শুতে এসে কথাটা বিদিশাকে বলল অনিকেত। শিবুই তাকে বলেছে। অনিকেতের কাছে এক হাত জিভ কেটেছে।

'সরি দাদা, গ্রাম আর মেয়ে দুটো নামই ভুল করেছিলাম। সেই মেয়ের নাম উমা নয়। তার নাম হল...'

স্বচ্ছ একটা নাইটি পরে বিদিশা বসে আছে ড্রেসিং টেবিলের সামনে। চুল বাঁধছে। এরপর হাতে পায়ে ক্রিম দেবে। চাকরি ছেড়ে দেওয়ার কারণে তার হাতে এখন অঢেল সময়। দুপুর ঘুমোয়, রাতে অনেকটা সময় ধরে প্রসাধন সারে। কখনও টিভি দেখে। ইচ্ছে হলে পত্রিকা পড়ে। স্বামীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'তুমি কী বললে? আমরা ওকে তাড়িয়ে দিয়েছি বলেছ?'

অনিকেত মৃদু হেসে বলল, 'খেপেছ? আমাদের সম্পর্কে কী ভাবত বলো তো?'

'ঠিকই করেছ।'

গভীর রাতে আদর সেরে ক্লান্ত অনিকেত ঘুমিয়ে পড়ে। নগ্ন বিদিশা জেগে থাকে অনেকক্ষণ। ঘুমোতে চেষ্টা করে, পারে না। একটা সময় তার মনে হতে থাকে সে রক্তাক্ত। পড়ে আছে অচেনা একটা পাটখেতে।

'কে' নামে ফেব্রুয়ারি ২০০৯ সালে উদিতা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়

মেয়েটা

সুমিত্রা মেয়েটাকে প্রথম দেখতে পায় বারান্দায়। বারান্দা দিয়ে শান্তভাবে হেঁটে রান্নাঘরে ঢুকল। রাত তখন ক'টা? ঠিক ক'টা বলা কঠিন, দুটো থেকে আড়াইটের মধ্যে যে-কোনও একটা সময় হবে। প্রতিদিন এইসময়ে একটা মালগাড়ি যায়। অনেকক্ষণ ধরে যায়। ঘটাং ঘটাং ঘটাং...। একটানা, ভোঁতা একটা আওয়াজ। কোনও কোনওদিন মনে হয়, এই আওয়াজ কোনওদিনই শেষ হবে না। চলতেই থাকবে।

তখনও মালগাড়ি যাচ্ছিল। তার মানে দুটোর পর কোনও একটা সময়। অবশ্য কোনও কোনও সময় লেটও হয়। রাতের গাড়ি কাকভোরে পাস করে।

পাঁচিলের ঠিক ওপাশেই রেললাইন। প্রথম প্রথম ভয় করত। মনে হত গায়ের ওপর দিয়ে ট্রেন চলে যাচ্ছে। এখন আর হয় না। তিন মাসে অভ্যেস হয়ে গেছে। রেললাইনের কাছে বাড়ি হলে যেমন আওয়াজের অসুবিধে, তেমনি আবার সময় জানার সুবিধে। ঘড়ি লাগে না। গাড়ির আওয়াজই বলে দেয়, আটটা ছাব্বিশ, দশটা আঠাশ না একটা তেত্রিশ।

সময়ের সমস্যা না থাকলেও এ বাড়িটায় বাথরুমের সমস্যা আছে। লম্বা বারান্দা পার হয়ে এসে উঠোনে নেমে বাঁদিকে কয়েক পা যেতে হয়। বারান্দা আর উঠোনের মাঝখানে গ্রিলের দরজা। তাতে সর্বক্ষণ তালা। সেই তালা খুলে যেতে হয়। দিনে চলে যায়, রাতের বেলা অসুবিধে। বারান্দার আলোটা জ্বালতে হবে। কিছুদিন হল, সেই আলো আবার ঠিকমতো জ্বলছে না। কোনও কোনও দিন জ্বলে, কোনও কোনও দিন সুইচ ধরে হাজার খটর খটর করলেও জ্বলে না। নিজের মর্জি মাফিক চলে। বাল্‌ব পালটেও লাভ হয়নি। মনে হয়, সুইচে গোলমাল। প্রদীপ বাড়িওয়ালাকে বলেছে। লাভ হয়নি কোনও। বাড়িওয়ালা লোকটা কিপটে। গত এক সপ্তাহ ধরে মুখেই শুধু 'করছি করব' বলছে।

সুমিত্রা প্রদীপকে তাড়া দিলে সে ধমক লাগায়। বলে, 'থামো তো। যখন সময় হবে করবে। সামান্য একটা আলোর জন্য এতবার বলবার কী আছে? বাড়িওয়ালার সঙ্গে অত টিকটিক করলে দেবে দূর করে। এত কম টাকায় বাসা জুটবে আর? সুন্দরবনে গিয়ে থাকতে হবে। তা ছাড়া আমি আর বাড়ির জন্য ছুটব না। অনেক হয়েছে।'

সুমিত্রা গজগজ করে, 'কী এমন কম টাকা? একটা তো মোটে ঘর। তার ওপর ইলেকট্রিক বিল আলাদা। তাও ঘর দুটো হলে কথা ছিল।'

প্রদীপ বিরক্ত হয়। তার কাজকর্মের যা অবস্থা তাতে এই মুহূর্তে একটা ঘরের ভাড়া দিতেই প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। দু'দিন আগেও অবস্থাটা এরকম ছিল না। দিন দিন খারাপ হচ্ছে। এ মাসে পুরো মাইনে হয়নি। হবেও না। সুমিত্রাকে মিথ্যে বলেছে। বলছে, খেপে খেপে পাওয়া যাবে।

এই অবস্থায় বাথরুম, আলো-ফালোর কথা শুনলে মাথা গরম হয়ে যায়। চোখ-মুখ কুঁচকে বলল, 'ইস, দুটো ঘর। এইটুকু টাকায় অত ফুটানি চলে না। এমন ভান করছ যেন বিয়ের আগে রাজপ্রাসাদে থাকতে। দাসী-বাঁদিরা সব সামনে আলো ধরে ধরে চলত।'

'এর মধ্যে রাজপ্রাসাদের কী দেখলে? রাত-বিরেতে বাথরুমে যেতে হয় তাই বললাম।'

'ঠিক আছে অনেক বলেছ। এবার চুপ করো। রোজ রোজ তোমার জন্য বাড়ি বদলাব নাকি? প্রতিটা জায়গায় তোমার একটা না একটা অসুবিধে লেগে আছে। একটু মানিয়ে চলতে শেখো সুমিত্রা।'

'আমি তো বাড়ি ছাড়তে বলছি না। শুধু সুইচটা বদলাতে বললাম। এর মধ্যে মানামানির কী আছে?'

'ঠিক আছে ঠিক আছে, অনেক হয়েছে। লেকচার বন্ধ করে এবার ভাত দাও। লেট হয়ে যাচ্ছে। এমনিতেই অফিসের অবস্থা খারাপ। উঠি উঠি করছে। শুনছি ছাঁটাই হবে। এরপর দেরি করলে আর রক্ষে নেই। অফিস উঠলে তোমার অবশ্য সুবিধে। ফুটপাতে গিয়ে থাকতে পারবে। ল্যাম্পপোস্টের তলায় জায়গা বেছো, অন্ধকার থাকবে না।'

সুমিত্রার খারাপ লাগে। খুব দ্রুত মানুষটা কেমন যেন হয়ে গেল। চট করে ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে। একটা কথা বললেই রেগে যাচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে? টাকা-পয়সার টানাটানি তো অনেক সংসারেই আছে। তা ছাড়া অভাবটা তো আর তার একার নয়, সুমিত্রারও। তাকেও তো বইতে হচ্ছে।

'এরকম করে বলছ কেন?'

প্রদীপ প্রায় চিৎকার করে ওঠে। বলে, 'কীরকম করে বলব? ছড়া কেটে? সুর করে? মাত্র ক'টা দিনের মধ্যে দু'-দুটো বাড়ি ছাড়তে হল। তোমার জন্যই হল। এইটা চলছে তিন নম্বর। এখানেও তুমি গোলমাল পাকাচ্ছ। এরপরও কীভাবে বলব? বলো। বলে দাও। এভাবে চলতে থাকলে, ফুটপাত ছাড়া গতি থাকবে ভেবেছ?'

ঘটনা সত্য। আগের বাড়ি দুটো সুমিত্রার কারণেই ছাড়তে হয়েছে। প্রথমটা তো তিনটে স্টেশন আগে ছিল। কলকাতা যাতায়াতে প্রদীপের সুবিধে হত। সময় কষ্ট দুটোই কম হত। বাড়িটাও মন্দ ছিল না। দুটো ঘর। একটা আবার একটু বড়। শুধু জলের একটা সমস্যা ছিল। বাড়ির সামনে টাইমের কল। সকালেই ক'টা বালতি তুলে চৌবাচ্চা ভরে নিলে দিব্যি চলে যেত। দুটো মানুষের সংসারে কী আর এমন জল খরচ?

তবু বাড়িটা ছাড়তে হল। শুধু ছাড়তে হল না, ছাড়তে হল এক মাসের মধ্যেই। অ্যাডভান্সের টাকাটাও নষ্ট হল।

সেই সময় টাকাপয়সার অবস্থা এতটা খারাপ ছিল না। জল তোলা, কাচাকুচির জন্য একটা ঠিকে লোক রেখেছিল সুমিত্রা। রাধার মা। মোটাসোটা ভালমানুষ গোছের মহিলা। ফাঁক পেলেই টুক টুক করে পান সেজে মুখে পোরে।

এইরকম একদিন পান সাজতে সাজতে বলল, 'পাড়াটা ভাল না বউদি।'

'ভাল না! কেন ভাল না কেন? বেশ শান্তই তো মনে হয়। ঝুট ঝামেলা নেই। চব্বিশ ঘণ্টা মাইক বাজে না, চাঁদার হুজ্জুতি নেই। আমার বাবা শান্ত জায়গাই পছন্দ।'

রাধার মা আঙুলের ডগায় রাখা চুন জিবে দিয়ে বলে, 'না ভাল না। ওপরে ওপরে ঠিক আছে। তলে তলে ভাল না।'

'কী বলছ বুঝতে পারছি না রাধার মা। ঠিক করে বলো।' সুমিত্রার খানিকটা কৌতূহল হয়।

রাধার মা গলা নামিয়ে বলে, 'কী বলব? এখানে পকেটে টাকার গোছা নিয়ে লোক ঘোরে। সব বাইরের লোক। পার করে দেওয়ার ব্যবস্থা ওদের।'

সুমিত্রা ভয় পেয়ে বলে, 'কী যা-তা বলছ। কীসের পার? কোথায় পার?'

রাধার মা মুখ নামিয়ে হাসল। বলল, 'অত কথা জেনে কাজ নাই। আপনের বয়স অল্প, দেখতে শুনতেও ভাল। আমার বলার কথা বলে রাখলাম।'

সুমিত্রা কথাটা প্রদীপকে জানায়। প্রদীপ হেসে বলল, 'আমার বউটাকে যে দেখতে সুন্দর আমি জানি। শুধু সুন্দর নয়, একটু বেশি সুন্দর। ফরসা রং, পান পাতার মতো মুখ। নাকটা টিকালো। এ আর নতুন খবর কী সুমিত্রা?'

সুমিত্রা স্বামীর গায়ে চাপড় দিয়ে বলল, 'আঃ, ইয়ারকি কোরো না। রাধার মা বলে গেল, তলে তলে খারাপ।'

প্রদীপ এবার বিরক্ত হল। বলল, 'তোমার অত তলে যাওয়ার দরকার কী? পাড়া খারাপ না পাড়া ভাল আমাদের কী? আমরা পাড়ায় থাকি না বাড়িতে থাকি?'

সুমিত্রা চুপ করে যায়।

সপ্তাহখানেকের মাথায় সুমিত্রা বুঝল, পিছনে লোক লেগেছে। সেই লোক প্রদীপ অফিসে বেরিয়ে গেলেই চলে আসে। বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। সাইকেলে ঘন্টি মারে। মোটরবাইকে বসে পা নাড়ে। মোবাইলে কথা বলে। সুমিত্রা বাড়ি থেকে দোকান-বাজারে বেরোলে পিছু নেয়।

প্রদীপকে বললে সে এবারও হেসে উড়িয়ে দিল। বলল, 'ও তোমার মনের ভুল। রাধার মা বলেছে। এখন মনের মধ্যে এসব কত কিছু হবে। মোটরবাইক, মোবাইল, পিছু নেওয়া... যত্তসব গল্প। অফিসে গোলমাল শুরু হয়েছে। এখন গল্প নিয়ে মাথা ঘামালে আমার চলবে না। একটা অন্য রোজগারের ধান্দা করতে হবে মনে হচ্ছে। সাইড ইনকাম।'

সুমিত্রা প্রথমে বাড়ি থেকে বেরোনো কমিয়ে দিল। তারপর একেবারে বন্ধ করল। লাভ হল না। ক'দিনের মধ্যেই দুপুরে দরজায় টোকা পড়ল। এক দিন নয়, পরপর তিন দিন। সুমিত্রা আবার প্রদীপকে জানায়। প্রদীপ এবার রেগে গেল। বলল, 'কী শুনতে কী শুনেছ তার ঠিক নেই। দুপুরে কে দরজায় ধাক্কাবে? হয় ভুল শুনেছ, নয় ফিরিওলা। ইচ্ছে হলে খুলবে, না হলে খুলবে না। আমি তো অফিস কামাই করে তোমাকে পাহারা দিতে পারব না। সুমিত্রা, একটা জিনিস নিয়ে এত বাড়াবাড়ি কোরো না। আমার হাজারটা সমস্যা। কাজকর্ম নিয়ে পাগল হয়ে আছি। কেন বুঝতে চাইছ না?'

মুখে একথা বললেও প্রদীপ একটা রবিবার ছুতোর মিস্ত্রি ডেকে সদরে আর একটা ছিটকিনি লাগাল। সুমিত্রার দিকে হেসে বললে, 'ব্যস, এবার হল তো? আমার সুন্দরী বউকে আর কেউ চুরি করে নিয়ে যেতে পারবে না।'

এরপর তিন দিন আর কিছু হল না। হল চতুর্থ দিন। কে যেন জানলায় ঢিল ছুড়ল। একটা নয়, পরপর অনেকগুলো। লোহার শিকে সেই ঢিল লেগে আওয়াজ হল। ঠং ঠং ঠং...।

গোটা দুপুর রক্তশূন্য মুখে খাটে সোজা হয়ে বসে রইল সুমিত্রা। বিকেলে রাধার মাকে বলতে, সে মুখে আঁচল দিয়ে হাসে। সুমিত্রা রেগে বলে, 'হাসছ কেন? তুমিও কি তোমার দাদাবাবুর মতো বলছ আমি ভুল শুনেছি?'

রাধার মা চকিতে মুখ ঘুরিয়ে সুমিত্রার দিকে তাকায়। চোখে ঝিলিক মেরে বলে, 'ভুল না ঠিক দরজা খুলে দেখলেই পারেন। অসুবিধে কী? দাদাবাবু তো থাকেন না।'

প্রদীপ বাড়ি ফিরে দেখল, সুমিত্রা জিনিসপত্র অনেকটাই গুছিয়ে ফেলেছে। মরে গেলেও সে আর এখানে এক মুহূর্ত থাকবে না। রাধার মাকে টাকা হিসেব করে ছাড়িয়ে দিয়েছে বিকেলেই।

প্রদীপ তার কাছ থেকে একটা দিন সময় নিল।

তাড়াহুড়োর মধ্যে বাড়ি খুঁজলে যা ঘটার তাই ঘটল। ভাড়া বেশি পড়ল। তবে বাড়িটা ভাল। ঘর একটা হলে কী হবে, বড় বড় দুটো জানলা। সামনে এক চিলতে বারান্দাও আছে। বারান্দায় দাঁড়ালে দূরে একটা ঝিলের মতো দেখা যায়। বিকেলের পর সেখান থেকে হাওয়া আসে। সন্ধেবেলায় গা ধুয়ে সুমিত্রা কোনও কোনও দিন সেই বারান্দায় দাঁড়াত। তার ওপর বাড়িউলি মহিলাটি মুখে খিটখিটে হলেও, মনটা খারাপ নয়। সুমিত্রার খবর রাখত। মাঝেমধ্যে এসে দু'-একটা কথা বলে যেত। কতদিন বিয়ে, বাচ্চাকাচ্চা নেই কেন, একজন ভাল ডাক্তার চেনা আছে, একদিন যাবে কিনা— এইসব কথা।

বৃদ্ধা বাড়িউলি একা মানুষ। স্বামী মারা গেছেন অল্প বয়েসে। নিজেও নিঃসন্তান। দূর সম্পর্কের এক বোনপোকে এনে মানুষ করেছেন। সে ছেলেটিও ভাল। দেখতে শুনতেও ভাল। শক্তপোক্ত চেহারা। তবে চোখ দুটো খারাপ। বাইরে নিয়ে গিয়ে অপারেশন করেও কাজ হয়নি। মোটা ঘষা কাচের চশমা পরে। কলেজে ঢুকেও চোখের কারণে পড়াশোনা শেষ করতে পারেনি বেচারি। সুমিত্রার সামনাসামনি হলে মুখ নামিয়ে সুন্দর হাসে। হেসে বলে, 'দিদি, ভাল আছেন?'

শিষ্টাচারের জন্য ভুলে যায়, ও মুখ তুললেও কিছু নয়। ভাল করে যে দেখতে পায় না তার এত লজ্জার কী আছে?

ছেলেটাকে সুমিত্রার ভাল লাগে। সে প্রদীপকে বলে, 'ভাগ্যিস ওই নোংরা পাড়াটা ছেড়ে চলে এসেছি। ভাড়াটা একটু বেশি পড়ছে ঠিকই, কিন্তু বাড়িটা ভাল। মানুষগুলোও ভাল। আহা, ছেলেটা চোখে ভাল দেখে না।'

প্রদীপ চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বলে, 'পুরুষমানুষগুলো সব অন্ধ হলে সুন্দরী মহিলাদের কোনও অসুবিধে হত না।'

'ছিঃ, এরকম বলতে নেই।'

'আচ্ছা বলব না। তোমার পছন্দ হলেই হল। তবে মনে রেখো সুমিত্রা, আর কিন্তু আমি ছুটতে পারব না। বাড়ি বদলেরও একটা খরচ আছে। অ্যাডভান্স, সেলামি ছাড়াও ঠেলা, টেম্পো ভাড়া করতে হয়। তোমার স্বামীর যা অবস্থা তাতে মাসে মাসে সে এই খরচ সামলাতে পারবে না। আমি যেন বাড়ি বদলানোর কথা আর না শুনি।'

শুনতে হল। শুধু শুনতে হল না, এই কথার দু'দিন পরেই আবার বাড়ি বদলাতে হল প্রদীপকে।

দু'নম্বর বাড়ির সবথেকে ভাল ছিল বাথরুমটা। দেখলে চমকে যেতে হয়। অনেকটা জায়গা। সাধারণত ভাড়া বাড়ির বাথরুম এত বড় হয় না। চৌবাচ্চাটাও বড়। আগেরটার মতো জলের সমস্যা নেই। সুমিত্রার লোভ হয়। প্রদীপ অফিস চলে যাওয়ার পর ঘরের কাজ সেরে সুমিত্রা অনেকটা সময় ধরে স্নান করে। কোনও কোনও দিন রেডিয়ো নিয়েই বাথরুমে ঢোকে। ডিঙি দিয়ে উঁচু তাকে তুলে দেয়। গান চলে।

সেদিনও রেডিয়ো নিয়ে ঢুকেছিল সুমিত্রা। কিন্তু চালাতে পারেনি। চালাতে গিয়ে দেখল, ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে। আওয়াজ হচ্ছে ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস...। সস্তার রেডিয়োগুলোর এই দোষ। হুট করে ব্যাটারি ফুরোয়। খানিকটা বিরক্ত হয়ে চৌবাচ্চার দিকে সরে আসে সুমিত্রা আর তখনই দেখতে পায় সে।

উলটোদিকের দেওয়ালে, উঁচুতে, সবসময় বন্ধ থাকা জানলার কোণে একটা ফুটো। ছোট্ট ফুটো। সেই ফুটোতে একটা চোখ। চোখ নয়, চশমা। ঘষা কাচের চশমা। সেই চশমা স্থির হয়ে তাকিয়ে আছে। আবছা, স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকা সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে আছে।

সন্ধেবেলা অফিস থেকে ফিরে ঘটনা শুনল প্রদীপ। ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি ঠিক দেখছ সুমিত্রা? মনের ভুল নয় তো? আমার কিন্তু এখনও মনে হয় আগেরবারেও তোমার ভুল হয়েছিল। দরজায় কার না কার টোকা শুনেই আমরা পালিয়ে এলাম। এটাও সেরকম কিছু নয় তো। একটা প্রায় অন্ধ মানুষ...?'

'আমি ঠিক দেখেছি। ওই চশমা আমার ভুল হবে না।'

'কই আমি তো বাথরুমে কোনও ফুটোটুটো দেখতে পেলাম না!'

'নিশ্চয় বাইরে থেকে ঢেকে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।' শাড়ির আঁচলটা পিঠে ফেলে মুখ নামিয়ে বলল সুমিত্রা।

প্রদীপ উঠে দাঁড়িয়ে শান্ত গলায় বলল, 'সরো সুমিত্রা। আমাকে যেতে দাও। ওপরে গিয়ে হারামজাদার চোখ উপড়ে দিয়ে আসছি।'

সুমিত্রা স্বামীর হাত চেপে ধরল। ফ্যাকাশে মুখে ফিসফিস করে বলল, 'কোনও লাভ নেই। যারা ওই চোখে দেখতে চায় তারা চোখ না থাকলেও দেখবে। তা ছাড়া প্রমাণ করা যাবে না। তোমার মতোই লোকে শুনলে হাসবে। বিশ্বাস করতে চাইবে না। তার থেকে চলো বাড়িটা ছেড়ে চলে যাই।'

প্রদীপ প্রথমে অবাক হয়, তারপর রেগে ওঠে।

'আবার বাড়ি ছেড়ে দেব! তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? আর কতবার পালাব বলো তো সুমিত্রা? তোমার জন্য কি সারাজীবন পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হবে?'

সুমিত্রা নিচু গলায় বলে, 'এটা আমার দোষ? একটা কদর্য মানুষ বাথরুম ফুটো করে... ছি ছি।'

প্রদীপ হাত ছুড়ে বলে, 'না তোমার দোষ নয়। তোমার দোষ হবে কেন? দোষ আমার।

গরিবের ঘরে সুন্দর দেখতে মেয়ে বিয়ে করে আনা যে কত বড় দোষ আমি হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। পৃথিবীর সব পুরুষমানুষ শুধু তোমার সঙ্গে ফস্টিনস্টি করে?'

বকাঝকার পরেও প্রদীপ বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হল। কারণ না ছেড়ে তার কোনও উপায় ছিল না। গোটা একটা দিন সুমিত্রা বাথরুমে ঢোকেনি। সে জানিয়েছে, ওই বাথরুমে সে আর কখনওই ঢুকবে না।

বারান্দার আলোটা আজ জ্বলেছে। বাথরুম থেকে ফিরে সুইচ নেবানোর ঠিক আগের মুহূর্তে সুমিত্রা মেয়েটাকে দেখতে পায়। পিছন থেকে দেখতে পায়। লম্বায় অনেকটা তার মতোই।

সুমিত্রা বুঝতে পারল ভুল দেখেছে। এত রাতে একটা মেয়ে বাড়িতে কীভাবে ঢুকবে? ভাড়া বেশি হলেও এই তিন নম্বর বাড়ির দরজাটরজাগুলো শক্তপোক্ত। সদরে কাঠের পাল্লার পরও লোহার কোলাপসিবল আছে। বারান্দা থেকে উঠোনে নামার মাঝখানে গ্রিলের দরজায় তো সবসময় তালা। তা হলে? এ মেয়ে ঢুকবে কী করে? আর ঢুকলেও অমন শান্ত ভঙ্গিতে বারান্দা দিয়ে হেঁটে রান্নাঘরের দিকে যাবেই বা কেন? ভুল দেখেছে। নিশ্চয় ভুল দেখেছে। এ বাড়িতে চোর-ডাকাত, ভূতটুতের কোনও বদনাম নেই। তিন মাস তো কেটে গেল। কই এতদিন তো কোনও অসুবিধে হয়নি!

পুরো এক গেলাস জল খেয়ে সুমিত্রা ঘরে এসে শুয়ে পড়ল। মালগাড়িটা কি যাওয়া শেষ করেছে? অনেকক্ষণ একটানা কোনও শব্দ হলে এটাই মুশকিল। থামলেও মনে হয় থামেনি। প্রদীপ হাত-পা ছড়িয়ে মরার মতো ঘুমোচ্ছে। বালিশটা সরে মাথাটা কাত হয়ে আছে। সুমিত্রা সাবধানে মাথার তলায় বালিশটা গুঁজে দিল। আহা রে, মানুষটার খুব ধকল যাচ্ছে। সংসারের চাপ, অফিসের চাপ সব মিলিয়ে দুশ্চিন্তা। আজকাল কোনও সময়েই মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না। অফিসে খুব গোলমাল চলছে। এ মাসে পুরো মাইনে হয়নি। বলছে খেপে খেপে দেবে। প্রথমটার পর তাও তো দেয়নি। রাগারাগি কি আর এমনি করে? তবে একটা ভাল কথা, চাকরির পাশে কী যেন একটা কাজের চেষ্টা করছে। ছোটখাটো ব্যাবসামতো। যদিও তাতেও টাকা দরকার। কোন একটা বন্ধু কিছুটা দেবে বলেছে। বাকিটা নিয়ে চিন্তায় আছে। সন্ধেবেলাতেও বলছিল।

'টাকার জন্য আটকে যাচ্ছে সুমিত্রা। ব্যাবসাটা শুরু করতে পারলে আর কোনও চিন্তা থাকবে না। এক বছরের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাবে। তখন শালার চাকরির মুখে লাথি। শুধু টাকাটা যদি পাই...।'

'কেন তোমার ওই বন্ধু না কে, সে দেবে না?'

'আরে বাবা, আগে যেটুকু বলেছে সেটুকু দিক। বাকিটা দেখা যাবে। অ্যাই শোনো, বর্ধনকে একদিন ডাকব বলেছি। খাওয়াব। রোববার-টোববার দেখে দুপুরে ডাকব'খন।'

সুমিত্রা অবাক হয়ে বলে, 'বর্ধন কে?'

'সে তুমি চিনবে না। ওই লোকটার হাতেই অর্ডার। আমার ব্যাবসার ফিউচার। পরে ঘুস-টুস নেবে। তবে আগে থেকে একটু ইন্টিমেসি দেখিয়ে নিই। বলেছি, একদিন এসে আমার বউয়ের হাতের রান্না খেয়ে যান। ব্যাবসায় এসব আছে। খাওয়াতে হয়। বাইরে

খাওয়ালেও চলত। কিন্তু তাতে ইন্টিমেসি থাকত না। সেই কারণে প্রথমবার বাড়িতে ডাকা। প্ল্যান কীরকম?'

সুমিত্রা হেসে বলল, 'প্ল্যান ভাল। তবে দেখো তোমার বউয়ের হাতে রান্না খেয়ে আবার না পালায়।'

প্রদীপ খানিকটা অন্যমনস্কভাবে বলল, 'না না, পালাতে দিলে চলবে না। অর্ডার চাই। পালাতে দিয়ো না সুমিত্রা।'

সুমিত্রা হেসে বলল, 'আমি পালাতে না দেওয়ার কে? আমি ওসব কী বুঝি। সংসারে দুটো সাশ্রয় হলেই হল।'

সুমিত্রা ঠিকই করে রেখেছে, সেরকম হলে হাতের একটা বালা বিক্রি করে দেবে। প্রদীপকে এখন কিছু বলেনি। এত রাতে মনে হচ্ছে, বললে ভাল হত। মানুষটা কিছুটা চিন্তার হাত থেকে হয়তো রেহাই পেত।

ঘুম আসতে আরও রাত হল সুমিত্রার। ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগে আগে সে সিদ্ধান্ত নিল, প্রদীপকে কালকেই বালা বিক্রির কথাটা বলবে, কিন্তু মেয়েটার কথা বলবে না। মজা করেও বলবে না।

ঠিক দু'দিন পর মেয়েটাকে দ্বিতীয়বার দেখা গেল। দু'দিন পরে মানে শুক্রবার। এবার আর রাতে নয়, দেখা গেল দুপুরবেলা। একটা সাতান্ন বেরিয়ে যাওয়ার পর।

খেয়েদেয়ে একটু গড়িয়ে নেওয়া সুমিত্রার বিয়ের আগের স্বভাব। দুপুরবেলা এ বাড়িটা কেমন একটা ঝিম ধরে পড়ে থাকে। সুমিত্রার বেশ লাগে। চোখ বুজে আসে। আজও আসছিল, আর ঠিক তখনই শব্দটা হল।

খসখস, খসখস...।

শাড়ির শব্দ। মাড় ভাঙা শাড়ি পরে কেউ নড়াচড়া করলে যেমন শব্দ হয়, তেমন। সুমিত্রা খাটের ওপর সোজা হয়ে বসল। ভুল শুনছে?

শব্দটা আবার এল। এবার আর শাড়ির শব্দ নয়, চুড়ির শব্দ। বেশি চুড়ি নয়, অল্প চুড়ির শব্দ। হাতে চুড়ি পরে কেউ কিছু করছে। কান পেতে শুনল সুমিত্রা। শব্দটা আসছে ভেজানো দরজার ওপাশ থেকে। এর মানে বারান্দায় কেউ আছে। কে আছে? কেউ কি আছে?

পা টিপে টিপে উঠে গিয়ে দরজা ফাঁক করতেই মেয়েটাকে স্পষ্ট দেখতে পেল সুমিত্রা।

শাড়ি পরে বসে আছে বারান্দায়। মেঝেতেই বসে আছে। সেই শাড়ির রং তুঁতে। মাথা নামিয়ে কিছু একটা করছে। চুল ঝুঁকে পড়েছে সামনে। হাতে অল্প ক'টা চুড়ি। ডান হাতে একটা সোনার বালার মতো। এত সব দেখা যাচ্ছে, কিন্তু মুখ দেখা গেল না। কারণ এবারও মেয়েটা উলটোদিকে ফিরে আছে।

শরীরের সব শক্তি দিয়ে সুমিত্রা চিৎকার করে উঠল। কে? কে? একবার, দু'বার, তিনবার। কোনওবারই আওয়াজ বেরোল না। সামান্য আওয়াজও নয়।

সুমিত্রাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে মেয়েটা এবার উঠে দাঁড়ায়। শান্ত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ায়। মাটির ওপর পড়ে যাওয়া আঁচলটা তুলে কাঁধের ওপর ফেলে। তারপর কোনও দিকে না

তাকিয়ে ধীরপায়ে বারান্দা ছেড়ে নেমে যায় উঠোনে। বাঁদিকে বাঁক নিয়ে চোখের আড়ালে চলে গেল সুমিত্রার।

যেন কিছুই হয়নি! যেন সে এ বাড়িরই মেয়ে!

সুমিত্রা যখন দরজা ধরে মেঝের ওপর বসে পড়েছে তখন সে ঘামছে। শুধুই ঘামছে।

প্রদীপ ফিরে জামাকাপড় বদলাতে বদলাতে বলল, 'বুঝলে সুমিত্রা, বর্ধনকে ডেকে ফেলেছি। কালই আসতে বলেছি। আর দেরি করাটা ঠিক হবে না। জিনিসটা প্রায় পেকে এসেছে। এবার একটা ছোট্ট ঢিল দিলেই ব্যস, টুপ করে নীচে পড়বে।' বলতে বলতে প্রদীপ ঢিল ছোড়ার অভিনয় করল। বাঁকাভাবে একটু হাসল। মানুষটাকে আজ খুশি খুশি লাগছে। খানিকটা যেন নিশ্চিন্ত। প্রদীপ খাটে বসে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর আবার বলতে শুরু করল, 'আমি তো ভেবেছিলাম, দুপুরে খাওয়াব। ব্যাটা বলল, না রাতে। তখন বুঝলাম, শুধু খাওয়া নয়, শালা একটু ইয়েও চায়। ইয়ে বোঝো তো? আরে ইয়ে গো।' প্রদীপ দুটো হাত সামনে এনে বোতলের ইঙ্গিত করল। হেসে বলল, 'বেশ, রাতে খাবি তো তাই খা শালা। ওর অর্ডার শিয়োর করতে পারলে বাকিটা কোনও অসুবিধে হবেই না। টাকা আপসে চলে আসবে। এ মাসের শেষ থেকেই কাজ শুরু করে দেব। কথা ফাইনাল হয়ে গেছে।'

থেমে সিগারেটে লম্বা টান দিল প্রদীপ। তৃপ্তির টান। পা নাড়াতে নাড়াতে বলল, 'খাবার বেশি কিছু করতে হবে না। মেনু ছোট রাখবে। মাংসের সঙ্গে কোনটা মানাবে বলো তো সুমিত্রা? ফ্রায়েড রাইস নাকি রুমালি রুটি? সে তুমি যেটা ভাল বোঝো। পারলে একটু চাটনি দিয়ো। কালই টম্যাটো এনে দেব। ঘরে চিনি কতটা আছে?'

এতটা বলার পর প্রদীপ বুঝল, সুমিত্রা কিছু বলছে না। একমনে চুপ করে আলনার কাপড় গুছিয়ে যাচ্ছে। সে বউয়ের দিকে তাকাল। তাকিয়ে চমকে উঠল।

'এ কী তোমার কী হয়েছে? মুখটা এরকম ফাকাশে কেন? জ্বরটর বাধালে নাকি?'

সুমিত্রা মুখ নামিয়ে বলে, 'কিছু হয়নি, কী আবার হবে? কাল রাতে ঘুম হয়নি বোধহয়।'

প্রদীপ নিশ্চিন্ত হল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'তাই বলো। দেখো বাপু এখন আবার জ্বর-ফর বাধিয়ে শুয়ে পোড়ো না। অন্তত কাল রাতের আগে তো নয়ই। একটা মানুষকে খেতে বলেছি। আর শোনো...।'

'কী?'

'না, থাক পরে বলব।' স্ত্রীর দিকে অল্পক্ষণ তাকিয়ে থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল প্রদীপ।

সুমিত্রার একবার মনে হল, মেয়েটার কথাটা বলে ফেলে। পরক্ষণেই মনকে শক্ত করল। একটা মিথ্যে জিনিস নিয়ে প্রদীপকে বিরক্ত করাটা অন্যায় হবে। বিশেষ করে এই সময় তো একেবারেই নয়। মনে হচ্ছে, অনেকদিন পরে একটু ঘুরে দাঁড়ানোর আশা পেয়েছে মানুষটা। এখন এসব হাবিজাবি শুনলে রেগে যাবে, চেঁচাবে। ভাববে এবার এ বাড়িটারও দোষ দেখতে শুরু করেছে সে। বাড়ি বদলাতে চাইছে। প্রদীপ তো আগের ঘটনাগুলোও বিশ্বাস করেনি। এটা তো একেবারেই করবে না। করবার মতো নয়ও। সে হলেও করত না। আজকালকার দিনে ভূত কে বিশ্বাস করে? কেউ করে না। সে কি করে? করে না।

রাতে সত্যি সত্যি জ্বর এল সুমিত্রার। খেতে বসে বুঝল। বেশি জ্বর নয়, শরীরে হালকা একটা গরম ভাব। রুটিগুলো নেড়ে-চেড়ে তুলে রাখল।

প্রদীপ ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী হল, খাবে না?'

'না, ইচ্ছে করছে না। গা-টা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে। রাতে উপোস দিলে ঠিক হয়ে যাবে।'

প্রদীপ বিরক্ত হল। মুখ নামিয়ে খেতে খেতে বলল, 'কালই ওষুধ-টষুধ খেয়ে ফিট হয়ে যাও। বাড়িতে একজন গেস্ট আসবে আর তুমি জ্বর নিয়ে কাঁথামুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকলে... আর শোনো।' প্রদীপ মুখ তুলল।

চলে যেতে গিয়েও সুমিত্রা থমকে দাঁড়ায়। মানুষটা যেন কেমন করে কথা বলছে আজ। গলার স্বর কঠিন। চোখগুলোও কঠিন।

প্রদীপ বলল, 'দয়া করে বর্ধনটার সামনে একটু ফিটফাট হয়ে থেকো।'

'মানে?'

'মানে আর কী? একটু সেজেগুজে থাকবে। একটা ভাল শাড়ি, একটু গয়না। মুখে পাউডার, লিপস্টিক দেবে। বোঝোই তো একটা লোক অর্ডার দেবে। বড় অর্ডার। ব্যাবসার শুরুতে ওরকম একটা অর্ডার মানে অনেক। শুরুটা ঠিক হলে বাকিটা ভাবতে হয় না। কিন্তু অর্ডারটা যে দিচ্ছে লোকটা তো দেখবে কাকে দিচ্ছে। দেখবে না?'

প্রদীপ উঠে পড়ল। বারান্দায় হাত ধুয়ে এসে খাটে বসল। একটা সিগারেট ধরাল। আড়চোখে সুমিত্রার দিকে তাকাল। বলল, 'আসলে সকলেই চায় যাকে এত টাকার কাজ দিচ্ছে সেই লোকটা কেমন? ঘরটা দেখবে। ঘরের মানুষগুলোকে দেখবে। একটা ভরসা তো দিতে হবে। বোঝাতে তো হবে প্রদীপ লোকটা হেঁজিপেঁজি নয়। সুন্দর ঘর না থাক, সুন্দর বউ আছে। দরকার হলে তাকেই দেখাতে হবে। হবে না? তা ছাড়া...।'

সুমিত্রা ঠান্ডা গলায় বলল, 'তা ছাড়া কী?'

প্রদীপ উঠে এসে বউয়ের সামনে দাঁড়াল। কাঁধে হাত রাখল, তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'এই প্রথম তোমার স্বামীর একটা চান্স এসেছে। ঘুরে দাঁড়ানোর সুযোগ। এই সময় বর্ধনটা ফসকে না যায়। তুমি একটু লোকটাকে ম্যানেজ করতে পারবে না সুমিত্রা?'

প্রদীপের চোখ চকচক করছে। সুমিত্রা তার হাত কাঁধ থেকে সরিয়ে খুব নিচু গলায় বলল, 'পারব। কী করতে হবে বলে দিয়ো।'

প্রদীপ হাসল। 'বলল, গুড। ভেরি গুড।'

রাতে সুমিত্রার ঘুম ভাঙল জ্বরের দাপটে। গা পুড়ে যাচ্ছে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। সে ধড়ফড় করে উঠে বসল বিছানায়। পাশেই হাত-পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে প্রদীপ। জানলা-দরজার ফাঁকফোকর দিয়ে আসা ছিটে-ফোঁটা আলো এসে পড়েছে ঘুমন্ত মুখে। সুমিত্রা বুঝতে পারছে শরীরটা খারাপ লাগছে। প্রদীপকে ডাকবে। ডেকে জ্বরের কথা বলবে? মনে হচ্ছে বলা উচিত।

'অ্যাই শোনো, শুনছ?'

প্রদীপের গায়ে হাত দিয়ে নাড়া দিল সুমিত্রা।

প্রদীপ প্রথমে বিরক্তিতে বলল, 'আঃ।' তারপর উঠে বসল। নাক-মুখ কুঁচকে বলল, 'কী হয়েছে?'

সুমিত্রা ভেবেছিল স্বামীকে জ্বরের কথা বলবে। কিন্তু বলল অন্য কথা। গায়ে হাত রেখে বলল, 'আমার ভয় করছে।'

'ভয় করছে! রাতদুপুরে ঘুম ভাঙিয়ে কী পাগলামি করছ সুমিত্রা?'

'একটা মেয়ে... জানো একটা মেয়ে এই বাড়িতে ঘোরে...।'

প্রদীপ রাগে হিসহিস করে ওঠে, 'কী? একটা মেয়ে বাড়ির মধ্যে ঘুরে বেড়ায়? ঢুকতে দাও কেন?'

'আমি দিই না। সে নিজেই ঢোকে। দরজা-জানলা বন্ধ থাকে, তাও ঢোকে।' সুমিত্রা যেন খানিকটা ঘোরের মধ্যে বলে।

প্রদীপ ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসে। চাদর টেনে শুতে শুতে বলে, 'ও তাই বলো। ভূত। এবার তুমি কী বলবে আমি জানি সুমিত্রা। তুমি বলবে, চলো বাড়িটা ছেড়ে চলে যাই। তাই তো? সুমিত্রা, আমার মনে হচ্ছে, তোমার মাথার কোনও সমস্যা হচ্ছে। কাল বর্ধনের ব্যাপারটা ভালয় ভালয় মিটে গেলে আমি তোমাকে কলকাতায় নিয়ে যাব। ডাক্তার দেখাব। তাও ভাল, এবার মেয়ে-ভূত দেখেছ। পুরুষ নয়। যাই হোক, প্লিজ আর বিরক্ত না করে আমায় ঘুমোতে দাও। তুমিও ঘুমোও।'

সুমিত্রার ঘুম হল না। সারারাত গা পোড়া জ্বর ছিল। শেষরাতে নিজে থেকেই সেই জ্বর খানিকটা কমে এল। চারটে সাতান্নর গাড়িটা চলে যাওয়ার পর খাট থেকে সাবধানে নামল সুমিত্রা। আর শুয়ে থাকা যাবে না। অনেক কাজ। বাড়িতে অতিথি আসবে।

পা টিপে গিয়ে দরজা খুলল সুমিত্রা।

এই সময়টা আলো ফোটে, আবার ফোটেও না। সবকিছু একই সঙ্গে স্পষ্ট এবং অস্পষ্ট। আঁধার বুঝি শেষ কথা বলে যায় আলোর সঙ্গে। এক আশ্চর্য সময় এটা। সেই আশ্চর্য সময়ে আবার মেয়েটাকে দেখতে পেল সুমিত্রা। বসে আছে সে। বসে আছে বারান্দার শেষে। উঠোনে নামার সিঁড়ির ধাপে। সেই তুঁতে শাড়ি। সেই পিঠের ওপর আঁচল ফেলা।

আগের দিনগুলোতে সুমিত্রার সাড়া পেয়ে এই মেয়ে হেঁটে চলে গেছে। সরে গেছে। মিলিয়ে গেছে চোখের আড়ালে। আজ গেল না। ঘুরে তাকাল।

চমকে উঠল সুমিত্রা। এই মুখ তো তার চেনা! বহু, বহুদিনের চেনা! আয়নার সামনে দাঁড়ালেই সে দেখতে পায়। ফরসা রং, পান পাতার মতো মুখ। নাক টিকালো।

জ্বরের দুর্বলতায় মাথা ঘুরে গেল সুমিত্রার। চোখ বোজার আগে তার মনে হল, মেয়েটা যেন তার দিকে চেয়ে হাসল। সামান্য হাসল।

লাইনের ধারে মেয়েটার মৃতদেহ পাওয়া গেল সন্ধের ঠিক পরে পরে। গায়ে তুঁতে শাড়ি। হাতে অল্প ক'টা চুড়ি। মুখে পাউডার আর ঠোঁটে হালকা লিপস্টিক মেখে মরা মেয়েটা যেন হাসছে। সামান্য হাসছে।

প্রদীপ বিকেলেই কলকাতায় চলে গেছে বর্ধনকে আনতে। তার বউয়ের আত্মহত্যার খবর সে এখনও জানে না।

সাপ্তাহিক বর্তমান ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০০৬

যে যা পারে না

যে যা পারে না! এ আবার কী রে বাবা! শাম্বদা মিটিমিটি হেসে বলল, 'দেখ না কী কাণ্ড হয়। এবারের নবমী একেবারে জমজমাট হয়ে যাবে। একেই বলে যথার্থ রিয়ালিটি শো।' মেঘনা ভয়-ভয় মুখে বলল, 'শাম্বদা, পুজোর সময় কোনও ঝামেলা-টামেলা হয়ে যাবে না তো? করতে গেলাম ফান, হয়ে গেল উলটো। তা হলে পুটো কমিটি কিন্তু ছেড়ে কথা বলবে না।' শাম্বদা মেঘনার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'দূর বোকা, সবাই দারুণ খুশি হবে। আইডিয়া কাকে বলে দেখবি। শুধু একটা নোটিশ দিতে হবে।' আমি ভুরু কুঁচকে বললাম, 'কী নোটিশ?' শাম্বদা বলল, 'নোটিশে লেখা হবে— এই খেলায় নাম দেওয়ার সময় দয়া করিয়া কেহ মিথ্যে বলিবেন না। কী পারেন আমরা তাহা জানিতে চাহি না। যাহা পারেন না তাহাই করিয়া দেখান এবং পুরস্কার জিতুন। কমিটির সঙ্গে কথা বলে প্রাইজ মানিটা হেভি রাখতে হবে।' অর্ক বলল, 'মিথ্যে বলার উপায় নেই। আমাদের হাউজিং-এ কে কী পারে, না পারে আমাদের ভালমতোই জানা আছে। বৈশালী কাকিমা গান গাইলে কী কেলেঙ্কারি হয় তা কি আমরা জানি না ভেবেছ? কিংবা ধরো, অপূর্ব কাকুর রান্না। নুন ঝালে পোড়া। মুখে দিলে তিড়িং-বিড়িং করে টানা তিন দিন লাফাতে হবে। বিদিশা মাসিমার ড্রইং? ল্যান্ডস্কেপ আঁকলে তলায় লিখে দিতে হয়— ইহা একটি দৃশ্য। সূর্য অস্ত যাইতেছে। নৌকো চলিতেছে। তারপর ধরো অন্তরার সাজগোজ। যত সাজবে, তত পেতনি ওয়ার্ল্ড ওকে দলে নেবার জন্য টানাহেঁচড়া করবে। সবই জানি। আমাদের ফল্‌স উপায় নেই।' শাম্বদা কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'যে মিথ্যে বলবে, সে-ই ঠকবে। এই খেলায় কে ভাল পারল, তা তো আর জাজ করা হবে না। জাজ করা হবে কে পারল না।' আমি বললাম, 'আরে এর মধ্যে হেনস্তা করার কী দেখছ! আমরা তো আর কাজের এক্সসেলেন্স দেখব না। আমরা দেখব স্পিরিট। পারি না, তবু বুক ফুলিয়ে, সাহস করে করবার চেষ্টা করলাম। এটাই তো ফেস্টিভ্যালের স্পিরিট। যার স্পিরিট যত ভাল হবে, সে-ই জিতবে। ইটস্ জাস্ট ফান।'

সবাই হইহই করে উঠল। আমি চুপ করে রইলাম। শাম্বদা বাড়াবাড়ি করছে। বেশি পাকা। মজার খেলা খেলতে গিয়ে একটা গোলমাল না হয়ে যায়। মনে হচ্ছে হয়ে যাবে।

পুজোর সময় আমাদের এখানে এমনিতেই নানান ধরনের গোলমাল হয়। কাশফুল, শরতের মেঘ দেখলে সবাই বুঝতে পারে পুজোর আর দেরি নেই। মন আনন্দে নেচে ওঠে। আমরা যারা 'সুখে আছি' হাউজিং-এ থাকি, তাদের মন আনন্দে নেচে ওঠে জি-ব্লকের অবনী মেসোমশাইয়ের সঙ্গে এ-ব্লকের পরিতোষকাকুর মুখ দেখাদেখি বন্ধ হলে বুঝতে পারি, উৎসব শুরু হয়ে গেছে। পুজো ইজ নকিং অ্যাট দ্য ডোর।

অবনী মেসোমশাই আর পরিতোষকাকুর ঝগড়া এবার কঠিন পর্যায়ে পৌঁছেছে। সামনাসামনি দেখা হলে তারা মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে। শুধু মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে না, নাক দিয়ে 'ফুঃ' ধরনের অবজ্ঞাসূচক আওয়াজও করছে। ঝগড়ার কারণ অতি গুরুত্বপূর্ণ। পুজোর ক'দিন হাউজিং-এর খাওয়া-দাওয়ার মেনু। সপ্তমীর দিন ছেঁচড়া, না নবমীতে আলু-পটলের তরকারি? শুনেছি অবনী মেসোমশাই এবার দু'দিনেই ছেঁচড়ার পক্ষে। পরিতোষকাকু চাইছেন ছেঁচড়া একদিন অফ করে দেওয়া হোক। আলু-পটলের সঙ্গে ছেঁচড়া যায় না। অবনী মেসোমশাই বলেছেন, 'এ তো ফাইভস্টারের ডিশ নয়, পুজোর সময় হাউজিং-এর সবাই মিলে একসঙ্গে বসে হইচই করে খাওয়া। এখানে অত যাওয়া-আসা দেখলে চলে না।' ব্যস। এর পরেই দু'জনের কথা স্টপ। তবে বিচলিত হওয়ার কিছু নেই। ষষ্ঠীর আগে ঝগড়া মিটে যাবে। গত বারো বছর ধরে মেনু নিয়ে এই কাণ্ড চলছে।

আমাদের পুজোয় মজা খুব বেশি। এত বেশি যে পুজোর ক'টা দিন হাউজিং ছেড়ে আমাদের কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না। সেই স্কুলের সময় থেকেই এরকম চলছে। এখন বড় হয়েছি। কলেজে পড়ছি। উৎসাহ কমা তো দূরের কথা, উলটে বাড়ছে। মেয়ে বলে অন্য সময় মা রাত পর্যন্ত বাইরে থাকতে দেয় না। সন্ধে হলেই মোবাইলে জ্বালাতন শুরু হয়ে যায়। 'কোথায় আছিস?', 'কখন ফিরবি?', 'বাবা কিন্তু রাগ করবে'। পুজোয় নো ডাকাডাকি। রাত পর্যন্ত প্যান্ডেলে বসে থাকলেও কেউ কিছু বলে না। এগারোটার সময় ঝালমুড়ি বা এগরোল নিয়ে আমরা নতুন করে গল্প শুরু করি। হাসতে হাসতে ডেকরেটরের নড়বড়ে চেয়ার থেকে ঘাসের ওপর পড়ে যাই। মনে হয় রাত এগারোটা নয়, মোটে সন্ধে ছ'টা বাজে।

যারা সারা বছর বাইরে পড়াশোনা করে বা চাকরি করছে, তারাও এই ক'দিন হাউজিং-এ ফিরে আসে। যারা ছুটিতে বেড়াতে যায়, তারা ট্রেনের টিকিট কাটে দশমীর পর। ঠাকুর ভাসান হয়ে গেলে সুটকেস গোছাতে বসে। যদি কেউ আগে যায়, তা হলে রওনা দেওয়ার সময় এমন মুখ করে থাকে, যেন বিরাট শাস্তি পেয়েছে। ট্রেনে চেপে কুলুমানালি বা মুসৌরি বেড়াতে যাচ্ছে না, যাচ্ছে দ্বীপান্তরে। প্যান্ডেলের দিকে তাকিয়ে ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

আসল কথা হল, আমাদের 'সুখে আছি' হাউসিং-এ পুজোর হাসি, হইচই, হুল্লোড়ের সঙ্গে সবসময়েই খানিকটা ঝগড়া, কিছুটা হিংসুটেপনা, বেশি মাত্রায় পরনিন্দা-পরচর্চা এবং সর্বোপরি দু'-একটা নির্দোষ ষড়যন্ত্র মিলেমিশে থাকে। ফলে উৎসব আরও ইন্টারেস্টিং হয়।

শারদীয় পরনিন্দা-পরচর্চা পর্বটি আমাদের হাউজিং-এ অতি উত্তেজনাময় একটা ঘটনা। ঘটনা খুব গোপনে ঘটলেও কীভাবে যেন সকলেই সব জেনে যায়! হাউজিং-এর মাসিমা, কাকিমা, পিসিমারা এই সময়টা এক্সটেনসিভ পরিশ্রম করেন। ই-ব্লকের মৈত্রেয়ী মাসিমা দুপুর হলেই তিনতলায় তপতী কাকিমার ফ্ল্যাটে ছুটছেন। সেখানে খানিকক্ষণ কাটিয়েই তাঁকে চলে যেতে হচ্ছে ডি-ব্লকের ইরা পিসিমার কাছে। 'কিছুতেই বলব না' বলেও আগের আলোচনা সব ফাঁস করে তিনি সোজা চলে যান সি-ব্লকে। কারণ, চান্দ্রেয়ী বউদি ডেকে পাঠিয়েছেন— 'মৈত্রেয়ী, তাড়াতাড়ি চলে এসো। খবর আছে।' কী খবর? দোতলার তন্দ্রা বউদি নাকি পুজোর ক'টা দিন ফরসা হবে বলে গাজর আর আপেল সেদ্ধ মুখে মেখে গোটা

সকালটা সূর্যের দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। রান্না-টান্না পুড়ে কেলেঙ্কারি। প্রতিবাদে তন্দ্রা বউদির শাশুড়ি অনশন শুরু করেছেন। পুত্রবধূকে বলেছেন, 'বউমা, তুমি গাজর এবং আপেল খাও। আমার আজ নো মিল।' এ ছাড়াও কে বেশি শাড়ি কিনে ডাঁট দেখাচ্ছে, কে পিছিয়ে পড়েছে, তাঁতের ব্লক প্রিন্টে কাকে পেতনির মতো লাগবে, তসরে অ্যাপ্লিক লাগিয়ে কে রাম ঠকান ঠকেছে, চুড়িদারের সঙ্গে আনারকলি কাট কামিজ কিনে কোন দুই মেয়ের মা খুকি সাজবার চেষ্টা করছে— এসব হট টপিক তো আছেই।

আমার মা একজন খুবই ভালমানুষ টাইপ মহিলা। তিনি এসবের মধ্যে থাকেন না। খবর পেলাম, এবার প্রাকপুজো পরচর্চাপর্বে তিনি নাকি 'সুখে আছি' হাউজিং-এ সবার আগে রয়েছেন। তাঁকে বিভিন্ন ফ্ল্যাট থেকে ঘনঘন ডেকে পাঠানো হচ্ছে। মোবাইলে দীর্ঘ সময় ফিসফিসানি চলছে। বুঝতে পারছি, এ বছর আমার মা কোনও মজাই ছাড়তে রাজি নয়।

এবার দু'-একটা হিংসুটেপনার উদাহরণ দিই।

জি-ব্লকের রঞ্জনা শুনলাম, দু'দিন আগে ই-ব্লকের আরিত্রিকাকে একটা এস এম এস পাঠিয়েছে। বয়ান এরকম— 'তোমার মন যে এত ছোট আমি কল্পনাও করতে পারিনি আরিত্রিকা। সামান্য জুতোর হিল নিয়ে তুমি এত কাণ্ড করলে! তোমাকে সেদিন আমি গল্প করে বললাম, হাই হিলের একটা চমৎকার জুতোর খোঁজ পেয়েছি। একেবারে এক্সক্লিউসিভ। ভাবছি কিনে নেব। নবমীর রাতে আমার ফ্লোরাল প্রিন্টের কুর্তিটার সঙ্গে পরব। তুমি ভালমানুষের মতো মুখ করে বললে, ভেরি গুড, কিনে নাও। অথচ খবর পেলাম, গতকাল তুমি ঠিক ওই দোকানে গিয়ে জুতোটা কিনে নিয়েছ। ছি ছি।'

হিল বিষয়ক হিংসের পর আসি আলো বিষয়ক হিংসুটেপনায়।

কাল দেখি শৌভিক মুখ শুকিয়ে। জিজ্ঞেস করতে বলল, দেবাঞ্জন তাকে থ্রেট করেছে। থ্রেট! কেন? গতবার শৌভিক সপ্তমীর সান্ধ্য গানের আসরে স্টেজে আলো ফেলছিল। বালিকাদের কোরাসের সময় সে নাকি ইচ্ছে করে দেবাঞ্জনের বোনের বদলে আলো ফেলেছিল নিজের বোনের মুখে। এবার যদি একই ঘটনা ঘটে, তা হলে গানের পর শৌভিকের বিপদ আছে বলেছে। সপ্তমীর রাতেই তার বিসর্জনের ব্যবস্থা হবে। সত্যি কথা বলতে কী, 'সুখে আছি' হাউজিং-এর সব থেকে বেশি গোলমাল হয় ফাংশন নিয়ে। এবারও হয়েছে। আগে একটা নাটক হত, গোলমালের কারণে এবার হচ্ছে তিনটে। কমিউনিটি হলে তিন দফায় তিন মাস ধরে অডিশনপর্বে অ্যাক্টর সিলেকশন হয়েছে। বাছাই নিয়ে ব্যাপক ক্ষোভ। স্বজনপোষণের অভিযোগ। বিক্ষোভ সামাল দিতে নাটকের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। তাতেও বিক্ষোভ সামলানো যায়নি। গান, আবৃত্তি, নাচেও একই গোলমাল। জি-ব্লকের মঞ্জু মাসিমা প্রতিবাদে আলাদা করে গীতিনাট্যের ব্যবস্থা করেছেন। প্যারালাল প্রোগ্রাম। রবীন্দ্রসংগীত-নজরুলগীতি-অতুলপ্রসাদের গান পাঞ্চ করে হিন্দি সিনেমার নৃত্য সহযোগে একটা জগাখিচুড়ি ব্যাপার। ফাংশন থেকে বাদ পড়া ছোট-বড়রা এতে যোগ দিয়েছে। পুজো কমিটি এই প্রতিবাদী গীতিনাট্য এখনও অনুমোদন করেনি। মঞ্জুমাসিমা জানিয়েছেন, অ্যালাও না করলে বয়ে গেল। অষ্টমীর সন্ধেবেলা তিনি দলবল নিয়ে স্টেজে উঠবেন এবং নাচ শুরু করবেন। নাচ কে থামায় তিনি দেখতে চান। সেরকম হলে পুলিশে কমপ্লেন

করবেন। ভয়াবহ টেনশনের ব্যাপার। টেনশন বাড়ছে, পুজোর মজাও বাড়ছে। মনে হচ্ছে, ইস, গতবার কেন এমন টেনশনের ঘটনা ঘটেনি?

তবে আমাদের মূল ঝগড়া শুরু হয় কমিটি তৈরির সময়। মূল পুজো কমিটি ঠিক থাকলেও সাব-কমিটি নিয়ে বিরাট গোলযোগ লেগে যায়। চাঁদা, হিসেবনিকেশ, প্রতিমা, আলো, ফাংশন, ভাসান, খাওয়া-দাওয়া— সবকিছুরই আলাদা আলাদা সাব-কমিটি রয়েছে। হাউজিং-এর সবাই একটা না একটা কমিটিতে ঢুকতে চায়। জোর পলিটিক্স চলে। পাবলিক ডিমান্ডে সাব-কমিটির সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়ছে। এ বছর যেমন নতুন দুটো হয়েছে। মাইকে গান বাজানোর সাব-কমিটি আর প্রসাদ বিতরণ সাব-কমিটি। আমরা কমবয়সিরা এবার আরও একটা কমিটি বানিয়েছি। ফান সাব-কমিটি। ফান কমিটি প্ল্যান-প্রোগ্রাম করছে, পুজোর তিনদিন হাউজিং বাসিন্দারা কী কী মজার খেলায় মাতবে। পরিকল্পনা শুনে কমিটির বয়স্করা প্রথম ভুরু কুঁচকেছিল। আমরা তাদের বুঝিয়েছি, ফান ছাড়া ফেস্টিভাল হয় না। ফানের মধ্যে রয়েছে ষষ্ঠীর রাতে ফ্যাশন শো। সেই শো-তে 'মিস সুখে আছি' এবং 'মিস্টার সুখে আছি' সিলেক্ট করা হবে। সপ্তমীর বিকেলে মিউজিক্যাল চেয়ার। অষ্টমীর সন্ধেতে গো অ্যাজ ইউ লাইক। শুধু নবমীর দিনটা বাকি। সাব-কমিটি মিটিং-এ বসেছে। কমিটিতে আমি যেমন আছি, তেমন শাম্বদা রয়েছে। শাম্বদা সেক্রেটারি। শাম্বদার কমিটিতে থাকার ব্যাপারে আমার আপত্তি আছে। কারণটা গোপন। গোপন কারণ শুনে অনেকে মনে করতে পারে শাম্বদা ছেলে খারাপ। না, শাম্বদা ছেলে খারাপ নয়। বরং ছেলে অতিরিক্ত ভাল। শিবপুরে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে। গায়ের রং কালোর দিকে হলেও দেখতে হ্যান্ডসাম। গানের গলা সুন্দর। গিটার হাতে বব ডিলান, পিট সিগার, জন ডেনভারের গান ধরলে মুগ্ধ না-হয়ে উপায় থাকে না। তবে আজকাল কায়দা করে নিজে গান লিখে সুর বসাচ্ছে। সেগুলো অবশ্য অতি অখাদ্য। সে হোক, সবার সবকিছু ভাল হয় না। তবে আমার আপত্তি অন্য কারণে। শাম্বদা গত বছর পুজোর সময় আমাকে...। থাক, গোপন জিনিস গোপন থাকাই ভাল। আমি তাকে জানিয়ে দিয়েছিলাম, 'আমার দ্বারা এসব হবে না। আমি এসব পারি না।' এই কারণেই ওই ছেলের সঙ্গে আমার কমিটিতে থাকতে আপত্তি। তবু সবাই যখন বলল থাকতে হবে, আমি মুখে কিছু বলিনি। একটা কিছু হলেই চোখ বড় বড় করে গুজগুজ ফুসফুস শুরু করে দেবে। আমিও করি। কিন্তু শাম্বদার সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে কোনও কানাঘুষো হোক, তা আমি চাই না। সেইজন্য চুপ করে মেনে নিয়েছি।

নবমীর রাতের নতুন মজার পরিকল্পনাও মেনে নিলাম। তবে আমার স্থির বিশ্বাস, আমরা একটা বড় বিপদের মধ্যে পড়তে চলেছি। 'সুখে আছি' হাউজিং-এর বাসিন্দারা 'যা পারে না' তা নিয়ে কেরামতি দেখাতে গিয়ে বিরাট প্রেস্টিজের মধ্যে পড়বে। হাজার ঝগড়া, হিংসুটেপনা, পরচর্চায় পুজোর যে আনন্দ কখনও নষ্ট হয়নি, এবার হবে। সবথেকে বড় কথা, এই খেলায় কেউ যোগ দেবে না। উৎসবের দিন ফেল করতে কে চায়?

...যা বাব্বা! নবমী এবার সবথেকে আনন্দের হয়েছে। শাম্বদার নতুন খেলায় কম্পিটিটরের সংখ্যা একশো ছাড়িয়ে গিয়েছিল। প্যান্ডেলের মাঠে জায়গা করে রিয়ালিটি শো চলেছে দুপুর থেকে সন্ধে পর্যন্ত। শম্ভু কাকুর নাচ, শুভশ্রীর হাই জাম্প, লীলাবতীদির

আবৃত্তি, শ্যামল মেসোর কীর্তন, অর্কপ্রভদার সুচে সুতো পরানো, প্রান্তিকের তবলা, সৌরভবাবুর শাড়ি ভাঁজ, অমিয়দার অমলেট রান্না, বিদিশা মাসির নাট-বল্টু লাগানো— একেবারে হইহই ফেলে দিল। সবাই এত হেসেছে যে যে হাউজিং-এর বাইরে পর্যন্ত ভিড় জমে গেল। তারা অবাক হয়ে পাঁচিলের ওপর দিয়ে উঁকি মারতে লাগল। এত ফুর্তি!

যদিও আমি ছিলাম দূরে দূরে। প্ল্যান ছিল গোলমাল লাগলেই কেটে পড়ব। শাম্বদার পাকামির জন্য আমি কেন বড়দের গালি খাব? খেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পর সবাই দেখলাম ওই ছেলেকে খুব বাহবা দিচ্ছে। অনেকে পিঠ চাপড়েও দিল। পুজো কমিটির সেক্রেটারি ওর হাত ধরে বলল, 'আগামী পুজোতে আরেকটা নতুন আইডিয়া চাই কিন্তু শাম্ব। আরও মজার কিছু। তোমার জন্য বেশি করে টাইম রাখব।' শাম্বদার দেখি গর্বে বুক ফুলে উঠেছে। ওর সঙ্গে চোখে চোখ পড়তে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। যেন কিছুই দেখিনি।

দশমীর দিন আমি একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড করে বসলাম। আমি যা পারি না, সেই কাণ্ড। 'শাম্ব' নামের পাকা ছেলেটাকে লুকিয়ে একটি চিঠি দিয়েছি। দু'লাইনের চিঠি। কিন্তু লিখেছি রাত জেগে। কী লিখেছি? লিখেছি— ইস, বলব কেন? উৎসবের সব আনন্দের কথা সবাইকে বলতে নেই। তবে আমি কখনও ভাবতে পারিনি এ কাজ আমি পারব। উৎসবের এটাই মজা। যে যা পারে না, তাকে দিয়ে সে সেই কাজও করিয়ে নেয়।

আনন্দবাজার পত্রিকা ক্রোড়পত্র, জেলা ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৯

মোবাইল

তন্দ্রা মোবাইলটা এবার ডান কান থেকে বাঁ কানে নিল। জিনিসটা এতক্ষণ ডান হাতে ধরা ছিল, এবার ধরল হাঁ হাতে। কান ও হাত বদল এই নিয়ে হল মোট সতেরো বার। তাও কথা ফুরোয়নি। চট করে ফুরোবে বলে মনেও হচ্ছে না। গভীর রাতে প্রেমিক-প্রেমিকার ভাব-ভালবাসার কথাও একসময় ফুরিয়ে যায়। ঝগড়া বোধহয় ফুরোয় না।

তন্দ্রা ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলল। রাগের নিশ্বাস। বলল, 'সুপর্ণ' তুমি কচি খোকা নও যে কথাটা বুঝতে পারবে না। আসলে ইচ্ছে করেই বুঝছ না। তোমার সঙ্গে প্রেম করাটাই আমার ভুল হয়েছিল। খুব বড় ভুল।'

সুপর্ণ বলল, 'শুধু আমি কেন, তুমিও তো বুঝতে পারছ না তন্দ্রা। সে অর্থে ভুল শুধু তোমার হয়নি, আমারও হয়েছে। যাক ভুলে ভুলে কাটাকাটি হয়ে গেল। শোনো, তুমি অমন ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলো না তো। কানে লাগে।'

তন্দ্রা ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'কানে লাগলে, তুলো দিয়ে নাও। ফোন ছাড়ছি। ইস, রাত দেড়টা বাজে।'

সুপর্ণ ও ধার থেকে 'ফুঃ' ধরনের একটা আওয়াজ করল। বলল, 'দেড়টা বাজল তো কী হল? আমেরিকায় রাত দেড়টা মানে কী জানো? রাত দেড়টা মানে হল বিকেল। প্রেম করতে যাবে বলে ছেলেমেয়েরা তখন সাজতে বসে। বুঝলে?'

তন্দ্রা দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'এটা আমেরিকা নয় সুপর্ণ। যাদবপুর বাইপাসের ধার। এখানে রাত দেড়টার সময় শেয়াল বেরোতে পারে।'

সুপর্ণ গলা নরম করে বলল, 'আহা, শেয়াল তো তোমার ঘরে ঢুকে পড়ছে না। ঠিক আছে আর পাঁচ মিনিট। ওনলি ফাইভ। প্লিজ, তন্দ্রা এসো আজই আমরা একটা ডিসিশন নিয়ে ফেলি। এই সুযোগ আর পাব না। ঠাকুমার কাছে শুনেছি, রাত বারোটার পর যে-কোনও সিদ্ধান্ত খুব মঙ্গলজনক।'

তন্দ্রার ইচ্ছে করল চিৎকার করে। অনেক কষ্টে রাগ সামলাল। ঠান্ডা গলায় বলল, 'ঠাকুমা, দিদিমা লাগবে না। সিদ্ধান্ত আমি নিয়ে ফেলেছি সুপর্ণ। আমি এখন বিয়ে করছি না। আগে তুমি কাজকর্ম পাও। বিয়ে তো পালিয়ে যাচ্ছে না।'

'উফ তুমি সেই একই ভুল করছ। আজকাল ওই কনসেপ্টটাই উঠে গেছে। ছেলেকে চাকরি-বাকরি করতে হবে এমনটা আর নেই। এক জন করলেই চলে। পাত্র অর পাত্রী। এনিবডি। তিন মাস হয়ে গেল তুমি স্কুলে জয়েন করে গেছ। তা হলে বিয়েতে অসুবিধে কোথায়? অ্যাই তন্দ্রা, শুনছ? অ্যাই শোনো না, হানিমুনের জন্য একটা জায়গা যা ভেবেছি

না, উঁহুঁ এখন বলব না। সারপ্রাইজ দেব। ঠিক করেছি, চোখ বেঁধে তোমাকে নিয়ে যাব। তারপর পৌঁছে যখন দেখবে... অ্যাই শুনছ, চুপ করে আছ কেন? কী হল?'

তন্দ্রা মোবাইল বন্ধ করে দিয়েছে। তার মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে। উফ, কী ভয়ংকর! চাকরি নেই, বিয়ে নেই, এদিকে হানিমুনের প্ল্যান হয়ে গেছে। এরপর নিশ্চয় ছেলেমেয়ের পরীক্ষার রেজাল্ট নিয়ে আলোচনা শুরু করত। না, কাল ভোরে এ ছেলেকে আরও জোর ধমক দিতে হবে। এ ছেলে জোর ধমকের ছেলে।

পাঁচ তলার ওপরে এই ফ্ল্যাটটা ছোট কিন্তু চমৎকার। তার ওপরে তন্দ্রার ঘরটা দক্ষিণমুখী। টেবিলটাকে সে রেখেছে একেবারে জানলা ঘেঁষে। সেখানে ঘন নীল রঙের টেবিল ক্লথ। নীল পেপারওয়েট। এমনকী পেনস্ট্যান্ডটা পর্যন্ত নীল। জোরে হাওয়া দিলে মনে হয়, ঘরের বদলে টেবিল চেয়ার পেতে আকাশে বসে আছে। টেবিলের ওপর মোবাইলটা রেখে তন্দ্রা চেয়ারে বসল। সামনে এক গাদা খাতা। কাল দুপুরে স্কুলে যাওয়ার আগে এগুলো দেখতে হবে। উপায় নেই। বড়দি খ্যাচখ্যাচ করবে। অন্য টিচাররা যদিও পাত্তা দেয় না, বকাঝকার মাঝখানেই তারা জিরে-হলুদ বাটা আর ছেলের প্রাইভেট টিউটর নিয়ে সিরিয়াস ধরনের আলোচনা শুরু করে দেয়। মাত্র তিন মাস চাকরিতে ঢুকে তন্দ্রার পক্ষে এটা সম্ভব নয়।

সে খাতাগুলো সামনে টেনে নিল এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমোনোর আগে মোবাইল ফোনে আঙুল ছুঁয়ে ফিসফিস করে বলল, 'পাগল ছেলে... পাগল ছেলে কোথাকার।'

রাতে কখন চেয়ার ছেড়ে উঠে বিছানায় গেছে মনে নেই তন্দ্রার। ঘুম যখন ভাঙল তখন সকালের আলোয় ঘর ভাসছে। সকালে ঘুম ভাঙলে প্রিয় কারও মুখ মনে পড়ে। তন্দ্রার মনে পড়ল বড়দির গম্ভীর মুখ। ইস, খাতা দেখা বাকি। টেবিলের দিকে তাকাল তন্দ্রা। সব অগোছালো হয়ে পড়ে আছে। ছড়ানো খাতা। খোলা পেন। সব। শুধু মোবাইলটা নেই!

তন্দ্রা ছুটে গিয়ে ঘরের দরজা খুলল। মুখ বাড়িয়ে চিৎকার করে বলল, 'মা, মা, আমার মোবাইল কোথায়? মোবাইল ফোন!'

কমলাদেবী রান্নাঘর থেকে বললেন, 'আঃ সকালে উঠেই মোবাইল মোবাইল করিস না তো। এই সাতসকালে তোর বন্ধ ঘর থেকে মোবাইল কে নেবে? ভূতে? দেখ হয়তো ভূতেই নিয়েছে।'

২

আঠাশ তলার কার্নিশে পা ঝুলিয়ে বসে আছে কানন। মা বলে, 'অমন ফটফটে আলোয় বাইরে থাকিসনি। কে দেখে ফেলবে।'

মায়ের বড্ড ভয়। বসলে কে দেখবে? বাইপাসের পাশে আকাশ ছোঁয়া এই বাড়ি তৈরির কাজ চলছে। এখনও মানুষের ঝামেলা শুরু হয়নি। মিস্ত্রি-মজুর এসে গেলে দেয়াল, সিলিং বা মেঝেতে ছায়ার মতো মিশে থাকলেই চলে।

অন্য দিন হলে এই সময়টায় কানন জোরে জোরে পা দোলাত। আজ একবারে চুপ। মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে নিজের কঙ্কাল হাতের দিকে। সেই হাতে ধরা রয়েছে ছোট্ট একটা মোবাইল ফোন! মানুষের মোবাইল ফোন।

এই জিনিস কানন আজ প্রথম দেখছে এমন না। আগেও আড়াল-আবডাল থেকে দেখেছে। লোভ হত। বড় অদ্ভুত জিনিসটা! মাথার কাছের ছোট্ট কাচটুকু যেন এক চিলতে জানলা! বাজনা বেজে, যন্ত্র চালু হলে সেই জানলায় চাপা আলো জ্বলে ওঠে। মনে হয়, জানলা খুলে কেউ ডাকছে, আয় আয়...! কানন দেখেছে, মানুষ তখন কান পেতে কথা শোনে। ফিসফিস করে কথা কয়। কাননের হিংসেও হয়েছে। আহা, মানুষের জীবন কী আনন্দের! সেই আনন্দের জীবন আর পাওয়া যাবে না, কিন্তু মজার জিনিসটা যদি একবারটির জন্য পাওয়া যেত।

পাওয়া গেছে।

প্রতিদিনের মতো কালও অনেক রাতে আকাশ পথে চক্কর মারতে বেরিয়েছিল কানন। মানুষের মর্নিং ওয়াকের মতো ভূতেদের নাইট চক্কর। তখনই চোখে পড়ে। একেবারে জানলার পাশে। নিজেকে সামলাতে পারেনি। জানলা দিয়ে সে তার লম্বা হাত বাড়িয়ে দেয়।

এখন মনে হচ্ছে, কাজটা ঠিক হয়নি। যতই হোক চুরি তো। মা জানতে পারলে রাগারাগি করবে। তবে এখনই ফেরত দিয়ে আসা যায়। জায়গা মনে আছে। ফ্ল্যাটটা পাঁচ তলায়। টেবিলে নীল কাপড় পাতা। ভেসে যেতে কতক্ষণ আর লাগবে?

রিং রিং রিং...। মোবাইল বেজে উঠল।

কানন চমকে উঠে আঁকড়ে ধরল জিনিসটা। শুধু বাজছে না, থিরথির করে কাঁপছেও! কী করবে সে? ছুড়ে ফেলে দেবে? ওই তো ছোট্ট জানলায় আলো জ্বলছে! কী মিষ্টি বাজনা! কে ফোন করছে? শুনবে? ওরে বাবা, কথা বলতে হবে নাকি? একটু বললে কী ক্ষতি? কীভাবে বলবে? পারবে কি? মানুষের সঙ্গে সে যে অনেক দিন কথা বলেনি।

এলোমেলো বোতাম হাতড়াতে যন্ত্র চালু হল নিজের খেয়ালে। কাঁপা হাতে তুলে কানে ঠেকাল কানন।

'কেমন আছ তন্দ্রা? নিশ্চয় স্কুলের খাতা নিয়ে বসে পড়েছ। এই চমৎকার সকালে কাউকে যেন গোল্লা দিয়ে বোসো না। সব দশে দশ করে দাও। কী হল কথা বলছ না কেন? যাঃ বাবা, এখনও রাগ কমেনি। তুমি দেখছি বিয়ের পর জ্বালাবে।'

কানন পারছে না। কথা গলা পর্যন্ত এসে যেন আটকে যাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ফিসফিস করে বলল, 'না, মানে আমি...।'

'ওরে বাবা, রাগের চোটে গলাটাও বদলে ফেলেছ! হা হা। নাকে কথা কিন্তু সুন্দর লাগছে তন্দ্রা। বিউটিফুল! বেশ পেতনি পেতনি লাগছে। আচ্ছা, একবার বলো তো আমি তোমাকে ভালবাসি। দেখি পেতনি গলায় কেমন শোনায়। হা হা।'

হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে কাননের। মানুষটা এসব কী বলছে! কানন ঢোঁক গিলে বলল, 'দেখুন, আপনি...।'

'ওরে বাবা, একেবারে আপনিতে চলে গেছ! ভেরি গুড। বাপ রে, বিয়ে করতে চেয়েছি বলে এত রাগ! প্লিজ তন্দ্রা, রসিকতা ছাড়ো, বিশ্বাস করো, আমি ক্রমশ অসুস্থ হয়ে পড়ছি।

রাতে ঘুমোতে পারি না। দিনে খালি ঘুম ঘুম পায়। চূড়ান্ত ডিসঅর্ডার। সকলে বলছে, এ সবের একটাই ওষুধ। বিবাহ। এই দেখো মোবাইলের ভেতর দিয়েই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি। বিয়ের মুখে একটু-আধটু গা ছুঁলে কোনও ক্ষতি নেই তন্দ্রা।'

এই মানুষটা সত্যি সত্যি গায়ে হাত দেবে নাকি! দূর, এরকম হয় না। কাননের শরীর ঝিমঝিম করে উঠল। সে বুঝতে পারছে জিনিসটা এবার ছুড়ে ফেলে দেওয়া উচিত। কিন্তু পারছে না! কত দিন যে কোনও পুরুষ তাকে ছোঁয়নি। কত দিন তা মনেও পড়ে না। সে নিজের মনে বলল, 'আমি, আমি...।'

'তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না, তন্দ্রা। বিয়ের ব্যাপারে যা করবার, সব আমি করব। লক্ষ্মীটি, তুমি শুধু একবার রাজি হয়ে যাও। আর, দয়া করে গলাটা স্বাভাবিক করো। দিনের বেলা ভূতের গলা শুনতে ভয় করছে। নাও, ফোন ছাড়ার আগে একটা চুমু দাও দেখি। আচ্ছা, আমি দিচ্ছি...।'

কাননের কান গরম হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে, তার শরীর দিয়ে তাপ বেরুচ্ছে। তার লজ্জা করছে। ভীষণ লজ্জা। কানন নিজের অজান্তেই হাত তুলে ঠোঁটে চাপা দিল।

৩

স্কুল থেকে হাফছুটি করে বাড়ি চলে এসেছে তন্দ্রা। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। কাল রাতে ঘুম হয়নি। মনও খারাপ। ফিরেই খোঁজ নিয়েছে। না, মোবাইল এখনও পাওয়া যায়নি। এত রাগ হচ্ছে, যে মনে হচ্ছে, মা ঠিকই বলেছে। ভূতেই নিয়ে গেছে। তা ছাড়া আর যাবে কোথায়? তন্দ্রা ভেবেছিল, বাড়ি ফিরে লম্বা ঘুম দেবে। এখন আর ঘুম আসছে না। শাড়ি বদলে বসবার ঘরে এল। সুপর্ণকে মোবাইল হারানোর ঘটনাটা জানানো দরকার। বেচারি নিশ্চয় অনেক বার ফোন করে বসে আছে। সে টেবিলে রাখা ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করল।

বেকার হওয়ার সুযোগে সুপর্ণ দুপুরে একটা ছোট্ট ঘুম দেয়। ফোন ধরে বিস্মিত গলায় বলল, 'তন্দ্রা! তুমি? কী হল, স্কুলে যাওনি?'

'গিয়েছিলাম। তবে শরীরটা ভাল লাগছে না বলে বাড়ি ফিরে এসেছি।'

সুপর্ণর গলায় উদ্বেগ, 'শরীর খারাপ! সে কী! কী হয়েছে? দাঁড়াও আমি এখনই একটা ট্যাক্সি ধরে চলে আসছি।'

মনের এই অবস্থার মধ্যেও তন্দ্রার হাসি পেল। বলল, 'ট্যাক্সি ধরে আসতে পারো, তবে পকেটে টাকা আছে তো? ভাড়া কিন্তু তোমাকেই দিতে হবে।'

সুপর্ণ নাটকীয় ঢঙে বলল, 'সামান্য ট্যাক্সি ভাড়ার ভয় দেখাচ্ছ তন্দ্রা? দরকার হলে একটা গোটা ট্যাক্সি কিনে চলে যেতে পারি। তুমি শুধু একবার হ্যাঁ বলো।'

'দুঃখিত, আমি হ্যাঁ বলছি না। যাক, এখন ওসব কথা ছাড়ো তো। অ্যাই জানো, আজ একটা বিচ্ছিরি কাণ্ড হয়েছে।'

'বিচ্ছিরি কাণ্ড যে হয়েছে সে সকালে তোমার সঙ্গে মোবাইলে কথা বলেই বুঝতে

পেরেছি। ভাল কাণ্ড হলে কারও গলা অমন ভূতের মতো হয় না। মনে হচ্ছিল, ঠিক যেন একটা পেতনির সঙ্গে কথা বলছি! শুধু পেতনিগলা? রাগের চোটে আপনি আজ্ঞেও করছিলে। যাক, শেষ পর্যন্ত গলা যে তোমার ঠিক হয়েছে তার জন্য ধন্যবাদ। সব ধরনের বউ মেনে নেওয়া যায় তন্দ্রা, কিন্তু পেতনিগলার বউ মেনে নেওয়া অসম্ভব। নাও, এখন তোমার বিচ্ছিরি ঘটনা বলো। দাঁড়াও আগে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিই।'

তন্দ্রা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকল। সে সুপর্ণর কথা ঠিক বুঝতে পারেনি। সকালে মোবাইলে কথা হয়েছে মানে! ছেলেটা নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছে। সে গম্ভীর গলায় বলল, 'মন মেজাজ ভাল নেই সুপর্ণ। এখন ঠাট্টা ভাল লাগছে না। আজ সকাল থেকে আমি মোবাইলটা হারিয়ে বসে আছি। তাই তো বাড়ির ল্যান্ডফোনে তোমাকে এখন ধরলাম। তুমি বলছ সকালে মোবাইলে কথা বলেছি! সকালে তোমার সঙ্গে কথার প্রশ্নই ওঠে না।'

ও পাশে সুপর্ণ যেন লাফিয়ে উঠল। বলল, 'আলবাত হয়েছে। একশো বার হয়েছে। তখন ন'টা বেজে দশ মিনিট। আমরা দু'জনে ঠিক সাত মিনিট তেরো সেকেন্ড কথা বলেছি। শুধু কথা বলিনি, কথা শেষ হয়ে গেলে আমি তোমাকে চুমু খেয়েছি। একটা নয়, পরপর দুটো চুমু খেয়েছি। প্রেমিকাকে সব নিয়ে মিথ্যে বলা যায় তন্দ্রা, চুমু নিয়ে বলা যায় না। আর একটা কথা বলব তন্দ্রা? যদি রাগ না করো তা হলে বলতে পারি। বলো, রাগ করবে না। বলো আগে। অন্য দিন নরম লাগে, আজ কিন্তু চুমু দেওয়ার সময় কেমন শক্ত শক্ত লাগল। মনে হল, ঠোঁটে নয়, হাড়ে চুমু খাচ্ছি। হা হা। সত্যি বলছি। হা হা। অ্যাই রাগ করলে? অ্যাই তন্দ্রা, রাগ কোরো না প্লিজ। বিয়ের মুখে একটু-আধটু অসভ্য কথা চলে।'

তন্দ্রা রিসিভার ধরে কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইল। তারপর হিমশীতল গলায় বলল, সুপর্ণ, মোবাইল কোম্পানিকে বলে আমার লাইনটা কেটে দেওয়ার ব্যবস্থা করো প্লিজ। আজই। এখনই।'

৪

মা বকে। বলে, 'অত সাজিসনি রে ছুঁড়ি। অত সাজিসনি। ওসবে আমাদের অমঙ্গল হয়। রং ঢং হল মানুষের জিনিস আমাদের কি মানায়?'

কানন শোনে না। সে সাজতে বসে। কঙ্কাল হাতে চুড়ি পরে। করোটি কপালে টিপ লাগায়। পাতাহীন কোটর চোখের চার পাশে হালকা কাজল টানে। তারপর মোবাইল ফোন হাতে নিয়ে আকাশ ছোঁয়া বাড়ির অনেক ওপরে গিয়ে বসে। অপেক্ষা করে, যদি আবার কখনও গান বেজে ওঠে। যদি ফের মোবাইলের এক চিলতে জানলায় জ্বলে ওঠে আলো। হয় না। কিছুই হয় না। কানন কাঁদতে ভুলে গেছে। সে শুধু মোবাইলটা গালে বোলায়। ঠোঁটে ঠেকায়।

সুপর্ণ এখনই চাকরি পাক না পাক, তন্দ্রা ঠিক করেছে বিয়েটা করে ফেলবে। আজকাল রাতে একা থাকতে তার কেমন ভয় ভয় করে।

আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয় ৩০ অক্টোবর ২০০৫

গৃহত্যাগী

দিব্যকান্তিবাবুর ইচ্ছে করছে পাশের ঘরে গিয়ে এখনই ছোকরার গালে একটা চড় লাগান। সাধারণ চড় নয়। ঠাঁটিয়ে চড়। ঠাঁটিয়ে চড়ের অনেক রকম গুণ আছে। সব থেকে বড় গুণ হল, ঠিকমতো মারতে পারলে ব্রেনে সরাসরি অ্যাকশন হয়। যে চড় খায়, সে দ্রুত বুঝতে পারে কেন মারা হল। আলাদা করে কারণ বলতে হয় না। দিব্যকান্তিবাবুর বিশ্বাস, এই ছোকরার বেলাতেও একই ঘটনা ঘটবে। চড় মারামাত্র সে চড়ের কারণ বুঝতে পারবে।

কিন্তু এই ছোকরাকে চড় মারা যাবে না। কারণ ছোকরা এ বাড়ির জামাই। শুধু জামাই নয়, একমাত্র জামাই। কয়েক বছর আগে ঢাকঢোল পিটিয়ে এ বাড়ির মেয়ে তপস্যার (ডাক নাম তপু) সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে। 'ঢাকঢোল' শুধু কথার কথা নয়, বৈদ্যবাটী থেকে সত্যি সত্যি ঢাকি আনিয়েছিলেন দিব্যকান্তি। বিষয়টি নিয়ে মেয়ের মায়ের সঙ্গে তাঁর টেনশনও হয়।

'মেয়ের বিয়ে বলে মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি তোমার? মনে হচ্ছে সেটাই হয়েছে। চিন্তা কোরো না, অনেক সময় এরকম হয়। একমাত্র মেয়ের বিয়ে হলে, মেয়ের বাবার মাথা গরম হয়ে যায়। এই সময়টায় বেশি করে ঠান্ডা খাওয়া দরকার। আজ থেকেই শুরু করে দাও। দাঁড়াও নমিতার মাকে বেলের শরবত দিতে বলছি।'

দিব্যকান্তিবাবু স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে থাকেন। বলেন, 'আমার মাথা খারাপ হয়েছে এমন খবর তোমায় কে দিল জয়া?'

'কে আবার দেবে? আমি নিজেই বুঝতে পারছি। পাগল না হলে কেউ বিয়েবাড়িতে ঢাক বাজানোর কথা ভাবে? তুমিই বলো না, ভাবে কেউ?'

দিব্যকান্তি বললেন, 'কেন? ভাবে না কেন? অসুবিধে তো কিছু নেই। শাস্ত্রে বারণ আছে নাকি?'

জয়াদেবী রাগী গলায় বললেন, 'বাজে কথা বোলো না। বিয়েবাড়িতে মাইক বাজে, সানাই বাজে। রাতের দিকে বাসরে ছেলেমেয়েরা গানবাজনাও করে। তা বলে ঢাক! তপু যদি শোনে কী কাণ্ড করবে ভেবেছ একবার? বিয়ে ফেলে বাড়ি ছেড়ে পালাবে। আজকালকার দিনের ছেলেমেয়েদের চেনো না তো। মেয়েকে ডেকে কথাটা একবার বলে দেখো না।'

ডাকতে হল না। তপু নিজেই ঘরে ঢুকল। ঢাকের কথা শুনে হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠল ছেলেমানুষের মতো। 'দারুণ হবে বাবা। ফ্যান্টাস্টিক! ইউনিক আইডিয়া। আমি তো ঠিক করেছিলাম, বিয়েতে কিছুতেই সানাই বাজাতে দেব না। সানাই শুনলেই আমার কান্না পায়। বুনির দিদির বিয়েতে কী বিচ্ছিরি কাণ্ডটাই হল। খেতে বসে খানিকটা ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে

কাঁদলাম। মেকআপ, টেকআপ থেবড়ে একাকার কাণ্ড। বিয়ের মতো আনন্দের একটা দিনে কান্নাকাটির কোনও মানে আছে?'

দিব্যকান্তি জয়াদেবীর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। বিজয়ীর হাসি। তারপর এগিয়ে এসে মেয়ের কাঁধে একটা হাত রাখলেন। স্নেহের গলায় বললেন, 'না কাঁদবি না। হাসবি। হাসতে হাসতে বিয়ে করবি। তিনজন ঢাকি আসছে রে মা। তিনটে শিফটে বাজাবে। সকাল, বিকেল, সন্ধে। এদের মধ্যে একজনের নাম মহেশ্বর। শুনেছি মহেশ্বর একজন ওস্তাদ বাজিয়ে। সে নাকি এক কাঠিতে বাজায়। ঝড়ের মতো হাত চলে। কাঠি দেখা যায় না, শুধু বাজনা শোনা যায়। ভেবেছি, বর আসার সময় মহেশ্বরকেই বাজাতে বলব। তোর শ্বশুরবাড়ির লোকেদের তাক লেগে যাবে।'

বিয়ের মুখে মুখে 'বর' এবং 'শ্বশুরবাড়ি' শুনলে যে-কোনও মেয়েই লজ্জা পায়। তপুও পেল। তার ফরসা গাল দুটো লাল হয়ে গেল। গাল লাল হল জয়াদেবীরও। তবে লজ্জায় নয়, রাগে। তিনি বললেন, 'তিনজন! তিনজন মিলে বাড়িতে ঢুকে ঢাক পেটাবে? আমি নেই। আমি এই বিয়েতে নেই। তোমরা বাপ-মেয়েতে যা খুশি করো। ঢাক বাজাও, ধুনুচি নৃত্য করো, যা খুশি। কালই আমি সুটকেস গুছিয়ে দাদার ওখানে চলে যাব। বাবা-মা নেই বলে তোমরা ভেবো না বাপের বাড়িতে আমার কোনও যাওয়ার জায়গা নেই। তুমি আজই অফিসে গিয়ে পাটনার টিকিট কেটে দিতে বলবে।'

মেয়ের বিয়ের আগে বাড়ির গিন্নিকে রাগানো একটা ঝুঁকির কাজ। এত বড় ঝুঁকি নেওয়া যায় না। দিব্যকান্তিবাবুও সেই ঝুঁকি নিতে পারলেন না। তিনি ঢাকির সংখ্যা তিন থেকে কমিয়ে একে নিয়ে এলেন। সেই লোককেও বাড়াবাড়ি কিছু করতে দেওয়া হয়নি। সে প্যান্ডেলের মুখে দাঁড়িয়ে হালকা কাঠি মেরেছে মাত্র। বলাই ছিল, আওয়াজ যেন দোতলা পর্যন্ত না যায়। সেখানে জয়াদেবী ছিলেন। তিনি ঢাকের প্রতিবাদে একতলায় নামেননি। দোতলাতেই অতিথিদের 'আসুন, বসুন' করেছেন।

তবে আস্তে হলেও ঢাক তো বেজেছে। সেই ঢাক বাজানো জামাইকে চড় মারা যায়? যতই হাত নিশপিশ করুক, মারা যায় না।

দিব্যকান্তি নিজেকে শান্ত করবার চেষ্টা করলেন। আড়চোখে তাকালেন পাশের ঘরে। ঘরে আলো জ্বলছে। ভেতর থেকে নানারকম আওয়াজ ভেসে আসছে। মানুষের কথা, গাড়ির শব্দ, এমনকী গানবাজনাও! দিব্যকান্তির ভুরু কুঁচকে গেল। টিভি চলছে? পরদার ফাঁক দিয়ে ইডিয়টটাকেও দেখা যাচ্ছে। সাদা পাজামা পাঞ্জাবি পরে বসে আছে চেয়ারে। পাঞ্জাবির রং হালকা গেরুয়া, কাপড় নরম। তবে পাজামা পাঞ্জাবির একটাও তার নিজের নয়। কী করে হবে? সে তো এসেছে একবস্ত্রে। দুটোই দিব্যকান্তিবাবুর। জয়া আলমারি থেকে বের করে দিয়েছে। পাজামা মাপে মোটামুটি হলেও, পাঞ্জাবিটা একটু ঢলঢল করছে। আরে! গাধাটা হাসছে না? হ্যাঁ, হাসছে। হাসির সঙ্গে পা-ও নাড়াচ্ছে। দিব্যকান্তিবাবুর এবার মনে হল, শ্বশুরমশাইয়ের পাজামা-পাঞ্জাবি পরে পা দুলিয়ে দুলিয়ে যে গাধা হাসতে পারে তাকে একটা না, একসঙ্গে দুটো চড় মারা উচিত। তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

জয়াদেবী ঘরে ঢুকলেন। হাতে বই। বইয়ের মলাটে একটা ফুলকপি আর দুটো বড়

গাজরের ছবি। ওপরে লেখা— 'মাছ, মাংস, বিরিয়ানি।' রান্নার বইগুলোতে অনেক সময়েই এই সমস্যা হয়। বিষয়ের সঙ্গে মলাটের কোনও মিল থাকে না। বিষয় একরকম, তো ছবি অন্যরকম। জয়াদেবীর কাছে 'নিঃশব্দে নিরামিষ' নামে একটা বই আছে। তার মলাটে ভাবুক ধরনের একটা বড় গলদা চিংড়ি বসে আছে শুঁড় বাগিয়ে।

জয়াদেবী স্বামীর উলটোদিকের সোফায় বসে পড়লেন। মুখের সামনে রান্নার বই তুলে বললেন, 'আজ রাতে চিকেন কোপ্তা করলে কেমন হয় বলো তো? এমনি কোপ্তা নয়, জিঞ্জার কোপ্তা। সঙ্গে গরম খিচুড়ি। ভুনি খিচুড়ি। জিঞ্জার কোপ্তা দেখছি করা খুবই সহজ। প্রথমে চিকেনটাকে বলের মতো করে কাটতে হবে। তারপর আদার রসে ডুবিয়ে রাখতে হবে আধ ঘণ্টা। তারপর...।'

দিব্যকান্তিবাবু মুখ নামিয়ে নিলেন। এই আর এক বিপদ। বাড়িতে জামাই এলে, জয়াদেবী রান্নাঘরে যাবেন। রান্নার লোককে সরিয়ে নিজের হাতে রান্না করবেন। বেশি নয়, একটা-দুটো শৌখিন প্রিপারেশন। নিজের রান্না জামাইকে খাওয়াতে না পারলে তাঁর নাকি মন ভরে না। বিপদ হল, জয়াদেবীর রান্নার হাতে সমস্যা আছে। বিচ্ছিরি সমস্যা। নুন ঝালের মেজারমেন্টে গোলমাল হয়ে যায়। এমনকী সময় সম্পর্কেও তাঁর ধারণা দুর্বল। তেল কই এবং মাটনকোরমা যে আলাদা আলাদা সময় ধরে আগুন চায়, এই হিসেব আজও রপ্ত হয়নি। ফলে মাঝে মধ্যেই রান্না, হয় সামান্য কাঁচা থাকে, নয় পুড়ে যায়। জয়াদেবী অবশ্য এতে বিচলিত নন। বাড়িতে জামাই এলে তিনি বই খুলে বসে পড়েন। বিপদের কথা হল, সেই জিনিস শুধু একা জামাই নয়, দিব্যকান্তিবাবুকেও খেতে হয়। গত তিন দিন ধরেই হচ্ছে।

'কী গো, বললে না প্রিপারেশনটা কেমন হবে?'

খানিকটা গদগদ ভঙ্গিতেই জয়াদেবী স্বামীর কাছে জানতে চান।

দিব্যকান্তিবাবু মুখ তোলেন। তাঁর মুখ থমথম করছে। কঠিন চোখে তাকান স্ত্রীর দিকে। বলেন, 'ওই গাধাটা আর কতদিন এখানে থাকবে বলে তোমার মনে হচ্ছে?'

'গাধা! গাধা কে? কার কথা বলছ তুমি? পলাশ?' জয়াদেবী অবাক গলায় জানতে চান।

'তা ছাড়া বাড়িতে এই মুহূর্তে আর ক'টা গাধা আছে বলে তোমার মনে হচ্ছে জয়া? ওটা তিনদিন ধরে শ্বশুরবাড়িতে বসে কী করছে?'

জয়াদেবী ফিসফিস করে ওঠেন, 'অ্যাই, আস্তে বলো। কী হচ্ছেটা কী? পলাশ শুনতে পাবে না?'

পরদার ওপাশ থেকে হাসির আওয়াজ ভেসে এল। দিব্যকান্তিবাবু একবার মুখ ঘুরিয়ে সে দিকে তাকালেন, তারপর দাঁত কিড়মিড় ধরনের আওয়াজ করে বললেন, 'ওই ছেলে হাসছে কেন? হাসি-মশকরার মতো কোনও ঘটনা ঘটেছে কি? শ্বশুরবাড়িতে বসে খাওয়াদাওয়া, ঘুমের মধ্যে হাসির কিছু আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

জয়াদেবী মুখের সামনে থেকে বই সরালেন। এক গাল হাসলেন। ভাবটা এমন যে শ্বশুরবাড়িতে শুয়ে বসে খাওয়াটা একটা আনন্দের বিষয়।

'ওমা, হাসবে না তো কী করবে? কাঁদবে? কী যে বলো তুমি!'

এবার গলা আরও নিচু করলেন। বললেন, 'জামাই তোমার হাসির সিনেমা দেখছে। কমেডি ছবি। বিকেলে বলল, মা, সিনেমা দেখব। আমি বললাম, দেখো না। অসুবিধে তো কিছু নেই। ডিভিডি চালিয়ে সিনেমা দেখো। জামাই বলল, কী সিনেমা দেখব মা? আমি বললাম, হাসির কোনও ছবি দেখো। আমি বরং তোমাকে ক'টা লুচি ভেজে দিই। গরম লুচি খেতে খেতে হাসির ছবি ভাল লাগবে। লুচি কী দিয়ে খাবে? আলু ভাজা না আলুর দম? জামাই বলল, না মা, আলু খাব না। আলুতে ফ্যাট হবে। মা, আপনি ক'টা পটল ভেজে দিন। বেশি করে তেল দিয়ে ডুমো ডুমো করে ভাজবেন। আমি পড়লাম মহা ফাঁপরে। বাড়িতে পটল নেই। নমিতার মাকে বললাম, ছি ছি, কী কাণ্ড, জামাইমানুষ মুখ ফুটে পটল খেতে চেয়েছে, তুই আগে বাজারে যা। ঠিক করেছি, আর কিছু না রাখি, ঘরে সব সময় পটল রাখব।'

আর সহ্য করা যাচ্ছে না। তীক্ষ্ণ স্বরে স্ত্রীকে ধমকে উঠলেন দিব্যকান্তি, 'স্টপ, স্টপ। চুপ করো। চুপ করো বলছি।'

জয়াদেবী ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'ইস, পলাশ নিশ্চয় শুনতে পেল। বলছি না আস্তে বলো।'

দিব্যকান্তি গলার ভল্যুম এক রেখে একই সঙ্গে নাক এবং মুখ দিয়ে 'ফোঁস' জাতীয় একটা শব্দ করতে গেলেন। রাগের শব্দ। শব্দ বের হল না। এতে রাগ আরও বেড়ে গেল।

'শুনতে পেলে কী হবে? কিছুই হবে না। চলে যাবে ভেবেছ? যাবে না। অপমানিত হওয়ার জন্যে আলাদা মেটেরিয়াল লাগে। তোমার জামাই সেই মেটেরিয়াল নয় জয়া। গোড়া থেকেই আমার সন্দেহ ছিল, এখন আমি নিশ্চিত। সেন্ট পারসেন্ট শিয়োর। বুঝতে পারছি, এটি একটি নির্লজ্জ জিনিস। দুটো কানই কাটা। ভাবছি একবার ডেকে কানগুলো দেখতে চাইব। কেমন হবে বলো তো?

'উফ, চুপ করবে? চুপ করবে তুমি? নিজের জামাই সম্পর্কে কী এসব ছাইভস্ম বলছ! তপু যদি শোনে?' জয়াদেবী ভয়ে ভয়ে বললেন।

'চুপ করব? কেন, চুপ করব কেন? একটা ধেড়ে ছেলে নিজের কাজকর্ম ফেলে, বাড়িঘর ফেলে, বউ ফেলে, বাবা-মাকে ফেলে শ্বশুরবাড়িতে বসে পা দোলাচ্ছে আর লুচি-পটলভাজা খেতে খেতে হাসির সিনেমা দেখছে, আর আমি চুপ করব? তাও যদি একটা প্রপার কারণ থাকত।'

ইস, শুনতে পাচ্ছে নাকি? জয়াদেবী মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন। এখন আর পলাশের মুখ দেখা যাচ্ছে না। মনে হয় চেয়ারে হেলান দিয়েছে। পরদার আড়াল থেকে এখন শুধু তার পা দুটো দেখা যাচ্ছে। দুটো পা সামনে ছড়ানো। নিশ্চিন্ত এবং আরাম করে বসলে যেমন হয়। পায়ে হাওয়াই চটি। চটি দুটো পায়ের তুলনায় বেশ ছোট। তবে জিনিস খুবই ভাল। সাধারণ হাওয়াই নয়। স্ট্র্যাপে পাতার কাজ করা। হঠাৎ দেখলে মনে হবে পাতার চটি। অবশ্য চটি জামাইয়ের নয়। চটি তার বউ তপুর। তপু বাপের বাড়িতে এলে পরে। এখন পলাশ পরছে। কী করবে বেচারি? সে তো আর সঙ্গে করে ঘরে পরার চটি নিয়ে আসেনি। রাগ করে গৃহত্যাগের সময় কেউ সঙ্গে হাওয়াই চটি নিয়ে বের হয় না।

জয়াদেবী বিরক্ত ভঙ্গিতে স্বামীকে বললেন, 'তুমি জানো না ছেলেটা কেন এখানে আছে? নাকি জেনেও না জানার ভান করছ?'

দিব্যকান্তি দাঁতে দাঁত চেপে হিসহিসিয়ে উঠলেন, 'জানি, অবশ্যই জানি। আর জানি বলেই মাথায় আগুন জ্বলছে। ফাজলামো হচ্ছে? ন্যাকামি? তোমার জামাই কি ছেলেমানুষ? কচি খোকা সে?'

জয়াদেবী কোলের ওপর রাখা রান্নার বইয়ের পাতা উলটোতে উলটোতে বললেন, 'আহা, রাগ করছ কেন? দু'দিনের মধ্যে সব ঠিক হয়ে যাবে। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া। দুধে আমে মিশে যেতে কতক্ষণ?'

'তিনদিন তো হয়েই গেল।'

'দু'দিন মানে কি আর দু'দিন? তোমার আবার সবটাতে বেশি বেশি। তবে তুমি যাই বলো, আমি ওকে সাপোর্ট করেছি। বলেছি, ঠিক করেছ বাবা। বেশ করেছ। স্ত্রীকে মাঝেমধ্যে শিক্ষা দিতে হয়। এমনিতেই তারা মাথায় উঠে বসে থাকে। মাঝেমধ্যে শিক্ষা না পেলে তখন আর শুধু বসে থাকবে না, উঠে দাঁড়িয়ে নাচতেও শুরু করে। তুমি তপুকে শিক্ষা দিয়ে ভাল কাজ করেছ।'

দিব্যকান্তি নাকমুখ কুঁচকে বললেন, 'আমি জানি, আমি জানি তুমি ওই গাধাটাকে সাপোর্ট করছ। ছি ছি, লোককে বলা যাচ্ছে না জামাই এসেছে। ওটাকে ঘরের বাইরে বেরোতে বারণ করে দেবে।'

'কেন? বারণ করব কেন? পলাশ চোর-ডাকাত নাকি?' জয়াদেবী মুখ তুলে বললেন।

দিব্যকান্তিবাবু লম্বা শ্বাস নিয়ে বললেন, 'এখন মনে হচ্ছে চোর-ডাকাত হলে ভাল হত। তারা আর যাই করুক বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে শ্বশুরবাড়িতে এসে শেলটার নেয় না। প্রয়োজন হলে হাজতে যায়। বিয়ের পর পুরুষমানুষের নানারকম অধঃপতনের কথা আমার জানা আছে, কিন্তু এমন অধঃপতনের কথা শুনিনি কখনও।'

জয়াদেবী হাতের বই মুড়ে সামনের টেবিলে রাখলেন। এক গাল হেসে বললেন, 'ও মা, তা কী করবে? বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হলে বেচারি যাবে কোথায় বলো? আমরা, মেয়েরা না হয় বাক্সটাক্স গুছিয়ে বাবার কাছে, দাদার কাছে দু'দিন কাটিয়ে আসি। ওরা কী করবে? রাগ করে রাস্তায় রাস্তায় কতক্ষণ ঘুরবে? ঝগড়া করে তো আর হোটেলে গিয়ে ওঠা যায় না। পলাশ ঠিকই করেছে। আমাদের এখানে এসে উঠেছে। ক'দিন থাকুক। রাগ কমলে যাবেখন। তপুরও বোঝা উচিত জামাইয়ের পাশে তার শ্বশুরবাড়ি আছে। এখানে যত্ন কিছু কম পাবে না। শুধু ঝগড়া নয়, আমি শুনেছি, তোমার মেয়ে নাকি পলাশ বেচারিকে বাড়ি থেকে বিদায় করেছে।'

ঝগড়ার ব্যাপারটা দিব্যকান্তি জানেন। আজ বিকেলে অফিস থেকে মেয়েকে মোবাইলে ধরেছিলেন তিনি।

'তপু, ভাল আছিস?'

তপস্যার গলায় উচ্ছ্বাস। বলল, 'খুবই ভাল আছি বাবা। শাশুড়ি মোমো বানিয়েছেন, এখন বসে বসে স্যুপ দিয়ে সেই মোমো খাচ্ছি। অলরেডি গাদাখানেক খেয়ে ফেলেছি। আরও খাব। মনে হচ্ছে, আজ শাশুড়ি আর আমি দু'জনে মিলে মোমো খাওয়ায় রেকর্ড করব। তুমি কেমন আছ বাবা? হাঁটুর ব্যথা কমেছে?'

বর ঝগড়া করে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এসেছে আর মেয়ে শাশুড়ির সঙ্গে বসে মোমো খাওয়ার রেকর্ড গড়ছে শুনলে কোনও বাবার পক্ষেই ভাল থাকা সহজ নয়। দিব্যকান্তিবাবু বিরক্ত গলায় বললেন, 'না, হাঁটুর ব্যথা কমেনি।'

'সে কী! সে দিন মাকে যে আমার শ্বশুরমশাই বলে দিলেন, দাদাকে ঠান্ডা-গরম ট্রিটমেন্ট দেবেন। ফার্স্ট সাতদিন প্রথমে ঠান্ডা, পরে গরম। নেক্সট সাতদিন আগে গরম পরে ঠান্ডা। বলেননি? মা নিশ্চয় শোনেনি। এই হয়েছে মুশকিল। মা এ বাড়ির কোনও ভাল পরামর্শ শুনতে চায় না। ভেরি ব্যাড। আমার শ্বশুরমশাইয়ের কী এসে যায় বলো তো বাবা? কিছু এসে যায় না। তিনি তো তোমাদের ভালর জন্যেই বলেছিলেন।'

তপস্যার গলায় একই সঙ্গে শ্বশুরমশাইয়ের প্রতি গদগদ ভাব এবং মায়ের ওপর বিরক্তি ঝরে পড়ে।

দিব্যকান্তিবাবু চুপ করে রইলেন। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া তো বটেই, মায়ের সঙ্গেও গোলমাল! সেটাই স্বাভাবিক। পলাশকে জয়া শেলটার দিয়েছে, গোলমাল তো হবেই।

'তপু, পলাশের ঘটনা কী? কী হয়েছে তোদের? ও এখানে এসে আছে। এসব কী ছেলেমানুষি তপু? ও বাড়ির লোকজন কী মনে করছেন। কোনও পুরুষমানুষ এই কাজ করে? না করেছে কোনওদিন? স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করে শ্বশুরবাড়িতে! ইউ শুড টক উইথ পলাশ।'

ও পাশে তপস্যাও চুপ করে রইল মিনিট খানেক। মনে হয় চামচ দিয়ে স্যুপ তুলে মুখে দিল। 'সুড়ুৎ' ধরনের একটা শব্দও পাওয়া গেল। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, 'বাবা, প্লিজ। প্লিজ বাবা, আর যার কথা বলো, তোমার জামাইয়ের সম্পর্কে কোনও কথা আমাকে বলবে না। আমি নিজেই ওকে বলেছি, যদি আমাকে তোমার না পোষায়, ক'টা দিন অন্য কোথাও গিয়ে থাকো। ওর কোনও কথা আমি শুনতে চাই না। যাক, এখন আমি ফোন ছাড়লাম বাবা, একটু পরেই ননদের সঙ্গে শপিং-এ যাব। ওরা গাড়ি নিয়ে আসবে। ননদাই বলেছে, একেবারে রাতে খাইয়ে তবে ছাড়বে।'

এরপর আর কিছু বলা চলে না। শ্বশুরবাড়ি নিয়ে মেয়ের হ্যাংলামো এই পর্যায়ে গেছে, দিব্যকান্তিবাবু জানতেন না। তিনি হতাশভাবে ফোন রেখে দেন।

পলাশ পরদার আড়াল থেকে মুখ বের করল। জয়াদেবী ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ান। বলেন, 'কী হল বাবা, খিদে পেয়েছে?'

পলাশ এক পা এগিয়ে এল। তবে পুরোটা এল না। তার শরীরের আদ্দেকটা রইল পরদার আড়ালে। সেই অবস্থাতেই বলল, 'না খিদে পায়নি। এক কাপ চা হবে মা? লিকার চা। দেখবেন লিকার যেন হালকা হয়।'

জয়াদেবী জামাইয়ের চায়ের ব্যবস্থা করতে রান্নাঘরের দিকে ছুটলেন। দিব্যকান্তিবাবু ভেবেছিলেন মুখ ফিরিয়ে নেবেন। যে জামাই প্রতি কথায় শাশুড়িকে 'মা, মা' করছে, সেই জামাইয়ের দিকে তাকিয়ে থাকা কঠিন একটা ব্যাপার। শরীরের মধ্যে জ্বালা জ্বালা করতে থাকে। মনে হয়, খুব শিগগিরই ফোসকা বের হবে। সেই ফোসকার সাইজ হবে বড় বড়। তবে ভাবলেও মুখ ফেরালেন না দিব্যকান্তিবাবু। কারণ জামাইয়ের দিক থেকে অত সহজে মুখ ফেরানো যায় না। একটি মাত্র জামাই হলে তো কথাই নেই।

পলাশ বলল, 'বাবা, ভাল আছেন? অফিস থেকে কখন ফিরলেন বাবা? তপু তো প্রায়ই বলে, এই বয়েসে বাবা যা খাটেন তোমরা পারবে না। আমি তখন বিশ্বাস করিনি। এখন করছি। আপনি সত্যি একজন পরিশ্রমী মানুষ।'

না, এই ছেলের অবস্থা খুবই খারাপ। শুধু 'মা' নয়, 'বাবা'ও শুরু করেছে! এখন কী করা উচিত? ধমক দেওয়া? কীরকম ধমক? ঘর কাঁপিয়ে জোরে? নাকি দাঁত চিপে নিচু স্বরে? অনেক সময় জোরের থেকে নিচু গলার ধমক কাজ বেশি দেয়। তাদের স্কুলে হেডমাস্টারমশাই নিচু গলায় ধমক দিত। অন্য কেউ শুনতে পেত না। যে শুনতে পেত, তার প্যান্টে ইয়ে হয়ে যেত। তখন সবাই বুঝতে পারত, এই ছেলে হেডমাস্টারের ধমক খেয়েছে।

দিব্যকান্তিবাবু ধমক দিলেন না। দিতে পারলেন না। জামাইকে যেমন চড় মারা যায় না, তেমন ধমক দেওয়াও যায় না। অনেক কষ্ট করে তিনি ঠোঁটে হাসি আনলেন। বললেন, 'তুমি ভাল আছ পলাশ? আমাদের এখানে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না তো?'

পলাশ হাসল। লাজুক ধরনের জামাই হাসি। বলল, 'হচ্ছে বাবা, অসুবিধে হচ্ছে। বেশ অসুবিধে হচ্ছে। ভেবেছিলাম কথাটা বলব না। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, বলাটা জরুরি।'

দিব্যকান্তিবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'অসুবিধে! অসুবিধে কীসের?'

'ঘটনা কী হয়েছে জানেন বাবা, দু'দিন ধরেই দেখছি কাক ভোরে ঘুমটা যাচ্ছে ভেঙে। আমি ভাবলাম ব্যাপারটা কী! ভোরে তো কখনও আমার ঘুম ভাঙে না। আমি হলাম লেট রাইজার। ছোটখাটো নয়, বড় লেট রাইজার। দশটায় বেড টি নিই। তা হলে! তা হলে ঘটনাটা কী? তখনই দেখলাম পুব দিকের জানলায় পরদাটা ছোট। ভোর হতে না হতে সেই পরদার ফাঁক দিয়ে ঘরে আলো ঢুকছে। কড়া রোদ। ব্যস, তাতেই ঘুম যাচ্ছে ভেঙে। আমি আবার ঘর অন্ধকার না থাকলে ঘুমোতে পারি না। গাঢ় অন্ধকার। পিচ ডার্ক। অথচ এখানে রোদ এসে একেবারে ডাইরেক্ট মুখে পড়ছে।'

একটু থেমে পলাশ সেই লাজুক হাসি হাসল। বলতে শুরু করল আবার।

'প্রথম দিন পরদা টেনেটুনে রোদ আটকানোর চেষ্টা করলাম, হল না। দ্বিতীয় দিন খাট সরাতে চেষ্টা করলাম। খাট সরল কিন্তু রোদ সরল না। এই কারণেই অসুবিধে।'

দিব্যকান্তিবাবু খুশি হলেন। একটু খুশি নয়, শ্বশুরবাড়িতে বেলা করে ঘুমোনোর শাস্তি হাড়ে হাড়ে টের পাক গাধাটা। আহা, সারারাত যদি এই ছেলের ঘরে রোদ ঢোকানো যেত তা হলে বেশ হত। তিনি খুশিভাব লুকিয়ে গলায় উদ্বেগ এনে বললেন, 'ছি ছি। কী কাণ্ড বলো দেখি পলাশ। ইস আমি যদি আগে জানতাম। ঠিক আছে, আজই দেখছি। তুমি মোটেও চিন্তা কোরো না। সামান্য পরদার কারণে তুমি ঘুমোতে পারছ না, এটা হতে পারে না। আমি নিজে বিষয়টা দেখছি পলাশ।'

জামাই লাজুক হাসি দিয়ে ঘরে ঢুকে যেতে খুশিভাব সরে মাথার আগুন জ্বলে উঠল দিব্যকান্তির। কত বড় আবদার! শ্বশুরমশাইকে বলছে পরদা টাঙান। কে জানে এ ছেলে যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে আর ক'টা দিন থাকলে হয়তো বলবে, বাবা আপনিই বরং সকালের দিকটা পরদা সেজে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকুন। রোদ সরে গেলে চলে

যাবেন। ইচ্ছে করছে, গাধাটার ঘাড় ধরে পুব দিকের ওই জানলাটা দিয়ে ছুড়ে ফেলে দিতে। সাততলার ফ্ল্যাট থেকে একতলায় পড়লে গাধাদের কী হয়? হাড়গোড় ভাঙে? ভাঙলে ক'টা ভাঙে? একে আর কতদিন সহ্য করতে হবে?

বেশি দিন নয়। ঘটনা ঘটল পরদিনই।

পলাশ বিছানা ছাড়ল বেলা করে। ততক্ষণে দিব্যকান্তিবাবু অফিসে রওনা দিয়েছেন। হালকা লিকার চা, কড়কড়ে দুটো টোস্টের সঙ্গে আস্ত একটা মর্তমান কলা, খান চার-পাঁচ পাকা পেঁপের টুকরো দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারল পলাশ। কাল রাতেই শাশুড়িকে সে জানিয়ে রেখেছিল, ব্রেকফাস্টে ফলের কোয়ান্টিটি একটু বেশি রাখলে ভাল। খাবার খেয়ে বাথরুমে ঢুকে কুসুম কুসুম গরম জল দিয়ে ভাল করে স্নান সারতে সময় নিল প্রায় ঘণ্টাখানেক। সাবান মাখল, শ্যাম্পু করল। শেষে চুলটুল আঁচড়ে, জামা জুতো পরে হাসি হাসি মুখে জয়াদেবীকে বলল, 'মা আজ তা হলে আসি? বাবার পাঞ্জাবিটা একটু বড় হলেও কী হবে পরে কিন্তু খুব আরাম। কাপড়টা ভাল।'

জয়াদেবী আপ্লুত ধরনের গলায় বললেন, 'ঠিক আছে বাবা, ঠিক আছে। তোমার জন্যে একটা পাঞ্জাবি কিনে তপুর হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেবখন।'

পলাশ হাসল। ঘাড় কাত করে অনুমতি নেওয়ার ঢঙে বলল, 'তা হলে আসি মা?'

দিব্যকান্তিবাবু সুখবরটা পেলেন অফিসে বসেই। খুশি হলেন। এতটাই খুশি হলেন যে, সন্ধে সাতটার জরুরি মিটিং বাতিল করে দ্রুত ফিরে এলেন বাড়িতে। ড্রাইভারকে বললেন, 'ভজন, তুমি পাশে বসো। আজ আমি গাড়ি চালাব।'

ড্রইংরুমেই বসে ছিলেন জয়াদেবী। ঘর অন্ধকার। দিব্যকান্তিবাবু আলো জ্বালিয়ে বললেন, 'কী ব্যাপার, অন্ধকার করে বসে আছ কেন? চলো আজ দু'জনে কোথাও বাইরে খেয়ে আসি। বেশি কিছু নয়, স্যুপ আর মোমো। কেমন হবে?'

জয়াদেবী মুখ তুললেন। মুখ থমথম করছে।

'কী হল শরীরটরির খারাপ নাকি?' উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, দিব্যকান্তিবাবু। ঝুঁকে স্ত্রীর কাঁধে হাতও রাখলেন। ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে দিলেন জয়াদেবী। গম্ভীর গলায় বললেন, 'তপু ফোন করেছিল।'

'এই রে আবার ওদের ঝগড়া নাকি?' দিব্যকান্তির গলায় আতঙ্ক।

জয়াদেবী মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'না, তা নয়। মেয়ে খুব রাগারাগি করল।'

দিব্যকান্তিবাবু অবাক হয়ে বললেন, 'রাগারাগি! কেন, রাগারাগি কেন? আমার হাঁটুর ব্যথা নিয়ে নিশ্চয়?'

'না তোমার হাঁটুর ব্যথা নিয়ে নয়। বলল, মা, পলাশ আমার সঙ্গে ঝগড়া করে ওখানে গিয়ে কদিন ছিল বলে সে কি তোমাদের জামাই নয়? আমি বললাম, কেন কী হয়েছে? মেয়ে বলল, কী হয়েছে তুমি জানো না? ছিল মাত্র দুটো না তিনদিন। এই ক'টা দিন তাকে ঠিকমতো যত্ন করতে পারলে না? আমি বললাম, কী অসুবিধে হয়েছে? তপু বলল, কী অসুবিধে বাবাকে জিজ্ঞেস করো। মানুষটার যদি কোনও কাণ্ডজ্ঞান থাকে। ছি ছি, তোমাদের জামাই আমাকে এসে যখন সব কথা বলল, আমি তো লজ্জায় মরে যাই।'

দিব্যকান্তিবাবু ধপ করে সোফায় বসে পড়লেন। এ সবের মানে কী? এই এত ঝগড়া, এখন বরের জন্যে মেয়ের প্রেম একেবারে উথলে উঠছে! কমপ্লেন পর্যন্ত করছে! গলার টাই আলগা করতে করতে তিনি বললেন, 'মানে! যত্ন হয়নি মানে কী? লুচি, পটল, সিনেমা, পাঞ্জাবি কী পায়নি গাধাটা? তার পরেও কমপ্লেন! শুধু ওই ছেলেকে নয়, আমার এখন মনে হচ্ছে, তোমার মেয়ের গালেও ক'টা চড় দেওয়া উচিত।'

জয়াদেবী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'তুমি আমাকে বললেই পারতে। আমি ব্যবস্থা করতাম।'

'কী বলিনি তোমায়? আমি এর মধ্যে কোথায়? আমার ওপর রাগ দেখাচ্ছ কেন?'

জয়াদেবী রাগের চোটে উঠে দাঁড়ালেন। আবার বসলেন। বললেন, 'আমার ব্যাপার? মেয়ে তো তোমার বিরুদ্ধে বলল। আমি তাকে সাপোর্ট করেছি। জামাই নাকি তোমাকে কাল রাতে বলছিল, পুবদিকের জানলাটায় তার অসুবিধে হচ্ছে। পরদা ছোট। পরদার ফাঁক দিয়ে ভোরবেলা আলো ঢুকছে, ঘুম ভেঙে যাচ্ছে বেচারির। শুনে তাকে তুমি বলেছিলে, এক্ষুনি দেখছি। কোনও চিন্তা নেই। বলোনি? বলোনি তুমি? আমার মেয়েজামাই মিথ্যে বলছে?'

'বলেছি তো, মিথ্যে হবে কেন?'

'তারপর? তারপর কোনও ব্যবস্থাই নিয়েছ? নাওনি। কিছুই করোনি। নিজে নাক ডেকে ঘুমোতে চলে গেছ। টেলিফোনে তপুর তো কেঁদে ফেলার মতো অবস্থা। বলল, বাড়িতে কি একটা এক্সট্রা বড় পরদাও নেই মা? নাকি জামাইয়ের ঘরে পরদা টাঙাতে বাবার লজ্জা করল? ছি ছি, ছেলেটার নাকি তিনদিন ভাল করে ঘুমই হয়নি এখানে। তপু বলছিল, চোখ দুটো একেবারে লাল করে বাড়ি ফিরেছে।'

দিব্যকান্তিবাবু চুপ করে বসে আছেন। মাথা নিচু। হিসেব মতো স্ত্রীর বকুনিতে তাঁর রেগে যাওয়ার কথা। তা হয়নি। তিনি আনন্দিত হয়েছেন। ওই ছেলে এ বাড়িতে ঠিকমতো ঘুমোতে পারেনি, তাই আনন্দ। একটা শিক্ষা দেওয়া গেছে। এখন তাঁকে আরও একটা কাজ করতে হবে। এই মহিলাকেও একটু শিক্ষা দিতে হবে। কথাটা সত্যি, স্ত্রীকে মাঝেমধ্যে শিক্ষা না দিলে মাথায় চড়ে নাচে। জয়াও মাথায় চড়ে নাচছে।

দিব্যকান্তিবাবু সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন দ্রুত। তিনি জামাইয়ের পথই অনুসরণ করবেন। গৃহত্যাগী হবেন। পাটনায় গিয়ে শালার বাড়িতে আশ্রয় নেবেন দিন কয়েকের জন্যে। শ্বশুরশাশুড়ি বেঁচে না থাকলে কী হবে, ওখানে যত্নআত্তি একেবারে শ্বশুরবাড়ির মতোই। কাল রাতের ট্রেনেই রওনা হবেন। পরদিন ভোরে পৌঁছে গরম লুচি খেতে খেতে শালার ডিভিডিতে হাসির সিনেমা দেখবেন। কটা চার্লি চ্যাপলিনের ছবি নিয়ে গেলে কেমন হয়?

সানন্দা, ১৫ মে ২০০৮

পালিয়ে

নার্ভাস ভাব গোপন করার যে ক'টি সহজ পদ্ধতি আছে তার মধ্যে সহজতমটি হল মুখটাকে হাসি হাসি করে রাখতে হবে। যেন 'কিছুই ঘটেনি'। সোহম সেই নিয়ম মেনেছে। সে-ও মুখটাকে হাসি হাসি করে রেখেছে, কিন্তু সেই হাসি ফুটছে না। মুখ কাঁচুমাচু লাগছে। সম্ভবত নার্ভাস হলে যে নিয়ম খাটে, অতিরিক্ত নার্ভাস হলে সেই নিয়ম কাজ করে না। তাকে দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, সে কোনও বড় ধরনের বিপদের মধ্যে পড়েছে। এমন বিপদ যা আগে কখনও ঘটেনি, ভবিষ্যতেও ঘটবার সম্ভাবনা কম।

ইশিকা কচুরিতে কামড় দিয়ে ঠান্ডা গলায় বলল, 'সোহম, মনে হচ্ছে তুমি যে-কোনও মোমেন্টে কেঁদে ফেলবে। তার আগে আর একবার তরকারিটা দিতে বলো। কচুরির তরকারির জন্য এদের মজার কোনও রেসিপি আছে বলে মনে হয়। খাওয়ার সময় ঝাল বোঝা যাচ্ছে না, পরে ধরা পড়ছে। ফ্যান্টাস্টিক!'

সোহম চমকে উঠে বলল, 'কাঁদব! কেন, কাঁদব কেন?'

ইশিকা সুন্দর হেসে বলল, 'সে তো জানি না, মুখ দেখে মনে হচ্ছে। অসুবিধে কিছু নেই এখানে লোকজন কম, আমরাও বসেছি দোকানের একেবারে কোণে। তুমি নিশ্চিন্তে কাঁদতে পারো।'

সোহম খানিকটা রাগ, খানিকটা অসহায় গলায় বলল, 'ঠাট্টা করছ? তোমার কি মনে হচ্ছে, এটা ঠাট্টা করবার মতো উপযুক্ত সময়? ডু ইউ থিঙ্ক সো?'

ইশিকা তার বড় চোখ আরও বড় করে বলল, 'ওমা! ঠাট্টা করব কেন? সিরিয়াস কথাই তো বলছি। কান্নাকাটির ব্যাপারে তুমি লজ্জাই বা পাচ্ছ কীসের জন্য? বিয়ের পর সব পুরুষমানুষই কাঁদে। হোয়াটস রং উইথ ইট? মেয়েদেরটা দেখা যায়, ছেলেদেরটা দেখা যায় না এই তো ডিফারেন্স। আমার এক মাসির বিয়ের সময় কেলেঙ্কারি হয়েছিল। শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার জন্য গাড়িটাড়ি সব রেডি, মাসি সেজেগুজে ঘোমটা টেনে বসে আছে ফিল্মি কায়দায়, কিন্তু ঘর ছেড়ে বেরোতে পারছে না। বিদায়বেলার লগ্ন প্রায় যায় যায়। কিন্তু করবার কিছু নেই। নাথিং টু ডু। মাসি বেচারির কিছুতেই কান্না পাচ্ছে না! চোখভরা জল ছাড়া সে পতিগৃহে যাত্রা করবে কী করে? বিরাট টেনশন। হি হি। শেষপর্যন্ত!...।'

'উইল ইউ প্লিজ স্টপ? আমাকে একটু মাথা ঠান্ডা করে ভাবতে দেবে?'

ইশিকা কচুরিতে মন দিতে দিতে বলল, 'কী ভাববে? যা হওয়ার হয়ে গেছে। অলরেডি ডান। ভাবনাচিন্তা করেই হয়েছে। এমন তো নয় যে, আমরা দুম করে কিছু করেছি।'

সোহমের খুব ইচ্ছে করল, টেবিলের উলটোদিকে বসা রূপবতী তরুণীটিকে একটি জোর

ধমক দেয়। ইশিকার সঙ্গে সে আগে কখনও ঝগড়া করেনি এমন নয়, বহুবারই করেছে। কিন্তু ছোটখাটো ঝগড়ায় এই মেয়ে বড় ধরনের রি-অ্যাকশন দেখায়। সামনে ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, মোটরবাইক, রিকশা যা পায় তাতে ফট করে উঠে পড়ে। প্রেমিকা এই কাণ্ড করলে মেনে নেওয়া যায়, কিন্তু ইশিকা এখন আর তার প্রেমিকা নয়, বিয়ে করা বউ। মাত্র আধ ঘণ্টা হল রেজিস্ট্রি অফিসে সই করে তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। স্ত্রীর রেগেমেগে অচেনা কারও মোটরবাইকের পিছনে চেপে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে? কেমন দেখাবে সেটা? এখন মাথা ঠান্ডা রাখা দরকার। কচুরি খাওয়া শেষ করে ইশিকা বলল, 'এবার রসগোল্লা খাব।'

'রসগোল্লা!'

'ইয়েস রসগোল্লা। ফিগার নিয়ে আমার যতই খুঁতখুঁতানি থাক, বিয়ের দিন মিষ্টিমুখ না করাটা অপরাধ। রসগোল্লা বলো। তোমার জন্যও বলো।'

সোহম বুঝতে পারছে, এই মেয়ে এখন যা খুশি তাই করবে। বিয়ের পর কিছুদিন 'যা খুশি' করে বিরাট আনন্দ পায়। সে অনিচ্ছার সঙ্গে রসগোল্লার অর্ডার দিল। এরকম একটা তেলচিটে মার্কা দোকানে ঢোকার ব্যাপারেই তার তীব্র আপত্তি ছিল। সহকারী রেজিস্ট্রার লোকটা ফিচেল প্রকৃতির। টাকা-পয়সা গুনে নেওয়ার পর ছোপ ছোপ দাঁতে হেসে বলল, 'যান, বিবাহের কার্যাদি ওভার, এবার সবাই মিলে পাশের দোকানে গিয়ে কচুরি শিঙাড়া সাঁটান। এখানে বিয়ে করতে এলে সবাই পাশের দোকানে কচুরি শিঙাড়া খায়।'

ইশিকা অতি উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'লেটস গো সোহম।'

সোহমের প্ল্যান ছিল অন্যরকম। ভেবেছিল, ঝামেলা শেষ হয়ে গেলে ট্যাক্সি নিয়ে চায়না টাউন বা পার্ক স্ট্রিটের কোথাও যাবে। সেখানে লাঞ্চ করতে করতে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে। ইতিমধ্যে ধরে আনা সাক্ষী দু'জন পালিয়েছে। যাওয়ার আগে বলে গেছে, দু'জনেরই নাকি 'ভীষণ জরুরি কাজ' পড়ে আছে। একেবারে ডাহা মিথ্যে। আসলে তারা পরিকল্পনা করে নবদম্পতিকে একা থাকার সুযোগ দিল। সেটা খারাপ নয়, তবে তার এই পরিণতি কে ভাবতে পেরেছিল?

সোহম মিনমিন করে বলল, কোথাও লাঞ্চ করব ভেবেছিলাম যে।'

ইশিকা সে কথায় পাত্তা না দিয়ে বলল, 'শুনলে না, এখানে বিয়ে করলে পাশের দোকানে কচুরি খেতে হয়? কে জানে হয়তো পাপ-পুণ্যির একটা ব্যাপার আছে। হোলি কচুরি। এদের সঙ্গে কমিশনের ব্যবস্থাও থাকতে পারে। না খেলে বেচারিরা দুঃখ পাবে।'

সোহমকে বিস্মিত করে চারটে কচুরির পর ইশিকা রস টিপে দু'-দুটো রসগোল্লাও খেয়ে ফেলল। রুমালে হাত মুছতে মুছতে হাসিমুখে বলল, 'নাও এবার বলো হোয়াই ইউ আর সো নার্ভাস? প্রবলেমটা কোথায়? শুধু নার্ভাস নয়, মনে হচ্ছে, তুমি ভয়ও পেয়েছ। আমাকে কি তোমার পেতনি বলে মনে হচ্ছে। পেতনি বউ?'

সোহম চাপা বিরক্ত গলায় বলল, 'কথায় কথায় হাসছ কেন? লোকে শুনতে পাবে।'

ইশিকা কৌতুকভরা চোখে চারপাশে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, 'সরি সোহম, আর হাসব না। নতুন বউয়ের হাসাহাসি ভাল দেখায় না। তবে আমাকে মোটেও নববধূর মতো লাগছে না। জিনস আর টপ পরে আছি, পায়ে স্নিকার। সঙ্গে ল্যাপটপ। ল্যাপটপ কাঁধে নিয়ে

কনে কখনও বিয়ে করতে আসে? কী করব বলো? অফিসে যেতে হবে না? এটা হল ফাউ বিয়ে, মেন বিয়ের দিন মারকাটারি সাজব।'

সোহম বুঝল, ইশিকার সহজে হাসি থামবে না। গোপনে বিয়ে করার কারণে তাকে যেমন ভয় চেপে ধরেছে, এই মেয়ে সম্ভবত আক্রান্ত হয়েছে হাসিতে। একই ঘটনায় ছেলেমেয়ে দু'জনের দু'রকম এফেক্ট! যদিও বিয়ের আগে পর্যন্ত তার নার্ভ যথেষ্ট শক্ত ছিল। শ্যামবাজারের মোড়ে যখন ইশিকার জন্য সে অপেক্ষা করছিল, তখন ভেতরে ভেতরে একটা শক্তি অনুভব করে। বীরের শক্তি। নিজেকে রূপকথার রাজপুত্র টাইপ লাগছিল। রাজকন্যেকে উদ্ধার করতে বেরিয়েছে। কিন্তু সইসাবুদ শেষ হওয়ার পরই ফট করে কী যেন ঘটে গেল! নিমেষে সব যেন পালটে গেল। হাত-পা ঠান্ডা হতে লাগল, কপালে ঘাম, বাঁ হাঁটুতে কাঁপুনি। হাঁটু কি এখনও কাঁপছে? সোহম টেবিলের তলায় হাত দিয়ে দেখল। হ্যাঁ, কাঁপছে। বাঁ, ডান দুটো হাঁটুই কাঁপছে।

ইশিকা উদাসীন ভঙ্গিতে বলল, 'তোমার কি হাঁটু কাঁপছে? শিভারিং?'

সোহম অবাক হয়ে বলল, 'তুমি কী করে বুঝলে?'

'বিয়ের পরপর ছেলেদের হাঁটু কাঁপা একটা স্বাভাবিক সিম্পটম। ফুলদির হাজব্যান্ডের সমস্যা হয়েছিল দাঁতে। বিয়ের পিঁড়িতে বসেই ঠকঠকানি শুরু হল। ফুলদি জোর বকা দিল, তাতে কাঁপুনি আরও বেড়ে গেল।'

সোহম ফস করে কাঁপা হাতে একটা সিগারেট ধরাল। বলল, 'বাজে কথা বন্ধ করো, এতক্ষণ মনে হয়নি, কিন্তু এবার মনে হচ্ছে, কাজটা ঠিক হল না। এভাবে লুকিয়ে... বরং আমরা আরও কয়েকটা দিন ওয়েট করতে পারতাম। ইউ কুড কনভিনস ইয়োর ফ্যামিলি। দরকার হলে আমি নিজে যেতাম, তোমার বাবার সঙ্গে কথা বলতাম।'

ইশিকা তার ব্যাগ থেকে চিরুনি বের করে দ্রুত হাতে চুল আঁচড়াতে থাকে। তার অফিসের সময় হয়ে গেছে। বিদেশি কোম্পানিতে হুট করে হাফ ছুটি পেয়েছে এই অনেক। বলল, 'প্রবলেম কোথায় বলবে? বাবার সঙ্গে কথা বলতে তো অসুবিধে নেই। তবে রিস্ক হাফ হয়ে গেল।'

'রিস্ক হাফ হয়ে গেল!'

ইশিকা আবার তার সুন্দর হাসি হেসে বলল, 'বাঃ, হল না! ডকুমেন্টারি বানানো, কবিতা লেখা, গ্রুপ থিয়েটার করা বেকার এবং ভিতু পাত্রের সঙ্গে আমার বাবা তাঁর সুন্দরী, বুদ্ধিমতী, চাকুরিরত কন্যার বিবাহ দেবেন কি না, সে বিষয়ে তোমার কি কোনও সংশয় ছিল না? আমার তো বাপু ছিল। নাউ দ্য সংশয় ইজ ওভার। বিয়ের ঝামেলা শেষ, এখন শুধু রাজি করানোর পালা। রিস্ক আদ্দেক। এই সময় ঝুঁকি কমানোটাই আসল ম্যানেজমেন্ট। আর তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ঠান্ডা মাথায় গিয়ে একদিন কথা বললেই চলবে। আমার বাবা খুবই চমৎকার একজন মানুষ, নাইস পার্সন। মেয়ের পছন্দ অপছন্দকে তিনি যথেষ্ট মূল্য দেন। প্রেমিকের ব্যাপারে কঠিন হলেও, জামাইয়ের বিষয়ে তিনি নিশ্চয় নরম হবেন। মনে হয় না উনি তোমাকে দু'-চারটের বেশি ধমক-ধামক দেবেন।'

ধমক! ঢোঁক গিলল সোহম। বান্ধবীর বাবা ধমক দেবে শুনলে খানিক আগে পর্যন্ত

লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে, আস্তিন গুটিয়ে অবশ্যই সে একটা কাণ্ড করে ফেলত। শ্বশুরমশাইয়ের বেলায় কি তা করা যায়? মনে হয় না যায়। সোহম আরও মিইয়ে গেল। কাঁধে ল্যাপটপ তুলে ইশিকা উঠে দাঁড়ায়। ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলল, 'এই যে স্বামী সাহেব, আমি এখন চললাম। আপনি বসে বসে বুকে বল আনুন। আর শুনুন স্যার, সারাদিন যে চুলোয় থাকুন রাত দশটার মধ্যে বাঁধনদের ফ্ল্যাটে চলে আসবেন। ও আর ওর বর আজ ওদের ফ্ল্যাটটা আমাদের ছেড়ে দিচ্ছে।'

সোহম চোখ কপালে তুলে বলল, 'ফ্ল্যাট ছেড়ে দিচ্ছে! মানে?'

ইশিকা হেসে বলল, 'মানে আর কী, তুমি বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দেবে, সারারাত এডিটিং চলবে বলে ফিরতে পারবে না। আর আমি বলে দেব, বাঁধনদের বাড়িতে পার্টিতে আটকে গেছি। গাড়ি পাঠিয়ে লাভ হবে না। ওরা কিছুতেই ছাড়ছে না। সেরকম হলে বাঁধনের সঙ্গে মাকে কথা বলিয়ে নেব। বাঁধন খুব সুন্দর করে মিথ্যে বলতে পারে। ও হল মিথ্যে এক্সপার্ট।'

সোহমের মনে হল, এবার সত্যি সত্যি সে কেঁদে ফেলবে। কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

ইশিকা আরও ফিসফিস করে বলল, 'আজ আমাদের ফুলশয্যা না? হাঁদা কোথাকার।'

গোপন বিয়ের কথা ফাঁস করা যায়, কিন্তু গোপন ফুলশয্যা গোপন থাকাই ভাল। সে খবর আমরা ফাঁস করব না। বলার মতো শুধু একটাই কথা, কোনও এক আশ্চর্য কারণে মাঝরাতের দিকে সোহম দুম করে সাহস পেয়ে যায় এবং তার স্ত্রীকে গভীর ভালবাসায় কাছে টানে।

বাঁধন শুধু তার ফ্ল্যাট ফাঁকা করে চলে যায়নি, একটা ঝলমলে লাল রঙের বেনারসি উপহার দিয়ে বন্ধুকে চমকে দিয়েছে। খাটের ওপর প্যাকেটে সেই বেনারসি রাখা ছিল। সঙ্গে দু'লাইনের চিরকুট—

ইশিকা, বিয়ের রাতে বউ বেনারসি পরায় তাবড় তাবড় স্মার্ট বরেরাও ঘাবড়ে যায়। ঘাবড়ে গিয়ে 'কাণ্ড' ঘটায়। আমি চাই, তুই আজ রাতে এই শাড়ি পড়ে সোহমকে ঘাবড়ে দিবি। সে কাণ্ড ঘটাবে। সেই কাণ্ডের গল্প কাল শুনব। অনেক অনেক শুভেচ্ছা।

ইশিকা বন্ধুর দেওয়া শাড়ি পড়েছে। নিয়মমতো ঘাবড়ানোর কথা সোহমের। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার হল ঘটনা ঘটেছে উলটো। সোহমের বদলে ঘাবড়েছে সে নিজে! বেনারসির আড়ালে সাহসী, স্মার্ট, বুদ্ধিমতী এই মেয়ের হাঁটু কাঁপছে। শুধু হাঁটু কাঁপছে না, চোখেও জল! মুখ ঘুরিয়ে সেই জল সে লুকোতে চেষ্টা করল। আনন্দের কান্না স্বামীকে দেখাতে তার খুবই লজ্জা করছে।

আনন্দবাজার পত্রিকার তত্ত্ব-তালাস-এ রসগোল্লা নামে প্রকাশিত হয়

অচেনা

১

তমালের বুক টিপটিপ করছে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। অবস্থা প্রায় দমবন্ধের মতো।

ঠাকুর দেবতায় তেমন ভক্তি নেই তমালের। সাতাশ বছর বয়েসে ঠাকুর দেবতায় বেশি ভক্তি না থাকাটা আশ্চর্যের কিছু নয়। কিন্তু আজ তমালের মনে হচ্ছে, কাজটা ঠিক হয়নি, থাকা উচিত ছিল। অবশ্যই উচিত ছিল। মনে মনে দেবতাদের ডাকার চেষ্টা করল সে। যদি এই বিপদের হাত থেকে কেউ তাকে রক্ষা করতে পারে সে ঈশ্বরই পারবেন। কিন্তু অবস্থা এতটাই খারাপ যে এই মুহূর্তে দেবতাদের একটা নামও মনে পড়ছে না। বরং মন্টু, ঝন্টু, লালু ধরনের উলটো পালটা নাম মাথায় আসছে। কেন এমন হচ্ছে? তাকে বিপদে ফেলে দেবতারা কি মজা দেখছেন? আড়াল থেকে বলছেন, এতদিন ডাকিসনি, এবার বোঝ ঠেলা?

গাড়িতে চড়বার অভ্যাস তমালের নেই। অফিস যাওয়া আসা বাসে, ট্রামে। বাড়ির পাশেই বাসের গুমটি। এটা একটা বড় সুবিধে। বেরিয়ে টুক করে বাসে উঠে পড়লেই হল। চেতলা ব্রিজের কাছে বাস থেকে নেমে শুধু দুটো স্টপ অটোয়। বাসের গোলমাল বা ভয়ংকর লেট ধরনের কিছু হলে তবে ট্যাক্সি। তবে সেটাও বছরে দু'-একবারের বেশি নয়। অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে সামান্য চাকরি করে বছরে দু'-একবারের বেশি ট্যাক্সি চড়া যায় না।

সেই তমাল এখন চলেছে গাড়িতে। এমনি গাড়িতে নয়, মারকাটারি ধরনের দামি গাড়িতে। এরকম গাড়ি চড়া তো দূরের কথা, চোখেও খুব একটা দেখেছে কিনা মনে করতে পারছে না সে। গাড়ি তো নয় ছোটখাটো একটা এরোপ্লেন যেন। নরম সিটে বসার সঙ্গে সঙ্গে গা ডুবে গেছে। এসি চলছে বিড়বিড় বিড়বিড় করে। যেন ঘুমপাড়ানি গান গাইছে। হালকা একটা মিষ্টি গন্ধও আছে। সম্ভবত গাড়ির ভেতর সেন্ট ছড়ানোর কোনও স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা রয়েছে।

মসৃণ হাইওয়ে দিয়ে গাড়ি ছুটছে সাঁ সাঁ করে। ছুটছে না, ঝড়ের মতো উড়ছে। এটাও তমালের বুক টিপটিপ করার একটা কারণ। বাইরে তাকালে মনে হচ্ছে, যে-কোনও মুহূর্তে উলটোদিক থেকে আসা লরি বা ট্রাকের সঙ্গে ধাক্কা লাগবে। গাড়ি উঠে যাবে আকাশে, তারপর ছিটকে পড়বে পাশের নালায়। কাল সকালে খবরের কাগজে বেরোবে— 'বিখ্যাত কোম্পানির রয় অ্যান্ড সন্সের মালিক শিবপ্রসাদ রায় একটা পথ দুর্ঘটনায়...। সঙ্গে তমালের নাম কি থাকবে? মনে হয় না থাকবে। মালিকের পাশে সামান্য কর্মচারীর নাম থাকার কোনও কারণ নেই। সে বেঁচে থাকলেও নয়, মরে গেলেও নয়।

তবে তমালের ভয়ের মূল কারণ গাড়ির স্পিড নয়, সঙ্গের মানুষটি। তার সহযাত্রী। সেই কারণেই এই টেনশন, গলা শুকিয়ে কাঠ। সিঁটিয়ে বসে আছে সে। মনে হচ্ছে, মালিকের সঙ্গে গাড়িতে বসে যাওয়ার থেকে দরজা খুলে ঝড়ে উড়ে যাওয়া অনেক ভাল।

তমাল আড়চোখে তাকাল। শিবপ্রসাদ রায়ের মুখ থমথম করছে। হাতে ফাইল জাতীয় কিছু একটা খোলা। সেখানে লেখা কিছু নেই, শুধু কয়েকটা রঙিন গ্রাফ। সেই গ্রাফ এঁকেবেঁকে চলে গেছে পাতা জুড়ে। মানুষের হার্টের যেমন ইসিজি রিপোর্ট হয়, এটা তেমনি কোম্পানির হার্টের ইসিজি। শিবপ্রসাদ রায় হাত তুলে তাঁর ফিনফিনে সোনালি ফ্রেমের চশমা ঠিক করলেন। টাইয়ের গিঁট টেনে সামান্য নামালেন। তারপর হাতের ফাইল বন্ধ করে চোখ বুজলেন। তমালের মনে হল, মানুষটা চোখ বুজলে আরও বেশি রাগী হয়ে যায়। তার বুকের টিপটিপানি বেড়ে গেল। গলা ফাটছে। শিবপ্রসাদ রায়ের আসনের পাশে খাপ। সেখানে কাগজ, জলের বোতল উঁকি দিচ্ছে। কিন্তু তাতে লাভ নেই। মরে গেলেও হাত বাড়িয়ে ওই জল চাইতে পারবে না তমাল। খাওয়া তো দূরের কথা।

কলকাতা আর কত দূরে? উর্দি পরা ড্রাইভার পিঠ সোজা করে গাড়ি চালাচ্ছে। শুধু উর্দি নয়, লোকটার মাথায় টুপিও আছে। একে যদি জিজ্ঞেস করা হয়— ভাই কলকাতা আর কত দূর? তা হলে সে নিশ্চয়ই ঘাড় ফিরিয়ে কঠিন চোখে তাকাবে। সেই চোখে বলবে— তুমি আমাকে প্রশ্ন করার কে হে? আর একটা কথা বললে গাড়ি পাশে দাঁড় করাব। ঘাড় ধরে নামিয়ে দেব। তার থেকে চুপ করে থাকা ভাল।

তমালের কান্না পাচ্ছে। আবার রাগও হচ্ছে। নিজের শরীরের ওপর রাগ। একটা অসুখ বিসুখ হতে পারল না? ইনফ্লুয়েঞ্জা অথবা ফুড পয়জন ধরনের কিছু। নিদেন পক্ষে সকালের স্নানে যাওয়ার তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে পা মচকাতে পারত। তা হলে সে আজ অফিসেই আসত না। কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে এই মারাত্মক গাড়িযাত্রার প্রশ্নও উঠত না।

ভয়ংকর গাড়ি যাত্রা কতক্ষণ চলছে? খুব বেশি নয়, তবে মনে হচ্ছে অনন্তকাল। বিপদের সময় এক মিনিটকে একশো বলে মনে হয়। হাত ঘুরিয়ে ঘড়ি যে দেখবে সে সাহস হচ্ছে না। এম ডি-র পাশে বসে ঘড়ি দেখা নিশ্চয়ই একটা অন্যায় কাজ। এখন পর্যন্ত শিবপ্রসাদ রায় তার সাথে কোনওরকম মারাত্মক আচরণ করেছেন? না করেননি। মারাত্মক কেন, কোনওরকম আচরণই করেননি। গাড়িতে ওঠার পর একটা কথাও বলেননি। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না। তার মতো অতি নগণ্য একজন কর্মচারীর মালিকের সঙ্গে পাশে বসে যাওয়াটাই যথেষ্ট মারাত্মক। দম বন্ধ করে দেওয়ার জন্য এর বেশি কিছু দরকার হয় না।

ঘটনাটা একেবারেই হঠাৎ ঘটেছে।

আজ সকালে অফিস যাওয়ার পরই সুধীরবাবু ডেকে পাঠাল। সুধীর ঘোষ অ্যাকাউন্টস অফিসার। মানুষটা ভাল। হিসেবের ঝামেলায় পড়লে অনেক সময় তমালকে বের করে আনে। অথচ ইচ্ছে করলে উপরে কমপ্লেইন করতে পারত— এই ছেলে যোগ বিয়োগে কাঁচা। সেই নোটের ভিত্তিতে অন্য ডিপার্টমেন্টে তার বদলি হতে পারত। মেশিনে বা ফিল্ডে। এই কারণে তমাল সুধীরবাবুকে পছন্দ করে। একটা কৃতজ্ঞতা আছে।

'একটা কেলেঙ্কারি হয়েছে তমাল।'

'কী কেলেঙ্কারি?'

'কাল লন্ডন থেকে ফিরেই এম ডি আজ প্ল্যান্ট ভিজিটে গেছে।'

'তাই নাকি।'

'ওখানে সারাদিন থাকবেন। ঘুরে ফিরে দেখবেন। লাঞ্চের সময় ম্যানেজারদের সঙ্গে মিটিং করবেন।'

তমাল নার্ভাস গলায় বলল, 'এই রে।'

এই অফিসে ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কথা শুনলে সবাই নার্ভাস হয়ে যায়। হওয়ারই কথা। কোম্পানি যেমন বড়, মালিকটিও তেমনি রাগী। শিবপ্রসাদ রায়ের রাগ সম্পর্কে নানা ধরনের সত্যি মিথ্যে গল্প চালু আছে। তার মধ্যে সবথেকে বড় মিথ্যে গল্প হল 'ইয়ে'র গল্প। একবার মুম্বাইয়ে অফিসে টার্গেটে গোলমাল হয়ে গিয়েছিল বলে ভদ্রলোক নাকি এমন ধমক দিয়েছিলেন যে সেলস ম্যানেজারের প্যান্টে 'ইয়ে' হয়ে গিয়েছিল। শোকজ, সাসপেনশন, ট্রান্সফারের সত্যি গল্পের থেকেও 'ইয়ে' হয়ে যাওয়ার মিথ্যে গল্প মানুষ বেশি বিশ্বাস করেছিল। তবে মানুষটা যে রাগী তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কলকাতার অফিসে এলে গোটা অফিসটা একেবারে শান্ত হয়ে যায়। হাসি, ঠাট্টা, আড্ডা, ঝগড়া সব বন্ধ। টেবিলে ঘুরে ঘুরে কাজকর্মের খোঁজ নেন। অনেকটা স্কুলে পড়া ধরার মতো অবস্থা।

সুধীরবাবু বললেন, 'আমার দায়িত্ব ছিল তপোবিজয় সেনের জন্য কাগজপত্র ফাইল করে দেওয়া। সাততাড়াতাড়ি অফিসে এসে কাজটা করেও দিলাম। যত্ন নিয়েই করলাম। ফাইনান্স ম্যানেজারের কাজ বলে কথা।'

'তারপর?' উদ্বিগ্ন গলায় তমাল জিজ্ঞেস করল।

সুধীরবাবু পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, 'এখন দেখছি, গত জুনের সেল রিপোর্টটা ফাইলে ঢোকাতে ভুলে গেছি। তপোবিজয় সেনকে মোবাইলে ধরলাম। উনি শুনে তো আঁতকে উঠলেন। বললেন, যে করেই হোক পাঠিয়ে দিন। শিবপ্রসাদ রায় যেমন মানুষ হয়তো ওই রিপোর্টটাই চেয়ে বসবে।'

তমাল বলল, 'কী হবে?'

'ভাই তমাল, এই কাজটা তোমায় করতে হবে।'

'আমায়!'

'হ্যাঁ তোমায়। কাগজটা প্ল্যান্টে নিয়ে চলে যাও। চুপিচুপি তপোবিজয় সেনের হাতে তুলে দেবে। মালিকের কাছে ফাইনান্স ম্যানেজারের হেনস্থা হলে আমার কী অবস্থা হবে একবার অনুমান করতে পারছ? ভেবেছিলাম, আমি নিজেই যাব। কিন্তু কী জানি তাড়াহুড়োয় আর কী ভুলে গেছি। তা ছাড়া হঠাৎ কোনও ফিগার লাগলে এখান থেকে ফোনে বলে দিতে হবে। এই সময় অফিস ছেড়ে নড়া আমার উচিত হবে না। অন্য কাউকেও ভরসা করতে পারছি না। কে জানে হয়তো দেরি করে পৌঁছোলে, ততক্ষণে যা ঘটার ঘটে যাবে। প্লিজ তমাল, হাতে সময় আছে। তুমি রওনা দাও।'

হাওড়া থেকে দশটা বাহান্নর ট্রেন ধরেছে তমাল। স্টেশন থেকে রিকশাতে প্ল্যান্টে পৌঁছোতে আরও কুড়ি মিনিট। সব মিলিয়ে আড়াই ঘণ্টার বেশি। তবে কাজ হয়েছে।

লাঞ্চের মাঝখানে এসে কাগজ পৌঁছে দিয়েছে। ভেবেছিল তখনই পালিয়ে আসবে। ট্রেন ধরে কলকাতা। তপোবিজয় সেন আটকে দিলেন। বললেন, 'খেয়ে যাবে তমাল।'

খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল চমৎকার। সরু চালের ভাত, হালকা মুগের ডাল। ঝুরি ঝুরি আলু ভাজা। মাছ মাংস তো আছেই। এম ডি নাকি বহুদিন বাঙালি রান্না খাননি। এতদূর পর্যন্ত ঠিক ছিল। গোলমালটা হল এর পর। তমাল যখন বেরোতে যাচ্ছে তখন। গেটের কাছে আসতেই দারোয়ান তাকে প্রায় ঠেলে সরিয়ে দেয়।

'সরুন, সরুন, সাহেব বেরোচ্ছে। আঃ সরুন বলছি।'

তড়িঘড়ি সরে দাঁড়াল তমাল। সত্যি সত্যি শিবপ্রসাদ রায় বেরিয়ে এসেছেন। দল বেঁধে ম্যানেজাররা আসছে পিছু পিছু। উর্দি পরা ড্রাইভার ছুটে এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল। ম্যানেজিং ডিরেক্টর কিছু একটা বলার জন্য মাথা ঘোরালেন আর তখনই চোখ পড়ে গেল তমালের ওপর। থমকে দাঁড়ালেন। হাতের ছাতা, ব্যাগ নিয়ে কাচের দরজার গায়ে মিশে যেতে চেষ্টা করল তমাল।

সোনালি চশমার ওপর দিয়ে ভুরু কুঁচকে এম ডি বললেন, 'ইয়ংম্যান, আপনাকে কোথায় যেন দেখেছি?'

শিউরে উঠল তমাল।

'কোথায় বলুন তো?' শিবপ্রসাদ রায়ের গলায় অস্বস্তি।

কাঁপা পায়ে এবার এগিয়ে এল তমাল। কিছু একটা বলতে গেল, কিন্তু সেই কথা গলা দিয়ে বের হল না। ভেতরে আটকে রইল। কোম্পানির মালিক বলছে তাকে দেখেছে! অসম্ভব। তাকে চেনার কোনও কারণ নেই। কলকাতার অফিসে দেখে থাকলেও মনে রাখার প্রশ্নই ওঠে না। সে দেড়শো কর্মচারীর একজন মাত্র। তাও ওপরের দিকের কেউ নয়, নীচের দিকের কর্মী।

শিবপ্রসাদ রায় গাড়ির দরজায় হাত রেখে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কোথায় দেখেছি? মুম্বইতে? খুব চেনা চেনা লাগছে। বাই এনি চান্স আপনি কি কঙ্কনের কেউ হন?'

কঙ্কন! কে কঙ্কন? এই নামে কাউকে চেনা তো দূরের কথা, এমন নাম তমাল কখনও শোনেনি। তার হাঁটু কাঁপতে শুরু করেছে। অফিসার, ম্যানেজার, পিয়ন, আর্দালি, ড্রাইভাররা সবাই তাকিয়ে আছে তার দিকে। যেন একটা আজব বস্তু দেখছে।

তমাল আবার কিছু বলতে গেল। তার আগেই তপোবিজয় কয়েক পা এগিয়ে এলেন। বললেন, 'স্যার, এ আমাদের কলকাতা অফিসের স্টাফ। তমাল। অ্যাকাউন্টসে আছে। ভাল ছেলে।'

শিবপ্রসাদ রায় ঠোঁটের ফাঁকে সামান্য হেসে বললেন, 'ও তা হলে আমিই ভুল করেছি। হঠাৎ খুব চেনা চেনা লাগল।'

তমাল এগিয়ে এসে হাত জোড় করল এবং বুঝতে পারল শুধু হাঁটু নয়, তার গোটা শরীর কাঁপছে। তপোবিজয় আবার হাসিমুখে বললেন, 'তমাল কলকাতার থেকে একটা কাগজ দিতে এসেছিল স্যার। দিয়েই কলকাতা ফিরে যাচ্ছিল। আমি ধরে বললাম, খেয়ে যাও। ডোন্ট ওয়ারি, অনেক ট্রেন পাবে।'

শিবপ্রসাদ রায় মাথা নেড়ে বললেন, 'ঠিক করেছেন।' তারপর তমালের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী তুমি কলকাতায় ফিরবে?'

ঢোঁক গিলে তমাল কোনওরকমে বলল, 'হ্যাঁ স্যার।'

একেই কি বলে রেড লেটার ডে? খোদ মালিক তার সঙ্গে কথা বলছে। শুধু বলছে না, একেবারে তুমি তুমি করে বলছে।

এরপরই আসল ঘটনা ঘটল। ঘটনা না বলে তমালের পক্ষে দুর্ঘটনাই বলা উচিত।

শিবপ্রসাদ রায় হাত বাড়িয়ে বললেন, 'দেন ইউ ক্যান কাম উইথ মি। আমার সঙ্গে যেতে পারো। কোনও অসুবিধা আছে? আমি তোমাকে কলকাতা পর্যন্ত লিফট দিচ্ছি।'

তমালের এবার মনে হল, মাটি কেঁপে উঠল। মানুষটা বলছে কী? তাকে লিফট দেবে!

কে যেন বলে উঠল, 'নাও নাও উঠে পড়ো তমাল। স্যার যখন বলছেন।'

তমাল দরদর করে ঘামছে। সে কি ছুটে পালাবে?

শিবপ্রসাদ রায় এবার ঠান্ডা গলায় বললেন, 'নাও এসো আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

এরপর আর কিছু করার নেই। তমাল যখন গাড়িতে উঠছে তখন তার মনে হচ্ছে গাড়ি নয়, উঠছে ফাঁসির মঞ্চে। সেই 'ফাঁসির মঞ্চ' ছুটছে।

'কী যেন নাম তোমার?'

চোখ বোজা অবস্থাতেই শিবপ্রসাদ রায় প্রশ্ন করলেন। চমকে উঠল তমাল। বুকের ঢিপঢিপানি মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। হার্টফেল করল নাকি?

'ও। তমাল তুমি কি জল খাবে?'

তমাল অবাক হল। মানুষটা তার তেষ্টার কথা জানতে পেরেছে?

'না, স্যার ঠিক আছে।'

শিবপ্রসাদ রায় চোখ খুললেন। একটু হেসে বললেন, 'না ঠিক নেই। নাও জল খাও।'

কথা শেষ করে সিটের খাপ থেকে জলের বোতল এগিয়ে দিলেন। কাঁপা হাতে বোতল ধরল তমাল। চলন্ত গাড়িতে জল খাওয়া একটা ঝুঁকির ব্যাপার। ভেতরে জল পড়লে কেলেঙ্কারি।

'তুমি অ্যাকাউন্টসের কোনদিকটা দেখো?'

মুখ খোলা বোতল থেকে জল ছলকে পড়ল। তবে গাড়িতে নয়, পড়ল তমালের গায়ে। এই রে। পড়া ধরা শুরু হয়ে গেছে। এরপর আসবে বকাঝকা। কালই আসবে চিঠি। সুধীরবাবু সেই চিঠি ধরাতে ধরাতে বলবেন, 'তোমার জন্য খুবই খারাপ লাগছে তমাল। তোমাকে মেশিনে ট্রান্সফার করা হয়েছে। কাল থেকে নাইট ডিউটি। সঙ্গে রাতের খাবার আনবে। ক্যান্টিনে বেশিদিন টানলে পেটের সমস্যা হবে।'

তমাল কাঁদোকাঁদো গলায় বলবে, 'আমাকে বাঁচান সুধীরবাবু। প্লিজ বাঁচান।'

সুধীর ঘোষ গম্ভীর হয়ে ফাইলে মন দেবেন। বলবেন, 'আমার কিছু করার নেই রে ভাই। খোদ মালিকের অর্ডার।'

তমাল এম ডি-র দিকে তাকিয়ে বলল, 'স্যার, বেশি কিছু নয়। আগের দিনের সেল হিসেব চেক করি, এন্ট্রি করতে পাঠিয়ে দিই স্যার।'

শিবপ্রসাদ রায় বললেন, 'তুমি রিল্যাক্স করে বসো।'

'ঠিক আছে স্যার।'

'না ঠিক নেই। আমি খেয়াল করেছি, আমি খেয়াল করেছি, পুরো পথটাই তুমি স্ট্রেস নিয়ে বসে আছ। বি ইজি।'

এতক্ষণ পিঠ সোজা করে বসে ছিল। এবার সিটে হেলান দিল তমাল। শিবপ্রসাদ রায় জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন। হালকা গলায় বললেন, 'আসলে কী হয় জানো তমাল, অনেক সময় চেনা মানুষকে চেনা যায় না, আবার অচেনা কাউকে হঠাৎ খুব চেনা মনে হয়। তাই না?

এম ডি মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন, হাসলেন। তমাল কী করবে বুঝতে পারছে না। মালিক হাসলে কী করতে হয়? হাসতে হয়?

'আরও আছে। একজনকে একভাবে চিনলাম, হয়তো কিছুক্ষণ পর দেখা গেল, মানুষটা তা নয়। সম্পূর্ণ অচেনা ঠেকল। তোমার বেলায় হয়েছে প্রথমটা। কোথায় যেন দেখেছি মনে হল।'

কঠিন কথা। পুরোটা বুঝতে পারল না তমাল তবে শুনতে বেশ সহজ লাগল। উনি কি আবার অফিসের কাজের কথায় আসবেন? আসবেন মনে হয়। বড় মানুষেরা এইরকমই হয়। কঠিন কথার আগে সহজ আচরণ করে।

'অফিসের হিসাব চেক করার সময় তুমি ভুল পাও?'

তমাল চুপ করে রইল। না, চাকরিটা বোধহয় বাঁচানো গেল না। কালই কপালে চিঠি ঝুলছে। মরতে কেন যে সুধীরবাবুর কথায় ছুটে এল? একটা কিছু বলে...। অতগুলো ম্যানেজার মিলে তাকে মালিকের গাড়িতে তুলে দিলই বা কোন আক্কেলে?

কী বা করার ছিল? খোদ মালিক যদি গাড়িতে উঠতে বলে।

'কী হল বললে না কত ভুল পাও?'

তমাল ঢোঁক গিলল। কী বলবে? বেশি বলবে, না কম? কোনটা বললে এম ডি রাগ করবে না? মনে হয় 'ভুল পাই না' বলাটাই ঠিক হবে। ওপরের লেভেলের লোকেরা ভুলের কথা শুনতে পছন্দ করেন না।

তমালের মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'কিছু ভুল পাই স্যার।'

'গুড। যত বেশি ভুল পাবে তত বুঝবে নিজের কাজ ঠিক করছ। ভুল করতে করতেই একমাত্র ঠিকে পৌঁছানো যায়।'

'চেষ্টা করব স্যার। অবশ্যই চেষ্টা করব।'

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, তমালের এখন তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আগের মতো অসুবিধা হচ্ছে না। কই বকাঝকা তো কিছু নেই। বরং কথাগুলোও সুন্দর।

'গান শুনবে?'

গান! তমাল চমকে তাকাল। রাগী মালিকের মুখে এ কী কথা!

'শোনো, ভাল লাগবে। আমার সঙ্গে সবসময়ই রবীন্দ্রসংগীতের ভাল কালেকশন থাকে। আনকমন সব গান। একেকদিন একেকরকম নিয়ে বেরোই। সম্ভবত আজ পূজা পর্যায়ের সিডি আছে।'

শিবপ্রসাদ রায় সামান্য গলা তুলে ড্রাইভারকে বললেন, 'চরণ টেপটা চালিয়ে দাও।'

তমাল মুগ্ধ। এতটাই মুগ্ধ যে সে কিছু বলতেও পারছে না। ফিরে গিয়ে যে যখন এই গল্প বলবে কেউ বিশ্বাস করবে? ডাকসাইটে মানুষটা তার মতো এক অকিঞ্চিৎকর কর্মীকে গান শুনিয়েছে, এ কথা কি বিশ্বাস করার মতো? তমাল এবার একটা কাণ্ড করল। হাত বাড়িয়ে সহজভাবে বলল, 'স্যার, আর একবার জলের বোতলটা দেবেন? তেষ্টাটা মেটেনি।'

একটুও না ফেলে বেশ খানিকটা জল খেয়ে ফেলল তমাল। জামার হাতায় মুখ মুছতে মুছতে রবীন্দ্রসংগীত শোনার জন্য তৈরি হল। মনে মনে সুধীর ঘোষকে ধন্যবাদ জানাল। এই গরমের মধ্যে ট্রেনের ভিড় ঠেলে তাকে এতদূর পাঠানোর জন্য ধন্যবাদ। ওই মানুষটার জন্যই তো এই বিরল অভিজ্ঞতা। শিবপ্রসাদ রায়ের সঙ্গে বসে গান শোনা।

কিন্তু গান শুরু হওয়ার মুখেই একটা কাণ্ড ঘটল।

বিকট আওয়াজ। গাড়ির পাশে যেন বোমা ফাটল। চরণ সর্বশক্তি দিয়ে ব্রেক কষল। ঝাঁকুনি দিয়ে গাড়ি থমকে দাঁড়াল মাঝপথে।

২

ঝাঁ চকচকে রাস্তার পাশে একটা ঝুপড়িতে বসে আছে তমাল। পাশে রায় অ্যান্ড সনস্ কোম্পানির কর্ণধার শিবপ্রসাদ রায়। দু'জনের হাতে কাচের গ্লাস। তাতে চা। চায়ের স্বাদ খারাপ। তমাল তার মালিককে এই চা খেতে বারণ করেছিল। তিনি শোনেননি। বরং আরও একবার খাবেন বলে ঘোষণা করে রেখেছেন।

বিকেলের আলো ফুরোতে বেশি দেরি নেই। চওড়া রাস্তা দিয়ে কলকাতার দিকে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে ঝড়ের মতো। তমাল চেয়েছিল, মোবাইলে খবর দিতে। প্ল্যান্ট থেকে যদি কোনও গাড়ি পাঠানোর ব্যবস্থা করা যায়। শিবপ্রসাদ রায় রাজি হননি।

'থাক, বরং এসো তমাল ওই ঝুপড়িটায় গিয়ে চায়ের খোঁজ করি।'

'চা! স্যার এখানে আপনি চা খাবেন।'

শিবপ্রসাদ সামান্য হেসে বললেন, 'কেন, তুমি খাবে না? তুমি না খাও, আমি খাব। অনেক দিন রাস্তায় বসে চা খাইনি।'

সেই চা খাওয়া চলছে। শুধু চলছে না, দু'জনেই বসে পড়েছে ঝুপড়ির বাইরে পাতা কাঠের বেঞ্চে। বেঞ্চের পায়ায় মনে হয় কোনও গোলমাল আছে। মাঝে মাঝেই ঢক ঢক করছে। তমালের অসুবিধা হলেও কোট টাই পরা মানুষটার মনে হচ্ছে না কোনও অসুবিধা হচ্ছে। তিনি বেশ আরাম করেই বসে আছেন। তমাল আরও মুগ্ধ। বড় মানুষ একেই বলে। ছোটখাটো সমস্যা নিয়ে এরা ভাবে না।

খানিকটা দূরে চরণ ফেটে যাওয়া গাড়ির চাকা বদলাচ্ছে। এখনও তার মাথায় টুপি। জ্যাক লাগিয়ে গাড়ি উঁচু করছে সে। তার পাশে উবু হয়ে বসে আছে আট-ন'বছরের এক বালক। খালি গা, ঢলঢলে হাফপ্যান্টে দড়ি বাঁধা। বালকটি সম্ভবত আশেপাশে গ্রামের গোরু

চরায়। হাতে একটা খাটো ধরনের লাঠিও আছে। গভীর মনোযোগ দিয়ে কিছুক্ষণ চাকা বদল দেখে সে এবার গাড়ি পর্যবেক্ষণে মন দিয়েছে। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখছে। গায়ে হাত বুলোচ্ছে। তমাল চা খেতে খেতে দূর থেকে নজর রাখছে। এই ধরনের ছেলেপিলে ছিঁচকে চোর হয়। গাড়ি থেকে জিনিস তুলে পালায়। বাড়াবাড়ি করলে ধমক দিতে হবে।

শিবপ্রসাদ রায় চায়ের গ্লাস নামিয়ে বললেন, 'তুমি সঙ্গে আসায় ভালই হল। নইলে একা একা বসে থাকতে হত।'

'আমারও খুব ভাল লাগছে স্যার।'

'বানিয়ে বলছ না তো?'

তমাল হেসে বলল, 'সত্যি স্যার। আপনার সম্পর্কে কত কী শুনেছিলাম...।'

'আমার সম্পর্কে শুনেছিলে! কী শুনেছিলে?'

তমাল লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলল, 'শুনেছিলাম, আপনি স্যার ভীষণ রাগী।'

শিবপ্রসাদ রায় হাতের গ্লাসটা নামিয়ে চোখ বড় করে বললেন, রাগী! কেমন রাগী?'

'স্যার আপনার রাগ মেজাজ নিয়েও অনেকরকম গল্প আছে অফিসে।'

'একটা গল্প বলো।'

'একবার নাকি স্যার আপনার ধমক খেয়ে কোন ম্যানেজার...।'

বলতে বলতে থেমে গেল তমাল। উঠে দাঁড়িয়ে গলা তুলে ধমক দিল, 'অ্যাই, অ্যাই ছেলে। কী করছিস, ওখানে? যা ভাগ। ভাগ বলছি।'

শিবপ্রসাদ রায় আলতো ভঙ্গিতে বললেন, 'ছেড়ে দাও, ও কিছু করবে না।'

তমাল উত্তেজিত গলায় বলল, 'করবে না মানে? আপনি এদের চেনেন না স্যার। একেকটা খুদে ডাকাত। সুযোগ পেলেই কিছু একটা নিয়ে পালাবে। দেখছেন না কেমন ঘুরঘুর করছে।'

কথাটা শেষ করে আবার গলা তুলল তমাল।

'এই ছোঁড়া গাড়ির দরজা খুঁটছিস কেন? চড় খাবি...।'

যে গাড়িকে খানিক আগেও ফাঁসি মঞ্চ মনে হচ্ছিল, তার প্রতি কেমন যেন একটা প্রচ্ছন্ন মমতা তৈরি হয়ে গেছে। তমাল নিজেই অবাক হল। ভালও লাগছে। বদ ছেলেটা আবার ঘুরে এসে চরণের পাশে বসেছে। ইট, নাট বল্টু, টায়ার এগিয়ে সাহায্য করছে। বেটা ওখান থেকে কিছু হাতাবার ধান্দা করছে না তো?

শিবপ্রসাদ রায় বললেন, 'আমার ধমকের গল্পটা শেষ করলে না তো।'

তমাল এক গাল হেসে বলল, 'স্যার সেই ম্যানেজার নাকি প্যান্টে...'

গলা ফাটিয়ে হেসে উঠলেন শিবপ্রসাদ। ঝুপড়ির মালিক চা তৈরি বন্ধ করে অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে। তমালের দারুণ লাগছে। লাগারই কথা। তার গল্প শুনে একজন এতবড় মানুষ গলা ফাটিয়ে হাসছে! স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। তমাল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল, আজ কলকাতায় ফিরে রাতে ঘুমোবে না। টেলিফোন করে সবাইকে এই ঘটনা বলবে। মোবাইলের কার্ড ফুরিয়ে গেলে যাবে। কুছ পরোয়া নেই।

চরণ তমালের দিকে হাত তুলল। চাকা বদল হয়ে গেছে।

'আসুন স্যার। গাড়ি রেডি।'

'জাস্ট আ মিনিট তমাল।'

কথাটা বলে বাঁহাতের কড়ে আঙুল তুলে দেখালেন শিবপ্রসাদ রায়। তারপর স্বচ্ছন্দে হেঁটে মাঠের দিকে এগিয়ে গেলেন। গুনগুন করে গানও গাইছেন যেন।

তমালের ইচ্ছে করছে অফিসের সবার মাথায় মুগুরের বাড়ি মারে। ছি ছি। এমন একটা হাসিখুশি মানুষ সম্পর্কে কত কথাই না বলে ওরা। ভাগ্যিস আজ এসেছিল সে। তাই এত বড় মানুষটাকে চিনতে পারল।

শিস দিতে দিতে গাড়ির কাছে এগিয়ে এল তমাল। খালি গায়ের বালকটি এখনও গাড়ির গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে। তমাল সতর্ক হল। বেটা ছিনতাই টিনতাই করবে না তো? বলা যায় না। সন্ধে নামছে। এই সময়টা হাইওয়েতে চুরি ছিনতাইয়ের প্রকৃষ্ট সময়। অন্ধকার মাঠে গা ঢাকা দিলে কে ধরবে? স্যারের হাতে দামি কিছু নেই তো? ঘড়ি? মোবাইল?

চোখ মুখ শক্ত করে এগিয়ে এল তমাল। ছেলেটা দাঁত বের করে হেসে দূরে সরে দাঁড়াল।

'কী হল তমাল?'

'কিছু হয়নি স্যার, ছেলেটাকে তাড়াচ্ছিলাম। বদটা...। আপনি উঠুন স্যার।'

ড্রাইভারকে সরিয়ে নিজের হাতে গাড়ির দরজা খুলে দিল তমাল। ভেতরে আলো জ্বলে উঠছে। মায়াময় নরম আলো। শিবপ্রসাদ রায় পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করলেন। দু'আঙুলে একশো টাকার নোট বের করে এগিয়ে দিলেন অন্ধকার ঘেঁসে দাঁড়ানো ছেলেটার দিকে।

'নাও ধরো।'

তমাল স্তম্ভিত। মানুষটা কী করছে! ছেলেটা ঝাঁপ দিয়ে চোখের নিমেষে মানিব্যাগটা ছিনিয়ে নিতে পারে। তারপর এক লাফে নালা পেরিয়ে মাঠের জলকাদা ভেঙে ছুটবে। কে ধরবে তখন? স্যার বোধহয় ভুলে গেছেন, এটা লন্ডন নয়।

ছেলেটা আরও কয়েক পা পিছিয়ে গেল। শিবপ্রসাদ বললেন, 'কী হল নাও, তুমি তো চাকা বদলাতে সাহায্য করেছ। আমি দূর থেকে দেখেছি। নাও, এটা তোমার বখশিশ।'

ছেলেটা এবার হাসল। তারপর দু'পাশে জোরে মাথা নাড়িয়ে উলটো মুখে দৌড় লাগাল টেনে।

একবার টায়ার ফাটলে গাড়ি সাধারণত আস্তে চলে। এই গাড়ি ছুটছে আরও জোরে। কলকাতায় পৌঁছোতে দেরি নেই। আর অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই শহরে ঢুকে পড়বে তারা। মৃদু স্বরে গান চলছে। অচেনা রবীন্দ্রসংগীত। শিবপ্রসাদ রায় চোখ বুজে আছেন।

তমালের মনটা খারাপ হয়ে গেছে। তার খালি মনে হচ্ছে, মানুষকে সত্যি চেনা যায় না। বড় ছোট কোনও মানুষকেই নয়।

দ্য সানডে ইন্ডিয়ান, ৫ অক্টোবর ২০০৮

ইমেল বিছানো পথে

'বরবটির বীজ নিতে হবে দশ গ্রামের মতো। এমনি বীজ নয়, বালিখোলায় ভাজা বীজ। দু'কাপ জলে ফেলে সেই বীজ সিদ্ধ করতে হবে অল্প আঁচে। মিনিট কুড়ি-পঁচিশ পর মিশ্রণ থকথকে হয়ে গেলে আগুন থেকে নামাতে হবে। তারপর বীজসিদ্ধ জল পরিষ্কার কাপড়ে ছেঁকে আলাদা করে নিতে হবে সাবধানে। কুসুম কুসুম সেই গরম জল খাওয়ার নিয়ম হল দিনে দু'বার। বেশি হলে তিনবার। যাদের অল্প ঠান্ডাতেই সর্দিকাশির ধাত তাদের পক্ষে এই জল অব্যর্থ। তবে এতে কাজ না দিলে...।'

এই পর্যন্ত পড়ে শিবনাথবাবু বই বন্ধ করলেন।

বই শিবনাথবাবুর কোনও প্রিয় জিনিস নয়। স্কুল কলেজটুকু বাদ দিলে এই ছেষট্টি বছরের জীবনে বই তিনি বেশ কমই পড়েছেন। কিন্তু এই বইটি তিনি গত তিনমাস ধরে বারবার পড়ছেন, উলটেপালটে তারিয়ে তারিয়ে দেখছেন। এর কারণ বই নয়, বইয়ের বিষয়। বইয়ের বিষয় খুবই ইন্টারেস্টিং। তরিতরকারির গোপন রহস্য। পড়তে পড়তে শিবনাথবাবু কোনও কোনও সময় উত্তেজনাও বোধ করছেন। আলু, পটল, শিম, বেগুনের মতো অতি সামান্য জিনিসের ভেতর যে এত বড় বড় সব ক্ষমতা ঘাপটি মেরে আছে কে জানত! এইজন্যই বোধহয় কার মধ্যে কী লুকিয়ে আছে কে বলতে পারে? বেগুনে বাত কমে, শিমের ভেতর আছে অম্বলের যম, ঝিঙেতে মাথা ধরা পালায়! বাপ রে!

একটু আগে শিবনাথবাবু শুরু করেছিলেন বরবটি বিষয়ক পরিচ্ছেদটি। সর্দি কাশির দাওয়াই বানানোর কায়দাকানুন শেখবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ মন দিতে পারলেন না। বই বন্ধ করলেন।

বৃষ্টি কি ধরল?

জানলা বন্ধ। বাইরেটা দেখা যাচ্ছে না। জানলার মোটা, ঘষা কাচের ওপাশে খানিক আগে পর্যন্ত বড় বড় জলের ফোঁটা পড়েছে। মোটা কাচের ওপর জলের ফোঁটা কেমন যেন ঘোলাটে লাগে। মনে হয় রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে। এখন কিছুই দেখা যাচ্ছে না। শুধুই অন্ধকার। বৃষ্টি বাড়ল না কমল বোঝা মুশকিল।

বিকেল থেকেই শিবনাথবাবুর টেনশনের মতো হচ্ছে। বড় কিছু নয়, চাপা টেনশন। শরীরের মধ্যে একটা অস্বস্তি। অম্বলের ভাব হলে অনেক সময় এরকম অস্বস্তি হয়। সমস্যাটা ঠিক কোথায় বোঝা যায় না, শুধু কিছু একটা হচ্ছে বোঝা যায়। এখন অবশ্য অম্বলের ব্যাপার নেই। অন্য ব্যাপার। দুশ্চিন্তা হচ্ছে। পারবেন তো? এই বুড়ো বয়েসে পারবেন তো? নিজে করা তো দূরের কথা, কেউ করছে এমনটাও চোখে দেখেননি কখনও।

ছেলেটা অবশ্য বলেছে, চিন্তার কিছু নেই, করে দেবে। কী যেন নাম ছেলেটার? প্রশান্ত? তপন? কল্যাণ? এই রে, নাম ভুলে গেলে সমস্যা। ওই ছেলে এখন ভরসা। যার ওপর ভরসা করতে হবে তার নাম ভুলে যাওয়া বিচ্ছিরি ব্যাপার। বাসবী শুনলে রেগে যাবে।

'একটা কাজ যদি ঠিক করে করো।'

'করলাম তো। বিকেলে গিয়েই তো কথা টথা সব বলে এলাম। সত্যি, খরচ তোমার কমই।'

'তোমার তো ওটাই মুশকিল। বেশি কথা বলো। বেশি কথা বলো বলে কাজের কথা ভুলে যাও।'

'কাজের কথা কিছু ভুলিনি বাসবী। শুধু নামটা ভুলে গেছি।'

অবধারিতভাবে এইসময় বাসবী ধমক দেবে।

'থামো, চুপ করো। একদম চুপ করো তো।'

শিবনাথবাবু নাম মনে করার চেষ্টা করলেন। মনে পড়ছে না। খানিকটা অস্থির মনেই জানলার দিকে তাকালেন ফের। অন্ধকার। অন্ধকারের এই এক খারাপ স্বভাব। টেনশন বাড়িয়ে দেয়।

বৃষ্টির কী অবস্থা?

দেখতে পারলে হত। তবে বৃষ্টি বোঝার জন্য সবসময় চোখে দেখতে হয় না। আওয়াজ শুনলেও হয়। একেকটা বৃষ্টির একেকটা রকম আওয়াজ। শুধু জোর বা হালকা নয়, বৃষ্টির আওয়াজ সময়ের সঙ্গেও বদলায়। একই বৃষ্টি দিনের বেলায় যে আওয়াজ করে, রাতে তা করে না। তখন তার আওয়াজ হয় অন্যরকম। রাত যত গভীর হয় সেই আওয়াজ ঘন হয়ে আসে। হয়তো কোনও একসময় বৃষ্টি থেমে যায়, কিন্তু আওয়াজ থামতে চায় না। মাথার ভেতর চলতেই থাকে।

জানলাটা খুলবেন? শিবনাথবাবুর সাহস হচ্ছে না। বাসবীদেবী জানতে পারলে রাগারাগি করতে পারে। করাটাই স্বাভাবিক। সন্ধের পর থেকে শিবনাথবাবু কতবার যে জানলা খুলে বৃষ্টি দেখেছেন তার ঠিক নেই। কয়েকবার তো জলের ঝাপটায় ঘর ভেসে গেল।

অঞ্জলি প্রথমবার কিছু বলেনি। সে ছিল পাশের ঘরে। বাসবীর কাছে বসে টিভি দেখছিল। ডাক দিতে ন্যাতা বালতি এনে নিঃশব্দে ঘর মুছে আবার টিভি দেখতে চলে যায়। আর পাঁচটা কাজের লোকের মতো অঞ্জলিরও খুব টিভির নেশা। বারবার উঠতে হলে বিরক্ত হয়। দ্বিতীয়বার ডাক দেওয়ায় সে যতটা না বিরক্ত হল তার থেকে অবাক হল বেশি। এমনিতেই মেয়েটার চোখদুটো বড়। অবাক হলে সেই চোখ আরও বড় হয়ে যায়। সেই বড় বড় চোখ তুলে বলল, 'দাদু, এটা আপনি কী করেন! জানলা খুলে বারে বারে ঘর ভাসান কেন?'

শিবনাথবাবু চাপা গলায় বললেন, 'আমি কি ইচ্ছে করে ভাসাই?'

অঞ্জলি শান্তভাবে বলল, 'আমার তো তাই মনে হয়। ইচ্ছে করেই ভাসান। নইলে বৃষ্টি কি নিজে জানলায় টোকা মেরে বলল, একটু জানলাটা খোলেন তো, খুলে একটা গামছা দেন, ভিজে মাথাটা মুছি?'

কাজের লোকেদের নিয়ম হল, বেজার মুখে থাকতে হবে। যেন সবসময়েই বিরক্তি। কিন্তু অঞ্জলির বেলায় নিয়ম উলটো। তার হাসির রোগ আছে। সেই হাসি শুনলে কোনও কোনও সময় রাগে মাথা ঝনঝন করে। ইচ্ছে করে জোরে একটা ধমক দিই। অনেক সময় ধমক দিতেও হয়। কিন্তু এখন অসুবিধে আছে। বাসবী শুনতে পাবে। ঘরে জল ঢোকার ঘটনাও জানবে। বাসবী আজকাল চেঁচামেচি শুরু করলে চট করে থামতে চায় না। এই বাষট্টি বছর বয়সেও ছেলেমানুষের মতো হয়ে যায়। দোষের কিছু নয়। একা থাকলে কতরকম সমস্যা হয়। কাঁহাতক বুড়ো স্বামীর মুখ আর টিভির পরদা দেখা সম্ভব? এতে মেজাজে গোলমাল হতে বাধ্য।

অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে শিবনাথবাবু মুখে আঙুল দিলেন। বললেন, 'চুপ কর। চুপ কর। তোর দিদা শুনতে পাবে।'

'শুনতে পেলেই ভাল। আপনে যা শুরু করেছেন তাতে একটা বকা খাওয়া দরকার। হি হি। আমরা ঘরে জল ফেললে মা কানমলা দেয়। দিদা যদি... হি হি।'

শিবনাথবাবু হিসহিসে গলায় ধমক দিয়ে বললেন, 'ফাজিল মেয়ে আবার হাসে? চুপ কর বলছি। তুই বরং একটা কাপড় দে, আমি নিজেই মুছে দিচ্ছি। যা তোকে কিছু করতে হবে না।'

অঞ্জলি আবার ন্যাতা নিয়ে আসে। জল মুছতে মুছতে বলে, 'জল মোছাটা বড় কথা নয়, বড় কথা হল, সন্ধের পর ন্যাতা বালতি ধরা ঠিক নয় দাদু। শলিলে পাপ লাগে।'

কিশোরীটির কথায় শিবনাথবাবু অবাক হন। যে বাড়ির ছেলে আমেরিকার মতো একটা দেশে মাস্টারি করছে সে বাড়ির কাজের মেয়ের মুখে এসব কী কথা! ছি ছি। তাও সূর্য যদি কোনও হাবিজাবি বিষয়ের মাস্টার হত। কিন্তু তা তো নয়। সূর্যর বিষয় হল জেনেটিক্স। জেনেটিক্স একটা জটিল এবং আধুনিক বিষয়। শহর থেকে খানিক দূরে তার কলেজ। ক্লাসরুম থেকে একই সঙ্গে পাহাড় এবং লেক দেখা যায়। বরফ পড়লে সেই লেকে কলেজের মাস্টার এবং ছাত্রছাত্রীরা স্কি করে। স্কি কোনও সহজ ব্যাপার নয়, যথেষ্ট কঠিন একটা জিনিস। ব্যালান্স আর মনোসংযোগ না থাকলে এ জিনিস করা যায় না। সূর্যর মতো ছেলেও একবার বরফে পা হড়কে পড়ল। বাঁ হাতের কনুইতে লাগল চোট। বেশি নয়, অল্প চোট। কিন্তু তাতেই ছোটখাটো চেহারার সুন্দরমতো এক ছাত্রী ছুটে এসে সূর্যকে ধরে নিয়ে গেল কলেজের মেডিকেল রুমে। প্রথমে বরফ ঘষে, ওষুধ স্প্রে করে ব্যথা কমায়, তারপর নিজের হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। ঢাউস ব্যান্ডেজ। কাঁধ থেকে একেবারে কবজি পর্যন্ত। সূর্য বারবার তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে, এত কিছুর দরকার নেই। সামান্য লেগেছে মাত্র। একটু পরে নিজে থেকে ঠিক হয়ে যাবে। সেই মেয়ে কোনও কথাই শুনল না। উলটে নিজের মাথার স্কার্ফ খুলে সূর্যর হাত গলার সঙ্গে ঝুলিয়ে দেয়।

ছোটখাটো এই মেয়েটির নাম সুচিয়ং। বাড়ি বেজিং শহরের পশ্চিমপ্রান্তে। স্কলারশিপ নিয়ে সূর্যদের কলেজে পড়তে এসেছে মাত্র দু'বছর। এক সপ্তাহের মাথায়, সূর্য সুচিয়ংকে বিয়ে করে ফেলে এবং 'সুচি, সুচি' বলে ডাকতে শুরু করে। তাদের বিয়ের ফটোও চলে আসে দ্রুত। ফটোতে দেখা গেল, সূর্য এবং সুচি পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। সূর্যর হাতে ব্যান্ডেজ।

গোলাপি স্কার্ফ দিয়ে সেই ব্যান্ডেজ বাঁধা হাত ঝুলছে গলা থেকে। বোকা বোকা মুখে সূর্য হাসছে।

বাসবীদেবী ফটো সরিয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, 'এই স্কার্ফ তোমার ছেলে কতদিন গলায় ঝুলিয়ে রাখবে বলে মনে হয়?'

ছেলের বিয়ের খবরে খুবই খুশি হয়েছিলেন শিবনাথবাবু। একমাত্র ছেলে বলে কথা। তার বিয়েতে বাবা খুশি হবে না তো কে হবে? তা ছাড়া একটা বলার মতো বিয়ে করেছে হারামজাদা। জনে জনে গল্প করার মতো। পুত্রবধূ অনেকেরই আছে। ফরসা, কালো, রোগা, মোটা অনেকরকম। কিন্তু চিনা পুত্রবধূ কার আছে? অন্তত চেনা জানা কারও নেই। তিনি গদগদ গলায় স্ত্রীকে বললেন, 'সে তোমার ছেলের বউকে জিজ্ঞেস করো না।'

বাসবীদেবী আরও গম্ভীর হয়ে গেছেন। বললেন, 'কী করে করব? ওই মেয়ে ইংরেজিও নাকি ভাল জানে না। পরশু টেলিফোনে সূর্য বলল, সে চিনা ভাষা শিখছে। এই কারণে দশদিন কলেজ ছুটিও নিয়েছে। এই দশদিন সে ফোন করতে পারবে না।'

শিবনাথবাবু হেসে বললেন, 'না পারুক। দশ কেন, সেরকম হলে একমাস ফোন করতে হবে না। চিনা ভাষা সহজ কিছু নয়। খুবই কঠিন। তবে তোমার ছেলের মাথাটা পরিষ্কার কিনা, সেটা একটা নিশ্চিন্তি। মনে হয় না তার পক্ষে ভাষা শিক্ষায় খুব বেশি সময় লাগবে। তা ছাড়া পাশে স্ত্রী আছে। স্ত্রী থাকলে কঠিন কাজে সময় বেশি লাগে না। কী বলো?'

কথা শেষ করে শিবনাথবাবু বোকার মতো হাসলেন।

বাসবীদেবী সেদিকে তাকালেন না। ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'না লাগলেই ভাল। অন্তত মেয়েটাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে হাতের স্কার্ফটা তো খুলতে হবে। তার জন্যও তো ভাষাটা জানা দরকার।'

এসব যাই হোক, যে বাড়ির ছেলে সুদূর প্রবাসে জেনেটিক্সের মতো জটিল বিষয় নিয়ে মাস্টারি করে এবং স্কি করতে গিয়ে চিনা কন্যাকে বিয়ে করে ফেলে সে বাড়িতে অনেক কিছুর জায়গা থাকতে পারে, কিন্তু কুসংস্কারের কোনও জায়গা নেই। অন্য সকলের মতো কাজের লোকেরও সেটা জানা উচিত।

শিবনাথবাবু অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ছিঃ এসব আবার কী কথা! কে তোমাকে এসব আজেবাজে কথা শেখাল অঞ্জলি? পাপ পুণ্য আবার কী? আর যদি বা থাকে তার সঙ্গে সকাল বিকেলের কোনও সম্পর্ক নেই। সকালে যেটা খারাপ, বিকেলেও সেটা খারাপ।'

শিবনাথবাবু মাথা নাড়তে নাড়তে গম্ভীরমুখে বলতে লাগলেন। তাঁর গলায় একটা মাস্টার মাস্টার ভাব। এটা তাঁর আগে ছিল না, ইদানীং হয়েছে। কোনও কোনও সময় কথার ধরন শুনলে মনে হচ্ছে মানুষটা কোনও কলেজের শিক্ষক। ছোটখাটো কলেজ নয়, হোমরা চোমরা বড় ধরনের কলেজ। তিনি সেই কলেজের টিচার্সরুমে বসে বিগ ব্যাঙ অথবা জীবকোষের গঠন সংক্রান্ত ভারী কোনও বিষয় নিয়ে হালকা মনে গল্প করছেন। ছেলের কাছ থেকে শুনেছেন, বড় জায়গার নিয়মই নাকি এরকম। গল্পের বিষয় যত ভারী হয়, মন তত হালকা হতে থাকে। অথচ সারা জন্ম মাস্টারির এক মাইলের মধ্যে দিয়েও হাঁটেননি

শিবনাথবাবু। এমনকী বেকার অবস্থায় টিউশনিও নয়। ছ'বছর আগে সরকারের সার্বিক স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে অবসর নিয়েছেন আপার ডিভিশন ক্লার্ক হিসেবে। সার্বিক স্বাস্থ্য বিভাগে থাকার কারণে খাটা পায়খানা উচ্ছেদ থেকে শুরু করে বোরিক তুলোর হিসেব রাখা পর্যন্ত অনেক কাজই করতে হয়েছে, কিন্তু মাস্টারি করতে হয়নি। ক্লাস ফোরের পর নিজের একমাত্র ছেলেটিকেও পড়াতে হয়নি। সে দায়িত্ব ছিল বাসবীর। তা হলে? তা হলে এই বুড়ো বয়েসে এরকম হচ্ছে কেন? অনেক সময় ছেলে বাবার মতো হাবভাব, ধরনধারণ করে। বাবা কি কখনও ছেলের মতো করতে চায়?

এটা ঠিক নয়। শিবনাথবাবু সতর্ক হলেন।

অঞ্জলি ফ্রক সামলে মেঝের জল মুছতে মুছতে বলল, 'সবকিছু শেখাতে লাগে না দাদু। গরিব মানুষ নিজে নিজেই শেখে। এই যে আমি ঘর মুছি, কাপড় কাচি, কোথায় শিখেছি? কাপড় কাচার ইস্কুলে?'

'ঠিক আছে তোকে পাকা পাকা কথা বলতে হবে না। তাড়াতাড়ি কর। হাতে সময় নেই।'

অঞ্জলিকে বহুবারই এই কথা বলা হয়েছে। সে শোনেনি। পাকা কথা বলা তার অভ্যেস। শুধু কথা নয়, মাঝেমধ্যে পাকাদের মতো কাজও করে। তার মধ্যে কোনও কোনওটা তো অতি মারাত্মক। এবারের শীতেই এরকম একটা কাণ্ড করেছিল।

জানুয়ারির শুরুতে সূর্য আর সুচি এককাঁড়ি চকোলেট পাঠাল। এই ওদের এক স্বভাব। চেনা, অল্প চেনা, এমনকী অচেনা কেউ কলকাতা যাচ্ছে খবর পেলেই হল। অমনি বুড়ো-বুড়ির জন্য তার হাতে গাদাখানেক চকোলেট ধরিয়ে দেবে। চকোলেট ধরাতে একবার তো স্বামী স্ত্রী মিলে ম্যানহাটন এয়ারপোর্ট পর্যন্ত গাড়ি ছুটিয়ে এসেছিল।

ছেলে, ছেলে বউয়ের এই চকোলেট কাণ্ডে বাসবীদেবী বেশ খুশিই হন। তবু মিথ্যে বিরক্তি দেখিয়ে তিনি স্বামীকে বলেন, 'বলো তো কাণ্ড, এত চকোলেট এখন খাবেটা কে? আগেরবারের গুলোই তো গাদাগুচ্ছের পড়ে আছে। এই নড়বড়ে দাঁতে এসব জিনিস কি চিবোনো যায় না চিবোনো মানায়?'

শিবনাথবাবু হেসে বললেন, 'শুধু দাঁত বলেছ কেন বাসবী? সুগারের ভয় নেই? আমি বাবা দুটোর বেশি খাচ্ছি না।'

বাসবীদেবী মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'আমি কিন্তু এবার সূর্যকে বারণ করে দেব। এ আবার কীরকম আদিখ্যেতা। বাড়িতে একটা বাচ্চা কাচ্চা থাকলে কথা ছিল। নাতি নাতনি নিয়ে যে ঘর করব সে ভাগ্য তো আর হল না। বিস্কুট লজেন্স নিয়ে ঘর করে কী লাভ?'

শিবনাথবাবু দু'বার গলা খাঁকারি দেন। হাসিমুখে বললেন, 'আহা, আদিখ্যেতা বলছ কেন বাসবী? বাবা মাকে কিছু দেওয়া কি আদিখ্যেতা হল? সন্দেশ রসগোল্লার মতো ধরোই না। ওদেশে তো আর সন্দেশ রসগোল্লা পাওয়া যায় না। তাই... হা হা।'

রসিকতা খুবই নিম্নমানের। তবু কথাটা বলে শিবনাথবাবু শব্দ করে হাসতে লাগলেন। বাসবীদেবীর ইচ্ছে হল চাপা ধমক দিয়ে স্বামীর হাসি থামিয়ে দেন। কিন্তু এখন এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই। এখন মাথা ঘামাতে হবে চকোলেট নিয়ে। এগুলোর গতি কী হবে? সত্যি এদিক ওদিক বিলিয়েও সেবার চকোলেট শেষ হল না।

শিবনাথবাবু রাতে শোওয়ার আগে ফ্যানের রেগুলেটর কমাতে কমাতে বললেন, 'অঞ্জলিকে ক'টা দিয়ে দাও না। ওর তো শুনেছি ভাই-টাই কারা সব আছে। আছে না?'

বাসবীদেবী ঝাঁঝিয়ে বললেন, 'বোকার মতো কথা বোলো না তো। বয়স যত বাড়ছে, বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাচ্ছে তোমার। কাজের লোককে এই জিনিস দেব! অ্যাঁ! বলছ কী! হুট করে এমন এক-একটা কথা বলো না, ওই মেয়ে তো একেবারে ঘাড়ে চেপে বসবে।'

শিবনাথবাবু বুঝলেন কথাটা বলা ঠিক হয়নি। বোকার মতো হয়ে গেছে। বাসবী মিথ্যে বলছে না। বয়স যত বাড়ছে কথাবার্তায় বোকা ভাবও বাড়ছে। এটা ঠিক নয়, কন্ট্রোল করতে হবে। কথায় বোকাভাব কন্ট্রোল করবার উপায় কী? ফ্যানের রেগুলেটরের মতো যদি কোনও যন্ত্র থাকত ভাল হত।

'না না তা হলে ছেড়ে দাও। ঘাড়ে যখন উঠবে বলছ তখন দিয়ে কাজ নেই। তা ছাড়া এমনি চকোলেট লজেন্স হলে একটা কথা ছিল। এ একেবারে বাইরের জিনিস। কে জানে বাবা, বাইরের জিনিস পেলে ওই মেয়ে হয়তো ঘাড়ের বদলে তোমার মাথাতেই উঠে বসবে।'

বাসবীদেবী মশারির ভেতর থেকেই স্বামীর দিকে তাকালেন। একটা সময় ছিল যখন মশারির কাপড় হত ঘন। ভেতরে মানুষকে দেখাত ছায়া ছায়া, ভূতের মতো। অনেকদিন হয়ে গেল সে অবস্থা আর নেই। এখন মশারি খুবই স্বচ্ছ। পাতলা, ফিনফিনে। ভেতরের মানুষ তো দূরের কথা, স্ত্রীর রেগে যাওয়া পাকানো চোখও স্পষ্ট দেখা যায়। শিবনাথবাবুও দেখতে পেলেন। পেয়ে চুপ করে গেলেন।

পরদিন সকালে বাসবীদেবী একটা ঠোঙা অঞ্জলির হাতে দিয়ে বললেন, 'নে, বাড়ি নিয়ে যা। সবাইকে দিস। বলবি দাদাবাবু পাঠিয়েছে। বিদেশি। কম পড়লে আমায় বলে আরও ক'টা নিয়ে যাস। অসুবিধে কিছু নেই, আরও আছে। তবে বলে নিবি। না বলে জিনিস নেওয়া আমি পছন্দ করি না। তোর দাদাবাবু যখন ছোট ছিল কখনও আমায় না বলে কিছু নিত না। আমি বাড়ি না থাকলে অপেক্ষা করত। ফিরলে জিজ্ঞেস করত। আমি হ্যাঁ বললে হ্যাঁ, না বললে না। মনে রাখবি অঞ্জলি, এমনি এমনি আমার ছেলে হিরের টুকরো হয়নি। লেখাপড়ার পাশাপাশি আরও অনেক গুণ আছে তার।'

এ বাড়ির ছেলের প্রশংসা শুনে শুনে অঞ্জলি অভ্যস্ত। এই সময়টায় সে মুখ ফিরিয়ে নিজের কাজ করে। মুখ ফেরানো অবস্থাতেই ঠোঙা নিল সে। তবে পরদিনই সেই ঠোঙা ফিরিয়ে আনল! ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'ইস মাগো, এ আবার মানুষে খায়? তিতা। বিষ তিতা। ভাই তো মুখে দিয়েই থু দিল। সেই থু পড়ল ঘরের মেঝেতে। মা ভাইয়ের পিঠে ক'টা কিল দিল, তারপর ঠোঙা টান মেরে ফেললে উঠানে। আমি তুলে আনছি। নিন, আপনে রেখে দিন দিদা। এ জিনিস আমাদের চলবে না। আপনার হিরের টুকরো ফিরলে হাতে ধরিয়ে দেবেন।'

কাজের মেয়ের হাত থেকে ম্যানহাটনের চকোলেট ফিরিয়ে নেওয়া একটা ভয়ংকর অপমানের ব্যাপার। তার ওপর আবার ছেলের পাঠানো চকোলেট। কাজের চাপে যে ছেলে গত পাঁচ বছর বাপ-মায়ের কাছে আসতে পারেনি, সে চকোলেট কেন, চকোলেটের মোড়ক পাঠালেও মাথায় তুলে রাখা উচিত। তার বদলে এ কী কাণ্ড!

বাসবীদেবী নিজেকে অনেক কষ্টে সামলালেন। শান্ত গলায় বললেন, 'বাইরের মিষ্টি জিনিস প্রথমে একটু তেতোই হয় অঞ্জলি। তবে তেতো ভাব কাটতে সময় লাগে না। এসব ভাল জিনিস খাওয়া একটা অভ্যেসের ব্যাপার।'

অঞ্জলি ঘরের কোনায় ছেড়ে রাখা বাসি কাপড় তুলতে তুলতে বলল, 'ভালই তো, ক্ষতি কী? কোনও ক্ষতি নাই। অভ্যেস করেন, যত খুশি অভ্যেস করেন। দাদু আর আপনে বসে বসে নিমপাতা আর উচ্ছে চিবিয়ে দাদাবাবুর লঞ্জেচুস খাওয়ার অভ্যেস করেন। বলেন তো দুটো করলাও ধুয়ে দিই। হি হি। করলার লঞ্জেচুস। হি হি।'

এই পাকামি এবং গা জ্বালানো হাসির পর সামান্য কাজের মেয়েকে বরখাস্ত করাটা কোনও অপরাধ নয়। এমনকী শাস্তি হিসেবে ছাড়িয়ে দেওয়ার পর ভাঙা মাসের মাইনে নিয়ে বেশ ক'দিন ঘোরালেও বলবার কিছু থাকে না। কিন্তু তা করা যাবে না। পাকামি এবং গা জ্বালানো হাসি বাদ দিলে এই মেয়ের সবটুকু ভাল। এমনি ভাল নয়, অতিরিক্ত ভাল। একা বাড়িতে পড়ে থাকা এই বুড়ো বুড়ির সেবা যত্নে কিশোরীটির কোনও খুঁত নেই। বরং বেশি নজর রয়েছে। ঝড় বৃষ্টিতে কামাই নেই। জ্বর জারি হলেও গায়ে চাদর জড়িয়ে চলে আসে। এসে বলে, 'আজ আর কাচাকাচি করব না। শীত শীত লাগে।'

'শীত লাগে তো এলি কেন? নিশ্চয় জ্বর হয়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে গায়ে চাদর দিয়েছিস যে বড়।'

'নতুন চাদর দেখাতে গায়ে দিয়েছি দিদা। শীত আসতে কত দেরি, চাদর ততদিনে পুরনো হয়ে যাবে না?'

রাতে দুধটুকু পর্যন্ত কাপে কাপে ঢেলে রাখে। বাড়ি যাওয়ার আগে বলে, 'খেয়ে নেবেন। না খেয়ে মরলে বিপদ আছে। তখন রোগাভূত হয়ে দুধ চুরি করে খেতে হবে।'

এই মেয়ের পাকামো আর গা জ্বালানো হাসি সহ্য না করে উপায় কী?

অঞ্জলি ঘর মুছে বেরিয়ে গেলে শিবনাথবাবু কান পেতে আওয়াজ শোনার চেষ্টা করলেন। জল পড়ছে। ছর ছর, ছর ছর। কোথা থেকে পড়ছে? এটা একটা ভাল লক্ষণ। ছাদ বা কার্নিশ থেকে জল পড়ার আওয়াজ মানে বৃষ্টি ধরে এসেছে। ভেরি গুড।

অন্যদিন বিকেলের ভ্রমণ সেরে এসেই হাতের ঘড়ি খুলে ফেলেন শিবনাথবাবু। আজ খোলেননি। হাতে ধরে রাখা 'তরিতরকারির রহস্য' টেবিলে রেখে কবজি উলটে সময় দেখলেন। দশটা বেজে সাত মিনিট। ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ালেন। এবার তৈরি হতে হয়। তৈরি হওয়ার কিছু নেই, চট করে ধুতি পাঞ্জাবিটা পরে ফেলা। হালকা দেখে একটা চাদর নিতে হবে নাকি? বৃষ্টির জন্য নিশ্চয় বাইরে ঠান্ডা ঠান্ডা থাকবে। না থাকলেও প্রিকশান নেওয়া উচিত। বাড়িতে বুড়ো বুড়ি একা মানুষ, অসুখ বিসুখ যত কম হয় তত মঙ্গল। বাসবী কোথায় গেল? এখনও টিভি দেখছে? এরপর কিন্তু দেরি হয়ে যাবে। বাসবীর অনেক রাত পর্যন্ত টিভি দেখার নেশা। চ্যানেল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বিদেশের ছবি খোঁজে। বরফ পড়ছে, গাড়ি ছুটছে, ঝলমলে রাস্তা, বড় বড় বাড়ি এইসব। কোনও কোনও সময় আবার ছেলেমানুষের মতো উত্তেজিত হয়ে পড়ে।

'দেখো, দেখো একেবারে ওদের কিচেনের মতো না? ফ্রিজের ঠিক পাশে

মাইক্রোওভেন। মাথার ওপর মশলাপাতির সেল্‌ফ। ওদিকটা সবজি কাটার টেবিল। গ্রাইন্ডার, মিক্সার। রংটা আলাদা হলেও টেবিলটা কিন্তু সূর্যদের মতোই চওড়া। চওড়া নয়। কী গো চুপ করে আছ কেন?'

শিবনাথবাবু তখন খাটে। উলটো মুখে শোওয়া। টিভি দেখতে পাচ্ছেন না। টেবিল চওড়া না সরু জানেন না।

'তুমি এমনভাবে বলছ যেন সাতবার ওদের রান্নাঘর থেকে ঘুরে এসেছ। সাতবার তো দূরের কথা, এত বছরে একবারও তো হল না।'

বাসবীদেবী ঝাঁঝিয়ে ওঠেন। বলেন, 'ওমা, এ আবার কী কথা! ঘর চিনতে ওখানে যাওয়ার কী আছে? ওরা ছবি পাঠায়নি? সুচি তো ফ্ল্যাট বদলালে আগে ছবি পাঠায়। বেডরুম, কিচেন, ব্যালকনি কোনটা পাঠায় না? বলো কোনটা পাঠায় না? ভারী লক্ষ্মী মেয়ে। মনে করে করে সব পাঠায়। একবার বাথরুমের ছবি পর্যন্ত পাঠিয়েছিল। মনে নেই আমরা খুব হাসলাম? এর মধ্যে সব ভুলে গেলে? যত বুড়ো হচ্ছ তত তোমার মাথাটা যাচ্ছে।'

শিবনাথবাবু মুখ ঘুরিয়ে বললেন, 'আহা চটছ কেন? আসলে কী জানো, কোথায় যেন শুনেছিলাম, বিদেশের রান্নাঘর হল মারাত্মক জিনিস। ডলারের থেকেও মারাত্মক। মেয়েরা ডলার ছেড়েও ফিরে আসতে পারে, কিন্তু অমন চকচকে রান্নাঘর ছেড়ে আসতে পারে না। ভাবতে পারো রান্নাঘরে একটা আরশোলা নেই! আমার কী মনে হয় জানো বাসবী? এই যে তোমার ছেলে আর ছেলের বউ এখানে আসতে পারে না তার প্রধান কারণ...।'

এবার বাসবীদেবী ধমক দেন। জোর ধমক নয়, রাত বেশি বলে চাপা ধমক। ভুরু কুঁচকে বলেন, 'চুপ করো। একদম চুপ করো। এটা ক্লাসরুম নয়, আর আমিও তোমার ছাত্রী নই যে যা খুশি বকবে। ক'দিন ধরে লক্ষ করেছি তোমার মধ্যে একটা বোকা মাস্টার ধরনের ভাব এসেছে। পারলেই লেকচার দিচ্ছ। ব্যাপার কী বলো তো?'

শিবনাথবাবু খানিকটা আপনমনেই বিড়বিড় করেন। বলেন, 'আমারও মনে হচ্ছে, তবে কারণটা ঠিক ধরতে পারছি না বাসবী।'

শাড়ি পরে বাসবীদেবী তৈরি হয়েই আছেন। শুধু চুলটা একটু আঁচড়ে নিলেই হবে। এত রাতে সেটুকু না করলেও হয়। কে দেখবে? তার ওপর বৃষ্টি বাদলার দিন। ইস, বৃষ্টির আর সময় পেল না। তিনি টিভির দিকে তাকিয়ে আছেন বটে কিন্তু সেদিকে মন নেই। স্বামী পাশে এসে দাঁড়াতে মুখ তুললেন।

'এমা এটা কী পরেছ? ইস্তিরি করা পাঞ্জাবিটা তো বের করে রেখেছি।'

শিবনাথবাবু বুকের বোতাম লাগাতে লাগাতে বললেন, 'এই জল কাদায় কাচা জিনিস পরে কী হবে? তোমার ছেলের ওখান থেকে তো আর কাচিয়ে আনা যাবে না।'

আবার নিম্নমানের রসিকতা। অন্যদিন হলে এই রসিকতা শুনে বাসবীদেবী স্বামীকে ধমক দিতেন। এটা তাঁকে প্রায়ই করতে হয়। এতদিন হয়ে গেল, তবু মানুষটার ভেতর থেকে পুরনো দিনের ছাপোষা কেরানিটি মাঝেমধ্যেই শামুকের মতো মুখ বের করে ফেলে। বোকার মতো আচরণ করে, বোকার মতো কথা বলে। তখন সূর্যর কথা মনে থাকে না। আরে বাবা, তুমি না হও তোমার ছেলে তো বড় মানুষ। কথা বলার সময় এইটা

মাথায় থাকবে না? বাধ্য হয়ে ধমক দিতে হয়। ধমক দিয়ে শামুকটা খোলের মধ্যে ঢোকাতে হয়।

তবে বাসবীদেবী আজ কিছু বললেন না। বোঝাই যাচ্ছে মানুষটা টেনশনের মধ্যে আছে। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এই বয়েসে পৌঁছে যদি এমন একটা কাজ করতে হয় যার মাথা মুন্ডু কিছুই জানেন না, বোঝেন না, টেনশন তো হবেই। মনের এই অবস্থা সামলাতে নিম্নমানের রসিকতা করে ফেলাটা কিছু দোষের নয়।

বাসবীদেবী নিজেও চিন্তিত। তাঁরও ভয় ভয় করছে। গম্ভীর মুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। পাশে মেঝেতে বসা অঞ্জলির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অ্যাই মেয়ে, ঘুমিয়ে পড়বি না কিন্তু। টিভি দেখ। কী বলেছি মনে আছে? বেল বাজালেই দরজা খুলবি না, আগে আমাদের গলা শুনবি তারপর খুলবি। মনে থাকবে?'

মুখে রাতদিনের কাজের লোক বলা হলেও অঞ্জলি এ বাড়িতে রাতে থাকে না। শুধু বুড়ো বুড়ির অসুখ বিসুখ হলে অন্য কথা। তখন তাকে জোর করেও বাড়ি পাঠানো যাবে না। আজ কারও অসুখ হয়নি, তবু তাকে রাতে থাকতে হবে। উপায় কী? আজ শিবনাথবাবু, বাসবীদেবী কখন ফিরবেন ঠিক নেই। তাড়াতাড়ি ফিরলেও এই ছোট মফস্‌সল শহরে তখন সেটা হবে অনেক রাত। ওইসময় একটা কিশোরী মেয়ে একা একা খালের পাড়ে বাড়ি ফিরতে পারে না। আর এই বাড়িতে এমন কোনও জোয়ান পুরুষ মানুষ নেই যে তাকে পাহারা দিয়ে এগিয়ে আসবে। অগত্যা আজ রাত তাকে এখানেই কাটাতে হচ্ছে।

বাসবীদেবী মাথায় দ্রুত চিরুনি বোলাতে বোলাতে বললেন, 'কী রে মনে আছে তো? আমাদের গলা শুনে দরজা খুলবি।'

অঞ্জলি টিভির থেকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'দিদা, তোমাদের গলা যদি কেউ নকল করে? শুনেছি চোর ডাকাতে খুব নকল করতে পারে। একবার কাঁচরাপাড়ায় আমার মামিমার ঘরে মামার গলা নকল করে চোর ঢুকে পড়েছিল। তারপর কী কাণ্ড গো! হি হি। বাইরে থেকে সবাই বলে, অ্যাই দরজা খোল, দরজা খোল। চোরটা অমনি মামার গলা নকল করে... হি হি...।'

বাসবীদেবীর খুব ইচ্ছে করল দু' পা এগিয়ে অঞ্জলির গালে একটা চড় লাগান। দাঁতের একটা পাটি খুলে পড়ে যাক এবং মেয়েটার হাসি বন্ধ হোক। অতি কষ্টে বাসবীদেবী নিজেকে সামলালেন। এখন মারধর তো দূরের কথা, বকাঝকার সময়ও নয়। স্বামীর দিকে ফিরে বললেন, 'হ্যাঁগো ওরা দোকান খুলে রাখবে তো।'

শিবনাথবাবু বেতের চেয়ারে বসে জুতো পরছেন। প্রথমে চামড়ার জুতোটা পায়ে গলিয়েছিলেন। এখন সেটা খুলে রবারের স্যান্ডাক পরছেন। সম্ভবত জুতোটায় কোনও গোলমাল হয়েছে। নইলে ফিতে আটকাতে সমস্যা করছে কেন? বৃদ্ধ বয়েসে পা বাড়ল না তো?

'দোকান নয় বাসবী, একে বলে সাইবার কাফে। কম্পিউটার নিয়ে কারবার।'

'ওই হল। আমি বাবা ওসব চা কফি বুঝি না। দোকানে ঠিকমতো বলে রেখেছ তো? তোমার যা ব্যাপার। হয়তো গিয়ে দেখব, ঝাঁপ ফেলে পালিয়েছে।'

'পালাতে পারে। তবে আমি বিকেলেই বলে এসেছি। ছেলেটা মিত্তিরের ভাইপো। ওরই বিজনেস। কলকাতা থেকে ক'টা কম্পিউটার এনে বসিয়েছে। আমাকে তো খুব খাতির যত্ন করল।'

শিবনাথবাবু ইচ্ছে করেই নামের মধ্যে গেলেন না। নাম এখনও মনে পড়েনি। চোখে দেখলে হয়তো মনে পড়ে যাবে। অনেকসময় এটা হয়। চোখের আড়ালে থাকলে মনে থাকে না। 'আউট অব সাইট আউট অব মাইন্ড' কথাটা কি আর এমনি এমনি হয়েছে? তবে কথাটা সবসময় সত্যি হলেও নিজের সন্তানের বেলাতে নয়। এই যে সূর্য এতদিন চোখের বাইরে, সে কি আর মন থেকে মুছে যাচ্ছে? একেবারেই নয়, মোটেই নয়। বরং আরও বেশি বেশি করে চেপে বসছে।

চটি গলাতে গলাতে বাসবীদেবী খুব বিরক্তি নিয়ে বললেন, 'রাখো তোমার খাতির যত্ন। আমার সব জানা আছে। এই জল ঝড় মাড়িয়ে গিয়ে কী দেখব কে জানে। উফ কী যে ঝামেলায় পড়লাম। এই বয়েসে নতুন করে এসব হয়?'

কথাটা ঠিক নয়, ওই ছেলে সত্যি সত্যি শিবনাথবাবুকে খাতির করেছে। টুল এনে বসতে দিয়েছে। বলেছে, 'মেসোমশাই কোনও চিন্তা নেই। আপনি মাসিমাকে নিয়ে শুধু চলে আসুন। আমেরিকা কেন, সেরকম হলে আন্টার্কটিকা পর্যন্ত চলে গিয়ে আপনাকে ছেলের সঙ্গে কথা বলিয়ে দেব। পেঙ্গুইনের পাশে বসে সূর্যদা গল্প করবে। ইমেলের মজাই এটা মেসোমশাই। এক মিনিটে যেখানে সেখানে যাওয়া যায়। এই হাফ পাড়াগাঁয়ে আমি কি এমনি এমনি এই বিজনেস খুলেছি? আপনারা শুধু মুখে বলবেন আর আমি ফটাফট টাইপ করে যাব। চ্যাট কাকে বলে দেখবেন। জানেন মেসোমশাই, পাড়ায় সবাই বলত, সূর্যদা একটা জিনিয়াস হবে। আমি তখন খুব ছোট। ভাল করে বুঝতাম না। এখন দেখুন হল তো?'

খাতির যত্ন এবং ছেলের প্রশংসায় খুশি হলেন শিবনাথবাবু। কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না। বললেন, 'তুমি বাপু কিন্তু খুলে রেখো। অত রাত তো।'

মিত্তিরের ছেলে দাঁত বের করে হাসল। বলল, 'মেসোমশাই, রাত তো হবে। রাত হবে না? এক-একটা দেশের এক একটা টাইম। আমাদের রাত তো ওদের দিন। ওদের দিন তো আমাদের রাত। এই কারবারের মজা তো ওখানে, রাত দিন বুঝে চলতে হয়।'

সূর্যই হিসেব করে রাত এগারোটার পর সময় ঠিক করেছে। এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে, বাসবীদেবী সময় শুনে আঁতকে উঠলেন। টেলিফোন কানে চেপে ধরে বললেন, 'এগারোটা! খোকা তুই কী বলছিস! অত রাতে তোর বাবাকে নিয়ে যাব কী করে?'

'মা, বোকার মতো কথা বোলো না। এখানে তোমাদের থেকে অনেক বেশি বয়সের মানুষ ড্রাইভ করে কয়েক শো মাইল চলে যায়। হাউ? কী করে? তা ছাড়া বাবা তো বলল, জায়গাটা কাছে। মিনিট পনেরোর ওয়াকিং। কোন জায়গাটা যেন? বাজারের কাছে?'

'হ্যাঁরে, অন্য কোনও সময় নেই?'

'থাকবে না কেন? অবশ্যই আছে। খুবই আছে। তোমাদের রাতের বদলে আমাদের রাত আছে। কিন্তু সেই সময়তেই আবার আমরা নেই। আমাকে রাত জেগে পরের দিনের জন্য নোট তৈরি করতে হয়। ওইসময় তোমাদের সঙ্গে কথা বলা অসম্ভব। তোমার বউমার

আবার হোল ডে ধকল। নিজের রিসার্চ সামলে, মেয়ে সামলে... ওকেও তো রাতে একটু রেস্ট দিতে হবে। হবে না?'

বাসবীদেবী কাঁপা গলায় বললেন, 'থাক ওসব, আমার বাবা টেলিফোনই ভাল। সপ্তাহে একবার কথা বলি তাতেই হবে। তা ছাড়া ওসব জিনিস তোর বাবা কি এই বয়েসে পারবে? পারবে না। ছেড়ে দে খোকা।'

ওপাশ থেকে সমুদ্র পাহাড় টপকে ভেসে আসে সূর্যর বিরক্ত গলা।

'উফ মা, তোমাকে একই কথা কতবার বোঝাব? কতবার বোঝাব তোমাকে? টেলিফোনের খরচ এখন অনেক বেড়ে গেছে। এই ধরনের বিলাসিতা আমাদের মানায় না। আমাদের সংসারে খরচ বাড়ছে। সুচি রাগারাগি করে। এই যে ও রোজ বেজিং-এ ওর কাজিনের সঙ্গে গল্প করে, সে কি টেলিফোনে করতে হয়? যেখানে সেখানে ল্যাপটপ খুলে বসে পড়ে। তা ছাড়া মা আরও একটা জিনিস আছে, সেটা তোমাদের বুঝতে হবে।'

'আবার কী হল? শরীর টরির খারাপ নয় তো?' বাসবীদেবীর গলায় উদ্বেগ।

'লাস্ট টু মান্থ তোমাদের একটা ডলারও পাঠাতে পারিনি, কেন পারিনি সেটা একবার ভেবে দেখেছ মা? বিকজ আমাদের মেয়ের এডুকেশন। তোমার নাতনির লেখাপড়া। এখানে এখন এডুকেশন কস্ট দিন দিন বাড়ছে। শুধু এখানে কেন, সব দেশেই এক কাণ্ড। এটা একটা গ্লোবাল ফেনমেনন। আমাদের সকলকেই এটা মেনে নিতে হবে। প্লিজ, একটু বোঝো মা। আজকালকার দিনে সবদিক থেকে আমাদের সাশ্রয় করতে হবে। টেলিফোনের বদলে ইমেল এখন অনেক সস্তা, অনেক সহজ। কম্পিউটারের সামনে বসবে, ব্যস।'

'সে বাবা, সস্তা দামি যাই হোক, আমরা কম্পিউটারের কী জানি? না, না আমরা পারব না।'

সূর্য এবার রেগে যায়। বলে, 'দুধের ছেলেমেয়েরা যেটা পারে তোমরা কেন পারবে না! তা ছাড়া এটা সায়েন্স টেকনোলজি। এটা আমাদের সকলকে অ্যাডপ্ট করাতে হবে। না জানলে শিখতে হবে। নো নো মা, এটা আমি মানব না, কিছুতেই মানব না। তুমি আগে আমার ইমেল আই ডি লিখে নাও। হাতের কাছে পেন আছে?'

পেন ছিল না, তবে পেনসিল ছিল। বাসবীদেবী তিনবার কাটাকুটির পর লিখলেন।

'সূর্য অ্যাট দ্য রেট অফ...।'

বাসবীদেবী স্বামীর দিকে না ফিরেই ফিসফিস করে বললেন, 'কাগজটা নিয়েছ? ওই যে নম্বর না কী লেখা কাগজটা?'

শিবনাথবাবু মাথা নাড়ালেন। রাস্তা অন্ধকার। পাশের মানুষটাকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। ঝড় বৃষ্টি হলে এখানে সবার আগে রাস্তার আলোগুলো নিভে যায়। আজও নিভেছে। চারপাশের বাড়িগুলোতেও অনেকে শুয়ে পড়েছে আলো নিভিয়ে। ফলে অন্ধকারটা যেন বেশি। তবে একটা বাঁচোয়া বৃষ্টি থেমেছে। মেঘ কেটে আকাশের অস্পষ্ট আলো এসে পড়ছে মাটিতে। বৃষ্টি নেই তবু মাথায় ছাতা খুলে রেখেছেন শিবনাথবাবু। জোর বৃষ্টির পর বাতাসে একরকম জলের ফোঁটা উড়ে বেড়ায়। তাদের চোখে দেখা যায় না, গায়ে মাথায় পড়ে শিরশিরে একটা ভাব তৈরি করে।

বাসবীদেবী শাড়ির কুঁচিটা হাতে তুলে হাঁটছেন। না, শাড়িটা ভাঙা ঠিক হয়নি। কাদা-টাদায় একসা না হয়ে যায়। একটা রিকশা পাওয়া যাবে না? টর্চটা আনা উচিত ছিল। বয়েসের এই আর এক মুশকিল। সময়মতো অনেক দরকারি জিনিসের কথা মনে থাকে না, অনেকটা বাদে মনে পড়ে। এটা বিচ্ছিরি। একেবারে ভুলে গেলে একটা কথা ছিল।

সামনের ছিপছিপে জমা জল এড়াতে গিয়ে বাসবীদেবী ছোট একটা ইটের টুকরোয় হোঁচট খেলেন। সামান্য হোঁচট। ডান পায়ের কড়ে আঙুলটা কনকনিয়ে উঠল।

'উফ।'

শিবনাথবাবু এগিয়ে এসে স্ত্রীর হাত ধরলেন।

'লাগল?'

'না।'

'সাবধানে হাঁটো।'

'চুপ করো, বেশি কথা বোলো না।'

শিবনাথবাবু ভেবেছিলেন চাপা ধমক দেওয়ার পর বাসবীদেবী তাঁর হাত ছাড়িয়ে নেবেন। কিন্তু নেননি। তিনি বুড়ো মানুষটার হাত ধরেই আছেন।

দু'জনে হাঁটছেন সাবধানে, ভয়ে ভয়ে। যতটা পারা যায় পায়ের তলার জল বাঁচিয়ে, গর্ত এড়িয়ে। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে, আলো আঁধারে নড়বড়ে দুটো মানুষ হেঁটে চলেছে। হেঁটে চলেছে এক অচেনা, অজানা পথ ধরে।

কথা সাহিত্য শারদীয়া, ১৪১৪

আজ কি শুভ্র আসবে

আজ শুভ্র আসবে না। তবু পর্ণার মনে হচ্ছে, আজ শুভ্র আসবে। অবশ্যই আসবে। আজ দোল না?

শুভ্র কাল যখন ফোন করেছিল পর্ণা ঘুমিয়ে পড়েছে। মোবাইলটা বেজেই চলছিল, বেজেই চলছিল। একঘেয়ে বিশ্রীভাবে। ঘুমের মধ্যেই শুনতে পেল পর্ণা। বালিশ বিছানা হাতড়ে মোবাইল কানে চেপে ধরল। শুভ্রর গলা না শুনেই বলল, 'কী হয়েছে?'

'কী হয়েছে মানে? ধরছ না কেন? ঘুমোচ্ছিলে?'

'না জেগেছিলাম। তোমার সঙ্গে গল্প করছিলাম। কী হয়েছে? তাড়াতাড়ি বলো, কেটে যাবে।'

এখানকার মোবাইলগুলো এরকমই। যখন তখন কেটে যায়, কথা ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়। বিয়ের পর পর্ণা খুব বিরক্ত হত। বলত, 'যদি না শোনা যায় তা হলে রেখে লাভ কী? গাদাখানেক টাকা গোনা শুধুমুদু।'

শুভ্র বলত 'কই! শোনা যায় তো। আমি তো শুনতে পাই।'

'তুমি ওরকমই। একে শোনা বলে? স্পষ্ট নয়, খালি কেটে যায়। কাল কলকাতায় কথা বলছিলাম, মাঝপথে ফট করে বন্ধ হয়ে গেল।'

'আবার করলে না কেন?' শুভ্র শান্ত গলায় বলল।

পর্ণা কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, 'করব কী করে? সিগন্যাল এল সেই রাতে। দশটারও পর। তখন কি মা জেগে থাকে? ইস মা কী মনে করল বলো তো।'

শুভ্র অল্প হেসে বলল, 'এটা কলকাতা নয় পর্ণা। এখানে টাওয়ার নেই। টাওয়ার সেই আরসায়। ওখান থেকে রিলে হয়। তুমি মাকে বুঝিয়ে বলবে।'

পর্ণা স্বামীর দিকে ঘন হয়ে আসে। গলা নামিয়ে বলে, 'শুধু কি মা? তুমি ফোন করলে হ্যালো হ্যালো বলতে গলা ফেটে যায়। বাড়িসুদ্ধ সবাই শুনতে পায়। বুঝতে পারে তুমি ফোন করেছ। পরে জিজ্ঞেস করে, কী হল শুভা ফোন করেছিল? কী বলল? কবে ফিরবে? লজ্জা করে না বুঝি?'

শুভ্র মাথা নামায়। হাসে। বিড়বিড় করে কিছু বলে। সেগুলোও মোবাইলের মতো অস্পষ্ট, ছেঁড়া ছেঁড়া।

কাল রাতে কিন্তু শুভ্রর কথা সবটাই স্পষ্ট শুনতে পেয়েছে পর্ণা। যদিও ঘুমের মাঝে ফোন ধরেছিল। সেই হিসেবে কথা আরও অস্পষ্ট, আরও ছেঁড়াছেঁড়া শোনা উচিত ছিল। ব্যাপারটা কাল মনে হয়নি, আজ সকালে মনে হচ্ছে। মজার কাণ্ড তো!

পর্ণা বলেছিল, 'কী হয়েছে?'

শুভ্র বিরক্ত গলায় বলল, 'ট্রেন মিস করেছি।'

পর্ণা পাশ ফিরতে ফিরতে বলল, 'কী হবে এখন?'

'কী আর হবে? বাড়ি যাওয়া হবে না। স্টেশনে পচে মরতে হবে। শালার চাকরি।'

পর্ণা চাপা গলায় ধমক দিল, 'গাল দিচ্ছ কেন?'

শুভ্র দাঁতে দাঁতে ঘসে বলল, 'না গাল দেব না, দুধ ভাত দেব। শুয়োরের বাচ্চা।'

পর্ণা হাই তুলে বলল, 'কাকে বলছ?'

শুভ্র বলল, 'আবার কাকে? নিজেকে। হিয়া কী করছে?'

পর্ণা ঘুমে কাদা মেয়ের গায়ে হাত দিয়ে বলল, 'লুডো খেলছে। এরপর বলছে স্কিপিং করবে। তোমার মেয়ে আজকাল রাত দুটোর পর স্কিপিং করে।'

শুভ্র বউয়ের রসিকতায় রাগ করল না। সম্ভবত ট্রেন মিস করার রাগে আর রাগ করার ক্ষমতা হারিয়েছে।

'ইস মাত্র পনেরো মিনিটের জন্য ঝাড় খেয়ে গেলাম। ওনলি ফিফটিন মিনিটস। হাঁপাতে হাঁপাতে স্টেশনে ঢুকে শুনি গাড়ির বাচ্চা...।'

'ঠিক আছে কাল ফিরবে।' পর্ণা বুঝতে পারল তার আর কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। ঘুম পাচ্ছে। এটা আগে ছিল না। আগে শুভ্রকে পেলে সারারাত কুটুর কুটুর করে গল্প করত। রাতেই মোবাইলের কার্ড ফুরিয়ে যেত। আজকাল ঘুম পায়।

শুভ্র এবার রেগে উঠল। বলল, 'কী হাবিজাবি বকছ? কাল কী করে ফিরব? কাল সারাদিন গাড়ি নেই। সেই পরশু। তাও পরশু আবার ট্যুর। গেলেও রাতে থাকতে পারব না। গিয়ে কী হবে? দূর যাবই না শালা।'

শুভ্রর গলা শুনে পর্ণার মনে হল মানুষটার মন খারাপ হয়ে গেছে। পর্ণার খারাপ, ভাল কিছুই লাগছে না। শুভ্রর বাড়ি না ফেরা তার কাছে নতুন কিছু নয়। প্রথমে মানতে পারত না। এখন জলভাত হয়ে গেছে। তাও তো এখন মেয়েটা আছে। একসময় খুব একা লাগত।

ফিসফিস করে বলল, 'মন খারাপ কোরো না। খেয়েছ?'

'হ্যাঁ।'

পর্ণা আবার হাই তুলল। বলল, 'কী খেয়েছ?'

'এয়ার, ফ্রেশ এয়ার। এত রাতে রেল স্টেশনে খাবার কোথায় পাব? লাইনের পাথর চিবিয়ে খেতে পারি, খাব?'

এরপরই ফোন কেটে গেল। মোবাইলের আলো কয়েক মুহূর্ত জেগে থেকে, ঝুপ করে ডুব দিল অন্ধকারে। কত রাত তখন? এগারোটা? বারোটা? একটা? নাকি আরও বেশি? ইচ্ছে করলে পর্ণা সময় দেখে নিতে পারত। একবার ভাবল দেখেও নেবে। নীচের রাস্তা দিয়ে একটা রিকশ ঝনঝন আওয়াজ তুলে ছুটল। এখানে এরকমই। দিনরাত রিকশগুলো পড়িমড়ি করে ছুটছে। দূরে কে যেন ডাকল, 'বাবু, বাবু, অ্যাই বাবু...।' একবার, দু'বার, তিনবার। বাবু কে? এত রাতে তাকে কে ডাকছে? বাবু কি এখনও বাড়ি ফেরেনি? নাকি বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ডাকছে?

ঘুমিয়ে পড়ল পর্ণা। তার সময় দেখা হল না।

আজ ভোরে চোখ খুলেই পর্ণার মনে হল, শুভ্র আসবে। কাল রাতে টেলিফোন করে যা-ই বলুক, আজ সে আসবে। দোল বলেই আসবে। পর্ণা পাশ ফিরল। জানলার ফুটোগুলো দিয়ে আলো ঢুকছে। সেই আলোর দিকে তাকিয়ে পর্ণা এবার হেসে ফেলল। লজ্জাও হল। দূর, যত্তসব ছেলেমানুষি। দোল তো কী হয়েছে? সে কি শুভ্রর সঙ্গে রং খেলবে? এমা, ছিঃ।

খাটের একপাশে হিয়া গুটিসুটি মেরে শুয়ে আছে। চাদরটা পায়ের কাছে দলা পাকানো। মেয়েটাকে নিয়ে এই এক সমস্যা। ঘুমের সময় গায়ে কিছুতেই চাপা রাখবে না। সারারাত টেনে টেনে দিতে হয়। পাঁচ বছর বয়স হতে চলল, এখনও অভ্যেস পালটায়নি। ক'দিন আগেও বেচারি খুব সর্দি কাশিতে ভুগত। মাঝে মাঝেই জ্বর হত। বুকে সাঁই সাঁই আওয়াজ। শুভ্র বাড়িতে থাকত না। থাকবে কী করে? সেলসের চাকরি। নিজেই বলে 'ফিরিওয়ালা'। ফিরিওয়ালার বাড়িতে থাকলে চলে? তার ওপর কোম্পানি ছোট। খাটিয়ে মারে। কোনও কোনও দিন মাসে একবারও বাড়ি ফিরতে পারে না। এখন মানিয়ে নিয়েছে পর্ণা, তখন খুব অসুবিধে হত। অসুস্থ মেয়েকে কোলে নিয়ে রাত জাগত পর্ণা। ভয় করত, কান্না পেত। অন্ধকার ঘরে বসে কাঁদত। কাঁদতে কাঁদতেই শুনতে পেত পাশের ঘরে মায়া হাসছে। মায়ার বয়স সতেরো। কিন্তু হাসি কিশোরীদের মতো সুন্দর হাসি নয়। খল খল করা বিশ্রী হাসি। শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। তখনও মেয়েটার অবস্থা এতটা খারাপ হয়নি। এখনকার মতো সারাদিন ঘরে বন্ধ করে রাখতে হত না। শুধু যেদিন যেদিন বাড়াবাড়ি করত সেদিন তালা পড়ত। শাশুড়ি আসতেন সকালে। ঘুম ভাঙার পর। তখন খাটের গায়ে হেলান দিয়ে বসে বসেই ঘুমিয়ে পড়েছে পর্ণা। শাশুড়ি এসে হইচই বাধিয়ে দিতেন।

'বউমা, মেয়েকে এবার আমার কাছে দাও দেখি, দাও। এসো সোনা, এসো, এসো। আমার কোলে এসো। পর্ণা, তুমি বরং গিয়ে চা বসাও। শ্বশুরমশাই আবার ঘুম ভেঙে চা না পেলে বিরাট রাগারাগি করবে। পকেটে ঢু. ঢু অথচ মেজাজ দেখো। ঝাঁটা মারি তোর মেজাজে।' তারপর নাতনিকে কোলে নিয়ে দোলাতে দোলাতে মহিলা বলতেন, 'আহা রে! কী কষ্ট রে, বাছা আমার, মনা আমার। আমার পুনুপুনু, আমার মুনুমুনু। কাশতে কাশতে ম'ল বেচারি। নিশ্চয় মামাবাড়ির ধাত পেয়েছে। হ্যাঁগো বউমা, তোমার বংশে কেউ হাঁপের রোগী আছে? তোমার বাপ-কাকার সর্দি কাশি কেমন?'

পর্ণা খাট থেকে নামতে নামতে বলত, 'বাপ কাকার সর্দি কাশি ভাল মা। একতলায় কাশলে তিনতলা পর্যন্ত শোনা যায়। গলায় জোর আছে। তবে আমাদের বাড়িটা আরও ভাল। ড্যাম্প ধরা নয়, রোদ ঢোকে। সাউথ ফেসিং। পুবটা ফাঁকা।'

শাশুড়ি চিবিয়ে চিবিয়ে বলেন, 'কী করব বাপু, রোদ তো টেনে হিঁচড়ে ঢোকাতে পারব না। তোমার শ্বশুরমশাই সারাজীবন সামান্য চাকরি করেছেন। যেটুকু পেরেছেন এই ধ্যাড়ধ্যাড়ে গোবিন্দপুরে মাথা গোঁজার ঠাঁই করেছেন। তোমার কলকাতার অট্টালিকার সঙ্গে এ জিনিসের তুলনা করলে চলবে কেন বাছা? তা ছাড়া...।'

'তা ছাড়া কী?' পর্ণা মুখ ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করে। নিজের কথার মধ্যেই সে জোর খোঁজে।

নাতনির পিঠে হাত বুলিয়ে শাশুড়ি আড়চোখে পুত্রবধূর দিকে তাকান। মুখ ঘুরিয়ে বলেন,

'তা ছাড়া, তোমায় তো জোর করে স্যাঁতস্যাঁতে বাড়িতে এনে তোলা হয়নি বউমা, তুমি নিজেই এসেছ। নাকি বিয়ের আগে তোমায় ঘরবাড়ির কথা কিছু বলেনি শুভ? লুকিয়েছিল?

ভুরু তুলে চুপ করেন মহিলা।

থমকে দাঁড়ায় পর্ণা। না, শুভ্র তাকে কিছুই লুকোয়নি। ঘরবাড়ি, অসুস্থ শ্বশুরমশাই, পাগল ননদ সবই বলেছিল। বলেছিল, 'তুমি পারবে না পর্ণা। দেখবে কিছুদিনের মধ্যেই তুমি হাঁপিয়ে উঠেছ। শুধু মনে হবে, কলকাতায় পালিয়ে আসি। তখন কিন্তু আমার কিছুই করার থাকবে না। যা রোজগার করি তাতে দুটো সংসার অসম্ভব। তুমি পারবে না পর্ণা। জীবনটা গল্প উপন্যাস নয়।'

পর্ণা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। তারপর অল্প হেসে বলেছিল, 'জীবনটা গল্প উপন্যাসের থেকেও ভাল। আমি জানি, আমি পারব না। তবু আমি যাব। ওমা, দেখো দেখো পাঁচিলের মাথাটা দেখো, কেমন লাল হয়ে গেছে! ইস কী সুন্দর! কলকাতার রাস্তায় পলাশ পড়ে জানতাম না তো! অ্যাই, হাত বাড়িয়ে ক'টা এনে দাও না বাবা। দাও না প্লিজ। এই লম্বু...।'

শুভ্র সরে গিয়ে বলেছিল, 'পারব না।'

পর্ণা খিলখিল করে হেসে বলল, 'ঠিক আছে, তোমায় পারতে হবে না। আমি আঁচল বেঁধে পাঁচিলে উঠছি। এই দেখো।'

শাশুড়ি বোধহয় পর্ণার মন বুঝলেন। ঠোঁটে হেসে বললেন, 'এখন আর আপশোস করে লাভ কী? তবু দেখো, তোমার বর ফিরলে বলে দেখো। সে যদি তোমার জন্য রোদের কিছু ব্যবস্থা করতে পারে।'

শুধু রোদ নয়, রোদের সঙ্গে বৃষ্টিরও ব্যবস্থা করল শুভ্র। ধার দেনা করে ছাদের ঘরটা সারিয়ে সুরিয়ে নিল। প্লাস্টার, একটা নতুন দরজা, হোয়াইট ওয়াশ। ছোট আর সাদামাটা হলেও পর্ণা নিজের একটা ঘর পেল। খরচ বাঁচাতে ঘরের সামনেটা অ্যাসবেসটসের চাল। বৃষ্টিতে সারারাত ঝমঝম করে বাজে।

মেয়ের চাদর গলা পর্যন্ত টেনে বালিশটা ঠিক করে দিল পর্ণা। হিয়া ঘুম জড়ানো গলায় জিজ্ঞেস করল, 'বাবা এসেছে?'

পর্ণা এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'এখনও আসেনি। তবে এসে পড়বে। তুমি আর একটু ঘুমিয়ে নাও।'

হিয়া চোখ বুজেই বলল, 'তুমি বাবাকে রং আনতে বলেছ?'

পর্ণা নিচু গলায় বলল, 'বলেছি।?'

'আর পিচকিরি? পিচকিরি বলোনি?'

'হ্যাঁ তাও বলেছি।'

'কীরকম পিচকিরি? বন্দুক পিচকিরি না আমব্রেলা পিচকিরি, আমব্রেলা হলে আমি নেব না, আমি বন্দুক চাই। শান্তার যেমন আছে।'

পর্ণা একটা চাপা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'মনে হচ্ছে তোমার বাবা বন্দুক পিচকিরিই আনবে। তুমি এখন চুপ করে ঘুমোও।'

পর্ণা বারান্দার দরজাটা খুলল। দোতলার এই বারান্দাটা আসলে বারান্দা নয়। নেড়া ছাদের একটুখানি পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। ছাদের ফালি ঘরটার সঙ্গে শুভ্র এটাও বানিয়েছিল। দেয়ালে প্লাস্টার নেই। ইটগুলো দাঁত বের করে আছে। সেই ইট ঢাকতে পর্ণা একবার দুটো টব এনে রাখল। জুঁই গাছের টব। বিকেল হলে জল দিত। শখ করে বারান্দার নাম দিল জুঁই বারান্দা। ফুল হওয়ার আগেই গাছ দুটো মরে গেল। তবে নামটা রয়ে গেছে। জুঁই বারান্দায় এসে দাঁড়াল পর্ণা। বাতাসে একটা ভেজা ভেজা ভাব। ফাল্গুনে এরকম হয়। কোনও কোনও দিন সকালটা কুয়াশামাখা স্যাঁতস্যাঁতে লাগে। পাতলা শিরশিরে হাওয়া দেয়। মনে হয় বৃষ্টি হবে। বৃষ্টি হয় না। বরং বেলা বাড়লে চড়চড়ে রোদ ওঠে। আজও কি রোদ উঠবে? কোনও কারণ নেই, তবু কেন জানি পর্ণার মনে হল, দোলের দিন কড়া রোদ ভাল নয়।

মেয়ে বেলা করে উঠলে সুবিধে। অনেকগুলো কাজ সেরে ফেলা যায়। চা জলখাবার করে, শ্বশুর-শাশুড়িকে দিয়ে, রান্নার গোছগাছ সেরে ভাতটা পর্যন্ত চাপানো হয়ে যায়। সবথেকে বড় কাজ হল, মায়ার কাজ। তাকে স্নান করানো, ঘর পরিষ্কার করে খেতে দেওয়া। সতেরো বছর বয়সের পাগল মেয়েকে স্নান, খাওয়া করানো সহজ কথা নয়। অনেকটা সময় লাগে। এটা রুটিনে ছিল না পর্ণার। মাস কয়েক হল ঢুকেছে। রোগা জিরজিরে মেয়েটাকে দেখভালের জন্য এক দশাসই আদিবাসী মহিলার ব্যবস্থা ছিল। শুভ্রই করেছিল। সকালে আসত, যেত একেবারে রাতে রোগীকে খাইয়ে। মহিলা এমনি খারাপ ছিল না, তবে আড়ালে মায়াকে মারধর করত। পর্ণা কথাটা বলেছিল শুভ্রকে।

'পাগল সামলাতে অমন একটু-আধটু করতে হয় পর্ণা।'

'তা বলে অত বড় মেয়ের গায়ে হাত তুলবে!'

'আঃ পর্ণা, এখানে বড় ছোটর কিছু নেই। ওরা ছেলেমানুষের মতোই। পাগলাগারদে দিলে তো আরও খারাপ হবে।'

পর্ণা নিচু গলায় বলে, 'না, না এটা ঠিক নয়, তুমি বারণ করে দেবে।'

শুভ্র এবার রেগে যায়। হাত জোড় করে বলে, 'দোহাই পর্ণা আর ঝামেলা পাকিয়ো না। ওপরে ঘর করা নিয়ে তো দেখলে কী হল, বাবা এখনও ঠিকমতো কথা বলে না। এখন যদি ওই লোক চলে যায়, মায়াকে কে দেখবে বলো? তুমি? না আমি চাকরি ছেড়ে বসে থাকব।'

পর্ণা ছাদ থেকে তুলে আনা শাড়ি ভাঁজ করতে করতে বলে, 'ঘরটা ভেঙে দিয়ো না হয়।'

সেই মহিলা কাজ ছেড়ে দিয়েছে। এমনি ছাড়েনি। মায়া তার গালে কামড় দিয়েছিল। অল্প কামড় নয়, জোর কামড়! মুখ একেবারে রক্তে ভেসে গিয়েছিল। ওই হাড় বের করা মেয়ে দাঁতে অত জোর পেল কী করে! পরদিন জানতে পেরেছিল। অপমানের জোর। সেই অপমান মায়া নিজেই জামা খুলে দেখিয়েছিল। পর্ণা অবাক হয়ে গেল। পাগলেরও অপমান! সেই থেকে পর্ণা ননদের দায়িত্ব নিয়েছে। অন্তত শুভ্র যতদিন না পর্যন্ত একটা ভাল অ্যাসাইলামের ব্যবস্থা করে। মনে হয় না খুব তাড়াতাড়ি সে ব্যবস্থা করতে পারবে। যে দু'-একটা খোঁজ পাওয়া গেছে তাদের খরচ অনেক। বাকিরা শিকলে বেঁধে রাখে।

আলো বাড়ছে। কুয়াশা কুয়াশা ভাবটা কেটে স্পষ্ট হচ্ছে চারপাশ। এদিকে গাছপালা অনেক। বাড়ির সামনেই দু'-দুটো বকুল গাছ। চট করে এমন হয় না। ঘন ডালপালা নিয়ে

বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ফুল শুরু হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যেই নীচটাও সাদা হয়ে যাবে। মনে হবে, গাছ তার তলায় চাদর বিছিয়েছে। পর্ণা কখনও ফুল মাড়িয়ে যায় না। এখানে আসার পর দুটো বছর গাছপালা নিয়ে খুব লাফালাফি করেছিল। একটা খাতাই বানিয়ে ফেলল! ফুল-পাতার খাতা। সিজন ধরে ধরে সেখানে গাছের পাতা আর ফুলের পাপড়ি থাকত। একবার সেই খাতা কলকাতায় নিয়ে গেল পর্ণা। মা দেখে গম্ভীর হয়ে গেল।

'তোর বাবাকে দেখিয়েছিস?'

পর্ণা হেসে বলল, 'এখনও দেখাইনি, তবে ঠিক করেছি আজ ডিনারের পর দেখাব। আগে নিজের হাতে কফি বানাব, তারপর জমিয়ে বসে কফি খেতে খেতে দেখাব।'

'থাক, দেখাতে হবে না।'

পর্ণা অবাক হয়। খাতার পাতা উলটে বলে, 'সে কী! কেন মা! তুমি বর্ষা আর বসন্তের সিরিজটা দেখলে? এই দেখো শিমূল, পারুল, এই যে পলাশ। বকুল দেখেছ? কলকাতায় ইচ্ছে করলেও এই কালেকশন তুমি করতে পারবে না। বলো পারবে? আচ্ছা, বলো তো মা এটা কোন পাতা? এটা আমাদের বাড়ির গাছ। ঠিক বাড়ির নয়, তবে বাড়ির মতোই, গেটের পাশেই আছে। পারলে না তো? জানতাম পারবে না। দেখব বাপি পারে কিনা। বাপিকে যখন দেখাব...।'

মা কঠিন গলায় বলল, 'না, দেখাবে না।'

'কেন?'

মা এবার রেগে যায়। সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'পর্ণা আমরা জানি, এই বিয়ে করে তুমি কতটা জলে পড়েছ। ফুল পাতা দিয়ে তা ঢাকার চেষ্টা কোরো না।'

ফেরার পথে ট্রেনেই খাতাটা ফেলে দিয়েছিল পর্ণা। তারপর স্বাভাবিক ভঙ্গিতে শুভ্রকে বলেছিল, 'একটা চা বলো না। খুব তেষ্টা পেয়েছে।'

মায়ার কাজ শেষ করে একেবারে স্নান করে এসে তবে মেয়েকে তোলে পর্ণা। আর তো ক'টা দিন। এরপর স্কুল শুরু হলে সব রুটিন পালটে যাবে। কলকাতায় থাকলে এখনই হয়ে যেত। আজকাল তিন বছর থেকেই ছেলেমেয়েরা ব্যাগ নিয়ে স্কুলে যাচ্ছে। এই পাড়াগাঁ শহরে কোনও নার্সারি স্কুল নেই। বড় স্কুলও তেমন নেই। ট্রেনে করে সেই আরসা পর্যন্ত যেতে হবে। ঘণ্টা খানেকের মামলা। সব মিলিয়ে হয়তো আরও বেশি।

শুভ্রকে কথাটা বলেছিল পর্ণা।

'হিয়া, অতটা ট্রেন জার্নি পারবে তো?'

শুভ্র অবাক গলায় বলল, 'কেন? পারবে না কেন? আমরা সবাই পেরেছি। ও কেন পারবে না?'

'তোমাদের সময় আর ওদের সময় এক নয়।'

শুভ্র শান্ত গলায় বলল, 'ওদের সময় কীরকম পর্ণা? হেলিকপ্টার চড়বার সময়?'

পর্ণা মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'এরকম করে বলছ কেন?'

শুভ্র ভুরু কুঁচকে কয়েক মুহূর্ত থমকে থাকল। তারপর চাপা গলায় হিসহিসিয়ে বলল, 'কীরকম করে বলছি? দেখো পর্ণা, তুমি যেমন চাইছ তেমন হবে না। আমার পক্ষে দুটো

সংসার মেইনটেইন করা ইমপসিবল। একথা আমি তোমাকে বিয়ের আগেই বলেছিলাম। সেদিন তুমি শোনোনি। আজ বলছি, তুমি যদি চাও, বাপের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে মেয়েকে পড়াতে পারো। সেটা সবার পক্ষেই মঙ্গল হবে। আশা করি আজ তুমি আমার কথা শুনবে।'

সেদিন এই বারান্দায় অনেক রাত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিল পর্ণা। কাঁদছিল কি? কে জানে হয়তো কাঁদছিল, হয়তো কাঁদছিল না। মনে নেই। তবে মনে আছে ছাদ জুড়ে অনেকটা জ্যোৎস্না ছিল। আর বাতাসে ছিল একটা চাপা গন্ধ। চাপা অথচ মিষ্টি বকুল গাছের গন্ধ। ফুল দেওয়ার আগে কোনও কোনও বকুল গাছ লুকিয়ে লুকিয়ে এই গন্ধ ছাড়ে।

বেলা পর্যন্ত বিছানায় থাকতে পর্ণারও ভাল লাগে। বিয়ের আগে তো দশটাতেও খাটে গড়িয়েছে। ঘুম ভাঙলেও ওঠেনি। মটকা মেরে পড়ে থেকেছে। বিয়ের পর গড়ানো যায় না। তাও মাঝে মাঝে দোর দিয়ে পড়ে থাকে। শাশুড়ি ছাদে হাঁটেন, সিঁড়িতে ওঠেন, নামেন। পায়ের আওয়াজ করেন দুমদুম। আর চাপা গলায় গজগজ করতে থাকেন। করতেই থাকেন।

'এ কেমন অলুক্ষুনে কাণ্ড গো! ছি ছি। শ্বশুরবাড়িতে এত বেলা পর্যন্ত বিছানায়? লজ্জা শরম নেই নাকি গো? তাও যদি বুঝতুম বর রাতে ছিল। লোকে কী ভাববে গো? অ্যাঁ! কী ভাববে?'

শুভ্রকে নালিশ করলে বলে, 'এসব ছোটখাটো জিনিস নিয়ে বিরক্ত কোরো না পর্ণা। প্লিজ। মাস শেষ হতে চলল, এখনও টার্গেট হয়নি। কী দরকার বাপু তোমার অত বেলা পর্যন্ত নাক ডেকে ঘুমোনোর।'

বারান্দার দরজা দিয়ে ঘরে উঁকি দিল পর্ণা। মেয়েটা হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। পর্ণা থমকে দাঁড়াল। ঘুমোলে মেয়েটাকে বড় সুন্দর দেখায়। ঠোঁট দুটো অল্প অল্প কাঁপে। ঠিক শুভ্রর মতো! আহা রে, কত আশা বেচারির, বাবা পিচকিরি এনে দেবে, রং এনে দেবে। দোল খেলবে। পাশের বাড়ির শিবুটাকে দিয়ে একটু পরেই একটা পিচকিরি আনিয়ে নিতে হবে। আর আবির। আবির গুলেই খেলবে। এখানকার রং ভাল না। গায়ে র‍্যাশ হয়।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পর্ণা নিজের বাঁ হাতের কড়ে আঙুলে কামড় দিল। তিনবার কামড়। মেয়েকে সুন্দর দেখলে মাকে তিনবার কামড় দিতে হয়। নইলে নজর লাগে।

সিঁড়ির শেষে শাশুড়ির সঙ্গে দেখা। মুখ থমথমে। তিনি রান্নাঘরের দিকে যাচ্ছেন। নিশ্চয় কিছু ঘটেছে।

'কী হয়েছে মা?'

শাশুড়ি গনগনে গলায় বললেন, 'জানি না। তুমি মায়ার কাছে আজ যাবে না। ছি ছি, একটা বছরকার দিনে...।'

পর্ণা উদ্বিগ্ন গলায় বলে, 'কেন কী করছে মায়া?'

'নিজে গিয়ে দেখো একবার কী করছে। থুতু দিচ্ছে। নতুন পাগলামি। আমি ঘরের সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, জানলা দিয়ে থু থু করে একগাদা... ইস মাগো... আমি তেড়ে গেলাম তখন আবার দিল। আজ নোড়া দিয়ে হারামজাদির সব ক'টা দাঁত যদি না ফেলেছি। দেখব ফোকলা দাঁতে তখন কত থুক দেয়। তুমি সরো বউমা, সরো দেখি। আমি রান্নাঘর থেকে নোড়াটা নিয়ে আসি।'

পর্ণা শান্ত গলায় বলে, 'দাঁড়ান মা, আমি দেখছি। আপনি শান্ত হন।'

এগিয়ে যায় পর্ণা। বারান্দা পেরিয়ে মায়ার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ায়। বন্ধ জানলায় মেয়েটা দাঁড়িয়ে আছে। পর্ণাকে দেখে হাসে। পর্ণাও হাসে।

'মায়া, ভাল আছ?'

'হ্যাঁ, বউদি ভাল আছি। তুমি কেমন আছ?'

'আমি ভাল আছি।'

পর্ণা এগিয়ে এল। সে প্রতিদিনই আগে কথা বলে মেয়েটার মনের অবস্থা বুঝে নেয়। তারপর দরজা খোলে। পর্ণা নিচু গলায় বলল, 'যা শুনলাম সেটা কি সত্যি? তুমি কি...?'

মায়া কথার মাঝখানেই বলে, 'হ্যাঁ সত্যি। সত্যি সত্যি সত্যি। তিন সত্যি। এবার তোমাকেও দেব। সবাইকে দেব।' পর্ণা মুখ সরানোর সময় পায় না।

দোল একটা আনন্দের দিন। এদিন কেউ কাঁদে না। এদিন কাঁদতে নেই। পর্ণা তাই দাঁতে দাঁত চেপে কান্না আটকে রেখেছে। আটকে মুখে জলের ঝাপটা দিচ্ছে। দিয়েই চলেছে।

আজ শুভ্র আসবে না। তবু পর্ণার মনে হচ্ছে, আজ শুভ্র আসবে। অবশ্যই আসবে। আজ দোল না?

বর্তমান, রবিবার ১৬ মার্চ, ২০০৮

মেঘ-বৃষ্টি

১

হঠাৎ ঢুকলে অস্বস্তি হয়।

মনে হয়, সবকটা আলো ঠিকমতো জ্বালানো হয়নি। এত বড় ঘরে নিশ্চয় আরও আলো আছে। সময় হলে সেগুলো জ্বালানো হবে। একটু পরে বোঝা যায়, ব্যবস্থাই এরকম। ঘরে সবসময় একটা আলো-ছায়া ভাব করে রাখা আছে। মনে হয়, ঘরের ভেতর মানুষ, আসবাব কোনওটাই খুব স্পষ্ট নয়। আবার খুব অস্পষ্টও নয়। খানিকটা সময় থাকার পর ধীরে ধীরে চোখ সয়ে আসে।

'কাননবালা কনস্ট্রাকশন' কোম্পানির কর্ণধার আদ্যনাথ বসু এই আলো-ছায়া ঘরের এক কোণে নিজের টেবিলের সামনে বসে আছেন। তাকিয়ে আছেন কম্পিউটারের দিকে। দেখলে মনে হবে, কয়েক কোটি টাকার মালিক এই আটান্ন বছরের মানুষটি গভীর মনোযোগ দিয়ে কম্পিউটারের পরদায় জরুরি কিছু দেখছেন। গত তিন বছরের ব্যালান্স শিট অথবা আগামী কোনও প্রকল্পের জটিল ইঞ্জিনিয়ারিং ড্রইং।

ঘটনা কিন্তু তা নয়। আদ্যনাথবাবু এখন তাকিয়ে আছেন তাঁর কম্পিউটারের স্ক্রিন-সেভার ছবিটার দিকে। কম্পিউটারে যখন কোনও কাজ হয় না তখন এই ছবি পরদায় ভেসে থাকে। আদ্যনাথবাবুর ঠোঁটের কোণে ছেলেমানুষি ধরনের একটা সামান্য হাসি। চোখে মুগ্ধ ভাব। যখনই তিনি এই ছবিটা দেখেন চোখে এই মুগ্ধ ভাবটা ফুটে ওঠে। ঠিকমতো খেয়াল করলে ঘরের কম আলোতেও সেই ভাব বোঝা যায়। আজও বোঝা যাচ্ছে।

ছবিটা সন্দীপের তৈরি। ভাবনা, গল্প, ছবি, কম্পিউটার প্রোগ্রাম সবটাই তার নিজের হাতে করা। এটাই ছিল তার চাকরির পরীক্ষা। বিজ্ঞাপনে বলা হয়েছিল, প্রার্থীদের একটা করে কম্পিউটার স্ক্রিন সেভার তৈরি করে সিডি জমা দিতে হবে। সময় দশ দিন। সঙ্গে দিতে হবে বায়োডাটা আর পাসপোর্ট ছবি।

মণিদীপা এসে বলল, 'সারাদিন কম্পিউটারে বসে কী খটর খটর করছ? বললাম না, ওসব পাগলামিতে নেচো না।'

সন্দীপ মুখ তুলে বলে, 'পাগলামি বলছ কেন?'

মণিদীপা চাপা গলায় বলে, 'পাগলামি বলব না তো কী বলব? পরীক্ষা নেই, ইন্টারভিউ নেই, এ আবার কেমন চাকরি! শুধু কম্পিউটারের স্ক্রিন সেভার বানাও! নিশ্চয় এর ভেতরে কোনও ফোর টোয়েন্টি ব্যাপার আছে।'

'স্ক্রিন সেভার তৈরির ব্যাপারটা আমার বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে, মণি। তুমি জানো না, আজকাল চাকরির পরীক্ষাগুলো একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে। ফর্মটাই উলটেপালটে গেছে। আগের মতো জেনারেল নলেজ মুখস্থ করে, কপালে দইয়ের ফোঁটা লাগিয়ে যেতে হয় না।'

মণিদীপা মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'তা হলে কী করতে হয়? নাচগান করতে হয়?'

সন্দীপ উৎসাহ নিয়ে বলল, 'হতে পারে। অসম্ভব নয়। এই তো অঞ্জন কোথায় ইন্টারভিউ দিতে গিয়েছিল। গিয়ে তো একেবারে থ! কোথায় ইন্টারভিউ? কলকাতা থেকে অনেক দূরে বাগানবাড়িতে বিরাট পিকনিকের আয়োজন! ইন্টারভিউ বোর্ডের কর্তারা বড় বড় হাঁড়িতে মাংস রান্না করছে! সারাদিন খাওয়া-দাওয়া হইচই। পিকনিকে যেমন হয় আর কী! পরে জানা গেল, ওটাই নাকি পরীক্ষা ছিল। যা দেখার দেখে নেওয়া হয়েছে। বোঝো একবার।'

মণিদীপা এবার ধমকে ওঠে, 'থামো দেখি। উনি একেবারে বিরাট বুঝে বসে আছেন। যত্তসব গল্পকথা। এই কারণেই তোমার মতো ছেলেরা বেকার বসে থাকে। এসব পাগলামিতে সময় নষ্ট না করে ঠিকঠাক রাস্তায় চাকরির চেষ্টা করো এবার। আমি কিন্তু আর অপেক্ষা করতে পারব না বলে দিলাম।'

সন্দীপ সে কথায় কান না দিয়ে বলল, 'জিনিসটা একবার দেখবে মণি? অনেকটা করে ফেলেছি। মনে হচ্ছে, মজার হয়েছে। মাঝখানে একটা মোচড় আছে। দেখবে একবার?'

মণিদীপা কড়া গলায় বলল, 'না, দেখব না। একটা মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে মজা বা মোচড় কোনওটাই দেখার ইচ্ছে আমার নেই। তুমি নিজে দেখো। আমি চললাম।'

এরপর নিজেকে থামানো উচিত ছিল। সন্দীপ থামেনি। সে দশ দিনের মাথায় জিনিসটা বানিয়ে ফেলে এবং বিজ্ঞাপনের ঠিকানায় জমা দিয়ে আসে।

জিনিসটা এরকম—

একটা পুকুর। পুকুরের চারপাশে সবুজ গাছ। হাওয়ায় গাছের পাতা নড়ছে। পুকুরের জলে মেঘের হালকা নীল ছায়া। তাতে মাঝে মাঝে শুকনো পাতা উড়ে এসে পড়ছে। সামান্য কেঁপে উঠছে জল। গোল হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। আবার স্থির হয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। ছবির ডানদিকে বাঁধানো পুকুরঘাট। সেই ঘাটের রং টকটকে লাল। ছবি এই পর্যন্ত স্বাভাবিক। একটা নরম সরম পুকুরঘাটের ছবি যেন। মোচড়টা দেওয়া আছে এর পরে। সেই মোচড়ে দেখা যাচ্ছে, পুকুরঘাটে প্রমাণ সাইজের একটা পেট মোটা কাতলা মাছ বসে আছে পিঁড়ি পেতে। তার কানকো হাতে লম্বা একটা ছিপ। চোখে গোল চশমা। মুখ গম্ভীর। মাথার পিছনে লাঠিতে ছাতা বাঁধা। সেই ছাতা একপাশে কাত হয়ে আছে। পাশে টিফিন বাক্স, জলের বোতল। পেট মোটা চকচকে মাছ একটু পরপরই ছিপ তুলে দেখছে। কিছু নেই। হতাশ ভঙ্গিতে দু'পাশে মাথা নাড়ছে। বোঝা যাচ্ছে, বারবার তার টোপ খেয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। বেচারি বঁড়শিতে ফের টোপ গেঁথে জলে ফেলছে। গোল চশমার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে থাকছে জলে। আবার একটু পরে ছিপ তুলে দেখছে কিছু নেই। ছবিটা এভাবেই চলতে থাকছে।

ঠিক সাত দিনের মাথায় চিঠি এল! সন্দীপ আবার সেদিন কলকাতায় ছিল না। রাতে বাড়ি ফিরে দেখল। চিঠিতে বেতন, পার্কস, ছুটি সব বিস্তারিত লেখা।

আদ্যনাথবাবু কি সেই স্ক্রিন সেভারটাই এখন দেখছেন? মনে হচ্ছে, দেখছেন। সন্দীপ এদিকে বসে ঠিক বুঝতে পারছে না। সে চাকরিতে যোগ দিয়েছে তিন মাস হতে চলল। এখনও মানুষটার বেশিটাই সন্দীপ বুঝতে পারেনি। এই ঘরটার মতো। স্পষ্ট নয়, আবার অস্পষ্টও নয়। শুধু এইটুকু বুঝতে পারে, মানুষটা ইন্টারেস্টিং।

আদ্যনাথবাবু মুখ না ঘুরিয়েই সামান্য হাসলেন। বললেন, 'কেমন আছ, সন্দীপ?'

'ভাল আছি, স্যার। আপনি কেমন আছেন?' আদ্যনাথবাবু এবার মুখ ফেরালেন। কথায় বলে, মানুষ সবকিছু লুকোতে পারে, কিন্তু বুদ্ধি লুকোতে পারে না। ধারালো মুখ, টিকালো নাক, ঝকঝকে চোখে বুদ্ধি নিজে থেকেই ফুটে ওঠে। এই মানুষটার ক্ষেত্রে ঘটনা অন্যরকম। কালো, মোটা এবং অপেক্ষাকৃত বেঁটে এই প্রখর বুদ্ধিমান মানুষটার মুখটা যেন একটু বেশিরকমের গোল। নাকটা বড়। চোখ দুটো ছোট ছোট। অফিসে কেউ কেউ বলে, নিজের বদখত চেহারাটা ঢেকে রাখতেই উনি নাকি ঘরে কম আলোর ব্যবস্থা করেছেন।

'আমি খুব একটা ভাল নেই, সন্দীপ।'

সন্দীপ খানিকটা ব্যস্ত হয়ে বলে, 'কেন স্যার, কী হয়েছে? শরীর খারাপ?'

আদ্যনাথবাবু আবার একটু হাসলেন। বললেন, 'না, শরীর খারাপ নয়। মন খারাপ। কাল রাতে একটা স্বপ্ন দেখেছি। তারপর থেকেই মনটা খারাপ।'

এত বয়স্ক একটা মানুষের স্বপ্ন দেখে মন খারাপ হয়েছে শুনে হেসে ফেলা উচিত। সন্দীপের সেরকম কিছু হল না। উলটে তার খুব ইচ্ছে করল, স্বপ্নটা কী সেটা জানতে। মালিকের স্বপ্ন জানতে চাওয়া কি ঠিক হবে?

'এখানে তোমার চাকরির ঠিক কতদিন হল, সন্দীপ?'

'তিন মাস স্যার। আজকে নিয়ে তিন মাস দু'দিন। আমি জয়েন করেছিলাম...'

আদ্যনাথবাবু হাত তুলে থামিয়ে দিলেন। টেবিলের একপাশে রাখা ইন্টারকম তুলে চাপা গলায় বললেন, 'চা।' তারপর মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'সন্দীপ, এই সময়ের মধ্যে তুমি কি কোম্পানির কোনও কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরেছ?'

সন্দীপ একটু আমতা আমতা করে বলল, 'না, স্যার, এখনও পর্যন্ত সেরকম কোনও অ্যাসাইনমেন্ট পাইনি। শুধু গোসাবার কাছে একটা ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট...'

'আমি জানি। তুমি ওখানে একটা গেস্ট হাউসের প্রোপোজাল দিয়েছিলে। একেবারে নদীর গায়ে গেস্ট হাউস। আমার মনে পড়ছে। ওরা আমাকে ফাইলটা দেখিয়েছিল। একতলায় কিছু থাকবে না। শুধু বাগান। দোতলার ওপর বড় দুটো কাচের ঘর। সামনের ছাদটা নদী পর্যন্ত এগিয়ে যাবে। তাই তো?'

সন্দীপ উৎসাহী হয়ে বলে, 'হ্যাঁ, স্যার। একটা লঞ্চ রাখার কথাও বলেছিলাম। প্রোপোজালটা কি খারাপ ছিল স্যার?'

'না, খারাপ ছিল না। বেশ ভালই ছিল। তবু আমি বাতিল করে দিই। কারণ জিনিসটার মূলে একটা গোলমাল আছে। আমরা ওখানে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট তৈরির অর্ডার

পেয়েছি। গেস্ট হাউস বানানোর নয়। যা করার কথা নয়, সেটা করলে ফোকাস নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে।'

সন্দীপ খানিকটা লজ্জিত হয়ে বলে, 'সরি, স্যার।'

আদ্যনাথবাবু অল্প হাত তুললেন। বললেন, 'ইটস ওকে মাই বয়। ইটস ওকে।'

সন্দীপ লক্ষ করে দেখেছে, মানুষটার গলার আওয়াজটাও ঘরের আলোর মতো চাপা। প্রথমে একটু অস্বস্তি হয় ঠিকই, তবে পরে কেটে যায়।

'সন্দীপ, আজ তোমাকে একটা প্রজেক্টের ব্যাপারে ডেকেছি। খুব বড় প্রজেক্ট। এত বড় প্রজেক্ট কাননবালা কনস্ট্রাকশন আগে কখনও করেনি। পরে আর কখনও করতে পারবে কি না ঠিক নেই। তুমি বোধহয় জানো না, নতুন কোনও প্রজেক্টের আলোচনায় আমি সাধারণত কোম্পানির ওপরের দিকের সকলকে ডেকে নিই। কিন্তু এটার ক্ষেত্রে আমি তা করছি না। আমি চাইছি, প্রাথমিকভাবে জিনিসটা গোপন থাকুক। যতক্ষণ না ভাবনাটা ফাইনাল হচ্ছে। শুধু তুমি আর আমি জানব। এটাই হবে তোমার এখানে প্রথম কাজ।'

এই পর্যন্ত বলে আদ্যনাথবাবু থামলেন। চোখ তুলে বললেন, 'কেমন লাগছে সন্দীপ? তুমি কি উত্তেজনা বোধ করছ?'

সন্দীপ কী বলবে বুঝতে পারছে না। তার বিশ্বাস হচ্ছে না। টানা তিন মাস কাজ ছাড়া বসে থাকার পর এত বড় একটা দায়িত্ব, অবিশ্বাস্য তো লাগবেই। কাজ ছাড়া বসে থাকার কথা শুনে মনে হবে সন্দীপ এই অফিসের কোনও হেঁজিপেঁজি কর্মচারী। ঘটনা কিন্তু একেবারেই উলটো। সে একজন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ লোক। তার পদের নামটাও রাশভারী। আইডিয়া অ্যাসিস্ট্যান্ট। ভাবনার সহকারী। কোম্পানির মালিক নিজে এই পদ তৈরি করেছেন। নামটাও তাঁর দেওয়া। সন্দীপের কাজ হল, প্রয়োজন মতো কোম্পানিকে বিভিন্ন ধরনের ভাবনা জোগান দেওয়া।

গোড়াতে অফিসে অনেকেই গুজগুজ, ফুসফুস শুরু করে। কেউ বলল, পাগলামি ছাড়া কিস্যু নয়। কবিতা লেখার জন্য মালিক লোক রেখেছে। কেউ বলল, পয়সার অপচয়। এইভাবেই বড় কোম্পানি ডোবে। ইতিহাস বই খুললে অজস্র উদাহরণ পাওয়া যাবে। দু'-একজন আর একটু এগিয়ে গেল। তাদের মতে, এসব হল আত্মীয় ঢোকানোর ফিকির। লোকটা নিশ্চয় মালিকের মামাবাড়ির দিকের কেউ হবে। খোঁজ নাও। ভাল করে খোঁজ নিলেই সব জানতে পারবে।

কথাটা কানে গেল আদ্যনাথবাবুর। তারপরই সন্দীপ সাততলার ওপর আলাদা ঘর পেল। বাড়ি থেকে অফিস আসার জন্য আলাদা গাড়ি পেল। সেই গাড়ি সকাল ন'টায় বাড়ির সামনে হর্ন বাজায়।

সন্দীপের মুখে শুনে বিশ্বাস হয়নি। মণিদীপা একদিন সকালে নিজের চোখে গাড়ি দেখতে এল। হর্ন শুনে নাক কুঁচকাল। বলল, 'ছি, গাড়ির হর্নটা কী বিচ্ছিরি। বিয়ের পর কিন্তু এরকম বিচ্ছিরি হর্ন একদম অ্যালাউ করব না। সকালবেলা এরকম হর্ন শুনে ঘুম ভাঙবে, ইস আমি ভাবতেও পারছি না।'

সন্দীপের দেরি হয়ে গেছে। সে গালে দাড়ি কামানোর সাবান ঘষতে ঘষতে অবাক

হয়ে বলল, 'ন'টায় ঘুম ভাঙবে! সে কী? বিয়ের পর অত বেলা পর্যন্ত ঘুমোবে নাকি তুমি?'

মণিদীপা ঠোঁট টিপে হেসে বলল, 'ঘুমোবই তো। কত রাত পর্যন্ত দু'জনে জাগব না বুঝি?'

বেয়ারা এসে টেবিলে ট্রে বসিয়ে দিয়ে গেল। ট্রে-তে কাপ ডিশ, চায়ের পট, দুধ, চিনি সব আলাদা আলাদা সাজানো।

আদ্যনাথবাবুর এটাই অভ্যেস। তিনি নিজের হাতে চা বানিয়ে খান।

সন্দীপ কাঁপা গলায় বলল, 'স্যার, প্রজেক্টটা কী জানতে পারি?'

আদ্যনাথবাবু কথার উত্তর দিলেন না। মন দিয়ে চা বানাতে লাগলেন। শুধু একবার মুখ তুলে বললেন, 'চিনি?'

সন্দীপ চায়ে বেশি চিনি খায়। ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'কম স্যার।'

সন্দীপকে চা এগিয়ে দিয়ে আদ্যনাথবাবু নিজের কাপে চুমুক দিলেন।

'সন্দীপ, তোমার কি জানতে ইচ্ছে করছে না আমি কাল কী স্বপ্ন দেখেছি? কেন আমার মন খারাপ?'

সন্দীপ মাথা চুলকে বলল, 'ইচ্ছে করছে স্যার। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহস পাচ্ছি না।'

আদ্যনাথবাবু তাঁর চাকা লাগানো দামি চেয়ারটা ঠেলে একটু পিছনে সরিয়ে নিলেন।

'সন্দীপ, আমি ব্যক্তিগত কথা বলতে পছন্দ করি না। বলিও না। কিন্তু এই নতুন প্রজেক্টের সঙ্গে বিষয়টা জড়িত। সেই কারণেই তোমার জানা প্রয়োজন। আমার এই মন খারাপের গল্পটা না শুনলে তুমি কাজটা ঠিকমতো করতে পারবে না। যে ভাবনা তোমার কাছে চাইছি সেটা হয়তো পাব না।'

সন্দীপ লক্ষ করল কোথা থেকে যেন আলোর হালকা একটা রেশ মানুষটার মুখের একদিকে এসে পড়েছে। মানুষটাকে আরও রহস্যময় মনে হচ্ছে।

'তুমি কি জানো কাননবালা কে?'

সন্দীপ কাপটা টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখল। কাননবালা যে মালিকের স্ত্রীর নাম তা এ অফিসের সকলেরই জানা। সেই মহিলা সম্পর্কে নানা ধরনের গল্পও রয়েছে। বেশিটাই কেচ্ছা কেলেঙ্কারির গল্প। বয়স অল্প আর ভয়ংকর রকম সুন্দরী ছিলেন। বিয়ের খুব অল্প দিনের মধ্যেই মারা যান। সে মৃত্যু নিয়েও নাকি গোলমাল রয়েছে। এসব সত্যি না মিথ্যে সন্দীপ জানে না। জানার ইচ্ছেও নেই। সে ঠিক বুঝতে পারছে না, নতুন প্রজেক্টের সঙ্গে ওই মৃতা মহিলার কী সম্পর্ক।

সন্দীপ মাথা নামিয়ে বলল, 'স্যার জানি। উনি আপনার স্ত্রী। মারা গেছেন।'

'মারা যায়নি, আত্মহত্যা করেছে। গোপন রাখার যতই চেষ্টা হোক না কেন, সাধারণত পছন্দ অপছন্দের ব্যাপারগুলো বিয়ের কয়েকদিনের মধ্যে ধরা পড়ে যায়। আমার স্ত্রীর ক্ষেত্রে ধরা পড়তে বেশি সময় লাগে। কাননবালা আমাকে ছেড়ে তার পুরনো প্রেমিকের সঙ্গে চলে যায় বিয়ের ঠিক এক বছরের মাথায়। চলে যায় না বলে, পালিয়ে যায় বলাটাই ঠিক হবে। প্রথমে যায় দিল্লি। সেখান থেকে অন্য আর একজন তাকে নিয়ে চলে আসে বেনারস। বেনারসেই কাননবালা আত্মহত্যা করে। গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দেয়।

মৃত্যুর তিন দিন বাদে দরজা ভেঙে পোড়া পচা গলা দেহ বের করতে হয়েছিল। আমি মর্গে গিয়ে বডি আইডেন্টিফাই করেছিলাম কানের দুল দেখে। দুলটা আমার মায়ের ছিল। তুমি আর এক কাপ চা খাবে সন্দীপ? দার্জিলিং-এর সব চা ভাল হয় না। এই চা-টা ভাল। আমি আবার মকাইবাড়ির চা বেশি পছন্দ করি। অনেকে বলে কার্শিয়াং-এর দিকের চা বেস্ট। সাউথ থেকেও ভাল জিনিস আসছে। লিকার অনেক সফট হয়।

সন্দীপের মনে হয়েছিল, সে কিছুক্ষণ কথা বলতে পারবে না। কথা বলতে গেলে তার গলা বুজে আসবে। তা হল না। কোনওরকমে বলল, 'থ্যাঙ্কিউ স্যার। আমি আর চা খাব না।'

'ঠিক আছে। তা হলে আমি নিজের জন্য আর এক কাপ বানিয়ে নিই।'

আদ্যনাথবাবু চেয়ারটা আবার টেবিলের কাছে টেনে আনলেন। টি পটের ওপর ঢেকে রাখা টি কোজিটা যত্ন করে তুলে কাপে চা ঢাললেন। চিনির একটা কিউব ফেললেন। চামচ দিয়ে সামান্য নেড়ে, কাপে চুমুক দিয়ে মুখে আরামের একটা ভঙ্গি করলেন। তারপর কাপের দিকেই তাকিয়ে বলতে শুরু করলেন আবার।

'কাল রাতে স্বপ্নে কাননবালা এসেছিল। অনেকদিন পর। আফটার আ লং লং টাইম। সম্ভবত শেষ রাতের দিকে এল। সেটা নাও হতে পারে। অন্য কোনও সময়েও হতে পারে। স্বপ্ন তো, সময়টা গুলিয়ে যায়। দেখার সময় একরকম মনে হয়, আসলে হয়তো অন্যরকম। যাই হোক, আমি দেখলাম, সে একটা নীল রঙের বেনারসি শাড়ি পরেছে। ঘন নীল। এটা একটা আশ্চর্যের ঘটনা। স্বপ্নে সাধারণত সে সব পোশাক আশাকই দেখা যায় যেগুলো বাস্তবে ব্যবহার হয়েছে। কাননবালাকে আমি কখনও নীল বেনারসি পরতে দেখিনি। বিয়ের রাতে সে যেটা পরেছিল সেটা ছিল মেরুন। ডার্ক মেরুন। ভুল করেছি কি না জানার জন্য আজ সকালে আমি বিয়ের অ্যালবাম খুলেছিলাম। দেখলাম, না, ভুল করিনি। শাড়ি মেরুনই। তা হলে নীল বেনারসি দেখলাম কেন? তা ছাড়া স্বপ্নে রং দেখাটাও অসম্ভব। যাই হোক, দেখলাম কাননবালার গায়ের নীল শাড়ি ভিজে একেবারে চুপচুপে হয়ে আছে। সেই জলে আমার ঘরের মেঝে ভেসে যাচ্ছে।'

আবার থামলেন আদ্যনাথ। হাতের কাপ মুখ পর্যন্ত তুলে নামিয়ে রাখলেন। সম্ভবত খেতে দেরি হয়ে যাওয়ার কারণে চা ঠান্ডা হয়ে গেছে।

'বুঝলে সন্দীপ, মেয়েটার দুটো ছেলেমানুষি ছিল। তার মধ্যে একটা হল মার্কেটিং। কেনাকাটা করা। দোকান বাজারের শখ সব মেয়েদের কম বেশি থাকে। আমার স্ত্রীর বয়স কম ছিল, ফলে এই শখ তার যে একটু বেশিই হবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। আমি কখনও তাকে বাধা দিইনি। একটা কিছু নিয়ে তো থাকবে। টাকা আর গাড়ি নিয়ে যখন খুশি বাজারে বেরিয়ে যেত। আমি ওকে মার্কেটিং করতে একবার সিঙ্গাপুর পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। দ্যাট ওয়াজ হার ফার্স্ট টাইম প্লেন জার্নি। গোটা পথটা চোখ বুজে আমার হাত ধরে থাকল। আমি তো খানিকটা লজ্জাতেই পড়লাম। প্লেনসুদ্ধু সবাই দেখছে। বোঝো কী কাণ্ড! কিন্তু দ্বিতীয় ছেলেমানুষিটা খুব সমস্যা করত। মেয়েটা ভীষণ বৃষ্টিতে ভিজতে ভালবাসত। কিছুতেই সামলানো যেত না। একটা সুযোগ পেলেই হল, ফাঁকতালে খানিকটা ভিজে নিত। কত বকাবকি করেছি। নতুন বউ, ছাদে, বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওরকমভাবে ভেজে? লুকস অড।

তা ছাড়া সর্দি কাশি লেগেই থাকত। প্রথমে ভাবতাম ছোটবেলাটা গ্রামে কেটেছে। ভেজার হ্যাবিটটা রয়ে গেছে। ঠিক হয়ে যাবে। ঠিক হল না। কাল স্বপ্নেও দেখি এক ব্যাপার! আমি বললাম, এ কী, কানন! নিশ্চয় আবার বৃষ্টিতে ভিজেছ! উফ, তোমার ছেলেমানুষি এখনও যায়নি দেখছি! ছি ছি। দেখো তো ঘরটাকে কী করে ফেললে। যাও, কাপড় বদলে এসো। ভেজা কাপড়ে থাকলে ঠান্ডা লেগে যাবে। কাননবালা হাত দিয়ে কপাল থেকে ভেজা চুল সরাল। তারপর হেসে মাথা নাড়ল। চুল থেকে জল পড়ল মুক্তো দানার মতো। সেই জল এসে পড়ল আমার বিছানার ওপর। আমার গায়ের ওপর। তারপর হেসে বলল...

আদ্যনাথবাবু থামলেন। মুখ তুলে সন্দীপের চোখের দিকে তাকালেন সরাসরি। বললেন, 'তুমি কি পার্সোনাল কথা শুনতে বিরক্ত হচ্ছ?'

সন্দীপ যেন সে কথা শুনতে পেল না। সে আপনমনে ফিসফিস করে বলল, 'কী বলল?'

আদ্যনাথবাবু চোখ না সরিয়ে বলেন, 'কী বলল? বলল, দূর, জল কোথায়? এ তো কেরোসিন। গন্ধ পাচ্ছ না?'

'কেরোসিন!'

'হ্যাঁ, কেরোসিন। সুইসাইডের সময় কাননবালা...'

কথা থামিয়ে আদ্যনাথবাবু মুখ নামিয়ে নিজের মনেই হাসলেন। মুখ নামানো অবস্থাতেই ইন্টারকম তুলে বললেন, 'গাড়ি রেডি করতে বলুন। আমি বাড়ি চলে যাব। হ্যাঁ, সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক্যানসেল।' তারপর মুখ তুলে সন্দীপের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ইয়েস মাই বয়। বুড়ো মানুষের প্রেমকাহিনি কেমন লাগল? হাসি পেল? যাক, সন্দীপ, আমি ঠিক করেছি, কাননবালার নামে একটা বাজার বানাব। এখন যা বলে, ওই শপিং মল। এমন শপিং মল যা কেউ কখনও দেখা তো দূরের কথা, ভাবতেও পারেনি। তুমি ভাববে। সেই ভাবনা দেখে সবাই চমকে যাবে। ইয়েস তুমি। টাকা নিয়ে ভাববে না। আমি ইচ্ছে করলে পৃথিবীর বড় বড় শপিং মলের ভিডিও সিডি তোমাকে দিতে পারতাম। ঘুরিয়েও আনতে পারতাম। কিন্তু সেটা চাইছি না। আমার আশঙ্কা, তাতে তোমার নিজের ভাবনাটা নষ্ট হয়ে যাবে। টেক সেভেন ডেজ। সাত দিন সময় নাও। ঠিক সাত দিন পরে প্রজেক্ট রিপোর্ট নিয়ে তুমি আমার কাছে আসবে। বেস্ট অফ লাক।'

একটা ঘোরের মধ্যে দিয়ে ঘর থেকে বেরোতে বেরোতে সন্দীপের মনে পড়ল, আজ কাকে যেন সে অপেক্ষা করতে বলেছিল? কাকে বলেছিল? কোথায় সে অপেক্ষা করছে? মনে পড়ছে না। কিছুই মনে পড়ছে না।

২

মণিদীপার রাগের ব্যাপারটা অদ্ভুত।

কোনও একটা বিষয় নিয়ে সে টানা রেগে থাকতে পারে না। প্রথমে তিনদিন রাগবে, তারপর একটা বিরতি দিয়ে আবার একদিন রাগবে। এই বিরতিটাও অদ্ভুত। হঠাৎ এবং

চমকে দেওয়া বিরতি। সেই সময়টা তাকে দেখলে মনে হবে, কিছুই যেন হয়নি। পরেও কিছু হবে না।

এবার কিন্তু তা হচ্ছে না। বিরতি বা চমকে দেওয়া তো দূরের কথা, পাঁচ দিন হতে চলল সে কোনওরকম যোগাযোগই করছে না। মোবাইল বন্ধ, বাড়িতেও সে ফোন ধরছে না। ধরছে নমিতার মা। কাল রাতে নমিতার মা ফোনে সন্দীপকে ধমক দিয়েছে, 'দেখেন, আপনে কিন্তু বড্ড জ্বালাতন করেন। দিদিমণি আপনারে ফোন করতে না করেছে, তবু আপনি বারবার ফোন করেন কেন? এইডা করবেন না। আপনার একটা পেস্টিজ নাই? যখন বেকার ছিলেন তখন না হয় একডা কথা ছিল। এখন তো আর বেকার নন। তবে?'

নমিতার মা মণিদীপাদের রান্নার লোক। সন্দীপ তাকে চেনে না এমন নয়। গত সাত বছর যে বাড়ির মেয়ের সঙ্গে সে প্রেম করছে, সে বাড়ির রান্নার লোককে না চেনার কোনও কারণ নেই। সে তাড়াতাড়ি বলে, 'নমিতার মা, একটা খুব জরুরি কথা...' নমিতার মা ফোন কেটে দেয়।

মণিদীপার অবশ্য কোনও দোষ নেই। একটা সুন্দরী মেয়েকে পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনের সামনে যদি ঠায় দু'ঘণ্টা পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এবং যার জন্য দাঁড়িয়ে আছে তার মোবাইল ফোন যদি সেই সময় বন্ধ থাকে, তা হলে এমন ঘটনা ঘটতেই পারে।

সন্দীপ সেদিন কফি শপে বসে মণিদীপাকে সবটা খুলে বলতে যায়। পুরোটা পারে না। মালিকের সঙ্গে মিটিং, স্বপ্ন, গোপন প্রজেক্ট পর্যন্ত বলার পরই মণিদীপা আরও রেগে যায়। চাপা গলায় ধমকে বলে, 'অ্যাঁ! একজন তোমাকে তার স্বপ্নের কথা বলবে, আর সেটা শোনার জন্য তুমি তোমার প্রেমিকাকে এক ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রাখবে? কথাটা বলতে তোমার লজ্জা করছে না?'

'আহা, ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছ না মণি। স্বপ্নটা সিরিয়াস। সেটা তুমি শোনো। শুনলে চমকে যাবে। ভীষণ ইন্টারেস্টিং।'

'চুপ করো, একদম চুপ। স্বপ্ন সিরিয়াস না স্বপ্ন হাসির সেটা জানার কোনও দরকার নেই। অনেক হয়েছে, আর নয়। এটাই তোমার সঙ্গে আমার শেষ কফি খাওয়া।'

সন্দীপ পরিস্থিতি সামলাতে যায়। কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'তোমাকে তো বলেছি, আদ্যনাথবাবু মানুষটা কয়েক কোটি টাকার মালিক, অত বড় ব্যাবসা, তবু কোথায় যেন একটা ছেলেমানুষি আছে। বলিনি তোমাকে?'

মণিদীপা কফির মগে চুমুক দেয়। তার ঠোঁটের পাশে ক্রিম লাগে। ন্যাপকিন তুলে সেই ক্রিম মুছে ঠান্ডা গলায় বলে, 'বলেছ তো কী হয়েছে? তুমি তোমার ছেলেমানুষকে কোলে নিয়ে বড়মানুষ করো। আমি তো আপত্তি করছি না। করছি কি? কিন্তু আমাকে ছাড়ো।'

'মণি, এটা আমার প্রথম বড় কাজ। তিন মাস বসে বসে মাইনে নেওয়ার পর এটাই আমার ফার্স্ট চান্স। আমার প্রজেক্ট যদি ওঁর পছন্দ হয়...'

মণিদীপা টেবিল ছেড়ে উঠে পড়ে। বিলের ওপর টাকা রাখে। তারপর মোবাইলটা টেবিল থেকে তুলে নিয়ে বলে, 'তোমার উন্মাদ মালিকের পছন্দ অপছন্দ নিয়ে ভাবার সময় বা ইচ্ছে কোনওটাই আমার নেই। আমার ধারণা এই লোকের সঙ্গে তুমি যদি বেশিদিন কাজ

করো তা হলে তুমি দ্রুত উন্মাদে পরিণত হবে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি রাখবে। দুঃখিত, আমি তোমার সেই অবস্থা দেখতে চাই না, সুতরাং বিদায়। দয়া করে তুমি আমাকে আর বিরক্ত করবে না।' সন্দীপ একটু আগে পর্যন্ত খাটে বেডকভার মুড়ি দিয়ে শুয়ে ছিল। এখন পিঠ টান করে বসে আছে। তার দুটো চোখই বোজা। মুখ ভরতি খোঁচা খোঁচা দাড়ি। তিন দিন হল সে অফিসে যাচ্ছে না। প্রথম দু'দিন অফিসেই প্রজেক্টটা তৈরির চেষ্টা করেছিল। হুড়মুড় করে খান কয়েক বাড়ির ছবি এঁকে ফেলেছিল কিন্তু তাতে কাজ কিছু হয়নি। তখন ভাবল, বাড়িতে বসলে কাজ হবে। তাই অফিস না গিয়ে বাড়িতে বসে রাত দিন কাজ করেছে। তার খাটের পাশ পর্যন্ত টেবিলটা টানা। সেখানে কম্পিউটারের পাশে তাড়া তাড়া কাগজ। টেবিলের তলাতেও তাই। তবে সে কাগজগুলো দুমড়ানো মুচড়ানো এবং ছেঁড়া। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, সন্দীপ ধ্যান বা যোগব্যায়াম ধরনের কিছু করছে।

দুটোর একটাও ঠিক নয়। আসলে এই মুহূর্তে সে চেষ্টা করছে একটা বইয়ের কথা মনে করতে। একেবারে ফালতু বই। পাতলা ফিনফিনে। এক বছর আগে বেকার থাকার সময় চৌরঙ্গির বাস গুমটি থেকে কিনেছিল। বইয়ের নাম— 'পুরুষমানুষের রাগ কমানোর সহজ উপায়।' তাতে একশো ধরনের রাগ এবং সেগুলো কমানোর পদ্ধতি বলা ছিল। বউয়ের ওপর রাগ, চোরের ওপর রাগ, প্রেমিকার ওপর রাগ, পুলিশের ওপর রাগ থেকে শুরু করে মালিকের ওপর রাগ, কেরানির ওপর রাগ, এমনকী নিজের ওপর রাগ কমানোর পদ্ধতিও ছিল সেখানে। একেবারে এক, দুই, তিন পয়েন্ট করে।

এখন সেই নিজের ওপর রাগের অংশটাই মনে করার চেষ্টা করছে সন্দীপ। সমস্যা হল, আবছা আবছা মনে পড়ছে। সবটা পড়ছে না। পদ্ধতির নাম— ক্রোধ তাপ বিতাড়ন। এই পদ্ধতিতে প্রথমেই ঘরের সব জানলা দরজা খুলে দিতে হবে। তারপর খাটের ওপর টান টান হয়ে শুয়ে পড়ুন। মনে রাখবেন, ক্রোধের তাপকে তাড়াতে হলে আগে তাকে চেপে ধরতে হবে। তাই একটা চাদর নিয়ে পুরো শরীর ঢাকা দিন। খানিকটা পরে চাদর সরিয়ে ফেলুন। এবার খোলা দরজার দিকে মুখ করে, পিঠ সোজা করে, চোখ বুজে বসুন। এর পরেরটাই আসল। সেটা হল...

ব্যস, সন্দীপের আর মনে নেই। আসলটাই মনে নেই। থাকবেই বা কী করে? কতদিন আগে হেলাফেলা করে পড়া। সে জিনিস কি এখন মনে থাকে? অথচ থাকার দরকার ছিল। কারণ এই মুহূর্তে সন্দীপের নিজের ওপর প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে। এই রাগের পরিণতি কী হতে পারে সন্দীপ জানে না এমন নয়। ভাল করেই জানে। শো কজ, সাসপেনশন, চাকরি থেকে বরখাস্তের মতো যে-কোনও ধরনের ভয়ংকর পরিণতির সম্ভাবনা রয়েছে। অনেকটা আত্মহত্যার মতো। তবু করতে ইচ্ছে করছে। সম্ভবত এরকমটাই হয়। ভয়ংকর পরিণতির সম্ভাবনা জানা থাকলে মারাত্মক কাজের জন্য মন ছটফট করে। মানুষ সামান্য দড়ি হাতে খাড়া পাহাড় বেয়ে উঠে যায়। পলকা ছিপ নৌকো নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে উত্তাল সমুদ্রে।

সন্দীপের ইচ্ছে করছে টেবিলের ওপর রাখা কাগজগুলো বগলদাবা করে এখনই সোজা অফিসে পৌঁছে যেতে। পৌঁছে সোজা উঠে যাবে সাততলায় নিজের ঘরে। তারপর

কাগজগুলো কুচি কুচি করে ছিঁড়ে জানলা খুলে ভাসিয়ে দেবে বাইরে। এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। সন্দীপ এরপর ইন্টারকমে মালিককে ধরতে যায়।

'স্যার, আপনি কি খুব ব্যস্ত? মিটিং করছেন? স্যার, এক মিনিটের জন্য মিটিং ছেড়ে উঠে আসতে হবে। একবারটি আপনি আপনার ঘরের পিছনের লম্বা জানলাটার সামনে এসে দাঁড়ান প্লিজ। এবার পরদা সরালেই চমৎকার একটা দৃশ্য দেখতে পাবেন। দেখুন, অজস্র কাগজের টুকরো ভাসছে। শয়ে শয়ে, হাজারে হাজারে। ভাল করে দেখুন স্যার। এক-একটা টুকরো এক-এক রকম। কোনওটা নৌকোর মতো পাল তুলে সামনের দিকে ছুটছে। কোনওটা পালকের মতো ফুরফুরিয়ে ভেসে নামছে নীচে। কোনওটা আবার কোনদিকে যাবে বুঝতে না পেরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে মাঝপথে। অপূর্ব না স্যার? স্যার, নিজের কথা নিজের মুখে বলতে লজ্জা লাগে। তবু না বলে পারছি না। এই কাজটা স্যার আমার। আমি করেছি। গত তিন দিন ধরে সাতখানা প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করেছি। সাতটা শপিং মল। আজ সেগুলোই যত্ন করে ছিঁড়লাম। তারপর জানলা খুলে ছেঁড়া কাগজগুলো... কেন এমন করলাম জানেন স্যার? আমি বুঝতে পারছি, এগুলো কিছুই হয়নি। একেবারে সাদামাটা সাধারণ। আপনি যা চেয়েছেন তার ধারেকাছেও যেতে পারিনি। এই কারণেই নিজের ওপর ভীষণ রাগ হচ্ছে স্যার।'

প্রায় মিনিট পনেরো এভাবে চোখ বুজে বসে থাকার পর সন্দীপের কেমন ভয় করে উঠল। পাগল হয়ে যাচ্ছে না তো? আশ্চর্য কিছু নয়। তিন দিনে সাত রকমের শপিং মলের কথা ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। মণিদীপা তো এরকম আশঙ্কার কথা বলেই ছিল।

ধড়ফড় করে চোখ খুলল সন্দীপ। চোখ খুলেই চমকে উঠল। একটু দূরেই জানলার পাশে চেয়ার টেনে বসে আছে মণিদীপা! বসে নির্লিপ্ত মুখে পা দোলাচ্ছে। সন্দীপ লাফিয়ে উঠল।

'তুমি! তুমি কখন এলে?'

মণিদীপা কথার উত্তর না দিয়ে চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল, 'এমন চেহারা হয়েছে কেন? দাড়ি-টাড়ি কামাওনি। পাজামা, গেঞ্জি পরে বাড়িতে বসে আছ যে! অফিসে যাও না কেন? অসুখ হয়েছে না তাড়িয়ে দিয়েছে?'

সন্দীপ তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে একটা পাঞ্জাবি গলাতে গলাতে শুকনো গলায় বলল, 'অসুখ টসুখ কিছু নয়। বিপদে পড়ে ক'টা দিনের জন্য ছুটি নিয়েছিলাম মণি। ছুটি নিয়ে এবার মহাবিপদের মধ্যে পড়েছি। মনে হচ্ছে, ছুটি একেবারে পাকাপাকি নিয়ে নিতে হবে। তার মধ্যে তুমি আবার ঝামেলা পাকিয়েছ। বিপদের সময় পাশে না থাকলে... তুমি কি আমার বিপদের কথাটা শুনবে?'

মণিদীপা মুখ ঘুরিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে বলল, 'বাঃ, বাইরেটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। মেঘ করেছে। বৃষ্টি হবে নাকি?'

সন্দীপ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'রাখো, তোমার মেঘ-বৃষ্টি। মণি, তুমি শুনলে হাসবে আমি প্রজেক্টটা বানাতেই পারলাম না। অথচ হাতে মাত্র দুটো দিন। উনি এত ভরসা করে আমাকে কাজটা দিলেন। চাকরিটা থাকবে না।'

মণিদীপা চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসল। বলল, 'সে কী, এতদিনেও হল না? সামান্য একটা শপিং মলের ডিজাইন ভাবতে পারলে না? আমাকে জিজ্ঞেস করলেই পারতে। আচ্ছা, বলছি চট করে শুনে নাও। একতলায় জামাকাপড়। দোতলায় ক্রকারিজ। তিনতলাটা শুধু অর্নামেন্টসের জন্য রাখো। চারতলার একদিকে কসমেটিক্স আর একদিকে বিউটি পার্লার, স্পা, জিম। চলবে?'

সন্দীপ অস্থিরভাবে মাথা নাড়িয়ে বলল, 'না, না, এরকম নয়। এরকম তো আমি অনেকগুলো করেছি। অন্য কিছু, অন্যরকম।'

'সেটা কীরকম?' চোখ বড় করে বলল মণিদীপা।

সন্দীপ হতাশ হয়ে ফের খাটের ওপর গিয়ে বসল। বিড়বিড় করে খানিকটা আপনমনেই বলল, 'কীরকম সেটাই তো বুঝতে পারছি না। ভাবছি, অনেক ভাবছি। তবু মাথায় আসছে না। জিনিসটা হবে আদ্যনাথ বসুর স্বপ্নের মতো। তাঁর পালিয়ে যাওয়া মৃত স্ত্রী কাননবালার শখের মতো। পালিয়ে যাওয়া মরা বউয়ের জন্য বুড়ো মানুষটার ভালবাসার একটা ছোঁয়া থাকবে তাতে। সেই ছোঁয়া হবে সুন্দর অথচ মনখারাপ করা।'

মণিদীপা খাটের পাশে এগিয়ে এল। সন্দীপের কাঁধে হাত রেখে বলল, 'গোড়াতেই বলেছিলাম, এটা একটা পাগলামির চাকরি। এখানে বেশিদিন থাকলে নিজেও পাগল হয়ে যাবে। সেটাই হয়েছে। পাগল হয়ে যেতে শুরু করেছ। নইলে কেউ শপিং মলের ডিজাইন করতে গিয়ে স্বপ্ন, সুন্দর, মনখারাপ এসব ভাবে? একটা পেতনি মার্কেটিং করবে বলে যা করছ, সেটা পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। শহরে অনেক শপিং মল রয়েছে। তোমার পেতনিকে বলো, বেশি রাতে সেগুলোর একটায় ঢুকে পড়তে। নিশ্চিন্তে ব্যাগ ভরতি বাজার সেরে কফি টফি খেয়ে বাড়ি ফিরতে পারবে। কেউ বিরক্ত করবে না।'

সন্দীপ ক্লান্ত গলায় বলল, 'জিনিসটা ঠাট্টার নয়, মণি।'

'ছি, ঠাট্টার হবে কেন? পেতনির জন্য বাজার বানানো কি একটা ঠাট্টার জিনিস হল? খুবই সিরিয়াস জিনিস। তবে আপাতত ওইসব হাবিজাবি চিন্তা ছেড়ে আমার সঙ্গে তুমি বেরোবে। এই মেঘলা দুপুরে আমরা দু'জনে খানিকক্ষণ রাস্তায় হাঁটব। তারপর বৃষ্টি নামলে কোনও একটা চায়ের দোকানে ঢুকে ভাঁড়ে করে চা খাব। মনে হয়, এতে পুরো অসুস্থ হয়ে যাওয়ার আগে তুমি খানিকটা সময় পাবে। যাও, তৈরি হয়ে নাও। দাড়িটা কামাতে হবে না। বেশ একটা পাগল পাগল দেখাচ্ছে। মেঘলা দিনে পাগলের পাশে হাঁটতে কেমন লাগে দেখি।'

সন্দীপের বেরোতে একেবারেই ইচ্ছে নেই। তার ইচ্ছে আবার ডিজাইনটা নিয়ে বসার। শেষ চেষ্টা। কিন্তু কথাটা মুখ ফুটে বলতে সাহস হল না। পাঁচ দিন রাগের পর মণিদীপা এসেছে। এইসময় তার মতের বিরুদ্ধে যাওয়ার ফল মারাত্মক হতে পারে। এত চাপ একসঙ্গে নেওয়া কঠিন হবে।

চুপ করে সন্দীপ তৈরি হয়ে নিল। বেশিক্ষণ হাঁটতে হল না। মিনিট পনেরোর মধ্যে বৃষ্টি নামল। প্রথমে বড় বড় ফোঁটায়। তারপর মুহূর্তে চারপাশে সাদা করে। মণিদীপা সন্দীপের কনুইয়ের কাছটা ধরে ফিসফিস করে বলল, 'ইস কী মজা! অ্যাই ভিজবে?' সারা শরীর

কেঁপে উঠল সন্দীপের। সামনের দোকানটায় এক ছুটে ঢুকে যাবে ভেবেছিল সে। পারল না। থমকে দাঁড়াল।

কে কথাটা বলল? মণিদীপা? নাকি কাননবালা? কে বলল?

৩

'তোমার কি ঠান্ডা লেগেছে সন্দীপ? আমি কি এসিটা কমিয়ে দিতে বলব?'

আদ্যনাথ বসুর ঘরের আলোগুলো যেন আজ আরও একটু চাপা। আরও একটু নরম। ছ'দিনে মানুষটা কি একটু রোগা হয়ে গেছে? নাও হতে পারে। আলো-ছায়ার নানা ধরনের বিভ্রান্তি হয়।

'ঠান্ডা লেগেছে স্যার। তবে এসি কমাতে হবে না। অতটা কিছু নয়।'

'গুড। কিছু না হলেই ভাল। সন্দীপ, তুমি কিন্তু ইচ্ছে করলে আরও একটা দিন সময় নিতে পারো। তোমাকে সাত দিন সময় দেওয়া হয়েছিল। সেভেন ডেজ। তুমি একদিন আগেই চলে এসেছ।'

সন্দীপ এক মুহূর্ত চুপ করে রইল। তারপর হেসে বলল, 'স্যার, আমার আর সময় দরকার নেই। আমার কাজ হয়ে গেছে।'

'কাজ হয়ে গেছে?' আদ্যনাথবাবুর গলায় যেন সামান্য অবাক হওয়ার সুর। তিনি চেয়ারটা ঠেলে একটু এগিয়ে আনলেন। বললেন, 'তুমি শিয়োর যে তোমার কাজ হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ, স্যার। আমার কাজ হয়ে গেছে। তবে সেই ভাবনা আপনার পছন্দ হবে কি না জানি না।'

হাত দিয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলতে তুলতে আদ্যনাথবাবু বললেন, 'তুমি ক'টা প্রজেক্ট এনেছ, সন্দীপ? মানে আমি বলতে চাইছি, হাউ মেনি অপশনস?' তারপর রিসিভারে মুখ রেখে বললেন, 'এখন ঘরে কোনও লাইন দেবেন না।'

সন্দীপ একটু থামল। তারপর গলায় জোর এনে বলল, 'কোনও অপশনস নেই। নো অপশনস। একটাই প্রজেক্ট।'

'একটা! ওনলি ওয়ান!' আদ্যনাথবাবু পা দিয়ে চেয়ারটাকে ফের একটু পিছিয়ে নিলেন। এইসময় তাঁর মুখের একপাশে একটা আলোর রেখা এসে পড়বার কথা। অন্য দিন অন্তত পড়ে। আজ পড়ল না।

'হ্যাঁ স্যার, একটা।'

'আশ্চর্য। এত বড় একটা কাজের জন্য একটা মাত্র প্রোপোজাল! তোমাকে কোয়াইট কনফিডেন্ট মনে হচ্ছে, সন্দীপ। আচ্ছা, ফাইলটা দাও।'

'ফাইল তো আনিনি স্যার। সত্যি কথা বলতে কী, আমি লিখিনি কিছুই। পুরোটাই শুধু ভেবেছি।'

আদ্যনাথবাবু সোজা হয়ে বসলেন। ঠোঁটের ফাঁকে একটু হাসলেন। এত কম আলোতে সেই হাসি দেখতে পাওয়ার কথা নয়। তবু সন্দীপ দেখতে পেল।

'ইন্টারেস্টিং। অনেক বছর পর আমি কোনও প্রজেক্ট মুখে মুখে শুনব। জিনিসটা বলতে তোমার কতক্ষণ লাগবে? আধ ঘণ্টা? এক ঘণ্টা? আমরা কি তার আগে এক কাপ চা খেয়ে নেব?'

'স্যার, আমার মনে হচ্ছে, খুব বেশি হলে আট থেকে দশ মিনিটের মধ্যে আপনাকে বলে ফেলতে পারব।'

মাত্র দশ! ওনলি টেন? আর ইউ শিয়োর ওনলি টেন?

'হ্যাঁ, স্যার। দশ মিনিটই যথেষ্ট। আমি কি শুরু করতে পারি?'

'তুমি শুরু করো।'

আদ্যনাথবাবু চশমা খুলে মাথা চেয়ারে ঠেকালেন। সন্দীপ শান্ত ভঙ্গিতে বলতে শুরু করল।

দশ নয়। লাগল বারো মিনিট। একটা সময় পর্যন্ত আদ্যনাথবাবু সন্দীপের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা শুনছিলেন। তারপর তিনি মুখ নিচু করে ফেলেন। সন্দীপ থামার পর স্থির হয়ে বসে থাকেন দীর্ঘক্ষণ। একইভাবে, মুখ নামিয়ে। তারপর ফিসফিস করে বলেন, 'তুমি কি আর একবার ওই জায়গাটা থেকে বলতে পারবে সন্দীপ? বলবে?'

সন্দীপ টেবিলের ওপর অনেকটা বেশি ঝুঁকে পড়ে। মালিকের টেবিলে এতটা ঝুঁকে পড়া যায় না। সন্দীপ উত্তেজনায় সে সব ভুলে গেছে।

'কোন জায়গাটা থেকে স্যার আপনার ভাল লেগেছে?'

আদ্যনাথবাবু যেন সন্দীপের পুরো কথা শুনতেই পেলেন না। বললেন, 'ওই যে যেখানে মেঘ আরও কালো হয়ে এল।'

সন্দীপ উৎসাহের সঙ্গে প্রায় উঠে দাঁড়াল। বলল, 'স্যার, দোতলা স্যার। দোতলা। একতলায় যে হালকা মেঘলা ভাবটা ছিল সেটা দোতলায় আরও কালো করে আনা হবে। করিডরে আলোটা এমন করা হবে যাতে মনে হয় মেঘে মেঘে আকাশ সত্যি কালো হয়ে গেছে। একতলার প্যাসেজগুলোতে আমরা হালকা একটা ঠান্ডা হাওয়া রাখব। কাছাকাছি কোথাও বৃষ্টি হলে যেমন হাওয়া দেয় সেরকম। দোতলায় সেটা বাড়বে। তিনতলায় উঠলে এটাকেই স্যার একটা ঝড়ের চেহারা দিতে হবে।'

'ঝড়!' বিড়বিড় করে বললেন আদ্যনাথ।

'হ্যাঁ স্যার, ঝড়। আমাদের শপিং মলের তিনতলার করিডরে সবসময় মেঘ আর ঝড় পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয়, সঙ্গে বড় বড় ফোঁটার বৃষ্টি ফেলতে শুরু করব। জিনিসটা করা কোনও সমস্যা হবে না। সিলিং থেকে শাওয়ার দিয়ে সহজেই করা যাবে। শুধু ড্রেনেজটা স্যার খেয়াল থাকে যেন। অতটা জল সারাক্ষণ পাম্প আউট করে ফেলতে হবে তো। আমাদের এঞ্জিনিয়াররা নিশ্চয় সেটা পারবে। এরপর চারতলায় আমরা ভালভাবে বৃষ্টি নামাব। আপনাকে তো একটু আগে বললামই, যাঁরা চারতলায় উঠবেন এমন প্রতিটা কাস্টমারের জন্য আমরা ছাতা এবং ওয়াটারপ্রুফের ব্যবস্থা রাখছি। শপিং মলের নীচেই সব

পাওয়া যাবে। সেই ছাতা নিয়ে আর ওয়াটার প্রুফ পরে দোকানে দোকানে ঘুরে কেনাকাটা করাটাই হবে মেঘ-বৃষ্টির আসল মজা।'

আদ্যনাথবাবু চেয়ারটা ঠেলে যেন আরও একটু অন্ধকার দিকে সরে গেলেন। তিনি যেন চাইছেন উলটোদিকে বসে থাকা সন্দীপ তাঁর মুখ দেখতে না পায়।

'মেঘ-বৃষ্টি! মেঘ-বৃষ্টিটা ঠিক কী?'

সন্দীপ এবার লজ্জা পেল। নিচু গলায় বলল, 'আমাদের শপিং মলের নাম স্যার। আমি ভেবেছি। খারাপ হয়েছে?'

আদ্যনাথবাবু উত্তর দিলেন না। সন্দীপ বলতে লাগল, 'একদম ছাদে একটা রেস্তরাঁর কথাও ভেবেছি। বড় রেস্তরাঁ। সিন্থেটিক ছাদ। ছাদের ওপর সারাটা সময় ঝরঝর করে বৃষ্টি পড়বে। সময় বুঝে আলোটাও অ্যাডজাস্ট করা যাবে। এখানে স্যার জলের থেকে আমরা বৃষ্টির শব্দের দিকে বেশি মন দেব। অল্প অল্প ছাঁট আসবে। এখানে মূল মেনুটাই হবে খিচুড়ি। নানা ধরনের খিচুড়ি। সঙ্গে ইলিশ মাছ। আমার ধারণা, ঠিকমতো করা গেলে, এটা স্যার, খুবই আকর্ষণীয় হবে।'

'মেঘ-বৃষ্টিতে কোনও ভেজার জায়গা নেই, সন্দীপ?'

আদ্যনাথবাবুর গলাটা একটু অন্যরকম শোনাল কি? একটু ভারী?

'স্যার, আলাদা করে ভেজার জায়গা না রাখলেও ইচ্ছে করলে যে কেউ ভিজতে পারবে। পুরো ব্যবস্থাটাই সেরকম রাখা যেতে পারে। কাঁচা সবজি, আনাজপাতি আর ফলের দিকটা তো স্যার আমি ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যেই রাখতে চাই।'

'তোমার কি বলা শেষ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, স্যার শেষ হয়েছে। আপনার কেমন লাগল। পছন্দ হয়েছে?'

'এবার তা হলে চা দিতে বলি?'

'বলুন স্যার।'

আদ্যনাথ বসু এতক্ষণ পরে মুখ তুললেন। কম আলোর কারণে সন্দীপ দেখতে পেল না, এই বয়স্ক, কুৎসিত দর্শন মানুষটার দু'চোখ গড়িয়ে জল পড়ছে।

বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

সানন্দা পুষ্পাঞ্জলি, ২০০৬

ডাস্টবিন

১

বিভূতিচরণের মুখ থমথম করছে। তিনি স্থির হয়ে বসে আছেন। অথচ সকালের এই সময়টা বিভূতিচরণের হাসিমুখে থাকার সময়। তাঁকে ঘিরে থাকে দর্শনার্থী আর দলের ছেলেপিলেরা। তারা অভাব, অভিযোগ, আবদার এবং বিচারের কথা বলে। বিভূতিচরণ এসব শোনেন না। শোনে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি জীবন। শুনে গুরুত্ব অনুযায়ী কাগজে লিখে ফেলে। এই গুরুত্ব বোঝাটা একটা কঠিন কাজ। অনেকদিনের অভিজ্ঞতা লাগে। কী বলছে সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, কে বলছে সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। কথা শুনে নয়, মুখ দেখে জীবন কাগজে নোট নেয়।

ঘরের এক পাশে কাজ চলে, অন্য পাশে বিভূতিচরণ নিচু গলায় অল্প অল্প কথা বলেন। সেইসব কথার অধিকাংশই আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলির ওপর গভীর তত্ত্বের কথা। যেমন বুশের জয় বিশ্বের কৃষি বাজারে কেমন প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারে অথবা দেশে ঘনঘন ধর্মঘট এড়াতে রুশ প্রধানমন্ত্রীর ঠিক কোন পথে এগোনো উচিত এইসব।

সামনে বসে যারা এসব শোনে তারা এসব কথার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারে না। পারার কথাও নয়। তবে তাতে কোনও অসুবিধে হয় না। সব কথাতেই প্রবল উৎসাহের সঙ্গে মাথা নাড়ে। সবথেকে বেশি মাথা নাড়েন গঙ্গারাম পাঁড়ে। তিনি এ অঞ্চলের একজন নামকরা ইট-বালি সাপ্লায়ার। ইদানীং জটিল আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে পাঁড়েজি গম্ভীরমুখে দু'-একটা মতামতও দিচ্ছেন। বিভূতিচরণের তাঁকে মনে ধরেছে। তিনি ঠিক করেছেন, পাঁড়েজিকে খুব শিগগিরই দলে নিয়ে নেবেন।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই সময়ে বিভূতিচরণের জন্য বাড়ির ভেতর থেকে একটা বড় কাচের গেলাসে চা আসত। কথার ফাঁকে ফাঁকে বিভূতিচরণ তাতে চুমুক দিতেন। সম্প্রতি ব্যবস্থা বদলেছে। কাচের জায়গায় আসছে পাথরের গেলাস। তাতে নিমপাতার ঘন সবুজ শরবত। সাতসকালে নিমপাতার শরবত অতি জঘন্য একটা জিনিস। মুখে দিলে পেটে পাক মারে। বিভূতিচরণ সেটা বুঝতে দেন না। চুমুক দেওয়ার সময় চোখে একটা তৃপ্তির ভাব রাখেন।

প্রতিদিনই কেউ না কেউ গদগদ গলায় তাঁকে জিজ্ঞেস করবে, 'বিভুদা, ওটা কী খাচ্ছেন? বাদামের শরবত নাকি?' বিভূতিচরণ নরম গলায় বলবেন, 'শরবতটা ঠিকই ধরেছ। তবে বাদামের শরবত নয়। নিমপাতার শরবত খাচ্ছি ভাই।'

'নিমপাতার শরবত! ওরে বাবা, সে তো মারাত্মক জিনিস! শুনেছি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোজ সকালে নিমপাতার শরবত খেতেন। আপনিও খান!'

বিভূতিচরণ মৃদু হাসবেন। লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলবেন, 'যাঃ, পাগল কোথাকার। কার সঙ্গে কার তুলনা।'

সেই বিভূতিচরণ আজ দলের কয়েকজনকে বাদ দিয়ে সব দর্শনার্থীকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। তারপর থমথমে মুখে বসে আছেন। থমথমে মুখে বসে থাকবার কারণ আছে। গতকাল তাঁর এলাকায় বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে, অথচ তিনি কিছুই জানতে পারেননি। এটা ভয়ংকর ব্যাপার। বিভূতিচরণ কোনও অগা-বগা পাবলিক নন, তিনি এই অঞ্চলের নির্বাচিত প্রতিনিধি। গত নির্বাচনে অমিয় সামন্তকে ষোলোশো বাইশ ভোটে পরাজিত করেছেন। এই জয়ের জন্য তাঁকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। তবু তিনি কাল কিছু জানতে পারেননি। জানতে পারলেন আজ সকালে। দলের সিস্টেম একেবারে ভেঙে না পড়লে এ জিনিস হওয়ার কথা নয়। এই কারণেই তাঁর মুখ থমথমে।

সকালে খবরের কাগজগুলো খুলতেই বিভূতিচরণ দেখতে পেলেন বড় বড় হেডিং— 'এক হতদরিদ্র ভিখিরি পরিবারের সততা।' হেডিং-এর নীচে রঙিন ফটো। ফটোতে দেখা যাচ্ছে, সাত-আট বছরের এক বালক তার বাবা-মাকে দু'পাশে নিয়ে খাটিয়ার ওপর বসে আছে। খোলা আকাশের তলায়, ফুটপাথের ওপর সেই খাটিয়া পাতা। ব্যাকগ্রাউন্ডে নীল প্লাস্টিক, আর ভাঙা দরমা দিয়ে তৈরি ঝুপড়ি উঁকি মারছে। সম্ভবত এই ঝুপড়ি পরিবারটির বাড়ি। খাটিয়ার একদিকে একটা ট্রানজিস্টর রেডিয়ো, অন্যদিকে একটা নেড়ি কুকুর। কুকুর খাটিয়ার মধ্যে মাথা গুঁজে ঘুমোচ্ছে। তবে বাবা, মা এবং ছেলে তাকিয়ে আছে ক্যামেরার দিকে। তিনজনের চোখেই ভয় ভয় ভাব। মনে হচ্ছে, এটাই এদের জীবনের প্রথম ছবি ওঠার ঘটনা। তিনজনেরই জামাকাপড়ের অবস্থা ভয়ংকর। ছেঁড়া, তাপ্পি মারা। খাটিয়ার পাশে একটা ডাস্টবিন। গায়ে মরচের দাগ। ডাস্টবিনের ওপর থেকে উপচে পড়ছে আবর্জনা। সেই আবর্জনায় পুরনো জুতো, ফুলকপির ডাঁটা, তোবড়ানো প্লাস্টিকের বোতল, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো সবই আছে। ফটো থেকেই যেন দুর্গন্ধ আসছে! ফটোর নীচে ক্যাপশন— 'এই সেই সৎ ভিখিরি পরিবার এবং এই সেই ডাস্টবিন। যে ডাস্টবিন এতদিন সামান্য ময়লা ফেলবার পাত্র হয়ে পথের পাশে পড়ে ছিল, তাই আজ হয়েছে সততার প্রতীক, লোভহীনতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।'

এরপর রয়েছে ঘটনার বিবরণ। বিবরণে বলা আছে, কীভাবে এই পরিবার ডাস্টবিন ঘাঁটতে গিয়ে একটা কাপড়ের পুঁটলি কুড়িয়ে পেল, কীভাবে সেই পুঁটলি খুলে দেখতে পেল গয়না, কীভাবে সেই পুঁটলি তারা পুলিশের কাছে গিয়ে জমা দিল ইত্যাদি। রোমহর্ষক, আবেগঘন কাহিনি।

বিভূতিচরণের ইচ্ছে করছে, সামনে বসে থাকা ছেলেদের দিকে নিমপাতার শরবত ভরতি পাথরের গেলাসটা ছুড়ে মারি। যাক, একটার মাথা ফেটে যাক। দরদর করে রক্ত পড়ুক। তাতে হয়তো রাগ কিছুটা কমবে। তিনি নিজেকে অনেক কষ্টে সামলালেন। হিসহিসে গলায় বললেন, 'এসব কি সত্যি? সত্যি এই ঘটনা ঘটেছে?'

পল্টু কাঁদোকাঁদো গলায় বলল, 'হ্যাঁ বিভুদা, সত্যি ঘটেছে। কাল রাতে আমরা কিছুই জানতে পারিনি। খারাপ ঘটনা হল, কীভাবে যেন অমিয় সামন্তর কানে খবরটা চলে যায়। ব্যাটা রাতেই ওই ঝুপড়ির ওখানে ছুটে গেছে। তখন টিভিওলারা ছিল। ভিখিরিদের ইন্টারভিউ নিচ্ছিল। আজ সকাল থেকে ওদের সঙ্গে অমিয়কেও টিভিতে দেখাচ্ছে।'

বিভূতিচরণ শীতল গলায় বললেন, 'দয়া করে টিভিটা চালাও।'

টিভি চালানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই পরদায় ছবি ভেসে উঠল। সেই ছবি বিভূতিচরণের হাড় হিম করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

ছবি এরকম—

গভীর রাত। সাদা কুর্তা আর ঘি রঙের পাঞ্জাবি পরে অমিয় হাসিমুখে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। এক হাতে সে ভিখিরি বালককে জড়িয়ে আছে। অন্য হাতে খানকতক কম্বল। পাশে সেই ভাঙা ডাস্টবিন। সেখান থেকে ছেঁড়া জুতো আর কপির ডাঁটা উঁকি দিচ্ছে। অমিয় জড়িয়ে ধরার কারণে ছেলেটার মনে হয়, দম চাপা লাগছে, সে ছাড়া পাওয়ার জন্য ছটফট করছে। অমিয় তাকে আরও শক্ত করে চেপে ধরল। তারপর ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে গলা কাঁপিয়ে বলল, 'এই দরিদ্র, সৎ পরিবার আমার বহুদিনের পরিচিত। আমার এলাকার মানুষ। আমার একান্ত আপনজন। এদের সততা আসলে আমার সততা। এদের কষ্ট আসলে আমার কষ্ট। তাই এত রাতেও আমি এদের জন্য কিছু শীতবস্ত্র নিয়ে ছুটে এসেছি।'

বিভূতিচরণের এবার মনে হল, পাথরের গেলাসটা এবার টিভির পরদায় ছুড়ে মারলে ভাল হয়। এপ্রিল মাসের গরমের রাতে শীতবস্ত্র নিয়ে ছুটে গেছে! এ লোক ছোটখাটো হারামজাদা নয়, খুব বড় হারামজাদা। শালা প্রথম চান্সেই ইস্যুটাকে ধরে নিয়েছে। রাজনীতিতে ইস্যু বড় কথা নয়, ইস্যুকে ধরাই বড় কথা। এবার ভিখিরির বাচ্চাগুলোকে নিয়ে ওরা বিরাট লাফালাফি শুরু করবে। বিভূতিচরণের বুক ধড়ফড় করছে। প্রেশার কি বেড়ে গেল? মনে হচ্ছে বেড়ে গেল। এর জন্যই বলে, বিপদ কোথা থেকে আসবে তার কোনও ঠিক নেই। তাঁর বিপদ এল সামান্য ফুটপাথ থেকে! খবরটা যদি আগে পাওয়া যেত তা হলে অমিয়র বদলে টিভির পরদায় এখন তাঁর ছবি ভেসে উঠবার কথা। ধড়ফড় বুকের ভেতরটা হু হু করে উঠল।

আগুন-গরম মাথা নিয়ে বিভূতিচরণ চিন্তার মধ্যে ডুবে ছিলেন। কিছু একটা করতে হবে। এভাবে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। যে করেই হোক অমিয়কে আটকাতে হবে। আচ্ছা, ফ্যামিলিটাকে রাতে তুলে নিয়ে হাপিস করে দিলে কেমন হয়? ঝুঁকি হয়ে যাবে? বড়লোক অপহরণ খুব একটা কঠিন কিছু নয়, হামেশাই শোনা যায়। কিন্তু ভিখিরি অপহরণ? জানাজানি হয়ে গেলে কেলেঙ্কারি। না, তাঁকে এগোতে হবে অন্য পথে। কিন্তু কী সেই পথ? সেই পথ কি পাওয়া যাবে?

মিনিট দশেক গভীর ভাবনার পরেই পথ পাওয়া গেল। মুচকি হেসে জীবনকে কাছে ডাকলেন বিভূতিচরণ। ফিসফিস করে বললেন, 'ভাল করে শোনো জীবন। খুব মন দিয়ে শোনো। বুঝতেই পারছ ওরা পরিবারটাকে নিয়ে ক'দিন খুব নাচবে। নাচুক, যত খুশি নাচুক। এই সময়টা আমরা নাচব ওই ডাস্টবিন নিয়ে। নাচ কাকে বলে দেখিয়ে দেব।'

জীবন অবাক হয়ে বলল, 'ডাস্টবিন নিয়ে নাচব!'

'হ্যাঁ, ডাস্টবিন নিয়ে। যে ডাস্টবিনটা থেকে গয়না-টয়না কুড়িয়ে ফেরত দেওয়া হয়েছে সেটাই হবে আমাদের তুরুপের তাস। ওরা খেলবে ভিখিরি নিয়ে, আমি খেলব ডাস্টবিন নিয়ে। দেরি কোরো না, তুমি বেরিয়ে পড়ো। ডাস্টবিনটা আমার চাই। ডাস্টবিন নিয়ে ফিরে এসে খবরের কাগজ, টিভি অফিসে ফোন করবে। বিকেলে বাড়িতে প্রেস কনফারেন্স করব। ডাস্টবিন বিষয়ে প্রেস কনফারেন্স। বেশি কিছু খাওয়ানোর দরকার নেই। শুধু একটা করে বড় সন্দেশ, একটুকরো করে কেক। ডাস্টবিনটাকে আমি আমার কাছে কেন নিয়ে এলাম সে কথা সাংবাদিকদের বলব। বলব, মানুষ যেমন মনীষীদের ছবি পাশে রেখে চলে, আমি তেমনি এই ডাস্টবিন পাশে রেখে দেশের কাজ করব। সামান্য মানুষ নয়, যে জিনিস মানুষকে সততার পথে নিয়ে যায়, সেটাই আসল, সেটাই খাঁটি। মানুষ চলে যায়, কিন্তু জিনিস পড়ে থাকে। আদি অনন্তকাল ধরে সে মানুষের মহান কীর্তির চিহ্ন বহন করে। তাই আমি ডাস্টবিন...। আহা! কেমন হবে জীবন?'

কেমন হবে জীবন বুঝতে পারছে না। বোঝার দরকারও নেই। সে তার স্যারের মনের কথা বুঝতে পারছে। ব্যস, সেটাই যথেষ্ট। হেসে বলল, 'খুবই ভাল হবে স্যার। আমি স্যার তবে রওনা হয়ে যাই? স্যার, ডাস্টবিনটা আনবার সময় কাউকে বলতে হবে নাকি? কোনও অনুমতির ব্যাপার আছে?'

'অনুমতি! অনুমতি কীসের! আমি বলছি, এটাই অনুমতি। একটা রিকশ-টিকশয় জিনিসটা তুলে নিয়ে চলে আসবে। সঙ্গে কয়েকজনকে নিয়ে যাও। দেরি কোরো না।'

'ডাস্টবিন কি ময়লাসুদ্ধ আনব স্যার?'

'না না, ময়লা-টয়লা ওখানেই ফেলে আসবে। খেপেছ, বাড়িতে ময়লা ঢোকাব নাকি?'

বিভূতিচরণ উঠে পড়লেন। তাঁর মন ভাল হয়ে গেছে। এবার অমিয় ব্যাটা বুঝতে পারবে। তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন, কাগজে কাগজে তাঁকে নিয়ে খবর, টিভিতে টিভিতে তাঁর ছবি। হাসিমুখে তিনি। পাশে ডাস্টবিন।

২

রঙিন চাঁদোয়া। চাঁদোয়ার তলায় খানকয়েক বিয়েবাড়ির সাদা চেয়ার। সামনে উঁচু একটা টুলের ওপর টিভি চলছে। পার্টি অফিসের সামনে রাস্তা আটকে টিভি দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছে। ভোর থেকে ছোটাছুটি করে অমিয় নিজের উদ্যোগে এই ব্যবস্থা করেছে। টিভিতে বেশি সময়টাই সিনেমা চলছে, শুধু খবরের সময় খবর। এখন চলছে উত্তম-সুচিত্রার সিনেমা। এই সকালেও দর্শকসংখ্যা খারাপ নয়। বেকার ধরনের কয়েকজন বেশ গুছিয়ে বসে পড়েছে। তাদের হাবভাব দেখে বোঝা যাচ্ছে, সারাদিনের জন্য বিনা খরচে এমন একটা আমোদের আয়োজন পেয়ে তারা যথেষ্ট খুশি। তাদের খুবই আশা, বেলা বাড়লে হালকা ধরনের টিফিনও আসতে পারে।

পার্টি অফিসের ভেতর অমিয় বসে আছে। তার মুখ বেজার। বেজার হওয়া স্বাভাবিক। টিভি মাঝে মাঝেই গোলমাল করছে। সিনেমার সময় ঠিক চলছে, কিন্তু খবর শুরু হলেই ছবি কাঁপছে। এত কাঁপছে যে লোকজন ঠিকমতো চেনা যাচ্ছে না। এরকম চলতে থাকলে তো গোটা আয়োজনটাই ব্যর্থ। পাবলিককে সিনেমা দেখানোর জন্য তো এই আয়োজন হয়নি। টিভি খবরে তাঁকে দেখানো হবে। গভীর রাতে ভিখিরি বালককে জড়িয়ে ধরে আছে। হাতে কম্বল। এই দৃশ্য দেখানোর জন্যই ভোর থেকে এত ছোটাছুটি, এত ব্যবস্থা। সেটাই যদি ব্যর্থ হয়, তা হলে আর কী লাভ হল?

ব্রজেশ্বরবাবু সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বললেন, 'তোমার সবটাতেই বাড়াবাড়ি অমিয়। টিভির খবর তো লোকে বাড়িতে বসেই দেখতে পায়। এর জন্য রাস্তায় টিভি বসানোর কী ছিল?'

ব্রজেশ্বরবাবু নেতা মানুষ। নেতা মানুষদের মাথায় সব সময়ই নানা ধরনের পরিকল্পনা আসে। কালকের ঘটনাটা নিয়েও ব্রজেশ্বরের মাথায় নাকি দারুণ একটা পরিকল্পনা এসেছে। সেই পরিকল্পনার কথা জানাবার জন্যই এই সাতসকালে সবাইকে তিনি ডেকে পাঠিয়েছেন।

অমিয় নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'এতে বাড়াবাড়ির কী আছে ব্রজদা? সকাল থেকে টিভিতে আমাকে দেখাচ্ছে। আমি চেয়েছিলাম, এলাকার মানুষ সেটা আরও ভাল করে জানুক।'

মাটির ভাঁড়ে সিগারেটের ছাই ফেলে ব্রজেশ্বর বিরক্তমুখে বললেন, 'এত আমি আমি করছ কেন অমিয়? তাও যদি ভোটে জিততে একটা কথা ছিল। একটা সমাজবিরোধীর কাছে তো হেরে গেছ।'

অমিয় মনে মনে বলল, শালা, বেশি সাহস দেখায়। ভোটের দিন ভয়ে দরজায় খিল দিয়ে বসে ছিল। এখন ফুটানি। মুখে কিছু বলল না। সুতপা মিটিং-এর নোটস লিখবে। সে খাতা বের করতে করতে বলল, 'অমিয়দা, শুনলাম কাল রাতে আপনি নাকি কম্বল নিয়ে ওখানে গিয়েছিলেন? ঘটনা কি সত্যি? এই গরমে কম্বল! লোকে তো হাসাহাসি করছে।'

অমিয় গজগজ করে বলল, 'কী নেব? রাতে পার্টি অফিস খুলে দেখি, কতগুলো কম্বল পড়ে আছে। লাস্ট ফ্লাডের সময় তোলা হয়েছিল। দেওয়া হয়নি। তারই কয়েকটা নিয়ে চলে গেলাম। গরমকাল বলে তো আর ফুটপাথের ঝুপড়িতে এয়ারকন্ডিশন মেশিন নিয়ে যেতে পারব না।'

এমন সময় বাইরে হাততালির শব্দ হল। গোপাল জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল। অমিয় তাকে টিভি শো ম্যানেজের দায়িত্ব দিয়েছে। বলল, 'অমিয়দাকে দেখাচ্ছে। সবাই খুব ক্ল্যাপ দিচ্ছে। অমিয়দা বাইরে এসো।'

ব্রজেশ্বরবাবু গোপালকে জোর ধমক দিলেন, 'জানলা বন্ধ করে দাও। মিটিং শুরু হবে। অ্যাই, অমিয় বাইরে যাবে না।'

রাগে অমিয়র চোখমুখ লাল হয়ে উঠল। হিংসুটের দল।

তবে তার রাগ বেশিক্ষণ টিকল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই জল হয়ে গেল। জল হয়ে একেবারে গড়িয়ে পড়ল ব্রজেশ্বরের পায়ে। কী প্ল্যান! শাবাস! এই না হলে নেতা।

ব্রজেশ্বরবাবু সত্যি চমকপ্রদ।

শনিবার বিকেলে চার রাস্তার মোড়ে স্টেজ বানিয়ে সংবর্ধনা সভা হবে। সেখানে একটি সৎ দরিদ্র পরিবার এবং একটি সততার প্রতীক ডাস্টবিনকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। মঞ্চে কোনও রাজনৈতিক নেতা, কর্মীকে রাখা হবে না। রাখা হবে, এই এলাকার স্কুলশিক্ষক, শিল্পী, খেলোয়াড় এবং মাধ্যমিকে ভাল নম্বর পাওয়া ছাত্রদের। আর থাকবে অমিয়। অন্য কোনও কারণ নয়, আগামী নির্বাচনের কথা মাথায় রেখেই তাকে স্টেজে রাখা। স্টেজের একপাশে বসবে ভিখিরি পরিবার, অন্যপাশে থাকবে ডাস্টবিন। একটা স্পট লাইট ডাস্টবিনটার ওপর পড়বে।

সভার শুরুতে অমিয় তার সংক্ষিপ্ত ভাষণে বলবে, 'সমাজের সব আবর্জনাই আবর্জনা নয়। এই সামান্য ডাস্টবিন আজ সে কথাই আমাদের প্রমাণ করে দিল। কোনও কোনও সময় আবর্জনার আড়ালেও লুকিয়ে থাকে রত্ন, অলঙ্কার। যাকে দেখে আমরা একসময় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি, তাকে আজ সম্মান জানাতেই এই ছোট্ট আয়োজন। সততার এই প্রতীকটিকে আমরা স্থায়ীভাবে আমাদের মধ্যে জায়গা করে দিতে চাই। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, চার রাস্তার এই মোড়ে ডাস্টবিনকে ঘিরে একটা মনোরম পার্ক তৈরি করা হবে। থাকবে ফুলের বাগান। বসবে ফোয়ারা।'

সুতপা বলল, 'স্টেজের ওপর ডাস্টবিন! দারুণ আইডিয়া। ব্রজদা, ডাস্টবিনে ময়লাগুলো থাকবে, নাকি ফেলে দেওয়া হবে?'

ব্রজেশ্বরবাবু অবাক গলায় বললেন, 'এটা কী বললে সুতপা! ময়লা ছাড়া ডাস্টবিন কী করে হবে? অবশ্যই ময়লা থাকবে। এতে মানুষের কাছে আমাদের কথা আরও বিশ্বাসযোগ্য হবে।'

অমিয় লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে পড়ল। হাতে একদম সময় নেই। অনেক কাজ। ম্যাটাডর ঠিক করতে হবে। ছেলেপিলে নিয়ে ডাস্টবিনটাকে তুলে আনতে হবে এখনই। সেরকম হলে এ কদিন জিনিসটা সে নিজের শোওয়ার ঘরে রেখে দেবে। শালা বিভূতিচরণ, দেখব এবার তুমি কেমনভাবে জেতো। এক অস্ত্রেই তুমি কুপোকাত। সেই অস্ত্রের নাম, ডাস্টবিন-পার্ক।

৩

মুম্বই থেকে ফ্যাক্স এল ঠিক বেলা দশটা পাঁচ মিনিটে। ফ্যাক্সের ওপর লেখা, ভেরি আর্জেন্ট। দশটা পনেরো মিনিটের মধ্যে শঙ্করপ্রসাদ খাস্তগিরের টেবিলে পৌঁছে গেল সেদিনের সবকটা খবরের কাগজ। সেই কাগজগুলো দ্রুত পড়ে তিনি সেক্রেটারিকে ডিকটেশন দেওয়ার জন্য ডাকলেন।

বহুদিন পর আজ জেনারেল ম্যানেজার শঙ্করপ্রসাদ খাস্তগির খানিকটা উত্তেজিত। উত্তেজনার কারণ আছে। মুম্বই থেকে যে ফ্যাক্স এসেছে সেটি খোদ চেয়ারম্যানের। তার

থেকেও বড় কথা হল, তিনি যে বিষয় জানতে চেয়েছেন তার সঙ্গে এই সাবান কোম্পানির কোনও সম্পর্ক নেই। এই কারণেই তিনি উত্তেজিত।

ঠিক এক ঘণ্টা পরে মার্কেটিং ম্যানেজার ত্রিদিব চৌধুরিকে ঘরে ডেকে পাঠালেন শঙ্করপ্রসাদ। সেক্রেটারিকে বলে দিলেন, কেউ যেন বিরক্ত না করে। আজ সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট বাতিল।

শঙ্করপ্রসাদ ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'মিস্টার চৌধুরি, আপনি কি ঘটনাটা জানেন?'

'কোন ঘটনাটা স্যার?'

'ওই যে একটা বেগার ফ্যামিলি গয়নাটয়না কীসব কুড়িয়ে পেয়েছে...। জানেন আপনি?'

'টিভি নিউজে দেখেছি স্যার। প্রথমে অতটা রেজিস্টার করেনি। সকালে বাজারে গিয়েও যখন বিষয়টা নিয়ে কথাবার্তা শুনলাম, তখন খানিকটা মন দিই। ঝুপড়ি, ডাস্টবিন, ফুটপাথ নিয়ে কথা হচ্ছিল। আমার মিসেসও সকালে বলেছিলেন। আমাদের বাড়িতে যে মহিলা রান্না করে সেও শুনেছে। তবে সে গয়নার কথা শোনেনি। সে শুনেছে, ডাস্টবিন থেকে একটা ডায়মন্ড খুঁজে পাওয়া গেছে। আই ডিডন্ট বিলিভ।'

খাস্তগির কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর ভুরু কুঁচকে চিন্তিত ভঙ্গিতে বললেন, 'দেখুন তো কী মুশকিল। আমি কিছুই জানতাম না। সকালে হেড অফিস থেকে ফ্যাক্স এল। চেয়ারম্যান নিজে লিখছেন, উনি নাকি অন্য সোর্সে খবরটা জানতে পেরেছেন। অ্যান্ড হি বিকেম ভেরি মাচ্ ইন্টারেস্টেড। এখনই ডিটেলস জানাতে হবে। আমি খবরের কাগজ আনিয়ে, নোট তৈরি করে পাঠিয়ে দিলাম। এরপর চেয়ারম্যান নিজে ফোন করলেন। বললেন, খাস্তগির, আমাদের এই সুযোগ কাজে লাগাতে হবে। আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, আমরা কী করব? আমরা একটা সাবানের কোম্পানি...। চেয়ারম্যান মনে হল, বিরক্ত হলেন। বললেন, নো খাস্তগির, ইউ আর মেকিং আ মিসটেক। এখানে একটা ডাস্টবিনের ভাইটাল রোল আছে। এই ডাস্টবিনটাকে আমরা আমাদের সাবানের বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করব।'

ত্রিদিব চৌধুরির গলায় চাপা উত্তেজনা। বললেন, 'সেটা কীরকম?'

খাস্তগির ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'প্রথমেই আমরা ডাস্টবিনটাকে কোম্পানির তরফ থেকে নিয়ে নেব। যদি দাম লাগে তাই দেওয়া হবে। যত দাম লাগে। মোদ্দা কথা হল, এটার সোল রাইট হবে আমাদের। অন্য কেউ আর এটাকে ইউজ করতে পারবে না। তারপর এটার ছবি, ডিজাইন দিয়ে আমাদের বিজ্ঞাপন শুরু হবে। হোর্ডিং, কিওস্ক, নিউজপেপার, টিভি অ্যাড। চেয়ারম্যান চাইছেন, খুব তাড়াতাড়ি এই শহরটাকে আমরা যেন ডাস্টবিন দিয়ে ঢেকে দিই। কাজটা টপ প্রায়োরিটি দিয়ে আমাদের করতে হবে।'

এতটা বলে খাস্তগির থামলেন। ত্রিদিব বললেন, 'তা হলে স্যার পারচেজ ম্যানেজার মিস্টার মণ্ডলকে এখনই স্পটে পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। জিনিসটা কেনবার জন্য ও নেগোসিয়েশন শুরু করুক। কারণ, উই নিড দ্য ডাস্টবিন ফার্স্ট। ওটা আগে হাতে আসা দরকার। আমি একটা চেক রেডি করে দিচ্ছি। নাম আর টাকার অ্যামাউন্টটা সেখানে লিখছি না। ডাস্টবিনটা কার সেটা তো আমরা জানি না। কথা বলে মিস্টার মণ্ডল নাম বসিয়ে

নেবেন। বিকেলের মধ্যে জিনিসটা নিয়ে গিয়ে আমাদের ট্যাংরা বা মৌলালির গোডাউনে ঢুকিয়ে দিতে পারলে অনেকটাই নিশ্চিন্ত হতে পারব।'

খাস্তগির বললেন, 'জিনিসটা যেন কোনওভাবেই আমাদের হাতছাড়া না হয়।'

মিটিং শেষ হওয়ার মুখে হেড অফিস থেকে আরও একটা ফ্যাক্স এল। মুম্বইতে বিজ্ঞাপন বিভাগ ইতিমধ্যেই প্রাথমিক কাজ এগিয়ে ফেলেছে। বাংলায় মূল স্লোগান তৈরি—

'মনের ময়লা দূর করেছে ডাস্টবিন, গায়ের ময়লা দূর করছি আমরা।'

৪

গলি সরু। ভ্যান, জিপ কিছুই ঢুকতে পারেনি। সেই সুযোগে আরও কয়েকটা ঝুপড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তবে এখন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। যদিও এই নিয়ন্ত্রণে কোনও ভরসা নেই। যে-কোনও সময় গোলমাল আবার শুরু হতে পারে। আরও ফোর্স চাওয়া হয়েছে। সেই ফোর্স এখনও আসেনি। থানার বড়বাবু গলির মুখে দাঁড়িয়ে সেই ফোর্সের জন্য অপেক্ষা করছেন। তিনি কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। ট্রাম রাস্তায় পায়চারি করছেন এবং মনে মনে রিপোর্ট তৈরি করছেন। শালার পুলিশের চাকরি। ওপরতলায় রিপোর্ট দিতে দিতেই জান কয়লা হয়ে গেল।

এখন পর্যন্ত বড়বাবু যে রিপোর্টটুকু তৈরি করতে পেরেছেন সেটা অনেকটা এরকম—

গোলমালের কারণ জানা যায়নি। কারা করছে তাও খুব স্পষ্ট নয়। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে চিন্তার কিছু নেই, বোঝা যাবে। দুটোকে ধরে গাঁদন (এই শব্দ রিপোর্টে থাকবে না।) দিলেই সব বোঝা যাবে। ঘটনায় বেশ কয়েকটা বোমা পড়ে। লাঠি এবং লোহার রড ব্যবহার হয়েছে যথেচ্ছ। মারপিটের সময় কয়েকজনের হাতে নাকি পাইপগানের মতো কিছু অস্ত্র দেখা গেছে। গোপন সূত্রে খবর পাওয়া গেছে, আজ সকাল থেকে অমিয় সামন্তর পার্টি অফিসের সামনে টিভি দেখানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। কেন হয়েছিল? সাতসকালে চেয়ার পেতে টিভি দেখানোর কী আছে? গোলমালের জন্য লোক জড়ো করা হচ্ছিল? হতে পারে। আবার নাও হতে পারে। সবথেকে বেশি ঝামেলা করেছে বিভূতিচরণ। গোলমালের সময় সে নিজে হাজির ছিল। তার গাড়ি থেকেই লাঠি, লোহার রড এবং কেরোসিন তেলের টিন নেমেছে।

বড়বাবু খানিকটা নিশ্চিন্ত হলেন। রিপোর্ট মোটামুটি টাইট। ফাঁকফোকর কম। সমস্যা হচ্ছে তিনটি বিষয় নিয়ে। খবর পাওয়া গেছে, ঝামেলার ঠিক আগে ঘটনাস্থলে কারা নাকি গাঁদা ফুলের মালা নিয়ে ঘুরছিল। মারপিটের সময় বোমাটোমা ঠিক আছে। কিন্তু ফুলের মালা? না, ঠিক নেই। দ্বিতীয় সমস্যাটা আরও জটিল। ঘটনার পর ফুটপাথের ওপর একটা আধপোড়া চেক পাওয়া গেছে। চেকে নাম, টাকার অঙ্ক কিছুই লেখা নেই, তলায় কোনও একটা কোম্পানির সিলমোহর রয়েছে। পুড়ে যাওয়ার কারণে সেই সিলমোহর পড়া যাচ্ছে

না। ভিখিরিদের ফুটপাথে চেক! অতি সন্দেহের বিষয়। খুবই রহস্যজনক। গোলমালের সঙ্গে কোনও যোগসূত্র নেই তো? তিন নম্বর সমস্যাটাও জ্বালাতনের। খবর পাওয়া গেছে, ঝামেলার ঠিক আগে আগে ঝুপড়িগুলোর সামনে নাকি একটা সুট-টাই পরা লোককে ঘুরঘুর করতে দেখা গেছে। কেউ বলছে সুটের রং বাদামি, কেউ বলছে কালো। ঝুপড়ির সামনে ছেঁড়া জামাকাপড় পরা লোক থাকবে, সুট পরা লোক থাকবে কেন? গোলমালের বিষয়।

বড়বাবু প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন। মোবাইল বেজে উঠল। তিনি ব্যস্ত হয়ে ফোন ধরলেন— 'হ্যাঁ স্যার বলছি, বলুন স্যার। না স্যার, ওদের পাওয়া যাচ্ছে না। যে ঝুপড়িগুলোতে আগুন লেগেছে তার মধ্যে এই ফ্যামিলির ঘরটাও আছে। তারপর থেকেই ফ্যামিলিটা মিসিং। ট্রেস করা যাচ্ছে না স্যার। বাবা, মা, ছেলে কেউ নেই। মনে হচ্ছে, ভয়ে পালিয়ে গেছে স্যার। নিশ্চয় স্যার, আমি গুরুত্ব বুঝতে পারছি স্যার। খোঁজ পেলেই আপনাকে জানাচ্ছি। আর কিছু বলবেন স্যার? কী বললেন স্যার, ডাস্টবিন! ডাস্টবিন তো খেয়াল করিনি স্যার। ওটার দখল নিয়ে গোলমাল! সামান্য ডাস্টবিনের জন্য এতবড় ক্ল্যাশ! স্যার কিছু মনে করবেন না, ইনফরমেশনে কোনও গ্যাপ হচ্ছে না তো? না, না, আমি নিজে যাচ্ছি। যেখানে থাকুক ওই জিনিস আমি খুঁজে আর্মড গার্ড বসিয়ে দেব। স্যার এমন ব্যবস্থা করব যাতে ধারে কাছে কেউ ঘেঁষতে না পারে।'

ফোন ছাড়ার পর বড়বাবুকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে। একেই বলে ওপরতলার হুড়কো। রিপোর্টে এত কিছু রয়েছে তাতে হচ্ছে না। বলছে, গোলমালের কারণ একটা ডাস্টবিন! ধুস শালা।

ফোর্স এসে গেছে। বড়বাবু হাঁক দিলেন, 'অ্যাই, ইধার আও। আমি ভেতরে যাব। আভি পজিশন লেনা হোগা।' বিরাট পুলিশবাহিনী নিয়ে সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়লেন বড়বাবু।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল, আধপোড়া একটা ঝুপড়ির সামনে একদল পুলিশ গোল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। সম্ভবত একেই বলে, 'পজিশন নেওয়া'। তাদের হাতে লাঠি, ঢাল এমনকী বন্দুকও। তারা কঠিন মুখে ঘিরে রেখেছে সামান্য একটা ডাস্টবিন! ভাঙা, জং ধরা একটা ডাস্টবিন! ডাস্টবিন থেকে উপচে পড়ছে আবর্জনা। ছেঁড়া জুতো, ফুলকপির ডাঁটা, তোবড়ানো প্লাস্টিক।

শুধু কোথা থেকে যেন একটা টাটকা গাঁদা ফুলের মালা এসে সেই আবর্জনার মধ্যে পড়েছে!

শারদীয়া আজকাল, ১৪১২

কুঞ্জবিহারীর দুঃস্বপ্ন

তীব্র একটা অস্বস্তিতে ঘুম ভেঙে গেল কুঞ্জবিহারী সামন্তর। এ আবার কেমন স্বপ্ন! ধড়ফড় করে উঠে বসলেন কুঞ্জবিহারী। ঘর অন্ধকার। দিনের আলো দেখে মোটামুটি একটা সময় আন্দাজ করা যায়। রাতের অন্ধকারে সেই সুবিধে নেই। সবই এক মনে হয়। রাত এখন কত? কুঞ্জবিহারীর মনে হল, শরীর কাঁপছে। খুব সামান্য হলেও কাঁপছে। তিনি হাত বাড়িয়ে মাথার বালিশটা আঁকড়ে ধরলেন। নড়াচড়ায় বিছানায় হালকা তরঙ্গ উঠল। খাটটা এভাবেই তৈরি। একটা স্তরে স্প্রিংগুলো একে অপরকে আলতো করে ছুঁয়ে আছে। সামান্য নড়াচড়াতেই বিছানায় যেন ঢেউ খেলে! একটা সমুদ্র সমুদ্র এফেক্ট। নতুন খাট তৈরির প্রথম রাতে কুঞ্জবিহারী সমুদ্র-খাটে শুয়ে স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'বুঝলে প্রতিমা, সমুদ্রে পেতেছি শয্যা, শিশিরে কী ভয়?'

প্রতিমাদেবী এ কথার মানে বুঝতে পারলেন না। স্বামীর কাছে ঘন হয়ে এসে বললেন, 'মরণ, বুড়ো বয়েসে ওইসবের শখ হয়েছে না? নাও যা করবে তাড়াতাড়ি করো, আমার ঘুম পেয়েছে।'

আজ সমুদ্র শয্যার দোলায় ভয় করে উঠল। কুঞ্জবিহারীবাবু ফ্যালফ্যাল করে ঘরের চারপাশে তাকালেন। জায়গাটা কোথায়? নিজের ঘরই তো? অতিরিক্ত আতঙ্কে মানুষ সবার আগে চেনা পরিবেশ খোঁজে। তারপর খোঁজে চেনা মানুষ। হ্যাঁ, নিজেরই ঘর। এই তো তাঁর আলিপুর রোডের দোতলা বাড়ি, এই তো তাঁর সুসজ্জিত বেডরুম। প্রথমে চোখ খুলে অন্ধকার মনে হলেও বেডরুম একেবারে অন্ধকার নয়। আবার খুব আলোকিতও নয়। নাইটল্যাম্প জ্বলছে। চাপা নীলাভ আলোর মধ্যে একটা ফুরফুরে ভাব। সেই ফুরফুরে আলোয় কুঞ্জবিহারী মুখ ঘুরিয়ে দেখলেন, পাশে স্ত্রী নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। হালকা ধরনের নাকও ডাকছে। কুঞ্জবিহারী অবাক হলেন। নাক ডাকছে! কই, নাক ডাকার অভ্যেস তো প্রতিমার ছিল না। নাক ডাকার মধ্যে একটা 'সুখী সুখী' ভাব। কুঞ্জবিহারী স্ত্রীর দিকে আগ্রহ ভরে তাকালেন। ছেচল্লিশ বছরের এই ঘুমন্ত মহিলাকে দেখে মনে হচ্ছে, পৃথিবীর সবথেকে সুখী মহিলা। স্বামী প্রচুর অর্থের মালিক হলে যে-কোনও বোকা ধরনের স্ত্রীই নিজেকে পৃথিবীর 'সবথেকে সুখী মহিলা' বলে মনে করতে পারে। দোষ দেওয়া যায় না। একটু বেশি বোকা হলে কি সেই ভাব নাক ডাকার মধ্যেও ফুটে ওঠে?

কুঞ্জবিহারী মুখ ফেরালেন। বুঝতে পারলেন তিনি ঘেমেছেন। গায়ের ফতুয়াটা ভিজেছে। হান্ড্রেড পার্সেন্ট কটনের এই ফতুয়া 'মনসুর টেলরিং শপ' থেকে বানানো। 'মনসুর টেলরিং শপ' সুট প্যান্ট ছাড়া অন্য কিছুতে হাত দেওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। বললে অপমানিত

হয়। তবে 'সামন্ত অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর কুঞ্জবিহারী সামন্তর মতো সামান্য কয়েকজনের বেলায় নিয়ম অন্যরকম। তখন ফতুয়ার মতো তুচ্ছ জিনিসের অর্ডারও তারা হাসিমুখে নিয়ে নেয়। বাড়াবাড়ি ধরনের ধনী মানুষের কোনও কিছুই তুচ্ছ নয়। সেই ফতুয়া ঘামে ভিজেছে। যদিও ভেজার কথা নয়। এসি মেশিন চলছে। আগে একটা ছিল, গত বছর গরম বেশি পড়ার পর প্রতিমাদেবী বেডরুমে মেশিনের সংখ্যা বাড়িয়ে দুটো করেছেন। ঘর বরফ ঠান্ডা। তারপরেও ঘাম। দুঃস্বপ্নটা কি এতটাই ভয়ংকর?

কুঞ্জবিহারী কিছুক্ষণ খাটের ওপর থম মেরে বসে রইলেন। স্ত্রীকে ঘুম থেকে ডেকে তুললে কেমন হয়? তুলে যদি স্বপ্নের ঘটনাটা বলেন? আর কয়েক মাস পরেই চুয়ান্ন শেষ করে পঞ্চান্নতে পা দেবেন। এই বয়েসের একজন পুরুষমানুষের পক্ষে মাঝরাতে স্ত্রীকে ঘুম থেকে তুলে দুঃস্বপ্নের গল্প শোনানো কি উচিত? উচিত নয়। কুঞ্জবিহারী তবু স্ত্রীকে ডাকলেন।

'প্রতিমা, অ্যাই প্রতিমা। শুনছ?'

স্বামীর ডাক প্রতিমাদেবী শুনলেন না। ঘুমন্ত অবস্থাতেই এপাশ ওপাশ করলেন। পায়ের ওপর গুটিয়ে যাওয়া হালকা কম্বল টেনে তুললেন। এই মহিলার ঘুম আগে ছিল হালকা। অল্প আওয়াজেই চট করে ভেঙে যেত। বিয়ের পর পর ভোর হতেই বিছানা ছাড়তেন। সংসারে হাজারটা কাজ। এখন সে প্রশ্ন নেই। সংসারের কিছুই নিজের হাতে করতে হয় না। সব ধরনের কাজের জন্য সব ধরনের লোক রয়েছে। তিনি নিশ্চিন্তে বেলা পর্যন্ত বিছানায় গড়ান। কাজের মেয়ে চা বানিয়ে আনলে অতি কষ্টে চোখ খোলেন। আধশোয়া অবস্থাতে ফিনফিনে কাপ ঠোঁটে তুলে বলেন, 'গিজারটা চালিয়ে দাও গোপালের মা। গা-টা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে। ভাবছি একটা হট শাওয়ার নেব।'

প্রতিমাদেবী আজকাল কথাবার্তায় দু'-একটা ছোটখাটো ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করছেন। তবে বেশিটাই বাড়ির কাজের লোকদের সঙ্গে। একটা প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকার চেষ্টা আর কী। পার্টি-টার্টিতে একটু-আধটু ইংরেজি বলতে না পারলে লজ্জা করে। এত বড়মানুষের স্ত্রী বলে কথা।

কুঞ্জবিহারী স্ত্রীর গায়ে হাত দিয়ে নাড়া দিলেন। ফিসফিস করে বললেন, 'অ্যাই শুনছ?'

প্রতিমাদেবী চোখ না খুলে জড়ানো গলায় বললেন, 'কী হয়েছে?'

এবার থমকে গেলেন কুঞ্জবিহারী। সত্যি তো কী এমন ঘটছে যার জন্য স্ত্রীর ঘুম ভাঙাতে হল? তিনি খানিকটা লজ্জা পেয়েই বললেন, 'না, তেমন কিছু হয়নি, একটা স্বপ্ন দেখলাম।'

প্রতিমাদেবী মাথা ঘুরিয়ে এবার চোখ খুললেন। বললেন, 'স্বপ্ন!'

'হ্যাঁ, স্বপ্ন...।' কুঞ্জবিহারী আমতা আমতা করে বলেন।

প্রতিমাদেবী এবার শুয়ে শুয়েই হাসলেন। আহ্লাদি গলায় বললেন, 'ওমা, সে কী গো, আমিও তো স্বপ্ন দেখছিলাম! খুব মজার স্বপ্ন। তুমি কী দেখলে? অ্যাই বলো না, প্লিজ বলো।'

কুঞ্জবিহারী কিছু একটা বলতে গেলেন, প্রতিমাদেবী শুনলেন না, তিনি নিজেই বলতে থাকেন—

'আমি দেখলাম একটা বাগানে বেড়াচ্ছি আর একঝাঁক প্রজাপতি আমাকে ঘিরে ঘিরে উড়ছে। হাত বাড়িয়ে একটাকে যেই ধরতে গেলাম অমনি কী হল জানো? আমিও একটা প্রজাপতি হয়ে গেলাম! হি হি। বেগুনি রঙের ডানা, গায়ে হলুদ ফুটি ফুটি। শুনেছি স্বপ্নে কালার দেখা যায় না, আমি কিন্তু কালার দেখলাম গো। খুব মজার না?'

মোটা না হলেও প্রতিমাদেবীর চেহারা ভারীর দিকে। যত দিন যাচ্ছে ভার বাড়ছে। সম্ভবত সুখের ভার। আজকাল অল্প পরিশ্রমেই হাঁপিয়ে পড়েন। চেয়ার, সোফা থেকে আর আগের মতো চট করে উঠতে পারেন না, অসুবিধে হয়। কাজের মেয়েদের ধমক দেন, 'হাঁ করে দেখছিস কী গাধা? হাতটা ধরতে পারিস না?' মুখেও গোলমাল শুরু হয়েছে। বিয়ের সময় যে মুখ লম্বাটে ছিল, ক্রমশ গোল হচ্ছে। গোলগাল মুখের মোটা এক মহিলা প্রজাপতি হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে দৃশ্যটা কতখানি মজার সেই চিন্তার মধ্যে না গিয়ে কুঞ্জবিহারী নিচু গলায় বললেন, 'হ্যাঁ মজার। তবে আমারটা সেরকম না। আমারটা মনে হয় দুঃস্বপ্ন!'

প্রতিমাদেবী আঁতকে উঠলেন। আধখানা উঠে বসে বললেন, 'দুঃস্বপ্ন! ওমা সে কী গো! কী দুঃস্বপ্ন? বদ্যিকে নিয়ে কিছু নয় তো?'

বদ্যি, বদ্যিনাথ। কুঞ্জবিহারী সামন্তর একমাত্র শালা। প্রতিমাদেবী আজকাল তাঁর বাপের বাড়ির লোকজনকে নিয়ে নানা ধরনের আদিখ্যেতা শুরু করেছেন। সেই আদিখ্যেতা তালিকার প্রথমেই রয়েছে তাঁর এই অপোগণ্ড ভাইটি। জামাইবাবুকে ধরে বদ্যিনাথ ইতিমধ্যেই দু'জায়গায় চাকরি পেয়েছে। দু'জায়গা থেকেই খেদিয়ে দিয়েছে। এখন ব্যাবসা করার ফন্দি আঁটছে। কুঞ্জবিহারী বললেন, 'তোমার ভাইকে নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখব কেন!'

'আহা, তোমাকে কাল বললাম না, ছেলেটার মনমেজাজ ভাল নেই? বলিনি? কাজকর্ম নেই মন ভাল থাকবে কী করে? তার ওপর ক'দিন হল সর্দি জ্বরে ভুগছে বেচারি। ছেলেটাকে নিয়ে সবসময় চিন্তায় থাকি।'

কুঞ্জবিহারী থমথমে গলায় বললেন, 'আমি থাকি না। তা ছাড়া দুঃস্বপ্নটা তোমার ভাইকে নিয়ে নয় প্রতিমা।'

প্রতিমাদেবী চোখ বড় করে বললেন, 'তা হলে! কাকে নিয়ে? আমাকে?'

কুঞ্জবিহারী বিরক্ত গলায় বললেন, 'কাউকে নিয়ে নয়, তুমি ঘুমিয়ে পড়ো।'

প্রতিমাদেবী আবার বালিশে মাথা রাখতে রাখতে বললেন, 'হ্যাঁগো, সাপ-টাপ নিয়ে কিছু দেখোনি তো?'

কুঞ্জবিহারী আরও বিরক্ত হলেন। না, প্রতিমা সত্যিই অতিরিক্ত রকমের বোকা হয়ে পড়েছে। একে ঘুম থেকে ডেকে তোলাটাই ভুল হয়েছে। তিনি চাপা গলায় হিসহিসিয়ে ওঠেন, 'সাপ নিয়ে স্বপ্ন দেখব কেন? আমি কি সাপুড়ে?'

'ওমা, ঘুম থেকে ডেকে তুলে ধমক দিচ্ছ কেন? আমার কী দোষ? এমন করছ যেন দুঃস্বপ্ন তুমি দেখোনি, আমি দেখেছি। অ্যাই বলো না সাপ দেখোনি তো? স্বপ্নে সাপ দেখা ভাল নয়। বউয়ের অসুখ করে। শীলার বর একবার সাপ দেখেছিল, দু'দিন পরেই শীলার বুক ধড়ফড় শুরু হল। ডাক্তার বলল ইসিজি করো। স্বপ্নে হাঁস মুরগি দেখাও ভাল নয়। সংসারে অশান্তি হয়। তবে বক দেখা ভাল। তন্দ্রা একদিন ঘুমের মধ্যে বক দেখল, তারপর...।'

কুঞ্জবিহারী অবাক হলেন। 'তুমি এসব উদ্ভট কথা কোথা থেকে জানলে!'

'ওমা, শেখার কী আছে! এ তো সবাই জানে। স্বপ্নে কী দেখলে কী হয় তার বইও পাওয়া যায়। ফুটপাথে বিক্রি হয়। তুমি কিন্তু সাপ-টাপ দেখে একটা কেলেঙ্কারি করে বোসো না বাপু। বঙ্কার বিয়ে আছে। তোমার স্বপ্নের ঠেলায় হয়তো কাল সকাল থেকেই আমার পেট ব্যথা শুরু হল। বিয়ে-টিয়ে মাথায় উঠবে। লকার থেকে গাদাখানেক গয়না তুলেছি। গায়ে পরে শুয়ে শুয়ে কাতরাতে হবে।'

কুঞ্জবিহারী হতাশ গলায় বললেন, 'সাপ ব্যাং কিছুই দেখিনি প্রতিমা। তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোও।'

প্রতিমাদেবী পাশ ফিরলেন এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ফের গভীর ঘুমের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। 'সুখী সুখী' নাক ডাকাও শুরু হল। স্ত্রীর বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে কুঞ্জবিহারীর ধারণা কোনওদিনও ভাল নয়। অবস্থার যে অবনতি হচ্ছে সেটাও বুঝতে পারছিলেন। মন খারাপ হয়ে গেল। তিনি আরও কিছুক্ষণ খাটের ওপর বসে রইলেন, তারপর নামলেন নিঃশব্দে। ঘরের একপাশে একটা বামন রেফ্রিজারেটর। বেডরুমে রেফ্রিজারেটর রাখার বুদ্ধি প্রতিমার। মাঝরাতে কনকনে ঠান্ডা জল খাওয়ার ইচ্ছে হলে ঘর থেকে যাতে বেরোতে না হয়। কুঞ্জবিহারী অনেকটা জল খেলেন। অতিরিক্ত ঠান্ডা বা গরম শরীরের সঙ্গে মনের ওপরও অনেক সময় কাজ করে। সত্যি মন খানিকটা শান্ত হল যেন! স্বস্তিবোধ করলেন কুঞ্জবিহারী। বাথরুমে ঢুকে চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিলেন। আরও ভাল লাগছে। ঠান্ডার কারণে শরীরে অল্প একটু কাঁপুনি দিচ্ছে। দিক, কোনও অসুবিধে নেই। আতঙ্কের কাঁপুনির থেকে শীতের কাঁপুনি ঢের ভাল। কুঞ্জবিহারী এবার খাটে এসে শুয়ে পড়লেন। এখন অনেকটা সহজ লাগছে। দুঃস্বপ্নটা মাথার ভেতর আবছা হয়ে এসেছে। একটা ঘুমের ওষুধ খেলে খারাপ হত না। হালকা ধরনের কোনও ওষুধ। একসময় হাউজ ফিজিশিয়ন ডাক্তার সেন ঘুমের ওষুধ দিয়েছিলেন। অবশ্য সে সময়টা ছিল কঠিন দুশ্চিন্তার সময়। ব্যাবসাপাতির ট্রানজিশন পিরিয়ড। টেন্ডার, অর্ডার সাপ্লাই নিয়ে সারাক্ষণ দুশ্চিন্তা। অর্ডারের জন্য দরজায় দরজায় ঘুরতে হত। ব্যাঙ্কে বিরাট লোন। রাতে ঘুম আসত না। সেই অবস্থা বছর পনেরো আগে কেটে গেছে। ওষুধ খাওয়াও বন্ধ হয়েছে। দুশ্চিন্তা কি ফিরে আসছে? চোখ বুজলেন কুঞ্জবিহারী। কীসের দুশ্চিন্তা? কোনও দুশ্চিন্তা নেই। ব্যবসা হুড়মুড়িয়ে বাড়ছে। মাইনে করা দক্ষ ম্যানেজাররা নিখুঁত হাতে কাজ সামলায়। ছোটখাটো কয়েকটা সিদ্ধান্তের ব্যাপারে নাক গলানো ছাড়া প্রায় কিছুই করতে হয় না তাঁকে। দুর্গাপুরের নতুন প্রজেক্ট যে-কোনও মুহূর্তে শুরু হয়ে যাবে। জাপানি এক কোম্পানির সঙ্গে জয়েন্টভেঞ্চার। দিল্লির ছোট একটা অ্যাপ্রুভালের জন্য আটকে আছে। তদ্বিরের জন্য লোক গেছে। টাকাপয়সা খরচ করা হচ্ছে জলের মতো। যে-কোনও সময় গিঁট খুলে যাবে। তা হলে? কুঞ্জবিহারীর মনে হল, ভাঙা ঘুম ফিরে আসছে। একমাত্র মেয়ে সৌমী বেঙ্গালুরুতে ম্যানেজমেন্ট পড়ছে। পড়া শেষ হতে বছরখানেক বাকি। প্রতিমা খবর দিয়েছে, অর্চি না অর্ক নামের একটা ছেলের সঙ্গে তার ভাব-ভালবাসা হয়েছে। কম্পিউটারে গল্প করতে করতে চেনাজানা। আজকাল ভাব-ভালবাসা নাকি সব কম্পিউটারেই হয়। সেই ছেলের আবার লেখাপড়ায় ঝোঁক।

রসায়ন শাস্ত্র নিয়ে গবেষণা করতে চায়। এটা খুবই ভাল। অর্থাভাবে নিজের খুব বেশি লেখাপড়া সম্ভব হয়নি কুঞ্জবিহারীর, অথচ ইচ্ছে ছিল। শিক্ষিত মানুষদের প্রতি একটা দুর্বলতা রয়েই গেছে। সেখানে খোদ জামাই যদি লেখাপড়ার জগতের লোক হয় তা হলে তো খুবই আনন্দের কথা। সব মিলিয়ে সুখের মধ্যেই আছেন। হাবিজাবি স্বপ্ন নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও মানেই হয় না। মনে প্রশান্তি নিয়ে সমুদ্র-খাটে সামান্য তরঙ্গ তুলে নিশ্চিন্তে পাশ ফিরলেন কুঞ্জবিহারী। ঘুমিয়েও পড়লেন দ্রুত।

ভোর রাতে দুঃস্বপ্ন আবার ফিরে এল। ফিরে এল আরও ভয়ংকর হয়ে। কুঞ্জবিহারী ঘুম ভেঙে উঠে পড়তে চাইলেন। পারলেন না। তিনি ঘুমের মধ্যেই ছটফট করে উঠলেন। ফতুয়া ঘামে ভিজে উঠল।

২

ডাক্তার সেন শান্ত গলায় বললেন, 'একই স্বপ্ন দু'বার দেখলেন?

কুঞ্জবিহারী বললেন, 'না, দু'বার নয়, একবারই দেখলাম। মাঝখানে ঘণ্টাখানেকের গ্যাপ। প্রথম পর্যায়টা দেখলাম মাঝরাতে, পরের অংশ ভোরের দিকে। কন্টিনিউটি বলা যেতে পারে।'

অফিস থেকে আগে বেরিয়েছেন কুঞ্জবিহারী। বেরোনোর আগে ডাক্তার সেনকে টেলিফোন করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট চান। ডাক্তার সেন হেসে বলেন, 'আপনার আবার অ্যাপয়েনমেন্ট কী? সোজা চেম্বারে ঢুকে পড়বেন। কিন্তু হলটা কী? জ্বর-টর নাকি? সিজন চেঞ্জের সময়।'

কুঞ্জবিহারী শুকনো হেসে বললেন, 'না, জ্বর নয়। কী হল সেটাই বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে, কিছু হয়নি।'

'যা বাবা, কিছু হয়নি তবু ডাক্তারের কাছে!'

'গিয়ে বলছি।'

দুপুর পর্যন্ত কুঞ্জবিহারী ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা চিন্তা করেননি। তিনি সময় নিচ্ছিলেন। স্বপ্ন এমনই একটা জিনিস যা বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। বেশিরভাগ স্বপ্নই ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে উধাও হয়। কুঞ্জবিহারী ভেবেছিলেন, এই ক্ষেত্রেও তাই হবে। যতই দু'পর্যায়ে দেখা দিক, স্বপ্ন বেশিক্ষণ স্থায়ী হবে না। লাঞ্চের পর খানিকটা বিশ্রাম নেন কুঞ্জবিহারী। নরম গদির চেয়ারে মাথা এলিয়ে চোখ দুটো বুজে থাকেন। আজও ছিলেন। আর তখনই বুঝতে পারলেন, স্বপ্নটা শুধু মনে আছে নয়, একেবারে খুঁটিনাটি নিয়ে মনে আছে! মাথার ভেতর সিনেমার মতো হয়ে চলেছে একটার পর একটা দৃশ্য। এরপরই ডাক্তার সেনকে তিনি ফোনে ধরেন।

চেম্বারে বসতে ডাক্তার সেন বললেন, 'বলুন, সমস্যা কী?'

কুঞ্জবিহারী ভুরু কুঁচকে বললেন, 'জানি না এটা কোনও সমস্যা কিনা। ডাক্তার সেন,

মানুষ কি কখনও একই স্বপ্ন ভাগে ভাগে দেখতে পায়? এখন খানিকটা, আবার পরে খানিকটা? হয় এরকম?'

ডাক্তার সেন একটু থতমত খেলেন। ঠোঁটের কোনায় সামান্য হেসে বললেন, 'কী ব্যাপার বলুন তো মিস্টার সামন্ত, মনে হচ্ছে স্বপ্ন নিয়ে কোনও গোলমাল হয়েছে?'

কুঞ্জবিহারী অন্যমনস্ক গলায় বললেন, 'কাল রাতে একটা বিশ্রী স্বপ্ন দেখছিলাম, এতটাই বিশ্রী যে খানিকটা দেখার পর ঘুম ভেঙে গেল। মিসেসকে ঘুম থেকে ডেকে তুললাম।'

'স্বপ্ন দেখে মিসেসকে ডেকে তুললেন!'

কুঞ্জবিহারী ক্লান্ত হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, কাজটা বোকার মতো করেছি, কিন্তু স্বপ্নটা এতটাই খারাপ ছিল, একটা আনইজি ফিলিংস হচ্ছিল... যাই হোক ওকে কিছু বলিনি। নিজে উঠে জল-টল খেলাম, বাথরুমে গেলাম। মনটা খানিকটা শান্ত হল। ফিরে এসে এপাশ ওপাশ করতে করতে আবার ঘুমিয়েও পড়লাম। ভাবলাম মাথা থেকে ঘটনাটা বেরিয়ে গেছে। আসলে বেরোয়নি। পরে আবার বাকিটুকু দেখলাম।'

ডাক্তার সেন অবাক হলেন। এত বড় মানুষটা স্বপ্নের কারণে স্ত্রীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছে! অবাক ভাব গোপন করে তিনি কুঞ্জবিহারীর চোখের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলেন, 'একই স্বপ্ন দু'বার দেখলেন?' কুঞ্জবিহারী জানান, না একই নয়। স্বপ্নটা একবারই দেখেছেন। তবে দুটো আলাদা ভাগে। ডাক্তার সেন একটু থমকালেন। তিনি বুঝতে পারছেন, মানুষটার মধ্যে একটা ছটফটানি ভাব এখনও রয়েছে। বাইরে থেকে সেই ভাব দেখা না গেলেও, ভেতরে আছে এটা বোঝা যাচ্ছে। টেবিলের ওপর রাখা প্রেসক্রিপশন প্যাডের পাতাগুলো ওলটাতে ওলটাতে বললেন, 'কফি খাবেন? খান, ভাল লাগবে। আমার এখানে কফি তৈরির ব্যবস্থা আছে।' কুঞ্জবিহারী মাথা নেড়ে জানালেন, খাবেন না। ডাক্তার সেন নরম গলায় বললেন, 'এতে চিন্তা করার কী আছে? ঘুমিয়ে পড়বার পরও আপনার অবচেতনে হয়তো ঘটনাটা ছিল। ভোরের দিকে সে বাকিটুকু দেখিয়ে দিয়েছে।'

'তাই হবে। দু'ভাগেই হোক আর দশ ভাগেই হোক, স্বপ্নটা ভাল নয় বলেই হয়তো আমি এত ভাবছি। শেষের অংশটা বেশি মারাত্মক।'

ডাক্তার সেন হালকাভাবে হাসলেন। স্বপ্নটা যে মারাত্মক কিছু সেটা বোঝাই যাচ্ছে। কী ধরনের মারাত্মক? নিজের মৃত্যু? তাই হবে। মৃত্যু স্বপ্ন মনে থাকলে অনেকক্ষণ খচখচ করে। মানুষটাকে আগে শান্ত করা প্রয়োজন।

'আমি স্বপ্ন বিশেষজ্ঞ নই মিস্টার সামন্ত, তবে এটা জানি স্বপ্ন ভাল মন্দ দু'রকমই হতে পারে, সেইজন্যই তো 'দুঃস্বপ্ন' কথাটা এসেছে। আমরা স্বপ্ন দেখি, আবার ভুলেও যাই।'

'আমি ভেবেছিলাম, ভুলে যাব। দুপুর পর্যন্ত অপেক্ষাও করলাম। দেখলাম, একটুও ভুলিনি। সবটাই মনে আছে। ডিটেইলসে।'

ডাক্তার সেন আবার অল্প হাসলেন। বললেন, 'নিশ্চয় বেশি খারাপ ধরনের কিছু দেখেছেন। সেই কারণেই মন থেকে যায়নি। খারাপ কিছু মন থেকে চট করে যেতে চায় না। সে স্বপ্নই হোক, আর সত্যি হোক। এত চিন্তা করার কী আছে? রিল্যাক্স।'

মুখে একথা বললেও ডাক্তার সেন মনে মনে একটু চিন্তিতই হলেন। মানুষটা ভাল।

অতিরিক্ত টাকাপয়সা হয়ে গেলে মানুষের মধ্যে কিছু অসুখ-বিসুখ বাসা বাঁধে। মনে হয় না, কুঞ্জবিহারী সামন্তর ক্ষেত্রে সেরকম কিছু ঘটেছে। বরং মানুষটা অন্যদের জন্য করে। এই তো দু'বছর আগে, নার্সিংহোম করার সময় টাকা দিয়ে তাকেই সাহায্য করেছিল।

কুঞ্জবিহারী বললেন, 'আমি বরং স্বপ্নের কথাটা বলি ডাক্তার সেন।'

'অবশ্যই বলুন।'

কুঞ্জবিহারী মুহূর্তখানেক মাথা নিচু করে ভাবলেন। তারপর মাথা নিচু করেই বলতে শুরু করলেন। যেন স্বপ্নটা দেখতে দেখতেই বলছেন—

'জায়গাটা সম্ভবত পার্ক সার্কাসের মোড় ছিল। চড়া রোদের দুপুর। ছাতা মাথায় দিয়ে দু'-একজনকে হাঁটতে দেখেছি। আমি একটা পান সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পান কিনছিলাম। যদিও পান আমি কখনও খাই না। চুনে অ্যালার্জি আছে। মুখ চুলকোয়। তবু স্বপ্নে কিনলাম। পান কেনার পর মুখ ফিরিয়ে দেখি, ট্রাফিক সিগন্যালে গাড়ি-টাড়ি সব আটকে আছে। আমার গাড়িটাও রয়েছে। বাঁদিকের ফুটপাথ ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে। জানলার কালো কাচগুলো তোলা। ভেতরে এসি চলে বলে গাড়ির কাচ আমার সবসময়ই তোলা থাকে। নিজের গাড়ি দেখতে পেয়ে আমি অবাক হই, ব্রজেশ্বরকেও দেখি।'

ডাক্তার সেন বললেন, 'ব্রজেশ্বর কে?'

'আমার ড্রাইভার। অনেকদিন ধরে আছে। এফিশিয়েন্ট লোক। ছোট গাড়ি দিয়ে কাজ শুরু করেছিল। তখন আমার সেকেন্ড হ্যান্ড একটা গাড়ি ছিল। এখন ও বড় গাড়িতেও হাত পাকিয়েছে। যাই হোক, স্বপ্নের ঘটনায় আসি, আমি ভাবলাম এই ভরদুপুরে গাড়িতে কে? আমিই কি কোথাও থেকে আসছি? নাকি আমার মিসেস শপিং-এ গিয়েছিল? প্রতিমা প্রায়ই দুপুরের দিকে শপিং-এ বেরোয়। তার ওপর ওর কোন এক আত্মীয়র যেন বিয়ে-থা'র ব্যাপার আছে। সেই কারণেও বেরোতে পারে। যদিও তার গাড়ি আলাদা। আলাদা ড্রাইভার। সেই ড্রাইভার ছোকরা ধরনের ছেলে। সেই ছেলেকে কিছুদিন হল প্রতিমা ডিসকন্টিনিউ করেছে। কারণটা ঠিক জানি না। সে নাকি আমাদের বাড়ির কাজের মেয়েটির সঙ্গে গল্প করছিল।'

ডাক্তার সেন বুঝতে পারছেন, পেশেন্ট মূল বিষয় থেকে সরে যাচ্ছে। অন্য কেউ হলে ধমক দিয়ে থামিয়ে দেওয়া যেত। এক্ষেত্রে সে প্রশ্ন ওঠে না। এই পেশেন্ট যদি মূল বিষয় ছেড়ে হাজার শাখা উপশাখাতেও ঘোরাফেরা করে, আগ্রহভরে শুনতে হবে। তা ছাড়া ব্যাপারটা খানিকটা গোলমেলে বলে মনে হচ্ছে। বলার ভঙ্গিটা বেশি গোলমেলে লাগছে। একজন বয়স্ক মানুষ স্বপ্ন নিয়ে এত সিরিয়াস হবে কেন? ডাক্তার সেন চুপ করে রইলেন। কুঞ্জবিহারী আবার বলতে শুরু করলেন, 'গাড়িতে কে আছে দেখার জন্য আমি ফুটপাথ থেকে নেমে কয়েক পা এগিয়ে যাই। আর তখনই ঘটনাটা ঘটে। বুকের কাছে একটা ধাক্কা খেলাম। তীক্ষ্ণ ধরনের ধাক্কা। কনুই দিয়ে গুঁতো মারলে যেমন হয়। আমি মুখ ফিরিয়ে দেখি, ধাক্কাই, একটা লোক আমাকে ধাক্কা মেরেছে। ধাক্কা মেরে আমার আগে গাড়িটার কাছে পৌঁছোতে চাইছে।'

কুঞ্জবিহারী থামলেন। ডাক্তার সেন এবারও চুপ করে রইলেন। মানুষটার যে একটা

সমস্যা হয়েছে এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আর সেই সমস্যা কতটা শরীর আর কতটা মানসিক সেটা আগে বুঝতে হবে। পেশেন্ট নিজের মতোই বলুক।

'লোকটার গায়ে ঢলঢলে নোংরা পায়জামা। ওপরে জোব্বা ধরনের জামা। মনে হল বস্তা দিয়ে তৈরি। বুকে পিঠে তাপ্পি। মাথার চুলগুলো ঝাঁকড়া, জট পাকানো। কাঁধে আড়াআড়িভাবে ঝোলা মতো কিছু রয়েছে। সেটার অবস্থাও শোচনী। ভিখিরিদের যেমন হয়। লোকটা আবার তার বাঁ হাতের কনুই দিয়ে আমাকে ধাক্কা দিল। আমি রেগে লোকটার কাঁধটা চেপে ধরি। রেগে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। ওই গাড়ি আমার, আমি যাব। অন্য লোক আমাকে ধাক্কা মারার কে? লোকটা ঝটকা দিয়ে আমার হাত সরিয়ে দেয়। ভিখিরির গায়ের জোর সম্পর্কে আমার আগে কোনও ধারণা ছিল না। এবার হল। সে আমাকে পিছনে ফেলে গাড়ির দিকে ছুটে গেল। তখন দেখলাম ব্যাগ থেকে বের করে হাতে একটা টিনের কৌটো নিয়েছে।'

ডাক্তার সেন আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। বিড়বিড় করে বললেন, 'টিনের কৌটো!'

কুঞ্জবিহারী মুখ তুললেন। একটু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, টিনের কৌটো। যাকে আমরা বলি ভিক্ষাপাত্র। লোকটা আসলেই একটা ভিখিরি। ভিক্ষের জন্যই আমার গাড়ির দিকে ছুটছিল। ওই মোড়টায় এরকমই হয়। সিগনালে গাড়ি দাঁড়ালে দু'-একজন ভিখিরি ছুটে আসে। ছোট ছেলেপিলে হলে গাড়ির জানলা ধরে ঝোলে। বড় হলে কাচে হাত বোলায়। ডাক্তার সেন আপনি কি জিনিসটা কখনও লক্ষ করেছেন?'

ডাক্তার সেন এবার সামনে বসা মানুষটার চোখ লক্ষ করলেন। মণি দুটো অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে না। তবে চোখের তলায় ক্লান্তি রয়েছে। রাত জাগার ক্লান্তি। তিনি ফিসফিস করে বললেন, 'হবে হয়তো। আমি ঠিক খেয়াল করিনি।'

'ওই আধ-বুড়ো ভিখিরিটা এবার আমার গাড়ির বন্ধ জানলার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। হাতের কৌটোটার ওপর রোদ পড়ে চকচক করছিল।'

পরিস্থিতি হালকা করার জন্য ডাক্তার সেন হেসে বললেন, 'বাঃ আপনি তো খুব মাইনিউটলি সবকিছু লক্ষ করেছেন মিস্টার সামন্ত। ভিখিরির ভিক্ষাপাত্রটি পর্যন্ত মনে রেখেছেন দেখছি।'

কুঞ্জবিহারী চেয়ারে হেলান দিলেন। ক্লান্ত গলায় বললেন, 'রাখতে বাধ্য হয়েছি ডাক্তার সেন। কারণ এর অল্প পরেই লোকটাকে আমি চিনতে পারি।'

'চিনতে পেরেছেন! পরিচিত কেউ? ছোটবেলার বন্ধু? মানুষ অনেকসময় ছোটবেলার বন্ধু, মৃত মানুষকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। সেরকম কিছু?'

কুঞ্জবিহারী এই প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে বললেন, 'তবে প্রথম পর্যায়ে চিনতে পারিনি। কারণ সেইসময় আমার ঘুমটা ভেঙে যায়। রাস্তায় এক নোংরা ভিখিরির সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছি এই দৃশ্য দেখার পর ঘুম ভাঙাটাই স্বাভাবিক। ঘুম ভাঙার পর ভীষণরকম একটা আনকমফর্ট ফিল করি। ভিখিরিটা কে ছিল সেটা দেখতে পেলাম পরের পর্যায়ে। জল-টল খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়বার পর।'

'কে ছিল?'

'আমি লোকটাকে স্পেয়ার করলাম না। পিছন থেকে জোব্বাটা ধরে টান দিলাম। লোকটা এক হাত দিয়ে ছাড়াতে চেষ্টা করল, অন্য হাতে টিনের কৌটোটা দিয়ে আমার গাড়ির জানলার কাচে টোকা মারতে লাগল ক্রমাগত। ভিক্ষের জন্য যেমন করে আর কী। আমি এবার দু'হাত দিয়ে তার কাঁধের ঝোলাটা টানলাম। এই টানাহ্যাঁচড়ার মাঝখানেই সিগনাল ছেড়ে দেয়, গাড়িগুলো চলতে শুরু করে। আমার গাড়িটাও গড়িয়েছে। লোকটা গাড়ির পাশে পাশে দৌড়োয়। এটা ভিখিরিদের একটা কমন প্র্যাকটিস। অনেক সময় লাস্ট মোমেন্টে মানুষের মন দুর্বল হয়ে ওঠে, গাড়ির কাচ নামিয়ে পয়সা ছুড়ে দেয়। সম্ভবত লোকটা সেই সুযোগই নিতে চেষ্টা করেছিল। আমি তখনও ছাড়িনি। লোকটাকে আরও জোরে টেনে ধরলাম। টানাহ্যাঁচড়ায় বেচারির হাতের কৌটোটা ছিটকে পড়ল রাস্তায়। ভেতরের সিকি, আধুলি, এক-দু'টাকার কয়েন ছড়িয়ে পড়ল ট্রামলাইনে। ততক্ষণে আমার গাড়ির পিছনের চাকা পড়ে থাকা কৌটোটা তেবড়ে দিয়ে স্পিড তুলে ফেলেছে। ডাক্তার সেন, আপনাকে আগেই বোধহয় বলেছি, ব্রজেশ্বরের হাত ভাল। স্পিড তোলার সময়েও সে চমৎকার স্টিয়ারিং কাটাতে পারে। সে যদি কৌটোটা দেখতে পেত কিছুতেই তার ওপর গাড়ির চাকা তুলত না। যাই হোক, এর পরেই সেই ভিখিরি আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকায়। ভয়ংকর দুটো চোখ। পাথরের মতো কঠিন। আমাকে যেন ফালা ফালা করে দেখছে। ওই চোখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। আমি শিউরে উঠে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। ততক্ষণে আমি লোকটাকে চিনতে পেরেছি।' দম নেওয়ার জন্য থামলেন কুঞ্জবিহারী।

ডাক্তার সেন বলেন, 'কে লোকটা?'

'আমি।'

ডাক্তার সেন বিস্মিত গলায় বললেন, 'আপনি। লোকটা আপনি! ওই ভিখিরিটা?'

কুঞ্জবিহারী খানিকটা আপন মনেই বললেন, 'এইখানেই ঘটনাটা শেষ হয়ে গেল হলে বোধহয় এতটা সমস্যা ছিল না। কিন্তু তা হয়নি। গাড়ি বাঁক ঘোরার সময়ে আমি ভেতরটা একঝলক দেখতে পেয়েছিলাম ডাক্তার সেন। মজার কথা হল, সেখানেও আমি ছিলাম! ব্যাক সিটে মাথা এলিয়ে বসে ছিলাম। এরপরই ঘুম ভেঙে উঠে পড়তে চেষ্টা করি, পারি না। ঘুমের মধ্যেই ছটফট করতে থাকি, ঘামতে থাকি।'

কুঞ্জবিহারীর গলা কি সামান্য কাঁপছে? তিনি চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, 'এক গ্লাস জল পাওয়া যাবে? ঠান্ডা জল?'

ডাক্তার সেন ইন্টারকমে চাপা গলায় জলের কথা বললেন। পেশেন্টের সমস্যাটা তিনি বুঝতে পেরেছেন বলে মনে হচ্ছে। সহজ সমস্যা। গরিব মানুষ যেমন ধনী হওয়ার স্বপ্ন দেখে, ধনীরও তেমন ভিক্ষে করে বেড়ানোর ভয় থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কোনও এক ধরনের ইনসিকিউরিটি সেন্স মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে। এই জাতীয় মানুষ বেশিরভাগ সময়েই ব্যাবসাপাতি নিয়ে টেনশনের মধ্যে থাকে। টেনশন বাইরে দেখা যায় না, ভেতরে জমা হয়। সময় সুযোগ পেলে কোনও না কোনওভাবে প্রকাশ পেতে চেষ্টা করে। এটাও

সেরকম। নার্ভ ঠান্ডা করার কোনও হালকা ধরনের ঘুমের ওষুধেই কাজ হবে। তিনি প্রেসক্রিপশনের প্যাড টেনে নিয়ে শান্ত গলায় বললেন, 'কুঞ্জবিহারীবাবু, আপনি যতটা চিন্তিত হয়ে পড়েছেন অত চিন্তা করার মতো কিছু ঘটেনি। স্বপ্নের আসল রহস্য লুকিয়ে আছে রেম বা র‍্যাপিড আই মুভমেন্টের মধ্যে। ঘুমের মধ্যে মণির ঘোরাফেরার ওপর নির্ভর করে আপনি কী ধরনের স্বপ্ন দেখবেন বা আদৌ দেখবেন কিনা। তার সঙ্গে বাস্তবের সম্পর্ক নেই। আসলে আপনার বিশ্রামের প্রয়োজন। টেনশন কমাতে হবে।'

জলের গ্লাসে চুমুক দিয়ে কুঞ্জবিহারী মৃদু হেসে বললেন, 'আমি তো বিশ্রামেই থাকি ডাক্তারবাবু। টেনশনও কিছু নেই। আর আপনি যদি ভাবেন, আমি হঠাৎ করে পথের ভিখিরি হয়ে যাওয়ার ভয় পাচ্ছি, সেটাও বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। আপনাদের শুভেচ্ছায় যেটুকু বিষয়সম্পত্তি, টাকাপয়সা করেছি তাতে আর যাই হোক, কোনও অবস্থাতেই ভিখিরি হয়ে যাওয়া মুশকিল।'

ডাক্তার সেনও হাসলেন। বললেন, 'সেইজন্যই তো বলছি, এটা কিছু নয়। কোনও একটা চাপা স্ট্রেস থেকে হয়েছে। ভিখিরি দেখেছেন তাই ভিখিরি, রাজা-মহারাজা দেখলেও অবাক হওয়ার কিছু ছিল না। দিন কয়েক রাতে ভাল করে ঘুম হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। যাকে বলে সাউন্ড স্লিপ। দেখবেন ভিখিরি-টিখিরি সব ভ্যানিশ, স্বপ্ন একেবারে ক্লিয়ার।'

কথাটা সত্যি। স্বপ্ন ভ্যানিশ হতে দিন কয়েকও লাগল না। প্রথম রাতেই ওষুধ খেয়ে চমৎকার ঘুম হল কুঞ্জবিহারী সামন্তর। স্বপ্ন-টপ্নর কোনও বালাই নেই। সকালে ঝরঝরে শরীর। ব্রেকফাস্টে কিছুদিন হল ফল চালু করেছেন প্রতিমা। কলা বা আপেল। সঙ্গে একটু পাকা পেঁপে। প্রতিমাদেবী বাড়িতে নেই। মাসতুতো ভাইয়ের বিয়ে উপলক্ষে বেরিয়ে পড়েছেন। হাতে খবরের কাগজ নিয়ে পেঁপের টুকরো মুখে তুলতেই কুঞ্জবিহারীর মোবাইল বেজে উঠল। মেয়ে ফোন করেছে।

'বাপি, কেমন আছ?'

'ভাল আছি মা। তুই কেমন আছিস?'

সৌমী প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চিন্তিত গলায় বলল, 'ভাল নেই। তোমার নাকি রাতে ঘুমের সমস্যা হচ্ছে?'

কুঞ্জবিহারী চুপ করে রইলেন। প্রতিমার কাজ। মেয়েকে বলেছে। তিনি বললেন, 'আরে বাবা না না, তেমন কিছু নয়, তোর মা তিলকে তাল করে। একদিন একটু গোলমাল হয়েছিল।'

'কী গোলমাল!'

কুঞ্জবিহারী হেসে বললেন, 'কিচ্ছু গোলমাল নয়। ডোন্ট ওয়ারি মামণি। ডাক্তার সেনের এক সেরাটিভেই এভরিথিং গন। কাল রাতেই ফার্স্ট ক্লাস ঘুমিয়েছি।'

'তুমি নাকি দুঃস্বপ্ন দেখেছ! কী স্বপ্ন বাপি?' আদুরে গলায় বলল সৌমী।

কুঞ্জবিহারী বললেন, 'দেখলাম হাউ মাউ খাঁউ বলে একটা রাক্ষস আমায় খেতে আসছে। হা হা।'

সৌমীও হাসল খানিকটা। একসময় হাসি থামিয়ে নিচু গলায় বলল, 'বাপি তুমি কি মায়ের কাছ থেকে কিছু শুনেছ?'

কুঞ্জবিহারী ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কী ব্যাপারে ডার্লিং?'

সৌমী আদুরে গলায় বলল, 'জানি না যাও।'

কুঞ্জবিহারী হেসে বললেন, 'শুনেছি এবং খুব খুশি হয়েছি।'

'রিয়েলি বাপি?'

'সত্যি। শুনলাম তোর ওই ছেলে নাকি লেখাপড়া নিয়ে থাকে?'

সৌমী আধো গলায় বলল, 'তা থাকে, তবে আমি অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজি করিয়েছি।'

'কীসে রাজি করিয়েছিস?'

সৌমী লজ্জা লজ্জা গলায় বলল, 'অর্ক বলেছে বিয়ের পর সে তোমাকে বিজনেসে হেল্‌প করবে। অত বড় বিজনেস, সব তো আর মাইনে করা লোকজন দিয়ে হয় না, তোমার তো একজন নিজের লোকও চাই। আরে বাবা, পড়াশোনা তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না, বিজনেস দেখতে দেখতেই না হয় করবে। হি এগ্রিড। ঠিক করেছে, গবেষণা-টবেষণার কাজ সেরকম হলে কিছুদিন বন্ধ রাখবে। ভাল হল না বাপি?'

কুঞ্জবিহারী অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'ভাল হল, খুবই ভাল হল।'

মেয়ের ফোনটা ছেড়ে মনটা খুশিই হল কুঞ্জবিহারীর। সত্যি তো এত বড় ব্যাবসার দায়িত্ব যদি জামাই বুঝে নেয়, সেটা তো ভালই। আরও খুশি হলেন অফিসে পৌঁছে। জাপানি কোম্পানির সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করার ব্যাপারে যে গিঁটটা তৈরি হয়েছিল সেটা কেটে গেছে। দিল্লি থেকে জেনারেল ম্যানেজার মুন্সি ফ্যাক্স পাঠিয়েছে, ছাড়পত্র পাওয়া গেছে। মন্ত্রী-আমলাদের 'দেওয়া থোওয়া'র পরিমাণটা খানিকটা বাড়াতে হয়েছে এই যা। বিকেলে অফিস থেকে বেরোনোর মুখে প্রতিমাদেবী ফোন করলেন— 'হ্যাঁগো, কাল তোমার অফিসে একবার বদ্যিকে যেতে বলেছি। বেচারির কিছু টাকা ধার লাগবে, বিজনেসে নামছে, দোকান না রেস্তোরাঁ কী যেন ছাই করবে বলেছে। তবে যা চাইবে তার হাফ দেবে। হারামজাদা আগে কাজ করে দেখাক, তারপর বাকিটা হবে। আর হ্যাঁগো, তোমার শরীর কেমন? স্বপ্ন-টপ্ন কিছু দেখোনি?'

কুঞ্জবিহারী বললেন, 'না কিছু দেখিনি। তোমার ভাইকে অফিসে আসতে হবে না। অ্যামাউন্ট বলে দিয়ো, পাঠিয়ে দেব।'

পার্কসার্কাস মোড়ের কাছে ব্রজেশ্বরকে গাড়ি দাঁড় করাতে বললেন কুঞ্জবিহারী। গাড়ি থেকে নেমে সামনের পানের দোকানে গিয়ে অর্ডার দিলেন। মিঠেপাতা, সঙ্গে মিষ্টি মশলা। পান নেওয়ার সময় নজর পড়ল ফুটপাথের একপাশে গুটিকতক ছেঁড়া চটি বই, পত্রিকা, পুরনো খবরের কাগজ সাজিয়ে এক ছোকরা বসে। কুঞ্জবিহারী সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

'কী লাগবে স্যার?'

টাইতে হাত বুলিয়ে সামান্য ঝুঁকে কুঞ্জবিহারী নিচু গলায় বললেন, 'স্বপ্নের ওপর কোনও বই আছে ভাই?'

'কীসের ওপর!'

'স্বপ্ন, খোয়াব? আছে? কী স্বপ্ন দেখলে কী হয় তার বই থাকে না?'

ছোকরা দাঁত কামড়ে হাসল। বাঁ চোখ টিপে বলল, 'স্বপ্ন নেই, স্বপ্নসুন্দরী আছে স্যার। একদম্ টাইট মাল। দেখবেন?' বলতে বলতে ফুটপাথে বিছোনো প্লাস্টিকের তলা থেকে দ্রুত হাতে একটা পত্রিকা বের করল সে। মলাটে ভরাট নগ্ন বুক বের করা তরুণী হাসছে। মুখে পান দিয়ে ভাল করে চারপাশে তাকালেন কুঞ্জবিহারী। শেষ বিকেলের ঝলমলে আলোয় শহর ছুটছে ধোপদুরস্ত হয়ে। ঝকঝকে গাড়ি ছুটছে একে অপরকে পাল্লা দিয়ে। সুন্দর সুন্দর সাজগোজের মানুষও ছুটছে। নিশ্চিন্ত হয়ে গাড়িতে ফিরে গেলেন কুঞ্জবিহারী। ব্রজেশ্বর সেলুট ঠুকে দরজা খুলে দাঁড়াল। এটা তার নতুন কায়দা। গাড়ি স্টার্ট নেওয়ার পর কুঞ্জবিহারী বললেন, 'একটু খেয়াল করে চলো তো ব্রজেশ্বর। রাস্তার পাশে নজর রেখো।'

'কাউকে খুঁজছেন স্যার?'

চুনের কারণে জিভে একটা হালকা অস্বস্তি শুরু হয়েছে। কুঞ্জবিহারী সেই অস্বস্তি সামলে বললেন, 'না, তেমন কেউ না... একটা আধবুড়ো টাইপের ভিখিরি, হাতে দেখবে একটা টিনের কৌটো রয়েছে। তেবড়ানো কৌটো। দেখলেই আমাকে বলবে।'

শারদীয়া আনন্দবাজার, ১৪১৬

দিঘি

আবার দেখা দিল!

দেখা দিল সেই একই জায়গায়! রাস্তার ঠিক ওপাশে, ফুটপাথ টপকে। সারি সারি দোকান বাজার, বাড়িঘর এক টানে সরিয়ে ফেলে টলটল করছে জল। সকালবেলার ঝকঝকে আকাশ তাতে ছায়া ফেলেছে। নীল ছায়া। মনে হচ্ছে নিজের একটা টুকরো ভেঙে নীচে ফেলে রেখেছে।

জগন্নাথ প্রথমে চোখ কচলাল তারপর মাথা ঝাঁকাল। অনেকসময় মাথা ঝাঁকালে মিথ্যে দৃশ্য চোখের সামনে থেকে সরে যায়। এই জিনিস কিন্তু সরল না। উলটে আরও স্পষ্ট হল! পানকৌড়ি ধরনের কোনও একটা পাখি সেই ঝকঝকে নীল জলে টুপ করে ডুব দিল!

মিথ্যে জলে, মিথ্যে পানকৌড়ি!

সবটাই মুহূর্তখানেকের জন্য। যেন সিনেমার দৃশ্য। নিমেষে এসে পরদা থেকে সরে গেল নিমেষেই। আবার ফিরে এল সেই দোকান-বাজার, বাড়িঘর। সেই এটিএম কাউন্টার! সেই ফুটপাথের গায়ে পার্ক করা ইনোভা গাড়ি।

জগন্নাথের শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। কাঁপা দুটো হাতে বারান্দার রেলিং চেপে ধরল সে। স্পর্শ না করেও বুঝতে পারল ভোরের এই আলগা শীতেও তার কপালে ঘাম জমেছে।

ঘাম হওয়া আশ্চর্যের নয়। বালিগঞ্জের মোড়ের কাছে যদি চোখের সামনে হঠাৎ একটা বড়সড় দিঘি দেখা দেয়, আর সেই দিঘির জলে যদি পানকৌড়ি ডুব মারে, তা হলে ঘেমে ওঠাটাই স্বাভাবিক। আরও বড় কিছু হলেও অবাক হওয়ার কিছু ছিল না।

আজ প্রথম নয়, এই নিয়ে ঘটনাটা পরপর দু'দিন ঘটল। জগন্নাথ মাথা ঠান্ডা করে বোঝার চেষ্টা করে। একেই কি হ্যালুসিনেশন বলে? মায়া? নাকি অন্য কিছু?

প্রথমদিন জিনিসটা দেখা দিয়েছিল রাতে। ঘড়ি দেখেনি জগন্নাথ। তবে এগারোটার কিছু পরেই হবে। রাতের খাওয়া শেষ করে সবে বেডরুমে এসে দাঁড়িয়েছিল জানলার সামনে। সাততলার ওপর ফ্ল্যাট। রাতের এই সময়টা দক্ষিণের জানলায় হু হু করে হাওয়া দেয়। স্কাইস্ক্যাপার, ফ্লাইওভার, শপিংমলে ধাক্কা খাওয়ার পরও সেই হাওয়ায় একটা বুনো এলোমেলো ভাব। শহুরে হাওয়া কোথা থেকে যে এই ভাবটা পায়! মনেই হয় না কলকাতায় আছি। বেশি কথা বলা প্রমোটার ছোকরা এক গাল হেসে বলেছিল, 'ফ্ল্যাটটার দাম যেটুকু বেশি মনে হচ্ছে দাদাভাই, তা আসলে হাওয়ার জন্য।'

জগন্নাথ অবাক হয়ে বলল, 'হাওয়া!'

প্রোমোটার মুচকি হেসে বলল, 'অবাক হচ্ছেন দাদাভাই। অবাক হবেন না। কলকাতা শহরে এখন মাটির দাম নেই, দাম হল হাওয়ার। আগে ছিল জলের দর এখন হচ্ছে হাওয়ার দর।'

'হাওয়ার দর! মানে? কী বলছ আবোল তাবোল?'

বকবকানি ছোকরা আবার হেসেছিল। ভুরু নাচিয়ে লেকচারের কায়দায় বলল, 'মানে খুব সোজা দাদাভাই। তিন-চারতলায় ফ্ল্যাট আর আজকাল কেউ নিচ্ছে না। কেন জানেন? কারণ ওসব ফ্ল্যাটে আজকাল আর আলো বাতাস ঢোকে না। আমার হাতে ওই জিনিস অনেক আছে। ইচ্ছে করলে দু'-পাঁচটা এখনই দেখিয়ে দিতে পারি। কিন্তু ও জিনিস আপনাদের পছন্দ হবে না। নীচের দিকে জায়গা নেই বলে কলকাতা বাড়ছে ওপরের দিকে। যত বাড়ছে দাদাভাই, নীচের আলো বাতাস তত আটকাচ্ছে। এই যুগ হল টাওয়ারের যুগ। আপনাকে যে সাততলাটা বেছেবুছে দেখাচ্ছি তা কি আর এমনি এমনি? কদিন পরে মনুমেন্টের ডগায় না উঠলে বাতাস কী জিনিস কলকাতার মানুষ ভুলে যাবে। চারপাশে ওনলি ভ্যাকুয়াম। সেইদিন এলও বলে।'

ছোকরার বকবকানি পুরোটা মনে না ধরলেও, অনেকটা ধরেছিল। শুধু মনের ব্যাপার নয়, ঘটনা সত্যিও। বেডরুমের জানলাদুটো খুলে দিতেই রঞ্জনার চুল হাওয়ায় উড়তে লাগল। সম্ভবত সেদিনটা ছিল খানিকটা ঝোড়ো হাওয়ার। প্রোমোটার জানলার গ্রিলে হাত রেখে বীরদর্পে হেসে বলেছিল, 'কী দিদিভাই, বলেছিলাম কি না হাওয়ায় উড়িয়ে দেবে? বলেছিলাম তো?'

রঞ্জনা মাথার চুল, গায়ের আঁচল ঠিক করতে করতে গদগদ গলায় বলেছিল, 'হ্যাঁ ভাই বলেছিলে। আমার খুব পছন্দ। হ্যাঁগো, তোমার কেমন লাগছে?'

নতুন ফ্ল্যাটে আসার পর রঞ্জনার গোছগাছের বাতিক বেড়েছে। ঠাট্টা করলে বলে, 'বাতিক বলছ কেন? নিজের বাড়ি সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে কার না ভাল লাগে?'

'বাড়ি! সাড়ে আটশো স্কোয়ার ফুটের একটা পুচকে ফ্ল্যাটকে বাড়ি বলছ!' জগন্নাথ কৌতুকে তাকায়।

রঞ্জনা চোখ বড় করে বলে, 'বাঃ বাড়ি নয়? নিজের বাড়ি তো বটেই। সাড়ে আটশোই হোক আর সাড়ে তিনশোই হোক। তোমার ওই সন্তোষপুরের তিনতলা বাড়িকে আমি কখনই নিজের ভাবিনি। বিয়ের এতগুলো বছর হয়ে গেল, এখনও ওটা শ্বশুরবাড়িই। পরের। তা ছাড়া এটা কত সুন্দর। যে দেখছে সবাই বলছে। বলো, বলছে কি না? ছোড়দি সেদিন বলল, যেতেই ইচ্ছে করছে না রে, এমন হাওয়া বাতাসের ঘর।'

গর্বিত হাসল রঞ্জনা।

হাওয়া বাতাসের ঘর কিনতে জগন্নাথকে অনেক দেনা করতে হয়েছে। একেবারে গলা পর্যন্ত। ব্যাঙ্ক লোনে কুলোয়নি। ব্যক্তিগত ভাবেও ধার নিতে হয়েছে। বন্ধুবান্ধব, অফিস কলিগ, আত্মীয়স্বজন যার কাছ থেকে যতটা পাওয়া গেছে। আপত্তি করেছিল জগন্নাথ। তার চাকরিতে এত বিলাসিতা মানায় না। রঞ্জনা শোনেনি। সমানে চাপ দিয়েছে।

'বাড়ি তো দশবার কিনছ না, একবারই কিনছ।'

'তা বলে এত দাম দিয়ে।'

'আহা, লোকেশনটা দেখবে না? তার ওপর ফ্ল্যাটের পজিশন? শুধু যে ওপরে তা তো নয়, তার ওপর আবার সাউথ ফেসিং।'

জগন্নাথ বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'অতটা দেনা ঘাড়ে নিয়ে সাউথ, নর্থ ফেস করার ইচ্ছে থাকবে ভেবেছ? ভাল করে ভাবো রঞ্জনা। হুট করে কাজটা করে ফেলার আগে দশবার ভাবা উচিত। এত লোন শোধ হবে তো? পারবে?'

রঞ্জনা মুখ ঘুরিয়ে বলেছিল, 'আমার ভাবা হয়ে গেছে। ওটাই নেব। আমার গলার হার আর দুটো চুড়ি বাঁধা দেব ঠিক করেছি।'

সেদিন রাতে জগন্নাথ জানলার সামনে দাঁড়িয়ে মনে মনে দেনার হিসেবই কষছিল। মাসিক কিস্তির সঙ্গে সংসার খরচের যোগবিয়োগ। টানাটানি শুরু হয়ে গেছে। ছেলেমেয়ে হলে এই টানাটানিও আরও বাড়বে। দক্ষিণ খোলা জানলার হাওয়া চিন্তা কমাতে পারছিল না, বরং বাড়াচ্ছিল। ডাইনিং থেকে খুটখাট আওয়াজ আসছে। রঞ্জনা টেবিলে গোছাচ্ছে। সবসময়ের কাজের মেয়েটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে সে। টাকাপয়সার কারণেই ছাড়িয়েছে। মুখে অবশ্য সেকথা বলে না। বলে, 'ফ্ল্যাটে সবসময়ের কাজের লোক চলে না। তা ছাড়া ওরা কাজের থেকে অকাজই করবে বেশি। যা নোংরা, মা গো।'

চিন্তিত মনে সিগারেট ধরিয়ে বাইরে, নীচে তাকাল জগন্নাথ। অনেক নীচে। আর তখনই দিঘিটা দেখতে পেল সে! রাস্তার ওপাশে, অলস ভঙ্গিতে, অনেকটা জায়গা জুড়ে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে যেন। জলে রাতের আলো পড়েছে। রাতের অন্ধকার পড়েছে।

ঠোঁটের সিগারেট হাতে নিয়ে ভুরু কোঁচকাল জগন্নাথ। জল! বালিগঞ্জে জল আসবে কোথা থেকে? তা ছাড়া ফুটপাথের ওদিকটায় তো সারি সারি দোকানবাজার, বাড়ি। এটিএম কাউন্টার। মোবাইল শপ। ফ্ল্যাট দেখতে আসার সময়েই রঞ্জনা খুশি হয়ে বলেছিল, 'ইস কী সুবিধে বলো! রাস্তা টপকালেই হাতের কাছে সবকিছু। সন্তোষপুরের মতো কথায় কথায় রিকশা ধরতে হবে না।'

জগন্নাথ জানলার গ্রিলে মাথা ঠেকিয়ে ভাল করে দেখতে চাইল। হ্যাঁ, ওই তো, জলই তো! যতদূর চোখ যায়। রাস্তার তীব্র তীক্ষ্ণ আলো পড়ে সেই জল কোথাও কোথাও চকচক করছে। ছুটে যাওয়া গাড়ির হেডলাইটে কেঁপে কেঁপে উঠছে!

হাওয়ায় একটা জোলো, সোঁদা গন্ধ না?

রঞ্জনার ঘরে-ঢোকা আওয়াজে সংবিৎ ফিরল জগন্নাথের।

'দেখছ তো, তুমি ফ্ল্যাটটার কেমন প্রেমে পড়ে গেছ? জানলা থেকে নড়তেই চাইছ না।'

জগন্নাথ মুখ না ফিরিয়েই বিড়বিড় করে বলেছিল, 'না ঠিক তা নয়...।'

রঞ্জনা দরজা আটকে দ্রুত হাতে পোশাক বদলাতে থাকে। এখানে আসার পর মনের মতো একটা রাত্রিবাস কিনেছে সে। এমনিতে গা দেখা যায় না, তবে খুলতে সোজা। আগেরটায় জগন্নাথ কতবার যে গিঁট পাকিয়ে ফেলেছিল।

'আহা লজ্জার কী আছে? কেনার সময় কিন্তু কম গালাগালি দাওনি।'

জগন্নাথ ফিসফিস করে বলল, 'একবার এদিকে এসো রঞ্জনা।'

'কী হয়েছে?'

জগন্নাথ খানিকটা ভূতগ্রস্তের মতো গাঢ় গলায় বলে, 'একটা জিনিস দেখে যাও।'

পিছন ফিরে শাড়ি খোলে রঞ্জনা। অন্তর্বাসের জঞ্জাল থেকে মুক্ত হতে হতে বলে, 'এত ওপর থেকে একটা কেন, সবটাই ভাল। তুমি সিগারেটটা ফেলো দেখি, ফ্ল্যাটে সিগারেটে খুব অসুবিধে হয়।'

হাতের সিগারেট হাতেই পুড়ছিল জগন্নাথের। দিঘি তার জল, আলো, ছায়া নিয়ে সরে গেছে ততক্ষণে! আবার সেই ঘরবাড়ি। সেই ফুটপাথ দিয়ে হেঁটে যাওয়া দু'-একটা রাতের মানুষ। সেই এটিএম বুথ। সেই মোবাইল শপের ঝলমলে আলো।

রাত্রিবাসের বুকের বোতাম না আটকেই রঞ্জনা জগন্নাথের পাশে এসে দাঁড়াল। দাঁড়াল ঘনিষ্ঠ হয়ে। স্বামীকে শরীরের স্পর্শ দিয়ে। এত ওপরে এই আরেক সুবিধে। আশেপাশে থেকে উঁকি মারার কেউ নেই। জগন্নাথ যদি তাকে এখন জড়িয়ে চুমুও খায় কেউ দেখতে পাবে না। সন্তোষপুরের বাড়িতে এটা অসম্ভব ছিল। চুমু তো দূরের কথা, দু'জনে মিলে একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসার পর্যন্ত উপায় ছিল না।

'কী দেখছ?'

জগন্নাথ অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'জানো রঞ্জনা, এইমাত্র ওদিকটায়, ওপাশে...।'

জগন্নাথ চুপ করতে রঞ্জনা ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী ওপাশে?'

জগন্নাথ নিজেকে সামলাল। সে যা দেখেছে সেকথা রঞ্জনাকে বলতে গেলে একটা বিরাট হাসাহাসির কাণ্ড হবে। ঘটনা তো হাসাহাসিরই। রাস্তার পাশে বাড়িঘর গজাতে পারে, দোকানপাট বসতে পারে, একটা বড়সড় দিঘি তো তৈরি হতে পারে না।

রঞ্জনা বলল, 'কী হল, বললে কী দেখেছ?'

জগন্নাথ সিগারেটের টুকরো জানলা গলিয়ে ফেলে দিল, তারপর হেসে জড়িয়ে ধরল স্ত্রীকে।

'দেখি, একটা লোক রাস্তার ওপাশে, ফুটপাত ধরে দৌড় দিচ্ছে।'

রঞ্জনা চোখ বড় করে বলল, 'সে কী গো। মারামারি নাকি?'

জগন্নাথ স্ত্রীর দিকে ঘন হয়ে এসে বলল, 'মনে হয় না।'

'তা হলে?'

'মনে হয়, বাড়িতে বউ অপেক্ষা করছে। তোমার মতো এইরকম সুন্দর হয়ে।'

রঞ্জনা হাত দিয়ে স্বামীর মুখ সরিয়ে লজ্জা লজ্জা হাসল। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'যাঃ যত ফাজলামি। নিজের ফ্ল্যাটে এসে খুব ফাজলামি বেড়েছে না?

পরদিন থেকে আর মিথ্যে দিঘির কথা মনে রাখেনি জগন্নাথ। রাতে মানুষ কতরকম ভুল শোনে, ভুল দেখে সব কি মনে রাখা যায়? নাকি রাখতে হয়?

মনে পড়ল আবার আজ সকালে। প্রায় দশদিন পেরিয়ে। আবার দিঘিটা দেখার পর।

রঞ্জনা এখনও ওঠেনি। সন্তোষপুরে অনেক ভোরে বিছানা ছাড়ত। এখানে ঘুম ভাঙার পরও খানিকটা গড়িয়ে নেয়। বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল জগন্নাথ। একেবারে কাক ভোরে যাকে বলে। শহরের ঘুম ভাঙব ভাঙব করছে। রাস্তায় একটা দুটো করে লোকজন হাঁটছে।

গাড়ি চলতে শুরু করেছে অল্প অল্প। বেশ লাগছে। অনেকটা ওপর থেকে লোকজন, পথঘাট দেখতে অন্যরকম লাগে। নিজেকে সবার থেকে আলাদা মনে হয়। ক'টা বছর কষ্ট করে যদি দেনার বোঝা হালকা করা যায়, তা হলে বলতে হবে রঞ্জনা সত্যি একটা সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। মেয়েরা একই সঙ্গে অবুঝ আর সাহসী হয়। রঞ্জনা সাহস না করলে সে কিছুতেই এত খরচ করে ফ্ল্যাটটা নিত না।

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে জগন্নাথ মুখ তুলে তাকায় এবং আবার দিঘিটা দেখতে পায়। দিনের আলোয় জলরেখা স্পষ্ট! একটু একটু যেন ঢেউও আছে! একটা পানকৌড়ি পর্যন্ত!

রঞ্জনা প্লেটে ভাত তুলতে তুলতে মুচকি হেসে বলল, 'জল মানে? সুইমিংপুল?'

কষ্ট করে হাসল জগন্নাথ।

'ঠাট্টা করছ?'

'বাঃ তুমি বালিগঞ্জের রাস্তায় আস্ত একটা দিঘি দেখতে পাচ্ছ আর আমি ঠাট্টা করতে পারব না?'

জগন্নাথ বউয়ের কাছে স্মার্ট হতে চাইল।

'দিঘি দেখতে পাচ্ছি তো বলিনি, বলেছি দিঘির মতো লাগছিল।'

'মরীচিকা?'

এখানে আসার পর খাওয়ার দাওয়ার ব্যবস্থা রঞ্জনা সবই কাচের প্লেটে করেছে। প্লেটগুলোও সুন্দর। পাশে হালকা নকশা। আগে ভাতেই মুসুরির ডাল ঢেলে দিত। এখন ডালের জন্যও আলাদা বাটি। সেই বাটি টেনে নিতে নিতে জগন্নাথ বলল, 'মরীচিকা ঠিক নয়, এক ধরনের আলো ছায়ার মায়া বলতে পারো। কে জানে হয়তো এতটা ওপর থেকে কোনও কোনও সময় আলো এমনভাবে পড়ছে মনে হচ্ছে জলের মতো। চকচক করছে।'

'আর বাড়িঘর, দোকানবাজারগুলো সব যাচ্ছে কোথায়? জলে ডুব মারছে?'

মুখ টিপে হাসল রঞ্জনা। তারপর প্লেটে ভাত তুলে দিতে দিতে বলল, 'ঠিক আছে আমি দেখব তো, আলো নিশ্চয় তোমার জন্য একা পড়বে না। আমার জন্যও পড়বে। আমাকেও দিঘি দেখাবে। ভালই হবে। ফ্ল্যাট থেকে খানিকটা নেচারল বিউটি পাওয়া গেল।'

'তুমি কিন্তু আবার ঠাট্টা করছ রঞ্জনা।'

'আচ্ছা, করব না, আসলে কী হয়েছে জানো, টাকাপয়সার চিন্তায় তোমার মাথা এলোমেলো হয়ে গেছে। সেই কারণে তুমি যা-তা দেখতে শুরু করেছ। এখন বালিগঞ্জে জল দেখছ, এরপর শ্যামবাজারে পাহাড় দেখবে।'

জগন্নাথ এবার লজ্জা পেল। না, দুম করে ঘটনাটা রঞ্জনাকে বলা উচিত হয়নি। সত্যি তো একটা ছেলেমানুষি কাণ্ড। চিন্তাভাবনার মধ্যে থাকলে কত কী যে হয়। জগন্নাথ খাওয়ায় মন দিল। অফিসে লেট হয়ে যাবে। সামনে একটা প্রোমোশনের চান্স আছে। হয়ে গেলে মাইনে বাড়বে। এখন মাইনে বাড়ার খুব প্রয়োজন। খেতে খেতেই মনকে শক্ত করল জগন্নাথ। যেন পণ করল, আর কিছুতেই উলটোপালটা দেখবে না।

মজা হল, মানুষের অনেক কিছুর ওপর যেমন নিয়ন্ত্রণ থাকে তেমন আবার অনেক কিছুর

ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকেও না। বিশেষ করে নিজের ওপর। জগন্নাথেরবেলাতেও তাই ঘটল। সে আবার পথের ধারে ঘরবাড়ি মানুষ শূন্য করে দিঘিটা দেখতে পেল। এবার অনেক দ্রুত এবং পরপর।

সাইক্রিয়াটিস্ট ভদ্রলোক গম্ভীর ধরনের মানুষ। ভারী গলায় বললেন, 'আপনি কি বিশ্বাস করেন যে আপনি সত্যি সত্যি জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন?'

'না, ডাক্তারবাবু আমি বিশ্বাস করি না।'

জগন্নাথ ভেবেছিল, এই স্বীকারোক্তিতে ডাক্তার খুশি হবেন। হলেন না। ভদ্রলোকের মুখ আরও গম্ভীর হয়ে গেল। 'হ্যালুসিনিশনের এটাই সমস্যা। গোড়াতে মিথ্যে বলেই বিশ্বাস হয়। পরে সেই বিশ্বাস বদলায়।'

'কী হয়?'

ডাক্তার এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে বললেন, 'ঝামেলা করে।'

জগন্নাথ কাঁদোকাঁদো বলল, 'ডাক্তারবাবু, আমার কি মাথার গোলমাল হয়েছে?'

সাইক্রিয়াটিস্ট ভদ্রলোক এতক্ষণ পরে সামান্য যেন হাসলেন।

'মাথায় কখনও গোলমাল হয় না। গোলমাল থাকে। কারওটা ধরা যায়, কারওটা ধরা যায় না।'

'আমারটা কি ধরা গেছে?'

'মনে হয় না। হ্যালুসিনেশনে আমরা সকলেই ভুগি। তবে আপনার মতো একটানা হয় না। তার ওপর একটা অন্যরকম। ইট কাঠ পাথর সরিয়ে একটা ওয়াটার বডি দেখতে পাচ্ছেন... আচ্ছা, আপনার দেশ কোথায়? আপনি কি গ্রামে বড় হয়েছেন? অনেক সময় স্মৃতি ভিসুয়ালি ফিরে আসে।'

জগন্নাথের খুব খারাপ লাগছে। বিষয়টা যে এত প্রকটভাবে দেখা দেবে সে ভাবতেও পারেনি। রঞ্জনাও খুব আপসেট হয়ে পড়েছে। যে হাওয়া-বাতাসের জানলাটার জন্য এত দাম দিয়ে ফ্ল্যাট কেনা সেটাই পাকাপাকি বন্ধ করে দিয়েছে। মজার কথা হল, সাততলার ওপর থেকে ছাড়া দিঘিটা কখনও দেখাও দেয়নি! অন্তত আজ পর্যন্ত তো নয়ই। রঞ্জনাই তাকে সাইক্রিয়াটিস্টের কাছে জোর করে পাঠাল। নিজেও আসতে চেয়েছিল। জগন্নাথই রাজি হয়নি। বলেছে, 'আগে আমি যাই, সিরিয়াস কিছু হলে তুমি যেয়ো।'

ডাক্তার বললেন, 'কী হল বললেন না, দেশের বাড়িতে কোনও পুকুরটুকুর আছে?'

জগন্নাথ গলা নামিয়ে বলল, 'ডাক্তারবাবু, দেশের বাড়ি বলতে আমার আলাদা কিছু নেই। কলকাতাতেই আমার জন্ম। এখানেই লেখাপড়া, বড় হয়েছি।'

ডাক্তার প্রেসক্রিপশনের প্যাড টেনে নিয়ে বললেন, 'কোনওরকম টেনশন আছে?'

জগন্নাথ একটু চিন্তা করল। ভাঙা গলায় বলল, 'ফ্ল্যাটটা অনেক খরচ করে কিনেছি, অনেকটা লোন, তা ছাড়া...।'

'তা ছাড়া কী?' চশমার ওপর দিয়ে তাকালেন ডাক্তার।

'তা ছাড়া অফিসে একটা প্রোমোশনের ব্যাপারও আছে।'

'ও। এটাই তো আগে বলবেন। চিন্তা করবেন না। স্ট্রেস থেকে হ্যালুসিনেশন একটা কমন

ব্যাপার। ওষুধ লিখে দিচ্ছি, আজ থেকেই শুরু করবেন। থ্রি উইকস পরে রিপোর্ট করবেন। আশা করি তার মধ্যে অনেকটা ঠিক হয়ে যাবেন।'

জগন্নাথ একটু চুপ করে থেকে বলল, 'এরকম কেন হচ্ছে ডাক্তারবাবু? আমার ভয় করছে। স্ত্রীও ভীষণ ঘাবড়ে গেছে।'

গম্ভীর ডাক্তার আবার সামান্য হাসলেন।

'এরকম কেন হচ্ছে সেটা বোঝালে জটিল হয়ে যাবে। আসলে এত চাপ, উদ্বেগ আপনার ভেতরে কোনও কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন শুরু করেছে। তারা আপনার অবচেতনে একধরনের মুক্তির পথ খুঁজছে। খুব সম্ভবত দিঘিটা এক ধরনের সিম্বল। প্রতীক। আপনার উদ্বিগ্ন মনের খোলামেলা কোনও মুক্তির পথ। এটা জল না হয়ে জঙ্গলও হতে পারত। মাসখানেক কেটে গেলে মিসেসকে নিয়ে বাইরে থেকে কোথাও ঘুরে আসবেন।

জগন্নাথ খানিকটা আশ্বস্ত হল।

'থ্যাঙ্কু ডাক্তারবাবু। শেষ একটা কথা জিজ্ঞেস করছি, আমি কি জানলাটা খুলব?'

'অফকোর্স। আপনার দিঘি তো আপনার ফ্ল্যাটের জানলার বাইরে নেই, আছে আপনার মনের ভেতরে। আশা করি আমার ওষুধ মন থেকে তাকে দূর করবে।'

তিন সপ্তাহ লাগল না, দু'সপ্তাহ যেতে না যেতে ওষুধ কাজ দিল। খুব ভালভাবেই দিল। রঞ্জনা দারুণ খুশি। জগন্নাথও। এর মধ্যে আবার দুটো কাণ্ড ঘটেছে। জগন্নাথের অকৃতদার বড়মামা মারা গেছেন। মৃত্যুর আগে ভাগনেকে তাঁর বারাসতের জমির একটা অংশ লিখে দিয়ে গেছেন। বিক্রি করলে হেসে খেলে এই ফ্ল্যাটের দাম অনেকটা উঠে আসবে। আর দু'নম্বর কাণ্ড হল, জগন্নাথের প্রমোশনটা হয়ে গেছে।

রাতে রঞ্জনা দক্ষিণের জানলার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'দেখলে তুমি টেনশন করতে করতে কেমন অসুস্থ হয়ে পড়ছিলে। কই এসো তো, দেখো দিকি তোমার ওইসব পুকুর, দিঘি, সমুদ্র আর দেখতে পাও কিনা।'

জগন্নাথ জানত দেখতে পাবে না। তবু সে এগিয়ে এল। তাকিয়ে দেখল, না, কিছুই নেই। সেই ঘরবাড়ি, দোকানের সারি। এত রাতেও আলোয় উজ্জ্বল।

রঞ্জনা হেসে ফিসফিস করে বলল, 'পাগল একটা।'

জগন্নাথ বলল, 'আসলে টাকা পয়সা নিয়ে চিন্তা করতে করতে...।'

জগন্নাথ একেবারে ঠিক হয়ে গেছে। সে আর কখনওই তার হাওয়ায় ভেসে যাওয়া ফ্ল্যাটের ওপর থেকে টলটলে জলের মিথ্যে দিঘিটা দেখতে পায় না। তবে নতুন কাউকে ফ্ল্যাটের ঠিকানা দিতে গেলে মজা করে বলে—

'ফ্লাইওভারটা পেরোলেই দেখবেন একটা দিঘি। খুব বড়। জল একেবারে টলমল করছে। ওর উলটোদিকের ফ্ল্যাটের সাততলায়...।'

ডাক্তারবাবু বা রঞ্জনা এই মজার কথা জানতে পারে না।

নতুন গল্পপত্র, জানুয়ারি ২০০৯

নেতা

তেষ্টায় গলা ফেটে যাচ্ছে বিশ্বনাথের। অথচ এরকম হওয়ার কথা নয়। তার সামনেই টেবিলের ওপর কাচের গেলাস। তাতে জল টলটল করছে। গেলাসের ওপর ঘন নীল রঙের ঢাকনা। ঢাকনায় সাদা পাল তোলা জাহাজের ছবি। ঢাকনা সরিয়ে গেলাসটা মুখে তুললেই তেষ্টার সমস্যা মিটে যায়। বিশ্বনাথ মাঝেমধ্যে গেলাসের দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু তুলছে না। তুলছে না অন্য কোনও কারণে নয়, আসলে তার কিছুতেই মনে পড়ছে না, ঠিক কী করলে তেষ্টা মেটে। অনেক ভাবছে। তবু মনে পড়ছে না। মানুষের তেষ্টা মেটে কীভাবে? এক মুঠো ঘাস চিবোলে? গলা খুলে গান গাইলে? নাকি খানকতক ডিগবাজি খেলে? এরকম হাজারটা হাবিজাবি জিনিস মনে পড়ছে, কেবল জল খাওয়ার কথাটা মাথায় আসছে না।

অতিরিক্ত নার্ভাস হয়ে পড়লে অনেক সময় এরকম হয়। যেটা দরকার সেটা কিছুতেই মাথায় আসতে চায় না। আলতুফালতু জিনিস মাথায় ঘুরপাক খায়। বিশ্বনাথের আজ তাই হয়েছে। এই মুহূর্তে সে অতিরিক্ত নার্ভাস। তেষ্টার সঙ্গে তার হাঁটু কাঁপাও শুরু হয়ে গেছে। বিশ্বনাথ টেবিল থেকে হাতদুটো সরিয়ে হাঁটুর ওপর রাখল।

মলিনবাবু চেয়ারে হেলান দিলেন। ফতুয়ার পকেট হাতড়ে ছোট্ট একটা কৌটো বের করলেন। লম্বা ধরনের কৌটো। দেখতে সুন্দর। শুধু সুন্দর নয়, দামিও। জয়পুরের ওরিজিনাল জিনিস। পুরোটা কাঠের। মাথার কাছের ঢাকনায় হালকা রুপোর টাচ আছে। সিলভার লাইন। অল্প টান দিতেই ঢাকনা খুলে যায়। ভেতরে সারি দিয়ে সাজানো খড়কে কাঠি। মলিনবাবু অতি যত্নে একটা কাঠি বের করে মুখে পুরলেন এবং সন্তর্পণে দাঁত খুঁটতে শুরু করলেন। এই সময়টায় সাধারণত আমেজে মলিনবাবুর একটা চোখ আধখানা বুজে থাকে। আজ দুটো চোখই আধবোজা। এর মানে আরাম বেশি হচ্ছে।

এক-একজন বড় মানুষের এক-এক রকম শখ থাকে। কারও বই পড়া, কারও গান শোনা, কেউ আবার বাগান করে। নেতা মলিনবাবুর শখ হল দাঁত খোঁটা। রাজনৈতিক জীবনের একেবারে প্রথম পর্যায়ে এই কাজে তিনি ব্যবহার করতেন দেশলাই কাঠি। বারুদের দিকটা পট করে ভেঙে ফেলে দিতেন, বাকিটা দু'আঙুলে ধরে পুরে দিতেন মুখে নিঃশব্দে। তারপর এল আলপিন। আলপিন অবশ্য বেশিদিনের জন্য নয়, মাঝখানে কিছু দিনের জন্য। সেটা ছিল খুবই টেনশনের একটা সময়। পার্টিতে তখন নিজেদের মধ্যে মারাত্মক লেঙালেঙি চলছে। একেবারে হার্ড টাইম বলতে যা বোঝায়। যায় যায় অবস্থা। সেই টেনশন পিরিয়াড কাটলে দেখা দিল প্লাস্টিকের টুথপিক। ততক্ষণে পার্টিতে একটা জায়গা হয়ে গেছে। প্লাস্টিকের টুথপিক বেশ পছন্দের ছিল মলিনবাবুর। জিমন্যাস্ট করা মেয়ের মতো।

হিলহিলে পাতলা শরীর। বেঁকিয়ে চুরিয়ে ইচ্ছেমতো খেলানো যায়। এখন চলছে পাতলা কাঠের শৌখিন জিনিস। ডগায় নকশা, শেষে নকশা। মলিনবাবুর ইচ্ছে আছে, গোটা বিষয়টা চন্দন কাঠের দিকে নিয়ে যাওয়ার। বছরে দু'বার মাইশোর থেকে আসবে। প্যারিসের শ্যাম্পেন, হাভানার চুরুটের মতো মাইশোরের দাঁত খড়কে।

মলিনবাবু চোখ খুললেন। বিশ্বনাথের দিকে তাকালেন। না, গণেশ কাজটা খারাপ করেনি। সত্যি লোকটার সঙ্গে তাঁর চেহারার মিল আছে। অল্প মিল নয়, বেশ অনেকটাই মিল। হাইটটা প্রায় সমান। গায়ের রংও কাছাকাছি, কালো। চোখের চাউনিতে মিল না থাকলেও লম্বা নাক আর নাকের পাশের আঁচিলটায় মিল আছে। সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি আর কালো চশমা পরলে চট করে বোঝা কঠিন। না, গণেশ একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। এতটা মিলের দরকার ছিল না। মলিনবাবু খুশিতে সামান্য হাসলেন। বললেন, 'কী পারবেন না?'

বিশ্বনাথ ঢোঁক গিলল। সামনের মানুষটা কোনও রাম-শ্যাম মানুষ নয়, নেতা মানুষ। নেতা তার দিকে তাকিয়ে হাসছে। একটু হলেও হাসছে। উত্তরে তারও হাসা উচিত। বিশ্বনাথ হাসল। কিন্তু গলা শুকিয়ে যাওয়ার কারণে সেই হাসি হাসির মতো হল না। উলটে মুখে একটা ভয়ের ভাব ফুটে উঠল। বিড়বিড় করে বলল, 'ভয় করছে স্যার।'

মলিনবাবু খুশি হলেন। রাজনৈতিক জীবন তাঁকে শিখিয়েছে উলটো দিকের মানুষের ভয় থাকা ভাল জিনিস। অ্যাশট্রেতে খড়কে কাঠি ফেলে বললেন, 'ভয়! দূর, ভয় কীসের? আমি আছি না? ভাই, আপনি কী করেন?'

বিশ্বনাথ একই ভাবে বিড়বিড় করে বলল, 'কিছু করি না স্যার। দু'বছর আগে কারখানা...।'

মলিনবাবু আরও খুশি হলেন। এত বড় একটা মানুষ কিছু করে না মানে খুবই ভাল। কিছু না করা মানুষ সর্বদা একটা অস্থিরতার মধ্যে থাকে। এদের কথা শোনাতে সুবিধে হয়, খরচ কম লাগে। গণেশ কাজটা করেছে চমৎকার। শুধু প্রক্সি দেওয়ার জন্য একই রকম দেখতে লোক ধরে আনেনি, খরচাপাতির দিকটাও খেয়াল রেখেছে। ছেলেটা গুণী।

মলিনবাবু মুখে চুকচুক আওয়াজ করে বললেন, 'আহা, এই বাজারে কিছু না করাটা খুবই বিচ্ছিরি ব্যাপার। কী বলব ভাই, দেশে সমস্যা তো এই একটাই। সব আছে, শুধু করার কিছু নেই। যাক, বাড়িতে কে কে আছে? বিয়ে-থা হয়েছে?'

এতক্ষণ পরে বিশ্বনাথ একটু উৎসাহ পেল। ভাল করে মুখ তুলে বলল, 'স্যার, স্ত্রী আছে। মেয়ে ফুলি আছে। ভাল নাম ফুলেশ্বরী। ক্লাস ফোরে পড়ছে।'

মলিনবাবু দু'হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন। লোকটা শুধু সস্তা নয়, বোকাও। বোকা লোকরাই আগ বাড়িয়ে ছেলে-মেয়েদের নাম বলে। চেয়ারটা পিছনে ঠেলে বললেন, 'গণেশ নিশ্চয় আপনাকে কাজটা বুঝিয়ে দিয়েছে?'

বিশ্বনাথ চুপ করে রইল। বড় মানুষদের কাছে খানিকক্ষণ বসলে সাহস বাড়ে। তার বাড়ছে না। বরং উলটো হচ্ছে। একটু আগে হাঁটু কাঁপছিল, এখন মনে হচ্ছে গোটা পা-টাই কাঁপছে। বলল, 'স্যার, আমি বোধহয় পারব না। আগে কখনও তো এরকম কিছু করিনি।' কথাটা বলে বিশ্বনাথ বুঝতে পারল, শুধু শরীর নয়, তার গলাও কাঁপছে।

মলিনবাবু ভুরু কোঁচকালেন। তিনি জানেন, এইসময় কী করা উচিত। এই 'পারব না, করব না' অসুখের সহজ ট্রিটমেন্ট আছে। খুব জোরে একটা ধমক দিতে হয় সেই ধমকে 'চোপ' যেমন থাকবে তেমনই 'শুয়োরের বাচ্চা'ও রাখতে হবে। ধমক শেষে মিটিমিটি হেসে বলতে হবে, 'ভাই, এক গেলাস শরবত দিতে বলি? আমের শরবত। খারাপ কিছু না। হোম মেড। খাবেন এক গেলাস?'

কিন্তু এই লোককে ট্রিটমেন্টটা দেওয়া ঠিক হবে না। গাধাটা ঘাবড়ে যাবে। তাকে যে কাজটা দেওয়া হচ্ছে সেটা কঠিন এবং গোলমেলে। ঘাবড়ে গেলে সমস্যা হতে পারে। তা ছাড়া লোকটা ভয় পেয়ে চলে গেলে মুশকিল। এই মুহূর্তে এত কাছাকাছি দেখতে আর একজনকে পাওয়া যাবে না। একে অন্যভাবে সামলাতে হবে।

'দেখুন কী কাণ্ড। এখনও আপনি ভয় পাচ্ছেন? ছি ছি। আরে বাবা, আগে করেননি তো কী হয়েছে? এখন করবেন। কখন কে কী করে তা কি আগে থেকে বলা যায়? এই তো আমার কথাই ধরুন না ভাই। ধরুন আমার কথা। কী ছিলাম আর কী হলাম। একটা সময় করতাম ভাঁড় ডিউটি!'

বিশ্বনাথ জামার হাতা দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। অস্ফুটে বলল, 'ভাঁড় ডিউটি।'

মলিনবাবু কৌটো খুলে আর একটা কাঠি বের করলেন। গুড। প্রশ্ন করা মানে লোকটা সহজ হচ্ছে। বড় করে হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, ভাঁড় ডিউটি। সে একটা সময় ছিল বটে। খতরনাক সময়। সবে কলেজে ঢুকেছি। বাবা বলল, ওনলি লেখাপড়ায় কিস্যু হবে না। পকেটে গাদাখানেক সার্টিফিকেট নিয়ে ফ্যা ফ্যা করে ঘুরবি। সাইডে একটা কিছু কর। তারপর থেকেই ছোঁকছোঁক শুরু করলাম। পার্টিতে এন্ট্রি নেব। কিন্তু নেব বললেই কি নেওয়া যায় ভাই? সেটা এখনকার মতো সময় ছিল না। ভেরি হার্ড টাইম। খুব কঠিন সময়। পার্টিতে চলছে পুনুদা আর দিনুদার জমানা। আমরা আড়ালে বলতাম 'নুনু এরা'। বাংলায় যাকে বলে 'নুনু জমানা'।পুনুদার 'নু আর দিনুদার 'নু'। দুইয়ে মিলে... হা হা। আমাদের তখন কাজ ছিল, ভাঁড়ে করে ওদের চা সাপ্লাই করা। সেই চা খেতে খেতে হারামজাদারা মিটিং করতেন। দেশ দশের কথা ভাবতেন। তখন কি ভাই জানতাম আমিও একটা নেতা হয়ে যাব? জানতাম আমি? ভাঁড় থেকে একেবারে... হা হা। তাই বলছি, আপনারও কী হবে ঠিক নেই। যা খুশি হতে পারে। বলা যায় না, আপনিও হয়তো... নিন, ওসব ফালতু চিন্তা ছাড়ুন। কাল সকালেই বেরিয়ে পড়ুন ভাই। শান্তভাবে কাজটা সেরে আসুন।'

বিশ্বনাথের তেষ্টা বাড়তে বাড়তে একটা জায়গায় এসে থম মেরে গেছে। এখন আর অত কষ্ট হচ্ছে না। সে জল-ভরা গেলাসের দিকে তাকাল। ঢাকনার ছবিটা চমৎকার। পুরনো দিনের গল্পের বইতে আঁকা ছবির মতো। কাঁচা হাতের ছবি। হয়তো সেই কারণেই বেশি ভাল লাগছে। ছবিটা ফুলিকে দেখাতে পারলে হত। মেয়েটা একদম ছবি আঁকতে পারে না। ক্লাসের ড্রইং পরীক্ষায় একশোতে দুই পেয়ে সেদিন বাড়ি ফিরল। মালতী আজকাল সব সময় রেগে থাকে। সেদিন অবস্থা আরও ভয়ংকর হল। আঁকার পরীক্ষায় দুই পাওয়ার অপরাধে সে তার মেয়েকে কঠিন শাস্তি দিল। সারা দুপুর ছোট্ট ফুলিকে বারান্দায় বসে ছবি আঁকতে হয়। এক হাজারটা গোল আর এক হাজারটা চৌকো। ছবি আঁকা একটা দারুণ

আনন্দের বিষয়। অথচ ফুলি সেদিন ছবি আঁকছিল হাপুস নয়নে কাঁদতে কাঁদতে। চোখের জলে তার ফ্রকের হাতা ভিজে যাচ্ছিল। বিশ্বনাথের খুব ইচ্ছে করছিল মেয়েটাকে গিয়ে কোলে তুলে নেয়। চোখের জল মুছিয়ে দেয়। নিজের মেয়েকে কোলে তুলে চোখের জল মুছিয়ে দেওয়া কঠিন কোনও কাজ নয়। অতি সহজ কাজ। কিন্তু এই সহজ কাজে সেদিন সাহস পায়নি বিশ্বনাথ। দীর্ঘদিন রোজগার না থাকলে বোধহয় এরকমই হয়। মানুষ অতি সহজ কাজের সাহসও হারিয়ে ফেলে।

এখান থেকে যাওয়ার সময় ফুলির জন্য জলের ঢাকনাটা চেয়ে নিয়ে গেলে কেমন হয়?

মলিনবাবু গলা খাঁকারি দিলেন। না, এবার একটু কড়া হওয়া দরকার। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'কী হল? এখনও ভাবছেন? আপনাকে তো ভাই এখানে কবিতা লিখতে ডাকা হয়নি যে অনেক ভাবাভাবি করতে হবে। কাজ করার আগে যারা এত ভাবে তাদের আমি পছন্দ করি না। এবার আসল কথায় আসুন। কাজ করবেন টাকাপয়সা বুঝে নিয়ে চলে যাবেন। ব্যস, মিটে গেল। গণেশ আপনাকে সব বলে দিয়েছে তো?'

মলিনবাবুর চেবানো গলা শুনে বিশ্বনাথ সামান্য চমকে উঠল। মাথা নাড়ল। 'সব' কিনা জানা নেই, তবে গণেশ তাকে অনেক কথাই বলেছে। গণেশকে এই এলাকার সবাই বুঝেশুনে চলে। তার মোটরবাইক আছে, গলায় সোনার চেন আছে। সেই সোনার চেন আঙুলে পাকাতে পাকাতে হেসে হেসে কথা বলে। আঙুলে চেন পাকানোর মানে গণেশ হুমকি দিচ্ছে। হাসির সঙ্গে হুমকি মেশানোর কাজে গণেশ একজন ওস্তাদ ছেলে। সেই গণেশ সেদিন মোটরবাইক থেকে নেমে বিশ্বনাথের হাত ধরে রাস্তার ধারে টেনে নিল। গলা নামিয়ে বলল, 'এই যে তোমাকেই খুঁজছি বিশুদা। একটা কাজ আছে। ভাল পেমেন্ট। গুরুর নিজের কাজ। পার্সোনাল আর কনফিডেনশিয়াল। জানো তো, দাদার এবার ইলেকশনে টিকিট পাওয়ার হাই চান্স? সুতরাং কপাল ঠুকে জয়গুরু বলে ঝুলে পড়ো মাইরি। ফ্যা ফ্যা করে অনেক দিন ঘুরছ। এবার তোমার একটা হিল্লে হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।'

বিশ্বনাথ ভয়ে ভয়ে বলল, 'কাজটা কী গণেশ।'

গণেশ মোটরবাইকের হ্যান্ডেলে কনুই রেখে চোখ টিপল। বাঁ হাতের তর্জনী দিয়ে গলার হার পেঁচাতে পেঁচাতে হেসে বলল, 'প্রক্সি। আমাদের নেতার প্রক্সি দিতে হবে তোমাকে। সেজেগুজে গিয়ে বলতে হবে, বন্ধুগণ আমিই মলিন সরখেল। আপনারা কেমন আছেন? ভাল আছেন তো? বুঝলে?'

'নেতার প্রক্সি!' বিশ্বনাথ চমকে উঠল। সে ঠিক শুনছে তো?

গণেশ চোখ নাচিয়ে বলল, 'কত জনের ভাগ্যে এই চান্স জোটে? আমার তো হিংসে হচ্ছে মাইরি। আমি দাদাকে জিগ্যেস করলাম, কীরকম মিল চাই? দাদা বলল, বেশি চাই না, অল্প হলেই চলবে। ওই গন্ডগ্রামে আমি কোনওদিন যাইনি, আমাকে কেউ চেনেও না। সুতরাং বেশি মিল দিয়ে কী হবে? তুই খুঁজে দেখ। আমি তো এক বুক জলে পড়ে গেলাম। নেতার যমজ কোথায় পাই শালা? হঠাৎ তোমার কথা মনে পড়ল। তোমার নাকের পাশের আঁচিলটা চোখে ভেসে উঠল।'

'না না, আমাকে ছেড়ে দাও গণেশ। আমি এসব পারব না।'

গণেশ বিরক্ত গলায় হিসহিস করে বলল, 'আরে! মামদোবাজি নাকি? পারব না বললেই হবে? এত কষ্ট করে খুঁজে বের করলাম, এখন বলছ পারব না? এলাকায় থাকো, এলাকার লিডারকে সাহায্য করা তো তোমাদের কর্তব্য বিশুদা। ইচ্ছে না থাকলেও করতে হবে। তা ছাড়া ফ্রি-তে তো আর করছ না। যাক, ছাড়ো ওসব। মন দিয়ে শোনো, আমরাই গাড়ির ব্যবস্থা করে দেব। সকাল সকাল বেরোবে। গ্রামের নাম সাহেবপুর। হাইওয়ে থেকে একটু ভেতরের দিকে। যাওয়া-আসাই যা সময়। স্পটে ম্যাক্সিমাম দশ-পনেরো মিনিট। ব্যস। কাজ শেষ। ফিরে এসে পেমেন্ট বুঝে নেবে।'

বিশ্বনাথ আমতা আমতা করে বলল, 'কাজটা কী?'

গণেশ ফস করে একটা সিগারেট ধরাল। এক-মুখ ধোঁয়া ছেড়ে ফিসফিস করে বলল, 'রাস্তায় দাঁড়িয়ে এসব আলোচনা না করাই ভাল। তবু ছোট করে বলে রাখছি। সাহেবপুর গ্রাম এখান থেকে গাড়িতে ঘণ্টা চারেক হবে। বোম্বে রোড জ্যাম থাকলে একটু বেশি। তিন দিন আগে সেখানে বলাই নামে একজন অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। তুমি মলিনদা সেজে সেখানে যাবে। তার ফ্যামিলির কাছে গিয়ে মালাফালা দিয়ে আসবে। ছোট কাজ।'

'মারা গেছে!' রোদের মধ্যে দাঁড়িয়েও বিশ্বনাথের কেমন শীত শীত করে উঠল।

'আস্তে, চিল্লিয়ো না! চুপ করে বাকি কথাটা শুনে রাখো। হারামজাদা বলাইটা মাস তিনেক হল গুরুর কাছে আসা-যাওয়া শুরু করেছিল। লোকটার ড্রাগ আর মেয়েছেলে পাচারের কারবার ছিল। দাদা একদিন বলল, বুঝলি গণেশ, ভাবছি, সাহেবপুরে পলিটিক্যাল বেস করব। একদিন গেলে কেমন হয়? অজ গাঁ। কোনওদিন নেতাটেতা নাকি দেখেনি। তখনই বুঝলাম, ক্যাচাল হচ্ছে। তার দু'দিন পরেই এই কাণ্ড। বোম্বে রোডে বলাইয়ের মোটরবাইকে ট্রাকের ধাক্কা। বলাই ফিনিশ। মনে মনে ভাবলাম, ল্যাঠা চুকে গেল।'

ফিনিশ! বিশ্বনাথ গণেশের মোটরবাইকে একটা হাত রেখে বিড়বিড় করে বলল, 'ভাই গণেশ, আমাকে ছেড়ে দাও ভাই।' নার্ভাস হয়ে পড়ার কারণে পুরো কথাটা বিশ্বনাথের মুখ দিয়ে বের হল না। শুধু শোনা গেল, 'ভাই, ভাই...।'

'না, ল্যাঠা চুকল না। সাহেবপুরে ছড়িয়েছে, এটা নাকি অ্যাক্সিডেন্ট নয়। মার্ডার, খুন। মলিন সরখেল লোক দিয়ে বলাইকে খুন করিয়েছে। গাঁয়ের লোকগুলো কত বড় শুয়োরের বাচ্চা একবার ভেবে দেখো।'

'খুন!' বিশ্বনাথ ঠিক বুঝতে পারছে না কী করবে? ছুটে পালাবে? ছুটে পালালে কি গণেশের হাত থেকে বাঁচা যাবে?

'হ্যাঁ খুন। হারামজাদারা বলছে, বলাইয়ের ব্যাবসায় নাকি দাদা গোপনে টাকা ঢালছিল। তাই নিয়ে গোলমাল। দাদা ট্রাক দিয়ে মেরে দিয়েছে। বোঝো মাইরি, ট্রাক দাদার হতে পারে, কিন্তু সে কি আর ইচ্ছে করে মারবে? আসলে কনস্পিরেসি। দাদা যাতে এবার ইলেকশনে টিকিট না পায় তার জন্য চক্রান্ত।' গণেশ একটু থামল। আর-একটা সিগারেট ধরাল। একটা টান দিয়ে ফেলে দিল। বলল, 'যাক, এখন দাদা বলছে, এরকম একটা ক্রুশিয়াল সময়ে এ ধরনের নোংরা অভিযোগ টিকিয়ে রাখা ঠিক হচ্ছে না। সাহেবপুরে একবার যাওয়া দরকার। নইলে ওখানকার লোকদের সন্দেহ আরও বাড়বে। এরপর বউটা

থানায়-ফানায় কমপ্লেন করে দিলে ঝামেলা আছে। পার্টিতে খবর যাবে। ইলেকশনে দাঁড়ানো চৌপাট হয়ে যাবে। তাই আগে থেকে একটা গার্ড দেওয়া আর কী। বুঝলে বিশুদা?' এই পর্যন্ত গম্ভীর মুখে বললেও গণেশ এবার হাসল। হেসে বলল, 'তবে আমরা কোনও রিস্ক নিতে রাজি নই। ফট করে যদি বিক্ষোভ টিক্ষোভ হয়! সাহেবপুরের এই যাওয়াটা কিন্তু আসল লোকের হবে না। তাই যাবে একজন ফল্স লোক। নেতা মলিন সরখেলের প্রক্সি। সুতরাং রেডি হও বিশুদা।'

মলিনবাবু বিরক্ত মুখে উঠে পড়লেন। অনেক হয়েছে, আর নয়। একটা সামান্য কাজে এত সময় নষ্ট করলে চলবে না। সম্বোধন পালটে বললেন, 'যা বলছি মন দিয়ে শুনে নাও বাপু। একবারই বলব। হাতে সময় নেই। কাল সকালেই তুমি ওই সাহেবপুরে যাচ্ছ। প্রথমে ভেবেছিলাম, সঙ্গে গণেশকে দেব। পরে ভেবে দেখলাম, দরকার নেই। গাঁয়ের লোকগুলো মূর্খ হয়। ভাববে ভয় পেয়েছে। তুমি একাই যাবে। বাড়িতে কাচা পাজামা-পাঞ্জাবি আছে? সাদা? ঠিক আছে, রাতে গণেশ তোমাকে পৌঁছে দেবে। মাপটা বলে যাবে। গাড়িটা একটু দূরে রাখবে। গরিব মানুষগুলো বোকা হয়। শোকের সময় মাথার ঠিক থাকে না। গাড়ি-টাড়ি দেখলে রেগে যেতে পারে। স্পটে খুব বেশি হলে থাকবে দশ মিনিট। পৌঁছেই সোজা ভিক্টিমের বাড়ি। চোখে যেন সানগ্লাস থাকে। সানগ্লাস আছে? ঠিক আছে, গণেশ পৌঁছে দেবে। কথা কম বলবে। একেবারে না বলতে পারলে সবথেকে ভাল। গাড়িতে একটা প্যাকেট থাকবে। প্যাকেটে থাকবে একটা সাদা কাপড়, একটা মালা আর একটা মিষ্টির বাক্স। জিনিসগুলো ভিক্টিমের বউয়ের হাতে দেবে। যদি ওই বলাই লোকটার কোনও ছবিটবি দেখতে পাও, মালাটা ছবিতে দিয়ে দেবে। দিয়ে প্রণাম করবে। না পেলে নয়। আর এই একশো টাকার নোটটা রাখো। বলাইয়ের বউকে দিয়ে বলবে, বাচ্চাদের জন্য দিলাম। বেশি দিতে পারতাম। দেব না। হারামজাদারা ভাবতে পারে টাকা ছড়াচ্ছি।'

মলিনবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। বিশ্বনাথেরও উচিত উঠে দাঁড়ানো। তবু সে চুপ করে বসে আছে। ফুলি, ফুলির ছবি, ফুলির কান্না এরকম হাজারটা আলতুফালতু কথা তার মনে আসছে। এই সময় যে সব কথা মনে আসার কোনও দরকার নেই, সেই সব কথা। শুধু উঠে দাঁড়ানোর কথাটা মনে আসছে না!

মলিনবাবু টেবিলের এ পাশে এলেন। বিশ্বনাথের কাঁধে হাত রাখলেন। বড় ধরনের হুমকি দেওয়ার সময় এটাই নিয়ম। আগে স্নেহ দেখাতে হয়। হাসিমুখে বললেন, 'কী যেন নাম তোমার ভাই? যাঃ ভুলে গেলাম। যাক, যে নামই হোক, নামে কী আসে যায়? কিছু আসে যায় না। কাল যত রাতই হোক, কাজ শেষ করে তুমি আগে আমার কাছে আসছ। একটা মোবাইল ফোন তোমাকে দিতে পারতাম। তা হলে টেনশন থাকত না। দরকার নেই। মোবাইল ফোন জিনিসটা খারাপ কাজে ভাল নয়। ধরা পড়ে গেলে খুব ফাঁসিয়ে দেয়। রিস্ক নেব না। তুমি নিজেই আসবে। রিপোর্ট দেবে। ভাই মনে রেখো, আমি কিন্তু চাই এই কাজটা ঠান্ডাভাবে হয়ে যাক। আগে পরে কেউ টের পাবে না। বউ মেয়ে নিয়ে তোমাকে এখানেই তো থাকতে হবে। কী, থাকতে হবে তো? সেটা মনে রেখো। বাড়ির লোকের কথা ভুলে যাওয়া ঠিক নয়। দেখো কাণ্ড! তোমার নাম ভুলে গেলেও তোমার মেয়ের নামটা কিন্তু মনে

আছে! ফুলেশ্বরী। চমৎকার নাম। একদিন ফুলেশ্বরীকে নিয়ে আমার কাছে আসবে। এই নাও. এক হাজার টাকা রেখে দাও। বাকিটা কাল পাবে। আমি অ্যাডভান্স দিয়ে কাজ করা পছন্দ করি।'

২

এই টেবিল ল্যাম্পটার একটা মজা আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় আলো চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। মলিনবাবু এটা নিজে পছন্দ করে কিনেছেন। রাত দশটার পর ঘরে শুধু এই আলোটা জ্বলে। বাকি সবকিছু কেমন ছায়া ছায়া লাগে। অন্ধকারের ছায়া। এখনও লাগছে। টেবিলের ও পাশে বসে থাকা গণেশকে ছায়ার মতোই মনে হচ্ছে।

মলিনবাবু খড়কে কাঠিটাকে দাঁত দিয়ে চেপে ধরে ফিসফিস করে বললেন, 'তারপর? তারপর কী হল?'

গণেশ এখনও মুখ নামিয়ে আছে। সেই অবস্থাতেই বলল, 'তারপর ওই মহিলাই বিশুদাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করল।'

'কোন মহিলা?' মলিনবাবু ভুরু কুঁচকোলেন।

'ওই যে, বাদলের বিধবা বউটা।'

'কেন মারধরের সময় মেয়েছেলেটা ছিল না?'

গণেশ এবার মুখ তুলল। বলল, 'আমি যতদূর শুনেছি, ছিল না। গাড়ির ড্রাইভার সেরকমই বলেছে। ওরা ততক্ষণে বিশুদাকে মারতে মারতে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। সামনের দিকে কয়েকজনের হাতে বাঁশ ছিল।'

মলিনবাবু সামান্য শিউরে উঠলেন। দাঁতে ধরা কাঠিটা ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, 'বাঁশ ছিল!'

গণেশ কাঁপা গলায় বলল, 'হ্যাঁ, বাঁশ ছিল। ড্রাইভার এত ভয় পেয়ে যায় যে পালাবার কথাও ভুলে যায়। বেশি ভয় পেলে...'

মলিনবাবু নড়েচড়ে বসলেন। গলা খাঁকারি দিলেন। বললেন, 'লোকগুলো মুখে কিছু বলছিল?'

গণেশ চুপ করে রইল।

মলিনবাবু বিরক্ত গলায় বললেন, 'আঃ চুপ করে আছ কেন? কথা বলো। গাধাটাকে মারবার সময় পাবলিক মুখে কিছু বলছিল না? ওরা ঠিক কখন বুঝল লোকটা আসলে আমি নই, জাল, একটা ফ্রড?'

গণেশ ফিসফিস করে বলল, 'বুঝতে পারেনি। মনে হয়, বুঝতে পারলে মারত না। বিশুদাকে বাঁশ দিয়ে পেটাবার সময় পাবলিক বারবার আপনার নাম করছিল দাদা। বলছিল... বলছিল...।'

'কী বলছিল? থামলে কেন? বলো।' হিমশীতল গলায় জিগ্যেস করলেন মলিনবাবু।

অন্ধকারে গণেশের আমতা আমতা গলা শোনা গেল। বলল, 'বলছিল, মার শালা মলিনকে... মার... পিটিয়ে মেরে ফেল হারামজাদাকে। জামাকাপড় খুলে ন্যাংটো করে দে...।'

মলিনবাবু গায়ের আদ্দির ফতুয়াটা টেনেটুনে ঠিক করলেন। একটু হাসলেন। শুকনো হাসি। এরকম যে একটা কিছু হতে পারে সে ভয় ছিল। সেই কারণেই সাহেবপুরে নিজে না গিয়ে বানানো লোক পাঠানোর পরিকল্পনা। তবে এতটা হবে ভাবা যায়নি। বড়জোর গাড়ি ঘেরাও করে বিক্ষোভ টিক্ষোভ, গাড়ি ভাঙচুর। তা বলে একেবারে বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা!

মলিনবাবু সামনে রাখা গেলাসের নীল ঢাকনা সরিয়ে জলে চুমুক দিলেন। জল বিস্বাদ লাগল।

গণেশ চাপা গলায় বলল, 'আমরা এখন কী করব?'

গণেশ কি ভয় পেয়েছে? অন্ধকারের এই একটা সুবিধে। মুখ দেখে ভয়, সাহস কিছুই আলাদা করা যায় না। সব মুখই একরকম লাগে। ছায়া ছায়া।

মলিনবাবু কৌটো খুলে খড়কে কাঠি বের করলেন। মুখে পুরলেন। এখন কী করা উচিত? দু'দিকেই বিপদ। ওই বিশ্বনাথ লোকটা যদি হাসপাতালে টসকে যায়, ঘটনা পুলিশ পর্যন্ত গড়াবে। কেন মরল? কে মারল? কোথায় মারল? খুঁজতে খুঁজতে পুলিশ সাহেবপুর পর্যন্ত ছুটবে। আবার যদি না মরে, তা হলেও বিপদ। বেটা বেঁচে ফিরে সব বলে দিতে পারে। আর যদি ডাইং স্টেটমেন্টের মতো মারাত্মক কিছু দিয়ে বসে?

'এই মুহূর্তে আমাদের কিছু করার নেই গণেশ। অপেক্ষা করতে হবে। হাসপাতালে কে কে আছে? তুমি গিয়েছিলে?'

'পাগল! আমি কখনও ওদিকে যাই! অন্য লোক ফিট করে এসেছি। খবর দিচ্ছে।' হাতের মোবাইলটা তুলে অন্ধকারেই দেখাল গণেশ।

মলিনবাবু চেয়ারটা সামান্য পেছনে ঠেলে বললেন, 'কী খবর পেলে?'

'বিশুদার বউ আর মেয়ে ওখানে আছে। আর...।'

'আর?'

গণেশ আর কে বলার আগে মলিনবাবুর মোবাইলটা বেজে উঠল। বিরক্ত মুখে ফোন কানে তুললেও তিনি কথা বললেন নরম গলায়।

'কে বলছেন? হ্যাঁ, হ্যাঁ বলুন ভাই। আরে না না, বিরক্ত হব কেন? খবরের কাগজের সাংবাদিক ফোন করলে কখনও বিরক্ত হতে পারি! এ তো আমাদের পরম সৌভাগ্য। হা হা। বলুন কী জানতে চান... না, না লোকটাকে আমি চিনি না। কী করে চিনব? আমার এলাকায় তো বিশ্বনাথ নামে কত লোক থাকে, ভেরি কমন নেম। তাই না? কী বললেন। আমি সেজে গিয়েছিল। আমি সেজে মানে মলিন সরখেল হয়ে? ইন্টারেস্টিং তো! বলছেন কী? হা হা। নেতা, মন্ত্রীর সই জাল হয় শুনেছি, এ তো দেখছি চেহারা জাল হয়েছে। বলেন কী ভাই! হা হা। অনেকটা আমার মতো দেখতে। হাইট, গায়ের রং মিলে যাচ্ছে। মজার ব্যাপার দেখছি। হ্যালো, ভাই, আমার একটা উপকার করতে হবে কিন্তু। হাসপাতালের নাম

আর বেড নাম্বার জানাতে হবে। আমি কাল একবার যাব। আসল নেতা যাবে নকল নেতার কাছে... হা হা। ফটোগ্রাফার পাঠাতে পারেন। হা হা। আচ্ছা, গুড নাইট।'

মোবাইল বন্ধ করে মলিনবাবু চিন্তিত গলায় বললেন, 'খবর ছড়াতে শুরু করেছে গণেশ। খবর ছড়াতে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি বলো, হাসপাতালে আর কে আছে? পুলিশ কি পৌঁছেছে?'

'না পুলিশ নয়। দাদা, অবাক কাণ্ড শুনলাম, বাদলের বউটাও হাসপাতালে রয়েছে। মেয়েছেলেটা খুব ছোটাছুটি করছে। ওষুধ, ডাক্তার, রক্ত...।'

মলিনবাবু নড়েচড়ে বসলেন। বললেন, 'বাদলের বউ! তুমি ঠিক বলছ? ভুল হচ্ছে না তো গণেশ?'

'আমার সোর্স তাই বলছে দাদা। ওর ভুল হবে না।'

মলিনবাবু উঠে দাঁড়ালেন। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন চুঁইয়ে পড়া আলোর দিকে। শান্ত গলায় বললেন, 'গণেশ, আমার ধারণা কাল সকালের আগেই পুলিশ চলে আসবে। তোমার ওই গাধাটা যদি হাসপাতালে আজ রাতেই মারা যায়, তা হলে একটা নয়, একসঙ্গে দুটো মার্ডার চার্জে জড়িয়ে পড়ছি আমি। আজ রাতেই এখান থেকে চলে যাওয়া দরকার। এখনই। তুমিও আমার সঙ্গে যাবে। পুরোটা যাবে না। একটা পার্টের পর আলাদা হয়ে যাবে। চট করে বাড়ি থেকে কয়েকটা কাপড় জামা নিয়ে এসো। আসবার সময় একটা ট্যাক্সি নিয়ে আসবে। ওটাতেই আমরা স্টেশন পর্যন্ত চলে যাব। আমি ততক্ষণে রেডি হয়ে নিচ্ছি।' এতটা বলে মলিনবাবু একটু থামলেন। লম্বা একটা শ্বাস টেনে বললেন, 'সেদিন ট্রাকটা কে চালাচ্ছিল মনে আছে গণেশ? হামিদ না? হামিদই তো। তাকে কি সরানো গেছে?'

গণেশও উঠে দাঁড়িয়েছে। কাঁপা গলায় বলল, 'হ্যাঁ, গেছে। হামিদ এখন মুম্বইতে।'

মলিনবাবু হাতের কবজি উলটে ঘড়ি দেখলেন। গলা নামিয়ে বললেন, 'গুড। ওকে ধরতে পুলিশের সময় লাগবে। তুমি দেরি কোরো না। আশা করি আজ রাতের মধ্যে লোকটার কিছু হবে না। তোমার কী মনে হয়?'

গণেশ অস্ফুটে বলল, 'আমার কিছু মনে হয় না।'

৩

গণেশ কি একটু বেশি দেরি করছে? মনে হচ্ছে করছে। তার বাড়ি মোটরবাইকে সাত মিনিট। তা হলে? মোবাইলটাও বন্ধ করে দিয়েছে। মলিনবাবুর একটা হাত মুখের কাছে। তাতে ছোট্ট, পাতলা কাঠি ধরা। কাঠির ডগায় নকশা, শেষে নকশা। নিয়মমতো এইসময় তাঁর একটা চোখ আধবোজা থাকার কথা। কিন্তু এখন মলিনবাবু দুটো চোখই খুলে রেখেছেন। তাকিয়ে আছেন টেবিল ল্যাম্পের দিকে। মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। এত বড় একটা ভুল করে মাথা ঠান্ডা রাখা কঠিন, তবু রাখতে হবে। নেতা তৈরির পরিকল্পনাটাই সব গোলমাল করে দিল। এই ধরনের পরিকল্পনাতে ঝুঁকির দিকটাই যে বেশি, এটা বোঝা উচিত

ছিল। হাসপাতালে একটা ফোন করলে কেমন হয়? লোকটা বেঁচে আছে কি? বেঁচে থাকলে আর একটু সময় পাওয়া যাবে। মজা হল, এ দেশে পুলিশ মরে যাওয়ার আগে নড়াচড়া শুরু করে না।

কলিং বেলের আওয়াজে মলিনবাবু চমকে উঠলেন না। গণেশ এসেছে। তাকে ধমক দেওয়ার জন্য মনে মনে তৈরি হলেন। এক হাতে পায়ের কাছে রাখা সুটকেসটা, আর অন্য হাতে টেবিলের ওপর রাখা তালা-চাবি নিয়ে উঠে পড়লেন। দ্রুত। টেবিল ল্যাম্পটা নিভিয়ে কয়েক-পা এগিয়ে দরজার লক খুললেন।

না, গণেশ নয়।

তবে রাস্তার আধখানা আলোয় দরজার সামনে দাঁড়ানো মানুষটাকে চিনতে অসুবিধে হল না মলিনবাবুর। প্রায় একই রকম লম্বা। কাঁধের কাছটা সেই চওড়া। কপালটা অনেকখানি। সামনের দিকের চুল পেতে আঁচড়ানো, ঠিক যেমনটি তাঁর নিজের। নিশ্চয় নাকের পাশে আঁচিলটাও আছে।

মানুষটার এক দিকের চোখ আধখানা বোজা। হাসল? মনে হয় হাসল। তারপর খসখসে আর জড়ানো গলায় বলল, 'স্যার, চিনতে পারছেন? পারছেন না তো? আমার মেয়ের নাম স্যার ফুলি, ভাল নাম ফুলেশ্বরী...।'

মলিনবাবু চোখ তুললেন। লোকটার ডান হাতটা মুখের কাছে। সেই হাতে খড়কে কাঠিটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু কশ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ওটা কী? রক্ত নাকি?

হ্যাঁ, রক্তই তো!

পুলিশ এল শেষ রাতে। হাসপাতাল থেকে বিশ্বনাথের মৃত্যুকালীন জবানবন্দি নিয়ে। মলিন সরখেল তখন তাঁর বাড়ির সদর দরজার সামনে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে আছেন।

শারদীয়া আনন্দবাজার, ১৪১৩

তালিকা

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে দোলা রিকশওলার সঙ্গে ঝগড়া করছে। গলা ফাটানো ঝগড়া নয়, শান্ত ভঙ্গিতে নিচুগলার ঝগড়া। সাত বছরের কিটি মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে হাসি হাসি মুখে সেই ঝগড়া শুনছে। তার চোখ মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে, মায়ের ঝগড়া শুনতে তার ভাল লাগছে।

দোলা রিকশওলাকে বলল, 'ভাই, তুমি এরকম কোরো না।'

বুড়ো রিকশওলা অবাক হয়। বলে, 'ওমা! আমি কী করেছি! করছেন তো আপনি। টাকার নোট নিয়ে প্যাঁচাল করছেন।'

দোলা বলল, 'দেখো, আজ আমার মন খুব খারাপ। আমার বাবার অসুখ। সহজ অসুখ নয়, কঠিন অসুখ। অসুস্থ বাবাকে আমি দেখতে এসেছি। টাকার নোট ছেঁড়া না ময়লা এরকম একটা সামান্য বিষয় নিয়ে ঝগড়া করবার মতো মনের অবস্থা আমার নয়।'

রিকশওলা কাঁধের গামছা তুলে কপালের ঘাম মোছে। অবাক গলায় বলে, 'তা হলে খামকা ঝগড়া করেন কেন? ঝগড়া করার জন্য আমি কি আপনার পায়ে পড়েছি?'

দোলা নিচু গলায় বলল, 'তুমি এরকমভাবে কথা বলছ কেন ভাই?'

রিকশওলা আরও বিরক্ত হয়। ঠোঁট উলটে বলে, 'তা হলে কীরকমভাবে বলব?'

'কোনওভাবেই বলবে না। শুধু ময়লা নোটটা বদলে দেবে।'

রিকশওলা বিরক্ত মুখে কোমরের কাছে লুঙ্গির গিঁট খোলে। হাতের মুঠিতে খানকতক নোট বের করে দোলার সামনে মেলে ধরে। হতাশ ভঙ্গিতে বলে, 'নেন, যেটা আপনার পছন্দ তুলে নেন।'

দোলা মুখ বাড়িয়ে দেখে সব নোটই মলিন। একটাও তুলে নেওয়ার মতো নয়। সে মেয়ের হাত ধরে গেট খুলে বাড়িতে ঢুকে পড়ে। এটা দোলার স্বভাব। যখনই সে বাপের বাড়িতে আসে রিকশওলার সঙ্গে ঝগড়া করবে। স্টেশন থেকে রিকশতে উঠেই ঝগড়া শুরু করে দেয়। ঝগড়ার বিষয় এক-এক দিন এক-এক রকম। কোনওদিন নড়বড়ে সিট, কোনওদিন বেশি ঝাঁকুনি, কোনওদিন হাতলে পেরেক। সবই খুব হালকা পলকা বিষয়। চাপা গলার কারণে ঝগড়ার ফলাফল চট করে বোঝা যায় না, তবে ঘটনা হল প্রতিবারই সে ঝগড়ায় পরাজিত হয়। দোলার অবশ্য এতে কিছু আসে যায় না। পরেরবার যখন আসে একইভাবে আবার ঝগড়া করে।

আজ ঝগড়ার সময় দোলার গলা ছিল সামান্য উঁচুর দিকে। বারান্দা থেকে পার্থ দিদির ঝগড়া শুনতে পেয়েছে। পার্থর মুখে বিরক্তি, হাতে সিনেমার পত্রিকা। পত্রিকা এক বছরের

বাসি। বাইশ বছরের এক বেকার যুবক সাতসকালে ঘুম থেকে উঠে বাসি সিনেমা পত্রিকা পড়ছে, এটা একটা অবাক হওয়ার মতো ঘটনা। পার্থর কোনও উপায় নেই। এই কাজ তাকে নিয়মিত করতে হয়। পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে সিনেমার নায়ক নায়িকাদের সম্পর্কে গুজব বের করতে হয়। গসিপ। সেই তালিকায় প্রণয়, বিবাহ, চুম্বন যেমন থাকে তেমন দিনদুপুরে সহকারী পরিচালককে উপ-নায়িকার চড় মারা, মধ্যরাতে খলনায়ককে কোরাস গায়িকার গান শোনানো ধরনের ঘটনাও থাকে। পার্থ জানে এই কাজ খুবই নিচু মানের। কিন্তু সে কী করবে? তার সুন্দরী, বোকা, প্রেমিকা আত্রেয়ী একজন গুজব সংগ্রাহক। শুধু সংগ্রাহক নয়, আত্রেয়ী সব ধরনের গুজব বিশ্বাসও করে। এই মেয়েকে নিয়মিত গুজব সাপ্লাই না করতে পারলে বিচ্ছিরি কাণ্ড হয়। মেয়ে ল্যান্ড ফোন, মোবাইল ফোন কিছুই ধরে না। এমনকী বাড়িতে গেলে দেখা পর্যন্ত করে না। কাজের মেয়ে এসে গম্ভীর মুখে অপমান করে। বলে, 'দিদিমণির মাথা ধরেছে। আপনি এখন যান।'

দিদির গলা শুনে মুখ তুলল পার্থ। গ্রিলের ফাঁক থেকে দোলাকে দেখা যাচ্ছে। তার পায়ের কাছে সুটকেস। বাপের বাড়িতে এলেই দোলা সুটকেস আনবে। একবেলার জন্য এলেও আনবে, একমাসের জন্য এলেও আনবে। এটা তার মায়ের পরামর্শ। মা বেঁচে থাকতে মেয়েকে এই পরামর্শ দিয়ে গেছেন।

'বাপের বাড়িতে যখনই আসবি সবসময় রেডি হয়ে আসবি। সঙ্গে ব্যাগ, সুটকেস আনবি। কখন হুট বলতে থেকে যেতে ইচ্ছে করে তার কোনও ঠিক আছে? কোনও ঠিক নেই। একটা কথা মনে রাখবি দোলা, বাপের বাড়ি হোটেল বা হলিডে হোম নয় যে আগে থেকে বলে কয়ে ঘর বুক করে আসতে হবে। তা ছাড়া সুটকেস আনার পেছনে আরও একটা ব্যাপার আছে। সেটাই আসল।'

দোলা অবাক হয়ে জানতে চায়, 'কী ব্যাপার মা?'

মা আনাজ কুটতে কুটতে এদিক ওদিক তাকান। তারপর গলা নামিয়ে বলেন, 'বাড়ির বউ ব্যাগ, সুটকেস নিয়ে বেরোলে শ্বশুরবাড়ি চাপের মধ্যে থাকে। আমার যখন নতুন নতুন বিয়ে হয়েছিল, আমিও তোর বাবার ওখানে এই চাপ দিয়েছি।' কথা শেষ করে মা সামান্য হাসলেন।

'চাপ! কী চাপ মা?'

'সে তুই এখন বুঝবি না। দু'দিন পরে বুঝবি। একে বলে সুটকেস চাপ।'

'সুটকেস চাপ!'

মা বঁটি থেকে চোখ তুলে বলেন, 'হ্যাঁ সুটকেস চাপ। এই চাপের আলাদা ব্যাপার আছে। হাতে সুটকেস দেখলে মনে হয়, বাক্স প্যাঁটরা বেঁধে বউ বাড়ি ছেড়ে চলল। এতে শ্বশুরবাড়িতে খাতির যত্ন বাড়ে। তবে রোজ রোজ ভারী জিনিস বয়ে আনবি না। হালকা দেখে একটা খালি সুটকেস আনবি। তোর শাশুড়ি চাপের মধ্যে থাকবে, সুটকেস যে খালি এই কথা তার মাথায় আসবে না।'

মা মারা গেছেন আড়াই বছর। দোলা সুটকেস আনা বন্ধ করেনি। কেউ বারণ করলে বলে, 'তোমাদের কোনও অসুবিধে আছে? সুটকেস তোমরা বইছ না আমি বইছি?'

কিন্তু আজ শুধু দোলার হাতে সুটকেস নয়, কিটির কাঁধে স্কুলের ব্যাগও রয়েছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, সেই ব্যাগ তার মায়ের সুটকেসের মতো মিথ্যা নয়। বই খাতায় বোঝাই। পার্থ সতর্ক হল। একটা বিপজ্জনক ইঙ্গিত। এর মানে হল, দিদি তার মেয়েকে নিয়ে সত্যি সত্যি এখানে থাকার জন্য এসেছে। আর দিদি থাকা মানেই বাড়িতে নানা ধরনের ঝামেলা শুরু হওয়া। সকলের সঙ্গে খিটিমিটি, কাজের লোকদের ওপর মাতব্বরি, কিটিকে মারধর, ভাড়াটের জল খরচ নিয়ে চেঁচামেচি এবং সর্বোপরি ভাইয়ের প্রতিটি কাজে নাক গলানো। কিছুক্ষণের মধ্যেই বাড়ির সিস্টেমে একটা বড় রকমের গোলযোগ তৈরি করে ফেলে। কী হবে এখন? চিন্তিত মুখে পার্থ পত্রিকার পাতা ওলটাতে লাগল।

গ্রিলের গেট খুলে বারান্দায় উঠতেই কিটি মায়ের হাত ছাড়িয়ে ভেতরে দৌড় দিল। দোলা মাটিতে সুটকেস রেখে শাড়ির আঁচল দিয়ে কপালের ঘাম মোছে। পার্থর দিকে ফিরে বলে, 'বাবা কোথায়?'

পার্থ মুখ না তুলে জবাব দেয়, 'ভেতরে।'

'ভেতরে কী করছে?'

পার্থ উত্তর দিল না। দোলা বলল, 'কী রে বললি না বাবা কী করছে?' দোলার গলায় অসন্তোষ।

পার্থ গলায় ঝাঁঝ এনে বলল, 'কী আর করবে? কাগজটাগজ পড়ছে। ব্রেকফাস্টও করতে পারে। সকালবেলায় বুড়োমানুষ যা করে তাই করছে। বাবা তো আর ডন বৈঠক মারবে না।'

পার্থর গলার ঝাঁঝ বুঝতে পেরেও দোলা যেন বুঝতে চাইল না। আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'বউদি যা বলল সত্যি?'

এবার পার্থ চোখ তুলে দোলার দিকে তাকাল। ভুরু কুঁচকে বলল, 'আমি কী করে জানব বউদি তোকে কী বলেছে?'

'কাল রাতে বউদি ফোনে আমায় কী বলেছে তুই জানিস না?'

পার্থ মুখ নামাল। ও, গোলমালটা তা হলে বউদি পাকিয়েছে। দিদির এখানে ছুটে আসার জন্য সে-ই দায়ী। এদিকে বউদি নিজে কিন্তু কেটে পড়েছে। দাদা আর মিঠুকে নিয়ে আজ ভোরেই কলকাতায় গেছে। মাসতুতো না পিসতুতো বোনের বিয়ে। দু'দিন এমুখো হবে না। যাওয়ার আগে গোলমাল যা পাকানোর পাকিয়ে দিয়ে গেল। দিদিকে সব বলে দিয়েছে। শুধু কি আর বলেছে? নিশ্চয় কয়েক গুণ বাড়িয়েই বলেছে। যে-কোনও ঘটনা নিয়ে টেনশন ছড়াতে ওই মহিলার জুড়ি নেই। ব্যস, দিদিও বাক্স প্যাঁটরা গুছিয়ে ছুটে এসেছে। এখন গোটাটা তাকে একা সামলাতে হবে। সামলানোর দুশ্চিন্তায় পার্থর কপালে অল্প অল্প ঘাম জমতে শুরু করল।

অথচ সেদিন অন্যরকম কথা হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল, বাবার এই পাগলামির গল্প কাউকে বলা হবে না। একাশি বছরের বুড়োমানুষ কী আবোল তাবোল বললেন, কী আবোল তাবোল করলেন সেটা বাইরে বলে বেড়ানোর কিছু নেই। এই ঘটনা তো একেবারেই নয়। কেননা এই ঘটনা যে শুনবে সেই হাসবে। হাসবারই কথা। বউদি কথা রাখল না। দিদি অবশ্য হাসছে না। তার হয়েছে উলটো রি-অ্যাকশন। চোখ মুখ থমথম করছে। বোকা

মানুষদের অনেকসময় এরকম হয়। যা হওয়া উচিত তার উলটো হয়। পার্থর রাগ বাড়ছে। সে বলল, 'বউদি তোকে কী বলেছে আমি কী করে জানব? আমি তো আর বউদির টেলিফোনে আড়ি পাতি না।'

'এরকমভাবে বলছিস কেন? এর মধ্যে আড়ি পাতার কী হল?'

পার্থ নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, 'কিছু হয়নি। বউদি যদি বলে থাকে তা হলে আর আমার কাছে জানতে চাইছিস কেন? একটা জিনিস বারবার জানার কী আছে?'

দোলা বারান্দার কোণে রাখা মোড়া টেনে ভাইয়ের সামনে বসে পড়েছে।

'নিজের বাবার অসুস্থতার কথা বারবার জানতে চাওয়াটা অপরাধ নাকি?'

পার্থর দুটো ভুরুই কুঁচকে আছে। পত্রিকায় সংগ্রহ করার মতো ছোট বড় কোনও গুজবই নজরে পড়ছে না। এটাও একটা ভয়ের ব্যাপার। দশ দিন হতে চলল আত্রেয়ীকে কিছুই সাপ্লাই করা যায়নি। এবার যে-কোনওদিন মেয়েটা অ্যাকশন নিয়ে বসবে। পরিকল্পনা ছিল, আজ সারা দুপুর ছাদের ঘরে উঠে পুরনো পত্রপত্রিকা ঘাঁটা হবে। নিশ্চয় কিছু পাওয়া যেত। তারপর নাম বদলে আত্রেয়ীকে বললেই চলবে। গুজব তো একই থাকে, শুধু নায়ক নায়িকার নাম পালটায়। কিন্তু দিদি চলে আসায় পরিকল্পনা মনে হয় বাতিল করতে হবে।

পার্থ রাগ-রাগ গলায় বলল, 'রেগে যাচ্ছি কোথায়? বাবা অসুস্থ এটা তোকে কে বলল?'

দোলা চোখ কপালে তুলে বলল, 'ওমা! অসুস্থ নয়! কাল ঘটনা শোনার পর সারারাত ঘুমোতে পারিনি। একটা মানুষ ওরকম করছে আর তুই বলছিস অসুস্থ নয়?'

ঘটনা সত্যি। কাল সুপর্ণার টেলিফোনের পর দোলা রাতে ঘুমোতে পারেনি। আজ সকালে কোনওরকমে মুখ-হাত ধুয়ে ছুটে চলে এসেছে। শ্বশুরবাড়িতে বলে এসেছে, কবে ফিরবে ঠিক নেই।

কাল সন্ধেবেলা সুপর্ণা দোলাকে ঘটনা বলেছে। ঘটনার বেশিটাই বুঝতে পারেনি দোলা। এ আবার কী কথা? এরকম আবার হয় নাকি? টেলিফোনে শুনতে শুনতেই গা ছমছম করে উঠেছে তার। সুপর্ণাকে বলেছে, 'তুমি কী বলছ বউদি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সুপর্ণা রিসিভারে মুখ ঠেকিয়ে ফিসফিস করে, 'অত দূরে বসে তুমি কী বুঝবে দোলা? আমি তো এখানে থেকেও কিছু বুঝতে পারছি না। আমার ভীষণ ভয় করছে। বুক ধড়ফড় করছে। মনে হচ্ছে মানুষটাকে ভূতে পেয়েছে। ভূতে পেলে এরকম হয়। মানুষ উলটোপালটা কাজ করে। তোমার দাদাকে বলতে গিয়ে ধমক খেলাম।'

নিজের বাবাকে 'ভূতে পেয়েছে' কথাটা শুনতে দোলার ভাল লাগল না। তবে এখন ভাল-মন্দ লাগার ব্যাপার নেই। এখন বিপদের সময়। সে কাঁপা গলায় বলল, 'ওই জিনিস তুমি নিজের চোখে দেখেছ?'

'না, আমি দেখিনি, পরশুদিন তোমার দাদা দেখেছে। তোমার বাবাই দেখিয়েছেন। বিকেলবেলা আমাকে ডেকে বলল, বউমা, তীর্থ কখন অফিস থেকে ফিরবে? আমি বললাম, ফোন করেছিল। আজ একটু দেরি হবে, মিটিং আছে। সাতটা দশের গাড়িতে ফিরবে। তখন তোমার বাবা বললেন, সাতটা দশের ট্রেনটা ভাল না, লেট করে। যাই হোক তীর্থ এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়ো। আমি জেগে থাকব। দরকার আছে।'

দোলার শ্বশুরবাড়িতে টেলিফোনে কথা বলতে হয় দাঁড়িয়ে। শ্বশুরমশাই নিজে এই ব্যবস্থা করেছেন। টেলিফোনের কাছ থেকে চেয়ার, টুল, মোড়া, সোফা সব সরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য হল, টেলিফোন পার্কের লেক নয় যে তার পাশে বেঞ্চ পেতে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করতে হবে। টেলিফোন একটা জরুরি জিনিস। দাঁড়িয়ে কাজের কথাটুকু বলে ছেড়ে দিলেই চলবে। দোলার অবশ্য কোনও অসুবিধে হয়নি। প্র্যাকটিস হয়ে গেছে। টেলিফোনের রিসিভার কানে নিয়ে ঘণ্টাখানেক দাঁড়ানো তার কাছে আজকাল জলভাত। কাল রাতেও সুপর্ণার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল সে। তবে পা-টা একটু যেন কাঁপছিল। সেটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। নিজের বাবার এই ঘটনা শুনলে যে-কোনও মেয়েরই পা কাঁপবে।

'তারপর কী হল বউদি?'

'কী আবার হবে? রাতে তোমার দাদা এসে বাবার ঘরে গেল। তখন উনি দেখালেন।'

'কী দেখালেন?'

'ওমা, শুরুতেই তো বললাম। নিজের হাতে লেখা একটা তালিকা দেখালেন, লিস্ট। পার্থও ঘরে ছিল। সেও দেখেছে। আমিও ছিলাম। তবে ঘরে ছিলাম না, ঘরের বাইরে পরদার আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলাম। পরের বাড়ির মেয়ে তো, তাই উনি ডাকেননি।' সুপর্ণার গলায় অভিমান।

দোলা অভিমানে পাত্তা না দিয়ে বলল, 'পরদার আড়াল থেকে কী দেখলে?'

'অত দূর থেকে কিছু দেখা যায় নাকি? শুধু দেখলাম তোমার বাবা একটা খাতার পাতা ওলটাচ্ছেন। হলুদ মলাটের বেঁটে খাতা, লাইন টানা। আর তাঁর দুই ছেলে ঝুঁকে পড়ে সেই খাতা দেখছে। পরে তোমার দাদা বলল, মোট আড়াই পাতার তালিকা হয়েছে। তাতে নাম লেখা আছে।'

'নাম লেখা!'

সুপর্ণা থমথমে গলায় বলল, 'হ্যাঁ নাম, সব মরা মানুষের নাম। তোমার বাবার আত্মীয়স্বজন, ছোটবেলার বন্ধু, অফিসের লোক, পাড়ার মানুষ। অনেক নাম। যেখানে যত মরেছে। নামের পাশে ছোট ছোট করে লেখা কার জন্য কী নিয়ে যাবেন।'

একটু আগে দোলার পা কাঁপছিল। এবার হাতও কাঁপতে থাকে। শক্ত হাতে রিসিভার চেপে ধরে বলে, 'মানে! নিয়ে যাবে মানে?'

'মানে আমি জানি না। তোমার দাদাকে জিজ্ঞেস করলাম। সে গম্ভীর হয়ে বলল, পাগলামি। বাবার মাথাটা পুরো গেছে। উনি নাকি বুঝতে পেরেছেন আর বেশিদিন নয়, এবার মারা যাবেন। আর তার পরই চেনাজানা সব মরা মানুষের সঙ্গে দেখা হবে। সেই কারণেই লিস্ট বানাচ্ছেন! কার জন্য কী নিয়ে যাবেন, কে কী ফেলে গেছে সেই লিস্ট। তুমি শুনলে বিশ্বাস করবে না দোলা, তোমার বাবা ছেলেদের নাকি বলেছেন, কাউকে যদি চিঠিটিঠি লিখতে চাস অসুবিধে নেই। আমাকে দিয়ে রাখিস। হাতে হাতে পৌঁছে দেব। বউমাকেও বলব। ওর যদি কাউকে কিছু দেওয়া টেওয়ার থাকে। তোমার কথাও বলেছে।' এতটা বলে সুপর্ণা থামল।

দোলা চমকে উঠল। বলল, 'আমার কথা! আমার কথা কী বলল বাবা?'

সুপর্ণা ফিসফিস করে বলল, 'বলেছে, দোলাকেও খবর দিতে হবে। ওরও তো কেউ থাকতে পারে। তোমাকে ডেকে পাঠাবে বলেছে। দোলা, আমার ভয় করছে। কী হবে? আমি আবার দুটো দিন থাকব না। তুমি কালই চলে এসো।'

দোলা চলে এসেছে। শুধু বউদি চলে আসতে বলেছে বলে নয়, নিজে থেকেই সে আসত। যে মেয়ের বাবা মরা মানুষদের জন্য জিনিসের লিস্ট বানাতে বসে সেই মেয়ে না এসে পারে না।

পার্থ পত্রিকা হাতে উঠে দাঁড়াল। সে মনকে শক্ত করেছে। বিপদের সময় মেজাজ হারালে চলে না। বিপদ সামলাতে হয় ঠান্ডা মাথায়। এই মুহূর্তে দিদি একটা বিপদ। তাকে বাড়ি পাঠাতে হবে ঠান্ডা মাথায় বুঝিয়ে শুনিয়ে। নইলে সব কাজ পণ্ড। শুধু বাড়িতে ঝামেলা নয়, এই মেয়ে 'বাবা মারা যাচ্ছে,' বলে আত্মীয়স্বজনদের খবর পর্যন্ত দিতে পারে। তখন একটা বিরাট কেলেঙ্কারি হবে। থামাতে হবে, যে করেই হোক একে থামাতে হবে। পার্থ অনেক কষ্টে মুখে হাসি ফোটাল। দোলার দিকে তাকিয়ে বলল, 'বাবার পাগলামির গল্প তুই পুরোটা শুনিসনি দিদি। হাফ শুনেই টেনশন করছিস। ফুল শুনলে হাসতে হাসতে মোড়া থেকে পড়েই যাবি। বাবার কিচ্ছু হয়নি। মরা টরা তো দূরের কথা, মানুষটা অসুস্থই নয়। দিব্যি খাচ্ছে দাচ্ছে, হাঁটছে চলছে। প্রেশার, সুগার, হার্ট সব নর্মাল। এই তো শনিবার চেকআপ হল। পরশু বিকেলে কী করেছে জানিস? কাজের মেয়েটাকে দিয়ে স্টেশন মোড় থেকে তিন টাকার আলুকাবলি আনিয়ে চুপিচুপি খেয়েছে। তেঁতুল জল, লঙ্কার গুঁড়ো ছড়ানো মারাত্মক জিনিস। আমি এক টাকা দিয়ে কাজের মেয়ের মুখ সিল করলাম। খবর লিক না হয়। আহা, বুড়োমানুষ একটা শখ করেছে। দাদা-বউদি শুনলে বকাবকি করবে। যে মানুষ এইট্টি ওয়ানে রাস্তার আলুকাবলি চমৎকার হজম করে ফেলল সে এখন মরবে কী রে? নো চান্স। বউদি তোকে ভয় দেখিয়ে দিল আর তুই ভয় পেয়ে গেলি?'

দোলা উঠে দাঁড়াল। ভাইয়ের কথা পুরো বিশ্বাস হচ্ছে না, আবার একেবারে উড়িয়েই বা দেয় কী করে? মানুষটা এতটা যখন সুস্থ, মৃত্যুর প্রশ্ন উঠবে কেন? সে অস্ফুটে বলল, 'আর তালিকা? ওই যে বাবা লিস্ট না কী বানাচ্ছে। সেটা কী?'

পার্থ বুঝতে পারল দিদিকে খানিকটা নরম করা গেছে। এবার বাকিটুকু করতে হবে। ব্যাপার কিছুই নয়, সুতরাং এখানে থেকে সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না— এটা বুঝিয়ে সুটকেস এবং মেয়েসহ কলকাতার ট্রেনে তুলে দিতে হবে দ্রুত। সে দিদির দিকে এক পা এগিয়ে এসে বলল, 'ভীমরতি। বুড়োবয়সের ভীমরতি বুঝিস? বাবা যখন খাতা খুলে লিস্ট দেখাচ্ছিল, তখনই আমি আর দাদা মুখ চাওয়াচায়ি করছিলাম। হাসিও পাচ্ছিল। ভীমরতি না হলে কেউ মরা মানুষের জন্য জিনিস গোছানোর কথা ভাবে? তাও আবার অমন সিরিয়াস মুখ করে! বাপ রে।' পার্থ আওয়াজ করে হাসল। ইচ্ছে করেই আওয়াজ করে হাসল। অনেক সময় যুক্তির থেকে আওয়াজের হাসি বেশি কাজ দেয়।

'বাবার ওই লিস্ট দেখলে তুইও হাসতে হাসতে মরবি দিদি। ছেলেবেলায় তার টগর না পলাশ নামে এক বন্ধু ছিল। গাঁয়ের বন্ধু। পুকুরে ডুবে মরেছিল। সেভেন্টি ইয়ার্স আগের ঘটনা। বাবা তার জন্য ডাংগুলি নিয়ে যাওয়ার প্ল্যান করছে। আমাকে বলল, ডাংগুলি

কোথায় পাওয়া যায় খোঁজ করে বলিস তো। দেরি করবি না, হাতে টাইম নেই। দিদি, তুই ভাব একবার কাণ্ডটা। যতীনকাকুকে মনে আছে? আরে ওই যে বাবার কলিগ ছিলেন, রোগা করে। সরু গোঁফ। অফিসে বাবার উলটোদিকের টেবিলে বসতেন। হুট করে একদিন অফিসের মধ্যেই হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। বাবা সারারাত বারান্দায় বসে রইল জেগে। মনে পড়েছে এবার? খাতায় দেখলাম সেই যতীনকাকুর নামের পাশে বাবা লিখেছে— নস্যির ডিবে। দাদুর জন্য ছড়ি, বড়পিসির জন্য লবঙ্গ, মল্লিককাকুর জন্য নাক্সভোমিকা থার্টি। বাবার এক কাকিমার জন্য বাতের তেল। এসব নাকি ওরা ফেলে গেছে! হি হি। আর কত বলব? ভূগোল স্যারের জন্য কলমের কথা বলেছি? স্কুল জীবনের ভূগোল স্যার। তার নামও বাবার লিস্টে আছে। অঞ্জলিদি নামে কোন মহিলার নামের পাশে লেখা রয়েছে দেখলাম, শাড়ি। ব্রাকেটে লেখা লাল পাড়, গরদ। দাদাকে বলল, এই মহিলা নাকি মায়ের পক্সের সময় দারুণ সেবাযত্ন করেছিল। তোকে এত ডিটেলসে বলছি কেন জানিস দিদি? বলছি, এই কারণে যে শুনলে পাগলামিটা ধরতে পারবি। চিন্তা কমবে। গঙ্গা নামে একজনের জন্য গোলাপ গাছের চারাও নেবে বলে ঠিক করেছে বাবা। ছোট চিনা গোলাপ। তিন পাতার লিস্ট তো কম নয়। এইট্টি ওয়ান ইয়ার্সে এতগুলো মরা মানুষের নাম মনে করে লেখা কি সহজ ব্যাপার?' পার্থ দম নিতে থামল। দোলার চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে, পাগলামির কথাটা অনেকটাই বিশ্বাস করিয়ে আনা গেছে। পার্থ নতুন উদ্যমে আবার শুরু করল।

'মনে হয়, বেশ কিছুদিন ধরেই বাবার এই রোগটা ডেভেলপ করেছে। শুধু কি নাম, দেখলাম অনেক ঘটনাও মনে আছে রে! হ্যাঁরে দিদি, মামাবাড়িতে ভবানী নামে কোনও ড্রাইভার ছিল? মনে পড়েছে তোর? বাবা বলল, সেই ভবানী ড্রাইভার নাকি বাবার কাছে জুতো চেয়েছিল। ক্যাম্বিসের জুতো। পরে লোকটা মরল অ্যাক্সিডেন্টে। বাবার জুতো দেওয়া হল না। বাবা এখন ঠিক করেছে, একজোড়া ক্যাম্বিসের জুতো বাক্সে করে নিয়ে স্বর্গে যাবে। ভীমরতির বিরল দৃষ্টান্ত। গবেষণা করার মতো।'

এবার দোলাও হেসে ফেলল। পার্থ বলল, 'অতএব নো টেনশন। বাবা তোকে কিছু বলতে গেলে হয় হেসে উড়িয়ে দিবি, নয় ধমক দিবি। ভীমরতির রোগীকে ধমক দেওয়া কোনও দোষের নয়। তারপর দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে বরং একটা সিনেমা দেখে আয়। মাথা ঠান্ডা হবে। বলিস তো টিকিট কেটে দিই। বিকেলে নিশ্চিন্তে বাড়ি চলে যাবি। মিছিমিছি কিটির স্কুল কামাই করার কোনও দরকার নেই। আন্ডারস্ট্যান্ড মাই বিলাভেড সিস্টার?'

দোলা আবার হাসল। সে এখন পুরোপুরি চিন্তামুক্ত। না, বউদি বেশি টেনশন করেছে। পার্থর কাছে ঘটনা সবটা শুনে বোঝা যাচ্ছে, গোলমাল শরীরে নয়, মাথায়। এই বয়সে একটু আধটু পাগলামি অস্বাভাবিক কিছু নয়। দোলা ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সিনেমায় কাজ নেই, দুটো চল্লিশের গাড়ি ধরে কলকাতা ফিরে যাব বরং। কিটির আবার গাদাখানেক হোমটাস্ক আছে। ছাড় ওসব, হ্যাঁরে, তোর নিজের কাজকম্মের কিছু হল?'

পার্থ হাঁপ ছাড়ল। অপারেশন সাকসেসফুল। এবার ছাদের ঘরে ওঠার প্রস্তুতি নিতে হবে। একটা হাতপাখা চাই। ছাদের ঘর মানেই বেজায় গরম। মাথায় অ্যাসবেসটস। ঘেমে

নেয়ে একসা হতে হবে। এত পরিশ্রমের পরও যদি গুজব না পাওয়া যায় তা হলে কিছু করার নেই। বানাতে হবে। দোলার দিকে তাকিয়ে পার্থ বলল, 'না, কাজকম্ম এখনও কিছু হয়নি। তবে ভাবছি খুব শিগগিরই একটা মিউজিয়ম খুলব। সংগ্রহশালা। দেখ না জামাইবাবুকে বলে কিছু টাকাপয়সা ম্যানেজ করতে পারিস কিনা।'

ভেতরে যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েও দোলা থমকে দাঁড়াল। চোখ সরু করে বলল, 'মিউজিয়ম! কীসের মিউজিয়ম?'

পার্থ মুচকি হেসে বলল, 'গুজবের। গুজবের সংগ্রহশালা। খারাপ হবে?'

অক্ষয়বাবু নিজের ঘরে বসে আছেন ইজিচেয়ারে। ঘরের জানলাগুলো খোলা। সকালের টাটকা হাওয়া এবং রোদ দুই-ই ঢুকছে। সাদা ফতুয়া পায়জামা পরা বৃদ্ধ মানুষটার সাদা চুল উড়ছে। হাতে মাঝারি মাপের একটা কাচের বাটি। তাতে দুধ মুড়ি। বুড়বুড়, বুড়বুড় করে আওয়াজ হচ্ছে। দুধে মুড়ি ভেজার আওয়াজ শুনতে বেশ লাগে অক্ষয়বাবুর। তিনি বড় একটা চামচ দিয়ে আরাম করে দুধ মুড়ি খাচ্ছেন আর আওয়াজ শুনছেন। মেয়েকে দেখে অক্ষয়বাবু খুশি হলেন।

'আয়, চেয়ারটা নিয়ে বোস। কাছে এসে বোস। কেমন আছিস?'

দোলা বসল না। পাশে দাঁড়িয়ে বাবার কাঁধে হাত রেখে চুপ করে রইল। বাবার খাওয়া দেখতে লাগল। পার্থ ঠিকই বলেছে, মানুষটার মুখে অসুখের কোনও ছাপ নেই। বরং বেশ সুন্দর লাগছে। একটা ফ্রেশ ভাব। রাতে ভাল ঘুম হলে এমন হয়। বউদি মিছিমিছি ভয় দেখাল। পরের বাড়ির মানুষের এই হল সমস্যা। মুখ দেখে ভাল মন্দ বুঝতে পারে না।

'তুমি কেমন আছ বাবা?'

'খুবই ভাল। তোর সঙ্গে দরকার আছে। এসে ভালই করেছিস। নইলে আজই তোকে খবর পাঠাতাম।'

দোলা সতর্ক হল। সে বাবার ঘরে ঢোকার আগেই ঠিক করে নিয়েছে ভাইয়ের পরামর্শ মতোই চলবে। বাবার কোনও ধরনের পাগলামি প্রশ্রয় দেবে না। বলল, 'বাবা, শুনলাম তুমি নাকি কী সব কাণ্ড করেছ? কথাটা সত্যি?'

খাওয়া শেষ। কাচের বাটি সাবধানে মাটিতে নামিয়ে রাখলেন অক্ষয়বাবু। মেয়ের দিকে না তাকিয়ে বললেন, 'কাণ্ড! আমি আবার কী কাণ্ড করলাম রে বাবা!'

পাশের টেবিলে রাখা জলের গেলাসটা দোলা এগিয়ে দিল। বলল, 'নাও, খাও। কী কাণ্ড তুমি জানো না? কী সব ছাই ভস্ম লিস্ট বানাচ্ছ নাকি। তালিকা।'

অক্ষয়বাবু ঠোঁটের ফাঁকে হাসলেন। বললেন, 'ওমা ছাই ভস্ম হবে কেন? এই কারণে তোকেও তো খবর দেব ভেবেছিলাম। তোর যদি কেউ...'

দোলা চাপা গলায় ধমক দিল, 'চুপ করো। চুপ করো। একদম। ছি, বাড়িসুদ্ধু মানুষকে ভয় পাইয়ে দিয়েছ। এ আবার কী? দিব্যি সুস্থ শরীরে আছ। প্রেশার, সুগার, হার্ট সব নর্মাল। খাচ্ছ, দাচ্ছ, বেড়াচ্ছ। তুমি এখন মরবে কেন?'

অক্ষয়বাবু মেয়ের হাত থেকে গেলাস নিয়ে দু'চুমুকে পুরো জল শেষ করলেন। এই বয়সে মাত্র দু'চুমুকে এক গেলাস জল শেষ করা সহজ কাজ নয়। কঠিন কাজ। কঠিন কাজটি করতে

পেরে তিনি খুশি হলেন। মেয়ের দিকে তাকিয়ে অল্প হেসে বললেন, 'সব নর্মাল থাকলে বুঝি মানুষ মরে না? মানুষের মৃত্যুই তো একটা নর্মাল জিনিস। সম্ভবত সবথেকে বেশি নর্মাল।'

দোলা ঝাঁঝিয়ে ওঠে। বলে, 'রাখো তোমার জ্ঞানের কথা। কাল রাতে শুনে আমি এমন ভয় পেয়ে গেলাম... শোনো বাবা, ওইসব লিস্টফিস্টের পাগলামি আজই বন্ধ করো। একটা শিক্ষিত মানুষের এসব কী? কিটি শুনলে দাদু সম্পর্কে কী ভাববে বলো তো? তোমার ওই খাতা কোথায়? খাতা পুড়িয়ে তবে আমি আজ বাড়ি ফিরব।'

অক্ষয়বাবু চোখ বড় করে তাকালেন। চোখে কৌতুক। বোঝাই যাচ্ছে, তিনি মজা পাচ্ছেন। বললেন, 'বাপ রে, মনে হচ্ছে একেবারে যুদ্ধ করবি বলে তৈরি হয়ে এসেছিস। হা হা। ওই খাতা তোমরা এখন আর হাতে পাবে না বাপু। তালিকা তৈরি করতে বিস্তর খাটাখাটনি করতে হয়েছে। খাতা আমি লুকিয়ে রেখেছি। ছেলেদের দেখানো হয়ে গেছে, এখন শুধু তোকে আর বউমাকে একবার দেখাব।' অক্ষয়বাবু থামলেন। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে যেন খানিকটা আপনমনে বললেন, 'বুঝলি দোলা, মনে হচ্ছে না আর বেশি সময় পাব। যা করার দ্রুত সারতে হবে।'

দোলা চুপ করে রইল। এবার কিন্তু তার কান্না পাচ্ছে। সত্যি মানুষটা বাড়াবাড়ি শুরু করেছে। সে গলা তুলে বলল, 'বাবা, তুমি যদি এরকম করো আমি কিন্তু এ বাড়িতে আসা বন্ধ করে দেব। এই বলে রাখলাম।'

অক্ষয়বাবু হাসলেন। মানুষ শিশু এবং বৃদ্ধ বয়েসে সবথেকে সুন্দর করে হাসতে পারে। অক্ষয়বাবুর হাসিও সুন্দর হল। তিনি হাত বাড়িয়ে মেয়ের ডান হাতটা ধরলেন। হাত একটু কাঁপছে। কাঁপবেই তো। এতটা বয়স হয়েছে।

'ঠিক আছে, করব না। কথা দিলাম খাতা বন্ধ করে দেব। যেটুকু হওয়ার হয়েছে আর নয়। তবে তুই শুধু একটা কাজ করে দে মা। লাস্ট কাজ।'

দোলা ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী কাজ?'

'তোর মায়ের উল বোনার দুটো কাঁটা খুঁজে দিয়ে যা। বেচারি ওগুলো ফেলে গেছে।'

এই ঘটনার ঠিক সাত দিনের মাথায় মারা যান অক্ষয়বাবু। সকালবেলা, ইজিচেয়ারে বসে বুকে তীব্র ব্যথা অনুভব করেন। হাতে দুধ মুড়ির বাটি। সেই বাটি তিনি মেঝেতে নামাতে চেষ্টা করেন। পারেন না। বাটি হাত থেকে গড়িয়ে পড়ে। বিশ্রী আওয়াজ করে ভাঙা কাচ ছড়িয়ে পড়ে গোটা ঘরে।

এরও অল্প কিছুদিন পরে পার্থ তার বাবার আলমারির কোণ থেকে একটি বাঁধানো ছোট খাতা উদ্ধার করে। হলুদ মলাট, লাইন টানা। খাতাটি তার চেনা। কাপড় জামার মাঝখানে যত্ন করে লুকোনো ছিল। দ্রুত পাতা ওলটায় পার্থ।

তালিকা লেখা সেই পাতাগুলো নেই। কাঁপা হাতে কে যেন ছিঁড়ে নিয়ে গেছে।

শারদীয়া আনন্দবাজার, ১৪১৪

চেয়ার

হ্যাটট্রিক হল। পরপর তিন দিন। শেষ ঘটনাটা ঘটে শনিবার। শনিবার রাতে। এক-একজন বাড়িওলা ভাড়া আদায়ের জন্য ভাড়াটেকে এক-এক রকম থেরাপি দেয়। গালমন্দের থেরাপি, জল বন্ধের থেরাপি, গুন্ডা লেলানোর থেরাপি। অবনী ঘোষালের থেরাপি হল 'বসে থাকা থেরাপি'। তিনি ভাড়াটের বাড়ি গিয়ে বসে থাকেন। ভাড়ার কথা কিছু বলেন না, কোনও কথাই বলেন না। শুধু চুপ করে বসে থাকেন। চা দিলে ভাল, না দিলে ক্ষতি নেই। কিছু মনে করেন না। তবে উনি কোন সময় যাবেন সেটা নির্ভর করে কতদিন ভাড়া বাকি আছে তার ওপর। দিন যত বেশি হয় রাত তত বাড়ে। এমনও হয়েছে অবনী ঘোষাল রাত দেড়টার সময় গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। ভাড়াটে দরজা খোলার পর লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলেছেন, 'এত রাতে এসে বিরক্ত করলাম। খারাপ লাগছে ভাই, খুবই খারাপ লাগছে। আপনারা ব্যস্ত হবেন না। ঘুমোতে যান। আমি বরং কিছুক্ষণ বসি। অসুবিধে নেই। শুধু পাখাটা দয়া করে একটু ছেড়ে দেবেন ভাই। কী গরমটাই না পড়েছে।'

শনিবার সেই অবনী ঘোষাল এলেন। এলেন রাত ন'টার সামান্য পরে। গৌরী তখন রান্নাঘরে। দ্রুত হাতে রুটি বেলছে। মনের ভেতরে চাপা টেনশন। টেনশনের কারণে রুটির মাপে গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। গৌরীর এই এক অসুবিধে। রুটি বেলার সময় টেনশন হলে মাপে গোলমাল হয়। রুটি ছোট বড় হয়ে যায়। সেদিন গৌরীর টেনশন ছিল গ্যাস নিয়ে। যে-কোনও সময় গ্যাস ফুরিয়ে যেতে পারে। তিন দিন আগেই সিলিন্ডারের সময় পেরিয়ে গেছে। চাটুর তলায় আগুনের নীল শিখা দপ দপ করে সিগন্যাল দিচ্ছে। 'ম্যাডাম, আমি চললাম, টা টা' ধরনের সিগন্যাল। এই সিগন্যাল ফলস হতে পারে। হয়তো গৌরীর সঙ্গে মজা করছে। টানাটানির সংসারের সঙ্গে সবাই মজা করে। চাল, ডাল, তেল, গ্যাসের সিলিন্ডার— সবাই। গৌরী মনে মনে চাইছিল, এটাও মজা হোক। মজা হলে ভাল, নইলে বিপদ। এই মাসে নতুন গ্যাসের সিলিন্ডার আনার কোনও উপায় নেই। চাল, ডাল তাও ধার বাকিতে হয়, গ্যাস সিলিন্ডারের ক্ষেত্রে এখনও ধার সিস্টেম চালু হয়নি। সেই কারণেই গৌরীর টেনশন। রুটিও হচ্ছিল ছোট-বড়। এমন সময় বাড়িওলা এলেন। তবে মানুষটা ঝামেলা পাকাননি একটুও। ভাড়া মাত্র দিন সাতেকের বকেয়া পড়েছে। সেই হিসেব কষে বারান্দার চেয়ারে মিনিট দশ বসলেন মাত্র। চা, জল কিছুই খেলেন না। তারপর 'আচ্ছা, আজ চলি' বলে উঠে পড়লেন।

আর তখনই ঝুম্পার নজরে পড়ে।

বারান্দায় কম পাওয়ারের হলুদ আলোতেই সে দেখতে পায়— অবনী ঘোষালের

পাঞ্জাবি ছিঁড়েছে। ছিঁড়েছে কোমরের একটু ওপরে। তিন কি চার আঙুল ওপরে। ছেঁড়া খুব বড় নয়। মনে হচ্ছে কেউ নখ দিয়ে খাবলা মেরেছে। ছেঁড়া কাপড়ের চারপাশে বেরিয়ে এসেছে রোঁয়ার মতো সাদা সুতো। বারান্দার অল্প হাওয়ায় তারা উড়ছে। উড়ছে ফুরফুর করে। যেন ময়ূরের পেখম!

ঝুম্পা দরজা লাগিয়ে তাড়াতাড়ি ছুটে যায় রান্নাঘরে। মাকে ঘটনা বলে। গৌরী রুটি বেলা থামিয়ে চোখ বড় করে, 'বলিস কী, আবার।'

'হ্যাঁ মা আবার, এবার বেশ অনেকটা, এই এতখানি। চেয়ারের খোঁচে লাগলে যেমন হয়। এবারও বোধহয় পেরেক বা কাঠের টুকরোয় লেগেছে।'

গৌরী ভয়ে ভয়ে বলে, 'দেখতে পায়নি তো?'

'খেপেছ। ছিঁড়েছে তো পেছনে, দেখবে কী করে? বুড়োর পেছনে তো আর চোখ নেই। হি হি।'

গৌরী চিন্তিত মুখে বলল, 'হাসিসনি ঝুম্পা। এই নিয়ে দু'দিন হল। ওই চেয়ারে জামাকাপড় ছিঁড়ল।'

ঝুম্পা ভুল ধরিয়ে বলল, 'দু'দিন না মা, তিন দিন। পরপর তিন দিন হল। একেবারে হ্যাটট্রিক। একটা কাজ করব? চেয়ারটার গায়ে একটা কাগজ সেঁটে দেব? সেখানে লেখা থাকবে— সাবধান। সাবধান। সাবধান। এই চেয়ারে বিপদ আছে। জামাকাপড় ছিঁড়িলে কর্তৃপক্ষ দায়ী নহে। হি হি। লিখব মা?'

আবার রুটিতে মন দিল গৌরী। কিন্তু মন পুরো বসছে না। বসবে কী করে। এ আবার কী অলুক্ষুনে কাণ্ড শুরু হয়েছে। রোজ রোজ মানুষের জামাকাপড় ছিঁড়ছে। ছি ছি। গৌরীর টেনশন বাড়ছে। সে মাথা ঠান্ডা করার চেষ্টা করল। নইলে সমস্যা। রুটির মাপে গোলমাল হলে শিবনাথ বিরক্ত হয়। গত মাসেই তো হল। ঝগড়াও হল এক প্রস্থ।

'আবার তুমি ঝামেলা করেছ? এক-একটা রুটি এক-এক সাইজের। আগের তিনটে যেরকম ছিল, এটা তার থেকে বড়। একটু বড় নয়, বেশ বড়। ডবল না হোক, দেড়া তো বটেই। তুমি নিজেই দেখো।'

গৌরী জানে, ঘটনা সত্যি। তার মাথার ঠিক নেই। কয়েকটা দিন ধরে পাগল পাগল অবস্থা। এই অবস্থা নিয়ে রুটির মাপে যে গোলমাল হবে তার আর আশ্চর্য কী? কদিন পরেই মেয়ের মাধ্যমিক। সামনের সপ্তাহে ফি জমা দেওয়ার তারিখ। তার ওপর টেস্ট পেপার, পেন, পেনসিল, ক্লিপ লাগানো লেখার বোর্ড কিনতে হবে। সব থেকে বড় কথা হল, মেয়ের কোচিং-এর টাকা। এক মাসের নয়, তিন মাসের টাকা। কোচিংওলারা মহা বদ। অ্যাডভান্স না দিলে লাস্ট মিনিটের সাজেশন দেয় না। কিছু টাকা দেওয়া আছে। পুরোটা যায়নি। ইতিহাস আর অঙ্কের সাজেশন আটকে রেখেছে। পুরো পেমেন্ট হলে তবে দেবে। ইতিহাস নিয়ে চিন্তা নেই, কিন্তু অঙ্কটা লাগবেই। মেয়ে অঙ্কে বিরাট গাধা হয়েছে। গরিব ঘরের ছেলেমেয়ে অঙ্কে গাধা হলে সমস্যা। একবার ফেল মারলে বারবার ফেল মারতে থাকে। সুতরাং যে-কোনওভাবে বাকি টাকা জোগাড় করে সাজেশন আনতে হবে। অথচ তখনও মেয়ের বাবার বেতন হয়নি। এই অবস্থায় রুটি ছোট-বড় হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়।

স্বামীর বিরক্তি দেখে গৌরীর রাগ হয়। তবু সে নিজেকে শান্ত রাখে। ঠান্ডা গলায় বলে, 'ও তোমার মনের ভুল। নাও হাত সরাও, তরকারি দিই। কুমড়ো কেমন হয়েছে? বাদাম দিয়েছি। কুমড়োতে বাদাম দিলে একটা চিংড়ি মাছের মতো গন্ধ হয়। গন্ধ হয়েছে কিনা দেখো।'

গৌরীর কথায় কান না দিয়ে শিবনাথ হাত বাড়িয়ে বাটিতে রাখা রুটির গোছা তুলে ধরে। বলে, 'নাও দেখো, মনের ভুল কিনা নিজেই দেখো। তাকিয়ে দেখো এক-একটা এক-একরকম সাইজের।'

ঝুম্পা সাধারণত খায় তার বাবার পাশে বসে। সেদিন বসেছিল উলটো দিকে। মায়ের কথামতো বাদামে চিংড়ি মাছের গন্ধ পাওয়ার চেষ্টা করছিল সে। পাচ্ছিল না। না পাওয়ারই কথা। এগারো দিন হতে চলল এ বাড়িতে মাছ-মাংস ঢুকছে না। প্রথম দু'দিন স্টকে ডিম ছিল, এখন সেই স্টকও ফুরিয়েছে। ঝুম্পা নিশ্চিত, আর ক'টা দিন এভাবে চললে মাছ-মাংসের স্বাদ, গন্ধ সবই সে ভুলে যাবে। মনে হয় সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেছে। চিংড়ি মাছ দিয়েই শুরু হয়েছে। গন্ধ ভুলে যাওয়ার বিষয়টা মাথায় আসতেই তার মজা লাগল। সে মুখ তুলে বলল, 'বাবা, কম্পাস নিয়ে আসব? তুমি ব্যাসার্ধ মেপে মেপে দেখবে রুটি ছোট-বড় হয়েছে কিনা!'

গৌরী নিজের মনে গজগজ করতে করতে বলে, 'মাসের শেষ হতে চলল, এখনও মাইনে হল না। ঘরে একটা ফুটো কড়ি পর্যন্ত নেই। ওদিকে মেয়ের পরীক্ষা আর উনি বসে বসে গজ-ফিতে দিয়ে রুটি মাপছেন!'

শিবনাথ চুপ করে গিয়েছিল। না গিয়ে উপায় নেই। গৌরীর কথা মিথ্যে নয়। তখনও মাইনে হয়নি শিবনাথের। তার অফিসে বছরের মধ্যে অন্তত তিনবার এই ঘটনা ঘটে। ঠিক সময়ে বেতন হয় না। আসলে কোম্পানির অবস্থা খারাপ। পুরো খারাপ নয়। খানিকটা খারাপ। পুরো খারাপ হলে ল্যাটা চুকে যেত। কোনও কিছুই খানিকটা হওয়া ভাল নয়। গৌরীর বেশ মনে আছে, শিবনাথ চুপ করে গেলেও সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত সে একাই ঝগড়া করেছে। মাঝেমধ্যে কেঁদেছেও।

এই কারণেই গৌরী আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল রুটিতে মন বসাতে। ঝুম্পার কথাটা ঠিক। বাড়িওলাকে নিয়ে জামাকাপড় ছেঁড়ার ঘটনা তিনবার হল। প্রথম আক্রমণ ছিল শাড়ি। উমার শাড়ি। গোলগাল ফরসা সুন্দর দেখতে মেয়ে উমা। বয়স কম। পাশের ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকে। মাঝে মাঝে বিকেলে গৌরীর কাছে এসে শাশুড়ি-ননদের নিন্দে করে যায়। বৃহস্পতিবার এসেছিল জায়ের নামে বলতে। পরপর দু'কাপ চা খেল। উঠতে যাওয়ার সময় চেরা একটা আওয়াজ। কাপড় ছেঁড়ার আওয়াজ। গৌরী, উমা দু'জনেই সেই আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। আওয়াজ সন্ধান করতে দেখা গেল, উমার হাঁটুর পিছনে চেয়ার কামড় বসিয়েছে। ডান পায়ার পাশ থেকে মুখ বের করা পেরেক দামি শাড়ি ফালা করে দিয়েছে। প্রায় এক বিঘতের মতো কাপড় ঝুলছে। উমা কেঁদে ফেলে। শাড়ি জায়ের। গৌরীর মনে হচ্ছিল, লজ্জায় মাটিতে মিশে যায়। সমস্যা হল, লজ্জায় অনেক কিছু হয়, কিন্তু মাটিতে মিশে যাওয়া যায় না।

পরদিন চেয়ার আঁচড় বসাল বিশ্বনাথের জামায়। বিশ্বনাথ শিবনাথের কলিগ। শৌখিন মানুষ। বেতনে গোলমাল হলেও পরিপাটি করে চুল আঁচড়ায়। নিখুঁতভাবে দাড়ি কামায়। রঙিন জামা পরে। সেদিন তার জামা অবশ্য রঙিন ছিল না। ছিল সাদা জামা। সেই সাদা জামার বাঁ কাঁধে বেতের ধারালো মুখ বিঁধল। একটা নয়, একসঙ্গে তিনটে মুখ। তিনটে আঙুলের মতো। উমার শাড়ি ছেঁড়ার শব্দ হয়েছিল, বিশ্বনাথের বেলায় ঘটনা ঘটল নিঃশব্দে।

রাতে খাওয়ার টেবিলে গৌরী বলল, 'চেয়ারটা নিয়ে এবার একটা কিছু করো। ছি ছি। ভদ্রলোকের বাড়িতে এ কী কাণ্ড! রোজ রোজ মানুষের জামাকাপড় ছিঁড়ছে। ইস, মাগো, লজ্জায় মরে যাচ্ছি।'

শিবনাথ বলল,'ওটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেই তো হয়। ঠিক আছে, কালই ঢুকিয়ে দেব।'

গৌরী মুখ তুলে বলল, 'তারপর? ভাঙা চেয়ার না হয় লুকোলে, কিন্তু বাইরের কেউ এলে বসবে কোথায়? আমাদের কি সোফা পাতা ড্রইংরুম আছে? সে মুরোদও তোমার নেই। নতুন চেয়ার কেনার ক্ষমতাই নেই, তো সোফা।' কথা শেষ করে গৌরী 'ফুঃ' ধরনের একটা আওয়াজ করে।

'এখানে মুরোদের কী আছে? বাইরেই যে বসতে হবে তার কী মানে? ভেতরে এসে বসবে।'

গৌরী অবাক হয়। মানুষটা বলে কী? টাকাপয়সার চিন্তায় মাথাটা একেবারে গেল নাকি? ভেতরে বসবে মানে? ভেতর বলতে তো দেড়খানা মাত্র ঘর। বড়টায় তাদের দু'জনের শোওয়ার ব্যবস্থা। আর আদ্দেক যেটা, সেটা মেয়ের। সেও তো বড় হয়েছে। তারও তো একটা আলাদা জায়গা চাই। নাকি চাই না?

গৌরী খাওয়া থামিয়ে শান্ত গলায় বলল, 'ভেতরে বসবে কোথায়? আমার খাটে? আর আমি কী করব? অতিথিকে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান শোনাব? কোন গান শোনাব সেটাও বলে দাও।'

ঝুম্পা 'হি হি' আওয়াজে হেসে ওঠে। শিবনাথ তাড়াতাড়ি বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে। কাল রবিবার, দেখি কিছু একটা করা যাবে।'

গৌরী অবাক গলায় বলল, 'রবিবার তো কী হয়েছে? সকালে বাড়ি বসে চেয়ারকে সহবত শেখাবে নাকি? বাবা-বাছা করে বোঝাবে?' ঝুম্পা এবার হাসতে গিয়ে বিষম খায়। শিবনাথ থালা সরিয়ে উঠে পড়ে। না, অপমানের একটা সীমা আছে।এরা কি জানে না, হুট বলতে একটা জিনিস কেনা অত সহজ নয়? টাকা লাগে। জানে না? নাকি জেনেও না জানার ভান করছে?

পরদিন ঘুম থেকে উঠেই শিবনাথ চেয়ার নিয়ে পড়ল। সে প্রতিজ্ঞা করেছে, আজ একটা হেস্তনেস্ত করে তবে ছাড়বে। এই ঘটনার শেষ দেখবে সে। ওই চেয়ারের সামনে, পেছনে, ওপরে, নীচে যেখানে যত দাঁত-নখ আছে, একটা একটা করে উপড়ে ফেলে তবে থামবে। স্ত্রীর অপমান, মেয়ের হাসি অনেক হয়েছে। আর নয়। এনাফ ইজ এনাফ।

ভাঙা চেয়ারের খোঁচ ওপড়ানোর জন্য শিবনাথ আয়োজন করল বিরাট। হাতুড়ি, সাঁড়াশি,

স্ক্রুড্রাইভার, টর্চ। এই টর্চ সুইচ টিপলে জ্বলে না। থাবড়া দিয়ে জ্বালাতে হয়। তিন থাবড়ায় একবার জ্বলে। কাজে বসার আগে শিবনাথ মেয়ের কাছে সর্ষের তেল চাইল। খানিক পরে তেল ছাড়াই ফিরে এল ঝুম্পা। বলল, 'মা জিজ্ঞেস করছে, চেয়ার সারাতে তেল কেন? তেল কি তুমি গায়ে মাখবে বাবা? চেয়ারের সঙ্গে কুস্তি লড়বে নাকি?'

রসিকতা গায়ে মাখল না শিবনাথ। তবে সত্যি তাকে কুস্তিই লড়তে হল। উলটে, পালটে, সোজা করে বেঁকিয়ে অনেক কসরত চলল চেয়ারের সঙ্গে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই বুঝতে পারল, বিষয় অত সোজা নয়। হারামজাদা যেন চেয়ার নয়, আস্ত একটা শয়তান! তার সঙ্গে খেলছে। ভয়ংকর খেলা খেলছে! ছোট পেরেক, বেতের ধারালো মুখ, কাঠের মাথার খোঁচগুলো দেখতে দিচ্ছে না। হাতুড়ি তুললে গা ঢাকা দিচ্ছে পায়া হাতলের খাঁজে, মুখ লুকোচ্ছে বসার জায়গায় অথবা ব্যাক রেস্টের মাঝখানে। যে ক'টা দেখা যাচ্ছে তারাও সাঁড়াশি বাগালে ঝকঝকে দাঁত বের করে হেসে ফসকে পালাচ্ছে এদিক-ওদিক।

ঘেমে একশা হল শিবনাথ। তবু হাল ছাড়ল না। ঘণ্টাখানেকের চেষ্টায় লাফিয়ে, ঝাঁপিয়ে, হামাগুড়ি দিয়ে খোঁচগুলো সব টেনে, হিঁচড়ে, ভেঙে, মুচড়ে চেয়ার থেকে আলাদা করে ফেলল। তারপর টর্চ জ্বেলে তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালাল কাঠ, বেতের আনাচে-কানাচে, ফাঁকফোকরে। আর নেই তো? না নেই। ঘাম মুছে হাঁপ ছাড়ল শিবনাথ। হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়ল মেঝেতে। চেয়ারের দিকে তাকিয়ে আপনমনেই হাসল। বিজয়ের হাসি। যাক, আজ থেকে মেয়েটা নিশ্চিন্তে এই চেয়ারে বসে পড়তে পারবে। কোনও ভয় নেই। সন্ধের পর বারান্দায় হাওয়া দেয়। পরীক্ষার আগে টাটকা হাওয়া শরীরের পক্ষে একটা উপকারি জিনিস।

শিবনাথ মেঝেতে ছড়িয়ে থাকা ওপড়ানো লোহার পেরেক, বেতের ধারালো মুখ, কাঠের টুকরো তুলতে লাগল একটা একটা করে। অতি যত্নে। ঝুম্পাকে দেখাতে হবে। আহা রে, মেয়েটা কতদিন তার গরিব বাবার কোনও কীর্তি দেখেনি।

তীক্ষ্ণ চিৎকারে বারান্দায় প্রথমে ছুটে যায় গৌরী, পরে শিবনাথ। রাত কত? দশটা? এগারোটা? নাকি আরও বেশি? বারান্দায় এসে শিবনাথ দেখল, রক্তশূন্য ফ্যাকাশে মুখে দাঁড়িয়ে আছে তার কিশোরী কন্যা। আতঙ্কে চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে তার। কাঁপছে। খুব সামান্য হলেও কাঁপছে সে। এক হাতে বই আর একটা হাত সালোয়ার-কামিজের ওড়নায়। ফিকে নীল সেই ওড়নার অন্য প্রান্ত আটকে আছে একটু দূরে। বেতের চেয়ারের হাতলে। শিবনাথের মনে হল, নিষ্প্রাণ চেয়ার যেন প্রাণ পেয়েছে। শয়তানের প্রাণ! কঠিন, নির্মমভাবে হাসছে। হাসতে হাসতে তীব্রভাবে ধরে রেখেছে ঝুম্পার ওড়না, ঝুম্পাকে, এমনকী তাদেরও!

ঝুম্পা বাবা-মায়ের দিকে তাকিয়ে কাঁপা গলায় ফিসফিস করে ওঠে।

'ছাড়ছে না, ছাড়ছে না।'

আজকাল রবিবাসর, ১৩ মে ২০০৭

সন্ন্যাসী

টিফিনের পর পার্থ সমাদ্দারকে তার টেবিলের দিকে আসতে দেখে সুপ্রতীক সতর্ক হল। সব অফিসেই এক ধরনের 'নিচু-গলা' টাইপের লোক থাকে। এরা যে-কোনও ধরনের আলাপ-আলোচনা গলা নামিয়ে করতে ভালবাসে। হয়তো ক্যান্টিনের মেনু বা বনগাঁ লোকালের লেট নিয়ে কথা বলবে, কিন্তু ভাব ভঙ্গি এমন যেন ভারত-আমেরিকার পরমাণু চুক্তি নিয়ে গোপন শলাপরামর্শ করতে এসেছে। কেউ শুনে ফেললে বিরাট বিপদ। প্রধানমন্ত্রী বকাঝকা দেবে।

পার্থ সমাদ্দার এই অফিসের সেই 'নিচু-গলা' টাইপের লোক। কথা বলার সময় সে শুধু গলা নামায় না, চারপাশে ইতিউতি চাইতেও থাকে। কেউ দেখে ফেলছে না তো? অনেকেই দেখে, কিন্তু আমল দেয় না। তারা জানে, এই ফিসফিসানির কোনও দাম নেই। সম্ভবত সেই কারণেই সমাদ্দার সম্প্রতি পরীক্ষামূলকভাবে কিছু কিছু কথা বানিয়ে বলতে শুরু করেছে। এতে যদি তার নিচু গলার গুরুত্ব বাড়ে। তবে এখনও এ খবর খুব বেশি চাউর হয়নি।

আজও কি সেরকম কিছু ঘটল? পার্থ সমাদ্দার কি বানিয়ে কিছু বলছে? নইলে সুপ্রতীক অমন চমকে উঠবে কেন?

'এসব আপনি কোথা থেকে শুনলেন পার্থদা? এ আপনি কী বলছেন!'

সমাদ্দার মুচকি হাসল। পাশের টেবিল থেকে চেয়ার টেনে এনে বসল মুখোমুখি। টেবিলের স্তূপাকৃত কাগজপত্রের পাশ থেকে মুখ বের করে বলল, 'ওকথা ছাড়ো, তুমি বলো খবর সত্যি কি না।'

সুপ্রতীক ঠোঁট কামড়ে মুহূর্তখানেক চুপ করে রইল। তারপর বলল, 'ভুল করছেন না তো? হয়তো একই নামের অন্য কেউ গিয়েছিল।'

'খেপেছ? উনি তোমার নাম বলেছেন।'

'আমার নাম!'

পার্থ সমাদ্দার ফিসফিস করে বলল, 'শুধু তোমার নাম নয়, তোমার মিসেসের নাম, বাড়ির ঠিকানা সব বলেছেন। এমনকী তুমি যে এখানে কাজ করো তাও। সেই কারণেই তো বিশু আমাকে কথাটা বলল। নইলে বলবে কেন? ওদের ওখানে এরকম রোজই কতজন যাচ্ছে।'

সুপ্রতীক নিজের অজান্তেই গলা নামিয়ে বলল, 'বিশু! বিশু কে?'

পার্থ সমাদ্দার হাসি হাসি মুখে বলল, 'বিশু, বিশ্বনাথ। বিশুই তো ওখানে নামটাম লেখে, ম্যানেজার মতো। আমার ভগ্নিপতির বাড়ির পাশেই থাকে। ছেলে খারাপ নয়, ছেলে ভাল,

একটু বেশি বকবক করে এই যা। কাল ভগ্নিপতির বাড়িতে নেমন্তন্ন ছিল। ছেলের জন্মদিন। ওখানেই ছোকরার সঙ্গে দেখা। বলল, পার্থবাবু, আপনাদের অফিসের... আমি তো শুনে থ'।'

সুপ্রতীক নার্ভাস গলায় বলল, 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

এদিক ওদিক তাকিয়ে পার্থ সমাদ্দার বলল, 'ঝগড়াঝাঁটি কিছু হয়েছে?'

সুপ্রতীকের সবটা তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। সমাদ্দার এসব কী বলছে! নিশ্চয় কোনও গোলমাল করছে। বানাচ্ছে না তো? লোকটা নাকি আজকাল বানিয়ে বানিয়েও কথা বলে। কিন্তু এরকম অদ্ভুত একটা কথা বানিয়ে বলতেই বা যাবে কেন? তা ছাড়া কথাটা তো এলেবেলে কিছু নয়, কথা সাংঘাতিক। নিজেকে সামলে, শুকনো হেসে সুপ্রতীক বলল, 'না, না, ঝগড়া কার সঙ্গে হবে? কেনই বা হবে? এই তো অফিসে বেরোনোর সময় শর্মিলাকে দেখে এলাম ব্রেকফাস্টের জন্য চা-টোস্ট, অমলেট, একটা বড় সাইজের কলা নিয়ে...।'

নিচু গলাতেই খুক খুক ধরনের হাসল সমাদ্দার। চোখ নাচিয়ে বলল, 'ঝগড়ার সঙ্গে কলার সাইজের সম্পর্ক কী? ঝগড়া তোমার ছোট কাঁঠালি কলাতেও হতে পারে, বড় সিঙ্গাপুরিতেও হতে পারে। পারে না?'

হাতের পেন টেবিলের ওপর রেখে পিঠ সোজা করে সুপ্রতীক খানিকটা সারেন্ডার করার ভঙ্গিতে বলল, 'তা ঠিকই, কিন্তু সত্যি পার্থদা, আমি কিছুই জানি না। কী মুশকিল হল বলুন তো।'

পার্থ সমাদ্দার ঠোঁটের ওপর আঙুল দিয়ে বলল, 'স্ স্... আস্তে বলো সুপ্রতীক, এসব জিনিস জোরে বলার নয়। লোকে শুনলে ভুল বুঝবে। ভাববে তোমরাই জোর করে...। আরও ব্যাপার হয়েছে।'

'আরও ব্যাপার! ব্যাপারের আর বাকি কী রইল?' সুপ্রতীকের ভেঙে পড়ার জোগাড়।

পার্থ সমাদ্দার এবার চোখের বদলে শুধু ভুরু নাচিয়ে বলল, উনি তোমার আর তোমার গিন্নির গুণগান করেছেন। একটু গুণগান নয়, বেশি রকমের গুণগান। বিশু তো বলছিল, পুত্রবধূর প্রশংসায় ভদ্রলোক নাকি একেবারে পঞ্চমুখ। রান্নাবান্না, সেবা যত্ন, ঘর গুছিয়ে দেওয়ার লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছেন। বিশু তখন বলেছে, স্যার, এখানে অতটা তো পাবেন না, তবে যতটা হয়...।'

সুপ্রতীক মিনমিন করে বলল, 'তা হলেই বুঝুন।'

টেবিলে টোকা দিতে দিতে সমাদ্দার দার্শনিক ধরনের চিন্তিত মুখ করে বলল, 'এটাই তো ব্যাপার সুপ্রতীক। মানুষের মনের কথা আর বাইরের কাজ যখন আলাদা হয়ে যায় তখনই ব্যাপার জটিল হয়ে দাঁড়ায়। নিশ্চয় ভেতরে কোনও ক্ষোভ অভিমান তৈরি হয়েছে।'

খানিকটা চুপ করে থেকে সুপ্রতীক মুখ নামিয়ে বলল, 'জায়গাটা কোথায়?'

সমাদ্দার চারপাশে এক ঝলক তাকিয়ে নিয়ে আরও ঝুঁকে পড়ল। গলা বাড়িয়ে প্রায় সুপ্রতীকের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'অ্যাকিউরেট লোকেশন জানি না, তবে বিশুর কাছে শুনেছি, জায়গা অতি চমৎকার।'

দাঁতে দাঁত চেপে সুপ্রতীক নিজের নার্ভাস ভাব গোপন করার চেষ্টা করল। বলল, 'চমৎকার না কদাকার জানতে চাইনি, জায়গাটা কোথায় সেটা কি আপনি জানেন?'

'জানি। উত্তরপাড়া স্টেশন থেকে যেতে হয়, গঙ্গার ধারে। দোতলার ওপর গঙ্গা ফেসিং একটা ঘর উনি পছন্দ করে এসেছেন। তিনতলাতে আরও ভাল ঘর ছিল। নেননি, হাঁটুতে ব্যথা, ওঠা-নামা করতে পারবেন না।'

সুপ্রতীক আঁতকে উঠল। হাঁটুতে ব্যথা! কই তার তো জানা নেই! কবে থেকে হল?

'সে কী! ঘর পর্যন্ত পছন্দ হয়ে গেছে! ছি ছি।'

সমাদ্দার সান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'ডোন্ট বি সো আপসেট সুপ্রতীক। আজই বাড়ি গিয়ে ঝামেলা মেটানোর চেষ্টা করো। যতই হোক বুড়ো মানুষ। বয়স কত হল?'

সুপ্রতীকের আর একটা কথাও বলতে ইচ্ছে করছে না। তার শরীর খারাপ করছে। তবু সে বিড়বিড় করে বলল, 'সিক্সটি এইট। সামনের আশ্বিনে নাইনে পা দেবে। তেরোই আশ্বিন।'

সমাদ্দার ঠোঁট উলটে ঘাড় নেড়ে বলল, 'না না সুপ্রতীক, এটা ঠিক নয়। তোমাদের আজই ঘটনা মেটানো উচিত।'

'কী মেটাব? কিছু হলে তো মেটামেটির প্রশ্ন। আপনি বিশ্বাস করুন পার্থদা, বিলিভ মি। নিজেই তো শুনেছেন, উনি শর্মিলাকে কতটা পছন্দ করেন।'

'আমার শোনাশুনিতে কী এসে যায়? লোকে শুনবে না। তোমাকে এই অফিসে সবাই গুডবয় হিসেবে জানে। শুধু গুডবয় নয়, তুমি হলে একজন ডিউটিফুল ফ্যামিলিম্যান। সেই তোমার বাড়িতেই যদি এই কাণ্ড হয় তা হলে কী বিচ্ছিরি বলো তো? সবার সামনে কী এক্সামপেল তৈরি হবে? আমি এখন চললাম, গাদাখানেক ফাইল ছাড়তে হবে। বস তো খালি আমার টেবিলের দিকেই চোখ পেতে রেখেছে, যাক, দরকার হলে বোলো, সেরকম হলে আমিও বোঝাতে যাব। তোমাদের একটা সোশ্যাল প্রেস্টিজ আছে।'

আবার মুচকি হেসে, পিঠে দু'বার চাপড় দিয়ে পার্থ সমাদ্দার নিজের ডিপার্টমেন্টের দিকে পা বাড়াল। সুপ্রতীকের মনে হল 'চাপড়' নয়, পিঠে দু' ঘা চাবুক পড়ল। সে পকেট থেকে মোবাইল বের করে দ্রুত শর্মিলার নম্বর টেপে।

দুপুরের এই সময়টা শর্মিলা টেলিফোন পছন্দ করে না। এই সময় সে তার দুই মেয়ে চন্দ্রাবলী এবং চন্দ্রাবতীকে স্কুলে পাঠিয়ে ঝাড়া হাতপায়ে বসে টিভিতে রান্নার প্রোগ্রাম দেখে। আজও দেখছে। বিদেশি চ্যানেলে সুন্দরী মেমসাহেব হাসি হাসি মুখে চকোলেট কেক বানাচ্ছে। শর্মিলা বিস্মিত দৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে আছে। তার বিস্ময় চকোলেট কেকের জন্য নয়, বিস্ময় রান্নাঘরের জন্য। এটা রান্নাঘর! রান্নাঘরও এত সুন্দর হয়! রান্নাঘর না হয়ে একে অনায়াসে ড্রইংরুম বা স্টাডিও বলা যেতে পারে। সিঙ্কের পাশে ফুলদানি। মাইক্রোআভেনের ওপর বইয়ের র‍্যাক। ইয়া বড় জানলায় মেরুন রঙের পরদা ঝুলছে। তার রান্নাঘরে যদি এরকম একটা লম্বা, কালো মার্বেল টেবিল থাকত তা হলে কথাই ছিল না। গরমের দুপুরে মাঝে মধ্যেই পালংশাক, ধনেপাতা, সজনেডাঁটা সরিয়ে একটু গড়িয়ে নিত। একেবারে বেডরুম। আহা।

সত্যি কথা বলতে কী, একটা ঝকঝকে রান্নাঘরের স্বপ্ন শর্মিলার বহুদিনের। সেই বিয়ের পর থেকেই। তার শ্বশুরবাড়ির সব ভাল, একতলা ছিমছাম বাড়ি। তিনটে বড় বড় বেডরুম। সঙ্গে টাইলস মোড়া বাথরুম। পুব আর দক্ষিণে দুটো খোলা বারান্দা। ডাইনিং কাম ড্রইংটাও ছোটর ওপর মন্দ নয়। শুধু রান্নাঘরটাই হতকুচ্ছিত। অন্ধকার, ঘুপচি, যেন বাড়ির এক কোনায় লজ্জায় মুখ লুকিয়ে আছে কুশ্রী মেয়ের মতো। ওখানে ঢুকলেই, খানিকটা পর থেকে শর্মিলার শরীর ঝিমঝিম করে, মাথা ধরে যায়, দম আটকে পড়ে। শাশুড়ি বেঁচে থাকতে একবার কথাটা তুলেছিল শর্মিলা।

'মা, রান্নাঘরটা একটু ঠিকঠাক করলে হয় না?'

'ঠিকঠাক! রান্নাঘরের আবার ঠিকঠাক কী! তেল মশলা, ফোড়ন কমিয়ে বাড়িয়ে রান্নার ঠিকঠাক হয় শুনেছি, তুমি কী বলতে চাইছ আমি ঠিক ধরতে পারছি না শর্মিলা!'

শর্মিলা আমতা আমতা করে বলল, 'না মানে, এই ধরুন জানলাটা কেটেকুটে খানিকটা বড় করা হল, দেয়ালে টাইলস দিলাম, ওপরদিকে একটা বড় ক্যাবিনেট। ক্যাবিনেটের ভেতরে মশলাপাতি থাকল।'

শাশুড়ি চোখ বড় করে বললেন, 'আর?'

শর্মিলা নার্ভাস হেসে বলল, 'আর... আর ঘরটা সাইজে যদি খানিকটা বড় করা যায়। এদিকের ওয়ালটা ভেঙে ফেলে খানিকটা বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।' শর্মিলা কথা থামিয়ে ঢোক গিলে আবার বলতে শুরু করল, 'আজকাল রান্নাঘরের কনসেপ্টটাই বদলে গেছে মা। সিনেমা, টিভিতে দেখেন না, ফ্ল্যাটবাড়িতে সব মডিউলার কিচেন। স্পেশিয়াস, এয়ারি। আমাদের মতো নয়, দু'জন ঢুকল কি ঢুকল না গায়ে গা লেগে যায়।'

শাশুড়ি ঠান্ডা গলায় বলেছিলেন, 'শর্মিলা, আমার যতদূর জানা আছে তোমার শ্বশুরমশাই রান্নাঘর সিমেন্ট বালি দিয়েই বানিয়েছেন, ইলাস্টিক দিয়ে নয়। ইলাস্টিক বা রাবার দিয়ে করলে না হয় টেনে বড় করা যেত। তা ছাড়া এটা ফুটবল খেলার মাঠও নয় যে তার ভালমন্দ আলো হাওয়ায় বিচার হবে। রান্নাঘরের বিচার হবে রান্নার কোয়ালিটিতে। তুমি ঘরের দিকে মন না দিয়ে বরং রান্নায় মন দিলে ভাল হবে। সেরকম অসুবিধে হলে তুমি রান্নার জন্য আলাদা লোকও রাখতে পারো। বাড়ির বউকে রোজ হেঁশেল ঠেলতে হবে এরকম কোনও নিয়ম আমার সংসারে নেই। রান্নাঘর সিনেমা-টিভির মতো করে সাজানোর থেকে তার খরচ কম হবে বলেই আমার মনে হয়।'

এরপর আর এ প্রসঙ্গ তোলার সাহস পায়নি শর্মিলা। শাশুড়ি মারা যাওয়ার পর সুপ্রতীককে কয়েকবার কথাটা বলেছিল। সে 'হচ্ছে, হবে' বলে চুপ করে গেছে। সেও প্রায় কয়েক বছর পার হয়ে গেল। এবার শর্মিলা নিজেই উদ্যোগ নিয়েছে। সপ্তাহখানেক আগে শ্বশুরমশাইকে গোপনে নিজের ইচ্ছে জানিয়েছে। বৃদ্ধ মানুষটা শুধু রাজি হননি, খুবই উৎসাহও দেখিয়েছেন। শুধু রান্নাঘর নয়, বাড়ির লোকদের যে-কোনও ধরনের ইচ্ছেতেই এই মানুষের বিরাট উৎসাহ। যত দিন যাচ্ছে উৎসাহের পরিমাণ বাড়ছে। নাতনিদের অ্যাকোরিয়ামের শখ তো নিজেই দু'জনকে নিয়ে হাতিবাগানে ছুটলেন গোল্ড ফিশ আনতে। শর্মিলা ছাদে গাছ করবে শুনে, টব আনলেন গাদাখানেক। সঙ্গে নয়নতারার চারা। সেই

চারার বেশিটাই গেল মরে। উনি বললেন, নো প্রবলেম। আরও আসবে। ছুটির দিনে ছেলে বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছে? কই বাত নেহি। সেদিন দোকান-বাজারের সব দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে একটা হইচই শুরু করে দিলেন। বাজারের সঙ্গে এল গরম জিলিপি। চন্দ্রাবলী-চন্দ্রাবতী গরম জিলিপি দিয়ে ব্রেকফাস্ট করতে গিয়ে হাতে মুখে রস মেখে একাকার কাণ্ড করল। মানুষটার এই হইচইয়ের অভ্যেস আজ থেকে নয়, গোড়া থেকেই দেখছে শর্মিলা। শাশুড়ি চোখ পাকিয়ে বলতেন, 'আদিখ্যেতা কোরো না তো।'

শর্মিলার মুখে সেদিন রান্নাঘরের কথা শুনে বললেন, 'বুঝলে বউমা, রান্নাঘর হল বাড়ির হার্ট। সে যেমন পাম্প করে গোটা বাড়ির শরীরে রক্ত সাপ্লাই করে, তেমন আবার সে হৃদয়ও বটে। খাবারে যত্ন, ভালবাসার ছোঁয়া লাগাতে জানে। রাঁধুনির মন খারাপের সময় কতবার যে রান্না পুড়ে গেছে আর রাগের সময় ঝাল পড়েছে বেশি তার ওপর যদি একটা সার্ভে হত... হা হা।'

শর্মিলা খুশি হয় আবার লজ্জাও পায়। হেসে বসে, 'মা বেঁচে থাকতে বলেছিলাম একবার।'

'তিনি প্রোপোসাল ঘ্যাচাং করে দিয়েছিলেন তো? জানি দেবেন। আরে বাবা, তোমার শাশুড়ির যুগ ছিল অন্যরকম। সে ছিল রান্নাঘরে বন্দি থাকার যুগ, আর তোমাদের যুগ হল আরেকরকম। রান্নাঘরে মুক্তির যুগ। কাজটা এতদিন যে কেন হয়নি, সেটাই আমার অবাক লাগছে।'

শর্মিলা অনুযোগের সুরে বলে, 'দেখুন না বাবা, আপনার ছেলেও তো বুঝতে চাইছে না। কতদিন ধরে বলছি।'

শ্বশুরমশাই চোখ পাকিয়ে বললেন, 'সুপ্রতীকের কথা বাদ দাও দেখি, তুমি বলদেওকে খবর পাঠিয়ে আজই প্ল্যান প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলো। রাজমিস্ত্রি হিসেবে বলদেও খারাপ নয়। খরচাপাতির হাতটা একটু বেশি। তবে ও নিয়ে চিন্তা কোরো না, আমি আছি।'

মানুষটাকে নিয়ে এই এক মুশকিল হয়েছে শর্মিলার। যে-কোনও কাজেই জমানো টাকা ফরফর করে বের করে দেন। সুপ্রতীক শুনলে রাগারাগি করে। শর্মিলা বলে, 'বাঃ, আমায় বলছ কেন? আমি কি চেয়েছি নাকি? উনি চিরকালই তো এরকম। মা বেঁচে থাকতে কম অশান্তি হয়েছে?'

বলদেওকে ডেকে ইতিমধ্যে দু' পর্যায়ে কথা হয়ে গেছে শর্মিলার। রাজমিস্ত্রির সঙ্গে কথা ফাইনাল হলে, আসবে কাঠের মিস্ত্রি। একদম শেষে ইলেকট্রিকের লোক। সবই ঠিক আছে, অসুবিধে হচ্ছে শুধু ঘরের সাইজ বড় করায়। রান্নাঘর বড় করতে হলে লিভিং ডাইনিং রুমের খানিকটা কেটে নিতে হবে। তা ছাড়া দেয়াল ভাঙলে বাড়ির খোলনলচেতে কোনও গোলমাল হয়ে যায় কিনা সেটাও দেখার। শর্মিলা অবশ্য এসব নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে না। ডিজাইন ফাইনাল হয়ে গেলে, শ্বশুরমশাইয়ের সঙ্গে বলদেওকে বসিয়ে দেবে। তবে শর্মিলার ইচ্ছে আগে একবার বলদেওকে টিভির প্রোগ্রাম দেখিয়ে দেওয়ার। ফটোর থেকে টিভি দেখলে আইডিয়া পরিষ্কার হবে।

বিরক্ত মুখে সুপ্রতীকের ফোন ধরেছিল শর্মিলা। এখন থমথমে মুখে বসে আছে। শুধু মুখ থমথমে নয়, চোখও ভেজা। ইচ্ছে করছে এখনই উঠে শ্বশুরমশাইয়ের ঘরে যায় এবং

জিজ্ঞেস করে ঘটনা সত্যি কি না? সত্যি হলে কেন সত্যি? তারা কী অন্যায় করেছে? কী অসুবিধে হচ্ছে তাঁর?

দুপুরে খাওয়ার পর মানুষটা নিজে একটু বিশ্রাম করেন। ঘরটা বাড়ির মধ্যে সবথেকে ভাল। দক্ষিণমুখো। জানলার কাছেই চাঁপা ফুলের গাছ ঝুঁকে আছে। গরমের সময় ফুলে ফুলে ভরে থাকে। স্ত্রীর মৃত্যুর পর, এই ঘর ছেড়ে দিতে চেয়েছিলেন। শর্মিলাকে ডেকে বলেছিলেন, 'এত বড় ঘরে আর দরকার কী? তুমি বরং এটাতে চলে এসো বউমা।'

শর্মিলা, সুপ্রতীক দু'জনেই কথাটা উড়িয়ে দেয়।

সুপ্রতীক টেলিফোনে বলেছে, 'তুমি হড়বড় করে বাবাকে কিছু বলতে যেয়ো না। আমি ফিরে যা বলার বলব।'

শর্মিলা চাপা গলায় ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'কেন? আমি বলব না কেন? আমি কী দোষ করলাম?'

'আহা, তোমার দোষের প্রশ্ন উঠছে কেন?' ওপাশ থেকে ফিসফিস করে বলল সুপ্রতীক।

কাঁদোকাঁদো গলায় শর্মিলা বলে, 'উঠছে না? সবাই তো আমার দিকেই আঙুল তুলবে। বলবে নিশ্চয় আমার সঙ্গে ঝগড়া করে... ছি ছি, এরপর মুখ দেখাতে পারব?'

সুপ্রতীক একটু চুপ করে থেকে বলে, 'তোমার সঙ্গে কিছু হয়নি তো শর্মিলা?'

'আমার সঙ্গে! আমার সঙ্গে কী হবে?' এবার সত্যি সত্যি চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ে শর্মিলার। বলে, 'তুমি এখনই বলতে শুরু করেছ!'

সুপ্রতীক গলা নরম করে বলে, 'আহা, ওভাবে কথাটা নিচ্ছ কেন? হয়তো ডাইরেক্ট কিছু হয়নি, ধরো, উনি তোমার কোনও কথায় দুঃখ পেয়েছেন অথবা কোনও আচরণে। তুমি বুঝতে পারোনি।'

'কী বুঝতে পারব না? খানিক আগেই তো কত গল্প করলাম, উনি ভাত খেতে বসেছিলেন। নাতনিদের নাচ-গান নিয়ে হাসাহাসি করলেন, কাল রাতদুপুর পর্যন্ত তোমার দুই মেয়ে নাকি জ্বালিয়ে মেরেছে। রেগে থাকলে কেউ অমন হাসাহাসি করতে পারে!'

'আচ্ছা, চন্দ্রাবলী-চন্দ্রাবতী কিছু করেনি?'

শর্মিলা এবার হিসহিসিয়ে উঠল। বলল, 'তোমার মাথা কি একেবারে গেছে? ক্লাস ফোরের দুটো মেয়ে কী করবে? আর যদি করেও থাকে, উনি একেবারে বাড়ি ছেড়ে...।'

সুপ্রতীক ফোনেই যেন নিজের মনে বলল, 'ঠিকই তো। তা-ই বা কী করে হবে? কিছুই বুঝতে পারছি না শর্মিলা। সব কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। কোনও কারণ নেই তবু... আমি নিজেও যে ওঁকে আঘাত দেওয়ার মতো কিছু বলেছি এমন তো নয়, সেদিন শুধু বললাম, অতবার দোকান বাজার ছুটো না বাবা। নাতনিরা রং পেনসিল চাইল, লজেন্স চকোলেট চাইল অমনি গায়ে পাঞ্জাবি চড়িয়ে ছুটলে, বয়স বাড়ছে না? তা হলে কী এমন ঘটল? যাক, আমি ফিরে দেখছি।'

শর্মিলা চোখ মুছে ফিসফিসিয়ে বলল, 'হ্যাঁগো, তোমার মামা কোনও পরামর্শ দেয়নি তো? ওর মাথায় কিন্তু নানারকম বদ মতলব খেলে।'

সুপ্রতীক বলল, 'খেপেছ! বাবা কারও পরামর্শ শুনে চলার মানুষ? তা ছাড়া পরামর্শ দিয়ে ওদের লাভ কী?'

'লাভ কিছু নয়, হিংসে। ছেলে, ছেলের বউ, নাতনিদের নিয়ে বুড়ো মানুষটা এমন সুন্দরভাবে মিলেমিশে আনন্দে রয়েছেন সেই দেখে হিংসে। ক'টা বাড়িতে এমন হয়?'

এত সমস্যাতেও সুপ্রতীক হেসে ফেলল, 'এটা বাড়াবাড়ি ধরনের ভাবনা হয়ে যাচ্ছে শর্মিলা। যাক, আমি তাড়াতাড়ি ফিরছি। ততক্ষণ তুমি কিছু বোলো না। হিতে বিপরীত হয়ে যাবে। জানোই তো বাবা একবার কোনও ডিসিশন নিয়ে ফেললে নড়চড় হয় না, তবে আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, আরও একটা জিনিস হতে পারে।'

'আবার কী?'

'শুনেছি সমাদ্দারটা নাকি আজকাল মিথ্যেও বলছে। নিচু গলার কারণে, মনটাও নিচু হয়ে গেছে। তাই যদি হয়...।'

এ প্রান্তে কপালে ডান হাত ঠেকিয়ে শর্মিলা বলল, 'তাই যেন হয় ঠাকুর, বানানোই যেন হয়।'

বিকেলে শ্বশুরমশাই ঘুম থেকে উঠলে রোজকার মতো শর্মিলা চা দিতে গেল। মন খারাপ হলে কী হবে, এই কাজে শর্মিলার কখনও গোলমাল হয় না। বরাবরই শর্মিলা চায়ের ব্যাপারে সতর্ক। বিছানায় আধশোয়া অবস্থাতে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে শ্বশুরমশাই হাসলেন।

'থ্যাঙ্কু। আমাদের বাড়ির নাচিয়ে গাইয়ে দুই ওস্তাদ স্কুল থেকে ফিরেছে নাকি?'

শর্মিলা অভিমানে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'এবার ফিরবে। আমি ওদের টিফিন করতে যাব।'

'শোনো শর্মিলা, আজ কিন্তু আমার একটা আবদার তোমায় রাখতে হবে।'

শর্মিলা ভুরু কোঁচকাল। অনুরোধ! অবাক গলায় বলল, 'বলুন।'

'আজ তোমাকে মেয়ে দুটোর জন্য লুচি ভাজতে হবে। শুধু ভাজলেই চলবে না, খেয়াল রাখতে হবে, লুচি যেন ফুলকো হয়। নাতনি দুটোকে কাল রাতে বলেছি, ওদের নাচগানে আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি, পুরস্কার হিসেবে আজ ফুলকো লুচি আর মণ্ডা মিঠাইয়ের ব্যবস্থা করা হবে। মিঠাইয়ের ব্যবস্থা আমি করব, কিন্তু লুচির জন্য তুমি ভরসা। হা হা।'

শর্মিলা চমকে ওঠে। এই চমৎকার মানুষটাই অমন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন! হতেই পারে না। কিছুতেই হতে পারে না। সুপ্রতীক নিশ্চয় কোথাও গোলমাল করছে। অফিসের লোক মজা করেননি তো? অফিসের সব লোক ভাল হয় না। তারা বিচ্ছিরি ধরনের ঠাট্টা করতে ভালবাসে। সুপ্রতীক যে বলেছিল, ওই সমাদ্দার না তালুকদার মিথ্যে কথা বলে? নিশ্চয় তাই হয়েছে। শর্মিলা কিছু একটা বলতে গিয়েও নিজেকে সামলাল। থাকুক, সুপ্রতীক কিছু বলতে বারণ করেছে।

'তোমার রান্নাঘর রেনোভেশনের কাজ এগোচ্ছে তো শর্মিলা? বলদেওকে আমার সঙ্গে একবার কথা বলতে বোলো দেখি। এতদিন পরে কাজটা যখন হচ্ছে ভাল করেই হওয়া দরকার।'

আলো কমে আসা বিকেলে ঘুপচি রান্নাঘর আরও অন্ধকার। ময়দা মাখতে মাখতে শর্মিলা নিশ্চিন্ত হল, সুপ্রতীকের খবর সত্যি নয়। এই চমৎকার মানুষটার কিচ্ছু হয়নি। রাগ অভিমান হলে লুচি, রান্নাঘরের কথা কেউ হাসতে হাসতে বলতে পারে? কখনওই নয়।

সুপ্রতীক ফিরে আসার পর যখন সে তার বাবাকে কথাটা বলবে, তখন যে খুব একচোট হাসাহাসি হবে তা এখনই বোঝা যাচ্ছে। গল্পটা শুনে মানুষটার মুখ কেমন হবে? ঘাবড়ে যাবেন? নাকি লজ্জা পাবেন? মনে হয় খুব জোরে একটা হাসি দেবেন। আচ্ছা, সে যদি সেইসময় নরমাল গলায় জিজ্ঞেস করে, 'বাবা, আপনি কোন সুটকেসটা নিয়ে যাবেন? জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করি?' এতে হাসি কি বাড়বে? মনে হয় বাড়বে। চন্দ্রাবলী-চন্দ্রাবতী পড়া ফেলে ছুটে এসে দাদুর ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং কিছু না জেনে তারাও হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়বে।

দৃশ্যটা ভেবে শর্মিলা নিজের মনেই হাসল।

দ্রুত টেনশন মুক্ত হতে হতে শর্মিলা সিদ্ধান্ত নিল, নতুন রান্নাঘরের একপাশে একটা ছোট্ট টিভি সেট রাখা হবে। এতে প্রোগ্রাম দেখতে দেখতে হাতেকলমে রান্না শিখতে সুবিধে হবে।

কলিং বেল পর্যন্ত হাত যায় না বলে, রোজই স্কুল থেকে ফিরে চন্দ্রাবতী এবং চন্দ্রাবলী প্রবল উৎসাহে দরজায় ধাক্কা মারে। যেন আজ স্কুলে তাদের দরজা ধাক্কা বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। দরজা খুলে শর্মিলা প্রথমেই জোর ধমক লাগায়। আজ লাগাল না। দরজা খুলে একগাল হেসে বলল, 'তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে নাও, তোমাদের দাদু তোমাদের জন্য লুচি-মণ্ডার ব্যবস্থা করেছে।'

সন্ধের মুখে মুখে চন্দ্রাবতী-চন্দ্রাবলী তাদের মায়ের কাছে এসে একটা মজার খবর বলতে বলতে হেসে কুটোপাটি খেতে লাগল। ধমক দেওয়ার পর জানা গেল, খানিক আগে তাদের দাদু নাকি মস্ত একটা সুটকেস নিয়ে খুব ঝামেলায় পড়েছিল। ঠেসে জামাকাপড় ভরার পর আর সুটকেস বন্ধ করতে পারে না! শেষ পর্যন্ত দুই বোন ওপরে বসে...

শর্মিলার মেজাজ ভাল নেই। চকোলেট কেক ঠিকমতো হয়নি। দুই মেয়েই টেস্ট করতে গিয়ে নাক কুঁচকেছে। এই হয়েছে এক ঝামেলা। নতুন রান্নাঘর মনের মতো হলেও, খাবারগুলো সবসময় মনের মতো হচ্ছে না। আজও হয়নি। আবার যে চেষ্টা করবে সে সময়ও নেই। বাইরে সবাই অপেক্ষা করছে। উত্তরপাড়া একেবারে কম পথ নয়। গঙ্গার ধারের বৃদ্ধাবাস পর্যন্ত পৌঁছাতে আরও খানিকটা যেতে হয়। সেই বাড়ির দোতলার গঙ্গামুখী বারান্দায় বসে আছেন এক বৃদ্ধ। আজ তাঁর জন্মদিন। তিনি ছেলেমানুষের মতো ছটফট করছেন। এত দেরি হচ্ছে কেন? কখন ওরা আসবে? নাতনিরা কখন 'হ্যাপি বার্থ ডে' বলে কেকের টুকরো মুখে তুলে দেবে?

বৃদ্ধাবাসের অনেকেই তাঁর এই ছটফটানি দেখে হাসাহাসি করছে। করুক। তাঁর কিছু এসে যায় না। আর কেউ না জানুক, তিনি তো আসল কথা জানেন। জীবনের বাকি দিনগুলো সংসারে থাকার জন্যই যে তিনি সংসার ছেড়েছেন। ঘরবাড়ির নকল সংসার নয়, সত্যিকারের সংসার।

সাপ্তাহিক বর্তমান, ২৪ জানুয়ারি ২০০৯

ব্যথা

শ্যামল সান্যাল দাঁতে দাঁত চেপে রইলেন। বাইরে থেকে কেউ যেন বুঝতে না পারে। খুব ভাল হত, ঠোঁটে যদি একটু হাসি আনা যেত। সেটা অসম্ভব। এই অবস্থায় হাসি আনা যায় না। অনেক বড় অভিনেতাও পারবে না। তবে যেভাবেই হোক লুকোতে হবে। ঘটনাটা জানাজানি হয়ে গেলে খুব লজ্জার হবে। ঘরে বাইরে কোথাও মুখ দেখানো যাবে না।

শ্যামলবাবু আবার ওপরের পাটির দাঁত দিয়ে নীচে চাপ দিলেন।

পঞ্চান্ন বছর বয়সে এটা সহজ কাজ নয়। ওপর-নীচ, সামনে-পিছনে সব জায়গার দাঁতই দুর্বল হয়ে পড়ছে। কোনওটা নড়ে, কোনওটা কাঁপে, কোনওটা মাঝেমধ্যে চড়াৎ-চড়াৎ করে শিরশিরানি মারে। চোয়ালের দুটোর অবস্থা তো ভয়াবহ! একেবারে ডেঞ্জার লাইনে দাঁড়িয়ে। যেন বাক্স-পেটরা গুছিয়ে তৈরি, যে-কোনও সময় রওনা দিলেই হল। এই কারণে খাওয়া-দাওয়াতেও সমস্যা। শক্ত কিছু মুখে দেওয়া যায় না। ছুটিছাটায় মাংস হলে এখন আর শুধু সিদ্ধ করলে চলে না, ডবল সিদ্ধ করতে হয়। এতে মাংস আর মাংস থাকে না। গলে, ঘেঁটে, বিতিকিচ্ছিরি একটা জিনিস হয়। খেতে বসে কাকলিদেবী রেগে যান। গজগজ করতে থাকেন।

'খাই তো ন'মাসে ছ'মাসে, তাও যদি এরকম হয় মুখে তুলতে ইচ্ছে করে না। মটন তো নয়, মনে হচ্ছে খিচুড়ি খাচ্ছি।'

শ্যামলবাবু ভাত মাখতে মাখতে নিচু গলায় বলেন, 'খারাপ কী? মাংসের খিচুড়ি তো খারাপ কিছু নয়। আমার ভাগলপুরের মামিমা ছিলেন খিচুড়ি স্পেশালিস্ট। মনে হয় খিচুড়ি নিয়ে গবেষণা করতেন। নিরামিষ, আমিষ— সবরকম। ওগরা, কাউন, ভুনি, ডালিয়া কত যে নাম সেসবের! একবার হল কী জানো কাকলি, পুজোর ছুটিতে ভাগলপুরে গিয়েছি...।'

কাকলিদেবী চাপা গলায় ধমক দিয়ে ওঠেন, 'চুপ, চুপ একদম।'

শ্যামলবাবু চুপ করে যান। মাথা নামিয়ে খেতে থাকেন ফের। এটা নতুন কিছু নয়। প্রতিবারই তিনি স্ত্রীর ধমকে চুপ করে যান। কাকলিদেবী বকছেন আর তিনি জোর গলায় প্রতিবাদ করছেন, এমন কখনও হয় না। সামান্য যেটুকু করেন সেগুলো একেবারেই মিনমিনে ধরনের আপত্তি। শুধু স্ত্রী নয়, মানুষটার ধরনই এরকম। ঝগড়া, ঝামেলা সহ্য করতে পারেন না। আসলে ছোটবেলা থেকেই এক-একজন এরকম হয়। এরা খেলার মাঠে গোলমাল হলে বন্ধুদের হাতে মার খেয়ে বাড়ি ফেরে। বড় হলে খেলার মাঠ থাকে না কিন্তু গোলমাল রয়ে যায়। তখনও এরা একইভাবে পালাতে যায়। কিন্তু পুরোটা পারে না। অন্য গোলমাল এসে যায়। গোলমাল থেকে পালানোর গোলমাল।

আজও হয়েছে। কাকলিদেবী সকাল থেকেই উত্তেজিত, 'কথাটা তোমাকে আর কতবার বলতে হবে?'

'কোন কথাটা?'

'এই যে, সবসময় চুপ করে থাকবে না, কিছু বলবে— এই কথাটা?'

শ্যামলবাবু শান্ত গলায় বললেন, 'তুমি তো জানো কাকলি আমি ওসব পারি না।'

'পারো না মানে! গালে একটা চড় মেরে চলে যাবে আর তুমি পারো না বলে চুপ করে বসে থাকবে?'

'চড়! কই গালে তো কেউ চড় মারেনি!'

কাকলিদেবীর গলায় উত্তেজনা বাড়ল। বললেন, 'মারেনি! মারতে বাকি রেখেছে কোথায়? বাড়িওয়ালার কাজের মেয়ে ঘর ঝাঁট দিয়ে দোতলা থেকে উঠোনে ময়লা ফেলছে। একদিন ফেলছে না, রোজ ফেলছে। বারণ করা সত্ত্বেও ফেলছে। এটা চড় নয়? অবশ্যই চড়। এক গালের বদলে দু'গালে চড়।'

'তুমি কি আমাকে বাড়িওয়ালার কাজের লোকের সঙ্গে ঝগড়া করতে বলছ?'

'বলিনি। তবে মনে হচ্ছে এবার বলতে হবে। যে-পুরুষমানুষ নিয়মিত ভাড়া দেওয়ার পরও বাড়িওয়ালাকে ধমক দিতে ভয় পায়, তার বাড়িওয়ালার কাজের লোকের সঙ্গেই ঝগড়া করা উচিত।'

'আস্তে বলো। সবাই শুনতে পাবে।'

কাকলিদেবী গলা নামিয়ে বললেন, 'শুনতে পেলে পাবে। আরও জোরে বলব। গলা ফাটিয়ে বলব। আমি জানি তাতেও তোমার টনক নড়বে না।'

শ্যামলবাবু খবরের কাগজটা মুখের কাছে তুলে বললেন, 'ও তুমি জোরে আস্তে যেভাবেই বলো, আমি ওসব পারব না।'

কাকলিদেবীর আগে রান্নাবান্নায় মন ছিল। বিয়ের প্রথম প্রথম, দিনের বেশি সময়টাই রান্নাঘরে কাটাতেন। এখন অনেক কমে গেছে। বছরখানেক আগে ছেলে চাকরি পেয়ে বহরমপুরে চলে যাওয়ার পর বাড়িতে খাওয়ার মানুষ বলতে মাত্র দু'জন। অত রান্না করে হবেটা কী? তার ওপর দু'জনেরই বয়স বাড়ছে। খাওয়া-দাওয়ায় হাজারগন্ডা বারণ। রান্নার মজাটাই নষ্ট হয়ে গেছে। তবে টানটা পুরো কাটেনি। সকাল আটটা বাজতে না বাজতে শোওয়ার ঘরের মেঝেতে আনাজপাতির ঝুড়ি, বঁটি, জলের বাটি সাজিয়ে বসেন। মাস কয়েক আগে পর্যন্ত রান্নাঘরেই বসতেন। গরম লাগে বলে কিছুদিন হল জায়গা বদলেছেন। তা ছাড়া আরও একটা সুবিধা আছে। এই সময়টা শ্যামলবাবু এ ঘরে বসে খবরের কাগজে চোখ বোলান। তরিতরকারি কাটতে কাটতে ঘর-সংসারের দু'-একটা জরুরি কথা বলে নেওয়া যায়। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় কাকলিদেবী বুঝেছেন, দিনের শুরুতেই সংসারের জরুরি কথা সেরে নেওয়া ভাল। এইসময় গলায় তেজ থাকে। বেলা যত বাড়তে থাকে সেই তেজ কমে আসে। সংসারের জরুরি কথা বলার সময় গলায় তেজ না থাকলে কথার কোনও দাম থাকে না।

বঁটিটাকে কাছে টেনে এনে কাকলিদেবী বললেন, 'পারবে না তো বুঝতেই পারছি। নইলে

ঘরে বাইরে তোমার এই অবস্থা হয়? অফিসে চারপাশে সবাই ফরফর করে প্রোমোশন পেয়ে এগিয়ে গেল, আর উনি এখনও সেই ক্লার্ক হয়েই বসে রইলেন। মা গো! আজকাল কাউকে ক্লার্ক বলা যায় নাকি?'

শ্যামলবাবু আরও শান্ত গলায় বললেন, 'সবাই সবকিছু পারে না।'

'চুপ, চুপ। সকালবেলা জ্ঞানের কথা শোনাতে এসো না। সবাই সবকিছু পারে না, আর তুমি কিছুই পারো না। একটা রিকশাওয়ালা পর্যন্ত চোখ রাঙিয়ে দু'টাকা বেশি নিয়ে চলে যায়।'

'দু'টাকা নয়, এক টাকা। তা ছাড়া সেদিন বৃষ্টি হয়েছিল। এক টাকার জন্য রিকশাওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া করব নাকি?'

'থাক, এক টাকা কেন, এক হাজার টাকা হলেও তুমি কিছু করতে না। করতে পারতে না। মাঝেমধ্যে মনে হয়, সব ছেড়ে-ছুড়ে পালাই। বহরমপুরে চন্দনের কাছে গিয়ে উঠি।'

শ্যামলবাবু নিচু গলায় বলেন, 'উঠবে কী করে? ছেলে নিজেই তো এখনও ঠিকমতো দাঁড়াতে পারেনি। পাঁচজনের সঙ্গে মেসে থাকে। মেসে গিয়ে উঠবে নাকি?'

'দরকার হলে তাই উঠব। মেসে গিয়েই উঠব। তোমার সঙ্গে থাকার চেয়ে ছেলের মেসে গিয়ে ওঠা ভাল। যে-ছেলের বাবা এরকম, তাকে আজীবন মেসেই থাকতে হবে। ছেলের জন্য জীবনে কী করেছ যে তার নিজের গাড়ি-বাড়ি আশা করো? খরচ করে পড়াতেও তো পারোনি। যেমন তেমন করে একটা বি কম পাশ। ওর একটা ভাল চাকরি-বাকরির জন্য কাউকে মুখ ফুটে বলেছ কখনও? এখন তো শুনি সবার ছেলে-মেয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি মাইনে পায়।'

'ওসব গল্প। মাইনের কাগজপত্র দেখাতে বলো, পালাবে।'

কাকলিদেবী আরও রেগে গেলেন। বললেন, 'হাবিজাবি বলে নিজের দোষ ঢেকো না। সব গল্প আর উনি বিরাট সত্যি এসেছেন! ছেলেটার বিয়ের কথা পর্যন্ত ভাবো না একবার। মেয়ে থাকলে আমার সর্বনাশ হত। সারাজীবন হয়তো আইবুড়োই হয়ে থাকত বেচারি। এরকম পুরুষমানুষকে কী বলে জানো?'

হাতে ধরা আলুটা ঘস করে বঁটিতে দু'ভাগ করলেন কাকলিদেবী। আলুর পেটে দাগ। ফেলে দিতে হবে। বাজার করতে গিয়ে ঠকে আসাটা তাঁর স্বামীর বেলায় নতুন কিছু নয়। এরকম বোকা মানুষকে লোকে ঠকাবে না তো কী করবে? বাজার তো আর মন্দির নয় যে 'আয় আয়' বলে বুকে জড়িয়ে ধরবে। তিনি মুখ তুলে কঠিন চোখে তাকালেন স্বামীর দিকে। শ্যামলবাবু সেই চোখ দেখেও না-দেখার ভান করে যত্ন করে খবরের কাগজটা ভাঁজ করলেন। তারপর উঠে পড়লেন চেয়ার ছেড়ে। স্নানে যেতে হবে। আজকাল অফিসে একটু দেরি হলেই সুখময় সামন্ত ঝামেলা করছে। যারা গলা ফাটিয়ে আর ইউনিয়ন ধরে ম্যানেজ করে রেখেছে তাদের কিছু হয় না। হবে কেন? বস্ হলেও সুখময় সামন্ত কী জিনিস অফিসের সবাই জানে। লোকটার অনেক গন্ডগোল। বড় বড় ফাইলের ঘুষের পয়সা ওর পকেট পর্যন্ত যায়। তারপর তো সাপ্লায়ার, কন্ট্রাক্টর সবাই আছে। তাই যে চোখ রাঙাতে পারে তার কাছেই কুঁকড়ে থাকে ব্যাটা। যত হম্বিতম্বি নরমদের ওপর।

কাকলিদেবী বললেন, 'কী হল বললে না তো?' দু'হাতে তখন আলুর টুকরো দুটো ধরা।

শ্যামলবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, 'কী বলব?'

'এই যে তোমার মতো পুরুষমানুষকে কী বলে— সেইটা বলবে।'

শ্যামলবাবু মৃদু স্বরে বললেন, 'আঃ কাকলি! যত দিন যাচ্ছে তুমি ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছ। আমাকে নিয়ে পড়লে আর থামতে চাও না। প্রেশারের ওষুধটা ঠিকমতো খাচ্ছ তো?'

কাকলিদেবী ফোঁস করে ওঠেন, 'তোমার মতো লোকেদের বলে ম্যাদামারা। ম্যাদামারা পুরুষমানুষ। সংসার সবরকম পুরুষমানুষ নিয়ে চলতে পারে। সাধু-লম্পট, চোর-ডাকাত, সবরকম। কিন্তু ম্যাদামারা পুরুষমানুষ নিয়ে চলতে পারে না। বুঝলে?'

তোয়ালে হাতে নিয়ে শ্যামলবাবু বাথরুমে ঢুকলেন। ঢুকতে ঢুকতে টের পেলেন ডান হাঁটুর কাছটা শিরশির করছে। এর অর্থ ব্যথাটা আবার আসছে। দ্রুত হাতে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন শ্যামলবাবু। অল্পক্ষণের মধ্যেই যন্ত্রণায় চোখ-মুখ কুঁচকে গেল মানুষটার।

ব্যথাটা কেমন যেন! অদ্ভুত। বেশিরভাগ সময়টাই ঘাপটি মেরে আছে। যেন গুঁড়িসুড়ি মেরে লুকিয়ে পড়েছে। হাড়ের পাশ বা পেশি-টেশির পিছনে কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে। কোনও কোনও সময় মনে হচ্ছে, সেরেই গেছে, আর হবে না। ঠিক তখনই মাথা-টাথা নেড়ে আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছে! যেন শিংওয়ালা বুনো মোষ! তেড়ে আসছে ঝোপের আড়াল থেকে। ঝনঝন করে উঠছে একেবারে। প্রথমে হাঁটু, তারপর হাঁটু ছাড়িয়ে গোটা পা। শেষ পর্যন্ত সেই ঝনঝনানি উঠছে কোমরের দিকে। বাপ রে। ভয়ংকর! তবে রক্ষে একটাই, বেশিক্ষণ নয়, বড়জোর তিরিশ কি চল্লিশ সেকেন্ডের। একটু কমও হতে পারে। কিন্তু ওইটুকুই মনে হচ্ছে অনেক। চোখ মুখ কুঁচকে যাচ্ছে যন্ত্রণায়। আর সেই যন্ত্রণা লুকোতেই এত কসরত। কখনও দাঁতে দাঁত চাপছেন শ্যামল সান্যাল। কখনও কামড়ে ধরছেন ঠোঁট। কখনও আবার হাতের মুঠি পাকিয়ে রাখছেন গায়ের জোরে। নিজেকে কষ্ট দিয়ে কষ্ট লুকোনোর নানা পথ খুঁজছেন। নইলে উপায় কী? কোনও উপায় নেই। চোখমুখে ব্যথার ছাপ পড়লে কেলেঙ্কারি। সবাই জানতে চাইবে কী হয়েছে?

মানুষ যেমন নানা ধরনের বাধা টপকে বড় হয়, তেমন অনেকরকম ব্যথাও পেরোতে হয়। শ্যামলবাবুকেও হয়েছে। মচকে যাওয়া, ধাক্কা লাগা, গর্তে পড়া তো আছেই, একবার হাত পর্যন্ত ভেঙেছিল। তখন কোন ক্লাসে পড়ছেন? সেভেন না এইটের শেষ? ক্লাস মনে না থাকলেও ঘটনা মনে আছে। প্রথম ভাঙা বলেই মনে আছে। সাধারণত জীবনের প্রথম ভাঙা এবং প্রথম জোড়া দুটোই মনে থাকে। স্কুলে টিফিনের সময় বন্ধুদের ধাক্কায় পড়েছিলেন শানবাঁধানো বারান্দায়। মিনিট তিন-চারের মধ্যে বাঁ হাতের কবজির ওপরটা ফুলে ঢোল। একুশ দিনের প্লাস্টার। ব্যথার নিয়ম হল, ব্যথার সঙ্গে ব্যথা ছাড়াও আরও একটু কিছু থাকবে। রাগ, দুঃখ, বিরক্তি বা অভিমান। সেদিন হাত ভাঙায় শ্যামলবাবুর কষ্ট যত না হয়েছিল, অভিমান হয়েছিল বেশি। বন্ধুদের ওপর অভিমান। ওরা কেন ধাক্কা দিল? আর আজ এই প্রায় বুড়ো বয়সের ব্যথায় শ্যামলবাবুর লজ্জা করছে। খুব লজ্জা করছে। সেইজন্যই লুকোনোর এত চেষ্টা।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত লুকোনো গেল না!

দুই

কাকলিদেবী ফিসফিস করে বললেন, 'ছি ছি।'

শ্যামলবাবুর দুটো চোখই বন্ধ। যন্ত্রণায় চোখের পাতা এবং ভুরু কুঁচকে আছে। কপালে ঘাম জমছে। ডান পায়ের হাঁটু চেপে ধরে তিনি বসে আছেন খাটের মাঝখানে। অন্ধকারে মনে হচ্ছে মানুষটা বুঝি ধনুকের মতো বেঁকে গেছে।

কাকলিদেবী খাট থেকে নামলেন। আলো জ্বালিয়ে ফিরে এলেন আবার। এখন কত রাত? দেওয়াল ঘড়িটা টিভির মাথায় ঝোলানো। আগে ছিল দরজার ওপর। বছরখানেক হল কাকলিদেবী সরিয়ে এনেছেন। টিভির মাথায় ঘড়ি থাকা দরকার। সময় দেখে চ্যানেল ঘোরাতে হয়। এক-একটা সময় এক-একটা চ্যানেলে প্রোগ্রাম। তবে সেই ঘড়ি এখন বন্ধ। কাল বিকেলে চারটে বাজার পর থেকেই থেমে আছে। ব্যাটারি ফুরিয়েছে। বন্ধ ঘড়ির দিকে চোখ পড়তে কাকলিদেবী আরও বিরক্ত হলেন। প্রতিবারই এই কাণ্ড হয়। ব্যাটারি ফুরিয়ে ঘড়িটা পড়ে থাকে দু'দিন, তিনদিন, এমনকী চারদিনও। মেয়েমানুষ তো আর টুলে উঠে ঘড়ির ব্যাটারি বদলাতে পারে না।

বিরক্ত কাকলিদেবী আবার বললেন, 'ছি ছি। কী কাণ্ড!'

মিনিটখানেক একইভাবে চুপ করে বসে থাকার পর শ্যামলবাবু সোজা হয়ে চোখ খুললেন। ঝনঝনানি কমছে। নিচু গলায় বললেন, 'আমাকে ছি ছি বলছ কেন? আমি কী করলাম?'

কাকলিদেবী চোখ কপালে তুলে বললেন, 'ওমা, বলব না! এই বয়সে পুলিশের লাঠি খেয়েছ, ছি ছি করব না তো কি মেডেল দেব?'

'আমি কি ইচ্ছে করে খেয়েছি?'

'পুলিশের মার কেউ ইচ্ছে করে খায় না। তুমি একটা চোর-ডাকাত দেখাও তো যে থানায় গিয়ে মারুন বলে পিঠ পেতে দিয়েছে।' কাকলিদেবী স্বামীর পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'দেখি কোন জায়গাটায় মেরেছে। ফুলেছে নাকি?'

'মেরেছে বলছ কেন?'

'তা হলে কী বলব, আদর করেছে? রাতদুপুরে ঘুম থেকে তুলে ঢঙ কোরো না। দাও দেখি, পা-টা এদিকে দাও। সেঁক দেব?'

শ্যামলবাবু চাপা গলায় বললেন, 'এইজন্যই এতদিন বলিনি। জানতাম তোমরা বিষয়টাকে একটা হাসি-তামাশায় নিয়ে যাবে।'

কাকলিদেবী গজগজ করে বললেন, 'বলোনি ভালই করেছ, লাঠির বাড়ি এমন ব্যাপার নয় যে ঢাক পিটিয়ে বলতে হবে।'

কথা শেষ করে কাকলিদেবী ফের হাত বাড়ালেন। শ্যামলবাবু পা সরিয়ে নিলেন। ব্যথাটা আবার চলে গেছে। খাটের ওপর পা লম্বা করে পরীক্ষা করলেন। না, নেই। যথারীতি ভ্যানিশ। কে বলবে খানিক আগেই টাটিয়ে উঠেছিল? উফ, একেবারে ঘুম ভাঙিয়ে ছেড়েছে! ঘটনাটার তিনদিন হয়ে গেছে কিন্তু এতটা কখনও হয়নি। এতদিন যে ঝনঝনানি

কোমর পর্যন্ত উঠেছিল, আজ ঘুমের মধ্যে মনে হল সেটা একেবারে মাথা পর্যন্ত গেছে! ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে বসলেন শ্যামলবাবু। পাশে কাকলি শুয়ে। ওর ঘুমটা পাতলা। সামান্য আওয়াজেই উঠে পড়ে। অন্ধকার খাটে বসেই শ্যামলবাবু ব্যথা সামলানোর চেষ্টা করলেন। ভেতরে বড় কোনও ক্ষতি হয়ে যায়নি তো? যদি টিস্যু বা নার্ভ-টার্ভ ছিঁড়ে থাকে? কে জানে ছোট কোনও হাড়ে হয়তো চিড় ধরেছে। পুলিশের লাঠিতে কী হয়? হেমারেজ হয় কি? রক্তক্ষরণ? রক্তক্ষরণ অতি মারাত্মক জিনিস। বিশেষ করে নিঃশব্দে হলে তো কথাই নেই। যন্ত্রণার মধ্যেই হুড়মুড় করে এসব মাথায় এল। আর তখনই শ্যামলবাবু ভয় পেলেন। খুব ভয়। হাত বাড়িয়ে স্ত্রীকে ধাক্কা দিলেন।

'শুনছ, এই যে শুনছ। ওঠো একবার। তাড়াতাড়ি ওঠো।'

কাকলিদেবী চোখ খোলেন। উঠে বসে উদ্বিগ্ন গলায় বললেন, 'কী হল? কী হয়েছে?'

'ব্যথা করছে। ভীষণ ব্যথা করছে।' অস্ফুটে বললেন শ্যামলবাবু।

কাকলিদেবী ঝুঁকে পড়লেন। একটা হাত স্বামীর বুকে রেখে ঘুমজড়ানো আতঙ্কিত গলায় বললেন, 'ব্যথা! বুকে?'

এই আতঙ্ক স্বাভাবিক। এই বয়সে মাঝরাতে ব্যথা শুনলে প্রথমে বুকের কথাই মাথায় আসে। শ্যামলবাবু কাতর ভঙ্গিতে বললেন, 'না না, বুকে নয়, পায়ে। তুমি উঠে আগে আলোটা জ্বালাও। জল দাও একটু।'

'পায়ে! কোথায় পড়েছিলে?'

'উফ! এই যে ডান পায়ে, হাঁটুর পিছনে। কোথাও পড়িনি। পুলিশের লাঠি লেগেছে।'

খাট থেকে নামতে গিয়েও থমকে যান কাকলিদেবী। লাঠি! পুলিশের লাঠি! এই মানুষটাকে পুলিশ মেরেছে! ঠিক শুনলেন তো? মনে হয় না ঠিক শুনলেন। তাঁর স্বামী চোর-ডাকাত নয়। পার্টিবাজি করে না। কোনও সাতে-পাঁচেই নেই। ভিতু, গোবেচারা বোকা ধরনের ভদ্রলোক। তাকে খামোকা পুলিশ মারতে যাবে কেন?

'কী বললে?'

শ্যামলবাবু এবার একটু বিরক্ত হন। বললেন, 'কিছু বলিনি। বললাম, পায়ে পুলিশের লাঠি লেগেছিল। তিনদিন হয়ে গেছে। তারপর থেকে বাজে একটা ব্যথা হচ্ছে। ব্যথাটা আজ হঠাৎ বেড়েছে, ঘুম ভেঙে গেল তাই তোমায় ডাকলাম।'

আলো জ্বালিয়ে এসে কাকলিদেবী টেবিলে রাখা জাগ থেকে গ্লাসে জল ঢাললেন। স্বামীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'ছিঃ, এ আবার কী কাণ্ড? কোনও ভদ্রলোক পুলিশের হাতে মার খায় নাকি? আমি তো বাপু পুলিশের মার খাওয়া মানুষ কখনও দেখিনি। ওই যা কাগজে-টাগজে পড়ি। এমা!'

শ্যামলবাবু এক চুমুকে জল শেষ করলেন। এই ভয়টাই করছিলেন। ঘটনাটা জানাজানি হলে একটা লজ্জার ব্যাপার হবে। কাকলির কথাটা মিথ্যে নয়। পুলিশের পিটুনি খাওয়া লোকজন তো আর চারপাশে ঘুরে বেড়ায় না। যদিও তিনি মার খাননি। কিন্তু সেকথা কে বিশ্বাস করবে? বালিশটা পিঠের কাছে দিয়ে শ্যামলবাবু আধশোয়া হয়ে বসলেন।

'হট ওয়াটার ব্যাগ দেব? মলম-টলম কিছু দিলে পারতে তো।'

কাকলিদেবীর গলা খানিকটা নরম হয়েছে। হওয়াই উচিত। ঘটনা যতই লজ্জার হোক, স্বামীর ব্যথা তো।

'না, থাক। কমে গেছে। এখন আর নেই।'

'এখন নেই, কিন্তু আবার হতে কতক্ষণ?'

'সেটাই তো মুশকিল। হঠাৎ হঠাৎ চাড়া দিচ্ছে।'

কাকলিদেবীর গলায় উদ্বেগ, 'সে আবার কী গো! হঠাৎ ব্যথা কিন্তু ভাল নয়।'

শ্যামলবাবু হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে শুকনো হাসলেন। বললেন, 'ব্যথার আবার ভাল-মন্দ কী কাকলি?'

কাকলিদেবী সরে এসে স্বামীর ডান হাঁটুর ওপর হাত রাখলেন। বোলাতে বোলাতে বললেন, 'অত জানি না। ছোটকুর বাবার এরকম হত। হঠাৎ হঠাৎ ফিক ব্যথার মতো। এমনি সময় ঠিক, কিন্তু শুরু হলে এমন কষ্ট যে, বুড়ো মানুষটা একেবারে মাটিতে বসে পড়ত। একবার বাজারে গিয়েও হল। মাছ কাটা বঁটির ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আর কী।'

শ্যামলবাবু আনমনে বললেন, 'ওটা পেট। পেট-আর পা এক জিনিস নয়।'

কাকলিদেবী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'ওই একই হল। রাতদুপুরে তক্কো কোরো না। এমন একটা করছ যেন পুলিশ তোমাকে মারেনি, আমায় মেরেছে।'

শ্যামলবাবু নিচু গলায় বললেন, 'তুমি একই কথা বারবার বলছ কেন? বলছি তো পুলিশ আমাকে মারেনি। ঘটনাটা শুনলেই বুঝতে পারবে। বুধবার অফিস যাওয়ার সময় শিয়ালদা ফ্লাইওভারের মুখটায় বাসটা দাঁড়িয়ে পড়ল। আর যাবে না। কী ব্যাপার, না সামনে গোলমাল। রোড ব্লকড। রাস্তা আটকে কারা বসে পড়েছে।'

কাকলিদেবী বললেন, 'কেন? বসে পড়েছে কেন?'

'সে তো আমি বলতে পারব না। আমি তো বসিনি। যারা বসেছে তারা বলতে পারবে। আজকাল যে-কোনও কারণে মানুষ রাস্তায় বসে পড়ে। তুমি তো আর রাস্তায় বের হও না। বেরোলে জানতে। অ্যাকাউন্টসের সন্তোষ সেদিন বলছিল, গেল রোববার ওদের ওখানে শাশুড়ির সঙ্গে ঝগড়া করে কোন বাড়ির বউ নাকি দুই ছেলের হাত ধরে যাদবপুরের মোড়ে গিয়ে বসে পড়েছিল। গাড়ি-টাড়ি আটকে সে এক একাকার কাণ্ড।'

'ঠিক আছে, তোমার কী হল বলো।'

'কী আর হবে, খানিকটা অপেক্ষা করে সবাই বাস থেকে নেমে পড়ল। আমিও নামলাম। অফিসে লেট হয়ে গেছে। বসে সময় নষ্ট করার মতো অবস্থা নেই। ঠিক করলাম হেঁটেই যাব। বাস থেকে নেমে দেখি রাস্তায় খুব ভিড়। গাড়ি-টাড়ি সব দাঁড়িয়ে। কাতারে কাতারে মানুষ। আমি ফুটপাথ বদলে তাড়াতাড়ি হাঁটা দিলাম।'

'কোনদিকে হাঁটলে?'

শ্যামলবাবু দুটো পা সামনের দিকে মেলে দিলেন। কাকলিদেবী ডান হাঁটুর তলায় একটা বালিশ দিয়েছেন। লজ্জার ঘটনা বলতে এখন আর ততটা খারাপ লাগছে না শ্যামলবাবুর। বরং একটা স্বীকারোক্তির মতো মনে হচ্ছে। কে জানে, হয়তো লজ্জার কথা বলে ফেলার মধ্যে স্বস্তির ব্যাপারও থাকে।

'কোনদিকে আবার? ভাবলাম একটু এগিয়ে ডানদিকের গলি ধরে পালাব। আসলে ওইদিকের ফুটপাথটা নর্মাল ছিল। শান্ত, স্বাভাবিক। লোকটোক হাঁটছিল। দু'-একটা হকার বসে আছে। সত্যি কথা বলতে কী, ঝামেলা নেই দেখেই আমি ওদিকে গেলাম। খানিকটা এগোলামও, অসুবিধে হল না। তারপই হঠাৎ...।' শ্যামলবাবু থামলেন।

কাকলিদেবী উৎকণ্ঠা নিয়ে বললেন, 'হঠাৎ কী? কী হঠাৎ?'

শ্যামলবাবু স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হঠাৎ শুনি একটা হইহই। দেখি উলটোদিক থেকে লোকজন ছুটে আসছে। পুরুষ মহিলা সবাই, বাচ্চারাও আছে। কী করব বুঝতে পারছি না। দেখি কোথা থেকে যেন ইটের টুকরো উড়ে আসছে। বড় নয়, ছোট ছোট ইটের টুকরো। আমি হাতের ব্যাগটা তুলে মাথা বাঁচাতে চেষ্টা করলাম। হকাররা তখন পড়িমড়ি করে জিনিস গোটাচ্ছে। কারা যেন চিৎকার করে বলল, 'লাঠি! লাঠি! লাঠি চালাচ্ছে পুলিশ।' এই পর্যন্ত বলে দম নিতে একটু থামলেন শ্যামলবাবু। ফের শুরু করলেন, 'কাকলি, তুমি তো জানো আমি আগে কখনও এরকম অবস্থায় পড়িনি। এরকম কেন? এর সিকি গোলমালেও থাকি না। ঘটনায় এতটাই নার্ভাস হয়ে গেলাম যে পিছন ফিরে পালাতেও ভুলে গেছি। সত্যি কথা বলতে কী এই অবস্থায় যে পালাতে হয়, সেটাও যেন মাথা থেকে উবে গেছে! যখন সংবিৎ ফিরল ততক্ষণে ঘাড়ের কাছে লাঠি উঁচিয়ে পুলিশ চলে এসেছে।' শ্যামলবাবু আবার থামলেন। পায়ের দিকে তাকালেন। বড় রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলার আওয়াজ এল। তার মানে ভোর হতে খুব বেশি দেরি নেই। শেষরাতে দু'-একটা করে ট্রাক ছাড়ে।

কাকলিদেবী শাড়ির আঁচল মুখে চেপে বসে আছেন। সেই অবস্থায় বললেন, 'তারপর কী হল? ওরা তোমাকে মারল?'

'মারল। তবে ইচ্ছে করে মারল এমন নয়। মিথ্যে বলব না। মিথ্যে বলাটা ঠিক হবে না। নিশ্চয় আমাকে দেখে বুঝতে পেরেছিল।'

'কী বুঝতে পেরেছিল?'

'কী পেরেছিল তা জানি না। তবে পুলিশ সব বুঝতে পারে। একটা বয়স্ক মানুষ, হাতে অফিসের ব্যাগ, ফুটপাথ দিয়ে চুপচাপ হাঁটছে। লোকটা যে সাতে-পাঁচে নেই, ওরা বুঝতে পারবে না? এটা তুমি কী বলছ কাকলি? নিশ্চয় পেরেছিল। তবে এলোপাথাড়ি চালাতে গিয়ে লাঠির একটা বাড়ি আমার পায়ের পিছনে এসে লাগল। এই যে এখানে। ওদের কোনও দোষ নেই। ওই একটাই যথেষ্ট। আমি ছিটকে পাশের সরু গলিতে ঢুকে গেলাম। ব্যথা তখনও বুঝতে পারিনি। বুঝতে পারলাম বিকেলে, অফিস ছুটির পর। ট্রামে ওঠার সময় ঝনঝন করে উঠল।'

কাকলিদেবী নরম গলায় বললেন, 'তোমার আগেই বলা উচিত ছিল।'

শ্যামলবাবু এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। তারপর অস্ফুটে বললেন, 'কেমন যেন একটা অস্বস্তি হচ্ছিল কাকলি। যতই হোক পুলিশের লাঠি। কীভাবে নেবে... এই তো খানিক আগে তুমিও বলছিলে। বলছিলে না?'

কাকলিদেবী গলায় জোর এনে বললেন, 'বলব না তো কী করব? বাপের জন্মে লাঠি

খাওয়া কাউকে এত কাছ থেকে দেখেছি নাকি? এখন একেবারে পাশে শুয়ে আছে! বাপ রে! যাক, কালই ডাক্তারের কাছে যাবে।'

শ্যামলবাবু খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, 'ভেবেছিলাম ডাক্তার লাগবে না, এমনিই ঠিক হয়ে যাবে। এখন বুঝতে পারছি, লাগবে। নাও আলোটা নেভাও। দেখি একটু যদি ঘুমোতে পারি। সকাল তো হয়েই এল।'

রাত-জাগা ঘুম ভাল নয়। ভাঙা ভাঙা ঘুমের ভেতর বিদঘুটে স্বপ্ন আসে। শ্যামলবাবুর বেলাতেও এল। সেই স্বপ্ন যেন বেশি বিদঘুটে। দেখলেন, টিভিতে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন তিনি। মোটা মোটা হাতলের সোফা। হাতে চায়ের কাপ। উলটোদিকে কম বয়সের একটা মেয়ে। মেয়েটার স্কার্ট শেষ হয়েছে উরুর ওপরে। পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছে সিনেমার নায়িকার মতো। জামাও গোলমেলে। সামান্য ঝুঁকলেই বুকের অনেকটা বেরিয়ে আসে। শ্যামলবাবু চোখ সরিয়ে নিলেন। একগাল হেসে ন্যাকা-ন্যাকা গলায় সেই মেয়ে বকবক শুরু করল।

'সুধী দর্শকমণ্ডলী, শুভসন্ধ্যা। আজ আপনাদের সামনে এমন একজন মানুষকে আমরা উপস্থিত করতে পেরেছি যাঁকে মাত্র তিনদিন আগে পুলিশ মেরেছে। লাঠি মেরেছে ডান পায়ে। আপনারা জানেন, এ ধরনের কৃতী মানুষরা খুবই লাজুক প্রকৃতির হন। এঁরা কিছুতেই মিডিয়ার সামনে আসতে চান না। থাকেন অধরা। কিন্তু শ্যামল সান্যাল রাজি হয়েছেন। আমাদের অনেক অনুরোধের পর স্টুডিয়োতে এসেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ। তাঁকে অভিনন্দন। শ্যামলবাবু আজ আপনাদের কাছে তাঁর লাঠি খাওয়ার অভিজ্ঞতার কথা বলবেন। শুধু তাই নয়, উনি কথা দিয়েছেন ব্রেকের পর আমাদের একটা আবৃত্তিও শোনাবেন। আমরা তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তবে সবকিছুর আগে আমি অনুরোধ করব, উনি যেন দর্শকদের তাঁর লাঠি খাওয়া পা-টা একবার তুলে দেখান। স্যার এই যে, এইদিকে ক্যামেরা... আপনি সবাইকে পা তুলে দেখান। লজ্জার কিছু নেই...।'

শ্যামলবাবু পা তুলতে যান এবং ঘুম ভেঙে যায়।

তিন

ঝন্টু এসে চোখ নাচিয়ে বলল, 'সাহেব আপনাকে ডাকে।'

অফিসে বসের পিয়নরা সাধারণত একটু রাশভারী ধরনের হয়। কম কথা বলে, কম হাসে। সম্ভবত দীর্ঘক্ষণ বসের কাছাকাছি থাকার ফলে তাদের মধ্যেও একটা 'বস বস' ভাব আসে। ঝন্টু সেরকম নয়। বসের পিয়ন হওয়া সত্ত্বেও সে ফাজিল প্রকৃতির ছেলে। শ্যামল সান্যালের সামনে দাঁড়িয়ে শুধু চোখ নাচাল না, মুচকি মুচকি হাসলও।

ফাইল, কাগজপত্র টেবিলে ছড়ানো। শ্যামলবাবু দ্রুত হাতে সেগুলো গোছাতে থাকেন। সুখময় সামন্ত কেন ডাকছে তিনি জানেন। লেটের জন্য কথা শোনাবে। মাসের মধ্যে তিনদিনের বেশি যাদের লেট হয় তাদের বসের ঘরে ডেকে কথা শোনানো হয়। অবশ্য

সবাইকে নয়, যাদের হাঁকডাক, ইউনিয়ন, স্লোগান, চোখ রাঙানি নেই শুধু তাদের। ঘরে ডাকার পর খানিকটা সময় দেখতে না পাওয়ার ভান করে সুখময়। এই মিনিটখানেকের মতো। মাথা নামিয়ে কাগজপত্রে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তারপর মুখ তুলে ঠান্ডা গলায় বলে, 'রোজ রোজ লেট না করে এক কাজ করুন, ক'টা দিন বরং ছুটি নিয়ে নিন। এই সপ্তাহখানেক ধরুন। দশদিনও নিতে পারেন। চিন্তা করবেন না স্পেশাল লিভ করে দেব।'

'বাড়িতে স্যার মিস্ত্রি লেগেছে। বোঝেনই তো স্যার মিস্ত্রি কী জিনিস। সকাল আটটায় আসব বলে দশটা বাজিয়ে ছাড়ল।'

'আহা, বুঝি সব, সবই বুঝি। সেইজন্যই তো ছুটির অ্যাডভাইস করছি। সেরকম হলে ছুটি নিয়ে মিস্ত্রির সঙ্গে কাজেও নেমে পড়তে পারবেন। বিদেশে তো এই সিস্টেম। সবাই মিলে বাড়ি রং করে। কে মালিক, কে মজুর বোঝা যায় না। কাজের সময় সব সমান।'

শ্যামলবাবু বসের ঘরে ঢোকার সময় 'কথা শোনা'র জন্য প্রস্তুত হলেন। আজ মনে হচ্ছে 'কথা শোনা'র চেয়েও বেশি কিছু হবে। কারণ বেশ দেরি হয়েছে। সকালে ঘুম ভাঙল অনেকটা পরে। সম্ভবত ডাক্তারবাবুর ব্যথার ওষুধে ঘুমের কিছু ছিল। আবার নাও হতে পারে। ডাক্তার দেখানোর কারণে হয়তো মনটা হালকা লাগছিল। মন হালকা হলে ঘুম ভারী হয়।

পুলিশের লাঠি শুনে ডাক্তারবাবু প্রথমটায় থতমত খেয়ে যান। বয়স্ক মানুষ। বাঁ হাতে চোখের চশমাটা খুলে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়লেন। বললেন, 'কী বললেন? লাঠি!'

শ্যামলবাবু গলা নামিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ডাক্তারবাবু, লাঠি। পুলিশ লাঠি মেরেছে। তবে অনেক মারেনি, মাত্র একটা ঘা দিয়েছে। ওনলি ওয়ান। অফিস যাওয়ার সময় গোলমালে পড়েছিলাম।'

কথাটা বলে শ্যামলবাবু ডাক্তারের দিকে চেয়ে হাসলেন। বোকার মতো হাসি।

কাকলিদেবীও সঙ্গে আসতে চেয়েছিলেন। শ্যামলবাবুই আটকেছেন। বললেন, 'তুমি গিয়ে কী করবে? আমি অফিস থেকে ফেরার পথে একেবারে ডাক্তারের চেম্বার হয়ে আসব।'

'আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

'সন্দেহ! সন্দেহ কীসের?'

'আমার মনে হচ্ছে তুমি ডাক্তারকে লাঠির কথাটা বলবে না। লুকোবে। সেই কারণেই আমার যাওয়া দরকার।'

শ্যামলবাবু মুখ তুলে স্ত্রীর দিকে তাকালেন। বললেন, 'খেপেছ? সব বলব।'

কাকলিদেবী স্বামীর ব্যাগে টিফিনবাক্স পুরে দিতে দিতে বললেন, 'তাই বলবে। উকিল আর ডাক্তারের কাছে কিছু লুকোতে নেই। ঘটনা খুব লজ্জার হলেও নয়।'

কাকলিদেবীর সন্দেহ মিথ্যে নয়। শ্যামলবাবু ভেবে রেখেছিলেন আসল কথা চেপে যাবেন। বানিয়ে অন্য কিছু বলবেন। বাস থেকে নামতে গিয়ে লেগেছে, বাজারে পা হড়কেছে ধরনের কিছু। ব্যথা ব্যথাই। ব্যথার ওষুধের গায়ে তো আর 'বাস থেকে পড়া', 'বাজারে পা হড়কানো' বা 'পুলিশের লাঠি' লেখা থাকে না। এই ঘটনার কথা যত চেপে যাওয়া যায় ততই

ভাল। অফিসে বসে শ্যামলবাবু মনে মনে 'বাসে লাগা'র গল্পটা ফাইনাল করেন। কিন্তু সন্ধ্যায় ডাক্তারের সামনে বসে কী যেন হল। মুখ থেকে ফস করে লাঠির কথাটা বেরিয়ে পড়ল! বলেই বুঝতে পারলেন, কাজটা ঠিক হল না। কম্পাউন্ডার ছোকরাটা ঘরে ঘুরঘুর করছিল। লাঠি শুনে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকিয়েছে। ব্যাটা শুনতে পেল নাকি? শ্যামলবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, 'মনে হয় ওরা ঠিক বুঝতে পারেনি ডাক্তারবাবু।'

চশমা চোখে দিয়ে ডাক্তারবাবু উঠে দাঁড়ালেন। দুটো ভুরুই কোঁচকানো। ঠোঁটের কোণে একচিলতে হাসির মতো। হাসি কি? ঘরের কোণে রাখা একফালি শোওয়ার জায়গাটা দেখিয়ে বললেন, 'নিন, শুয়ে পড়ুন। কারা বুঝতে পারেনি?'

শ্যামলবাবু শুয়ে পড়তে পড়তে বললেন, 'পুলিশ। পুলিশ বুঝতে পারেনি। পাবলিকের ব্যাপার তো, কে ভাল, কে মন্দ বোঝা যায় না। যাকে সামনে পেয়েছে তাকেই...। এই যে ডাক্তারবাবু এই পায়ে, এখানে, হাঁটুর পিছনে।'

ডাক্তারবাবু পা পরীক্ষা করতে করতে গম্ভীর গলায় বললেন, 'ফালতু ঝামেলায় যান কেন? সরে যেতে পারলেন না?'

শ্যামলবাবু উৎসাহ নিয়ে বললেন, 'যেতাম ডাক্তারবাবু, ঠিকই সরে যেতাম। কিন্তু ভিড়ে আটকে গেলাম। তার ওপর অফিসের লেট হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে মাথাটা যেন কাজ করল না। আর মিনিটখানেক হলেই সামনের গলিটায় ঢুকে যেতাম।'

পা পরীক্ষার পর টেবিলে ফিরে খসখস করে প্রেসক্রিপশন লিখলেন ডাক্তারবাবু। বললেন, 'নিন, দুটো ওষুধ দিলাম। সঙ্গে ভিটামিন। দিন কয়েক খান। পেন না কমলে একটা এক্স-রে করাব। তবে মনে হচ্ছে না দরকার হবে।'

'ভয়ের কিছু নেই তো? এমন ঝনঝন করে উঠছে... তাও সবসময় নয়। এক-এক সময়। কাল রাতে তো খুব ভয় পেয়ে গেলাম। হেমারেজ-টেমারেজ যদি কিছু হয়।'

ডাক্তারবাবু এতক্ষণ পর একটু হাসলেন। বললেন, 'চিন্তা করবেন না। দেখে তো ভয়ের কিছু মনে হল না। আসলে কী জানেন, পুলিশের লাঠির ট্রিটমেন্ট আমি আগে কখনও করিনি। ইনফ্যাক্ট ডাক্তারিতে তো আলাদা করে কিছু নেই। তবে যখন ছাত্র ছিলাম হাসপাতালে এ ধরনের কেস এলে বন্ধুরা মজা করে বলত পুলিশ নাকি মারবার সময় লাঠিতে একটা স্পিন ছাড়ে। চক্করের মতো। হাত, পা, পিঠের নার্ভ সেই চক্কর ক্যারি করে মাথা পর্যন্ত নিয়ে যায়। তখন মাথায় সমস্যা হয়। সেই কারণে ট্রিটমেন্ট স্যুড স্টার্ট ফ্রম দ্য ব্রেন। আগে মাথায় চিকিৎসা, তারপর ব্যথার। ওসব ছিল ঠাট্টা। আপনি চিন্তা করবেন না। ইফ অ্যাম নট রং, মনে হচ্ছে, দিন কয়েকের মামলা।'

ডাক্তারের হাসি যে-কোনও রুগির পক্ষেই গুরুত্বপূর্ণ। হাসি অল্প হলেই হয়। শ্যামলবাবু গদগদ মুখে বললেন, 'ডাক্তারবাবু, বেশি করে জল খাব? ছেলেবেলায় মা বলতেন জলে ব্যথা-বেদনা সারে।'

'জল! হঠাৎ জল কেন? ঠিক আছে খাবেন। তবে আবার এ ধরনের ঝামেলায় পড়লে জল, ওষুধ কেউ কিছু করতে পারবে না। সুতরাং এবার থেকে অ্যালার্ট থাকবেন। মনে রাখবেন, বয়স হয়েছে। বেশি বয়সে ব্যথা ভাল জিনিস নয়।'

বসের ঘরে কাঁপা পায়ে ঢুকে চমকে উঠলেন শ্যামল সান্যাল। রাশভারী সুখময়ের ঠোঁটেও চিলতে হাসি।

'বসুন, বসুন!'

শ্যামলবাবু ঘাবড়ে গেলেন। লোকটা বসতে বলে কেন? এবার থেকে কি এই অফিসে বসিয়ে বকুনি দেওয়ার সিস্টেম চালু হল? জড়সড় হয়ে বসলেন শ্যামলবাবু। টেবিলের ওপর হাত দুটো রাখলেন। সঙ্গে সঙ্গে নামিয়েও নিলেন। ঢোঁক গিলে বললেন, 'স্যার আজ লেট হত না। আসলে কাল...।'

'ওসব লেট-ফেট ছাড়ুন। আগে বলুন কী খাবেন? চা বলি? নাকি কফি? এখানে কফিটা পারে না, চা-ই খান। আপনাকে বরং একদিন বাড়িতে নিয়ে গিয়ে কফি খাওয়াব। আমার মিসেস কফিতে এক্সপার্ট।'

কথা বলতে বলতেই সুখময় বেল টিপল। ঝন্টু ঘরে ঢুকতে চায়ের অর্ডার হল। চায়ের সঙ্গে বিস্কুট। শ্যামলবাবুর এবার ভয় করছে। ভয় পাওয়ারই কথা। দীর্ঘ চাকরিজীবনে তাঁর কখনও বসের ঘরে বসে চা খাওয়ার অভিজ্ঞতা হয়নি। কেনই বা হবে? এই অফিসে তিনি একজন অতি সামান্য মানুষ। বসের ঘরের চা খাওয়ার মানুষ নন। তাঁকে অনেকে চেনেও না। কে শ্যামল সান্যাল?

'খবরটা চেপে গিয়েছিলেন কেন?' সুখময়ের গলা চাপা। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে আবার বলল, 'কেন?'

শ্যামলবাবু অবাক হন। বলেন, 'কোন খবরটা স্যার?'

'কোনটা আবার, লাঠি, পুলিশের লাঠি।'

বুকের ভেতর ছ্যাঁৎ করে উঠল। মানুষটা জানল কী করে?

'না না, স্যার...'

সুখময় সোজা হয়ে বসে বড় করে হাসল। হাত দেখিয়ে বলল, 'না, হ্যাঁ কিছু বলতে হবে না, সব জেনে গেছি। এভরিথিং। কার্তিক যখন বলল তখন প্রথমটায় বিশ্বাস হয়নি। কার্তিক কে জানেন মশাই? আপনার ডাক্তারের কম্পাউন্ডার। যার কাছে আপনি লাঠির ব্যথা সারাতে গিয়েছিলেন। ছোকরা থাকে ভবানীপুরে। আমার ভায়রার বাড়ির কাছে। এটা-সেটা কাজে ও-বাড়িতে যাতায়াত আছে। ওখানেই পরিচয়। কাল রাতে গিয়ে দেখি ব্যাটা বসে আছে। ভায়রার প্রেশার মাপছে। আমায় দেখে দাঁত বের করে বলল, স্যার, আপনাদের শ্যামল সান্যাল পুলিশের লাঠি খেয়েছে। আমি বললাম, কে শ্যামল স্যান্যাল? তখন কার্তিক আপনার চেহারার ডেসক্রিপশন দিল। আমি তো থ'। বিশ্বাসই করতে পারছি না মশাই। আপনি! আউট অফ অল পারসেনস আপনি পুলিশের সঙ্গে মারপিট করেছেন?'

শ্যামলবাবু নড়েচড়ে বসলেন। এখন কী করবেন? অস্বীকার? বাজে কথা বলে উড়িয়ে দেবেন? সেটা কি ঠিক হবে। মনে হচ্ছে না ঠিক হবে। এ লোক অতি ঝানু। অনেকটা নিশ্চিত হয়েই কথা শুরু করেছে।

'স্যার সেরকম কিছু নয়। সেদিন হঠাৎ অফিসে আসার পথে ঝামেলায় পড়লাম।'

'থাক। আর বলতে হবে না। ঘটনাটা তা হলে সত্যি? এটাই যথেষ্ট। আপনি যে তলে

তলে এতখানি কে জানত। আমি তো শুনেছিলাম শান্তশিষ্ট মানুষ। মাসে তিন দিন লেট, পাঁচটা ফাইলের মধ্যে দুটোতে ভুল। হা হা।'

সুখময় শরীর দুলিয়ে হাসল। ওর গলাটা কেমন যেন লাগছে। অচেনা। এমন ভঙ্গিতে কথা বলছে যেন পার্সোনেল বিভাগের এই কেরানিটিকে তিনি বিশেষরকম পছন্দ করেন। বহুদিন ধরেই চেনাজানা। লোকটাকে থামাতে হবে। শ্যামলবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, 'মারপিট-টারপিট কিছু নয় স্যার।' কথার মাঝখানেই ঝন্টু চা নিয়ে ঢুকল। শ্যামলবাবু চুপ করে গেলেন। ঘরে ঢোকা লোককে আর বিশ্বাস নয়। কম্পাউন্ডার ছোকরা একেবারে মাথা হেঁট করে দিয়েছে। ছি ছি। আর বলবি তো বল একেবারে অফিসের বড়বাবুকে?

ঝন্টু বেরিয়ে যেতে চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সুখময় বলল, 'আজ অফিসে এসেই একটা কাণ্ড করেছি। আপনার 'সি আর'-টা বের করলাম। কনফিডেনশিয়াল রিপোর্ট। ভেবেছিলাম এত সাহস যখন নিশ্চয় হট ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। ঝান্ডা, স্লোগানের ব্যাকগ্রাউন্ড। রিপোর্ট খুলে দেখি যা বাবাঃ। নো স্পট। একেবারে সাদা! একেই বলে কোন ছাইয়ের তলায় আগুন চাপা আছে কে বলতে পারে? হা হা।'

কথা শেষ করে বিচ্ছিরি ভঙ্গিতে সুখময় সামন্ত আবার হাসতে লাগল। শ্যামলবাবুর কপালে ঘাম জমছে।

'স্যার, বিশ্বাস করুন, সেদিনের ঘটনাটা ওরকম নয়। একেবারে আচমকাই ঘটেছে। বোকার মতো ঝামেলায় পড়ে গেলাম। আমি কখনও কোনও গোলমালে থাকি না স্যার। সেদিন ইউনিয়ন থেকে রিলে অনশন হল, সবাই এল, আমি পেট ব্যথা বলে বাড়িতে ছিলাম। এক দিনের সি. এল. কাটা গেল। আপনি তো সবই জানেন। ওই কার্তিক ছেলেটা বাড়িয়ে বলেছে।'

সুখময় এবার টেবিলের ওপর ঝুঁকে একটা হাত বাড়িয়ে শ্যামলবাবুর হাতটা সামান্য স্পর্শ করল। নিচু এবং গম্ভীর গলায় বলল, 'এইজন্যই চিন্তা। সাহসী মানুষের সাহস নিয়ে ভাবনা নেই, কিন্তু ভিতু মানুষের সাহসের কথা শুনলে চিন্তা আছে। সে সত্যি হলেও চিন্তা, বানানো হলেও চিন্তা। দেখুন শ্যামলবাবু, আজ আপনি কেউ নন, কিন্তু কাল কেউ হবেন না তার গ্যারান্টি কী? কোনও গ্যারান্টি নেই। আমার এক কাকা থাকেন জলপাইগুড়িতে। টাউন থেকে একটু দূরে। গোবেচারা, বোকাসোকা ধরনের মানুষ। একদিন সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার সময় হুমড়ি খেয়ে পড়লেন এক হাবিলদারের গায়ে। হাবিলদার ব্যাটা ঠাসিয়ে দিল এক চড়। ব্যস, ওই এক চড়েই কাকার কপাল খুলে গেল। একেবারে চিচিং ফাঁক। সে বছরই কারা যেন তাঁকে জোর করে ইলেকশনে দাঁড় করিয়ে দিল। মিউনিসিপ্যালিটি ইলেকশন। স্রেফ চড় ইস্যুতে কাকা গেলেন জিতে। তারপর থেকে রমরমা কাণ্ড। এখন টাউনের ওপর তিনতলা বাড়ি করেছেন। মার্বেল ফ্লোর। এলাহি কারবার। সুতরাং ও রিস্ক নেওয়া যায় না। আমি নিতে পারব না। আপনিও যে আমার কাকার মতো কিছু একটা হবেন না কে বলতে পারে? আর এ তো চড় নয়, একেবারে লাঠি। কালই হয়তো এখানকার ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট হয়ে গেলেন। তখন? তখন আমার কী হবে?'

বাঁ হাত দিয়ে কপালের ঘাম মুছে শ্যামলবাবু বললেন, 'এসব কী বলছেন স্যার? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

সুখময় হাসল। বললে, 'এবার কাজের কথায় আসি। দেখুন শ্যামলবাবু, আমার এখানে আরও বেশ কয়েক বছর চাকরি আছে। আপনিও আছেন। এই ক'টা দিন আমি আপনাকে দেখব, আপনিও আমাকে দেখবেন। ইউনিয়ন নিয়ে যত খুশি হইচই, হট্টগোল করুন কোনও অসুবিধে নেই। শুধু দেখবেন আমার গায়ে যেন আঁচ না লাগে। ফলস্ আঁচে সমস্যা নেই। সত্যি না হলেই হল। আই শ্যাল পে ফর দ্যাট। আমি এর জন্য আপনাকে দাম দেব। অনেক বছর আপনার এখানে কোনও প্রমোশন হয়নি। এটা ঠিক কথা। প্রপার জাস্টিস হয়নি। এত বছর সার্ভিসের পরও আপনি কেন সামান্য একজন ক্লার্ক হয়ে থাকবেন? এ চলতে পারে না। আমি দেখব। নিশ্চয় দেখব। ব্যস, এই আপনার সঙ্গে কথা হয়ে গেল। ফাইনাল কথা। নিন, এবার কোথায় মেরেছে দেখান। আহা, পা-টা তুলবেন তো!'

শ্যামলবাবুর মাথায় কিছু ঢুকছে না। তিনি কিছু বুঝতেই পারছেন না! মানুষটা কী বলছে? পাগল-টাগল হয়ে গেছে? নাকি ফাঁদ পাতছে? হতে পারে। বদ লোকেরা সব পারে। তিনি যন্ত্রের মতো সস্তা স্যান্ডাক পরা ডান পা-টা তুলে ধরলেন বসের মুখের দিকে।

টিফিনের আগে এবং পরে দুটো ঘটনা ঘটল।

টিফিনের আগে বহরমপুর থেকে টেলিফোন করল চন্দন। এই ঘরে ফোন থাকে সেকশন অফিসার অলক বোসের টেবিলে। লোকটা বিরাট পাজি। আগে শুধু ফোন করতে হলে খাতায় সই করতে হত। কোথায় ফোন, কেন ফোন সব লেখা চাই। হঠাৎ একদিন নিয়ম করল, ফোন এলেও লিখতে হবে কার ফোন এসেছে। বেশিরভাগই বানিয়ে লিখত। একদিন সরোজ লিখল, কেন্দ্রীয় জনকল্যাণ দপ্তরের উপমন্ত্রীর ফোন। অলক বোস খেপে লাল। সরোজ ঠান্ডা গলায় বলল, 'আপনি মন্ত্রীকে ফোন করে দেখুন মিথ্যে বলছি কিনা। মন্ত্রী আমার ছেলেবেলার বন্ধু। দেখলেন না তুই-তোকারি করছিলাম।' ঝগড়া হল খুব। তবে লাভ হল একটা। ফোন এলে নাম লেখা উঠে গেল।

শ্যামলবাবু উঠে গিয়ে ফোন ধরতে চন্দন চিৎকার করে বলল, 'হ্যালো বাবা, করেছটা কী? অ্যাঁ, কী করেছ তুমি? মা আগে তো বলেনি, আজ বলল। খানিক আগে বাড়িতে ফোন করেছিলাম। তারপর থেকে টানা তোমাকে ধরবার চেষ্টা করছি।'

শ্যামলবাবু রিসিভারটা প্রায় মুখে ঢুকিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'তোর মা বলবে কী করে? জানত না তো।'

'অন্যায় করেছ। কলকাতার বাস ধরব? এখন ব্যথাটা কীরকম?'

চন্দন মোবাইল থেকে ফোন করছে। কথা ছিঁড়ে ছিঁড়ে যাচ্ছে। শ্যামলবাবু ছেলের কথায় লজ্জা পেলেন। তাড়াতাড়ি বললেন, 'না না, ব্যথা নেই। তোরা সবাই মিলে কী শুরু করেছিস বল তো? ডাক্তার বলেছে কিচ্ছু না। নিজে থেকেই কমে যাবে। ইনফ্যাক্ট একদিনের ওষুধেই কমতে শুরু করেছে। এই তো আজ সকাল থেকে একবারও হয়নি। মনে হচ্ছে, আর হবেই না। তোকে আসতে হবে না। তোর মা কেন যে খামোকা তোকে বলতে গেল। মিছিমিছি টেনশনে ফেলা।'

'বাঃ, বলবে না! বাবা এত বড় সংগ্রামী হয়েছে, লাঠি খাচ্ছে, জেলে যাচ্ছে, ছেলে জানবে না? বুড়ো বয়সে একেবারে পুলিশের সঙ্গে লড়াই করে বসলে? অ্যাঁ!'

'যাঃ, বাজে কথা বলিস না। এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট।'

'আমিও মাকে বললাম। বললাম, বাবা ঝগড়া-টগড়াতেই থাকে না, এ তো একেবারে লাঠি-সোটার মামলা। তবে মা মনে হয় না পুরোটা বিশ্বাস করল। এমনভাবে বলল যেন তোমার দোষ ছিল।'

শ্যামলবাবু অলক বোসের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে ফিসফিস করে বললেন, 'তোর মা ওইরকমই। তুই ফোন ছাড়। মোবাইলের কার্ড খরচ হচ্ছে।'

ফোন নামিয়ে শ্যামলবাবু চিন্তিত মুখে নিজের টেবিলে এলেন। পুরো এক গ্লাস জল খেলেন। ফাইল খুললেন অন্যমনস্কভাবে। কাকলি আর কাকে বলেছে? আত্মীয়দের বললে কেলেঙ্কারি।

পরের ঘটনা ছোট, কিন্তু মারাত্মক।

টিফিনের খানিক পরেই সুজিত গুপ্ত দলবল নিয়ে টেবিলের সামনে এসে হাজির। মুখ তুলে চমকে উঠলেন শ্যামলবাবু। খোদ ইউনিয়নের সেক্রেটারি তার সামনে! সুজিত একগাল হেসে চেয়ার টেনে বসল। চকচকে মোবাইলটা টেবিলে রেখে ডান হাত বাড়িয়ে দিল।

'কনগ্রাচুলেশন শ্যামলদা। অভিনন্দন। আপনার মতো একজন সহকর্মী পেয়ে আমরা গর্বিত। ঘটনাটা আমরা এইমাত্র শুনলাম। আর শুনেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বুধবার ছুটির পর একটা সভা করব। বড় কিছু নয়, ছোট সভা। শ্যামল সান্যালের সংবর্ধনা সভা।'

শ্যামলবাবু কিছু একটা বলতে গেলেন। সুজিত এবার দুটো হাত জড়িয়ে ধরল। বলল, 'নো নো, আপনার কোনও আপত্তি শুনব না, শ্যামলদা। কোনও কথা নয়। খবর পেয়েছি আপনি খুব শাই। লাজুক ধরনের মানুষ। কিন্তু দাদা আমাদের কাছে লজ্জা করলে তো চলবে না। সংবর্ধনা আপনাকে নিতেই হবে। বেশি কিছু নয়। শুরুতে একটা গান, তারপর আমি কিছু বলব। সুখময়বাবু আপনার হাতে ফুল তুলে দেবেন। যতই হোক উনি আমাদের বস। শেষে আপনার মুখ থেকে সেদিনের ঘটনা শুনব। ব্যস, চা-শিঙাড়া দিয়ে ফিনিশ। বউদিকে আনতে হবে কিন্তু।'

সুজিত দলবল নিয়ে চলে গেলে বাথরুমে গিয়ে চোখে-মুখে জল দিয়ে এলেন শ্যামলবাবু। হাতের কাজ শেষ করে অফিস থেকে বেরোতে দেরি হয়ে গেল। বাইরে অন্ধকার হয়ে গেছে। কিছুতেই কাজে মন দিতে পারছিলেন না আজ। মনের ভিতর অস্বস্তি, সংকোচ। কী যে সব হয়ে গেল! খুব লজ্জা করছে। খালি মনে হচ্ছিল, অফিসে সবাই তাকিয়ে আছে। এমনকী ঝন্টুটা পর্যন্ত। না, না, বুধবার কিছুতেই অফিসে আসা যাবে না। জ্বর বলে দু'দিন কামাই করতে হবে। ইস, দু'-দুটো সি এল নষ্ট। তবে সবকিছুর মধ্যে একটাই যে ভাল, ব্যথাটা পাকাপাকিভাবে গেছে। সারাদিনে একবারও হল না। এরকম আগে হয়নি। ওষুধের গুণ আছে। একদিনেই অ্যাকশন। লজ্জার মধ্যেও মনটা ভাল লাগছে। না, ডাক্তারের কাছে আরও আগে যাওয়া উচিত ছিল।

সামনের ট্রামটায় উঠে পড়লেন শ্যামলবাবু।

হেদুয়া ছাড়িয়ে খানিক এগোনোর পর ট্রাম দাঁড়িয়ে পড়ল। উর্দি পরা বুড়ো কন্ডাক্টর টঙাস-টঙাস শব্দে দু'বার ঘণ্টি বাজিয়ে ঘোষণা করলেন, ট্রাম আর যাবে না। সামনে গোলমাল। শ্যামলবাবু জানলার পাশে বসে ঝিমিয়ে পড়েছিলেন। গোলমাল শুনে চমকে উঠলেন। আবার গোলমাল! ভুল শুনলেন না তো? হতে পারে। বাসে-ট্রামে ঝিমিয়ে পড়লে মানুষ অনেকসময় ভুল শোনে। তবে এটা ভুল নয়। শ্যামলবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন সবাই দ্রুত নেমে পড়েছে। তিনিও নামলেন। নেমেই বুঝলেন, ঘটনা সত্যি। খানিকটা এগিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। মানুষ মরেছে। উত্তেজিত জনতা বাসে আগুন ধরিয়েছে। আকাশে সেই আগুনের ধোঁয়া উঠছে গলগল করে। ধোঁয়ার সঙ্গে আগুনের হলকা। এতটা দূর থেকে পাওয়া যাচ্ছে ভাঙচুরের আওয়াজ। গাড়ির কাচ ভাঙছে? সাইরেন বাজিয়ে পুলিশ আর দমকল ছুটে গেল পাশ দিয়ে। ভেসে এল চিৎকার। উন্মত্ত মানুষের চিৎকার। শ্যামলবাবু দ্রুত চিন্তা করছেন। কোন গলিতে ঢুকবেন? কোনটা পালানোর পক্ষে বেশি সুবিধেজনক হবে? ডান না বাঁ? হাতে বেশি সময় নেই। এই গোলমাল আরও বাড়বে, ছড়াবে। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দ্রুত এবং সঠিক সিদ্ধান্ত। সেবারের মতো যেন ভুল না হয়। সামনে থেকে চেরা, তীক্ষ্ণ শব্দ ভেসে এল। গুলি চলল নাকি?

শ্যামলবাবু পা বাড়াতে গেলেন। আর ঠিক সেই সময় সে ফিরে এল! ফিরে এল নিঃশব্দে, আরও বেশি শক্তি নিয়ে যেন। সজোরে কামড় বসাল পায়ে, হাঁটুর পিছনে। তারপর কামড়াতে কামড়াতে উঠতে লাগল ওপরে। ঊরু, কোমর, পেট, বুক ছাড়িয়ে মাথার দিকে। শ্যামলবাবু থমকে দাঁড়ালেন। এ কী! এখনও যায়নি! হারামজাদা রয়ে গেছে এখনও! জাপটে জড়িয়ে গা ঢাকা দিয়ে রয়ে গেছে ভেতরে! যন্ত্রণায় চোখমুখ কুঁচকে এল। কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তার থেকেও বেশি হচ্ছে রাগ। তীব্র রাগ। যে-জিনিস এতক্ষণ লজ্জা হয়ে কুঁকড়ে-মুকড়ে দিয়েছিল, সে যেন হঠাৎ গাদাখানেক রাগ এনে মাথায় আগুন ধরিয়ে দিল! ইচ্ছে করছে ব্যথাটার গলা টিপে ধরতে। তারপর শরীর থেকে উপড়ে, টেনে মাটিতে ফেলে, থেঁতলে, পিষে মারতে। দাঁতে দাঁত চেপে ধরলেন শ্যামলবাবু। রাস্তা ভরতি মানুষ। কেউ যেন বুঝতে না পারে।

ডান বা বাঁয়ে গলি নয়, ভিড় ঠেলে রাগী আর বোকা শ্যামল সান্যাল এখন হাঁটছেন সামনে। ধোঁয়া, আগুন, গোলমালের দিকে। ছাতা আর অফিসের ব্যাগটা হাতে শক্ত করে ধরা।

দেশ, ২ জুন ২০০৮

কৃষ্ণচূড়া

ভয়ংকর ঘটনাটা জানা গেল লাঞ্চ আওয়ারে। অতি ব্যস্ততার মধ্যেও ইনস্টিটিউটের সকলেই কম বেশি খাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলার মুখে হলেও ডিরেক্টর মণিময় সামন্ত লাঞ্চ প্রত্যাখান করেছেন। শুধু এক বাটি টক দই নিয়েছেন তিনি। তবে সেটাও খাচ্ছেন না। টেনশন হচ্ছে, ভয়ংকর টেনশন! দু'রাত ঘুম হয়নি তাঁর। কাল থেকে খিদেও নেই। মণিময় সামন্ত, রোবোটিক্স বিষয়ে তিনি একজন পণ্ডিত। রোবট বিজ্ঞানে তাঁর খ্যাতি বিশ্বজোড়া। তাঁর 'জেড এমপি টেকনিক'-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে। 'জেড এমপি টেকনিক' দিয়ে রোবটের চলাফেরার বিষয়টা নির্দিষ্ট করা হয়। হাঁটাচলা, লাফানো এমনকী সাঁতার পর্যন্ত! মণিময় সামন্ত অ্যাকাচুয়েটের মোটর, হাইড্রলিক সিস্টেম, ইলেকট্রিক সার্কিটের অদলবদল ঘটিয়ে মানুষের চেহারার রোবটকে দিয়ে হাই তুলিয়েছেন। দেখিয়েছেন, ভিতরের শক্তি কমে এলে রোবট হাই তুলে বুঝিয়ে দিতে পারবে। এই কাজ নিয়ে খুব হইচই হয়েছিল। এমন মানুষের টেনশন করা মানায় না। মণিময় সামন্ত নিজেও সেটা বোঝেন। নিজের উপর রাগও হচ্ছে। মনে হচ্ছে, শুধু লেখাপড়া নিয়েই ভাল ছিলেন। কেন যে মরতে এত বড় একটা গবেষণা কেন্দ্রে ডিরেক্টর হতে গেলেন! মণিময় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সামনের এগজিবিশনটা পার করেই তিনি ডিরেক্টরের পদ থেকে ইস্তফা দেবেন। এত ঝামেলা নেবেন না। রোবট নিয়ে কাজ করলেও তিনি রোবট নন, মানুষ!

তিন দিন পর এই ইনস্টিটিউটে যে এগজিবিশন হতে চলেছে, তার উপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। প্রতিষ্ঠানের মানসম্মান তো বটেই, এমনকী, টাকাপয়সাও। সবকিছু ঠিক মতো হলে আগামী কয়েক বছর আর ফান্ড নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে হবে না! অনেক ভাবনাচিন্তা আর পরিশ্রম করে এই রোবটগুলো তৈরি হয়েছে। অতিথিরা আসছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে। তার মধ্যে রোবোটিক্সের ছাত্রছাত্রী, বিজ্ঞানীরা যেমন আছেন, তেমন নামীদামি কোম্পানির প্রতিনিধিরাও থাকছেন। রোবট পছন্দ হলে, অর্ডার পাওয়া যাবে। যাঁরা গোটা রোবট অর্ডার দেবেন না, তাঁরা সার্কিট, ডায়াগ্রাম বা সফটওয়্যার কিনে নিয়ে ফিরে যাবেন। ঠিক এইসময় মণিময় সামন্তর কাছে ভয়ংকর খবরটা এল। ইন্টারকমে খবর দিলেন ডক্টর সুফল সরকার। খবর শোনার পর কয়েক মুহূর্তের জন্য তাঁর যাবতীয় বোধবুদ্ধি যেন লোপ পেয়ে গেল। মাথাটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে। হঠাৎ খুব খিদে পাচ্ছে। মণিময় এক চামচ দই তুলে মুখে দিলেন। অতিরিক্ত টেনশনের উপর টেনশন চাপলে কি এরকমই হয়? পালিয়ে যাওয়া খিদে ফিরে আসে? ঘটনাটা এরকম, নিজের ঘরে লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে ডক্টর সুফল সরকার ল্যাবরেটরিতে ঢুকেছিলেন। ক'দিন থেকে 'আর থ্রি' মডেলে একটা সেন্সর

গোলমাল করছে, ফলে 'আর থ্রি' অ্যালজেব্রা, জিওমেট্রি বা ক্যালকুলাসের জটিল ফর্মুলা ঝরঝর করে বলে দিতে পারছে, কিন্তু সহজ যোগ-বিয়োগে হোঁচট খাচ্ছে। কাল বিকেলে উনিশের নামতা বলতে গিয়ে বাষট্টির ঘরে এসে থমকে গিয়েছে। রোবট যদি সামান্য উনিশের নামতা বলতে গিয়ে চুপ করে যায়, তবে সেটা খুবই বিশ্রী ব্যাপার হবে। তার উপর এগজিবিশনে 'আর থ্রি'-কে একজন প্রোফেসর হিসেবে দেখানো হবে। ইউনিভার্সিটির স্তরে সে পড়াতে পারবে। প্রোগ্রামিং-এ সিলেবাস বদলে দিলেই হল। সেদিক থেকে এই 'আর থ্রি' এগজিবিশনে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ মডেলের একটা। সুফল সরকার গোলমাল নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন। ডিরেক্টরের কানেও গোলমালের খবর পৌঁছেছে। আজ সকালে তিনি সুফল সরকারকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। 'এটা কী ব্যাপার, ড. সরকার? আমি শুনলাম আর থ্রি-তে সমস্যা হচ্ছে। ঘটনাটা কি সত্যি?'

ড. সরকার মাথা চুলকে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ স্যার সত্যি। কঠিন প্রবলেম সলভ করছে, কিন্তু ছোটখাটো অঙ্কে আটকে যাচ্ছে।'

মণিময় বিরক্ত গলায় বলেছিলেন, 'তিনদিন বাদে প্রোগ্রাম। কাল রাতে গেস্টরা আসতে শুরু করবেন। লাস্ট মোমেন্টে এই ধরনের গোলমাল কী করে হয়?'

'সেটা বুঝতে পারছি না। তবে ধরে ফেলার চেষ্টা করছি।'

মণিময় সামন্ত এই কথায় আশ্বস্ত হলেন না। মাথা নেড়ে বললেন, 'ভেরি ব্যাড ড. সরকার। এতদিন ধরে আমরা প্রিপারেশন নিয়েছি। তারপরও যদি এরকম হয়! বাকিগুলোর খবর কী? সেগুলোও গোলমাল শুরু করেছে নাকি?'

'না না স্যার! বাকি মডেলগুলো একেবারে পারফেক্ট। এক্স ফাইভের হাইড্রলিক পিস্টনে একটা সমস্যা ছিল। মডেল ঘাড় ঘোরানোর বেলায় একটা এক্সট্রা জার্ক পাচ্ছিল। ড. ভাদুড়ি কালই রিপেয়ার করে ফেলেছেন।'

মণিময় ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'ওর ফাংশনটা কী যেন...'

'খেলার সঙ্গী হওয়া। ধরুন, মর্নিংওয়াকের সময় পাশে পাশে হাঁটল বা জগিং করল। কিছু গেমে পার্টনারও হতে পারবে।'

মণিময় সামন্ত চোখ থেকে চশমা খুলে বললেন, 'ও হ্যাঁ মনে পড়েছে। খেলার মধ্যে আপনারা কি ব্যাডমিন্টন আর পোলোটা রাখতে পেরেছেন? আমি কিন্তু বলে দিয়েছিলাম বাইরে পোলোটা খুবই পপুলার গেম আবার ব্যাডমিন্টন না থাকলে মেয়েরা এই মডেলে ইনটারেস্ট পাবে না। আর এন টু? তার খবর কী? সেও আবার কোনও গড়বড় করছে না তো?'

'এন টু-কে ডোমেস্টিক হেল্‌পার হিসেবে রেডি করা হয়েছে। রান্না থেকে শুরু করে গেস্ট অ্যাটেন্ড পর্যন্ত সব কিছুই করতে পারবে।'

মণিময় সামন্ত ফোঁস করে একটা নিশ্বাস নিয়ে বললেন, 'করলেই ভাল। আচ্ছা ড. সরকার ওই ম্যানেজার মডেলের কোডটা কী?'

'ওটা স্যার জেড ফোর। অ্যাকাউন্টস, কো-অর্ডিনেশন, প্রোডাকশন, মার্কেটিং সব ধরনের কাজে এই মডেল অ্যাসিস্ট করতে পারছে। সবচেয়ে বড় কথা স্যার, জেড ফোর

মিটিং-এ বসে সকলের সঙ্গে আলোচনাও করতে পারে। সমস্যা একটাই ছিল, ম্যানেজারবাবুর মুখে একটু বেশি হাসি হাসি ভাব চলে এসেছিল।'

মণিময় সামন্ত চাপা আর্তনাদ করে উঠলেন, 'হাসি! ম্যানেজার হাসছে! কোম্পানির সিরিয়াস মিটিং-এ বসে ম্যানেজার যদি হাসে, সেটা কেমন হবে ভাবতে পারছেন, ড. সরকার? এই মডেল তো শুধু হাসি মুখের জন্যই বাতিল হয়ে যাবে!'

ড. সরকার তাড়াতাড়ি বললেন, 'সমস্যাটা আর নেই। ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন মানে ফাইবারের কাজে ভুল হয়ে গিয়েছিল।'

ঘাম জমেনি, তবু মণিময় সামন্ত রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছলেন। সুফল সরকার সামান্য হেসে বললেন, 'এতটা চিন্তা করবেন না, স্যার। এগজিবিশন সেমিনার সবই খুব ভাল হবে। এম ফাইভ এবং কে সিক্স তো দারুণ মডেল। আপনি তো জানেনই স্যার, কে সিক্স ইজ রিয়্যালি আ ব্রিলিয়ান্ট জব। ড. শকুন্তলা মিত্র নিখুঁতভাবে মেয়েটিকে বানিয়েছেন।'

'এখন নিখুঁত বলছেন। কাল হয়তো ড. মিত্র এসে বলবেন যে, মডেলে খুঁত পাওয়া গিয়েছে। সোলোনয়েড গোলমাল হয়েছে বা ওই মেয়ে ঘনঘন হাঁচছে।'

সুফল সরকার কোনওরকমে হাসি চাপলেন। ড. সামন্তর টেনশন সত্যি বাড়াবাড়ির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। না হলে, রোবট হাঁচছে, এমন কথা মাথায় আসত না।

'না স্যার আপনি দেখবেন,' বললেন ড. সরকার, 'কে সিক্স শুধু ভাল মডেলই হয়নি, তার অ্যাপিয়ারেন্সও চমৎকার হয়েছে। শাড়ি পরিয়ে টিপিক্যাল বাঙালি অল্পবয়সি মেয়ের ইমপ্রেশন দেওয়া হয়েছে। ড. মিত্র মডেলের জন্য শান্তিনিকেতন থেকে গয়না পর্যন্ত আনিয়েছেন। হাইড্রলিক সিস্টেম এমনভাবে প্রোগ্রাম করেছেন, যাতে মেয়েটা নির্দিষ্ট ইন্টারভ্যালে কপালের উপর পড়া চুল ঠিক করতে পারে। রোবট বলে মনেই হচ্ছে না। মনে হচ্ছে সত্যিকারের কলেজপড়ুয়া মেয়ে। আমরা সকলে ড. মিত্রকে কনগ্র্যাচুলেট করেছি। আপনিও করেছেন স্যার!'

'আমিও করেছি নাকি? কী জানি, হয়তো করেছি! বললাম না, সবই ভুলে যাচ্ছি। তা এই কে সিক্স-এর কর্মকাণ্ডটা কী যেন? এত সাজগোজ কীসের? ফ্যাশন শো-তে হাঁটবে নাকি?'

এবার আর না হেসে পারলেন না সুফল সরকার, 'স্যার কে সিক্স ইজ জাস্ট আ ফ্রেন্ড। কম্পানি দিতে পারে। ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্পগুজব করতে পারবে, ইন্টারঅ্যাক্ট করবে। বহু দেশে তো স্যার আজকাল এটা একটা সিভিয়ার প্রবলেমের আকার নিয়েছে। বন্ধু নেই, কথা বলার লোক নেই। কাজটা ডিফিকাল্ট ছিল। ড. মিত্র খুব সাকসেসফুলি কাজটা করতে পেরেছেন। মেয়েটিকে যেমন দেখতে অ্যাট্রাকটিভ করা হয়েছে, আলাদা করে একটা পার্সোন্যালিটি ইমপ্রেশনও দেওয়া হয়েছে। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হল, অন্য কোনও মডেলের নাম না থাকলেও কে সিক্স-এর একটা নাম দেওয়া হয়েছে।'

'নাম! রোবটের নাম!'

'হ্যাঁ স্যার, ড. শকুন্তলা মিত্রই নামটা দিয়েছেন। বাঙালি নাম। মডেলকে ল্যাবরেটরিতে কৃষ্ণচূড়া বলে ডাকা হচ্ছে।'

সুফল সরকার চলে যাওয়ার পর মণিময় সরকার ভাবলেন, মডেলদের ক্যাটালগে আরও একবার চোখ বুলিয়ে নেবেন। আসল বিষয়টি এতটা গুলিয়ে ফেলা উচিত হচ্ছে না। টেবিলে ছড়ানো কাগজ হাতড়েও তিনি ক্যাটালগ খুঁজে পেলেন না। ল্যাপটপে হাত দিলেই পাওয়া যাবে, কিন্তু হাত দিতে ইচ্ছে করছে না। এমন সময় টক দইয়ের বাটি এল, সেই বাটি রেখে চুপ করে বসে রইলেন। আর তখনই ড. সরকার খবরটা দিলেন। খবরটা দেওয়ার সময় তাঁর গলাটা কেঁপে গেল, 'স্যার ল্যাব থেকে বলছি, কৃষ্ণচূড়া নেই।'

'কৃষ্ণচূড়া? সে কে? হু ইজ শি?'

'আমাদের কে সিক্স মডেল স্যার। আমি আর থ্রি-কে ঠিক করতে ল্যাবে এসেছি। কাজ শেষ করে বেরোতে গিয়ে হঠাৎ নজরে পড়ল, কে সিক্স-এর জায়গাটা ফাঁকা।'

'ফাঁকা! মানে?'

'মানে বুঝতে পারছি না স্যার। ড. শকুন্তলা মিত্রকে ফোন করেছিলাম। উনি নিজের কোয়ার্টারে ছিলেন। এখনই আসছেন।'

মণিময় সামন্ত ঠান্ডা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'বাকিগুলো?'

'সব আছে স্যার। ওনলি কে সিক্স...'

ইন্টারকম রেখে মণিময় খিদে অনুভব করলেন। এক চামচ দই তুলে মুখে দিতে দিতে ভাবলেন, কী করা উচিত? এখনই কি রেজিগনেশন লেটার লিখে ফেলা দরকার? নাকি মাথায় দেওয়ার জন্য বরফ আনতে বলবেন? জেলখানা থেকে কয়েদি পালালে, পাগলা ঘণ্টি বাজানো হয়, ল্যাবরেটরি থেকে রোবট পালালে কী ব্যবস্থা আছে? তা ছাড়া কে সিক্স পালিয়েছে এমন উদ্ভট কথা তাঁর মাথায় আসছেই বা কেন? রোবট খারাপ হতে পারে, পালাতে পারে না। বিজ্ঞানী মণিময় সামন্তর মনে হল, তিনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন!

কিছুক্ষণের মধ্যেই খবর পাওয়া গেল একটি অল্পবয়সি সুন্দরী মেয়েকে গেট থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা গিয়েছে। মেয়েটির মাথায় গোলাপি রঙের ছাতা। বড় রাস্তা পার করে মেয়েটি ছাতা বন্ধ করে এবং ট্যাক্সিতে ওঠে। ঘণ্টাখানেক পর ডিরেক্টরের ঘরে জরুরি মিটিং-এ ড. শকুন্তলা মিত্র জানালেন, শুধু কে সিক্স মডেল নয়, তাঁর ছাতাটিও পাওয়া যাচ্ছে না। গত বছর টোকিওতে একটা সেমিনারে যোগ দিতে গিয়ে এই ছাতাটি কিনেছিলেন তিনি। গতকাল ড. মিত্র সেটি ল্যাবরেটরিতে ফেলে যান। মণিময় সামন্ত কঠিন চোখে মিত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কে সিক্স-এর চিপসে কোনও ল্যাঙ্গোয়েজ দেওয়া আছে কি? সে কি মানুষের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে পারবে?'

শকুন্তলা মিত্র বড় বড় চোখ করে বললেন, 'হ্যাঁ স্যার পারবে। তাকে কথা বলার জন্য ভাষা দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার হয়েছে। মডেলকে আমরা একটা সময় নানা ধরনের পোশাক পরিয়ে দেখেছিলাম। দ্যাট ব্যাগ ইজ মিসিং মানে, পোশাক ভরতি ব্যাগটাও ল্যাবে নেই।'

মণিময় সামন্ত নিচু গলায় বললেন, 'আমাদের গোপনে খোঁজখবর করতে হবে। ঘটনাটা যেন কোনওভাবেই ফাঁস না হয়। মডেলের একটা ফোটো দিন। আমি পুলিশের সঙ্গে কথা বলছি।'

পুলিশকে খবর দেওয়া হল, কিন্তু ফোটো দেওয়া হল না। কারণ কে সিক্স-এর কোনও ফোটো নেই, শুধু সার্কিট ডায়াগ্রাম আছে। পুলিশ স্পষ্ট জানিয়ে দিল, সার্কিট ডায়াগ্রাম হাতে নিয়ে মানুষের ভিড়ে মিশে যাওয়া রোবট খুঁজে বের করা অসম্ভব!

তিন মাস পর

কৃষ্ণচূড়া মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। সিঞ্চনের বেশিরভাগ কথারই সে উত্তর দিচ্ছে না। যে ক'টা দিচ্ছে, মুখ ফেরানো অবস্থাতেই দিচ্ছে। এই কাণ্ড নতুন। গত তিনমাসে এই মেয়েটার সঙ্গে সিঞ্চনের মান-অভিমান কম হয়নি। কিন্তু কখনও এই পর্যায়ে যায়নি। তার উপর আগে সবই ছিল ছোটখাটো রাগ। ঠিক সময়ে না আসা, রাতে ফোন না করা, অফিস কামাই করে বেড়াতে না যাওয়া, এই ধরনের। অভিমান ভাঙাতে অবশ্য অসুবিধে হয়নি। কখনও সিনেমা, কখনও আইসক্রিম, কখনও ছোটখাটো গিফটেই কাজ হয়ে গিয়েছে। আজ অবস্থা বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছেছে। কেন জানি সিঞ্চনের মনে হচ্ছে, এই মেয়ে অন্য কিছু ভাবছে। কঠিন কিছু! যদিও কাল সন্ধেবেলা যে ঘটনা ঘটেছে, তাতে রাগ করার কথা সিঞ্চনেরই। অপমানিত যদি কেউ হয়ে থাকে, সে হয়েছে, কৃষ্ণচূড়া নয়। সেই সময় রাগও হয়েছিল খুব, খানিকটা দুঃখও। কাল অনেক রাত পর্যন্ত মন খারাপ ছিল। ঠিক করেছিল কৃষ্ণচূড়ার সঙ্গে সে কোনওদিনই যোগাযোগ করবে না। প্রেম করলে রাগ দেখানোর অধিকার শুধু মেয়েদেরই থাকবে, এমন কথা কোথাও লেখা নেই। কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখে, মন থেকে রাগ-টাগ সব ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছে। একেই বোধহয় প্রেম বলে। মোবাইলে কৃষ্ণচূড়াকে ধরল সিঞ্চন, 'গুড মর্নিং কৃষ্ণচূড়া।'

'গুড মর্নিং,' থমথমে গলায় বলেছে কৃষ্ণচূড়া।

সিঞ্চন গলায় ঠাট্টার ভাব এনে বলল, 'গলা শুনে মনে হচ্ছে, এখনও খেপচুরিয়াস? নিজে কাণ্ড বাধিয়ে নিজেই রেগে গেলে?'

ওপাশে শান্ত গলায় কৃষ্ণচূড়া বলল, 'তোমার কি আজ একটু সময় হবে সিঞ্চন? আমি দেখা করতে চাই। তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

ফোন রেখে দেওয়ার পর সিঞ্চন কিছুটা থমকে গেল। কৃষ্ণচূড়া এত সিরিয়াস কেন? আসলে এই মেয়েটিকে এখনও সে ঠিকমতো বুঝতে পারেনি। ঠিকমতো বোঝার পক্ষে তিন মাস যদিও খুব সামান্য সময়। তবুও... হাসিখুশি সরল মেয়েটা সামান্য কারণে... বেশ কিছুটা সময় হল এই কফিশপে কৃষ্ণচূড়াকে নিয়ে ঢুকেছে সিঞ্চন। কাপুচিনো কৃষ্ণচূড়ার ফেভারিট। যদিও সিঞ্চনের জঘন্য লাগে, তবে আজ সে এমন হাসিমুখ করে এই কফি খাচ্ছে যে, মনে হচ্ছে, এমন অপূর্ব জিনিস সে আগে কখনও খায়নি। কিন্তু কৃষ্ণচূড়া সেটা লক্ষই করছে না। মেয়েটা গভীরভাবে কিছু একটা ভাবছে। সিঞ্চন নরম গলায় বলল, 'কৃষ্ণচূড়া, তুমি কিন্তু বেশি রাগ করছ। এত রাগ করার মতো ঘটনা কি কাল আদৌ ঘটেছে?'

কৃষ্ণচূড়া জিনসের উপর বেগুনি রঙের একটা টপ পরেছে, দারুণ লাগছে দেখতে! তবে

তিন মাস আগে সিঞ্চন যখন এই মেয়ের প্রেমে পড়ে, সেদিন জিনস-টপ নয়, কৃষ্ণচূড়া পরেছিল শাড়ি!

সেদিন অফিস থেকে বেরোতে রাত বেশি হয়ে গিয়েছিল সিঞ্চনের। আই টি কোম্পানিতে কাজের চাপ সবসময়ই বেশি। তার উপর সিঞ্চন চাকরিতে ঢুকেওছে সদ্য। ডিউটি টাইম পেরিয়ে গেলেও বসের দেওয়া অ্যাসাইনমেন্ট পেন্ডিং রেখে বেরিয়ে পড়া খারাপ দেখায়। কাজ শেষ করতে রাত হয়ে গেল। সিঞ্চন বেরিয়ে দেখল, সেক্টর ফাইভের মতো সরগরম এলাকাও বেশ ফাঁকা। এদিকটায় বাস-টাস এমনিতেই কম, রাত বাড়লে আরও কমে যায়। খানিকটা হেঁটে শেয়ার ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াল সিঞ্চন। স্ট্যান্ডে ভিড়। ট্যাক্সি দেখলেই গলায় কার্ড ঝোলানো ছেলেমেয়েরা ছুটে যাচ্ছে। যে ক'জন পারছে ঢুকে পড়ছে গাদাগাদি করে। ভিড়ের কারণে দুটো ট্যাক্সি ছেড়ে দিতে হল সিঞ্চনকে। তিন নম্বর ট্যাক্সি দেখে ছুটে গিয়ে কোনওরকমে ঠেলেঠুলেই উঠে পড়ল সিঞ্চন। জানলার ধার পেয়েছে। বাইপাসের ফুরফুরে হাওয়ায় সে চোখ বুজল। গোটা পথই অন্য প্যাসেঞ্জারদের দিকে তাকায়নি সিঞ্চন। পাশে বসা মেয়েটির দিকেও নয়, খেয়াল করতে হল যাদবপুরে নামার সময়। তখন ট্যাক্সি প্রায় ফাঁকা।

'এক্সকিউজ মি, কিছু মনে করবেন না, পার্সটা মনে হয় ফেলে এসেছি। ক্যান ইউ হেল্প মি?'

নিচু গলার মিষ্টি নারীকণ্ঠ শুনে চমকে ফিরে তাকায় সিঞ্চন। বাইপাসের অন্ধকারে মেয়েটির মুখ ভাল করে দেখতে না পেলেও গলার স্বরে তার কাঁচুমাচু ভাবটা বুঝতে পারে। বুঝতে পারে, মেয়েটি সত্যি বিপদে পড়েছে। মেয়েটি শাড়ি পরে আছে। আজকাল কলকাতায় শাড়ি পরা কমবয়সি বাঙালি মেয়ে চট করে চোখে পড়ে না। বিশেষ সেক্টর ফাইভে যাতায়াত করে এমন মেয়ে তো নয়ই। দাঁড়িয়ে পড়ে সিঞ্চন। মেয়েটি কাতর গলায় বলে, 'ট্যাক্সিতে ওঠার আগে ঠিক বুঝতে পারিনি...'

সিঞ্চন হেসে বলে, 'ইটস ওকে, কত লাগবে বলুন?'

মেয়েটি লাজুক গলায় বলে, 'ট্যাক্সি ভাড়াটুকু দিলেই হয়ে যাবে।'

সিঞ্চন ওয়ালেট থেকে পঞ্চাশ টাকার একটা নোট বের করে মেয়েটিকে দিতে গেলে সে বলে, 'প্লিজ আমাকে দেবেন না, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড, ড্রাইভারকে দিয়ে দিন।'

সিঞ্চন খুশি হয়। সে ঠিকই বুঝেছে। মেয়েটি সত্যিই বিপদে পড়েছে। সে ড্রাইভারকে দু'জনের ভাড়া দিয়ে দেয়। মেয়েটি গাড়ির জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বলে, 'আপনার অ্যাড্রেস বা মোবাইল নম্বরটা যদি দেন, আমি কালই...'

সিঞ্চন হেসে বলে, 'ইটস ওকে। ওইটুকু টাকা ফেরত দেওয়ার দরকার নেই। আপনি সাবধানে যান। টেক কেয়ার।'

মেয়েটিও হাসে। অস্ফুটে বলে, 'থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ, গুড নাইট।'

ট্যাক্সি আবার স্টার্ট দেওয়ার আগে উলটোদিকের গাড়ির হেডলাইটে চকিতের জন্য মেয়েটির মুখ দেখতে পায় সিঞ্চন। ভাসা ভাসা সুন্দর দুটো চোখে কৃতজ্ঞতা মাখিয়ে মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে আছে। নিজের পিঠ চাপড়ায় সিঞ্চন। ঠিকানা বা মোবাইল নম্বর দিলে

এই অপূর্ব দৃষ্টি থেকে সে অবশ্যই বঞ্চিত হত। মেয়েরা খুব বুদ্ধিমতী হয়। ফোন নম্বর দিলে হয় ভাবত কিপটে, নয় ভাবত অন্য কোনও মতলব আছে। এই দৃষ্টি কপালে জুটত না। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে বাড়ি ফিরল সিঞ্চন।

পরদিন নিজের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ অফিসে থাকল সিঞ্চন। রাত করে বেরোল আগের দিনের সময় হিসেব করে। ভেবেছিল হিসেবে ভুল হবে। কিন্তু তা হল না। জীবনের বোধহয় এটাই নিয়ম। খানিকটা যাওয়ার পরই সে দেখতে পেল, সেই মেয়ে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে আছে। স্ট্যান্ডের ঝলমলে আলোয় তাকে আরও ঝলমলে লাগছে। দূর থেকে সিঞ্চনকে দেখতে পেয়ে হাসিমুখে এগিয়ে এসে বলল, 'আপনার জন্যই ওয়েট করছি।' বুক ধুকপুক করে উঠল সিঞ্চনের। সে স্মার্ট। মেয়েদের ব্যাপারে ওস্তাদ না হলেও, ঘাবড়ে যাওয়ার মতো ছেলে সে নয়। কিন্তু সেদিন যেন অন্যরকম হল। মনে হল, এই মেয়েটি তার কাছে শুধু একজন মেয়ে-ই নয়, আরও একটু বেশি কিছু। নার্ভাস হেসে সিঞ্চন বলল, 'আপনি জানলেন কী করে আমি এখানে আসব?'

'আমি অনেক কিছুই জানতে পারি,' হাসিমুখে বলেছিল কৃষ্ণচূড়া।

'আর কী জেনেছেন?'

কৃষ্ণচূড়া মিটিমিটি হেসে বলল, 'জেনেছি, আপনি একজন নাইস পার্সন, সুন্দর মানুষ।'

সিঞ্চন হেসে বলল, 'বাবা, মাত্র কুড়ি টাকার জন্য 'নাইস পার্সন' জেনে গেলেন!'

'কুড়ি টাকা তো অনেক, দু'টাকার জন্যও বোঝা যায়। মানুষ চিনতে আমার ভুল হয় না। আমার সেন্সরগুলো খুব পাওয়ারফুল।'

'সেন্সর? সে আবার কী?' ভ্রূ তুলল সিঞ্চন। মেয়েটা শুধু সুন্দরী নয়, মজারও!

'কিছু নয়। ওসব বাদ দিন। ট্যাক্সি ধরবেন, না, আমার সঙ্গে এক কাপ কফি খাবেন। অবশ্য যদি আপনার হাতে সময় থাকে। টাকা ফিরিয়ে আপনাকে হার্ট করতে চাই না। ক্যান ইউ গিভ মি দ্য চান্স? কৃতজ্ঞতা জানানোর একটা সুযোগ?'

অন্যদিন হলে এই রাতে কফি খেতে যাওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারত না সিঞ্চন। কিন্তু সেদিন তার মনে হয়েছিল এক কাপ কেন, এই মেয়ে চাইলে সে দশ কাপ কফিও খেয়ে ফেলবে।

'চলুন কফি খাওয়া যাক। আপনার নামটা জানতে পারি কি?'

'কৃষ্ণচূড়া।'

'বাঃ, খুব সুন্দর নাম তো!'

'আরও একটা নাম আছে, সেটা কিন্তু তত সুন্দর নয়।'

'ডাকনাম?'

কৃষ্ণচূড়া হেসে বলল, 'না কোডনেম। শুনতে চাইবেন না।'

সিঞ্চন বলল, 'আপনি কিন্তু চমৎকার হেঁয়ালি করতে পারেন কৃষ্ণচূড়া। পাজলের মতো।'

'আমি পাজল ভাঙতেও পারি!'

সিঞ্চনের মনে হল, এই সেই মেয়ে যার জন্য চব্বিশ বছর ধরে সে অপেক্ষা করছে। সে প্রেমে পড়ে গেল।

কিন্তু সেই কৃষ্ণচূড়া যে একটা ছোট বিষয় নিয়ে এমন বাড়াবাড়ি করবে, কে জানত! সিঞ্চনের এবার বেশ বিরক্তই লাগছে। তবু সে নিজেকে সামলেই রাখল। হালকা গলায় বলল, 'ঠিক আছে, অনেক রাগ হয়েছে, এবার মুখ ঘোরাও তো। সুন্দর মুখটা অনেকক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না।'

কৃষ্ণচূড়া মুখ না ঘুরিয়েই বলল, 'দেখার দরকার নেই,'

সিঞ্চন হেসে বলল, 'ঠিক আছে, দেখব না। এই আমি চোখ বুজলাম। এবার তো ফেরাবে।'

মুখ না ফিরিয়েই কৃষ্ণচূড়া থমথমে গলায় বলল, 'কালকের ঘটনা আমি ভুলতে পারছি না।'

সিঞ্চন এবার আর নিজেকে সামলাতে পারল না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'কী ছেলেমানুষের মতো কথা বলছ কৃষ্ণচূড়া? আমি কিছুই করিনি, যা করার তুমিই তো করলে। কিছু না বলে, দুম করে চলে গেলে। আমি কি তোমাকে জোরজবরদস্তি করেছি? বাধ্য করেছি? তোমার ইচ্ছে নেই বুঝতে পেরেই আমি থেমে গিয়েছিলাম। আমি তো আর প্রসিড করিনি।'

কৃষ্ণচূড়া এবার মুখ ফেরাল। সিঞ্চনের মনে হল, তাকে আজ সবচেয়ে বেশি সুন্দর লাগছে। বিষণ্ণ হলে কি সব মানুষকেই বেশি সুন্দর লাগে? কৃষ্ণচূড়া চোখ নামিয়ে খানিকটা অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'প্রসিড করলে তোমারই সমস্যা হত সিঞ্চন।'

'কী যা তা বলছ কৃষ্ণচূড়া! আজকালকার দিনে এটা কোনও বিষয়? তুমি তো দেখছি ঠাকুরমা-দিদিমাদের আমলে পড়ে আছ!'

কৃষ্ণচূড়া শুকনো হাসল। চোখ-মুখের মতো তার দাঁতের সেটিংও চমৎকার। শুধু মুক্তোর মতো ঝকঝকে নয়। মনে হয়, কেউ যেন মেপে মেপে বসিয়ে দিয়েছে।

'তুমি বুঝতে পারছ না সিঞ্চন, বুঝতে পারবেও না।'

'থাক আমার আর বুঝে কাজ নেই। কালকের দিনটা এবার মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলো তো দেখি। কাম অন কৃষ্ণচূড়া! আজ আর অফিস যাব না ঠিক করেছি। চলো, টুক করে কোথাও ঘুরে আসি। অ্যাই, গঙ্গায় নৌকো চড়বে?'

কৃষ্ণচূড়া নৌকা চড়ার প্রস্তাব শুনল বলে মনে হল না। একই রকম বিষণ্ণ গলায় বলল, 'তুমি বুঝতে না পারলেও আমি বুঝতে পারছি। কালকের পর থেকেই বুঝতে পারছি। আমি তোমাকে ঠকাতে পারব না সিঞ্চন। গত তিন মাসে আমি তোমার সঙ্গে বড্ড ইনভলভড হয়ে পড়েছিলাম। এটা উচিত হয়নি।'

কপালের উপর এসে পড়া চুল সরাল কৃষ্ণচূড়া। সিঞ্চন লক্ষ করে দেখেছে, এই কাজটা সে মাঝেমধ্যেই করে। কপাল থেকে চুল সরায়। এই সময় তাকে দারুণ লাগে। শরীরে কেমন একটা শিরশিরানি হয়। ইচ্ছে করে, ঝাঁপিয়ে পড়ে আদর করি। সত্যি কথা বলতে কী, গতকালের ঘটনাটা সেরকমই ছিল। আগে থেকে কোনও পরিকল্পনা ছিল না। গত মাসে তার বস সৌম্যদা কোয়ার্টার পেয়েছে। রুবি পার্কের কাছে চমৎকার জায়গা। থার্ড ফ্লোরে দুটো বড় বড় ঘর। দক্ষিণের জানলাটা খুললেই মস্ত একটা লেক। এতদিন সেই কোয়ার্টার ফাঁকাই

পড়ে ছিল, টুকটাক কাজকর্ম করিয়ে পাটনা থেকে মাকে আনতে গিয়েছে সৌম্যদা। এবার পাকাপাকিভাবে সেট্‌ল করবে। যাওয়ার আগে কোয়ার্টারের চাবি সিঞ্চনকে দিয়ে বলে গিয়েছে, 'একদিন অন্তত গিয়ে দেখে আসিস। ফ্ল্যাটটা ফাঁকা পড়ে থাকবে ক'দিন। চিন্তা হয়।'

কাল সেই ফ্ল্যাটই দেখতে গিয়েছিল সিঞ্চন। বেশিক্ষণ নয়, শুধু একবার ঢুঁ মেরে আসা। কৃষ্ণচূড়াকে নিয়ে যাওয়ার কোনও কথাই ছিল না। সে-ই জোর করল। বলল, 'যাই না, তোমার সঙ্গে তো খানিকটা বেড়ানো হবে।'

'ধুর, এটা আবার বেড়ানো নাকি। এ তো চৌকিদারি। দরজা-জানলা বন্ধ আছে কি না দেখেই চলে আসব।'

কৃষ্ণচূড়া কৌতুক ভরা চোখে বলল, 'আমিও দেখব। দরজা-জানলা বন্ধ আছে কি না আমি দেখতে পারি না বুঝি? টেনেটুনেও দিতে পারি। আমার হাইড্রলিক সিস্টেম, এয়ার মাসল তোমাদের চেয়েও ভাল।'

সিঞ্চন হেসে বলল, 'কী যে ঠাট্টা করো হেঁয়ালিরানি, বুঝতেও পারি না। না না, তোমার গিয়ে দরকার নেই।'

কৃষ্ণচূড়া ঠোঁট ফুলিয়ে জবাব দিল, 'তোমার যখন আপত্তি...'

সিঞ্চন তাড়াতাড়ি বলে, 'দেখো কাণ্ড! আবার রাগ করলে তো! ঠিক আছে বাবা, চলো।'

জানলা বন্ধ কি না দেখার বদলে ঘরে ঢুকে, বেডরুমের জানলা খুলে দিল সিঞ্চন। লেকের বাতাস হু হু করে ঘরে ঢুকে পড়ল। জানলার কাছে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ ঝাপসা হয়ে আছে। ফুলে ফুলে সেই গাছ লাল হয়ে আছে। চুল এলোমেলো করে দেয় কৃষ্ণচূড়ার। সে হাত তুলে চুল ঠিক করতে করতে বলে, 'বিউটিফুল!'

এরপর আর সিঞ্চন নিজেকে সামলাতে পারে না। সে এগিয়ে এসে কৃষ্ণচূড়ার দুটো গাল দু'হাতে আলতো করে ধরে। ঠোঁট নামিয়ে দেয় মুখের উপর। কৃষ্ণচূড়া দ্রুত সরে যেতে চেষ্টা করে। পারে না, সিঞ্চন তার ঠোঁট ঘষতে থাকে কৃষ্ণচূড়ার চোখের পাতায়, কপালে, কানের লতিতে। কৃষ্ণচূড়া বাধা দিতে থাকে। মুখ দিয়ে অস্ফুট আওয়াজ বের হয়। হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে সিঞ্চনের মুখ। ততক্ষণে সিঞ্চন তার বুকের উপর একটা হাত নামিয়ে এনেছে। আঙুলগুলো নড়তে থাকে গভীর আদরে। সরে যেতে গিয়ে জানলার গ্রিলে কৃষ্ণচূড়ার মাথা ঠুকে যায়। কৃষ্ণচূড়া মুখ ঘুরিয়ে এপাশ-ওপাশ করতে থাকে। সিঞ্চন তার ঠোঁট রাখতে চেষ্টা করে কৃষ্ণচূড়ার ঠোঁটে। কখনও পারে, কখনও পারে না। একটা হাত ঘাড়ের পিছনে ধরে অন্যহাতে কৃষ্ণচূড়ার টপের বোতাম খুঁজতে থাকে পাগলের মতো। গাঢ় গলায় ফিসফিস করে বলতে থাকে, 'কৃষ্ণচূড়া, কৃষ্ণচূড়া, আমার কৃষ্ণচূড়া...'

ছিটকে সরে আসে কৃষ্ণচূড়া। সিঞ্চন অবাক হয়। কৃষ্ণচূড়া দ্রুত হাতে অবিন্যস্ত জামা ঠিক করতে করতে বলে, 'আমি চলে যাব...'

'কী হল?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে সিঞ্চন।

'কিছু হয়নি, আমি চলে যাব।'

'সরি কৃষ্ণচূড়া। হঠাৎ কী যে হল,' সিঞ্চন হাত তুলে শান্ত করার চেষ্টা করল। বলল, 'কাম ডাউন কৃষ্ণচূড়া। ইটস ওকে। আই অ্যাম সরি। বলছি তো, আমার ভুল হয়েছে।'

'প্লিজ আমায় ফিরে যেতে দাও, প্লিজ।'

নিজের মাথার চুল ঠিক করতে করতে সিঞ্চন বলে, 'ঠিক আছে বাবা। আমিও তো যাব, আরে, হঠাৎ কী যে হল...'

কৃষ্ণচূড়া আর উত্তর দেয় না। সে সিঞ্চনকে অবাক করে দিয়ে সত্যি সত্যি ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যায় একাই, লিফট ধরে সোজা নেমে আসে নীচে। হতবাক সিঞ্চন নীচে নেমে কৃষ্ণচূড়াকে দেখতে পায় না। মেয়েটা গেল কোথায়? ভ্যানিশ হয়ে গেল নাকি?

এরপরও রাগ করবে না সিঞ্চন। প্রেমিকাকে একটা চুমু খাওয়ার অধিকারও কি তার নেই। শারীরিক আদর বা জামা খোলার চেষ্টাটা না হয় একটু বেশিই হয়ে গিয়েছে। ওরকম সময়ে কি সবকিছু হিসেব করে করা যায়? এর মধ্যে বোঝাবুঝির কী আছে। সে কফির মগ সরিয়ে রেখে বলল, 'তুমি কী বলতে চাইছ, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না কৃষ্ণচূড়া। যদি মনে করো, আমি বাড়াবাড়ি কিছু করছি, আবার বলছি আয়্যাম সরি।'

কৃষ্ণচূড়া সিঞ্চনের চোখের উপর চোখ রাখল। নরমভাবে একটু হাসল। সে হাসিতে আনন্দ নেই। বলল, 'তোমার সরি বলার দরকার নেই। সরি বলছি আমি। সরি সিঞ্চন। আমি অনেক পাজল ভাঙতে পারি, কিন্তু সবটা পারি না। আমাকে ভুলে যাও।'

সিঞ্চন প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, 'সে কী! কী বলছ তুমি! তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? আর ইউ ম্যাড। সামান্য ঘটনার জন্য...'

কৃষ্ণচূড়া কপালে পড়া চুল সরিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'তোমার কাছে সামান্য হলেও আমার কাছে নয়। আমাকে মুখের ভাষা দেওয়া হয়েছে, শরীরের ভাষা দেওয়া হয়নি। এটা কতটা জরুরি এতদিন বুঝিনি, কাল বুঝলাম। আমি তোমার শরীরের সঙ্গে কমিউনিকেট করতে পারলাম না। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও পারলাম না।'

'মানে?'

কিছু একটা বলতে গিয়ে চুপ করে গেল কৃষ্ণচূড়া। সামান্য হাইয়ের মতো তুলল। মেয়েটা কি ক্লান্ত? সিঞ্চন হতবাক হয়ে বসে রইল।

কফির বিল মিটিয়ে দেওয়ার পর কৃষ্ণচূড়া বলল, 'তুমি কি আমাকে একটা ট্যাক্সি ধরে দেবে? আমার খুব ঘুম পাচ্ছে।'

দীর্ঘশ্বাস গোপন করে সিঞ্চন বলল, 'দেব।'

কৃষ্ণচূড়া হেসে বলল, 'ভাড়া দিয়ে দিতে হবে কিন্তু। রাজি তো?' কফি শপ থেকে বেরিয়ে কৃষ্ণচূড়া তার গোলাপি রঙের ছোট্ট ছাতাটা খুলে মাথায় ধরল। সিঞ্চন পাশে হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'তুমি কি আর-একবার ভাবতে পারো না কৃষ্ণচূড়া?'

কৃষ্ণচূড়া মুখ ফিরিয়ে বলল, 'না পারি না। যে ক্ষমতা আমার নেই, আমাকে দেওয়া হয়নি, তা নিয়ে ভাবতে পারি না।'

কে সিক্স মডেলকে পাওয়া গেল কাকভোরে। ইনস্টিটিউটের গেটের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসে ছিল। যেন ঘুমিয়ে আছে। তার এয়ার মাসল, পিস্টন, চিপস, সেন্সর, হাইড্রলিক সিস্টেম কোনওটাই কাজ করছে না। দেখলেই বোঝা যাচ্ছে, মডেল তার যাবতীয় ইন-বিল্ট চার্জ ফুরিয়ে ফেলেছে। ড. মণিময় সামন্ত খবর পেয়েই ছুটে এলেন।

উনিশ কুড়ি, ১৯ জুন ২০০৯

মৃত

প্রথম ঘটনাটা ঘটল তিন দিনের মাথায়। তখনও ফ্ল্যাটে বাসি ফুলের গন্ধ। এদিক ওদিক দু'-একটা উপহারের মোড়ক উড়ে বেড়াচ্ছে। বেড়াচ্ছে। আওয়াজ হচ্ছে খচমচ খচমচ।

চোখ খুলেই বাঁধন বুঝতে পারল ভয় করছে। জানা ভয় নয়, অজানা ভয়। ভোঁতা এক ধরনের অনুভূতি। সেই অনুভূতি সারা শরীরে পাক মেরে মেরে তাকে ঘুম থেকে টেনে তুলেছে, তারপর জমাট বেঁধে থমকে দাঁড়িয়েছে মাথার পেছনে।

বিছানায় উঠে বসে বাঁধন। রাত কত? ঘড়িটা কোন দিকে? মনে পড়ছে না। বরানগরে টেবিল ক্লকটা থাকত খাটের পাশে, অঙ্কুরের পড়ার টেবিলে। কাঁটায় রেডিয়াম জ্বলত। রাতে সময় দেখা যেত না, শুধু একটা আবছায়া সবুজ সবুজ ভাব। এ ঘরেও ঘড়ি আছে। ওয়াল ক্লক। ফ্রেমের গায়ে লতাপাতার নকশা। কিন্তু দেওয়ালটা মনে পড়ছে না, শুধু ফ্রেমের লতাপাতাটা মনে পড়ছে। খানিক আগে পর্যন্ত এসি মেশিনটা ঝিঁঝি পোকার মতো আওয়াজ করছিল। এখন যেন গোঙাচ্ছে। এসি মেশিনে অভ্যেস নেই বাঁধনের। এরা কি রাতে গোঙায়? কে জানে হয়তো গোঙায়।

বাঁধনের বিয়ে হয়েছে মোটে তিন দিন হল। পাশে শুয়ে থাকা মানুষটার মতো এখনও এই ঘর অচেনা। অন্ধকারও অচেনা। চোখ সওয়াতে অসুবিধে হয়। মশারির ভেতর থেকে চার পাশে তাকিয়ে বাঁধনের মনে হল, গত দু'দিনের তুলনায় আজকের অন্ধকারটা বেশি। এরকম মনে হওয়ার কোনও কারণ নেই। আজকের অন্ধকার বেশি হবে কেন?

সাত বছরের ছোট হলে কী হবে অঙ্কুর তাকে বারবার সাবধান করেছিল। বলেছিল, 'দেখিস দিদি, শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে যেন দুম ধাড়াক্কা ভয় পেয়ে বসিসনি। তুই যা ভিতু।'

কথাটা ঠিক। সুন্দরী মেয়েরা সাধারণত দু'ধরনের হয়। ডাকাবুকো অথবা ভিতু। বাঁধন হল দ্বিতীয় ধরনের। সে একজন শান্ত এবং ভিতু প্রকৃতির মেয়ে। কদিন আগে পর্যন্ত সন্ধের পর বাড়িতে একা থাকার কথা কল্পনাও করতে পারত না। বাবা, মা বা অঙ্কুর কাউকে না কাউকে থাকতেই হবে। একেবারে কিছু না হলে পাশের বাড়ির বুলুকে ডেকে আনত। বলত, 'বুলু, ঘুগনি হয়েছে, খেয়ে যাবি?' বুলু হেসে বলত, 'ঘুগনি খাব, কিন্তু আমি জানি তুমি ঘুগনির জন্য ডাকছ না বাঁধনদি। বাড়িতে নিশ্চয় কেউ নেই।'

বাঁধন ভাইকে চোখ পাকিয়ে বলল, 'মারব এক থাপ্পড়। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে খামোকা ভয় পাব মানে?'

অঙ্কুর কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ভয় মানুষ খামোকাই পায়। নিজেকে দেখে বুঝতে পারিস না? এই ধেড়ে বয়েসে ছায়া দেখে কেঁপে উঠিস, জানলায় খুট শুনে ফ্যাকাশে মেরে যাস,

রাতে বাথরুমে যেতে হলে আমাকে ডাকিস— এর কি কোনও কারণ আছে? শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে যদি একই কাণ্ড করিস, তা হলে তোর নাম হয়ে যাবে ভিতুরানি। সবাই বলবে, 'এই যে ভিতুরানি, এক গেলাস জল দাও দেখি।'

বাঁধন হাত বাড়িয়ে অঙ্কুরের ডান কনুইতে চিমটি কাটে, ঠোঁট উলটে বলে, 'বয়ে গেছে ভয় পেতে, ওই ফ্ল্যাট তোমাদের এই বরানগরের বাড়ির মতো ড্যাম্প ধরা নয় যে দেওয়ালে বড় বড় ছায়া পড়বে। ঘরদোর রং করা সব। একেকটা ঘরে একেক রকম রং। মাঝরাতে বাথরুম পেলে উঠোন পেরিয়ে যেতে হয় না। শোওয়ার ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচড। ঘরে ঝলমলে আলো। এখানকার মতো অন্ধকার, নোংরা, গা ছমছমে সিঁড়ির তলাও নেই, রান্নাঘরের টিনের চালও নেই। ভূত বাসা বাঁধবে কোথায়?'

অঙ্কুর হাই তুলে গম্ভীর গলায় বলল, 'জামাইবাবুর সাইজটাও ভাল। মনে হয় না ভূত তার বউকে অ্যাটাক করতে সাহস পাবে। সব দিক দেখেই তো পাত্র পছন্দ করা হয়েছে।'

'ক্লাস টেনের ছেলের পাকা পাকা কথা। মারব এক চড়।'

বাঁধন হাত তুলে ভাইকে চড় মারতে যায়। অঙ্কুর উঠে পালায়।

অঙ্কুরের কথাটা পুরো ঠিক নয়, আবার পুরো ভুলও নয়। বাঁধনের বাড়ির লোক আগে ছেলে পছন্দ করেনি। ঘটনাটা হয়েছে উলটো। মেয়ে পছন্দ করেছে অতীশ নিজে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে ফটো চেয়ে পাঠিয়েছিল। তারপর এক রবিবার হুট করে এসে হাজির। ব্যাবসার কাজে কলকাতায় এসেছিল। মেয়েও দেখে গেল। সঙ্গে দূর সম্পর্কের এক পিসিকে এনেছিল। তিনি কলকাতায় থাকেন। সে এক অদ্ভুত কাণ্ড। আগে থেকে বলা কওয়া কিছু নেই, একটা টেলিফোনও করেনি। প্রমথবাবু বাড়ি ছিলেন না। মুদির দোকানে গিয়েছিলেন মাসকাবারি আনতে। অঙ্কুর মোটা টেস্টপেপার হাতে নিয়েই ছুটল বাবাকে খবর দিতে। তাড়াহুড়ো করে ফিরতে গিয়ে ভদ্রলোক হাতেই ডালের ঠোঙা ফাটিয়ে ফেললেন। ঘেমে নেয়ে একসা হয়ে হবু জামাইয়ের সামনে তিনি যখন গিয়ে দাঁড়ালেন তখন হাত ভরতি মুসুর ডাল!

ঘটনা শুধু এটুকুই নয়, আরও আছে। বাঁধনদের বাড়িতে মাসে একদিন করে রান্নাঘর আর একদিন করে বাথরুম ধোয়া হয়। মৃন্ময়ীদেবী কোমরে আঁচল গুঁজে, হাতে শলা ঝাঁটা নিয়ে সকাল থেকে নেমে পড়েন। ঝাঁটায় বিশ্রী আওয়াজ হয়। সবাই আপত্তি করলেও মৃন্ময়ীদেবী শোনেন না। তাঁর বিশ্বাস ঝাঁটার আওয়াজ ছাড়া বাথরুম, রান্নাঘর সাফ হয় না। সেই রবিবার ছিল রান্নাঘরের পালা। যথারীতি ঝাঁটায় আওয়াজ তুলে রান্নাঘর ধুচ্ছিলেন মৃন্ময়ীদেবী। কে এসেছে দেখতে তিনি যখন বেরিয়ে আসেন তখনও হাতে ঝাঁটা। নার্ভাস হয়ে তিনি বেশ কিছুক্ষণ হাত থেকে ঝাঁটা নামাতে ভুলে যান।

এ তো গেল পাত্রীর বাবা-মায়ের অবস্থা, খোদ পাত্রীরও সেদিন ছিল বাজে পরিস্থিতি। তার চলছিল জ্বর। দু'দিন স্নান নেই। চোখ মুখ বসা, চুল উসকো খুসকো। খাটে চাদর মুড়ি দিয়ে গুটিসুটি দিয়ে পড়ে ছিল বেচারি। তাকে ডেকে তুলে যখন বলা হল 'ওরে তোকে দেখতে এসেছে' তখন তার গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে, চোখ দুটো লাল।

তবে 'মেয়ে দেখা' বেশিক্ষণের হল না। অতীশ বাঁধনকে বলল, 'জ্বর কত?'

বাঁধন ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে। এ বাড়িতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় জ্বর মাপার রীতি নেই। থার্মোমিটারে জ্বর দেখা হয়েছিল, সেই আগের দিন। বাঁধন বুঝতে পারছিল না সেটা বলা কি ঠিক হবে? ছেলে বলল, 'চোখ দেখে মনে হচ্ছে একের ওপর। যান শুয়ে পড়ুন। বেশি করে জল খাবেন। ভাইরাল ফিভারে রেস্ট আর জল শরীরের পক্ষে ভাল।'

বাঁধন দুর্বল শরীরে নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়ে। চোখ বুজেই বুঝতে পারে, বয়স্ক, কালোকুলো মানুষটাকে তার পছন্দ হয়ে গেছে। কেমন সুন্দর করে বলল, 'যান শুয়ে পড়ুন। বেশি করে জল খাবেন।' স্বামী এরকমই হওয়া উচিত। অল্প কথার মানুষ আর কেয়ারিং। আর কী পার্সোনালিটি! জল খেতে বলছে না তো যেন অর্ডার করছে। ভেদামারা, মিনিমিনি পুরুষমানুষকে আর যেভাবেই ভাবা যাক না কেন, স্বামী হিসেবে ভাবা অসহ্য। মানুষটা কী করে বুঝল তার জ্বর একের ওপর? চোখ দেখে জ্বর বোঝা যায়? থার্মোমিটারটা এনে একবার মেপে দেখলে কেমন হয়? থাক কেউ দেখে ফেললে একটা লজ্জার ব্যাপার হবে।

ছেলে এবং পিসিমা সে দিনই 'হ্যাঁ' বলে গেল।

পাত্রের বয়স বেশি বলে মৃন্ময়ীদেবীর খুঁতখুঁতানি ছিল। শুধু বয়স বেশি নয়, ছেলে দেখতে শুনতেও তেমন নয়। চেহারায় একটা থলথলে ভাব। প্রমথবাবু সেই কথা শুনে এই মারেন তো সেই মারেন।

'ছেলের আবার চেহারা কী? অ্যাঁ। জামাই কি তোমার ফিল্মে নামবে? ইনকামটা দেখেছ? কত বড় ব্যাবসা। ফ্ল্যাট, গাড়ি সব আছে। কলকাতাতেও একটা ফ্ল্যাট কিনবে প্ল্যান আছে। তবে? আর কী চাই?'

মৃন্ময়ীদেবী বললেন, 'তবু বয়সটা দেখবে না? বাঁধনের সঙ্গে ডিফারেন্স কত হচ্ছে বলো তো? চোদ্দো-পনেরো তো হবেই। নাকি তার থেকেও বেশি?'

ক্রুদ্ধ প্রমথবাবু বললেন, 'যতই হোক, যত খুশি হোক। চোদ্দো-পনেরো কেন, একশো, পাঁচশো হলেও কিছু এসে যায় না। স্বামী বয়েসে বড় হওয়াটাই মঙ্গল। চ্যাংড়াদের মতো পিঠোপিঠি বিয়েতে কী কাণ্ড হয় দেখোনি? ঘরে ঘরে ডিভোর্স। আগেকার দিনে এসব ছিল না। তখন নিয়ম ছিল, স্বামী বয়েসে বড় হবে। স্ত্রীকে বকাঝকা দেবে, সেরকম হলে দু'-একটা চড়ও লাগাতে হবে। মৃন্ময়ী, জেনে রাখবে সংসার টেকে শাসনে, চ্যাংড়ামিতে নয়। তা ছাড়া আরও একটা সুবিধে আছে।'

মৃন্ময়ীদেবী চোখ বড় করে বলেন, 'কী সুবিধে?'

প্রমথবাবু ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, 'বাড়িতে আর কেউ নেই। বাবা, মা মরেছে ছেলেবেলায়। আত্মীয়স্বজন বলতে শুধু ওই পিসি। তাও থাকে কলকাতায়। ঘটনা বুঝতে পারছ মৃন্ময়ী? সংসার শুধু তোমার মেয়েরই হবে। এমন চান্স তুমি কোথায় পাবে?'

মৃন্ময়ীদেবী কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। কথাটা ঠিক। শ্বশুর-শাশুড়ির হ্যাপা হল ভয়ংকর হ্যাপা। এ ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে বাঁধন সেই হ্যাপা থেকে রক্ষা পাবে। এটা সত্যি একটা সুযোগ।

'তাও তুমি একবার বাড়ি ঘরদোর দেখে এসো বাপু। একেবারে অচেনা ঘরে মেয়ে পাঠাবে? তার ওপর অত দূর।'

'অত দূর! আজকাল বিয়ে করে মেয়েরা দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে, আর তুমি এক রাতের ট্রেন জার্নিকে বলছ অত দূর। হাসালে মৃন্ময়ী। ছেলে দেখেছি, এবার ছেলের ঘরও দেখব। তুমি আমি দু'জনে গিয়েই দেখব। অতীশ তো নেমন্তন্ন করেই গেল, ভেরি ফেয়ার। এই শনিবারই চলো। এ জিনিস ফেলে রাখার নয়। ফেলে রাখলে হাতের কার্তিক, গণেশ একসঙ্গে পায়ে ঠেলা হবে।'

মৃন্ময়ীদেবী বললেন, 'তোমার দেখি বেশি উৎসাহ, আমি কিন্তু বাপু জামাইয়ের বাড়িতে থাকতে পারব না।'

স্ত্রীর মুখে 'জামাই' শুনে খুশি হলেন প্রমথবাবু। অল্প হেসে বললেন, 'তা কেন? হোটেলে উঠব, বিকেলে গিয়ে ঘুরে আসব একবার। পর দিন সকালেই ব্যাক। সেইমতো টিকিট করে নিচ্ছি। তবে সে সবের আগে মেয়েকে জিজ্ঞেস করো। তার মতটাও দেখতে হবে। পরে যেন কিছু না বলে।'

বাঁধন কিছুই বলল না। মায়ের প্রশ্নে মুখ নামিয়ে শুধু ঘাড় নাড়ল। লজ্জায় তার গাল চিকচিক করে উঠল। বিড়বিড় করে বলল, 'মা, থার্মোমিটারটা দাও তো দেখি জ্বর কত। আমার তো মনে হচ্ছে জ্বর এক-ই হবে। তোমার কী মনে হয়?'

মৃন্ময়ীদেবী রেগে বললেন, 'আমার কিছু মনে হয় না।'

হবু জামাইয়ের ওখান থেকে ফিরে মৃন্ময়ীদেবী উত্তেজিত। টানা দু'দিন ধরে বর্ণনা চলল, সঙ্গে উপদেশ।

'দেখিস বাঁধন, গিজার চালাবি সাবধানে। গরম জলে ছেঁকা খাসনি যেন। ওয়াশিং মেশিনে কাপড় দেওয়ার আগে ভাল করে যন্ত্রটা বুঝে নিবি। হুটহাট এসি চালিয়ে শুবি না। তোর কিন্তু ঠান্ডার ধাত। অতীশ আবার সব ঘরেই এসি লাগিয়েছে। কী যে করে না ছেলেটা, বাড়াবাড়ির একশেষ। আর হ্যাঁ, শোন, বাথরুমে খুব সাবধান। যদিও কাচাকাচির কোনও ব্যাপার নেই। সব আলাদা আলাদা কাজের লোক। তবে স্নানের সময় তেল, শ্যাম্পু ফেলেছিস কী পা হড়কে মরবি। মেঝে মার্বেল পাথরের। এমনি মার্বেল নয়, অতীশ বলল, কুয়েত না বাগদাদের পাথর। ওখানকার পাথর হল গিয়ে একেবারে তোর বেস্ট কোয়ালিটির। ময়লা ধরে না।'

এর পরই অঙ্কুর বলে, 'আঃ মা, পাথরের গল্প থামাবে? দিদির তো পাথরের সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে না।'

বাঁধনের বাবা-মা অনুষ্ঠান চেয়েছিল। একবারে ছাঁদনাতলায় পিঁড়ি বসিয়ে, যজ্ঞ করে বিয়ে হবে। সানাই বাজাবে, লোক খাবে। অতীশ রাজি হয়নি। সে চায় শুধু রেজিস্ট্রি। পর দিন ভোরেই বউ নিয়ে চলে যাবে।

'আপনারা অনুষ্ঠান করতে পারেন, কিন্তু সে ক্ষেত্রে আমাকে বাদ দিতে হবে। আমি মনে করি, বিয়ে একটা পারসোন্যাল ম্যাটার। স্বামী-স্ত্রী ছাড়া এর সঙ্গে অন্যদের কোনও সম্পর্ক নেই। তার ওপর ফালতু অনেকগুলো টাকা খরচ। তার থেকে বড় কথা, এখন আমার কাজের চাপ অতিরিক্ত বেশি। সামনে একটা বড় অর্ডার আছে। ইনফ্যাক্ট কাজের জন্যই আমি এতদিন বিয়ের মধ্যে যাইনি, সময় পাইনি। বিয়ের দিনও আমি কলকাতায়

কাজ করব। কাজ সেরে আসতে আসতে সন্ধে। আশা করি আপনারা আমাকে অনুমতি দেবেন।'

ফেরার পথে ট্রেনে মৃন্ময়ীদেবী মুখ শুকনো করে স্বামীকে বললেন, 'এ কীরকম কথা গো। একটা মাত্র মেয়ে, বিয়েতে আচার অনুষ্ঠান হবে না।'

প্রমথবাবু স্ত্রীকে চড়া গলায় বললেন, 'ভাল কিছু পেতে গেলে কিছু ছাড়তে হয় মৃন্ময়ী। এই ছেলে একটু ভাল নয়, অতিরিক্ত ভাল। সে শুধু অনুষ্ঠান বাদ দিল না, শ্বশুরমশাইয়ের গাদাখানেক টাকাও বাঁচিয়ে দিল।'

বিয়ে হল চুপচাপই। অতীশ যেমন চাইল। শুধু রেজিস্ট্রি। অতীশের দিকের আত্মীয়স্বজন বলতে পিসিমা ছাড়া দু'-একজন। একটা দিন কলকাতায় থেকে পরদিন ভোরেই নতুন বউ নিয়ে রওনা দিল অতীশ।

এসি মেশিনের গোঙানিটা বেড়েছে। যেন এই হঠাৎ জেগে ওঠা নবপরিণীতাকে কিছু বলতে চাইছে, পারছে না বলে গোঙাচ্ছে। বাঁধন মনে সাহস আনার চেষ্টা করল। লাভ হল না। মনে হল, আর একটু পরেই বাইরের অন্ধকার এবার মানুষের মতো মশারি তুলে ভেতরে ঢুকে পড়বে। অতীশের দিকে তাকাল। অন্ধকারে ঘুমন্ত মানুষটাকে মনে হচ্ছে ছায়া। মাথা, হাত-পা, পিঠ সব ছায়া। কাঁপা গলায় বাঁধন ডাকল—

'অ্যাই শুনছ? শুনছ? উঠবে একবার?'

অতীশ শুনল না। উলটো দিকে মুখ করে শুয়েই রইল। প্রথম রাত থেকেই অতীশ উলটো দিক ফিরে শোয়। অথচ স্বামী স্ত্রীর প্রথম রাত নিয়ে কতরকম গল্প শুনেছে বাঁধন। তারা মুখোমুখি শুয়ে সারারাত ফিসফিস করে কথা বলে। সিরিয়াস কিছু নয়, হাবিজাবি সব কথা। বলতে বলতে দু'জন দু'জনকে আদর করে। কখনও চাপা গলায় হাসে, কখনও রাগ করে। সব শেষ করে যখন ঘুমোতে যায় তখন দেখে, রাত ফুরিয়ে গেছে, বাইরে আলো!

বাঁধনের বেলায় এরকম কিছুই হয়নি। যা হয়েছিল তা যেমন অদ্ভুত, তেমন ভয়াবহ রকমের অপমানের। খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও মানুষটা সম্পর্কে বাঁধনের ধারণা নড়ে গিয়েছিল।

বউভাত বলে আলাদা করে কিছু হয়নি, শুধু রাতে অল্প কয়েক জনের খাওয়ার ব্যবস্থা। সবাই ব্যাবসার লোক। ফ্ল্যাটটা শহর থেকে খানিকটা দূরে। জায়গাটা ফাঁকা ফাঁকা। দুম করে রাত নামে। সবাই তাড়াহুড়ো করল। দশটা বাজতে না বাজতেই ফ্ল্যাট ফাঁকা। বাঁধনকে নিয়ে খেতে বসল অতীশ। বাঁধন কিছুই মুখে তুলতে পারল না। খুঁটে খুঁটে প্লেট সরিয়ে রাখল। অতীশ উঠে গিয়ে ফ্রিজ থেকে পুডিং বের করে আনে। নরম গলায় বলে, 'একটু খাও। সারাদিন ধকলের পর একদম খালি পেট ভাল না। ঠান্ডা জিনিস, দেখো, ভাল লাগবে।'

ঠান্ডা কিছু বাঁধন খায় না। গলায় ব্যথা করে। কিন্তু পুডিং খেল। মনে হল অমৃত!

ডিনার শেষ হলে অতীশ বলল, 'হালকা কিছু মিউজিক শুনবে বাঁধন? বাঁশি? হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া শুনতে পারো। ঘুমের আগে হালকা মিউজিক ঘুমের জন্য ভাল। স্টিমুলেশনের কাজ করে।' বাঁধন চুপ করে রইল। কী উত্তর দেবে সে বুঝতে পারছে না। সে শুধু মুগ্ধ। মুগ্ধ মানুষ কথার উত্তর দিতে পারে না। অতীশ বলল, 'বাজনা শুনতে ইচ্ছে না করলে, বই

দেখতে পারো। গত মাসে ছবির ওপর একটা কালেকশন নিয়েছি। ক্লাসিকাল পেইনটিংস। মাটিস, টিনটোরেটো, রাফেল। নাম শুনেছ?'

বাঁধন মাথা নামিয়ে লাল বেনারসির আঁচলে আঙুল পাকাতে পাকাতে মাথা নাড়ল। অতীশ সামান্য হেসে বলল, 'অসুবিধে কিছু নেই, শুনে নেবে। অনেক সময় পাবে। আমার এখানে কাজের লোকেরা সকাল সকাল কাজ সেরে চলে যায়। তারপর গোটা দিন ইউ উইল গেট প্লেনটি অব টাইম।'

বাঁধন যেন কিছুই শুনতে পাচ্ছিল না। গদগদ মুখে বসে ছিল, আর ভাবছিল 'এত সুন্দর! আমার বর এত সুন্দর!'

তখনও সে জানত না সুন্দর মানুষটা খানিকক্ষণের মধ্যে বদলে যাবে।

অতীশ বিছানায় উঠেছিল পায়জামা পাঞ্জাবি পরে। ধূসর রঙের পাঞ্জাবি। বুকের কাছে সুতোর কাজ। বাঁধন বেনারসি ছাড়েনি। ছেড়ে হালকা কিছু পরলে হত। অতীশ হাই তুলল। হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল। তারপর পাঞ্জাবি খুলতে খুলতে স্বাভাবিক গলায় বলল, 'নাও, কাপড় খোলো। অনেক রাত হয়েছে। কাল আবার সকালে বেরোনো।'

বাঁধন চমকে উঠল। মুখ ফেরাল স্বামীর দিকে। সে কী শুনছে!

অতীশ শান্ত গলায় বলল, 'শাড়ি-টাড়ি খুলে মাটিতে ফেলে দাও। সাবধানে ফেলবে, মশা না ঢোকে। এদিকটায় মশা বেশি। এসি চালালেও মশারি লাগে।' বাঁধন নিথর হয়ে বসে রইল। এ কেমন কথা! কাপড় খোলো! অতীশ ভুরু কুঁচকে বলল, 'দেরি করছ কেন?'

বাঁধন শিউরে উঠল। ভালবাসা কই? আদর সোহাগ কই? প্রথম দিন স্ত্রীকে কেউ এমনভাবে বলে নাকি! মনে হচ্ছে স্ত্রী নয়, সে একটা বেশ্যা। ভাড়া করা বেশ্যা।

অতীশ এবার কঠিন গলায় বলল, 'শুনতে পেলে না কী বললাম?'

বাঁধনের কান্না পেল। সে মুখ ফিরিয়ে নিচু গলায় বলে, 'আমার শরীর ভাল নেই।'

'কী হয়েছে? জ্বর?'

'না বমি পাচ্ছে।'

'যাও, বাথরুমে গিয়ে বমি করে এসো, আমি অপেক্ষা করছি। সায়া ব্লাউজ খুলে ঘরে আসবে। আমি দেখব।'

এবার অতীশের গলা যেন খানিকটা হিংস্র। চোয়াল শক্ত। দাঁতে দাঁত ঘষার শব্দ হল কি?

বাথরুমে গিয়ে বাঁধন বেসিনের কল খুলে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলে। এ কোন মানুষের সঙ্গে বিয়ে হল তার! এসব কী কথা! সায়া ব্লাউজ খুলে ঘরে আসবে! কীভাবে আসবে? উদোম হয়ে? ঘরে ঝলমল করছে আলো। নিয়ন তো আছেই, সিলিং-এ ঝোলানো ছোট্ট বাহারি ঝাড়টাও জ্বলছে। আলো না থাকলেই বা কী হত? ওইভাবে হেঁটে আসত অচেনা মানুষটার সামনে? ছি ছি। সভ্য, সুস্থ কোনও মানুষ এমন কথা বলতে পারে? যদি সে রাজি না হয়? মনে হচ্ছে, মানুষটা জোর করবে। শাড়ি টেনে খুলবে। ব্লাউজ ছিঁড়বে। তারপর? মা গো!

কল থেকে ঝরে পড়া জলে হাত রেখে আতঙ্কে কেঁপে উঠল বাঁধন। কাঁদতে কাঁদতে সে কাঁধের ওপর লাগানো ক্লিপটা খুলতে থাকে। শাড়ির আঁচল নামিয়ে জামার বোতামে হাত

রাখে। রেখে থমকে যায়। সে পারবে না, মরে গেলেও পারবে না। বেসিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে বাঁধন।

বমি হল না। মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে বাঁধন ঘরে এসে দেখল, অতীশ ঘুমিয়ে পড়েছে। তার মুখ উলটো দিকে ফেরানো।

শরীর জোড়া অপমান নিয়ে ফুলশয্যার রাতটা জেগে কাটিয়ে ছিল বাঁধন। অতীশ বিছানায় কোনও ফুল দিতে দেয়নি। ফুলের গন্ধে নাকি তার মাথা ধরে। মৃন্ময়ীদেবী সন্ধেবেলায় কলকাতা থেকে ফোন করেছিলেন। খাটে ফুল দেওয়া হয়নি শুনে অবাক গলায় বলেছিলেন, 'এটা কেমন কথা? ফুলশয্যার দিন বিছানায় কোনও ফুল থাকবে না?'

বাঁধন শুকনো হেসে বলেছিল, 'থাক মা, উনি যখন চান না। সব মানুষ কি একরকম হয়?'

সব মানুষ যে একরকম হয় না, বাঁধন তার পরের দুটো দিনে আরও বুঝেছে। দিনে নয়, বুঝেছে রাতে। অতীশ আর একদিনও ওসব কথা বলেনি। সারাদিন স্বাভাবিক। যেন কিছুই হয়নি। রাতে বাড়ি ফিরে ডিনার সেরে, বসার ঘরে ব্যাবসার কাজ সেরেছে কম্পিউটারে। তারপর এসে শুয়ে পড়েছে। পড়েই নিঃসাড়ে ঘুমিয়েছে। সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্ত, বিধ্বস্ত যেন। বাঁধন জেগে অপেক্ষা করেছে। ভেবেছে, এই বুঝি অতীশ জেগে উঠবে। আলতো ছুঁয়ে দিয়ে বলবে, 'সরি, সেদিন মজা করেছিলাম। এসো, কাছে এসো।'

অতীশ জাগেনি। একসময় ঘুমিয়েও পড়েছে বাঁধন।

আজ অতীশ বেরিয়ে যাওয়ার পর পরই বিপাশা ফোন করল। বিপাশা কলেজ ছেড়েছে অনেক দিন, কিন্তু এখনও কলেজ বয়েসের ফাজলামি ছাড়েনি। ফোন ধরেই হড়বড় করে বলতে শুরু করল—

'অ্যাই, বাঁধন কিচ্ছু সেন্সর করবি না, একটা সিনও না। কী হল সব বল। সেই ফুলশয্যা থেকে শুরু কর।'

বাঁধন লজ্জা পেয়ে বলল, 'দূর, কী যে বলিস না। ওসব কিছু হয়নি।'

বিপাশা অবাক গলায় বলল, 'ওমা হয়নি কী রে! তমাল তো প্রথম রাতেই এমন কাণ্ড করল যে দুটো ট্যাবলেটেও তিন দিন গায়ের ব্যথা মরে না। হটব্যাগ, আইসব্যাগ সব লাগল। হি হি।'

বাঁধন গাঢ় গলায় বলল, 'যাঃ খালি ফাজলামি। সবাই কি তোদের মতো? তোদের ছিল প্রেমের বিয়ে, চেনা মানুষ। আমাদের চিনতে বুঝতে সময় লাগবে না? তা ছাড়া এই মানুষটা অন্যরকম। খুব গম্ভীর। একটু রাগীও। মনে হয় একা থাকতে থাকতে এরকম হয়ে গেছে। সারাদিন ঠিক আছে। রাতে শুয়েই ঘুম। তাও আবার উলটো পাশ ফিরে।'

বিপাশা গলা গম্ভীর করে বলল, 'রাগী লোকেরা কিছু করে না তোকে কে বলল বাঁধন?'

বাঁধন এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে শান্ত গলায় বলল, 'না রে সত্যি বলছি। এখনও...। মনে হয় সারাদিন খাটাখাটনিতে ক্লান্ত থাকে।'

বিপাশা হাসতে হাসতে বলল, 'ও কিছু নয়। প্রথম প্রথম ওরকম হয়। ক'দিন পরে দেখবি ওই লোক তোর কী কাণ্ড করে, মাই ডিয়ার ঘুম ভাঙানোর ব্যবস্থা করো। পাশ ফেরাও সোনা।'

‘ব্যবস্থা? সেটা কী!’

বিপাশা হাসতে হাসতেই ফিসফিস করে ‘ব্যবস্থা’ বলে। টেলিফোনেই কান গরম হয়ে উঠল বাঁধনের। সে হাত তুলে বলল, ‘একটা চড় খাবি অসভ্য কোথাকার। ছি ছি আমি ওসব পারব না।’

পায়ের কাছে ঘরের একমাত্র জানলাটা বন্ধ। বাইরের আলো যে চলকে ঢুকবে তার উপায় নেই। একটা আবছা আলোর মতো থাকলে হয়তো এতটা ভয় হত না। কাল সকালে অতীশকে নাইট ল্যাম্পের কথা জিজ্ঞেস করেছিল বাঁধন। অতীশ তখন অফিস যাওয়ার জন্য তৈরি। সুটের ওপর টাই বাঁধছে।

‘রাতে ঘরে কোনও আলো জ্বলে না?’

আয়না থেকে ঘুরে দাঁড়াল অতীশ। বলল, ‘রাতে আলো! রাতে আলো কীসের? রাত তো অন্ধকার।’

‘ঠিক আলো নয়, ওই যে নাইটল্যাম্প, কম পাওয়ারের, আছে না? আমাদের বরানগরের বাড়িতে ছিল। আমি আর অঙ্কুর যে ঘরে শুতাম সারারাত জ্বলত। একেবারে সেই ভোর পর্যন্ত।’ বাঁধন উৎসাহের সঙ্গে বলে।

মুখ ঘুরিয়ে অতীশ আবার টাইতে মন দেয়। গম্ভীর গলায় বলে, ‘বাঁধন, এটা বরানগরের বাড়ি নয়। একেকটা বাড়ির একেকটা অভ্যেস। তোমাদের অভ্যেস আলো। আমার অভ্যেস অন্ধকার।’

বাঁধন ঢোক গিলে বলল, ‘নতুন জায়গা তো, এখনও ভাল করে চিনি না।’

হাতে গাড়ির চাবি তুলে অতীশ বলে, ‘চিনে নেবে। একদিনে সব চেনা যায় না।’

আর নাইটল্যাম্পের কথা তোলেনি বাঁধন। তবে ফাজিল বিপাশার ‘ঘুম ভাঙানোর ব্যবস্থা’ শুনতে শুরু করল পরের দিন থেকে। তবে পুরোটা নয়, খানিকটা। বিপাশা চাদরের কথা বলেনি। বাঁধন তবু চাদর নিয়েছে। লজ্জা করেছে। অতীশ ঘুমিয়ে পড়ার পর, চাদরটা টেনে নিয়ে অন্ধকারেই নিজের পোশাক খুলেছে। বিপাশা বলেছিল, ‘লজ্জার কী আছে? তোর বর না? নাকি অন্য কেউ? গাধা একটা। সেজেগুজে মটকা মেরে পড়ে থাকবি, দেখবি মুখ ফেরানো মানুষ মাঝরাতে উঠে তোকে ওই অবস্থায় পেয়ে কী ঝামেলা পাকায়। আর শোন, একটু ওদিকে ঘেঁষে শুবি। ঘুমের ঘোরে অতীশদার হাত যেন ঝপাং... হি হি।’

অপেক্ষা করা না ‘মটকা মারা’? বাঁধন জানে না। তবে অপেক্ষা করতে করতে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম ভাঙল ভয়ের কারণে।

বাঁধন আবার অতীশকে ডাকল। এবার জোরে।

‘এই যে, এই যে শুনছ? উঠবে একবার? ওঠো না।’

ভয়টা বাড়ছে। এতক্ষণ মনে ছিল না, নড়তে গিয়ে বাঁধনের মনে পড়ল, তার গায়ে কিছু নেই। সে নগ্ন। চাদরটা গলার কাছে এক হাতে চেপে ধরে স্বামীর দিকে সরে গেল। আর তখনই শরীরে যেন বিদ্যুৎ বয়ে গেল তার। শিউরে উঠল বাঁধন। মনে হল, ওপাশ ফিরে শুয়ে থাকা মানুষটা ঘুমিয়ে নেই, মানুষটা মরে আছে! সাড়াহীন, স্পন্দনহীন, শ্বাস-প্রশ্বাসহীন একটা মরা মানুষ শুয়ে আছে পাশে!

ছিটকে সরে এল বাঁধন। দ্রুত হাতে মশারি সরিয়ে খাট থেকে নামতে গিয়ে হোঁচট খেল। নিজেকে সামলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে গিয়ে বুঝল পা কাঁপছে। দুটো পা-ই কাঁপছে থরথর করে। মেঝেতে পড়ে যাওয়া চাদরটা বুকের ওপর টেনে তুলল কোনওরকমে। খানিকটা জমাট বাঁধা অন্ধকার দিয়ে শরীরটা ঢাকল যেন! কী করবে এখন? কী করবে সে? কোথায় যাবে? পালাবে? আলোর সুইচগুলো কোথায়? কোন দেওয়ালে? বাঁ দিকে? না ডান দিকে? ঘরের দরজাটা? মনে পড়ছে না। কিচ্ছু মনে পড়ছে না। এক-একটা মুহূর্ত মনে হচ্ছে অনন্ত। মনে হচ্ছে যুগের পর যুগ কেটে যাচ্ছে। শীতে কেঁপে কেঁপে উঠল বাঁধন। একটা কিছু করতে হবে। কী করতে হবে জানা নেই, কিন্তু করতে হবে। প্রায় মরিয়া হয়ে বাঁধন ঝাঁপিয়ে পড়ল পাশের দেওয়ালে, সারি দিয়ে সাজানো অসংখ্য সুইচের ওপর। আলোর সুইচ না, হাতে যেন চাঁদ পেল। এক মুহূর্ত দেরি না করে সুইচগুলো পরপর টিপতে লাগল বাঁধন। আলো জ্বলে উঠতে লাগল একটার পর একটা। প্রথমে দেওয়ালে সাজানো নিয়নগুলো, তারপর দরজার পাশে রাখা বাহারি শেডের আলো, একেবারে শেষে ঘরের মাঝখানের ঝাড়বাতিটা। আলোকোজ্জ্বল ঘরে, দেওয়ালের দিকে মুখ করে বাঁধন হাঁপাচ্ছে। গোটা শরীরটা কাঁপছে তার। হাতের চাদরটা আবার কখন মাটিতে পড়ে গেছে খেয়াল নেই।

'এসব কী হচ্ছে! মাঝরাতে আলো জ্বেলে কী করছ বাঁধন?'

বাঁধন চমকে মুখ ফেরাল।

মশারির ভেতর অতীশ উঠে বসেছে। তার চোখ বিস্ফারিত।

পরের ঘটনাটা ঘটল এরও সাত দিন পর।

গোটা সপ্তাহটা বাঁধন কাটিয়েছে দারুণ লজ্জার মধ্যে। অতীশ কিন্তু বিষয়টা নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করেনি। তার আচরণ ছিল আগের মতোই স্বাভাবিক, সহজ। যেন কিছুই ঘটেনি। অথবা ঘটলেও তা একেবারেই স্বাভাবিক কিছু। আতঙ্কের সেই রাতে আবার শুতে শুতে শান্ত গলায় বলেছিল, 'আলোগুলো নিভিয়ে দাও বাঁধন। রাতে এরকম করলে আমার সমস্যা হবে। মনে রেখো, সকালে উঠতে হয় আমাকে। শোওয়ার আগে গায়ে কিছু পরে নিয়ো। ঠান্ডা লেগে যাবে।'

পর দিন থেকে শুধু নাইটি নয়, একেবারে হাউসকোট জড়িয়ে শুল বাঁধন। হাউসকোটের কোমরে দড়ি। উঠতে বসতে নিজের ওপর ভারী রাগ হল। ছি ছি, ছেলেমানুষের মতো ভয় পেয়ে কী কাণ্ডটাই না করল! একেবারে একঘর আলোর মাঝখানে... না, মানুষটা সত্যি খুব ভাল। অন্য কেউ হলে তখনই জন্তুর মতো হামলে পড়ত। একটুও বুঝতে চাইত না। হয়তো বিছানা পর্যন্ত আসারও সময় দিত না। ঠান্ডা মেঝেতেই...। অথবা পরদিন সকাল থেকেই শুরু হত হাসিঠাট্টা। সত্যি সত্যি ডাকত 'ভিতুরানি, এক গ্লাস জল দেবে?'

অতীশ সে সব কিছু তো করেইনি, বরং সকালেই ইলেকট্রিক মিস্ত্রিকে টেলিফোন করছে। বাঁধন তখন ব্রেকফাস্ট টেবিলে। টোস্টে মাখন লাগাচ্ছে। বসার ঘর থেকে গলা তুলে অতীশ জিজ্ঞেস করল, 'কী রঙের নাইটল্যাম্প লাগাবে? ব্লু না গ্রিন?'

বাঁধন লাজুক গলায় বলল, 'যা খুশি।'

'তোমার বরানগরের বাড়িতে কী ছিল? গ্রিনটা একটু হার্ড হয়ে যাবে। ঠিক আছে ব্লু-ই বলছি।'

নাইটল্যাম্পের আবছা নীল আলো বাঁধনের চেনা। বরানগরের ঘরে জ্বলত। এক ধাক্কায় বাঁধনের ভয় ভাঙিয়ে দিল এই চেনা আলো। কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠল বাঁধনের। মনে মনে প্রথম রাতের বিশ্রী অপমান ক্ষমা করে দিল সে। পরপর ক'টা দিন বড় নিশ্চিন্তে, নির্ভয়ে ঘুম হল। শনিবার রাতে খেতে বসেই বাঁধন ঠিক করল, আর নয়, অনেক হয়েছে। যদি অতীশ তার ঘুমের আগেই শুতে আসে ঠিক আছে। আর যদি দেরি করে তা হলে মাঝরাতেই ঘুম ভাঙাবে। বাকি রাতটা জ্বালিয়ে মারবে। তারপর ভোর হলে চুপিচুপি ফোন করবে বিপাশাকে। এটা সেটা বলার পর সহজভাবে জিগ্যেস করবে, 'হ্যাঁরে গায়ের ব্যথা কমানোর ট্যাবলেটের নামটা কী যেন বলছিলি?'

সে দিন ঘুম ভেঙেছিল মনের ভয়ে, আজ বাঁধনের ঘুম ভাঙল শরীরের উত্তেজনায়। চোখ খুলে দেখল, নীল নাইটল্যাম্পে সবকিছুই কেমন নীল নীল লাগে। বালিশ, বিছানা, মশারি, এমনকী ওপাশ ফিরে শুয়ে থাকা ঘুমন্ত স্বামীকেও। মনে মনে বাঁধন হাসল। রেগে যাবে? যাক। হাউসকোটটা কি আগেই খুলে রাখবে? না, থাক। বরং ঘুম থেকে তুলে অতীশকে ফিসফিস করে বলবে, 'তুমি খোলো, অ্যাই চোখ বুজে খুলবে কিন্তু।'

কাছে সরে এসে উলটো মুখে শোয়া অতীশের গায়ে হাত রাখল বাঁধন। শরীরে শরীর লাগতেই ভেতরে কোথায় যেন বেজে উঠল। কী বাজল? বাঁশি? মিলনের আগে বুঝি ভেতরে এমন করে বাজে? আঃ কী আনন্দ! স্বামীর কাঁধের ওপর হাত নিয়ে মুখ ধরে আলতো টান দিল বাঁধন। সোহাগের টান। নিঃশব্দ রাতে সোনার চুড়িতে আওয়াজ হল। রিনঝিন, রিনঝিন...।

ঘুমন্ত অতীশের মুখের একপাশ কাত হয়ে পড়ল বালিশের এদিকে। নাইটলাম্পের আবছা আলোতেও বাঁধন দেখতে পেল সেই মুখে বীভৎস দুটো চোখ অল্প ফাঁক হয়ে আছে। মণিগুলো স্থির। মৃত মানুষের নিথর মণি। আর ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে গেঁজলা। থকথকে ফেনার গেঁজলা। গড়িয়ে পড়ছে নীল আলোর বালিশে! তীব্র আতঙ্কে জ্ঞান হারানোর সময় মানুষ মুখ দিয়ে গোঁ গোঁ ধরনের চাপা আওয়াজ করে। বাঁধন জ্ঞান হারাল নিঃশব্দে।

ক্লিনিকের ভিজিটর্স রুমটা ভারী সুন্দর। নরম আলোর তলায় লম্বা লম্বা সোফা। এক দিকে দেওয়াল জোড়া অ্যাকোয়ারিয়াম। রঙিন মাছেরা জলের আশ্চর্য জগতে খেলে বেড়াচ্ছে। সেখানে পাহাড়, ঝরনা, ডুবন্ত সাবমেরিন। ঘরে বসলে না তাকিয়ে উপায় নেই। প্রমথবাবুও তাকিয়ে আছেন। তাকিয়ে মাছেদের খেলা দেখছেন আর লজ্জায় মরমে মরমে মরে যাচ্ছেন। ছি ছি। মেয়েটা কী কাণ্ড করল! এমন ঘটনা কেউ শুনেছে? স্বামীকে মৃত দেখা! কাল ভোরে অতীশের ফোন পেয়ে মৃন্ময়ীদেবী কাঁদতে কাঁদতে যখন তাঁকে ঘটনা বলে তিনি একই সঙ্গে উদ্বিগ্ন এবং ক্রুদ্ধ হন।

'থামাও তোমার কান্না। চুপ করো। ছি ছি স্বামীকে মরা ভেবে অজ্ঞান... ভয়েরও একটা সীমা আছে। তোমার মেয়ে সেই সীমা ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে গেছে। মেয়েকে কী তৈরি করেছ দেখো এবার।'

মৃন্ময়ীদেবী চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, 'আমায় কেন বলছ? মেয়ে কি আমার একার। তা ছাড়া তখনই বলেছিলাম, অত বয়স...।'

প্রমথবাবু গলা চড়িয়ে ধমকান, 'চুপ। একদম চুপ। বড় বড় কথা বোলো না। অমন হিরের টুকরো স্বামী বাঁধন সাতজন্ম তপস্যা করলেও পেত না। সামান্য কেরানির ঘরের মেয়ে একেবারে রাজরানি হয়েছে। ওই ছেলের খুঁত ধরো কোন মুখে? শুনলে তো, অতীশ ঘরে নাইটল্যাম্পের ব্যবস্থা পর্যন্ত করে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, বউয়ের ভয় কমাতে রাত জেগে পাহারাও দিত। তোমার মেয়ে ছোটবেলা থেকেই এরকম। এই বয়েসেও নড়তে চড়তে ভূতের ভয়। মুখে একেবারে কালি লেপে দিল। কথাটা কাউকে বলা যাবে?'

মৃন্ময়ীদেবী খানিকটা বিড়বিড় করে বললেন, 'শুধু ভয় নয়, মেয়েদের আরও ব্যাপার থাকে। তুমি বুঝবে না।'

প্রমথবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কী ব্যাপার থাকে? অ্যাঁ? গাড়ি পেয়েছে, বাড়ি পেয়েছে, গান শোনা, বই পড়া বর পেয়েছে তার পরেও ব্যাপার? তোমাকে বলেছে?'

'ওসব কথা মাকে বলা যায়? আভাস দিয়েছিল, আমি ভেবেছিলাম, পুরুষমানুষের অমন হয়, নিজেই ঠিক হয়ে যায়। যাক, আমিও তৈরি হয়েছি, তোমার সঙ্গে যাব।'

প্রমথবাবু এবার বড় ধরনের উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। বললেন, 'খেপেছ? দল বেঁধে, ঢেড়া বাজিয়ে ভিতু মেয়েকে দেখতে যাব? গিয়ে কী করবে? গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলবে, আহা রে, বাছা, সোনা ভয় পেয়ো না। তোমার বর মরা নয় জীবিত, ওই দেখো কেমন তোমার সামনে হাঁটছে চলছে?'

'ছি, রাগের মাথায় কী বলছ ঠিক নেই।'

'ছি আমাকে না বলে মেয়েকে বললেই পারতে। তা হলে অতীশের কাছে এইভাবে লস অব ফেস হত না। তুমি কি ভাবছ অতীশ ছেড়ে দেবে? একেবারেই নয়। বলবে পাগল মেয়েকে গছিয়ে দিয়েছেন। এবার ঘাড়ে করে ফিরিয়ে নিয়ে যান।'

মৃন্ময়ীদেবী বললেন, 'পাগল!'

'পাগল ছাড়া কী? পাগল না হলে কেউ... তোমরা কেউ যাবে না। তুমি, অঙ্কুর কেউ নয়। আমি একা যাচ্ছি। অতীশের কাছে যা অপমান, গালিগালাজ শুনতে হয় আমি শুনব। যদি বলে মেয়েকে নিয়ে চলে যান, হাত ধরে রিকোয়েস্ট করব। আমি জানি তার পরেও ছেলেটা অপমান করবে। আমি হলেও করতাম।'

অতীশের ব্যবহার একেবারে অন্যরকম হল। প্রমথবাবু অবাক হয়ে গেলেন। স্টেশনে নিজে গাড়ি নিয়ে হাজির ছিল ছেলেটা। হাতের সুটকেসটা কেড়ে নিল। গাড়িতেই বলল, 'চিন্তা করবেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে। বাঁধনকে আমি এখানকার বেস্ট ক্লিনিকে রেখেছি। ডাক্তাররাও খুব ভাল। ভেরি এফিশিয়েন্ট অ্যান্ড কোঅপারেটিভ। ওঁরা বলছেন নতুন পরিবেশ, নতুন মানুষ, অনেক সময় এরকম হতে পারে। তবে গুড নিউজ হল, ইতিমধ্যেই প্রাথমিক ট্রমা অনেকটা কাটিয়ে উঠেছে বাঁধন। জ্ঞান ফেরার পর ওরা স্যাপ দিয়েছিল। মনে হচ্ছে, কাল সকালেই ছেড়ে দেবে। আপনি কিছু খেয়েছেন? আজ রাতটা কিন্তু আমার ওখানেই থাকবেন।'

প্রমথবাবু অস্বস্তি নিয়ে বললেন, 'না না, আমি হোটেলেই উঠব।'

প্রমথবাবু ঠিক করলেন, ক্লিনিকে ঢুকেই মেয়ের গালে ঠাটিয়ে একটা চড় মারবেন। সে

মেয়ে যতই অসুস্থ হোক। মেরে বলবেন, 'দেখ, মরা স্বামীর দায়িত্ব দেখ হারামজাদি। তোর পিছনে কেমন টাকা ঢালছে। তোর পিছনে নয়, তোর ভয়ের পিছনে। গাধা কোথাকার।'

চড় না মারলেও বেডে শুয়ে থাকা মেয়ের দিকে কড়া চোখে তাকিয়েছেন প্রমথবাবু। বাঁধন বাবার হাতটা ধরে ফিসফিস করে বলেছে, 'তুমি কি আমাকে বকবে?'

'বকব, তবে এখন নয়, অতীশের সঙ্গে এক বছর ঘর করার পর বকব এবং দুটো কান আচ্ছা করে মুলে দেব।'

বাঁধন হাসল। চোখে মুখে ক্লান্তির ভাবটা অনেকটা কেটে গেছে। বলল, 'আমার খুব লজ্জা করছে বাবা। ইস মানুষটা এত ভাল। ওর সম্পর্কে কী যা তা ভাবলাম। ভয়ের রোগটা যে আমার কবে যাবে বাবা? এত বড় হয়েছি। অঙ্কুর নিশ্চয় খুব হাসছে?'

নার্স বেশিক্ষণ ঘরে থাকতে দিল না। পেশেন্টের ঘুম দরকার। প্রমথবাবু গিয়ে বসলেন ভিজিটর্স রুমে। ব্যাবসার কিছু জরুরি কাজ সেরে ক্লিনিকে অতীশ এল ফুল হাতে। শ্বশুরমশাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেরি হয়ে গেল, আমি একটু দেখা করে আসি।'

আনন্দে চোখ চিকচিক করে উঠল প্রমথবাবুর। তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। ঠিক করলেন, রাতটা হোটেলে নয়, জামাইয়ের ফ্ল্যাটে উঠবেন এবং কাল সকালে কলকাতায় ফোন করে মৃন্ময়ীকে আর এক প্রস্ত গাল দেবেন। মেয়েদের সমস্যা বোঝার বিরাট পণ্ডিত এসেছেন। ছাতার মাথা।

রাতে খাওয়ার পরে ড্রইংরুমে বসে কথা বলল অতীশ। মুখ উজ্জ্বল করে সে কথা শুনলেন প্রমথবাবু।

'আপনাকে একটাই অনুরোধ। বাঁধনকে এখনই কলকাতায় নিয়ে যাবেন না। বিষয়টা জানাজানি হয়ে গেলে ওর পক্ষে খারাপ হবে। তা ছাড়া মানুষের কতরকম হয়। কারও রাগ বেশি, কারও আবেগ। বাঁধনের হয়তো তেমনি, ভয়ের দিকটা বেশি। যতই হোক ছেলেমানুষ। আমার মনে হয়, প্রবলেমটা এখানেই সলভড হবে। আমি ওর ভয় কাটাতে পারব।'

আপ্লুত গলায় প্রমথবাবু বললেন, 'নিশ্চয় পারবে, অবশ্যই পারবে বাবা। ঘটনা শোনার পর থেকে আমার যে কী লজ্জা করছিল। কলেজে পড়ার সময় দল বেঁধে কত শ্মশানে মশানে ঘুরেছি, রাত কাটিয়েছি নির্ভয়ে। অথচ মেয়েটাকে দেখো, বাবার একটু সাহসও যদি পেত।'

অতীশ সামান্য হাসল। উঠতে উঠতে বলল, 'পাবে, বাবার মতো সেও একদিন সাহসী হয়ে উঠবে নিশ্চয়। আমি এখন শোব, কাল সকালে উঠতে হবে। আপনার শোওয়ার ব্যবস্থা গেস্টরুমে করা হয়েছে। কোনও অসুবিধে হলে আমাকে ডাকবেন। দরজা খোলা রাখব। আর যদি ইচ্ছে করেন, শুতে যাওয়ার আগে লাইট কোনও মিউজিক শুনতে পারেন। হালকা বাজনা ঘুমের পক্ষে ভাল।'

হালকা বাজনা শুনতে হয়নি। মেয়ের দুশ্চিন্তা কাটায় মনটাই হালকা হয়ে গেছে প্রমথবাবুর। নরম বিছানায় শরীর রাখার পর পরই গভীর ঘুমের মধ্যে ঢুকে পড়লেন।

মানুষের ঘুম ভাঙে আওয়াজে। প্রমথবাবুর ঘুম ভাঙল গন্ধে। তীব্র, কটু গন্ধ। গা গুলিয়ে দেওয়া গন্ধ। চোখ কচলে দ্রুত খাটের ওপর উঠে বসলেন প্রমথবাবু। অন্ধকার ঘরে গন্ধটা যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে, খেলে বেড়াচ্ছে অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছের মতো।

প্রমথবাবুর গোটা শরীরটাই কেঁপে উঠল। তিনি গন্ধটা চিনতে পেরেছেন।

মৃত মানুষের গন্ধ।

শারদীয়া আনন্দবাজার, ১৪১৫

আমি ও মানালি

১

এক ধরনের ছাত্র থাকে যারা পরীক্ষায় কখনও ভাল রেজাল্ট করতে পারে না, কিন্তু লেখাপড়ায় অত্যধিক সিরিয়াস। এই কারণে তাদের নানা ধরনের হাসি-ঠাট্টা, গঞ্জনার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। কলেজের বন্ধুরা বলে, 'তুই হলি কর্ম করিয়া যাও, ফলের আশা করিয়ো না টাইপের ছেলে। একে মনীষী সিনড্রোমও বলতে পারিস। ওঁদের মধ্যে এই লক্ষণ প্রকট থাকে। মনে হচ্ছে খুব শিগগিরই কলেজে তোর বড় ছবি দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা হবে।' পাড়ার বন্ধুদের মত হল 'লেখাপড়ার পিছনে না ছুটে তুই বরং দেশসেবায় মন দে। ওই ফিল্ডে ভালমন্দ সব ধরনের লোক আছে, শুধু সিরিয়াস লোকের অভাব। পরীক্ষায় রেজাল্ট ভাল না হলেও দেশসেবায় তোর রেজাল্ট হবে মারকাটারি। চোখ বুজে ফার্স্টক্লাস।'

সিরিয়াস ছাত্রের ঘ্যানঘ্যানানিতে মাস্টারমশাইরাও বিরক্ত। ক্লাসের বাইরে কিছু জিজ্ঞেস করতে গেলে বলেন, 'এক জিনিস বারবার বুঝতে আসো কেন? সবকিছু যে সবাইকে বুঝতে হবে তারও তো কোনও মানে নেই। যতটুকু পেরেছ তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হও। তুমি তো আর ফেল করা ছাত্র নও। মোটামুটি ছাত্র।'

এইসব ছেলের বাড়িতেও সমস্যা। বাবা-মা, দাদা-দিদিরা বলে, 'কী রাতদিন বই-মুখে বসে থাকিস! রেজাল্ট তো সেই চল্লিশ আর পঞ্চাশ। খুব বেশি হলে বাহান্ন। বাজার-দোকান করতে বললে এমন ভান করিস যেন ফার্স্ট হবি। ফার্স্ট না হলেও সেকেন্ড তো বটেই।'

এসবে সিরিয়াস ছাত্রদের কিছু এসে যায় না। সিরিয়াস ভাবটা তাদের অভ্যেসের মতো। ঠাট্টা, বিরক্তি, রাগ কোনওটাই তাদের গায়ে লাগে না।

আমি হলাম এইরকম একজন সিরিয়াস ছাত্র। রাতদিন পড়াশোনা করে স্কুল শেষ করেছিলাম। রেজাল্ট হয়েছিল মোটামুটি। মন্দ নয়, আবার ভালও নয়। তবু কলেজ করছি আরও সিরিয়াসভাবে। কখনও ক্লাস কামাই করি না। ঝড়-জল, ধর্মঘটেও চলে আসি। অল্পস্বল্প জ্বরজারি বা পেটের অসুখে পকেটে ওষুধ রাখি। সেকেন্ড ইয়ারের গোড়ার দিকে একবার ট্রাম থেকে নামতে গিয়ে ডান পায়ের গোড়ালিতে হল হেয়ার লাইন ফ্র্যাকচার। ডাক্তার বলল, দশদিন বেডরেস্ট। আমি তিনদিনের মাথায় ট্যাক্সি নিয়ে কলেজে হাজির হলাম। অনার্স ক্লাসে আমাদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট মুকুল গাঙ্গুলি বললেন, 'তুমি খবর পাঠালে কদিনের জন্য ডিপার্টমেন্টটা নয় তোমার বাড়িতেই শিফট করতাম! তোমাকে আর কষ্ট করতে হত না, ট্যাক্সির ভাড়াও বাঁচত।'

ছেলেমেয়েরা খুব একচোট হাসল। বলল, 'নো প্রবলেম স্যার, আমরা ডিসাইড করেছি, অর্ণবের এই কদিনেই ট্যাক্সি ফেয়ার চাঁদা তুলে আমরা সামলে দেব।'

সত্যি সত্যি পরের অফ পিরিয়ডে কয়েক জন তাই করল। রুমাল পেতে ঘুরে ঘুরে করিডোরে পয়সা তুলল। বন্যাত্রাণে চাঁদা তোলবার ঢঙে টেনে টেনে গান ধরল, 'আমাদের অর্ণবের পা-টা ভেঙে গেছে গো/ ক্লাস না করে শুয়ে থাকলে ছটফটিয়ে মরে গো/ আসবে কী করে বলো গো...'

ওদের কাণ্ড দেখে আমি খুব হাসলাম। পরের দিন আবার কলেজে এলাম।

প্রত্যেক কলেজের মতো আমাদের কলেজেও দু'-একজন এমন অধ্যাপক আছেন যাঁদের লেকচারকে লেকচার না বলে বলা যায় ঘুমপাড়ানি সংগীত। যারা কঠিন ইনসোমনিয়ায় ভোগে তারাও এঁদের ক্লাসে ঘুমিয়ে পড়বে এবং কিছু সময় পরে নাক ডাকাতে শুরু করবে। ছেলেমেয়েরা কেউ এই অধ্যাপকদের ক্লাসে ঢুকতে চায় না। কিন্তু আমি ঢুকি। মন দিয়ে নোটস নিই। টিউটোরিয়াল, লাইব্রেরি, টিউশন কোনওদিন মিস করি না। সিরিয়াস হওয়ার কারণে আমি বিশেষ আড্ডা-টাড্ডার মধ্যেও নেই। ক্যান্টিনে বসলে ঘনঘন ঘড়ি দেখি। বন্ধুরা চোখ পাকিয়ে বলে, 'অ্যাই অর্ণব, ঘড়ি দেখছিস কেন?'

আমি অবাক হয়ে বলি, 'বাঃ, ক্লাস আছে না?'

'আজ ক্লাস বন্ধ। আজ আমরা সিনেমা যাব। তুই আমাদের সঙ্গে যাবি।'

আমি উঠতে উঠতে বলি, 'না ভাই, আমাকে ক্লাসে যেতে হবে। তারপর টিউশন আছে।'

ধ্রুব উঠে হাত চেপে ধরে। বলে, 'টিউশনের গুলি মার।'

আমি কাঁচুমাচু মুখে বলি, 'আমার কাছে পয়সা নেই যে!'

সায়ন বলে, 'তোর টিকিট আমরা কাটব। শুধু একটাই কন্ডিশন, সিনেমাহলে তোকে বসতে হবে মণিদীপার পাশে।'

তৃষা লাফ দিয়ে বলে, 'শুধু বসলেই হবে না, মণিদীপার হাত ধরে বসতে হবে।'

মণিদীপা বলে, 'বাপ রে, হাত ধরে হয়তো বলবে, মাই ডিয়ার, এস কে এম সেকেন্ড পিরিয়ডে যা পড়িয়েছে সেটা আরও একবার বুঝিয়ে দাও দেখি ডার্লিং! আমি ওর হাত-ফাত ধরতে পারব না বাবা।'

আমি হেসে বলি, 'ঠিক আছে, হাত ধরতে হবে না, তুই ফিসফিস করে বলে দিস, তা হলেই হবে।'

সকলে হেসে ওঠে। আমি ওদের সঙ্গে সিনেমা যেতে বাধ্য হই। টিউশনের সময় হয়ে গেলে 'একটু আসছি' বলে মাঝপথেই উঠে আসি চুপিচুপি।

শুধু সিনেমা-থিয়েটার নয়, কলেজ বয়েসের আমোদ-আহ্লাদেও আমি থাকি না। অল্পবিস্তর নির্দোষ নেশা-ভাঙ তো দূরের কথা, মেয়েদের প্রতিও আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই। ইন্টারেস্ট দেওয়ার মতো সময়ও নেই। সহপাঠিনীদের আমি চেহারায় যতটা না চিনি তার থেকে অনেক বেশি চিনি নোটস আর সাজেশনে। ফোর্থ পেপারের নোট তৈরিতে আত্রেয়ী না নন্দিনী কে বেশি ওস্তাদ তা আমার মুখস্থ। প্রীতমা, রাজন্যা না মধুরিমা কার সাজেশনটা কতটা মিলবে তার হিসেবে আমার পকেটে। রেফারেন্স বইয়ের জন্য চান্দ্রেয়ীর

কাছে গিয়ে যে ঝুলোঝুলি করতে হবে তা-ও আমার অজানা নয়। এসবের জন্য তাদের আশেপাশে আমি অসংখ্যবার ঘুরঘুর করতে পারি। বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করতেও পিছপা নই। কেউ কেউ ড্রইংরুমে বসিয়েও রাখে ঘণ্টাখানেক। আমি বসেই থাকি। কেউ কেউ কাজের লোককে দিয়ে বলে পাঠায়, 'দিদি এখন বাড়িতে নেই। ঘণ্টাখানেক পরে আসুন।' বুঝতে পারি কথাটা মিথ্যে; তবু একঘণ্টা পরে এসে আবার সুযোগ নিই। ভাল নোটসের কাছে খারাপ অপমান কিছু নয়।

সকলেই একথা জানে। জানে বলে ক্ষমা-ঘেন্না, হাসি-ঠাট্টা করে মেনেও নেয়। কলেজের ছেলেরা আমার নাম দিয়েছে, 'সিরিয়াস গাধা।' মেয়েরা বলে, 'শুকনো কাঠ।'

আমার কিছু যায় আসে না। আমি আমার মতো পথে চলি।

সেই আমিই হঠাৎ পাগল হয়ে গেলাম। একটু-আধটু পাগলামি নয়, ভয়ংকর রকমের পাগল। সব তালগোল পাকিয়ে গেল! আমার মতো সিরিয়াস গাধা, শুকনো কাঠের জীবনে যে এরকম ফল্গুধারার রস আসতে পারে আমি কল্পনাও করতে পারিনি। পড়লাম একেবারে অথই জলে।

ঘটনার শুরুটা একটু বলি। একেবারেই সাদামাটা শুরু।

একদিন দোতলার করিডোরের একপাশে দাঁড়িয়ে নোটসের পাতা উলটোচ্ছিলাম আর আড়চোখে তেরো নম্বর ঘরের দরজার দিকে নজর রাখছিলাম। তেরো নম্বরে ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাস চলছে। দিন তিনেক হল তাদের ক্লাস শুরু হয়েছে। কলেজে নতুন সেশন শুরু হওয়া আমার কাছে খুব বিরক্তিকর একটা ব্যাপার। গাদাখানেক ছেলেমেয়ে খালি কঁ্যাচোরম্যাচোর করে। পড়াশোনার পরিবেশ নষ্ট হয়। এরা শান্তশিষ্ট হয়ে সেট করতে করতে মাসখানেক কেটে যায়। ততদিন কলেজে যেন একটা হুল্লোড় চলতে থাকে। আমার টার্গেট ছিল মুকুল গাঙ্গুলি। তিনি ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাস সেরে বেরোবেন। আমি তাঁকে ধরব। টিচার্সরুম পর্যন্ত নানান ধরনের প্রশ্ন করতে করতে যাব। আমি জানি উনি বিরক্ত হবেন। অ্যাভয়েড করতে চাইবেন। তা হোক। আমায় লেগে থাকতে হবে। বাড়িতে বসে শুধু নোটস তৈরি করলেই হয় না। টিচারদের কাছে বারবার ঝালিয়ে নিতে হয়।

তেরো নম্বর ক্লাস ভাঙল। আমি সরে দাঁড়ালাম। হইহই করতে করতে নতুন ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে আসছে। কলেজে ঢোকার আনন্দে চোখ-মুখ ঝলমল করছে তাদের। নতুন নতুন বন্ধু পাতানোর চেষ্টায় একে-অন্যের সঙ্গে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা দেখাচ্ছে। মুকুল স্যারকে দেখলাম গোল করে ঘিরে ফেলেছে একদল। উফ, এদের টপকে যাওয়াটাই একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার। কিচ্ছু করার নেই। এই চলবে কটাদিন। আমি তাল খুঁজতে লাগলাম। আর তখনই চোখে পড়ল!

চোখ পড়ল মেয়েটির দিকে। আমি চমকে উঠলাম।

মেয়েটি ভয়াবহ ধরনের সুন্দর। এত সুন্দর যে আমার মনে হল, এরকম আমি আগে কখনও দেখিনি। আজকের পরে আর দেখতেও পাব না। সাদা সালোয়ার কামিজ পরেছে সে। ওড়নাও সাদা। মাঝে মাঝে নীলের পোঁচ। যেন খানিকটা শরতের আকাশ সঙ্গে নিয়ে চলছে। মাথার চুল ফুলের পাপড়ির মতো ছড়িয়ে আছে কাঁধ পর্যন্ত। টিকলো নাক, থুতনি।

দীর্ঘ গ্রীবা। টানা টানা দুটো চোখ। বইয়ের ব্যাগটা জড়সড় করে ধরে রেখেছে বুকের কাছে। মেয়েটি মুখ তুলে আমার দিকে তাকাল। চকিতে তার চোখদুটো দেখতে পেলাম। আমার গোটা শরীর টলমল করে উঠল। পৃথিবীর সব মায়া, মমতা, ভালবাসা যেন জমা হয়েছে এই মেয়ের চোখে! মেয়েটি যেন সামান্য হাসল। হাসল কি? নাকি এই মেয়ের ঠোঁটদুটোই অমন? হাসি লেগে থাকে সবসময়। মনে হল, মেয়েটির হাতে একটা গোলাপ ফুলও রয়েছে। লাল গোলাপ। সেই ফুল অদৃশ্য, আমি দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু রয়েছে!

আমি যে আমি, আমিও নোটস, সাজেশন, স্যার সব ভুলে গেলাম। করিডোরের পাঁচিল চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম যতক্ষণ না মেয়েটি আমার সামনে থেকে চলে যায় শান্ত পায়ে। চলে যাওয়ার পরও নড়তে পারলাম না অনেকক্ষণ। নিজের ক্লাসে ফিরলাম দেরি করে। ততক্ষণে লেকচার শুরু হয়ে গেছে। সবাই অবাক হল। এরকম আমার কখনও হয় না।

প্রথম দেখায় প্রেমের ঘটনা পৃথিবীতে রোজ আকচার ঘটছে। কিন্তু আমার ক্ষেত্রে হল বাড়াবাড়ি। কিছুদিনের মধ্যে আমি চলে গেলাম বড়সড় একটা ঘোরের মধ্যে। ক্লাসে অধ্যাপকরা লেকচার দিলে মাথামুন্ডু বুঝতে পারি না। বন্ধুদের মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকি। টিউশনে না গিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াই। রাতে থেকে থেকে ঘুম ভেঙে যায়। দিনে খিদে নষ্ট। বই-খাতা খুললে শব্দগুলো অর্থহীন মনে হয়। পড়তে চেষ্টা করি। পারি না। বাবা, মা, বড়দা, বোন দশটা কথা বললে একটা উত্তর দিই। বাসে কেউ ধাক্কা দিলে গ্রাহ্য করি না। দুম করে একদিন সিগারেট ধরে বসলাম। কিচ্ছু ভাল লাগে না, কিচ্ছু ভাল লাগে না... চোখের সামনে শুধু সেই মেয়ের মুখ। মায়া, মমতা, ভালবাসামাখা মুখ। কথাটা কাউকে বলতে পারি না। আমার মতো সিরিয়াস ছেলেরা সব পারে, প্রেমের কথা বলতে পারে না। বলতে পারার মতো কেউ তাদের থাকে না। থাকতে নেই। নিজেকে নিজেই লজ্জা পাই। সামলাতে চেষ্টা করি। সামলাতে পারি না। ক্লাসের ছেলেমেয়েরা অবাক হল।

'তোর কী হয়েছে রে শুকনো কাঠ?'

আমি আরও শুকনোভাবে হেসে বলি, 'কই, কিছু না তো!'

'আলবাত কিছু হয়েছে। আরও শুকিয়ে গেছিস। নিশ্চয় রাত জেগে হেভি পড়ছিস?'

আমি মাথা নামিয়ে বলি, 'পড়তে তো হবেই, ফাইনাল এসে গেল যে।'

রাত জাগছি, কিন্তু পড়ছি না। পড়তে পারছি না। এই করতে করতে দুটো মাস কীভাবে যেন গড়িয়ে গেল; সকালে রাতজাগা চোখ নিয়ে কলেজে ছুটি। গেটের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখি, মানালির (ততদিনে ওই মেয়ের নাম জেনেছি। কিন্তু শুধু ওই নামটুকুই।) ঝকঝকে গাড়ি এসে দাঁড়ায়। উর্দি পরা ড্রাইভার গেট খুলে সেলাম ঠোকে। মানালি কোনওদিকে না তাকিয়ে গটগট করে কলেজে ঢোকে। ওদের ক্লাস ভাঙলে করিডোরে বেফালতু ঘোরাঘুরি করি। স্যারেরা বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করেন, 'কী হল অর্ণব? কিছু বলবে?'

আমি তাড়াতাড়ি বলি, 'না, স্যার কিছু নয়।'

মানালি লাইব্রেরিতে ঢুকলে আমিও লাইব্রেরিতে ঢুকে পড়ি। অনেক দূরে মুখ নামিয়ে বসে থাকি। সামনে খোলা থাকে বইয়ের পাতা। হাওয়ায় উলটে যায়। তা-ও তাকিয়ে থাকি। মানালি একতলার লনের কাছে বন্ধুদের সঙ্গে দাঁড়ালে আমি তিনতলার বারান্দায় গিয়ে উঁকি

দিই। তিনতলার বারান্দায় দাঁড়ালে একতলার লনে চলে আসি। মাথা তুলে তাকাতে লজ্জা পাই। তবু যেন দেখতে পাই! কখনও ক্বচিৎ পাশ দিয়ে সে হেঁটে গেলে বুক ছ্যাঁৎ করে ওঠে। শরীর ঝনঝন করে। মনে হয় সে বুঝি তার হাতে থাকা অদৃশ্য গোলাপের ঘ্রাণ ছড়িয়ে দিয়ে গেল।

সন্ধের সময় বাড়ি ফেরার পথে অনেকটা হাঁটি। নিজেকে বোঝাই— এ ঠিক নয়। এ ঠিক হচ্ছে না। আমার মতো একজন সিরিয়াস ছেলে এমন মায়াজালে জড়াবে কেন? ছি ছি! বাড়ি ফিরে অনেকটা সময় ধরে স্নান করি। নিজের মনকে ধুয়ে ফেলি যেন। বই নিয়ে বসি। আর দুটো পাতা মন দিয়ে পড়বার পরই খাতার পাতায় গোলাপের ঘ্রাণ পেতে থাকি।

এত অশান্তির মধ্যিখানে একটাই বড় বাঁচোয়া, আমাকে কেউ সন্দেহ করে না। আসলে কেউ ভাবতেই পারে না, আমার মতো ছেলে প্রেমে পড়তে পারে।

পরীক্ষা এসে গেল। আমাদের ক্লাস শেষ। দু'-একটা ছুটকো-ছাটকা স্পেশাল পিরিয়ড চলছে। এলে চলে, না এলেও চলে। আমাদের ক্লাসের সব ছেলেমেয়েই ব্যস্ত। তারা কলেজে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। নোটস, সাজেশন গোছানোর কাজ কমপ্লিট। এবার সব ভুলে শুধু বাড়িতে বসে পড়ার সময়।

আমি তা-ও নিয়মিত কলেজে আসতে লাগলাম। ব্যস্ত হয়ে ঘুরে বেড়াতাম। লাইব্রেরি, করিডোর, টিচার্সরুম, ক্যান্টিন। যদি একবার মানালিকে দেখতে পাই। একবার, একটুখানি... ততদিনে আমার চেহারার মধ্যে একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব চলে এসেছে। যারা কলেজে দেখতে পেত তারা ভাবত, পড়ার চাপ। আমার কিন্তু ভয় করতে লাগল। বুঝতে পারলাম, বড় ধরনের গোলমালের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি। এই গোলমাল থেকে যদি বেরোতে না পারি তা হলে সেটা হবে ভয়াবহ। এর মাঝখানেই একটা কাণ্ড করে বসলাম। কলেজের অফিসে গিয়ে আমাদের হেডক্লার্ক অনীশদার কাছ থেকে মানালির বাড়ির ঠিকানা চেয়ে বসলাম। অনীশদা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকল। তারপর মাথা নাড়িয়ে শান্ত গলায় বলল, 'তোমার কাছ থেকে এটা আশা করিনি অর্ণব।'

এবার ঘটনার শেষটুকু বলি। শুরুর মতো শেষটাও সাদামাটা।

পরীক্ষার ঠিক সাতদিন আগে কলেজে ঢুকছি মাথা নামিয়ে। সময় হিসেব করেই এসেছি। ফার্স্ট ইয়ারের ক্লাস ভাঙবে। ছেলেমেয়েরা বেরোবে। মাথা নামিয়ে চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠছি দোতলায়। উঠছি দ্রুত। হাতে দুটো ফাইল রেখেছি ইচ্ছে করে। যেন নোটস নিয়ে ব্যস্ত। কিছুক্ষণের মধ্যে ক্লাস ভাঙা ছেলেমেয়েরা হইহই করতে করতে নীচে নেমে আসতে থাকে। মানালি কি আমার পাশ দিয়ে চলে গেল? নাকি এখনও নামেনি?

হঠাৎ পিছন থেকে ডাক শুনি, 'শুনুন।'

আমি দাঁড়িয়ে পড়ি। আবার ডাক, 'এই যে শুনুন।'

মুখ ফেরাতেই বুকটা ধক করে ওঠে, মানালি!

মানালি আজ শাড়ি পরেছে। শাড়ির রং ভাল করে দেখার আগেই সে খুব স্বচ্ছন্দে উঠে আসে সিঁড়ি টপকে। আমার থেকে একটা সিঁড়ি নীচে এসে থামে। দেখতে পাই মানালি একা নয়, নীচে আরও চার-পাঁচজন মেয়েও দাঁড়িয়ে। আমার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসছে তারা।

মানালি আমার চোখের দিকে সরাসরি তাকায়। আমি আমতা আমতা করে বলি, ‘আমাকে ডাকছ?’

মানালির মুখে আজও সেই হাসি। তবে সেই হাসি আজ অন্যরকম!

‘হ্যাঁ, আপনাকেই ডাকছি। আপনি এভাবে আমার পিছন পিছনে ঘুরছেন কেন?’

আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায়।

আমতা আমতা করে বলি, ‘আমি...’

‘হ্যাঁ, আপনি।’ কর্কশ গলায় মানালি বলে, ‘আমি বুঝতে পারি না ভেবেছেন? সব বুঝতে পারি। কলেজে ঢোকার সময় লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে দেখেন। ছুটির সময় সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করেন। কিছু বলিনি। সেদিন শুনলাম, অফিস থেকে আপনি আমার বাড়ির ঠিকানা পর্যন্ত জোগাড় করবার চেষ্টা করেছেন। হাউ ডেয়ার ইউ! ছি ছি! মুখ দেখলে তো ভালমানুষ মনে হয়। তাও যদি সামনাসামনি এসে বলতেন, একটা কথা ছিল! সরাসরি রিফিউজ করতাম। সেটুকু সাহসও তো নেই! শুধু লুকিয়ে লুকিয়ে কাওয়ার্ডের মতো... আই হেট কাওয়ার্ডস।’

বুঝতে পারি একটা কিছু প্রতিবাদ করা উচিত। প্রতিবাদ না হলেও অন্তত বলা দরকার। পারি না। মাথা নামিয়ে থাকি।

মানালি আবার বলে, ‘সিনিয়র বলে এতদিন কিছু বলিনি। তা ছাড়া শুনেছি, আপনি নাকি একজন সিরিয়াস স্টুডেন্ট। এই তার নমুনা! কীসের সিরিয়াস স্টুডেন্ট? প্রেমের? এসব কী ধরনের অসভ্যতামি? দেখুন, ফারদার ডিসটার্ব করলে প্রিন্সিপালের কাছে কমপ্লেন করতে বাধ্য হব। ভালমানুষিপনা বের করে দেব! আপনার কলেজে ঢোকাই বন্ধ হয়ে যাবে। মনে রাখবেন এটাই আমার প্রথম এবং শেষ ওয়ার্নিং।’

একটু থামে মানালি। ঠোঁটের পাশে ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলে, ‘পরীক্ষা এসে গেছে। মেয়েদের পিছনে না ঘুরে বাড়ি গিয়ে গুডবয়ের মতো বই নিয়ে পড়তে বসুন। নইলে ফেল করতে হবে।’

কথা শেষ করে মানালি নেমে যায় লাফাতে লাফাতে। আমি মাথা নামিয়েই থাকি। নীচ থেকে মেয়েদের হাসি ভেসে আসে। দল থেকে কে যেন বলে ওঠে— ‘বেচারি শুকনো কাঠ।’

ওরা আমার এ নামটাও জেনে গেছে!

ক্লান্ত পায়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে আসি। ভিড় রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে বেশ হালকা লাগে। মনে হয়, বড় ধরনের একটা ঝামেলা থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছি। ভাগ্যিস মানালি আমাকে ভিতু বলে চিনতে পেরেছে। যদি চিনতে না পেরে দুম করে আমার প্রেমে পড়ে যেত? তা হলে? তা হলে যে অনেক বড় গোলমাল হয়ে যেত!

এতদিন মোটামুটি রেজাল্ট করতাম। বি. এ পরীক্ষায় রেজাল্ট হল খুব খারাপ। একদিন সবাইকে লুকিয়ে কলেজ থেকে গিয়ে মার্কশিট নিলাম। আমার কলেজের পাট চুকল। পড়াশোনার জীবন শেষ হল। হন্যে হয়ে চাকরির চেষ্টা করতে লাগলাম। হাতে অদৃশ্য গোলাপ নিয়ে মানালি আমার মন থেকে মুছে গেল।

২

'প্লিজ আমাকে ছেড়ে যাবেন না। আমি মরে যাব।'

কাতর নারীকণ্ঠে থমকে যাই। রাস্তা ছেড়ে ফুটপাথে উঠে পড়েছি। এবার ছুটব। কোনদিকে ছুটব জানি না। সকলেই ছুটছে। আমিও ছুটব। লাঠি, টিয়ার গ্যাস, আগুনের মধ্যে দিক ঠিক করার কোনও উপায় নেই। সবাই যেদিকে ছুটছে সেদিকেই ছুটতে হবে নিশ্চয়। কিন্তু ওইদিকটাও কি নিরাপদ? ওদিকে গেলে কি বাঁচা যাবে? বুঝতে পারছি না।

শুধু নারীকণ্ঠ নয়, এবার পিঠে হাতের ছোঁয়া পেলাম। আমার দশটা-পাঁচটা অফিস করা ঘামে ভেজা নোংরা জামায় কেউ হাত রেখেছে। আলতোভাবে রেখেছে, কিন্তু রেখেছে!

'ভীষণ ভয় করছে! আমাকে নিয়ে চলুন। প্লিজ, আমাকে ফেলে যাবেন না।'

বিরক্ত হই। এই সময়টুকু শুধু নিজেকে নিয়েই ভাবতে হয়। নিজেকে বাঁচাতে হবে। এর মধ্যে এসব আবার কী জ্বালাতন? তার ওপর আবার মহিলা।

বড় বড় পাথরের টুকরো উঁড়ে আসছে। দোকানের কাচ ভেঙে পড়ছে ঝনঝন করে।

'ভয় করছে। আমার ভয় করছে খুব।' কাতর আর্তনাদে বাধ্য হয়ে মুখ ফেরালাম এবং ফিরিয়েই চমকে উঠলাম।

মানালি না? হ্যাঁ, মানালিই তো!

বাইশ বছরে খানিকটা মোটা হয়েছে। বাইশ? নাকি তেইশ? একুশ নয় তো? মনে নেই। আজকাল আগের হিসেব গুলিয়ে যায়। বিকেল শেষ হওয়া আলোতে ভাল করে তাকাই। চারপাশের যা অবস্থা তাতে ভাল করে কারও মুখ দেখার কথা নয়। তবু চেষ্টা করি। ঠিকই, এই মেয়ে মানালিই। কলেজের হিস্ট্রি অনার্স। তবে এখন আর মেয়ে নেই, এখন মহিলা। আমার মতোই চল্লিশ পেরিয়ে গেছে বা দোরগোড়ায়।

চারপাশ কাঁপিয়ে বোমা ফাটার আওয়াজ হল। পরপর দু'বার। দ্রুত সরে এলাম। বুঝতে পারছি এতক্ষণ যে উত্তেজনা জনতার হাতে ছিল, তা এবার গুন্ডারা দখল নিয়েছে। গলিঘুঁজি থেকে লাঠি-সোঁটা অস্ত্র নিয়ে তারা বেরিয়ে আসছে। জনতা বোমা পাবে কোথা থেকে?

মানালি এবার আমার কাঁধের কাছটা খামচে ধরল।

'আমি কিছু চিনতে পারছি না। সব গুলিয়ে যাচ্ছে। এই জায়গাটার নাম কী?' কাঁপা, সন্ত্রস্ত গলায় বলল মানালি।

গুলিয়ে যাওয়ারই কথা। পথঘাটের চেহারাটাই বদলে গেছে! ভয়াবহ অবস্থা। মারমুখী জনতা সবদিকে ছোট ছোট দল বেঁধে তেড়ে যাচ্ছে। তারা চাক ভাঙা মৌমাছির মতো হিংস্র, নিয়ন্ত্রণহীন। কাকে তেড়ে যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে না।

মানালির হাত কাঁপছে। বিস্ফারিত চোখ। এই কি সেই চোখ? একসময় যা দেখার জন্য হাপিত্যেশ করে থাকতাম ক্লাসে, করিডোরে? নিশ্চয় এই চোখ নয়। বয়েসের সঙ্গে যেমন চেহারা বদলায়, চোখও বদলায়। মানালির চোখ কতটা বদলেছে? তার আচরণ দেখেই বোঝা যাচ্ছে এরকম পরিস্থিতিতে পড়েনি কখনও। হিস্টিরিয়া রোগীর মতো করছে। হাঁটছে

কেন? ওর গাড়ি কোথায়? নাকি গাড়ি ফেলে পালিয়ে এসেছে? হতে পারে গাড়ি ভাঙচুর হয়ে গেছে। কলকাতায় কী শুরু হয়েছে এসব? সামান্য একটা অ্যাক্সিডেন্টকে কেন্দ্র করে এতবড় গোলমাল। আজকাল প্রায়ই এরকম হচ্ছে। ছোটখাটো ঘটনায় শহর জ্বলে উঠছে। অবরোধ, বাস পোড়ানো, লাঠি, টিয়ার গ্যাসে ভয়ংকর হয়ে যাচ্ছে। রাস্তার ওপাশে আমি যে বাসটা থেকে নেমেছি সেটায় এবার ওরা আগুন দিল। লাল সরকারি বাস। আগুনে সেই লাল আরও দগদগে লাগছে। ভকভকে কালো ধোঁয়া আকাশ পর্যন্ত লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। উফ! কী মারাত্মক! আগুন লাগানোর সময় ষণ্ডা ধরনের একটা ছেলে খালি গায়ে চিৎকার করে বলছিল, 'কাউকে নামতে দিবি না। কোনও শালাকে নয়। সবসুদ্ধ জ্বালিয়ে দে। হারামির বাচ্চা সব...। ভদ্রলোক এসেছে?' চিৎকার করছিল আর হাতের ডান্ডা দিয়ে বাসের গায়ে মারছিল থেকে থেকে। কন্ডাক্টরটা চালাক। কাঁধের ব্যাগটা রাস্তার ওপর ছুড়ে ফেলে সবার আগে ছুট দিল। খুচরো পয়সা ছড়িয়ে পড়ল চারপাশে। দেরি হলে সত্যি সত্যি হয়তো সবাইকে ওরা জ্বালিয়ে দিত। লাফিয়ে নামতে গিয়ে একজন বৃদ্ধ পিচের রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়লেন। মুখ তুলতে দেখি, ভদ্রলোকের ঠোঁট ফেটে ঝরঝর করে রক্ত বেরোচ্ছে।

'কী হবে.' মানালির ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে।

সেই ঠোঁট কি একই আছে? নাকি বদলেছে? নিজেকে দ্রুত সামলালাম। মেয়েমানুষের চেহারা দেখার সময় এখন নয়। 'হো হো' চিৎকার করে একদল উন্মত্ত মানুষ উলটোদিকে ছুটে যাচ্ছে। ওরা নিশ্চয় আবার আগুন লাগাবে। গুটিকতক ছেলে আটকে পড়া সারিবদ্ধ গাড়ির কাচ আর হেডলাইট ভাঙছে উৎসবের মেজাজে। ছেলেগুলোর স্কুলে পড়ার বয়েস। গাড়ির ভেতর থেকে মেয়েদের কান্নার আওয়াজ আসছে। ছিটকে ছিটকে নেমে পড়ছে সবাই। মানালিও কি এরকম কোনও গাড়ি থেকেই নেমে পড়তে বাধ্য হয়েছে? হতে পারে। পোড়া বাসের ধোঁয়ায় চোক করকর করে উঠল। চারপাশ আবছা লাগছে। আমি জামার হাতা তুলে চোখ মুছলাম। কাছেই দোকানের শার্টার পড়ছে কর্কশ আওয়াজে। কে যেন চিৎকার করে বলে উঠল, 'পালাও পালাও। পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুঁড়ছে।'

পিছনে চরচর শব্দে টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটল। ধোঁয়ায় বাতাস ভারী। অন্ধকার নামছে দ্রুত।

আমি কী করব? কী করা উচিত? ভাবতে ভাবতেই মানালির হাত চেপে ধরে বললাম, 'আসুন।' তারপর প্রায় ছুটতে লাগলাম। ছুটতে ছুটতেই বললাম, 'আরও জোরে।'

হোঁচট খেতে খেতে মানালি কেঁদে উঠল। বলল, 'আমি পারছি না।'

এই মেয়ের হাসি দেখেছি। কাঁদলে কেমন লাগে?

খানিকটা ছুটে গিয়ে বড় রাস্তা ছেড়ে বাঁ হাতে একটা সরু গলির মধ্যে ঢুকে পড়লাম দু'জনে। খানিকটা গিয়ে ঝাঁপ ফেলবার মুখে প্রায় জোরজবরদস্তি করে সেঁধিয়ে গেলাম একটা গোডাউনের ভেতর। ভাঙাচোরা লোহালক্কড়ের গোডাউন। টিমটিমে আলোয় জনাকয়েক মুটে-মজুর জড়সড় হয়ে বসে রয়েছে। যাক, এতক্ষণে কিছুটা হলেও নিরাপদ। বাইরের গোলমাল না থামা পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করা যাবে। মহিলা দেখে কে একজন বসবার জন্য দুটো ব্যাটারির খোলও দিয়ে গেল। না, এই শহরের সবটাই খারাপ হয়ে

যায়নি। আমি মানালির মুখের দিকে না তাকিয়ে বললাম, 'বসুন।' ক্লান্ত মানালি বসে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে হাঁপাতে লাগল। একটা আশ্রয় পেয়ে যেন স্বস্তি পেয়েছে খানিকটা। ছিপছিপে শরীর অনেকটা ভারী হয়েছে মানালির। এখনও কি একই রকম সুন্দরী রয়েছে? বুঝতে পারছি না। আসলে ওর দিকে তাকাতে কেমন একটা লাগছে।

অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে মানালি অনেকটা ধাতস্থ হল। হাতের বাহারি ভ্যানিটি ব্যাগ খুলে মোবাইল ফোন বের করে কানে চেপে ধরল সে।

'... হ্যাঁ, আপাতত সেফ। না না, এখনই তোমাকে আসতে হবে না,... এখানে গাড়ি ভাঙচুর চলছে। গোলমাল থামলে আবার ফোন করব... একজন ভদ্রলোক আমাকে রেসকিউ করেছেন... ইন ফ্যাক্ট আই বেগড হিজ হেল্‌প... খুব সাহসী মানুষ... উনি না থাকলে আজ যে কী হত... তুমি কি ওঁর সঙ্গে একটু কথা বলবে?... নাও বলো...'

মানালি উঠে দাঁড়িয়ে মোবাইলটা বাড়িয়ে ধরল। নরম, কৃতজ্ঞ গলায় বলল, 'নিন, একটু কথা বলুন প্লিজ। আমার হাজব্যান্ড। ও আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে চায়।'

আমি হাত বাড়িয়ে ফোন নিলাম। মানালির স্বামীকে জায়গার লোকেশনটা বোঝালাম। মোবাইল ফিরিয়ে দিতে দিতে সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি এখান থেকে চলে যাব। গোলমাল থামার আগেই চলে যাব। মানালি এখানে থাকলে ওর কোনও অসুবিধা হবে না। নিশ্চয় ওর স্বামীও খানিকক্ষণের মধ্যে এসে পৌঁছোবেন। আমি চাই না মানালি কোনওভাবে আমাকে চিনতে পারুক। ভিতু, অভদ্র শুকনো কাঠের বদলে একজন সাহসী, হৃদয়বান মানুষকে সে চিনেছে। আগুন, হিংসার মধ্যে মানুষ চিনতে পারা সহজ কথা নয়।

অনেক দেরিতে হলেও আমি তার হাতের অদৃশ্য গোলাপ দেখতে পেয়েছি।

বাংলা স্ট্রিট, উৎসব সংখ্যা ১৪১৬

পুঁইশাক

আবার একই কাণ্ড! একই ভুল!

এই নিয়ে দশ দিনের মধ্যে দু'বার ঘটল। ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে মনে হল, ভেতরে এমন কিছু আছে যেটা থাকার কথা নয়। শুধু তাই নয়, এবারের ভুলটা যেন বেশি। প্রথমবার মনে হয়েছিল, জিনিসটা ঠান্ডা। আজ মনে হল, জিনিসটা ঠান্ডার সঙ্গে শক্তও। সাধারণ শক্ত নয়, লোহা পিতল যেমন শক্ত হয়, সেরকম শক্ত। বাজারের ব্যাগে লোহা কোথা থেকে আসবে?

প্রথমবারের মতো ঝটকা দিয়ে আজও হাত সরিয়ে নিলেন প্রলয় সমাদ্দার। তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি সামনের মাঘে ছাপ্পান্ন শেষ করছেন। এই বয়সে একই ভুল বারবার হতে থাকলে দুশ্চিন্তায় ভুরু কুঁচকে যাওয়াটাই উচিত। আজ বাজারের ব্যাগে ভুল হচ্ছে, কাল ভুল হবে অফিসের কাজে। প্রাইভেট কোম্পানিতে ছোট পদের চাকরি। সামান্য ভুল হলে বড় ধরনের বিপদ হতে পারে। তার ওপর অফিসের অবস্থা ভাল নয়, নড়বড় করছে। গত এক বছর ধরে অর্ডার কমেছে। ম্যানেজমেন্টও খরচ কমাচ্ছে। এ বছর বোনাস দিয়েছে আদ্দেক। কিছুদিন আগে পর্যন্ত অসুখ-বিসুখ, মেয়ের বিয়ে, ফ্ল্যাটের জন্য লোন চাইলে পাওয়া যেত। এখন হাজারটা ফ্যাকড়া তুলে আটকাচ্ছে। প্রোডাকশনের নিশিকান্ত মাইতির বউয়ের ইউটেরাসে টিউমার। অপারেশন লাগবে। গত মাসে দশ হাজার টাকার লোন অ্যাপ্লিকেশন জমা দিয়েছিল। এখনও এক পয়সা পায়নি। অ্যাকাউন্টস ম্যানেজার তিন ধরনের ব্লাড রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে। ভাবটা এমন যে, অপারেশন হাসপাতালে হবে না, অপারেশন হবে অফিসের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টে। ম্যানেজার নিজে করবে। চাকরিতেও হাত পড়ছে। ইতিমধ্যে তিনজন পিয়নকে 'আর লাগবে না' বলে বাদ দেওয়া হয়েছে। প্রোডাকশনে দু'জনের কনট্র্যাক্ট রিনিউ হয়নি। কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে, এবার ক্লার্ক, অফিসারদের পালা। পরিস্থিতি কঠিন। সবাই কাঁটা হয়ে আছে। এই অবস্থায় সামান্য ভুলও মারাত্মক।

ভুরু কোঁচকানো অবস্থাতেই প্রলয়বাবু ব্যাগের দিকে তাকালেন। না, কোনও গোলমাল নেই। রোজকার মতো রান্নাঘরের দোরগোড়ায় আধখানা মুখ খুলে কেতরে পড়ে আছে নির্দোষ ভঙ্গিতে। একটু যেন লাজুক ভাব! সম্ভবত বহুদিন ভরা বাজার নিয়ে পিঠ সোজা করে দাঁড়াতে পারেনি বলে লজ্জা। এই ব্যাগের প্রতি অবশ্য কোনও মমতা নেই প্রলয়বাবুর। সিন্থেটিকের এই জিনিস তাঁর একেবারেই পছন্দ নয়। তাঁর বিশ্বাস, বাজার করবার ব্যাগ হবে চটের। কিছুদিন আগে পর্যন্ত তিনি সেরকম ব্যাগ নিয়ে বাজার যেতেন। বহুদিনের অভ্যেস ছিল। করবীদেবী হুট করে একদিন অভ্যেস বদলে দিলেন। বদলালেন বড় অদ্ভুত কারণে।

'এ আবার কী! আজকাল কেউ চটের ব্যাগ হাতে ঝুলিয়ে বাজারে যায় নাকি? বিশ্রী লাগে।'

প্রলয়বাবু অবাক হয়ে বলেন, 'কেন যাবে না। অনেকেই যায়।'

করবীদেবী চাপা ধমক দিয়ে বললেন, 'যে যায় যাক, তুমি যাবে না। বস্তার মতো দেখায়। কাল থেকে তুমি অন্য ব্যাগ নেবে। বিকেলে কিনে আনব। আজকাল অল্প দামে সিন্থেটিকের জিনিস পাওয়া যায়, সুন্দর দেখতে।'

প্রলয় সমাদ্দারের মনে হল, স্ত্রীকেও পালটা একটা ধমক দেওয়া উচিত। বলা দরকার— 'না, আমি এই ব্যাগ নিয়েই যাব। এত বছর ধরে যা করছি হঠাৎ পালটাব কেন? তা ছাড়া আমি কীসে বাজার করব চটের বস্তা না লোহার ট্রাঙ্কে, সে ব্যাপারে তুমি নাক গলানোর কে? আমি কি তোমার ব্যাপারে নাক গলাই?'

প্রলয়বাবু ধমক দিতে পারলেন না। আজ থেকে দশ-পনেরো বছর আগে হলে হয়তো পারতেন, কিন্তু এখন পারেন না। ঘরে-বাইরে কোথাওই পারেন না। এটা তাঁর পক্ষে যেমন অসুবিধের হয়েছে, তেমন আবার সুবিধেরও হয়েছে। অসুবিধে হল, এর ফলে প্রায় কোনও সময়েই উচিত কথা বলা হয় না। আর সুবিধে হল, জীবনযাপনটা ক্রমশ ঝগড়া-ঝামেলাহীন, শান্তিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। প্রলয়বাবু হিসেব করে দেখেছেন, একটা বয়েসের পর জীবনে উচিত কথার কোনও দাম নেই, দাম আছে শান্তির। শান্তির জন্য তিনি নিজেই নিজের মেকানিজম তৈরি করে নিয়েছেন। ঘরে-বাইরে খানিকটা ধমকানি, দু'-পাঁচটা অপমান, কিছুটা অবজ্ঞা চুপচাপ সহ্য করে নিলেই কাজ হচ্ছে। প্রথম প্রথম সমস্যা হত। এখন আর হয় না। প্র্যাকটিস হয়ে গেছে। প্র্যাকটিসে সব হয়। আজকাল ট্রামে বাসে কেউ পা মাড়িয়ে দিলে আর গায়ে লাগে না। অসহ্য গরম রাতে টানা লোডশেডিং চললেও ঘামে ভিজে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকেন। বাজারে ছোটখাটো ওজন ঠকানোর ঘটনায় চোখ ফিরিয়ে নেন। অল্প ক'টা পয়সার জন্য ঝামেলা ভাল লাগে না। সেদিন করবীদেবীকে ধমকাতে গিয়েও থমকে গেলেন। নরম গলায় বললেন, 'কী হয়েছে বলো তো? তুমি হঠাৎ বাজারের ব্যাগের মতো সামান্য জিনিস নিয়ে পড়লে কেন?'

করবীদেবী ঝাঁঝের সঙ্গে বললেন, 'আমি পড়িনি, তোমার মেয়ে পড়ছে।'

'মেয়ে! সুমি?'

'সুমি ছাড়া তোমার আর ক'টা মেয়ে আছে। বোকার মতো কথা বলছ কেন? এত বয়স হল, বোকার মতো কথা বলার অভ্যেস ছাড়তে পারলে না? সেদিন সুমির শ্বশুরমশাই গাড়ি থেকে তোমায় দেখেছেন।'

একমাত্র মেয়ের শ্বশুরমশাই মানুষটি অতিরিক্ত রকমের বড়লোক। তাঁর প্রসঙ্গ উঠলেই প্রলয় সমাদ্দারের নার্ভাস লাগে। সেদিনও লাগল। কাঁপা গলায় বললেন, 'সুমির শ্বশুরমশাই! আমাকে দেখেছেন?'

করবীদেবী গলায় ঝাঁঝ বাড়িয়ে বললেন, 'তোমাকে দেখবেন কেন? তুমি এমন কিছু রাজা-গজা নও যে, তোমায় দেখতে হবে। তোমার ব্যাগ দেখেছেন। দিল্লি না মুম্বইয়ের প্লেন ধরবেন বলে ভদ্রলোক ওই রাস্তা দিয়ে এয়ারপোর্ট যাচ্ছিলেন। গাড়ি থেকে দেখলেন, হাতে ব্যাগ ঝুলিয়ে তুমি চলেছ। ফিরে এসে সুমির কাছে হাসাহাসি করেছেন।'

'হাসাহাসি! হাসাহাসি কেন? বাজারে ব্যাগ নিয়ে যাব না তো কী নিয়ে যাব, করবী?' প্রলয়বাবুর বিস্ময় বাড়ে।

করবীদেবী কঠিন চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'উনি ব্যাগ বুঝতে পারেননি, বলেছেন, সুমি, তোমার বাবাকে দেখলাম সাতসকালে হাতে একটা ছোট বস্তা নিয়ে চলেছেন। ফ্লাইটের সময় হয়ে গিয়েছিল বলে দাঁড়াতে পারিনি, নইলে গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞেস করতাম। ব্যাপার কী বলো তো? ছি ছি। সুমির তো লজ্জায় মাথা কাটা যাওয়ার অবস্থা। আমাকে ফোন করে কান্নাকাটি করল। বলল, মা, বাবা কি আজকাল সকালে বস্তা নিয়ে কাগজ কুড়োতে বেরোচ্ছে?'

প্রলয় সমাদ্দার 'হা হা' আওয়াজে বোকা ধরনের হাসলেন। বললেন, 'কথাটা সুমি ভুল বলেনি। জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে তাতে ক'দিন পরে বস্তা নিয়ে কাগজ কুড়োতে বেরোলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। বেঁচে থাকতে হলে একটা সাইড বিজনেস লাগবে। সেদিক থেকে র‍্যাগ পিকার হওয়া সবথেকে ভাল। মূলধন লাগবে না।'

করবীদেবী এবার গলা তুলে ধমকে উঠলেন, 'চুপ করো। আমার সঙ্গে পচা ধরনের রসিকতা করবে না। মেয়ের একটা প্রেস্টিজ আছে। আগে ছিল না, বিয়ের পর হয়েছে। তোমার মতো দু'পয়সার কেরানির ঘরে তার বিয়ে হয়নি। তুমি সম্বন্ধ দেখলে অবশ্য তাই হত। মেয়ে নিজের পছন্দে বিয়ে করেছে বলে হয়নি। সুমির শ্বশুরবাড়ির টাকা পয়সা সম্পর্কে কি তোমার এখনও ধারণা হয়নি?'

স্ত্রীর ধমকে দ্রুত হাসি মুছে প্রলয়বাবু বিড়বিড় করে বললেন, 'অবশ্যই হয়েছে। সুমির বিয়ের দু'বছর হয়ে গেল এখনও ধাক্কা সামলাতে পারিনি। মাথার ওপর বিরাট ধার। রাতে ভাল করে ঘুম হয় না।'

করবীদেবী মুখে 'ফুঃ' ধরনের তাচ্ছিল্যের আওয়াজ করে বললেন, 'তোমার টাকা নেই তাই ঘুম হয় না। সেটা তো সুমির শ্বশুরবাড়ির অপরাধ নয়। তারা তো আর এসে তোমাকে ঘুমপাড়ানি গান শোনাতে পারবে না। যা-ই হোক, কাল থেকে তোমার ওই বস্তা বাতিল। সুমি বলে দিয়েছে, আর একদিনও যদি তার শ্বশুরবাড়ির কেউ তোমাকে ওই অবস্থায় দেখে, তা হলে সে সুইসাইড করবে।'

প্রলয়বাবু বিনীত ভঙ্গিতে বলেন, 'ব্যাগের বদলে আমি যদি বাজার বদল করি, করবী?'

'বাজার বদল! মানে?'

'মানে, এমন কোনও বাজারে গেলাম যে-দিকটায় এয়ারপোর্ট যাওয়ার পথ পড়ে না। ধরো স্টেশনের দিকে...। সুমির শ্বশুরমশাই তো প্লেনে ছাড়া যাতায়াত করেন না।'

করবীদেবী স্বামীর দিকে আগুন চোখে তাকালেন। প্রলয়বাবু বুঝলেন আর কথা বাড়ালে এবার বড় ধরনের অশান্তি আসবে। চোখ নামিয়ে তাড়াতাড়ি বললেন, 'ঠিক আছে করবী, তুমি ব্যাগটা বদলেই দিয়ো।'

ব্যাগ বদলেছে। তারপরে এই ঘটনা! এক দিন নয়, পরপর দু'দিন ঘটল। হাত ঢুকিয়ে মনে হল, ভেতরে এমন কিছু রয়েছে, যা বাজারের ব্যাগে থাকার কথা নয়, বিচ্ছিরি ধরনের মনের ভুল। ভুল কেন হচ্ছে?

প্রথম ঘটনাটা ঘটে এক বুধবার। বাজার থেকে ফিরে রোজকার মতো আনাজপাতি বের করতে গিয়েছিলেন প্রলয়বাবু। করবীদেবী স্বামীর এই একটা একটা করে ঝিঙে পটল বের করা সহ্য করতে পারেন না। টানাটানির সংসারে বাজার করা আনাজপাতি এমন কিছু হিরে জহরত নয় যে, বের করে সাজাতে হবে। তা ছাড়া যত দিন যাচ্ছে, আইটেম, কোয়ান্টিটি দুটোই কমছে। তাই নিয়ে এত বাড়াবাড়ির কী আছে? এই কারণেই স্বামী বাজার নিয়ে ফেরার সময় করবীদেবী রান্নাঘরে আসেন না। খানিক পরে আসেন। সেই বুধবারও আসেননি। কুমড়োর ফালি বের করার সময়ে মুহূর্তের জন্য ব্যাগের ভেতরে অজানা জিনিসের স্পর্শ পেয়েছিলেন প্রলয়বাবু। একা একাই চমকে উঠেছিলেন। সাবধানে ব্যাগের মুখ বড় করে উঁকি দিলেন ভেতরে। না, অচেনা কিছু নেই। কুমড়োর ফালির পাশে পড়ে আছে ক'টা ঢেঁড়শ, ছোট একটা পেঁপে। সবই চেনা! বছরের পর বছর হাতে ধরে নেড়েচেড়ে দেখছেন। ভুল বুঝতে পেরে লজ্জা পেয়েছিলেন প্রলয়বাবু। কেন এমন হল? স্নান করতে করতে ঘটনা মনে পড়ল। ভুল হওয়ার পিছনে কারণ আছে। বছরখানেক আগে অফিসের নীতিশবাবু একটা গল্প বলেছিলেন। তাঁর বেকার শ্যালকের গল্প। শান্তশিষ্ট, গোবেচারা টাইপ সেই ছেলে বসিরহাট না বনগাঁ কোথায় যেন থাকে। ছোকরা এক সকালে বাজার সেরে ফিরে ব্যাগ থেকে পেঁয়াজকলি টেনে বের করতে গিয়ে ঠান্ডা, তেলতেলে কিছু একটা ধরে ফেলে। বের করতে দেখা গেল ইঞ্চি তিন-চার লম্বা একটা সাপের বাচ্চা। পেঁয়াজকলির ডাঁটিতে জড়িয়ে আছে। বড় কিছু নয়, হেলে সাপ। শ্যালক বেচারি রান্নাঘরেই জ্ঞান হারায়। মনে আছে, গল্প বলে নীতিশবাবু খুব খানিকটা হেসেও ছিলেন। ভিতু শ্যালকের কাণ্ড নিয়ে হাসি। নিশ্চয় সেই গল্প এখনও মাথায় রয়ে গিয়েছে, আর তার থেকেই ভুল। মাথা খুব আশ্চর্য জিনিস। কোন পুরনো ঘটনা কখন উঁকি মেরে ফিরে আসে, কেউ বলতে পারে না।

কিন্তু সে তো বেশ কিছুদিন আগের ঘটনা। আজ আবার একই ভুল কেন হবে?

প্রলয়বাবু মন শক্ত করে ব্যাগের মুখটা বড় করে খুলে ধরলেন। না, আজও অচেনা অজানা কিছু নেই। সাপ-ব্যাং, লোহা-পিতল কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকার থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে চিমসে চেহারার পটল, ছোট সাইজের বেগুনটা। উচ্ছে দুটোও কুন্ডুলি পাকিয়ে আছে। একবারে ডানদিকে গুটিসুটি মেরে, মাথা দুমড়ে মুচড়ে রয়েছে খানিকটা সজনে ডাঁটা। আগে এই ডাঁটা ছিল জলভাত। এখন দামি জিনিস। কেনবার সময় ভাল করে দেখে নিতে হয় ঠিকমতো বেঁকছে কি না। প্রলয়বাবু আজও বেঁকাতে চেয়েছিলেন। আনাজওলা অনুমতি দেয়নি। ঠোঁট বেঁকিয়ে বলেছে, 'নেবেন তো ওই ক'টা, তার আবার সোজা বেঁকার কী আছে?'

প্রলয়বাবু ভেবেছিলেন, বেলা বাড়লে ব্যাগের ঘটনা মন থেকে মিলিয়ে যাবে। মেলাল না। আবছাভাবে রয়ে গেল। অস্বস্তির মতো। অস্বস্তি মানেই অশান্তি। প্রলয়বাবু বিরক্ত হলেন। তিনি অশান্তি পছন্দ করেন না।

খাওয়ার সময়ে করবীদেবী পাতে লাউয়ের তরকারি দিতে দিতে বললেন, 'সামনের রোববার সুমি আসছে। ক'টা দিন থাকবে। জামাই দিতে আসবে। আমি জামাইকে দুপুরে খেতে বলেছি। প্রথমে রাজি হচ্ছিল না, আমি জোর করেছি।'

প্রলয়বাবু অন্যমনস্ক গলায় বললেন, ‘জোর করলে কেন?’

করবীদেবী পরিবেশন বন্ধ করে বললেন, ‘মানে! ছেলেটাকে কতদিন খাওয়ানো হয়নি বলো তো?’

প্রলয়বাবু মুখ নামিয়ে ভাতের গ্রাস মুখে তুললেন। না, লাউটা ঠকিয়েছে। সজনে ডাঁটাও খারাপ হবে।

‘আমি তা বলিনি, ওর হয়তো কাজ ছিল।’

করবীদেবী বললেন, ‘কাজ ছিল তো কী হয়েছে? তা বলে নেমন্তন্ন করব না? সুমিই বা কী ভাববে? এখন কিছু বলবে না, পরে কথা শোনাবে।’

প্রলয়বাবু বিড়বিড় করে বললেন, ‘তা হলে ঠিকই করেছ।’

করবীদেবী মুখ ঝামটা দিয়ে বললেন, ‘তোমার কাছে ঠিক ভুলের সার্টিফিকেট চাইনি। ওইদিন ঠিকমতো বাজার করবে। সুমি বলেছে, ছেলে চিংড়ি মাছ ভালবাসে। তুমি গলদা নেবে। বড়টা পারবে না, সে মুরোদ তোমার নেই, মাঝারিটা আনবে।’

অফিসে যাওয়ার পথে প্রলয়বাবু ট্রামেই হিসেব কষতে লাগলেন। গলদা চিংড়ির দাম এখন কত যাচ্ছে? কার কাছ থেকে ধার পাওয়া যায়? নীতিশবাবুকে একবার বলে দেখা যেতে পারে। নইলে অন্য চেষ্টা করতে হবে। হাতে ক’দিন সময় আছে।

ধার চাওয়া হল না, নীতিশবাবু অফিসে আসেননি। এদিকে অফিসে জোর গুজগুজ ফুসফুস চলছে। ইউনিয়নের সঙ্গে বসে ম্যানেজমেন্ট নাকি গোপন লিস্ট বানাচ্ছে। ছাঁটাইয়ের লিস্ট। সেই লিস্টে ইউনিয়ন নিজের লোকদের বাঁচাবে। প্রলয়বাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। লিস্টে তাঁর নাম নেই তো? থাকলে কঠিন সমস্যা হবে। মাথার ওপর ধারের বোঝা। তার ওপর রয়েছে সুমি। বেচারি শ্বশুরবাড়িতে কী বলবে? বুড়ো বয়েসে বাবার চাকরি চলে গিয়েছে? চিন্তা বাড়তে থাকল। ইউনিয়নের নেতাদের সঙ্গে একবার দেখা করলে কেমন হয়? অনেকেই নাকি করেছে। এতদিন পলিটিক্সের ধারে কাছে যাননি। এখন মনে হচ্ছে, কাজটা বিরাট ভুল হয়েছে। সেরকম বুঝলে হাতে-পায়ে ধরতে হবে। ফাইল সরিয়ে উঠে পড়লেন প্রলয়বাবু। ওদের কী বলতে হবে? ভাই, দয়া করে আমাকেও আপনাদের সঙ্গে রাখবেন? কথা বলার সময় কি হাত কচলাতে হবে? কোনও সমস্যা নেই। হাত কচলানো যাবে।

নেতারা কেউ দেখা করল না। দরজা বন্ধ করে ইমারজেন্সি মিটিং চলছে। মুখ বাড়িয়ে জানিয়ে দিল, দিন তিনেকের আগে সময় হবে না। মনে গভীর অশান্তি নিয়ে বাড়ি ফিরলেন প্রলয়বাবু।

এদিকে নীতিশবাবু পরপর তিন দিন অফিসে এলেন না। তাঁর সম্পর্কে মারাত্মক খবর পাওয়া গিয়েছে। সেই খবর সত্যি না মিথ্যে, বোঝা যাচ্ছে না, তবে অফিসে সবাই জেনেছে। নীতিশবাবুর বনগাঁর এক শ্যালক নাকি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। ছোকরার বাজারের ব্যাগে রিভলভার পাওয়া গিয়েছে। পুঁইশাকের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। পুলিশ হাতেনাতে ধরেছে। তল্লাশির সময় তারা ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে প্রথমে ঠান্ডা, শক্ত জিনিসের ছোঁয়া পায়। এমনি শক্ত নয়, লোহা পিতলের মতো শক্ত। এর পরই অস্ত্রটা টেনে বের করে।

তখনও নলের সঙ্গে নাকি ক'টা পুঁইশাকের ভেজা ভেজা পাতা ঝুলছিল! নীতিশবাবু শ্যালককে বাঁচাতে থানা পুলিশ করছেন।

খবর শুনে অনেকক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইলেন প্রলয়বাবু। সেই গোবেচারা টাইপ, ভিতু ছেলেটা না? সাপের বাচ্চা দেখে যে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল?

রবিবার সকালে ধার করা টাকায় জামাইয়ের জন্য হাত খুলে বাজার করলেন প্রলয় সমাদ্দার। মাঝারি সাইজের গলদার সঙ্গে বড় ট্যাংরাও নিয়েছেন। সঙ্গে গাদাখানেক তরিতরকারি। যেমন করবীদেবী বলে দিয়েছিলেন। শুধু তার বাইরে দুম করে বেশ খানিকটা পুঁইশাক কিনে ফেলেছেন। কোনও দরকার ছিল না, তবু কিনেছেন। ঠিক করেছেন বাড়িতে ফিরে আগে গোপনে একবার ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে দেখবেন। দেখবেন হাতে রিভলভারের ঠান্ডা, শক্ত ছোঁয়া লাগে কি না।

দু'বার ভুল হয়েছে বলেই যে বারবার ভুল হবে, তার কী মানে আছে?

আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয়, ১০ জানুয়ারি, ২০১০

কালবৈশাখী

আজকের দিনটা অন্যরকম।

আমি ঠিক করেছি আজ বেরোব না। ছোট কাজ করি। ছুটিছাটা কম। যেটুকু আছে, তাও ফুরিয়ে গিয়েছে। এবার না গেলে মাইনে কাটবে। সে কাটুক। আমার খরচ কমে যাচ্ছে। একদিন কেন এখন তিনদিনের মাইনে কাটলেও কিছু এসে যাবে না। দুপুরে ভাত খাওয়ার পর লম্বা ঘুম দেব। উঠব একেবারে সেই বিকেলে। রোদ পড়ে যাওয়ার পর। উঠে এক কাপ চা খাব। চা আমাকে নিজে করতে হবে। এটা একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার। নিজে করা চায়ে স্বাদ হয় না। চা-পাতা দামি হলেও হয় না। আগের সিস্টেমে ফিরে যেতে হবে। ব্যাচেলর জীবনের সিস্টেম। সামনের চায়ের দোকানটার সঙ্গে চুক্তিতে যাব। বড় কাচের গ্লাসে পাউরুটির খালি প্যাকেট চাপা দিয়ে সকাল-বিকেল চা পাঠাবে। জানলার সামনে চেয়ার টেনে বসে তারিয়ে তারিয়ে খাব। সবসময় অবশ্য আমাদের ঘরের জানলার সামনে বসা যায় না। সমস্যা আছে। বসা যাবে কি যাবে না সেটা নির্ভর করে হাওয়া বাতাসের ডাইরেকশনের উপর। জানলার ঠিক উলটোদিকেই খোলা নর্দমা। হাওয়া যদি পুব দিক থেকে আসে তা হলে নির্ঘাত সে বিকট দুর্গন্ধ নিয়ে আসবে। হাওয়া উত্তর বা পশ্চিমমুখী হলে সে সমস্যা নেই। আবহাওয়া দফতরের জানলা খোলা-বন্ধ সম্পর্কিত কোনও বুলেটিন হয় না। হলে বেশ মজা হত। টিভির নিউজ রিডার সকালবেলা বেশ গলা কাঁপিয়ে বলত, 'এবার শৌভিক ঘোষের জন্য আবহাওয়া দফতরের বিশেষ বুলেটিন। শৌভিকবাবু, আপনি সকাল আটটা থেকে দশটা এবং বিকেল তিনটে থেকে চারটে ছাপান্ন পর্যন্ত ঘরের জানলা...।'

আমি অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখেছি দুপুরবেলা ঘর অন্ধকার করে ঘুমোনোর মতো আরাম খুব কম জিনিসেই আছে। হট ফেভারিটের মতো এই আরাম আমার কাছে কোল্ড ফেভারিট। গরমকালে জানলায় পরদা টেনে ঘর অন্ধকার করে ফেলি। তারপর ফ্যান চালিয়ে, ঘর ঠান্ডা করে ঘুম মারি। এই কারণে কোল্ড ফেভারিট। আমার স্ত্রী পায়েল এই জিনিস একেবারেই সহ্য করতে পারে না। পারবার কথাও নয়। কাজকর্মে না বেরিয়ে একটা সুস্থ-সবল লোক যদি দিনেরবেলা ঘরে শুয়ে ঘুমোয় কোনও স্ত্রীই সহ্য করবে না। এই যে আমার এত ছুটি খরচ হয়ে গিয়েছে সে এই বেটাইমে ঘুম-বিলাসের জন্য। প্রথম থেকেই পায়েলের ঘোর আপত্তি। যদিও ঘটনা সেরকম হওয়ার কথা ছিল না। বিয়ের প্রথম প্রথম মেয়েরা স্বামীকে সবসময় কাছে পেতে চায়। অসময়ের আদর সোহাগের নাকি স্বাদই আলাদা। রুটিনের বাইরের ব্যাপার। পরীক্ষার ভাষায় যাকে বলে 'আনসিন'। স্বামী

ভদ্রলোক যখন সেজেগুজে ফিটফাট হয়ে অফিসে বেরোয়, তখন নতুন বউ নাক মুখ কুঁচকে বলে— 'আজ না গেলে হয় না উঁ উঁ...। দেখো না উঁ উঁ... একটা ফোন করে দাও না উঁ উঁ...।' সেই সময় বেচারি স্বামীর জুতো মোজা খুলে সুড়সুড় করে ঘরে ঢুকে পড়া ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। মিনমিনে কেরানি থেকে বাঘা বাঘা অফিসার নতুন বউয়ের কোঁচকানো নাক এবং 'উঁ উঁ'-তে কুপোকাত হবেই। পায়েলের ঘটনা সেরকম নয়। সে কড়া ধাঁচের মেয়ে। শরীরের প্রতি তার অতিরিক্ত যত্ন। যখন তখন ঝাঁপাঝাঁপি, লাফালাফি সে মোটে পছন্দ করে না। তার সবকিছু হিসাব করা। আমিও তাকে এই বিষয়ে কখনও জোরজবরদস্তি করিনি। ইচ্ছে যে হয়নি এমন নয়, তবে সাহস হয়নি।

প্রথম দিন আমাকে বাড়িতে দেখে ভুরু কুঁচকে পায়েল জিজ্ঞেস করল, 'কী হল, শরীর খারাপ? কাজে যাবে না?'

আমি আহ্লাদি গলায় বলি, 'আজ আর কাজে যেতে ইচ্ছে করছে না পায়েল। কতদিন দুপুরে রাইস স্লিপ দিই না।'

'রাইস স্লিপ! সেটা আবার কী?'

আমি হাসি। বলি, 'ভাতঘুম। তুমিও ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে ভাতঘুম দিতে পারো। দেবে?'

পায়েল আঁতকে ওঠে, 'আমি দুপুরে ঘুমোব? খেপেছ? দুপুরে ঘুমোনো মানে পেটে চর্বি জমা। মা যদি জানতে পায় ভীষণ রাগ করবে।'

'তোমার মা জানতে পারবেন কী করে? তিনি কি নিয়মিত তোমার স্বাস্থ্য চেক করেন?'

পায়েল অবাক হয়ে বলে, 'ওমা! করবে না? বিয়ের পর মেয়ের শরীর স্বাস্থ্য কোনদিকে যাচ্ছে সব মা-ই নজর রাখে। একটু এদিক-ওদিক হলে এমন প্রশ্ন করবে না... বলবে, নিশ্চয় শ্বশুরবাড়িতে খাওয়া-দাওয়া ঠিকমতো হচ্ছে না।'

'ঠিক আছে তা হলে তুমি ঘুমিয়ো না। মাকে রাগিয়ে কিছু করা ঠিক হবে না। জানলার পরদাগুলি ভাল করে টেনে দিয়ে যাও।'

পায়েল মুখ ভেটকে বলে, 'কোথায় যাব? ঘর তো একটা।'

আমি হাই তুলতে তুলতে বলি, 'তাও তো বটে। দোকান টোকান ঘুরে আসবে? আজকাল কত সুন্দর সুন্দর সব দোকান বাজার হয়েছে।'

পায়েল অভিমানহত গলায় বলে, 'দোকানে ঘুরতে টাকা লাগে। যে টাকা মাইনে পাও, তাতে সুন্দর দোকানে যাওয়া যায় না। মাসকাবারির বাজার করতে মাসে একবার মুদির দোকান যাওয়া যায়। তাও ধারে।'

'তা হলে বরং বাপের বাড়ি ঘুরে এসো।'

এবার পায়েল ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকায়। বলে, 'থাক, আমি আমার ব্যবস্থা বুঝে নেব। তুমি বরং ঘুমোও।'

পরের দিকে পায়েল বিরক্ত হতে শুরু করল। বিরক্তি বাড়তে লাগল। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলতে শুরু করল, 'যে ব্যাটাছেলে দুপুরে বাড়িতে শুয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোয় তার কিস্যু হয় না।'

পায়েল খুব সুন্দরী। একটু সুন্দরী নয়, বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মাথা ধরে যাওয়া ধরনের বাড়াবাড়ি রকমের সুন্দরী। তার উপর আবার রেগে গেলে তার সৌন্দর্য দুদ্দাড় করে বাড়তে থাকে। এত বাড়ে যে তখন আর রূপ দেখার জন্য তার দিকে তাকাতে হয় না। এত সুন্দর বলেই আমি হুট বলতে পায়েলকে বিয়ে করেছিলাম। কোনও প্ল্যান ছিল না। বরং উলটোটাই ছিল। ভেবেছিলাম, সারাজীবন একা থাকব। কাজ যেটুকু না করলেই নয়, সেটুকু করব, আর বাকি সময় উপুড় হয়ে ঘুমোব। কিন্তু সব গোলমাল করে দিল ছোটমামা। ছোটমামা থাকে কসবায়। একদিন অফিসে এসে হাজির। তখন টিফিন টাইম। অফিসের বাইরে চায়ের দোকানের নড়বড়ে বেঞ্চে বসে মুড়ি আলুর চপ দিয়ে টিফিন করছিলাম। ছোটমামাকে দেখে ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ালাম। বাবা-মা মারা যাওয়ার পর আমার গার্জেন বলতে এই মানুষটাই। দেখা হয় কালেভদ্রে। কিন্তু দেখা হলেই মানুষটা বিরাট গার্জেনগিরি ফলায়।

'শরীরের এ কী হাল করেছিস বাবলু? ছি ছি। কণ্ঠার হাড় গোনা যাচ্ছে! ছি ছি। জামাকাপড়ে ইস্ত্রি নেই কেন? ইস। সকালে কী খেয়েছিস? ভেরি ব্যাড। তোকে যে এক পোয়া করে দুধ খেতে বলেছিলাম? খাচ্ছিস? নো নো, না না এভাবে চলতে পারে না। তুই বরং আমার ওখানে চলে আয়। মামা-ভাগনে টিম করে থাকব। কালই চলে আয়।'

ধমক শুনতে আমার চমৎকার লাগে। অপরাধীর মতো মাথা নামিয়ে থাকি। যাদের কপালে গার্জেনের ধমক-ধামক জোটে না তারা জানে ধমক কত দামি জিনিস। পয়সা দিয়ে ভাব-ভালবাসা কেনা যায়, ধমক কেনা যায় না।

আমি বললাম, 'ছোটমামা, মুড়ি খাবে?'

ছোটমামা চোখ পাকিয়ে বলল, 'তুই কি রোজ টিফিনে মুড়ি খাস?'

'রোজ খাই না। কোনওদিন বিস্কুট খাই। কোনওদিন আবার কিছুই খাই না।'

'বাড়ি থেকে টিফিন আনতে পারিস না?' ছোটমামা চশমার উপর দিয়ে তাকিয়ে বলল।

আমি হেসে বললাম, 'কী যে বলো ছোটমামা। বাড়ি থেকে টিফিন বানিয়ে আনব? একা মানুষ, বাড়িতে কতদিন খাওয়া-দাওয়াই হয় না।'

ছোটমামা নাক দিয়ে 'হু' ধরনের আওয়াজ করলেন। তারপর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'চিন্তা করিস না। তোর টিফিন বানানোর একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। তোর বিয়ে ঠিক করেছি।'

'বিয়ে! ছোটমামা, আমি তো বিয়ে করব না ঠিক করেছি।'

ছোটমামা আমার কথা গ্রাহ্যই করল না। বলল, 'তুই কী করবি, কী করবি না, সেটা তো তুই ঠিক করবি না, আমি ঠিক করব। ডেট ফাইনাল হয়ে গিয়েছে। মেয়ের ফোটো এনেছি। তুই যদি চাস দেখতে পারিস। না চাইলেও কোনও সমস্যা নেই। আমি অরিজিনাল মেয়ে দেখে নিয়েছি।'

আমি আবার দোকানের বেঞ্চে বসে পড়লাম। বললাম, 'ছোটমামা, তুমি কী বলছ আমি বুঝতে পারছি না।'

'তোকে বুঝতে হবে না। যা বোঝার আমি বুঝে নিয়েছি। পাত্রী আমার বাল্যবন্ধুর কন্যা।

অতি সুশ্রী, সুলক্ষণা। ঘর সংসারের কাজ জানে। আমি গত পরশু নিজে তার হাতে তৈরি এঁচোড়ের ডালনা খেয়ে এসেছি। অতি উপাদেয় রান্না। তারপরই ফাইনাল করেছি। ভাগনেকে রেঁধে-বেড়ে খাওয়াতে পারবে কি না নিজে দেখে নেওয়া দরকার ছিল। দেখে নিয়েছি। ঠিক আছে, শুধু একটাই গোলমাল।'

'আবার গোলমালও আছে!' আমি কী বলব বুঝতে পারছি না।

ছোটমামা বললেন, 'অন্য কেউ হলে লুকোতে পারতাম, কিন্তু তোর বেলায় লুকোনো যাবে না। শুধু আমার নিজের ভাগনে বলে নয়, ইউ আর এ ভেরি গুড বয়। তোর কোনও লোভ নেই। এই সময় লোভহীন মানুষ আর পিস অফ ডায়মন্ডের ভ্যালু এক। এরকম একটা গুড বয়কে ব্যাড জিনিস গোপন করা ঠিক নয়।'

'ব্যাড! কী ব্যাড ছোটমামা? মেয়ের কোনও খুঁত-টুঁত আছে?'

'খুঁত কি না জানি না, মেয়েটি এক বখাটের পাল্লায় পড়েছিল। যতদূর শুনেছি বখাটের নাম অলয় না প্রলয়। বড়লোকের উচ্ছন্নে যাওয়া ছেলে। মেয়ে দেখলেই পিছনে ঘুরঘুর করে। তবে সে অধ্যায় সব চুকে বুকে গিয়েছে। দেখতে সুন্দর মেয়ের হাজার ঝামেলা। আমার বন্ধু তার মেয়েকে অনেক বুঝিয়েছে। মেয়ে বিয়েতে নিমরাজি হয়েছে। তারা আর এক মুহূর্ত দেরি করতে চায় না। আমাকে ঘটনা বলতে, আমি বললাম, আমার হাতে ছেলে আছে। সেই ছেলে পৃথিবীর প্রথম দশটা ভাল ছেলের একটা। তোমরা যদি বলো আমি দেখতে পারি। কিন্তু তার আগে মেয়ের হাতের রান্না টেস্ট করে নেব। বন্ধু বলল, কে টেস্ট করবে? ছেলে? আমি বললাম, না, আমি।'

কথা বলতে বলতে ছোটমামা চামড়ার ব্যাগ হাতড়ে পায়েলের ফোটো বের করে আমার হাতে দিল। কিছু কিছু ঘটনা আছে যা মানুষের বোধবুদ্ধি ওলোটপালোট করে দিতে সময় নেয় না। পায়েলের ফোটো আমার তাই করল। মাথা ঘুরিয়ে দিল। বুদ্ধিভ্রংশ হল। এমন সুন্দর একটা মেয়ে আমার স্ত্রী হবে!

ছোটমামা আর কিছু বলার আগেই আমি নির্লজ্জের মতো প্রশ্ন করলাম— 'ডেট কবে ঠিক করেছ? আমার হাতে তো পয়সাকড়ি নেই। বিয়ের খরচখরচা বলে কথা।'

ছোটমামা নাক টেনে বলল, 'পয়সাকড়ি লাগবে না। এখন বিয়েতে ঘটা করার দরকার নেই। ওই অলয় না প্রলয় যেন জানতে না পায়। বখাটে ছেলেরা সব কিছু করতে পারে। কাগজে দেখিস না? অ্যাসিড-ট্যাসিড ছুড়ে মারে, রিস্ক নেব না। এখন নমো নমো করে বউকে নিয়ে ঘরে ঢুকে যা।'

'ঘর তো ভাল না।'

ছোটমামা ধমক দিয়ে বলল, 'তুই তো ভাল।'

সেই পায়েল আমার ঘুমের বহর দেখে যখন ঘোষণা করল 'কিস্যু হবে না' তখন আমি বললাম, 'কিছু হবে না কেন বলছ? হয়েছে তো। আমার এমন সুন্দর বউ হয়েছে।'

পায়েল ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, 'সুন্দর বউ ধরে রাখবার মুরোদ আছে তো? দেখো, ফসকে না যায়।'

আমি না তাকিয়েই বুঝতে পারি রাগে পায়েলের গাল লাল হয়ে গিয়েছে। তাকে আরও

চমৎকার লাগছে। মনে মনে স্ত্রীর রূপের জন্য আমার গর্ব হতে থাকে। আমি চোখ বন্ধ করে ঘুমে ডুবে যেতে চেষ্টা করি। পায়েল গজগজ করে—

'ভুল লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে বাবা-মা মেয়েকে হাত পা বেঁধে জলে ফেলে। আমায় ফেলেছে কাদায়। এই লোকের সঙ্গে ঘর করাও যা, গলা পর্যন্ত কাদায় ডুবে বসে থাকাও তা-ই।'

আমি আধো ঘুম আধো জাগরণে বলি, 'কাদার মধ্যে ঘুমোতে দারুণ মজা। গোরু মোষদের দেখবে কাদা পেলে আর উঠতে চায় না।'

পায়েল তীক্ষ্ণ গলায় ঝাঁঝিয়ে ওঠে।

'আমার বাবা-মায়ের তা-ই করা উচিত ছিল। তাদের উচিত ছিল আমাকে তোমার মতো অলস, অকর্মণ্যর সঙ্গে বিয়ে না দিয়ে গোরু মোষের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া। কেউ তোমায় খুঁজতে এলে বলতাম, মাফ করবেন, আমার স্বামী এখন কাদায় ঢুকে ঘুমোচ্ছেন আর জাবর কাটছেন, তাকে ডাকতে পারব না।'

আমি আওয়াজ করে হাসতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু ঘুমের কারণে পারলাম না। ঘুমের মধ্যে আওয়াজ করে হাসা কাঁদা যায় না। পায়েলের সেন্স অফ হিউমার চমৎকার। কোথায় যেন পড়েছিলাম, সুন্দরী মেয়েদের রসিকতাবোধ কম। আমেরিকার কোনও এক বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিষয়ে এক সমীক্ষা হয়েছিল। সেখানে রসিকতার পরীক্ষায় সুন্দরীরা গড়ে নম্বর পেয়েছিল দশের মধ্যে তিন। কুশ্রীরা পেয়েছিল, সাত থেকে সাড়ে সাত। পায়েল সেই পরীক্ষা ভুল প্রমাণ করে দিয়েছে। সে একজন রসিক সুন্দরী। সত্যি আমার কপাল ভাল। আমি মনে মনে ছোটমামাকে 'থ্যাঙ্ক ইউ' জানিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

তবে আজ আমার আরাম করা নিয়ে কোনও ঝামেলা হবে না। আমি নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারব। যতক্ষণ খুশি ঘুমোব। 'অন্যরকম দিন'-এর কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমোব।

দিন সাধারণত 'অন্যরকম' হয় একটা কারণে। আমার বেলায় কারণ হয়েছে দুটো। আজ চৈত্র মাসের শেষদিন। বাংলা বছর শেষ হচ্ছে। কায়দা করে যাকে বলা হয় বর্ষবিদায়। কাল পয়লা বৈশাখ, নতুন বছর শুরু হবে। কোন বছর শুরু হচ্ছে জিজ্ঞেস করলে বলতে পারব না। বাংলা দিন তারিখের হিসাব মাথায় থাকে না। তবে মনের ভিতর একটা ফুর্তি ভাব বোধ করছি। জোরালো কিছু নয়, হালকা ফুর্তি ভাব। পঁচিশ বছর বয়েসের অলস এক যুবকের ক্ষেত্রে হালকা ভাবই যথেষ্ট। বাংলা ইংরেজি কোনও নতুন বছর নিয়ে বেশি আদিখ্যেতা তাকে মানায় না।

দিন 'অন্যরকম' হওয়ার দু'নম্বর কারণ হল, আজ সকালে পায়েল আমাকে ছেড়ে চলে গেল। সে আমাকে বিয়ের ঠিক পাঁচ মাস তিন দিনের মাথায় ত্যাগ করল। বর্ষবিদায়ের মতো বউ বিদায়। তবে বর্ষবিদায়ের মজা হল, পরদিন নতুন আর-একটা বছর শুরু হয়। বউ বিদায়ের ক্ষেত্রে কি তাই হয়? মনে হয় না। আমার বেলায় তো একেবারেই হবে না। পায়েল ছাড়া কাউকেই আমি স্ত্রী হিসাবে ভাবতে পারব না। তবে চলে গিয়ে সে ঠিক কাজই করেছে। আমি তাকে সমর্থন করেছি। আমার মতো 'ঘেসটু' লোকের সঙ্গে জীবন কাটানোর অর্থ শুধু গলা পর্যন্ত কাদায় ডুবে বসে থাকা নয়, কাদার মধ্যে হাবুডুবু খাওয়া। 'ঘেসটু লোক' ব্যাপারটা ঠিক কি আমি জানতাম না। শব্দটা প্রথম শুনি পায়েলের মুখে।

'ঘেসটু মানে কী পায়েল? এটা কী কোনও আদরের কথা?

'না, এটা গালাগালি। যে লোক ঘেসটে ঘেসটে চলে তাকে বলে ঘেসটু। তুমি সেরকম। ইংরেজিতে বলে অ্যাম্বিশনলেস।'

বিয়ের মাসখানেক পর থেকে পায়েল দেরি করে বাড়ি ফেরা শুরু করল। দুপুর থাকতে থাকতে সেজেগুজে বেরোত। সন্ধে পেরিয়ে গেলে ট্যাক্সি এসে তাকে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিত। অবিন্যস্ত পোশাকে, থেবড়ে যাওয়া টিপে, ঘাড়ে ভেঙে পরা খোঁপায় আমার ঘরের কম আলোতেও ঝলমল করত সে! আমি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। প্রথম প্রথম পায়েল বলার চেষ্টা করত, কোথায় গিয়েছিল। আমি শুনতাম না। কী এসে যায়? একদিন মোটরবাইকে চেপে ফিরল। রাতে খেতে বসে গল্প বলার ঢঙে বলল, 'আজ প্রলয় নামিয়ে দিয়ে গেল।'

আমি রুটি ছিঁড়ে মুখে তুলে বললাম, 'কে প্রলয়?'

পায়েল শান্ত গলায় বলল, 'আমার বন্ধু। বাইরে ছিল, কয়েকদিন হল ফিরেছে।'

আমি বললাম, 'খুব ভাল। একদিন নেমন্তন্ন করে খাওয়াও। তোমার অন্য বন্ধুদেরও ডাকো। সবাই মিলে হইচই করব। বিয়েতে কিছু করতে পারোনি।'

পায়েল চকিতে আমার দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে বলল, 'পাগল, এই ওয়ানরুম ভাড়াবাড়িতে প্রলয়কে আনব? সল্টলেকে তার ফ্ল্যাট কত বড় তোমার আইডিয়া আছে? যদি খেতে হয় তার বাড়িতে খাব। হইচই করতে হলে তার বাড়িতে করব। তা ছাড়া তুমি হইচইয়ের কী বোঝো? তোমার হইচই মানে তো ভিখিরির মতো একটা চাকরি করতে যাওয়া, নইলে বাড়িতে শুয়ে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোনো। প্রলয়ের ইয়ারলি টার্নওভার কত বলো তো?'

'কত?' আমি উৎসাহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করি।

পায়েলের চোখমুখ দেখে মনে হল প্রলয়ের টার্নওভারের ব্যাপারে আমার উৎসাহ দেখে ভয়ানক রেগে গেল। বলল, 'থাক, জেনে লাভ নেই। বুঝবে না।'

আমি বললাম, 'তা-ই ভাল, আমি বুঝব না।'

এক শনিবার রাতে পায়েল ফোন করে জানাল, তার ফিরতে রাত হবে। সে প্রলয়ের ফ্ল্যাটে 'খাওয়া-দাওয়া করছে, 'হইচই' করছে। আমি যেন তার জন্য অপেক্ষা না করি। আমি পায়েল ফেরা পর্যন্ত জেগে বসে রইলাম জানলার পাশে। যত দিন যেতে লাগল, প্রলয়ের ফ্ল্যাটে পায়েলের 'খাওয়া-দাওয়া,' 'হইচই' বাড়তে লাগল। আমি খুশি হলাম। সত্যি তো মেয়েটা সারাক্ষণ এই খুপরিতে বসে কী করবে? আমি বাড়িতে ঘুমিয়ে আনন্দ পাই বলে সেও পাবে এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। সে যাতে আনন্দ পায় সেটাই তার করা উচিত। এক রাতে তাকে আমি আদর করছিলাম। সে আমার বুকের কাছে সরে এসে ফিসফিস করে বলল, 'এই...।'

আমি গাঢ় গলায় বললাম, 'কী?'

পায়েল ফিসফিস করে বলল, 'আমি যে প্রলয়ের ওখানে যাই তোমার রাগ হয় না?'

আমার চোখ কপালে উঠে যাওয়ার জোগাড়। বললাম, 'রাগ! কেন? রাগ হবে কেন? আমার আনন্দ হয়।'

পায়েল ছিটকে সরে গিয়ে বলল, 'আনন্দ হয়! পুরনো বয়ফ্রেন্ডের বাড়িতে গিয়ে হুল্লোড় করি বলে তোমার আনন্দ হয়!'

আমি হেসে তাকে জড়াতে যাই। পায়েল হাত সরিয়ে দেয়। আমি বলি, 'তোমাকে খুশি দেখলেই আমার ভাল লাগে।'

পায়েল অন্ধকার হাতড়ে তার নাইটি খোঁজে। বলে, 'তুমি কি উন্মাদ?'

'বাঃ, তোমার আনন্দ হলে আমার আনন্দ হবে না? রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর। এমনি এমনি লিখেছেন?'

বিছানা থেকে নেমে নাইটি পরল পায়েল। দাঁত কিড়মিড় করে বলল, 'এ তো দেখছি এমনি উন্মাদ নয়, বদ্ধ উন্মাদ।'

এতদিন শুধু বিরক্তি প্রকাশ করেছিল, কিছুদিন হল পায়েল বলতে শুরু করেছিল— 'অসম্ভব, আমি তোমার সঙ্গে থাকব না। কিছুতেই থাকব না। এইভাবে আমি আমার জীবন নষ্ট করে ফেলতে পারি না।'

আমি বললাম, 'ঠিকই, জীবন নষ্ট করা উচিত নয়।'

পায়েল বলল, 'আমি অন্যরকম ভেবেছিলাম।'

আমি বললাম, 'কীরকম ভেবেছিলে?'

'তোমার ছোটমামা বাবাকে বলেছিল, তুমি নাকি পৃথিবীর দশটা ভাল ছেলের একজন। তখন ভেবেছিলাম বিল গেটসের খুড়তুতো ভাই। এখন দেখছি কথাটা আধখানা সত্য। তুমি সত্যি পৃথিবীর দশজন ভাল-র একজন। তবে সেই দশজন মানুষ নয়, সেই দশজন ভাল গাধা।'

কাউকে 'গাধা' বললে তার অপমান হওয়ার কথা। আমার একেবারেই হল না। পায়েলের কোনও কথা বা আচরণে আমি অপমানিত হওয়ার কথা ভাবতেই পারি না। আমি মজা করে বলি, 'গাধা মোটেই অলস না। তারা অনেক মোট বয়।'

পায়েল কড়া গলায় বলে, 'থামো। তোমার এইসব গাধা টাইপ ইয়ারকি ভাল লাগছে না। একমাত্র গাধাদেরই জীবনে কোনও লক্ষ্য থাকে না। তারা নিজের অধিকার কতখানি জানে না। নিজের সুন্দরী স্ত্রীকে কীভাবে বাগে রাখতে হয় জানে না। স্ত্রী অন্য পুরুষের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে রাগ করে না।'

আমি হাসতে হাসতে বললাম, 'গাধার আবার স্ত্রী হয় নাকি!'

পায়েল অবাক হয়ে বলল, 'এত গাল দেওয়ার পরও তুমি হাসছ! আশ্চর্য! আসলে এটাও ভেদামারা পুরুষদের একধরনের গা-বাঁচানো টেকনিক। রাগতে পারে না বলে হাসিঠাট্টা দিয়ে ম্যানেজ করতে চায়। যাক, তোমাকে আর জ্ঞান দিয়ে লাভ হবে না। তোমার সঙ্গে যে পাঁচ মাস সময় কাটালাম এই যথেষ্ট। এই ভয়ংকর পাঁচ মাস ভুলতে আমার পাঁচ বছর সময় লাগবে।'

'আমার তার থেকেও বেশি সময় লাগবে। কারণ আমি তোমাকে খুবই ভালবেসে ফেলেছি পায়েল।'

পায়েল মিনিটখানেক চুপ করে থাকে। মনে হল তার টানা টানা তুলিতে আঁকা চোখদুটো

ভিজে উঠল। সম্ভবত আমার কথা শুনে রাগে অপমানে চোখে জল এসে গেল। রাগে অপমানে চোখে জল আসা মেয়েদের ক্ষেত্রে নতুন কিছু নয়। আমার কি কথাটা বলা ঠিক হল না? ইস, না বললেই হত। খামোকা সহজ সরল মেয়েটাকে দুঃখ দিলাম। মুহূর্তখানেকের মধ্যে নিজেকে সামলে নিয়ে পায়েল বলল, 'চুপ করো। একদম চুপ করো। এই ধরনের ন্যাকা কথা শুনলে আমার গা জ্বলে যায়।'

'তুমি চলে গেলে আর গা জ্বলবে না। কারণ আমার ন্যাকা, স্মার্ট কোনও কথাই আর তোমাকে শুনতে হবে না।'

পায়েল আবার খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলে, 'তুমি কি আমাকে সত্যি সত্যি চলে যেতে বলছ?'

'আমি বলছি না। তুমি প্রস্তাব দিয়েছ, আমি সমর্থন করছি। তোমার যাতে ভাল লাগে তাতেই আমার সমর্থন আছে।'

'বুঝেছি।' বলে পায়েল আমার সামনে থেকে সরে গেল।

আজ সকাল থেকেই পায়েল মন দিয়ে সুটকেস গুছিয়েছে। তার দুটো সুটকেস। একটা ছোট, একটা ঢাউস। যে শান্ত ভঙ্গিতে সে গোছগাছ করেছে তাতে কে বলবে সে স্বামীকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, সিমলা কুলু মানালি বেড়াতে যাচ্ছে।

আমি বললাম, 'হেল্‌প করব?'

পায়েল শান্তভাবে বলল, 'এখন নয়। পরে হেল্‌প করবে। আমি যাওয়ার সময় ছোট সুটকেসটা নিয়ে যাব। তুমি পরে ভারীটা পৌঁছে দিয়ে আসবে। তাড়াহুড়োর কিছু নেই। কাল পরশু দিয়ে আসবে। যদি মনে করো রবিবারও যেতে পারো।'

আমি বললাম, 'সেই ভাল। ভারী জিনিস বইতে গেলে তোমার হাতে হেঁচকা লেগে যেতে পারে। বিয়ের পরপরই একবার লেগেছিল মনে আছে? জলের বালতি তুলতে গিয়ে...।'

পায়েল সুটকেসের ঢাকনা বন্ধ করতে করতে বলল, 'থাক, আর নকল দরদ দেখাতে হবে না। তাও যদি আসল দরদ দেখাতে জানতে।'

আমি দেখেছি, পায়েলের শুধু যে রসিকতাবোধ ভাল এমনটা নয়, সে হেঁয়ালি করতেও পছন্দ করে। যাদের বুদ্ধি আছে একমাত্র তারাই হেঁয়ালি করতে পারে। দরদের আবার আসল নকল কী? সত্যি, মেয়েটা পারেও বটে।

'সুটকেস কোথায় দিয়ে আসতে হবে জিজ্ঞেস করলে না তো?'

আমি হেসে বলি, 'কোথায় আবার? উত্তরপাড়ায়, তোমার বাপের বাড়িতে।'

পায়েল শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ, গলা, ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে বলল, 'না, সল্টলেকে। প্রলয়ের বাড়ি।'

আমি হাই তুলতে তুলতে বললাম, 'ও আচ্ছা। ঠিকানাটা লিখে দিয়ো।'

পায়েল চলে গেল সাড়ে ন'টার কিছু পরে। আমি বলেছিলাম, দুপুরে খেয়ে বেরোতে। নতুন বছরের আগের দিন না খেয়ে চলে যেতে নেই। বাংলা, ইংরেজি কোনও বছরেই ঠিক নয়। পায়েল কঠিন চোখে আমার দিকে তাকাল। বাইরে রোদের তেজ বাড়ছে। আজ

ভয়ংকর গরম। সকাল থেকেই রোদ গনগন করছে। একটা দমবন্ধ ভাব। হাওয়া বাতাসও নেই। বেলা বাড়লে যে অবস্থা আরও খারাপ হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই, আমি পায়েলকে আটকালাম না। গরমে পায়েলের কষ্ট হবে। ভোরে উঠেই পায়েল আমার জন্য সারাদিনের রান্না করে দিয়েছে। এমনকী অফিসের টিফিন পর্যন্ত। আমি বারণ করেছিলাম। শোনেনি। বলল, 'যখন বেরোবে জানলা দরজা আটকে বেরোবে। বাসন মাজার মেয়েটা এলে নজর রাখবে। মেয়েটার হাত টানের হ্যাবিট আছে। রাতে শোওয়ার আগে গ্যাসের সিলিন্ডার বন্ধ আছে কিনা দেখবে। ইস্ত্রির দোকানে তোমার দুটো জামা দেওয়া আছে নিয়ে নেবে।'

আমি বললাম, 'বাপ রে, এ তো বিরাট লিস্টি! তোমাকে কি ট্যাক্সি ডেকে দেব?'

পায়েল কঠিন চোখে তাকিয়ে বলল, 'ধন্যবাদ। আমি নিজেই পারব।'

'প্রলয়বাবুকে বাইক নিয়ে আসতে বললে না কেন?'

পায়েল ভুরু কুঁচকে রাগী গলায় বলল, 'মানে?'

'মানে কিছু নয়। সঙ্গে মালপত্র আছে তো তাই বলছি। বাইকের পিছনে তুলে দিতাম।'

ঠোঁট কামড়ে পায়েল বলল, 'বাজে কথা কম বলো।'

ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সাজগোজে ফিনিশিং টাচ দিচ্ছিল পায়েল। ড্রেসিং টেবিল বলতে একটা বড় কাচ আর একটা টুল। টুলটা আবার সামান্য নড়বড় করে। লিপস্টিক লাগানোর সময় সতর্ক থাকতে হয়। সময় লাগে। আজ পায়েল যেন বেশি সময় নিচ্ছিল।

'তুমি কি পৌঁছে আমাকে ফোন করে একটা খবর দেবে?'

'না, দেব না।'

'আমি কি ফোন করব?'

পায়েল লিপস্টিক মাখা ঠোঁটদুটো ঘষা শেষ করে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'না, তুমিও করবে না।'

পায়েল চলে গিয়েছে। খাটের উপর চিত হয়ে শুয়ে আছি। পায়েল চলে যাওয়ার আগে যেমন আমার রাতের খাবার করে গিয়েছে তেমন ঘরদোর গুছিয়ে, বিছানার চাদরও বদলে গিয়েছে। ইস্ত্রি করা সাদা চাদর। গায়ে সবুজ লতাপাতা। মাথার উপর বনবন করে পাখা ঘুরছে। পাখার হাওয়া গরম। গায়ে লেগে চিরে চিরে যাচ্ছে। ঘরের একমাত্র জানলায় পরদা টেনেছি কিন্তু তারপরও যেন রোদের হলকা আসছে। একতলার এই ঘরটা এমনই। গরমকালে ভয়ংকর গরম, শীতকালে মারাত্মক ঠান্ডা। বাড়িওয়ালারা সবসময়েই ভাড়াটেদের জন্য এই কায়দায় ঘর বানায়। পায়েল অনেকবার এই বাড়ি বদলাতে বলেছিল। আমি চুপ করে থেকেছি। এই শহরে এত কম ভাড়ায় কোথায় বাড়ি পাব? একবার পেয়েছি এই যথেষ্ট। কলকাতা নিষ্ঠুর একটা শহর। তার অজস্র রাজপথ আর অলিগলি আছে। কিন্তু বউয়ের আবদার মেটানোর জন্য গরিব স্বামীর সামনে সে কোনও পথ খোলা রাখেনি। এখন অবশ্য আর চিন্তা নেই। পায়েল চলে গিয়েছে। বাড়িও বদলাতে হবে না। প্রলয়বাবুর বাড়িতে নিশ্চয় এসি মেশিন আছে। এসি না থাকলেও খোলা জানলা দরজা তো পাবেই।

পাবে না? মস্ত বারান্দা? ছাদ? আহা, বেচারি পায়েল, এবার একটু আরাম পাক। আমার ঠান্ডা গরমে কিছু এসে যাবে না। কোল্ড ফেবারিটের বদলে ক'দিন না হয় হট ফেভারিটে শুয়ে থাকব। পাশবালিশ জড়াতে জড়াতে মনে মনে পায়েলের দিয়ে যাওয়া কাজের তালিকা আওড়াতে লাগলাম।

...প্রলয়বাবুর বাড়িতে সুটকেস... দরজায় ছিটকিনি... গ্যাসের চাবি... কাজের মেয়ের উপর নজরদারি... আর কী যেন? কী যেন? মনে পড়ছে না...

ঘুম ভাঙল জানলা দরজার প্রবল খটখটানিতে। ধড়ফড় করে উঠে বসলাম খাটের উপর। ঘর আধো অন্ধকার। সন্ধে হয়ে গেল নাকি? ক'টা বাজে? জানলার পাল্লায় আওয়াজ বাড়ছে। ধাক্কাচ্ছে কে? ধাক্কানোর আওয়াজ তো নয়, যেন ঝনঝন করে উঠল। ঘরের কোনও ফাঁকফোকর থেকে চোরা বাতাস ঢুকছে। ঠান্ডা, শিরশিরে বাতাস। ব্যাপারটা কী? স্বপ্ন-টপ্ন নাকি? না স্বপ্ন তো নয়। এই তো বিছানার উপর পায়েলের পেতে যাওয়া চাদর। এই তো চাদরের গায়ের সবুজ লতাপাতা। স্বপ্ন হলে রং দেখা যেত না। জানলার ঝনঝনানি বেড়ে চলেছে। বাইরে কোথায় যেন দড়াম করে আওয়াজ হল। টিনের চাল পড়লে যেমন হয়। ঘটনা কী! আর শুয়ে থাকা উচিত নয়। আমি খাট থেকে নেমে পড়লাম।

পরদা সরিয়ে জানলার পাল্লা খুলতেই থমকে গেলাম! কালবৈশাখী।

ঝাঁপিয়ে ঝড় উঠেছে। শহরের বড় বড় বাড়ি, চোখা চোখা কার্নিশ, ইলেকট্রিক, কেবল তারের জঞ্জাল ভেদ করে দেখতে পেলাম আকাশ মেঘে মেঘে কালো। মেঘ ছুটছে দিগবিদিক জ্ঞান হারিয়ে। যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে। আমি কিছু বোঝার আগেই ওইটুকু জানলা দিয়ে হুড়মুড় করে খানিকটা দমকা হাওয়া ঢুকে পড়ল ঘরে। ঢুকল আমাকে ধাক্কা মেরে। সঙ্গে ধুলোবালি। অন্য সব ধুলোবালিতে নোংরা লাগে। একমাত্র কালবৈশাখী ঝড়ের ধুলোবালি গায়ে মাখতে ভাল লাগে। ধুলোর সঙ্গে গাছের কয়েকটা পাতাও রয়েছে যে! আশ্চর্য! ইট বালির শহরে গাছের পাতা এল কোথা থেকে? ঠান্ডা হাওয়া ঝাপটা মেরে, লন্ডভন্ড করে দিল আমার ঘরের সাজগোজ।

কালবৈশাখী প্রথম দেখছি না। তবু কেন জানি যতবার দেখি মন ভাল হয়ে যায়। ভিতরের যাবতীয় গ্লানি, ব্যর্থতা কোথায় যে পালায়! কে জানে হয়তো ঝড় উড়িয়ে নিয়ে যায়। আজও নিয়েছে। নিজেকে মনে হচ্ছে রাজার মতো। মনে হচ্ছে, প্রকৃতির এই সাজ আমার জন্য। শুধু আমার জন্য। কোমরে দু'হাত দিয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়াই আমার ছোট্ট জানলার সামনে। যেন রাজপ্রাসাদের মাথায় উঠেছি। ঝড়ের অভিবাদন গ্রহণ করছি।

ইস পায়েল যদি আর একটা দিন অপেক্ষা করত, আমার এই দাপট দেখতে পেত। না, এটা ঠিক হয়নি।ওকে ছাড়াটা আমার অন্যায় হয়েছে। আকাশের যা অবস্থা ঝড় মনে হয় আরও অনেকক্ষণ চলবে। তারপর হইচই করে বৃষ্টি নামবে। শিল পড়বে কি?

আর দেরি করা ঠিক হবে না। এখনই পায়েলকে নিয়ে আসতে হবে। সে রাজি না হলেও নিয়ে আসতে হবে। জোর করতে হবে। হাত চেপে ধরতে হবে। নিজের বউয়ের হাত চেপে ধরার মধ্যে তো অন্যায় কিছু নেই। অন্তত একটা দিন তাকে এই ঘরের ঝড়বৃষ্টি দেখে যেতে হবে।

শার্ট পরতে পরতে মোবাইলে পায়েলকে ধরলাম।

'কী?'

'ঝড় উঠেছে পায়েল। ঘরে খুব ঝড় উঠেছে। কালবৈশাখী।'

'জানি। দেখতেই তো পাচ্ছি।'

'না দেখতে পাচ্ছ না। দূরে বসে এই ঘরের ঝড় দেখবে কী করে?'

পায়েল চুপ করে থাকে।

'আমি আসছি।'

'কী বলছ শুনতে পাচ্ছি না, বড্ড হাওয়ার শব্দ।'

আমি গলা ফাটিয়ে বলি, 'আমি আসছি।'

'শুনতে পাচ্ছি না। আরও জোরে বলো।'

আমি ঝড় ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠি, 'আমি আসছি। শুনতে পাচ্ছ? তোমাকে নিতে আসছি।'

'যদি না যাই?'

আমি রেগে যাই। বলি, 'জোর করে নিয়ে আসব।'

মুহূর্তখানেক চুপ করে থেকে পায়েল ফিসফিসিয়ে বলল, 'এসো। আমি সুটকেস খুলিনি।'

প্রতিদিন রোববার, ১৮ এপ্রিল, ২০১০

চাপা

উদ্ভট চিন্তাটা প্রতীকের মাথায় এল বাড়ির একেবারে কাছে এসে।

গাড়ির গতি কমাল প্রতীক। কী করবে এখন? গাড়ি থামাবে? ঘুরিয়ে নেবে? নাকি উদ্ভট চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে চলে যাবে? কী করতে হয় এই সময়?

স্টিরিয়োতে চাপা গলায় গান চলছে। রনেন কিটিং-এর গান। ইউ সে বেস্ট হোয়েন ইউ সে নাথিং অ্যাটঅল... তুমি তখনই সবথেকে ভাল বলো, যখন কিছুই বলো না। এইসব প্রেমের গান কিঙ্কির কালেকশন। গাড়িতে সিডি রেখে দেয়। প্রতীককে চোখ পাকিয়ে বলে, 'খবরদার বাপি, আমার সিডিগুলো সরাবে না।' সুশ্রী মেয়ের ওপর রাগ করে। বলে, 'ওসব আবার কী রাজ্যের হাবিজাবি।' প্রতীক সিডি সরায় না। পনেরো বছরের মেয়ে নানাভাবে ভালবাসার কথা শুনতে চাইবে সেটাই স্বাভাবিক।

আজ প্রতীকও শুনছিল। পার্ক স্ট্রিটের মুখটা পার হয়ে স্টিরিয়ো চালিয়ে দিল। বেশ লাগছে কিন্তু শুনতে। তুমি যখন কিছুই বলো না...। গান শুনতে শুনতেই মোবাইলে সুশ্রীকে ধরল।

'আমি রওনা দিয়েছি।'

সুশ্রী হাই তুলে বলল, 'সে তো বুঝতেই পারছি। কোথা থেকে রওনা দিয়েছ?'

'পার্ক স্ট্রিট থেকে।'

'আজও গিলেছ নাকি?'

প্রতীক হাসতে হাসতে বলল, 'দু'পেগ, ওনলি টু। জাস্ট কম্পানি দিতে বসেছিলাম। তুমি তো জানো সুশ্রী, আমি যে ধরনের কাজ করি তাতে একটু-আধটু...।'

সুশ্রী চাপা গলায় বলল, 'থাক, একই এক্সকিউস রোজ শোনাতে হবে না। কতক্ষণ লাগবে?'

'হাফ আন আওয়ারও নয়। বাইপাস হয়ে নিউটাউনের মধ্যে দিয়ে সাঁই সাঁই করে উড়ে চলে যাব।'

'এই রাতে ফাঁকা রাস্তাটা দিয়ে আসবে? উলটোডাঙা দিয়ে ঘুরে এলে পারতে।'

'রাস্তা কোথায় ডার্লিং। বললাম তো উড়ে যাব। ওহো, তোমায় তো বলাই হয়নি, আজ সকালে গ্যারাজে গিয়ে গাড়িতে দুটো ডানা লাগিয়ে নিয়েছি। উইংস। ওরা জিজ্ঞেস করল, কোনটা নেবেন? আমি বললাম, যেটায় সবথেকে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরা যায় সেটা দাও। দাম একটু বেশি পড়ল।'

সুশ্রী আবার হাই তুলল। জড়ানো গলায় বলল, 'মাতলামি কোরো না, সাবধানে ড্রাইভ করো। তুমি কি ডিনার করেছ?'

'না করিনি। ওরা খুব জোরাজুরি করছিল। আমি বললাম, নো, নেভার। স্ত্রী কন্যা ডিনার টেবিলে না থাকলে আমার ডাইজেশন প্রবলেম হয়। খাবার হজম হতে চায় না।'

'আদিখ্যেতা কোরো না, অপেক্ষা করছি।'

'কিঙ্কি কোথায়? শুয়ে পড়েছে?'

'ওমা শোবে কেন? খেয়ে নিয়ে পড়তে বসেছে। নেক্সট উইকে ওর এক্সাম। ফোন রাখো, গাড়ি চালাতে চালাতে বকবক কোরো না। বরং আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। তুমি এলে উঠব।'

সুশ্রীর এই একটা মজা। দুম ধাড়াক্কা ঘুমিয়ে নিতে পারে। প্রতীক হেসে বলল, 'ঠিক আছে, ঘুমিয়ে নাও। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখো তুমিও আমার সঙ্গে উড়ছ। জাস্ট লাইক আ বার্ড।'

'বয়ে গেছে।'

নিউটাউনের রাস্তাটা ধরতেই অ্যাক্সিলেটরে চাপ দিল প্রতীক। আশি, নব্বই, একশো...। চারপাশ শুনশান, নিঝুম। মাঝে মাঝে উঁচু উঁচু লাইটপোস্ট থেকে উজ্জ্বল হলুদ আলো ঠিকরে এসে পড়েছে নীচে। আজ হঠাৎ-ই প্রতীকের মনে হল, ভারী চমৎকার তো! কালো অন্ধকার কেটে হলুদ পথ চলে গেছে রূপকথার গল্পের মতো। শেষে নিশ্চয় একটা সোনালি দুর্গ রয়েছে। দুর্গে ছলছল চোখের বন্দিনী রাজকন্যা। প্রতীক গাড়ির গতি আরও বাড়াল। সিগন্যালের ঝামেলা নেই। এই নতুন রাস্তার এটা একটা বড় সুবিধে। দু'পা এগোলে কলকাতার মতো চোখ পাকিয়ে কেউ থমকে দেয় না। মনের আনন্দে ছোটো। যত খুশি ছোটো। যতক্ষণ না হাঁপাচ্ছ ছুটতে থাকো। শুধু কোনও কোনও বাঁকে টিনের বোর্ড লাগানো— সাবধান! গোরু পারাপারের পথ, সাবধান! মানুষ পারাপারের পথ।

প্রথম প্রথম নোটিশগুলো দেখে কিঙ্কি খুব হাসত।

'দু'পাশে হাইরাইজ, আই টি পার্ক, শপিং মল হচ্ছে, সেখানে আবার গোরুর জন্য নোটিশ। হি হি। একটু পরে হয়তো দেখব, অ্যারো দিয়ে লেখা, ওই দিকে নৌকোর ঘাট, এই দিকে পালকি পাবেন। হি হি।'

প্রতীক বলত, 'তা নয়, এদিকটায় এখনও গ্রামটাম আছে। গ্রাম না থাকলেও মাঠ তো দেখতে পাচ্ছিস।'

রাতে সে ঝামেলাও নেই। 'সাবধান' লেখা বোর্ডগুলো অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছে। কোনও বাধা নেই। এত রাতে যে অল্প কয়েকটা গাড়ি ছুটছে তারা সকলেই ভ্রূক্ষেপহীন এবং দুঃসাহসী।

প্রতীকও সাহসী হল। সে অ্যাক্সিলেটরে আরও চাপ দিল। এবার সত্যি মনে হচ্ছে, গাড়িতে ডানা লেগেছে। সে উড়েই চলছে। শরীরটাও যেন হালকা পলকা। মাথায় ঝিমঝিমে ভাব। অল্প নেশার এটাই মজা। অনেক কিছু বোঝা যায়, আবার অনেক কিছু বোঝা যায়ও না। নিজের মনেই হাসল প্রতীক। আধখোলা, আধবোজা চোখে স্টিয়ারিং-এ আঙুল রেখে তাল দিতে লাগল। রনেন কিটিং-এর সঙ্গে গলা মেলাল— 'ইউ সে বেস্ট হোয়েন ইউ সে নাথিং অ্যাটঅল...।'

নিউটাউনের বাধাহীন, মসৃণ পথ পেরিয়ে ফ্লাইওভারের মুখে এসে পড়তে মিনিট

পনেরোও লাগল না প্রতীকের। এবার রাস্তা ছেড়ে ইউ টার্ন নিয়ে বাঁদিকের গলি। ঢুকলেই ছ'তলা ফ্ল্যাট। গলির মুখে এটিএম কাউন্টার। রাতে হীরকখণ্ডের মতো জ্বলজ্বল করে। আজও করছে। প্রতীকদের বাড়ি চেনার এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশ। কিঙ্কি মজা করে বলে, 'গলির মুখেই দেখবে টাকার পাহাড়, পাশ কাটিয়ে চলে আসবে।'

প্রতীকও পাশ কাটাতে গেল এবং ঠিক এই সময়ে উদ্ভট চিন্তাটা মাথায় বিদ্যুতের মতো ঝলসে উঠল।

আসার পথে অ্যাক্সিডেন্ট করল না তো? কাউকে কি চাপা দিল? নিদেন পক্ষে ধাক্কা মারেনি তো? মনে হচ্ছে যেন এরকম কিছু একটা ঘটেছে। কী ঘটেছে?

ব্রেক চেপে গাড়ি দাঁড় করাল প্রতীক। গান বন্ধ করল, গাড়ির ভেতর শুধু এসির ফিসফিসানি। বেশি ঠান্ডা লাগছে। ভুরু কুঁচকে গেল প্রতীকের। স্টিয়ারিং-এর ওপর রাখা দুটো হাতই ইঞ্জিনের কারণে মৃদু কাঁপছে।

অসম্ভব কিছু নয়। গোটা পথটা সে যেভাবে গাড়ি চালিয়েছে তাতে এ ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট ঘটানো অসম্ভব কিছু নয়। সারাক্ষণই সে ছিল অন্যমনস্ক। ফুরফুরে মেজাজে। মোবাইলে সুশ্রীর সঙ্গে হাসিঠাট্টা করল। গান শুনল। চালকের মধ্যে যে টানটান ভাবটা থাকা দরকার, তার বিন্দুমাত্র ছিল না। এখন মনে পড়ছে, সবসময় যে রাস্তার ওপর সমানতালে নজর রাখতে পেরেছে এমনটাও নয়। সে খেয়ালই ছিল না। অভ্যেসে ছুটছিল। ছুটতে ছুটতেই ধাক্কা মেরেছে হয়তো। মারার পরও খেয়াল হয়নি। অ্যাক্সিডেন্টের এটাই সমস্যা। অকস্মাৎ ঘটে যায় বলে বিপদ সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যায় না। কিছুটা সময় লাগে। ততক্ষণে চারপাশের মানুষ হইচই করে ওঠে, ঝাঁপিয়ে পড়ে গাড়ির ওপর। কাচ ভেঙে, দরজা খুলে ড্রাইভারকে টেনে নামায়। কিল, চড়, লাথির মাঝখানে পেট্রলের ঢাকনা খুলে আগুন লাগিয়ে দেয়।

প্রতীকের পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি টপকে সাইকেল রিকশ চলে গেল। লাস্ট ট্রেনের মতো সম্ভবত এটা এ পাড়ার শেষ রিকশ। চলে যাওয়া রিকশর দিকে তাকিয়ে প্রতীক ঠোঁট কামড়ায়। ঘাম হয়নি তবু পকেট হাতড়ে রুমাল বের করতে যায়। পারে না। রুমাল নিয়ে বেরোয়নি আজ।

মন বলছে, চাপা দিয়েছে, অবশ্যই দিয়েছে। কিন্তু এটা সম্ভব কী করে? ঘটনার সময় একেবারেই কিছু বুঝতে পারবে না। ধাক্কা দিলে একটা আওয়াজ তো হবে। হবে না? কে জানে হয়তো হয়েছেও। গাড়ির কাচ তোলা। ভেতরে এসি চলছে, গানও বাজছে। মিষ্টি একটা গন্ধও ছিল। গাড়িতে গন্ধের ব্যবস্থা সুশ্রীর করা। ড্যাশ বোর্ডের ওপর সেন্টের শিশি রেখেছে। শিশি আর ওডিকোলন ভেজানো ন্যাপকিন। ন্যাপকিন ব্যবহার হয় না, তবু রেখেছে। বাইরের আওয়াজ তো দূরের কথা ধুলো, বালি গন্ধ কিছুই ঢোকার উপায় নেই। নিশ্চয় তাই হয়েছে। মুখোমুখি না হয়ে ধাক্কাটা হয়তো লেগেছে পাশ থেকে। বড় কোনও ধাক্কা নয়, ছোট ধাক্কা। তারপরই মানুষটা হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এই ধরনের অ্যাক্সিডেন্টে এটাই হয়। যে ধাক্কা খায় প্রথমে ব্যালান্স হারিয়ে রাস্তায় পড়ে যায়। লাগে না বিশেষ। ভাবে ধুলো ঝেড়ে উঠে পড়বে। আর তখনই গাড়ির চাকা চলে যায় শরীরের ওপর দিয়ে।

এই মানুষটার কোথা দিয়ে চাকা গেছে? পা? পেট? মাথা নয় তো?

পা থেকে পিঠ পর্যন্ত ঠান্ডা একটা স্রোত উঠে এল হামাগুড়ি দিয়ে। একটু কাঁপুনিও হল যেন। এসি বন্ধ করল প্রতীক। ডানপাশের জানলার কাচ নামাল। বাইরে গরম হাওয়ার ঝলক। গাড়ির স্টার্ট বন্ধ করল প্রতীক।

নেশা কি বেশি হয়ে গেছে? প্রতীক মাথা ঝাঁকাল। দূর, আবোল তাবোল ভাবছে। একটা আস্ত মানুষকে চাপা দিয়ে চলে আসবে, অথচ বুঝতে পারবে না। এরকম কখনও হয়? একদিন-দু'দিন নয়, এগারো বছর গাড়ি চালাচ্ছে সে। তার আগে লাইসেন্স ছাড়াই কলকাতার রাস্তায় কয়েক মাস ঘুরেছে। তখন অবশ্য পাশে ড্রাইভার থাকত। এতদিন গাড়ি চালালে চোখ, কানের পর একটা অন্য ইন্দ্রিয় তৈরি হয়। সেটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় নয়, ড্রাইভারের ইন্দ্রিয়। চলন্ত গাড়িতে সেই ইন্দ্রিয়ই সব নিয়ন্ত্রণ করে। ঘুমিয়ে পড়লেও হাতের স্টিয়ারিং কাঁপে না। বাঁকে, মোড়ে ভুল হয় না। নিজে থেকেই হর্নে হাত পড়ে। গতি বাড়ে-কমে, গিয়ার বদল হয়। সামনে কেউ পড়লে গাড়ি যেন নিজেই দেখতে পেয়ে পাশ কাটায়। দু'-একটা ছোটখাটো অ্যাক্সিডেন্ট ছাড়া প্রতীকের ড্রাইভার জীবন পুরোটাই নিষ্কলঙ্ক। তাও সেসব অ্যাক্সিডেন্ট মানুষের সঙ্গে ছিল না। একবার মেটাডোর মেরেছিল বি টি রোডে। দরজায় ঘসে দিয়েছিল। আর একবার পিছোতে গিয়ে ট্যাক্সিতে লেগে ব্যাক লাইট ভাঙল। সে বলা নেই কওয়া নেই একেবারে মানুষ চাপা দিয়ে ফেলবে! ফেলবে শুধু না, ফেলে বুঝতেও পারবে না। ভুল হচ্ছে না তো? মনের ভুল? তার এমন কিছু নেশা হয়নি যে সে এ ধরনের ভুল করবে। তা ছাড়া এমন নয় যে মদ খেয়ে সে কোনওদিন গাড়ি চালায়নি। বহুবারই চালিয়েছে। কখনওই বাড়াবাড়ি ধরনের নেশা সে করে না। গাড়ি চালালেও করে না, না চালালেও করে না।

প্রতীক মনে মনে সাঁইতিরিশের নামতা আওড়াতে শুরু করল। কলেজ জীবনে প্রলয় বলত, মদ্যপানের পর সেন্সে আছিস কিনা বুঝতে নামতা মনে করবি। অড নাম্বারের টেবল। সাতাশ, সাঁইত্রিশ, সাতচল্লিশ।

প্রতীক বিড়বিড় করছে। থার্টিসেভেন ওয়ান জা থার্টিসেভেন, থার্টিসেভেন টু জা সেভেনটি ফোর, থার্টিসেভেন থ্রি জা ওয়ান হান্ড্রেড ওয়ান...।

পাঁচ পর্যন্ত পৌঁছানোর আগেই লজ্জা পেল প্রতীক। ছি, ছি, মাঝরাতে রাস্তায় দাঁড়িয়ে এসব কী পাগলামি শুরু করছে। বাড়ি ফিরে ঘটনা বললে কিঙ্কি নিশ্চয় খুব একচোট হাসবে।

প্রতীক নিজেও হাসল। হাত বাড়িয়ে গাড়ি চালু করে গিয়ারে হাত রাখল। আর তখনই মনে হল। যদি পাগলামি না হয়? ঘটনা যদি সত্যি হয়? নিশ্চয়ই সে কিছু একটা করেছে। না হলে, এ ধরনের চিন্তা তার মাথায় আসবে কেন? মানুষকে চাপা দেওয়া গান বা কবিতা নয় যে হুট করে মাথায় চলে আসবে। ঘটনা কিছু ঘটেছে বলেই তার এরকম মনে হচ্ছে। তার অজান্তেই ঘটেছে। ড্রাইভারের ইন্দ্রিয় তখন জানায়নি। এখন জানাল।

প্রতীক গাড়ি ঘোরাল। বড় গাড়ি। ঘোরাতে সময় নেয়।

নিউটাউনের রাজকীয় রাস্তাকে আরও উজ্জ্বল, আরও ঝলমলে লাগছে। হলুদ আলোর সঙ্গে কোথা থেকে যেন একটা ভাঙা চাঁদ এসে হাজির হয়েছে সামনে। এই ধরনের পথের

ওপর আকাশ সর্বদাই অনেকটা নেমে আসে। এখনও এসেছে। কালো আকাশ। চাঁদ অবশ্য পথে আলো ফেলেনি। আলো ফেলেছে দু'পাশের বিস্তীর্ণ মাঠে। তাদের দেখাচ্ছে রক্তশূন্য, ফ্যাকাশে। অনেক দূরে দূরে আকাশছোঁয়া বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে ছায়ার মতো। সিকিখানা, আধখানা তৈরি হয়ে অপেক্ষা করছে।

প্রতীক গাড়ি চালাচ্ছে একপাশ ধরে। প্রায় গড়িয়ে গড়িয়ে। কড়া হেডলাইট চকচকে রাস্তায় পড়ে পিছলে যাচ্ছে। আপ ডাউন দুটো পথেই সমান তালে চোখ রাখতে হলে গাড়ি এভাবেই চালাতে হবে। এতে যে সমস্যা হচ্ছে না এমন নয়, হচ্ছে। তবু চেষ্টা চালাচ্ছে প্রতীক। ফেরার সময়ও উলটোদিকটা আরও ভালো করে দেখতে হবে।

ডানপাশে চিত হয়ে শুয়ে থাকা ওটা কী?

প্রতীক তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে মুখ বের করে। গাড়ি সরিয়ে আনে। মানুষ একটা? না, মানুষ নয়, কংক্রিটের পাটাতন। হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে গুটিসুটি মেরে।

গোটা পথেই কিছু নেই! হুমড়ি খেয়ে, উপুড় হয়ে পড়ে নেই কেউ! ধারে এমন কোনও ঝোপঝাড় নেই যে গাড়ি চাপা দেহ গড়িয়ে সেখানে গিয়ে পড়বে। পাশের মাঠ পর্যন্ত পৌঁছোতে হলেও বেশ খানিকটা জায়গা পার হতে হবে। ছিটকে অতদূর যাওয়া শক্ত। দেয়াল করে আছে বালি, স্টোনচিপসের ঢিপি, পিচের ড্রাম। কোথাও লোহার বিম, পাইপ পড়ে আছে ঝিম মেরে। কোথাও আবার খুঁটিতে মাপজোক আর সীমানার ফিতে বাঁধা। ফিতেগুলো ফরফর করে হাওয়ায় উড়ছে পতাকার মতো। পাশ দিয়ে তীক্ষ্ণ হুইস্‌লের শীৎকার তুলে দুটো গাড়ি ছুটে গেল। এয়ারপোর্ট থেকে শহরে ঢুকছে। নির্জন পথটুকু পেরিয়ে যেতে চাইছে পড়িমড়ি করে।

প্রায় শেষের মুখে আসতে অন্ধকার অনেকটা কাটল। এদিকটায় ইতিমধ্যে অনেকগুলো বাড়ি চালু হয়ে গেছে। মানুষের বসবাস শুরু হয়েছে। দৈত্যের মতো দু'হাত ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটার পর একটা কাচের অফিস। আই টি পার্ক। নিয়ন আলোর শরীর জ্বলছে তাদের। এখানে দুর্ঘটনা কিছু ঘটলে চোখ এড়ানো অসম্ভব। প্রতীকের এবার অনেকটা নিশ্চিন্ত লাগছে। মনের অস্বস্তিটা যেন কমছে।

হঠাৎই চুপিসারে একটা জিপ প্রতীকের গাড়ি টপকে সামনে এসে দাঁড়াল। গায়ে ডোরাকাটা পুলিশের টহলদারি জিপ। মাথায় গনগনে লাল আলো ঘুরছে। গাট্টাগোট্টা চেহারার যে ভদ্রলোক জিপ থেকে লাফ দিয়ে নামলেন তাঁকে ঠিক চেনা পুলিশের মতো লাগছে না। এত রাতেও টিপটিপ ইউনিফর্মে স্মার্ট। ডানদিকের কোমরে রিভলভারের খাপ। জুতোয় আওয়াজ হচ্ছে। ঝকঝকে রাস্তায় টহলদারির জন্য ঝকঝকে পুলিশ অফিসার!

স্টার্ট বন্ধ করে জানলা দিয়ে মুখ বের করল প্রতীক। অফিসার মানুষটা বললেন, "এনি প্রবলেম স্যার?'

পুলিশের মুখে 'স্যার' শুনে একটু থমকে গেল প্রতীক। এদের কি আলাদাভাবে ট্রেনিং দেওয়া? হতে পারে। এই এলাকাটা জুড়ে বিদেশি অফিস, বিদেশি লোকজন, বিদেশি গাড়ির যাতায়াত। এখানে পুলিশ যে আলাদা হবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে?

প্রতীক ভুরু কুঁচকে বলল, 'কেন বলুন তো?'

অফিসার কাছে এসে জানলায় ঝুঁকে পড়েন। নরম গলায় বলেন, 'স্যার, অনেকক্ষণ থেকেই আমরা লক্ষ করছি, আপনি আস্তে গাড়ি চালাচ্ছেন। গাড়িতে কি কোনও সমস্যা?'

কী বলবে? এদের যদি বলা হয় যে, লাশ খুঁজতে বেরিয়েছে, তা হলে বিরাট গোলমাল পাকিয়ে যাবে। হয় মাতাল ভেবে ফাইন করবে, নয় পাগল ভেবে চড় লাগাবে। প্রতীক দ্রুত ভেবে নিল।

'বড় কিছু নয়, সামান্য একটু...। অ্যাক্সিলেটরে কিছু হয়েছে হয়তো। তারে...।'

'প্রবলেম হলে আমাদের বলতে পারেন, উই ক্যান হেল্‌প ইউ। আমাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে।'

'না না ইটস ওকে। একটু এগিয়ে হয়তো গ্যারেজ পেয়ে যাব।'

'ফাইন। আসলে রাস্তাটা তো ফাঁকা। তার ওপর এত রাত... যাক, শুভরাত্রি।'

অফিসার সুন্দর করে হাসেন। নিশ্চয় এঁদের হাসির জন্য বলা আছে। এই রাস্তায় ধমকের বদলে হাসি।

গাড়ির চাবিতে হাত রেখে প্রতীক এক মুহূর্ত থেমে বলল, 'ধন্যবাদ। আচ্ছা একটা ইনফরমেশন দিতে পারেন?'

অফিসার ভদ্রলোর বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী স্যার?'

'এই রাস্তার ওপর কোনও অ্যাক্সিডেন্টের খবর আছে?'

'অ্যাক্সিডেন্ট! কখন বলুন তো?' অফিসারের গলায় টেনশন।

প্রতীক গলা স্বাভাবিক করে বলল, 'বেশিক্ষণ নয়, এই ধরুন কুড়ি-পঁচিশ মিনিট বা আধ ঘণ্টা আগে?'

পুলিশ অফিসার এবার নিশ্চিন্ত হলেন।

'না স্যার, রাত আটটায় আমি ডিউটি নিয়েছি। তারপর থেকে কোনও ঘটনা নেই। কালকেও নেই। পরশু একটা হয়েছিল। তাও ভোররাতের দিকে। দুধের গাড়ি সাইকেলে ধাক্কা মারে। ফেটাল কিছু নয়। আপনি কি কিছু শুনেছেন? আপনার পরিচিত কেউ?'

প্রতীক তাড়াতাড়ি বলল, 'না না, আমার পরিচিত কিছু নয়। আসার সময় ওদিকের মুখটায় শুনলাম দু'-চারজন ছেলেছোকরা বলাবলি করছিল। কী জানি হয়তো পরশুর কথাই বলছিল। ইটস ওকে।'

'তাই হবে। গুড নাইট স্যার।'

কথা শেষ করে অফিসার ভদ্রলোক একটু সরে গেলেন। যার অর্থ 'এবার আপনি চলে যান।'

প্রতীক গাড়ি গড়াল। আর নয়, অনেক পাগলামি হয়েছে, এবার ফিরে যেতে হবে। দ্রুত ফিরে যেতে হবে। হাত উলটে ঘড়ি দেখল প্রতীক। বারোটা পার হয়ে গেছে। ছি ছি, কী বোকামিই না হল এতক্ষণ। কত দেরি হয়ে গেল। প্রতীক ঠিক করল, সামনে প্রথম যে জায়গাটা পাবে সেখান থেকেই গাড়ি ঘোরাবে। ঘুরিয়ে সুশ্রীকে একটা ফোন করবে। নিশ্চয়ই বেচারি ঘুমিয়ে পড়েছে। তাই হবে। নইলে এতক্ষণ খুব টেনশন করত। মোবাইলে বারবার ডাক আসত।

সামনেই জায়গা পাওয়া গেল, কিন্তু গাড়ি ঘোরানো হল না।

স্টিয়ারিং বেঁকানোর আগের মুহূর্তে খচখচানিটা ফের মাথা নাড়া দিয়ে বসল। যেন সাপের মতো সেটা কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল এতক্ষণ, আবার ফণা তুলছে!

চাপা দিয়েছে মানে এই রাস্তার ওপরই যে দিয়েছে এমন তো নয়। সে যাত্রা শুরু করেছিল সেই পার্ক স্ট্রিট থেকে। তারপর বাইপাস হয়ে সল্টলেকের অনেক পথ পার হয়েছে। ঘটনা কি সেখানে ঘটতে পারে না? গাড়ি চালিয়ে মানুষ মারার জন্য বাইপাস তো আদর্শ। তবে? এতটাই যখন এল, বাকিটুকু দেখে এলে ক্ষতি কী? ক্ষতি যেমন নেই, লাভও নেই। কিছুই পাওয়া যাবে না। যা হয়নি, যা হতে পারে না, তা পাওয়া যাবে কী করে? তবু মনের অস্বস্তিটা তো কাটবে। প্রতীকের এখন মনে হচ্ছে, পড়ে থাকা রক্তমাখা দেহের হদিশ পাওয়া থেকে মনের অস্বস্তি সরানো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এটা সরাতেই হবে। হটাতেই হবে। নইলে সে সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যাবে।

পিছনের বাড়িঘর ও পথ ফেলে প্রতীক আবার গাড়ি ছোটাল।

একই সঙ্গে তার রাগ হচ্ছে, আবার ভয়ও করছে। এটা কি কোনও অসুখ? হঠাৎ করে তাকে চেপে ধরল? নইলে এ কী করছে সে? কীসের পেছনে ছুটছে? সত্যি যদি যাওয়ার পথে কাউকে ধাক্কা মেরে, চাপা দিয়ে, থেঁতলে পিষে চলে গিয়ে থাকে তো গেছে। সমস্যা কোথায়? অ্যাক্সিডেন্ট করে অনেকেই তো পালায়। সে তো তাও করেনি। তার দোষ কোথায়? তাকে কেউ তাড়াও করেনি। তা হলে কেন এমন করছে সে? কেন যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে মনকে শান্ত করতে পারছে না? আর যদি সত্যিই কাউকে পায়, তা হলেই বা কী করতে পারে সে। হাড় ভাঙা, রক্তাক্ত মানুষটাকে গাড়িতে তুলে হাসপাতালে নিয়ে যাবে? অসম্ভব। এতটা মনের জোর প্রতীকের নেই। ফিরে যাওয়াই ভাল ছিল। ঠিক ছিল। কিন্তু পারছে কই?'

কখনও আলোয়, কখনও অন্ধকারে হেডলাইটের চোখ ধাঁধানো আলো ফেলে গাড়ি ছুটছে।

পরমা আইল্যান্ডের কাছাকাছি পৌঁছে সত্যি সত্যি একজনকে দেখা গেল। পথের ওপর নয়, বাঁ দিকে মূল পথ থেকে বেশ খানিকটা সরে গিয়ে পড়ে আছে লোকটা। গায়ের পোশাক এলোমেলো। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, পাশ ফিরে শুয়ে আছে। এরকমই হয়। মরা মানুষকে মনে হয় নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে।

এদিকটায় বাইপাস চওড়া করার কাজ চলছে। খোয়া, বালি বিছোনো। দ্রুত হাতে গাড়ি পাশ করল প্রতীক। দরজা খুলে নামল সর্তকভাবে। রাত বাড়ছে, বাইপাসের মতো ব্যস্ত পথেও গাড়ি কমে গেছে। যে গুটিকয়েক আছে, তারা ছুটছে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে। মনে সাহস এনে কয়েক পা এগোল প্রতীক। এদিকটায় আলোর অভাব নেই। মাথার ওপর ঝলমলে বোর্ডিং-এ অর্ধনগ্ন নারী হাসছে। সেই আলো এসে পড়েছে পথের ধারে পড়ে থাকা লোকটার গায়ে।

গাড়ি থেকে নামতে নামতেই প্রতীক ঠিক করে নিয়েছে কী করবে। কিছুই করবে না। দূর থেকে শুধু বোঝার চেষ্টা করবে আঘাতটা কতখানি। চাকা কোথা দিয়ে চলে গেছে? নাকি

শুধুই ধাক্কা মেরেছিল? এই সময় যদি পুলিশ চলে আসে আবার? সেটাও ভেবে ফেলেছে। বাঁ হাতের কড়ে আঙুল তুলে বলবে, 'বাথরুম।'

কিছুই করতে হল না। দু'পা এগোতেই পড়ে থাকা মানুষটা নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে উঠে বসে। খোলা জামার পকেট হাতড়ে বিড়ি বের করে দেশলাই জ্বালায়।

গাড়িতে উঠতেই প্রতীকের মোবাইল বেজে ওঠে।

'কী হল! তুমি কোথায়?' সুশ্রীর ঘুম ভাঙা উদ্বিগ্ন গলা।

প্রতীক নিজেকে সামলে শুকনো গলায় বলল, 'আসছি। আসছি ডার্লিং।'

'আসছি মানে। কোথায় তুমি? কী হয়েছে তোমার?' চাপা গলায় আর্তনাদ করে উঠল সুশ্রী।

কাঁধ দিয়ে মোবাইল চেপে ক্লান্ত গলায় প্রতীক বলল, 'রিল্যাক্স সুশ্রী। কিছুই হয়নি, টায়ার ফাটল। স্টেপনি বদলাতে গিয়ে দেখি সেটাও ড্যামেজ। আমি আসছি, প্লিজ আর একটু, একটুখানি।'

আরও একটু এগোল প্রতীক।

এত রাতেও পার্ক স্ট্রিট জেগে আছে। টলমল পায়ে পুরুষ হাঁটছে। মহিলাকে ইশারা দিয়ে চলে যাচ্ছে গাড়ি। 'খদ্দের'-এর কাছ থেকে পয়সা তোলার জন্য ভুঁড়িওলা পুলিশ ওত পেতে আছে পানের দোকানে। প্রতীকের ধীরে চলা গাড়ি দেখে রেস্তোরাঁর সামনে দাঁড়ানো মেয়েটা বুকের কাপড় সরিয়ে হাসল।

না, কোথাও কিছু নেই। অ্যাক্সিডেন্টের পর কলকাতা স্বাভাবিক হতে সময় নেয় না। পুলিশ জানে 'বডি' কীভাবে দ্রুত সরাতে হয়। তবু একটা চাপা টেনশন থেকে যায়। একটু জটলা, দুটো তৎপর ট্রাফিক সার্জেন্ট। সেসব কিছুই নেই।

পেট্রোল পাম্পে ঢুকে তেল ভরল প্রতীক। ক্যাশে বসা আধা ঘুমোনো ছোকরা ক্রেডিট কার্ড টানতে ভুল করল বেশ কয়েকবার। গাড়িতে উঠে বিধ্বস্ত প্রতীক বুঝতে পারল, এতক্ষণে অস্বস্তিটা সত্যি সত্যি কেটেছে। নিজেকে শুধু পাগল নয়, জোকারের মতো লাগছে। উদ্ভট একটা চিন্তার জন্য কী কাণ্ডই না করল! পরক্ষণেই মনে হল, বেশ করেছে। সামান্য কাঁটাও গলায় ঢুকে বিরাট গোলমাল পাকায়। তোলা না পর্যন্ত সব এলোমেলো করে ছাড়ে। এটাও সেরকম। মনের কাঁটা। সেই কাঁটা উপড়ে ফেলতে সে না হয় গাদাখানেক তেল আর সময়-ই খরচ করল।

বোতাম টিপতেই আলগোছে উঠে এল কাচ। এসি চলল। স্টিরিয়ো কি চালাবে? তুমি তখনই সবথেকে ভাল বলো...। দ্রুত ফুরফরে মেজাজে ফিরে এল প্রতীক। এবার সত্যিই উড়ে যেতে হবে। আরও জনহীন রাস্তা আরও সুন্দর। কাচের ঘরদোর, অফিসবাড়ি যেন উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জ। আকাশে ওড়ার পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে তাদের মাঝখান দিয়ে।

প্রতীক নিজের মনেই হাসল। টেম্পোরারি ইনস্যানিটি? কোথায় যেন পড়েছিল, বিচিত্র সব চিন্তা, উদ্ভট কল্পনা বারবার মনে আসাটা আসলে একটা মনের অসুখ। তারা মনকে তোলপাড় করে দেয়। না চাইলেও বারবার ফিরে আসে। অর্থহীন, অযৌক্তিক জানা সত্ত্বেও এড়ানো যায় না। ফেরানো যায় না। অসুখটার নাম কী? যা খুশি হোক। সাপ, ব্যাং, যা খুশি।

সে তো এখন মুক্ত। তা হলেই হল। মনের অসুখ হোক, প্রাণের অসুখ হোক, মাথা একেবার ঝরঝরে। পালকের মতো ফুরফুরে লাগছে নিজেকে।

প্রতীক অ্যাক্সিলেটারে চাপ বাড়াল।

বাঁকের মুখে মাথায় আলো ঘুরিয়ে টহলদারি জিপ এখনও দাঁড়িয়ে আছে। প্রতীক হাত নাড়ে। ওদের দেখতে পাওয়ার কথা নয়। কাচ তোলা, তার ওপর অন্ধকার। তবু একটা সৌজন্যের ব্যাপার তো আছে।

গান চালাল প্রতীক। সুশ্রীকে একটা ফোন করে দেবে? থাক, লিফটে ওঠার আগে একেবারে ফ্ল্যাটের বেল বাজিয়ে চমকে দেবে।

হর্ন বাজাতে হল না প্রতীককে, গাড়ি দেখতে পেয়েই টুলে বসে থাকা ঘুমন্ত দারোয়ান ধড়ফড় করে উঠে এসে গেট খোলে। মাথার টুপি ঠিক করতে করতে সেলাম ঠোকে।

পার্কিং-এ গাড়ি রেখে হাতে ব্যাগ নিয়ে নেমে এল প্রতীক। গাড়ি রাখার জায়গায় আলো পর্যাপ্ত। পরপর অনেক গাড়ি। নিরাপত্তার কারণেই করা। হঠাৎ দেখলে মনে হয় শোরুম। গাড়ি লক করল প্রতীক। মাথা তুলে তাকাল ওপরে। তার ফ্ল্যাটে আলো জ্বলছে। কিঙ্কির ঘরটা শুধু অন্ধকার। মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছে নিশ্চয়। ভালই করেছে। কতক্ষণ জাগবে? কাল সকালে ঘটনাটা বলতে হবে। ব্রেকফাস্ট টেবিলের পক্ষে বাবার এই পাগলামি যথেষ্ট মজার হবে। গা ছমছমেও। তবে ভাগ্যিস টায়ার পাংচারের গল্পটা ঠিক সময় মাথায় এসেছিল। নইলে সুশ্রী খুব টেনশন করত। কে জানে হয়তো ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়েও পড়ত। অনেক সময় যে ঘটনা রাস্তায় চিন্তা বাড়ায়, বাড়িতে কফি খেতে খেতে সেটাই হয়ে যায় হাসির।

ক্লান্ত প্রতীক নিজের মনেই আবার হেসে ফেলল। কয়েক পা এগিয়ে ঘাড় ঘোরাল গাড়ির দিকে। বহুদিনের অভ্যেস। ড্রাইভার ইন্দ্রিয় গাড়ির দিকে তাকিয়ে বোধহয় 'শুভরাত্রি' জানায়।

আর তখনই দাগটা চোখে পড়ল প্রতীকের। তার গাড়ির চাকা থেকে চলে গেছে গেট পর্যন্ত। তারপর গেট পেরিয়ে আরও...

আলোয় বুঝতে অসুবিধা হল না, দাগটা রক্তের।

শারদীয়া বর্তমান, ২০০৮

গর্ত

হরিপদ পড়ল নিঃশব্দে। এবং আলগোছে।

এই বনবাদাড়ের কুয়োটা যে আজও আছে সেটাই ভুলে গেছে সবাই। হরিপদ তো বটেই। সেই ভুলে যাওয়া, বহু বহু বছরের বাতিল, জীর্ণ, শুকনো, প্রায় বুজে আসা কুয়োটার মুখে ডাল পাতা সাজিয়ে কেউ যেন ফাঁদ পেতে রেখেছিল। আজ হরিপদ তাতে ধরা দিল। একপাশে ঝুঁকে থাকা ঝাপসা ঘন বটগাছটা থেকে উড়ে গেল বাদুড়ের দল। এঁকেবেঁকে উড়ে গেল। তাদের ক্রুদ্ধ ধারালো ডানায় চাপা অথচ তীক্ষ্ণ আওয়াজ উঠল। ফালা ফালা করে অন্ধকার কাটার আওয়াজ। শাট্ শাট্ শাট্।

প্রায় মাটির সঙ্গে মিশে থাকা বাতিল কুয়োতে পড়তে হরিপদর তেমন সমস্যা হয়নি। প্রথমে পায়ের তলার শুকনো ডাল পাতা ভেঙেছে। তারপর ছোট একটা হোঁচট। নেশা করা এলোমেলো পা এমনিতেই গোলমাল করছিল। সামলাতে সমস্যা হচ্ছিল। হোঁচটের পর আর একেবারেই সামলানো গেল না। নিজের দুবলা, পাতলা শরীরটা নিয়ে হরিপদ ঝুঁকে পড়ল সামনে। হাত বাড়িয়ে মাটি ধরতে গেল। মাটি পেল না। ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে থাকা লতা পাতা ছিঁড়ে পা হড়কে পড়ল যেন শূন্যে!

তারপর পড়তেই লাগল। ফটফটে চাঁদের আলোর পৃথিবী ছেড়ে গভীর, স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে পড়তে লাগল হরিপদ। তার দু'কানের পাশ দিয়ে বদ্ধ, সোঁদা বাতাস হু হু করে উঠছে ওপরে। যেন ছুটছে, পালাচ্ছে। বহুদিন বন্দি থাকার পর আজ যেন মুক্তি পেয়েছে!

প্রথম ধাক্কায় ঘাবড়ে গিয়েছিল হরিপদ। সত্যি পড়ছে তো? নাকি নেশার ঘোরে এমনটা মনে হচ্ছে? হতে পারে। নেশায় এমন হয়। কখনও মনে হয়, উঠে যাচ্ছি। মাটি, বাড়িঘর, মানুষ ছাড়িয়ে উঠে যাচ্ছি। সেই ওঠা থামতে চায় না। উঠতেই থাকে। আবার উলটোটাও ঘটে। কখনও কখনও মনে হয় পড়ছি। খাদে পড়ে যাওয়ার মতো। ওঠার মতো সেই পড়াও থামতে চায় না। একটা খাদের পর আর একটা খাদ আসে। তারপর আবার আর একটা।

যদিও গাছতলার আড্ডায় হরিপদ আজ বেশি খায়নি। সময় বেশি নিয়েছে ঠিকই, কিন্তু খেয়েছে অল্প। তবু ফট করে নেশাটা ধরে গেল। জিনিসটা ভাল ছিল। অনেক সময় এরকম হয়। জিনিস ভাল থাকে। কমেই কেল্লা ফতে করে। আজও তাই হয়েছে। নেশা চড়তেই মনে হয়েছে, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। অথচ বাড়ি ফেরার তাড়া হরিপদর কোনওদিনই নেই। বিয়ের পর দু'-চারদিন হয়েছিল। ব্যস, সেখানেই ইতি। নেশার কারণেই আজ মনে হল। ঠিক করল, সোজা পথে না ফিরে বনবাদাড়ের রাস্তাটা ধরবে। পথটা শর্টকাট হয়। বাড়ি

পৌঁছোতে মিনিট কুড়ি কম লাগে। কুড়ি মিনিটের জন্য হরিপদর মন অকারণে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

চাঁদু বারণ করেছিল। বলেছিল, 'রাত বিরেতে ওই জংলা পথটা দিয়ে না-ই বা গেলে হরিদা। তার ওপর মাল খেয়ে আছ। পা হড়কে পড়ে থাকলে কেউ খবর পাবে না। সারা রাতটা ঝোপের মধ্যে শুয়ে থাকতে হবে। কেউ খোঁজ পাবে না। রাতে ওই পথে কেউ যায় না কিন্তু।'

হরিপদ চোখ সরু করে বলল, 'কেন? যায় না কেন? কী আছে ওখানে?'

'কী আবার থাকবে? তুমি জানো না যেন। কিছু নেই। তবু ঝোপ-ঝাড় তো আছে। সাপ খোপ যদি থাকে?'

হরিপদ হেসে বলে, 'দুর, এই শীতের মুখে সাপ-খোপ কোথায়? আর থাকলেও ক্ষতি নেই। মাতালকে সাপে কাটলে কিছু হয় না। রক্তে বিষ কাজ করে না। তা ছাড়া জিনিসটা ভাল ছিল।'

চাঁদু বিরক্ত হয়। বলে, 'হ্যা হ্যা করে হেসো না তো। মাতাল চাতাল লোক নিয়ে এই হল গিয়ে মুশকিল। নিজের ভাল বোঝে না।'

'আহা, রাগ করিস কেন? দে দেখি দুটো বিড়ি দে। দুটো বিড়ি টানতেই পথ ফিনিশ হবে। তা ছাড়া আজ হল গিয়ে তোর জোছনা রাত। দেখিস না আলো কেমন ফটফটায়? চাঁদের আলোয় সাপ বেরোয় না। দে দে বিড়ি দে।'

'আমি তোমার সঙ্গে যাব না। সাপ না থাকুক, শিয়াল থাকতে পারে। জোছনা রাতে শিয়াল তাড়াতাড়ি বের হয়।'

হরিপদ আবার দাঁত বের করে হাসে। বলে, 'বেরোলে ক্ষতি কী? দু'জনে গপ্প করতে করতে চলে যাব। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সগ্গ পর্যন্ত কুকুর গিয়েছিল, আমার সঙ্গে বাড়ি পর্যন্ত না হয় শিয়াল যাবে। হা হা।'

চাঁদু মুখ ঘুরিয়ে বলে, 'যা খুশি করো গে যাও।'

'আহা বুঝিসই তো তোর বউদি আবার দেরি হলে চিন্তা করে। বেচারি ছেলেমেয়ে নিয়ে একা থাকে। রাতবিরেতে বাড়িতে একা মেয়েমানুষ বলে কথা। গ্রামের ভেতর ভয়ের কিছু নেই। তবু বয়সটা তো বেশি নয়। আহা, বুঝিসই তো। নিজের স্ত্রী বলে বলছি না দুটো সন্তানের মা হলে কী হবে, পুষ্পর শরীরে এখনও চটক আছে। আছে না? তা ছাড়া কে জানে হয়তো না খেয়েই বসে থাকবে। মেয়েটা যা বোকা।'

চাঁদু এবার হেসে ফেলে। হাসবারই কথা। চকডিহি গ্রামের সকলেই হরিপদর এ কথা শুনে হাসবে। হরিপদকে নিয়ে চিন্তা করার মতো সময় পুষ্পর নেই। যাদের স্বামী রোজগারহীন এবং অপদার্থ সেইসব স্ত্রীদের সংসার ছাড়া অন্য কিছু নিয়ে চিন্তা করার সময় থাকে না। পুষ্পর স্বামীর আরও একটা গুণ আছে। বেকারের সঙ্গে সে বোকাও। এর ওপর সংসার যদি অভাবের হয় তা হলে তো কথাই নেই, একেবারে সোনায় সোহাগা। হরিপদর সংসার শুধু অভাবের নয়, বেশিমাত্রায় অভাবের। কোনও কোনও দিন অবস্থা খুবই মারাত্মক চেহারা নেয়। এমনি সকালে রান্নাবান্নার উপায় থাকে না। বেলা বাড়লে চেয়ে চিন্তে, ধার দেনায় জোগাড় করতে হয়।

পুষ্প তার দুই ছেলে মেয়েকে তখন মিথ্যে বোঝায়। বলে, 'আজ রান্নার দেরি হবে। উনুন গোলমাল করছে। এইবেলাটা তোমার মুড়ি আর জল খেয়ে স্কুলে দৌড় দাও দেখি। বিকেলে ফিরে এসে ভাল জিনিস খাবে।'

ছয় বছরের বিনু পেটুক প্রকৃতির মেয়ে। ভাল জিনিস শুনে তার লোভ হয়। সে মায়ের কাছে মাথার ফিতে বাঁধতে বাঁধতে চোখ বড় করে বলে, 'কী খাব?'

পুষ্প দাঁতে বিবর্ণ নীল ফিতের একাংশ চেপে ধরে দ্রুত হাতে মেয়ের চুলে চিরুনি বোলায়। ভান করে কথাটা শুনতে পায়নি। তখন বিনুর এক বছরের বড় দাদা শঙ্কু প্রশ্নটা করে।

'কী হল বললে না? ফিরে এসে কী ভাল জিনিস খাব মা?'

সাধারণত এইসময় পুষ্প মেয়েকে কষিয়ে একটা চড় লাগায়। এর জন্য বড় কোনও কারণ দরকার হয় না। চুলের ফিতে নোংরা, ফ্রকের বোতাম ছেঁড়া ধরনের ছোটখাটো অপরাধই যথেষ্ট। এতে লাভ হয়। ছেলেমেয়ে দু'জনেই চুপ করে যায়। সুবিধের বিষয় হল, শঙ্কু, বিনু তাদের মাকে ভয় পায়। অভাবের বাড়িতে ছেলেমেয়েরা মাকে ভয় না পেলে সমস্যা।

তবে আবার কোনও কোনও দিন অন্যরকমও হয়ে যায়। পুষ্প বানিয়ে বানিয়েও বলে।

'সে হবেখন। ভাত রেঁধে অল্প ঘি দিয়ে নেড়ে রাখব। দুটো তেজপাতা দেব। এসে পোলাও খাবি।'

শঙ্কু উৎসাহ নিয়ে বলে, 'ক'টা কিসমিস ফেলে দিয়ো মা।'

'অনেক হয়েছে। আর পাকামো করতে হবে না। এখন যাও তো। স্কুলে দেরি হয়ে যাবে।'

শঙ্কু এবং বিনু সত্যি সত্যি দু'ঘটি জল খেয়ে স্কুলে দৌড়োয়। অবশ্য জলের ব্যাপারে শঙ্কু মাঝেমধ্যে আপত্তি করে। বলে, 'মা, অত জল খাব না। খালি পেচ্ছাপ পায়।'

বিনু কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'মা, আজ টিপিনেও কি মুড়ি?'

এবার আর পুষ্প নিজেকে সামলাতে পারে না। তার মাথায় আগুন ধরে যায়। ছুটে গিয়ে মেয়ের যত্ন করে বাঁধা চুলের মুঠি চেপে ধরে ঝাঁকানি দেয়। হিসহিসে গলায় বলে, 'খাওয়া নিয়ে আর একটা কথা বলবি তো মুখ ভেঙে দেব। উফ, একটা রাক্ষসের গুষ্টিকে আমি পেটে ধরেছি। শুধু খাই আর খাই। এরা একদিন আমাকেও চিবিয়ে খাবে।'

কয়েক বছর আগেও এইসময় পুষ্প তার গালাগালিতে হরিপদকে টেনে আনত। এখন আর আনে না। এনে কোনও লাভ হবে না। এইরকম ঝামেলার দিনগুলোতে হরিপদ সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। ফেরে সেই গভীর রাতে। বেরোনোর আগে এক টুকরো সাবান আর দু'বালতি জল দিয়ে গা ঘষে ঘষে ভাল করে স্নান সারে। দাঁত ভাঙা চিরুনি দিয়ে পাট পাট করে চুল আঁচড়ায়। বগল তুলে খালি পাউডারের কৌটোটা ক'বার নাড়ায়। তারপর জীর্ণ চটি দুটোকে ন্যাকড়া দিয়ে ভাল করে মুছে গম্ভীর মুখে বেরিয়ে পড়ে। আগে বেরোনোর সময় হরিপদ ছাতাটা নিত। এখন নেয় না। ছাতার অবস্থা খুবই শোচনীয়। শিকে খোঁচা লাগে। তাই খালি হাতেই গাছতলার দিকে রওনা দেয়। মুখ দেখে মনে হয়, জরুরি কোনও কাজে সদরে চলেছে।

এই লোকের জন্য পুষ্প রাত জেগে, থালা সাজিয়ে অপেক্ষা করবে কেন? সেই কারণেই চাঁদু হাসে।

হরিপদ চাঁদুর দিকে তাকিয়ে বলে, 'হাসছিস যে বড়?'

চাঁদু দাঁত বের করে বলে, 'না, হাসিনি। তুমি যাও হরিদা। এই নাও বিড়ি নাও। দুটো নেই, একটা নাও। সাবধানে যেয়ো। সাপ, শিয়ালের কথা মাথায় রেখো। পরে বলতে পারবে না আমি বলিনি। পথের জন্য আর একটু খেয়ে যাবে নাকি?'

আর একটু খাবার প্রস্তাবে হরিপদ খুশি হল। সে খুশি চেপে বলল, 'না থাক। আর খাব না। তোদের বউদিটা আবার গন্ধ পেলেই বকাঝকা করে। বুঝলি চাঁদু, ভাবছি দুম করে একদিন ছেড়ে দেব।'

চাঁদু না বোঝার ভান করে বলে, 'কী ছেড়ে দেবে?'

'কী আবার? নেশা। নেশা ছেড়ে দেব। সে একটা কাণ্ড হবে। বাড়ি ফিরে গিয়ে পুষ্পকে ঘুম থেকে তুলব। পুষ্প রেগে গিয়ে বলবে, কেন আমার কাঁচা ঘুম ভাঙালে? আমি বলব, একটা মজার ব্যাপার হয়েছে তাই ভাঙালাম। ও বলবে, মাঝরাতে মজা না দেখালেই হত না? আমি বলব, না হত না, এটা হল মাঝরাতের মজা। বলে ওর মুখের কাছে মুখ হাঁ করে বলব, গন্ধ পাচ্ছ? পাচ্ছ গন্ধ? পাচ্ছ না তো? জানতাম পাবে না। নো স্মেল। হা হা। কেমন হবে বল দেখি চাঁদু? তোদের বউদি একেবারে চমকে যাবে না?'

চাঁদু মুখ ফিরিয়ে হাসি লুকোল। বলল, 'হ্যাঁ, চমকে যাবে।'

'ভেরি গুড। তা হলে শেষ একটা দিয়ে দে চাঁদু। চট করে মেরে হাঁটা দিই। জল কম দিস। কড়া করে খাই। তুই আবার সাপ শিয়ালের কথা বলে ভয় পাইয়ে দিলি।'

চাঁদু সাপ, শিয়াল বলেছিল, কিন্তু কুয়োটার কথা বলেছিল কি? এরকমই হয়। নকল বিপদের কথা বলতে বলতে মানুষ আসল বিপদের কথা ভুলে যায়। চাঁদুও কি ভুলে গিয়েছিল? কবে যেন শুনেছিল পুবের জংলা পথে একটা মরা কুয়ো আছে। এই কি সেই কুয়ো? এতদিন মরে থাকার পর তাকে পেয়ে প্রাণ ফিরে পেল? মাথার ভেতর সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে হরিপদর। মনে হচ্ছে অজ্ঞান হয়ে যাবে। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। কুয়োর ভেতরে বাতাস কি কম থাকে? সেই কম বাতাসই ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। যে-কোনও সময় সরে যাবে। যেন মারার আগে পেঁচা তার বেঁকানো কুশ্রী ঠোঁট দিয়ে ইঁদুর নিয়ে খেলছে। নিজেকে ইঁদুরের মতো মনে হচ্ছে কেন? নেশার জন্য? নাকি মরবার মুহূর্তে এরকমই হয়। নিজেকে ইতর প্রাণীর মতো লাগে? নীচ থেকে উঠে আসা বাতাসের সঙ্গে একটা তীব্র, সুচালো গন্ধ ভেসে এল। গা গুলিয়ে উঠল হরিপদর। গর্তের দু'পাশেই ধাক্কা খাচ্ছে সে। প্রথমে পাশটা ছিল কঠিন। ইট পাথরের। এখন নরম, মাটির মতো লাগছে। আর কতটা পড়তে হবে? এক-একটা মুহূর্ত মনে হচ্ছে অনন্ত, অসীম। দু'দিকে হাত বাড়িয়ে দিল হরিপদ। হাতড়াল। যদি কিছু আঁকড়ে ধরার মতো পাওয়া যায়। শক্ত কিছু। গাছের শিকড়, দেয়ালের খাঁজ যা খুশি। যদি ধরে ঝুলে পড়া যায়। বাঁচার শেষ চেষ্টা করল হরিপদ। পারল না। তার হাতের মুঠোয় ভেজা ঘাস আর আগাছা ছিঁড়ে ছিঁড়ে এল। নখের আঁচড়ে উঠে আসতে লাগল গুঁড়ো মাটি, শ্যাওলা। সে পড়তেই লাগল। শেষে কী আছে? জল? তাই

হবে। কুয়োর শেষে তো জলই থাকে। কী হবে? সে কি সাঁতার জানে? মনে পড়ছে না। কিছুতেই মনে পড়ছে না। অথচ এখনই মনে পড়া দরকার। খুব দরকার। হরিপদ চোখ বুজে প্রাণপনে মনে করবার চেষ্টা করছে।

পুষ্প, অ্যাই পুষ্প। মুখটা ফেরাও পুষ্প দোহাই ফেরাও একবার। আচ্ছা ফেরাতে হবে না। শুধু বলো, আমি কি সাঁতার জানি? শঙ্কু, বাছা আমার। সোনা ছেলে। তুই তো জানিস। জানিস না? মায়ের মতো চুপ করে থাকিস না বাপ আমার। বল, বল, আমি সাঁতরাতে পারি? এই তো বিনু, আমার মা। আদরের ধন। আমায় বলে দে লক্ষ্মীটি। তোর বাপটা সাঁতার জানে কি না বলে দে। ঠিক আছে, তোর মাকে বলব না। কাউকে না। কানে কানে চুপিচুপি বলে দে।

হরিপদ এবার বুঝতে পারল সে মরে যাচ্ছে। নিশ্চয় মরে যাচ্ছে। মরে যাওয়ার আগে মানুষ তার প্রিয়জনের সঙ্গে কথা বলে। সেও বলছে। হরিপদ বুক ভরে জোরে শ্বাস নিল।

না, জল নয়। হরিপদ পড়েছে নরম মাটিতে। ভেজা ভেজা হলেও সেই মাটি মূলত শুকনো। নরম মাটির কারণেই অত ওপর থেকে পড়েও হরিপদ ব্যথা পায়নি। তবে আওয়াজ হয়েছে। বেশ জোর আওয়াজ। সেই আওয়াজ মরা কুয়োর দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে, দুমড়ে মুচড়ে, পাক মারতে মারতে উঠতে লাগল ওপরে।

একদিকে কাত হয়ে পড়েছে হরিপদ। সেই অবস্থাতেই চোখ খুলে তাকাল। গর্তটা যেন গোল একটা ঘরের মতো। চারপাশে খুব বেশি হলে হাতখানেক জায়গা। সোজা হয়ে, মাটির দেয়ালে হেলান দিয়ে বসল হরিপদ। জোরে শ্বাস টানল। না, অসুবিধে কিছু নেই। শরীরে কোথাও ব্যথা না থাকলেও পা দুটো একবার টান করে পরীক্ষা করল হরিপদ। সাবধানের কোনও মার নেই। ভাঙার ব্যথা অনেকসময় পরেও শুরু হয়। না, ভাঙেনি। হাতদুটোর অবস্থাও খারাপ কিছু নয়। ডানদিকে কনুইয়ের কাছে একটু জ্বালা জ্বালা আছে। সে তো থাকবেই। ছড়ে টড়ে গেছে বোধহয়। অতখানি পড়লে একটু ছড়বে না? এতক্ষণ পর খানিকটা স্বস্তি বোধ করল হরিপদ। না, তা হলে এবার অন্তত মরা হল না। মাথা তুলে ওপরের দিকে তাকাল সে। সেখানে একটুখানি আকাশ। সেই আকাশ গোল এবং নীল। চাঁদনি রাতের নীল। সেই আকাশ থেকে শিরশিরে তাজা হাওয়া নেমে আসছে একেবারে নীচ পর্যন্ত।

হরিপদ সামান্য হাসল। বিড়বিড় করে আপনমনেই বলল, 'বাঃ, ব্যবস্থা মন্দ নয়।'

২

বদ্রিনাথ কখনও দিনেরবেলা এ বাড়িতে আসেন না। তিনি আসেন সন্ধের পর। একা আসেন। গণেশ বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। দাঁড়িয়ে সিগারেট খায় আর চারপাশে তাকায়। দেখে কেউ আসছে কি না। পাহারা দেয়।

বদ্রিনাথ আজ এসেছেন দিনেরবেলা। বেলা দশটার কিছু আগে পরে। আজও গণেশকে

সঙ্গে এনেছেন। তবে আজ সে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে নেই। বাড়িতে ঢুকেছে। দাঁড়িয়ে আছে উঠোনে। বদ্রিনাথের জন্য বারান্দায় বাড়ির একমাত্র চেয়ারটা এনে দিয়েছে পুষ্প। সাধারণত চেয়ারের একটা বা দুটো পায়ে গোলমাল হয়। এই চেয়ারের চারটে পায়েই গোলমাল। সামান্য নড়াচড়াতেই ঢক ঢক করে। সব সময়ই মনে হয়, উলটে যাবে। বদ্রিনাথ সেটা জানেন। তাই তিনি বসে আছেন সতর্ক হয়ে। চেয়ারের হাতল ধরে।

সন্ধের সময় যখন বদ্রিনাথ আসেন তখন তিনি কখনও বারান্দায় বসেন না। ঘরে ঢুকে যান। পুষ্পর খাটেই বসেন। তাঁর জন্য আলাদা চাদরের ব্যবস্থা আছে। বিছানার চাদর। বদ্রিনাথ নিজেই কলকাতা থেকে পছন্দ করে কিনে আনেন। পুষ্প বাক্স খুলে সেই চাদর বের করে। খাটে যত্ন করে পাতে। বদ্রিনাথের এই একটা নেশা। বেশিদিন এক চাদর পছন্দ হয় না। নিয়মিত বদলান।

এবারের চাদরটা এসেছে কাল সন্ধেতে। রং সুন্দর। ফিরোজা। চারপাশে নকশা। সেই নকশার সবটাই সাদা। ডাল, পাতা, ফুল সব সাদা। হঠাৎ দেখলে সাদা বাগানের মতো লাগে। পুষ্প তার খাটে সেই চাদর পাতার পর হ্যারিকেনের আলোতে সাদা বাগান ঝলমল করে উঠল।

দরজা ভেজিয়ে পুষ্প বলে, 'বাঃ সুন্দর তো।'

বদ্রিনাথ তরল গলায় বলেন, 'তোমার পছন্দ হয়েছে?'

পুষ্প হেসে বলে, 'খুব পছন্দ হয়েছে। আসেন, খাটে আসেন। খাটে আরাম করে বসেন।'

এই সময়টায় বদ্রিনাথ একটা লজ্জার ভান করেন। প্রতিবারই করেন। কালও করেছেন। বললেন, 'আবার খাটে কেন? এই তো চেয়ারেই বেশ আছি।'

পুষ্প চোখ তুলে হাসে। বলে, 'বাঃ নতুন চাদর এনেছেন, বসে দেখবেন না?'

বদ্রিনাথ উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'ছেলেমেয়েরা কোথায়?'

পুষ্প মুখ নামিয়ে বলে, 'ওরা পাশের ঘরে লেখাপড়া করে। বাইরে থেকে ছিটকিনি দেওয়া আছে।'

বদ্রিনাথ খাটের ওপর উঠে পা গুটিয়ে বসেন। নতুন চাদরে হাত বোলাতে বোলাতে বলেন, 'গুড। ভেরি গুড। লেখাপড়া একটা দামি জিনিস। খুবই দামি জিনিস। সবকিছু থামিয়ো কিন্তু ছেলেমেয়ের লেখাপড়া কখনও থামিয়ো না। ওই ঘরে আলো আছে তো পুষ্প?'

'কোন ঘরে?' হাত বাড়িয়ে খাটের পাশে রাখা হ্যারিকেন কমাতে কমাতে বলে পুষ্প।

'ওই তো যে ঘরে তোমার ছেলেমেয়েরা পড়ছে সেই ঘরে। লেখাড়ার জন্য সাফিশিয়েন্ট লাইট দরকার। অন্ধকারে সব হয়, লেখাপড়া হয় না।'

'না, আলো নেই। মোম দিয়েছি।'

'এটাই তো অন্যায় করো। আমি টাকা রেখে যাচ্ছি। কালই একটা বড় দেখে হ্যারিকেন নিয়ে নেবে। আচ্ছা, ঠিক আছে তোমাকে কিছু করতে হবে না। গণেশ এসে দিয়ে যাবে। হ্যাজাক দেবে?'

'না, হ্যারিকেনেই হবে। হ্যাজাক দেখলে সবাই সন্দেহ করবে। আপনে হ্যারিকেনই পাঠাবেন। তেল ভরে পাঠাবেন।'

চিবুক দিয়ে শাড়ির আঁচল চেপে ধরে দ্রুত ব্লাউজের বোতাম খুলতে থাকে পুষ্প। তার হাতে সময় কম। এখনও রান্না বাকি। ছেলেমেয়েরা খাবে। তারা ঘুমিয়ে পড়ছে।

'মনে হয় না ওদের পড়াশোনা আর টানতে পারব। খেতে দিতেই পারি না, পড়াব কী করে?'

বদ্রিনাথ পুষ্পর দিকে স্থিরভাবে তাকিয়ে আছেন। চোখের পলক পড়ছে না। তিনি জানেন, জামা খোলা হয়ে গেলেই মেয়েটার ধারালো চিবুক থেকে আঁচল খসে পড়বে। প্রতিদিন এরকমটাই হয়। সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করেন বদ্রিনাথ। অপেক্ষা শেষ হলে তিনি পুষ্পকে ছোঁ মেরে টেনে নেন। কাল আগেই টেনে নিয়েছিলেন। তারপর ঘাড়ে, গলায়, বুকে মুখ ঘসে বিড়বিড় করে একটানা বলতে থাকেন, 'চিন্তা কী? কোনও চিন্তা নেই পুষ্প। আমি তো আছি। ভাল কাজে আমি সবসময় আছি। আছি না? বলো তুমি আছি কি না? উঁ উঁ বলো, বলো, আগে বলো। উঁ উঁ।'

বদ্রিনাথের ভারে পুষ্পর দম চাপা লাগে। তবু সে মিথ্যে করে হাসে। বলে, 'আপনে আছেন বলেই তো বেঁচে আছি। নইলে ছেলেমেয়ে নিয়ে কবে বিষ খেতে হত। বিষের পয়সাও আপনের কাছে চাইতাম। আপনি ভাল করেন না তো কে করেন? আসেন, আর একটু এদিকে সরে আসেন।'

পুষ্প দ্রুত আধবুড়ো মানুষটার ঘনিষ্ঠ হওয়ার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে তাকে উত্তেজিত করার। আসলে সে তাড়াতাড়ি মুক্তি চায়।

তবে ভাল কাজের কথাটা মিথ্যে নয়। একটা রাইস মিল আর দুটো লং ডিসটেন্স বাসের মালিক বদ্রিনাথ সত্যি গ্রামের পাঁচটা ভাল কাজে থাকেন। বিনিপয়সায় বই বিলি থেকে শুরু করে বন্যার খিচুড়ি পর্যন্ত সবেতেই তাঁকে পাওয়া যায়। সঙ্গে পুজো, বিয়ে, ফুটবল খেলার চাঁদা তো আছেই। পার্টি পলিটিক্সের মানুষগুলোও লোকটার হাতের মুঠোয়। থানা থেকে বড়বাবু সপ্তাহে একবার জিপ চালিয়ে এসে দেখা করে যেত। সামনের পঞ্চায়েত ভোটে দাঁড়ানোর খবর ছড়িয়ে যাওয়ার পর দু'বার করে আসে।

পুষ্প বদ্রিনাথকে চা দিয়েছে। হাতল ভাঙা কাপ একবার মুখে ঠেকিয়েই সরিয়ে রাখলেন বদ্রিনাথ। পুষ্পর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি খবরটা কখন পেলে?'

পুষ্প বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার ওপর বড় করে আঁচল টানা। এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সে বলে, 'আজ ভোরে। চাঁদু এসেছিল।'

বদ্রিনাথের মুখে একটা বিরক্তির ছাপ পড়ল। বললেন, 'কী বলল সে?'

'প্রথমবার কিছু বলেনি।'

বদ্রিনাথ ভুরু কুঁচকোলেন। বললেন, 'প্রথমবার মানে? চাঁদু দু'বার এসেছিল নাকি?'

পুষ্প মাথা নাড়ে।

'প্রথমবার এসে জিজ্ঞেস করল বিনুর বাবায় কাল রাতে বাড়ি ফিরেছে কি না। আমি বললুম, ফেরেনি। কিছু না বলে চলে গেল। ঘণ্টাখানেক বাদে আবার এল। তখনই বলল।'

'কী বলল?'

পুষ্প গায়ের কাপড় ঠিক করল। ইস শাড়িটা বড্ড ছেঁড়াখোড়া। বদলে আসা উচিত ছিল।

সন্ধেবেলা বদ্রিনাথ আসার আগে সে গা ধোয়, শাড়ি বদলায়। কোনও কোনও দিন কপালে একটা টিপও লাগায়।

'বলল মানুষটা নাকি গর্তে পড়ে গেছে। সারারাত ধরেই নাকি পড়ে আছে।'

বদ্রিনাথ চাপা গলায় বললেন, 'গর্তে! চাঁদু তোমাকে শুধু গর্তের কথা বলল?'

পুষ্প মুখ তুলল। বদ্রিনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'গর্তই তো। গর্ত না?'

বদ্রিনাথ চুপ করে রইলেন। চারপাশে একবার মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন। দু'বার গলা খাঁকারি দিলেন। তারপর বললেন, 'না গর্ত না। মাথা ঠান্ডা করে শোনো পুষ্প। তোমার স্বামী কাল রাতে মদ খেয়ে বাড়ি ফিরছিল। ফেরার সময় সে পুবদিকের জংলা বনবাদাড়ের রাস্তাটা ধরে। সময় কম লাগে ঠিকই, কিন্তু পথটা ভাল না। তুমি তো জানোই রাতে ওদিকটায় কেউ চট করে যেতে চায় না। আমি যতদূর খবর পেয়েছি, কাল অনেকেই হরিপদকে বারণ করেছিল। এমনকী ওই হারামজাদা চাঁদু পর্যন্ত। তোমার স্বামী শোনেনি। সে অন্ধকারেই হাঁটা দেয়। বলে, তার নাকি বাড়ি ফেরার তাড়া আছে। ডাহা মিছে কথা। আসলে সবই নেশার লক্ষণ। সোজা কথায় মাতলামি। যাই হোক, গ্রামের প্রায় সকলেই ভুলে গেছি যে ওই বনবাদাড়ের মাঝখানে একটা পুরনো কুয়ো আছে। অনেকদিন আগের জিনিস। চারদিকের দেয়াল ভাঙতে ভাঙতে মাটির সঙ্গে জিনিসটা সমান হয়ে গেছে।'

'কুয়ো!' পুষ্প অস্ফুটে বলে।

বদ্রিনাথ মুখ তুলে বললেন, 'হ্যাঁ, কুয়ো। তবে ভয়ের কিছু নেই। কুয়ো শুকনো। হরিপদ কাল রাতে পথ ছেড়ে, নেশার ঘোরে গাছপালার মধ্যে দিয়ে হাঁটতে যায় এবং ঝোপজঙ্গল ভেঙে সেই কুয়োর মধ্যে পড়ে। আজ খুব ভোরে কোন একটা ছোকরা ছাগল না গোরু চরাতে গিয়ে প্রথম দেখে। হরিপদকে নয়, দেখে খানিকটা জায়গা জুড়ে ডালপালা ভাঙা। কাছে গিয়ে কুয়োর মুখটা আবিষ্কার করে এবং তখনই...।'

এত পর্যন্ত বলে বদ্রিনাথ থামলেন। আড়চোখে পুষ্পর দিকে তাকালেন। তিনি যেন তার কাছ থেকে প্রশ্ন আশা করছেন। পুষ্প কোনও প্রশ্ন করে না। বদ্রিনাথ পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন। তারপর আবার শুরু করলেন।

'তখনই গুনগুন করে গান শুনতে পায়।'

'গান!'

পুষ্প চমকে মুখ তোলে।

বদ্রিনাথ শুকনো হাসেন। বলেন, 'গান মানে কি আর সেই গান? এমনি একটা সুরের মতো। অত নীচ থেকে আসছিল বলে ইকো হচ্ছিল। ইকো বোঝো? প্রতিধ্বনি। আসলে হরিপদর মদের খোঁয়ারি কাটেনি আর কী। কুয়োর গর্তে বসেও মাতলামি চলছে। যাই হোক, মাটির তলা থেকে গান আসছে শুনে সেই ছাগল চরানো ছোকরা খুবই ভয় পায়। সে ছুটতে ছুটতে গ্রামে ফিরে আসে। কয়েকজনকে বলে। ভাগ্য ভাল তার মধ্যে গণেশ ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে খবর দেয়। আমি লোক পাঠাই। জানা যায় খবর ঠিক।'

আবার থামলেন বদ্রিনাথ। মনে হচ্ছে, ঘটনা বলতে বলতে তিনি ভেতরে একটা চাপা উত্তেজনা অনুভব করছেন।

'চিন্তা নেই পুষ্প। তোমার স্বামী ঠিক আছে। তারপর গণেশকে আমি পাঠিয়েছিলাম। সে নিজে দেখে এসেছে। কী রে গণেশ বল।'

পুষ্প গণেশের দিকে তাকাল। গণেশ হাত কচলে বলল, 'আমার সঙ্গে কথাও হয়েছে।'

পুষ্প বিড়বিড় করে বলল, 'কথা হয়েছে!'

গণেশ দু'পা এগিয়ে এসে বলল, 'হ্যাঁ, কথা হয়েছে। গর্ত থেকে কথা তো, জড়িয়ে মড়িয়ে যাচ্ছিল। নিজের নাম বলল। বলল, কোনও সমস্যা নেই। খাবার চাইল।'

পুষ্প সামান্য নড়ে আবার খুঁটিতে হেলান দিয়ে স্থির হল। বদ্রিনাথ হাত তুলে গণেশকে থামালেন। তারপর ঝুঁকে পড়ে গলা নামিয়ে বললেন, 'মন দিয়ে শোনো পুষ্প। তোমায় কিছু ভাবতে হবে না। আমি তোমার স্বামীকে গর্ত থেকে তুলে আনব। আমার সব ছকা হয়ে গেছে। তবে এমনি এমনি তুলব না। তুলব ঘটা করে।'

'ঘটা করে!'

বদ্রিনাথ ঠোঁটের কোণে সামান্য হাসলেন।

'হ্যাঁ। ঘটা করে। খবরটা পাওয়ার পরই আমার মাথায় পরিকল্পনাটা খোলে। কিছুদিন আগে কোথায় যেন একটা বাচ্চা গর্তে পড়ে গিয়েছিল। গিয়েছিল না? বেশিদিন আগে নয়, এই তো সেদিন। জায়গাটার নাম এখন মনে পড়ছে না। তবে স্পষ্ট মনে আছে, টিভি, কাগজে ছবি, খবর, বিরাট হইচই হল। মিলিটারি, নেতা, মিনিস্টার, সাংবাদিক, সবাই সেখানে গিয়ে হাজির। তারপর ঢাকঢোল পিটিয়ে সেই ছেলেকে গর্ত থেকে বের করা হল। মনে পড়ছে তোমার? আমিও হরিপদকে নিয়ে তাই করব। বুঝতে পারছ?'

পুষ্প বুঝতে পারছে না। এসব সে কিছুই জানে না। টিভি, কাগজ থেকে সে অনেক অনেক দূরের মানুষ। শুধু সে লক্ষ করল, বদ্রিনাথ নামের মানুষটার চোখদুটো যেন কেমন হয়ে গেছে। স্থির, কিন্তু চকচকে। রাতেও এই লোকের চোখ চকচক করে। তবে সেটা অন্যরকম।

পুষ্প খানিকটা আপনমনেই বলল, 'কী করবেন?'

বদ্রিনাথ এবার উঠে দাঁড়ালেন, ফিসফিস করে বললেন, 'অতটা পারব না। তবে কিছুটা পারব। আশপাশের চার-পাঁচটা গ্রাম বদ্রিনাথের কেরামতি জানতে পারবে। ইলেকশনের আর বেশি দেরি নেই। এটা যদি করতে পারি আমার খুব সুবিধে হবে। খুবই সুবিধে হবে। পুষ্প, তোমার আপত্তি নেই তো? যতই হোক তুমি স্ত্রী। স্ত্রীর মত ছাড়া... বুঝতে পারছ তুমি?'

পুষ্প কিছু বুঝতে পারছে না। বুঝতে চাইছেও না। এই মুহূর্তে তার একটাই চিন্তা। গর্তের ভেতর মানুষটা কেমন আছে? ভাল আছে তো?

৩

ঝোপঝাড় কেটে জায়গাটা পরিষ্কার করার সময় একটা সাপ বের হল। নির্বিষ হেলে ধরনের সাপ। তাও কোনও ঝুঁকি নেওয়া হয়নি। ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কার্বলিক অ্যাসিড ছড়ানো হয়েছে ভাল করে।

অন্য সব কাজ ভাগ করে দিলেও ভি আই পি আনার ব্যাপারটা বদ্রিনাথ নিজের হাতেই রেখেছেন। পঞ্চায়েতের সাতজন বড় চাঁই আসছে। বিডিও সাহেব ইতিমধ্যে লোক পাঠিয়েছেন। নিজে আসবেন আসল সময়। থানায় ওসি খানিকক্ষণ আগে এসে ঘটনাস্থল দেখে দু'জন পুলিশ পোস্টিং করে গেছেন। তাদের একজনের হাতে বন্দুক। বদ্রিনাথ এই অঞ্চলের তিন পার্টির নেতাকেই নেমন্তন্ন করে এসেছেন। তারা কখনওই একসঙ্গে কোনও অনুষ্ঠানে থাকে না। তবে এখানে তারা সকলেই আসছে। আশপাশের কয়েকটা স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। যদি কিছু ছাত্রছাত্রী পাঠানো যায়। শুভ কাজে ছাত্রছাত্রীরা থাকে। কোনও স্কুলই কথা দিতে পারেনি। এত অল্প সময়ের মধ্যে ছেলেমেয়ে পাঠানো কঠিন। তবে কাদম্বরীদেবী গার্লস স্কুল একটা বড় দায়িত্ব নিয়েছে। এইটুকু সময়ের মধ্যেই একটা বড় কাজ করা গেছে। সদরে লোক পাঠিয়ে স্থানীয় এক কাগজের রিপোর্টার এবং ফটোগ্রাফারকে ধরে আনা হয়েছে। তারা এখন আছে খগেনের বাড়িতে। ভাত মাংস খেয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। রিপোর্টার ছোকরার নাকি রোদে অ্যালার্জি। সে বলে দিয়েছে, রোদ না পড়লে বেরোবে না। কেব্‌ল চ্যানেলের লোকও আনার চেষ্টা চলছে। আজকাল টিভিতে না দেখালে প্রচার হয় না। কেব্‌লের লোকগুলো খাওয়া-দাওয়া ছাড়াও আলাদা করে টাকা চাইছে। বলছে, গাড়ি করে নিয়ে গেলেও যাতায়াতের ভাড়া দিতে হবে। দরদাম চলছে। আশা করা যায়, বিকেলের আগেই একটা জায়গায় পৌঁছোনো যাবে।

সবথেকে বড় কাজটা বদ্রিনাথ করেছেন অতি গোপনে। কেউ জানে না। তিনি একজন মন্ত্রী ম্যানেজ করে ফেলেছেন। সম্পূর্ণ মন্ত্রী নয়, উপমন্ত্রী। তাতে কিছু এসে যায় না। গতকাল সদরে কী যেন সরকারি কাজে এসেছেন। রাতে ফিরে যাবেন। পার্টির সঙ্গে কথা বলে এক ঘণ্টার জন্য ব্যবস্থা হয়েছে। মন্ত্রীমশাই প্রথমে রাজি হচ্ছিলেন না। বিষয় শুনে রাজি হয়েছেন। তাঁর জন্য নতুন ধুতি পাঞ্জাবি এবং গরদের শালের ব্যবস্থা করেছেন বদ্রিনাথ। এটাই বদ্রিনাথের তুরুপের তাস। গর্ত থেকে হরিপদকে তোলার পর মন্ত্রী তাকে মালা পরাবেন।

ঘটনা এখানেই শেষ নয়। ঠিক হয়েছে গর্ত থেকে হরিপদকে তুলে আনার পর ছোট একটা অনুষ্ঠান হবে। গর্ত থেকে বেঁচে ফেরার সংবর্ধনা। এর জন্য ঝাপসা বটগাছের তলায় রং-চটা শামিয়ানা টাঙানো এবং চেয়ার পাতার কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। প্রথম সারিতে মাত্র তিনটে চেয়ার থাকছে। মাঝখানে হরিপদকে রেখে দু'পাশে বসবেন বদ্রিনাথ আর মন্ত্রীমশাই। মেয়েদের গানের পর, দু'জনের অল্প একটু করে ভাষণ। শেষে বলবে হরিপদ! বেশি নয়, দু'-একটা কথা বলবে। গর্তে থাকার ভয়ংকর অভিজ্ঞতার কথা শোনাবে।

এদিকে খোদ হরিপদর দায়িত্বে আছে গণেশ। আর কাউকে ভরসা করতে পারেননি বদ্রিনাথ। গর্তের ভেতর থেকে লোকটাকে তুলে না আনা পর্যন্ত ঠিকঠাক রাখতে হবে। রাখাও হচ্ছে। ভাঙা কুয়োর মুখের চারপাশটা শুধু সাফ করা হয়নি, রঙিন কাগজের টুকরো দিয়ে সরস্বতী পুজোর কায়দায় চেন বানিয়ে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। আড়াআড়িভাবে বাঁধা হয়েছে বাঁশ। বাঁশে সাদা রঙের চুনকাম। তাতে কপিকল লাগানো। কপিকলে বালতি ঝুলছে। সেই বালতি চেপে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাবার যাচ্ছে নীচে। সকালে ব্রেকফাস্ট গেছে।

টোস্ট, মাখন আর সিদ্ধ ডিম। একটু আগে গেল টিফিন। চারটে গরম লুচি আর শুকনো আলুর দম। খাবারের তালিকা মাইকে ঘোষণা করা হচ্ছে। গাছের ডালে বাঁধা মাইকে তেমন জোর নেই। সম্ভবত ব্যাটারি কমে এসেছে। ফ্যাঁসফেঁসে আওয়াজে দেশাত্মবোধক গান বাজছে। মাঝেমধ্যে গান থামিয়ে হচ্ছে ঘোষণা। সেই ঘোষণায় থাকছে, মন্ত্রী নেতাদের নাম। সমাজসেবী বদ্রিনাথের উদ্যোগ। কীভাবে তিনি গর্তে পড়া হরিপদ উদ্ধারে এগিয়ে এসেছেন তার মর্মস্পর্শী বর্ণনা। সেই সঙ্গে মাঝেমধ্যে গর্তে বসে থাকা হরিপদ সম্পর্কে তথ্যও গ্রামবাসীকে জানানো চলছে।

ইতিমধ্যে হরিপদর সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। পদ্ধতি পুরনো দিনের হলেও খারাপ নয়। কাজ চলে যাচ্ছে। লম্বা পাইপ নামিয়ে দেওয়া হয়েছে একেবারে নীচ পর্যন্ত। কথা চলছে তার মধ্যে দিয়ে। হরিপদকে বালতিতে একটা ঘণ্টা পাঠানো হয়েছে। শিবমন্দিরের পুজোর ঘণ্টা। কিছু বলতে চাইলে সে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। কুয়োর দেয়ালে পাক খেতে খেতে সেই ঘণ্টাধ্বনি ওপরে উঠে আসছে অস্পষ্ট অথচ গম্ভীর হয়ে। এর মানে, আমি কিছু বলতে চাই। কেউ এসে পাইপে কান পাতছে।

তবে হরিপদর সঙ্গে কথা বলার বিষয়ে সবাইকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। বদ্রিনাথের কড়া আদেশ গণেশ আর হরিপদর বাড়ির লোক ছাড়া কুয়োর ধারে কাছে কেউ যেতে পারবে না। তাঁর পরিকল্পনা হল, বিকেলে, উদ্ধারকার্যের আগে শুধুমাত্র বিশেষ কিছু অতিথিদের তিনি কুয়োর মুখে নিয়ে যাবেন। ইচ্ছে করলে তাঁরা পাইপ মারফত হরিপদর সঙ্গে দু'-একটা কথা বলতে পারেন। আবার নাও বলতে পারেন। রিপোর্টার ছোকরা অবশ্য বলে রেখেছে সে এই অবস্থায় একটা ইন্টারভিউ চায়। গর্ত থেকে ইন্টারভিউ।

কুয়োর সামান্য দূরে মাটিতে শতরঞ্চি পেতে হরিপদর গোটা পরিবার বসে আছে।

গণেশ যখন দুপুরে ডাকতে এল পুষ্প বলেছিল, 'আমরা পরে যাই। এত আগে কী হবে?'

গণেশ বলে, 'দাদা, আপনাদের এখনই যেতে বলেছে। বলেছে, ওখানে গিয়ে বসতে। কুয়োর পাশে বসার ব্যবস্থা হয়েছে। লোকের ভিড় বাড়ছে।'

পুষ্প বিরক্ত হয়। ঘরে কাজ আছে। সব ফেলে গিয়ে এখন কুয়োর ধারে বসতে হবে! সে বলে, 'লোক আসছে আসুক। আমাদের এখন যাওয়ার কী আছে?'

গণেশ রেগে যায়। বলে, 'আমাকে কেন বলেন? দাদার অর্ডার। এত খরচাপাতি হচ্ছে, আয়োজন হচ্ছে, বাড়ির লোক সামনে না থাকলে কেমন দেখাবে?'

'কেমন আবার দেখাবে? এতে দেখাদেখির কী আছে।'

'আছে, সেন্টিমেন্টের একটা ব্যাপার আছে। বাড়ির লোক বসে না থাকলে পাবলিকের মধ্যে সেটা থাকবে না।'

পুষ্প অবাক হয়ে বলে, 'সেটা আবার কী?'

'অত জানি না। আপনে ছেলেমেয়ে নিয়ে চলেন দেখি।'

শঙ্কু এবং বিনু দু'জনেই বসেছে মায়ের গা ঘেঁষে। তাদের সামনে কাচের প্লেটে দুটো করে রসগোল্লা এবং একটা করে শিঙাড়া। গেলাসে জল। শুধু রসগোল্লা শিঙাড়া নয়, বাবার গর্তে পড়ে যাওয়া উপলক্ষে ছেলেমেয়ে দুটির কপালে আজ নতুন জামাকাপড়ও জুটেছে।

বাইরের অতিথিদের সামনে ছেঁড়া, ময়লা শার্ট প্যান্ট চলে না। সেই কারণে নতুন। বদ্রিনাথের লোকই কিনে এনেছে। শঙ্কু, বিনু সেগুলো পরেছে। সব মাপে মাপে হলেও শঙ্কুর শার্ট বড় হয়েছে। একটু বেশি বড়। প্যান্ট ঢেকে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, সে শুধু শার্ট পরেছে। বিনু হাসাহাসি করায় পুষ্প শার্ট প্যান্টের ভেতর গুঁজে দিল।

পুষ্প শঙ্কুর কানে কানে কী বলল। শঙ্কু উঠে গিয়ে কুয়োর সামনে গেল। গণেশকে ইশারা করায় সে পাইপ এগিয়ে দেয়। শঙ্কু প্রথমে কথা বলে, তারপর কানে দিয়ে শোনে। ফিরে এসে মায়ের পাশে বসে। পুষ্প ছেলের দিকে তাকায়।

'বলেছিস?'

'হ্যাঁ, বলেছি।'

'কী বলল?'

'বলল, আলো লাগবে না। আলোতে চোখে কষ্ট হবে।'

পুষ্প মুখ নামিয়ে বলল, 'ও। হতে পারে। এতক্ষণ অন্ধকারে আছে তো। আর কিছু বলল?'

শঙ্কু বলল, 'হ্যাঁ, বলল।'

'বলল তো বলছিস না কেন?'

'তোমার কথা বলল।'

পুষ্প চমকে উঠল। বিনু-শঙ্কুর বাবা তার কথা কী বলল! লজ্জাও পেল কি? ঘোমটা ঠিক করতে করতে চারপাশে তাকাল। গলা নামিয়ে বলল, 'আমার কথা! আমার কথা কী বলল?'

শঙ্কু খানিকটা আমতা আমতা করে। তারপর বলে, 'বলল, তোর মায়ে কেমন আছে? কান্নাকাটি করতে বারণ করিস।'

'কান্নাকাটি!' পুষ্প অবাক হল। বলে কী মানুষটা! নীচে বসেও ওইসব গিলছে নাকি? শঙ্কু ঠিক শুনেছে তো?

'বলল তো তাই। আমি কী করব?'

'আর? আর কিছু বলেছে?'

শঙ্কু বোনের দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল।

'বলেছে, মায়েরে ঠিক সময় খেয়ে নিতে বলিস। বেশি রাত যেন না করে। রাতে খেলে হজমের গোলমাল হয়।'

পুষ্প ঠোঁট বেঁকাল। ন্যাকা। এতদিন বউটা কেমন আছে একবারটির জন্য মনে পড়েনি, আজ গর্তে বসে খুব মনে পড়ছে। এই মানুষটাকে আরও তিনদিন গর্তে ফেলে রাখা দরকার। যদি তার সে ক্ষমতা থাকত তা হলে তাই করত। তিনদিন গর্তে ফেলে রাখত।

বিনু তার দাদার কানে কানে ফিসফিস করে বলল, 'অ্যাই দাদা, আমিও বাবার সঙ্গে কথা বলব।'

শঙ্কু গলা নামিয়ে বলল, 'খবরদার যাস না বিনু। বাবা নামতা ধরছে। আমাকে বলল, সাত তেরোং কত হয় বল তো শঙ্কু। তুই কথা বললে তোকেও ধরবে। ট্রানস্লেশনও ধরতে পারে। আমার মনে হয়, গর্তে পড়ে বাবার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। অ্যাই শিঙাড়া খাবি?'

এমন সময় মাইকে ঘোষণা শুরু হল—

'আপনারা চিন্তা করবেন না। আমাদের সকলের প্রিয়, আমাদের গ্রামের গর্ব হরিপদ ভাল আছে। এইমাত্র তার সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি গণেশের কথা হয়েছে...। খবর শোনার জন্য সে একটা ট্রানজিস্টার রেডিয়ো চেয়ে পাঠিয়েছে। আমরা সেই রেডিয়ো পাঠানোর ব্যবস্থা করছি... দুপুরে তার জন্য' যে খাবারের মেনু হয়েছে এইমাত্র সেটা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে... সুক্ত, ভাজা মুগের ডাল, কাটা পোনা... আজ বিকাল ঠিক চার ঘটিকায় হরিপদকে গর্ত থেকে উদ্ধার করা হবে... আপনারা দলে দলে... ঠিক বিকাল চার ঘটিকায়...।

৪

চকদিহি গ্রামের কাছে কোনও ট্রেন লাইন নেই, তবু কোথা থেকে যেন মাঝেমধ্যে ট্রেন যাওয়ার শব্দ ভেসে আসে। গুম গুম গুম...। শীতের সময়তে এরকম হয়। রাত নিঃশব্দ হয়। দূর থেকে যেসব শব্দ আসার কথা নয়, তারাও আসে। চকিতে এসে চকিতেই মিলিয়ে যায়।

বদ্রিনাথ বসে আছেন তাঁর বাড়ির লাগোয়া অফিস ঘরে। টেবিলের ওপাশে গণেশ। গণেশের মাথা নিচু। সে কিছু ভাবছে। ভাবতে ভাবতে টেবিলের ওপর রাখা পেপারওয়েট নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

বদ্রিনাথ মুখ তুলে ফিসফিস করলেন, 'তুই পারবি?'

'আপনি বললে পারব।' গণেশ মুখ না তুলেই বলল।

'ওখান থেকে সব সরানো হয়ে গেছে? মাইক চেয়ার, কপিকল?'

'সব হয়নি। কিছুটা হয়েছে। বাকিটা কাল সকালে হবে।'

বদ্রিনাথ এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'এখন ওখানে কে আছে?'

'কেউ নেই। খগেনকে রাত দশটা পর্যন্ত রেখেছিলাম। তারপর তুলে নিয়েছি।'

বদ্রিনাথ ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কুয়োর ভেতর থেকে খগেন কোনও আওয়াজ টাওয়াজ পেয়েছে?'

গণেশ চুপ করে রইল। বদ্রিনাথ আবার বললেন, 'কোনও সাড়া শব্দ পায়নি?'

গণেশ বিড়বিড় করে বলল, 'খগেন বলে গেল গানের মতো কী একটা শুনেছে। ভুলও হতে পারে।'

বদ্রিনাথ দাঁত চিপে বললেন, 'হারামজাদা। আমার মুখ পুড়িয়ে, সর্বনাশ করে এখন গান গাইছে। এই ক্ষতি যে আমি কী করে মেকআপ করব, আমি জানি না। সামনে ইলেকশন...।'

কথাটা মিথ্যে নয়। আজ খুব বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে গেছে বদ্রিনাথের।

মন্ত্রী মশাইয়ের পৌঁছোতে আধঘণ্টা মতো দেরি হয়। ঘটনাস্থলে না এসে তিনি সরাসরি চলে যান বদ্রিনাথের বাড়িতে। সেরকমই ব্যবস্থা ছিল। তিনি সাবান মেখে স্নান করেন। নতুন ধুতি পাঞ্জাবি পরেন। দুধ ছাড়া চা খান। তারপর সন্ধের মুখে মুখে ঘটনাস্থলে আসেন। সবাই প্রস্তুত ছিল। একটা মানুষ তোলা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। ডবল খুঁটিতে কপিকল লাগানো হয়েছে। মোটা দড়ির একদিকে ঝুলছে বড় লোহার ড্রাম। পরিকল্পনা মতো এই ড্রামে চড়েই

গর্ত থেকে উঠে আসবে হরিপদ। প্রথমে তাকে জড়িয়ে ধরবেন বদ্রিনাথ। কাঁদতে কাঁদতে জড়িয়ে ধরবেন। তারপর একে একে অতিথিরা তাকে ফুল মালায় বরণ করবেন।

গোটা গ্রাম ভেঙে পড়েছে বন বাদাড়ের পাশে। ঘনঘন হাততালি। মুহুর্মুহু স্লোগান। বদ্রিনাথ জিন্দাবাদ... হরিপদ অমর রহে...।

স্কুলের মেয়েরা গান ধরেছে, 'অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো...।'

বদ্রিনাথের ইঙ্গিতে ড্রাম নামিয়ে দেওয়া হল। স্লোগান, গান সব থেমে যায়। সবাই অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে কুয়োর দিকে। এখনই গর্ত থেকে বেঁচে ফিরবে হরিপদ। ফিরবে।

পুষ্প চোখে আঁচল চাপা দেয়। শঙ্কু আর বিনু ভয়ে মায়ের হাত চেপে ধরে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই লোহার ড্রাম উঠে আসে। বদ্রিনাথ ছুটে যান। কিন্তু এ কী! হরিপদ কোথায়? ড্রাম যে খালি! কী ঘটল? কোনও গোলমাল? হরিপদকে তো পইপই করে সব বলে দিয়েছিল গণেশ। তবে?

মাটির গভীর অন্ধকার থেকে ঘণ্টাধ্বনি ভেসে আসে। গণেশ পাইপের কাছে ছুটে যায়। কান পাতে। হরিপদর কথা শোনে। নিজে কথা বলে। আবার কান পাতে। এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর থমথমে মুখে এগিয়ে আসে বদ্রিনাথের কাছে। কানের কাছে মুখ নিয়ে সে কী বলে শোনা যায় না। শুধু দেখা যায় বদ্রিনাথ দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসছেন জীর্ণ, বাতিল কুয়োর দিকে।

বদ্রিনাথও পাইপে মুখ রেখে কথা বলেন। কান পেতে উত্তর শোনেন। তারপর পাইপ ছুড়ে ফেলে কুয়োর ওপর মুখ রেখে চিৎকার করে ওঠেন—

'উঠবি না মানে? হারামজাদা। জুতিয়ে তোমার মুখ ছিঁড়ে দেব। ঠাট্টা হচ্ছে? রসিকতা? এতগুলো মানুষের সঙ্গে চ্যাংড়ামি করছ? এত খরচ, এত কিছু করার পর বলছ গর্তে থাকব। হারামজাদা, তোমার গর্তে থাকা বের করছি...। গর্তে তোমার কোন সুখ আছে শুয়োরের বাচ্চা?... বল, বল...।

দূরের মানুষগুলোও দেখতে পায় থরথর করে কাঁপছেন বদ্রিনাথ। শুধু কাঁপছেন না, মাথা নিচু এবার পাথরও খুঁজছেন। কুয়োর ভেতর ছুড়বেন নাকি?

মন্ত্রীমশাই এতক্ষণ নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ঘটনা দেখছিলেন। এবার চেয়ারে হেলান দিয়ে শান্ত গলায় সামনের মানুষগুলোকে বললেন, 'চুপ করে দাঁড়িয়ে কী দেখছেন আপনারা? এগিয়ে গিয়ে ধরুন। মানুষটা অসুস্থ হয়ে পড়বে যে। কুয়োয় পড়ে যাবে। ধরুন ওকে।'

গণেশ ছুটে যায়। ততক্ষণে কুয়োর কাছে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়েছেন বদ্রিনাথ।

ফেরার সময় গাড়িতে ওঠার আগে মন্ত্রীমশাই বদ্রিনাথকে কাছে ডাকলেন। বদ্রিনাথ ততক্ষণে অনেকটা শান্ত হয়েছেন।

'বদ্রিনাথবাবু, লোকটা কিন্তু ডেঞ্জারাস। এমনি ডেঞ্জারাস না বেশি ডেঞ্জারাস। ওপরের থেকে গর্তে থাকাটা ভাল বলে বিচ্ছিরি একটা গোলমাল পাকিয়ে দিল। যাক চিন্তা করবেন না। দেখবেন, লোকটা কাল সকালেই বউ বাচ্চার কান্না শুনে সুড়সুড় করে ওপরে উঠে আসবে। কিন্তু তারপর? তারপর গর্তের গল্প শুরু করবে না তো? সেটাই চিন্তার। দেখুন পাগল টাগল বলে যদি ম্যানেজ করা যায়। গ্রামের দিকে নানা ধরনের পাগল থাকে। এ না

হয় হবে গর্ত পাগল। যাক, সাবধানে থাকবেন। চট করে মাথা গরম করবেন না। মনে রাখবেন মাথা ঠান্ডাতে কাজ ভাল হয়। যাক, ধুতি উপহারের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। তবে ধুতির পাড়টা তত ভাল নয়। মনে হয় আপনাকে ঠকিয়েছে।'

মাথা ঠান্ডা করেই এখন কাজ করছেন বদ্রিনাথ। এত রাতে গণেশকে ডেকে পাঠিয়েছেন।

'লোকটাকে রাতে কিছু খেতে দেওয়া হয়েছে।'

'হ্যাঁ, খগেন কাগজে মুড়ে রুটি গুড় ফেলেছে।'

বদ্রিনাথ অল্প হাসলেন। নিষ্ঠুর হাসি। বললেন, 'গুড। খালি পেটে থাকলে ঘুমোত না। কাজে অসুবিধে হত।'

গণেশ সোজা হয়ে বসল। মুখ তুলে বলল, 'ঘুম, জাগা কোনও কিছুতেই অসুবিধে হবে না। প্রথমে প্লাস্টিক দিয়ে কুয়োর মুখটা ভাল করে ঢাকব। একটা না, পরপর দুটো প্লাস্টিক এনেছি। হাওয়া বাতাস ঢোকার ছিটে ফোঁটা পথ থাকবে না। তার ওপর দেব কাঠের পাটাতন। কিছু বোঝার আগেই শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যাবে। খুব বেশি হলে মিনিট পনেরো-কুড়ি। ব্যস। তারপরেই ফিনিশ। কাল ভোরে গিয়ে সরিয়ে নিয়ে এলেই হবে। কোথাও কোনও প্রমাণ থাকবে না।'

বদ্রিনাথ চকচকে চোখে বললেন, 'গণেশ, তুই নিশ্চিত যে অন্য কোথাও দিয়ে ওই গর্তে হাওয়া ঢুকবে না?'

গণেশ একটু হাসে। বলে, 'আমি নিশ্চিত।'

বদ্রিনাথ উঠে দাঁড়ান। বলেন, 'গুড। তা হলে যা। আর দেরি করিস না। আমিও এখন বেরোব। পুষ্পর কাছে যাব।'

অনেকটা কান্নার পর আজ পুষ্প ঘুমিয়েছিল। মায়ের সঙ্গে ছেলেমেয়ে দুটোও কেঁদেছে। কেন কাঁদছে তারা ভাল করে জানে না। মা কাঁদছে তাই কেঁদেছে। কাঁদতে কাঁদতেই ঘুমিয়ে পড়েছে।

বদ্রিনাথ আসার পর ঘুম চোখেই পুষ্প ছেলেমেয়েদের কোলে করে পাশের ঘরে রেখে এল। ছিটিকিনি ছাড়াই রাখল। এত রাতে আর ছিটকিনি কীসের? ফিরে এসে খাটের চাদর বদলাল। ফিরোজা রঙের সুন্দর চাদর।

তারপর নগ্ন হয়ে এসে দাঁড়াল আধো জাগা আধো ঘুমের ঘোরে।

আর তখনই পুষ্পর শরীর থেকে গন্ধটা পেলেন বদ্রিনাথ।

একটা তীক্ষ্ণ সোঁদা গন্ধ। সেই গন্ধ যেন ধাক্কা মারল! ছিটকে সরে গেলেন বদ্রিনাথ। গা গুলিয়ে উঠল। বমি পাচ্ছে। বদ্রিনাথ দ্রুত খাট থেকে নামলেন। নগ্ন পুষ্পকে ঠেলা দিয়ে সরিয়ে, মুখে হাত চেপে ছুটে গেলেন ঘরের বাইরে। পুষ্প কি হাসল?

অন্ধকার দাওয়ায় উবু হয়ে বসে বমি করতে করতে বদ্রিনাথ গন্ধটা চিনতে পারলেন।

মাটির গন্ধ। অনেকদিনের ভুলে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া কোনও গর্তের মাটি।

হিরে

ফুলছে, ফুঁসছে। পাক মেরে চাপা গর্জন তুলছে, সোঁ সোঁ। খানিক আগেই হলুদ বিপদসীমা পেরিয়েছে। এখন ছুটছে লাল বিপদসীমার দিকে। সর্বনাশের আর বেশি দেরি নেই। পরিস্থিতির অবনতি হচ্ছে দ্রুত। যে-কোনও মুহূর্তে চরম বিপদসীমাও পেরিয়ে যাবে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বাইরে।

নদী-বাঁধে এই বিপদের সময়গুলোতে মানুষকে জানানোর অনেকরকম ব্যবস্থা থাকে। কখনও সাইরেন বেজে ওঠে। কখনও ওড়ে লাল নিশান। সবাই বুঝতে পারে, বিপদ আসছে। পাড় টপকে, বাঁধ ভেঙে জল উপচে পড়বে এবার।

দুধের ডেকচিতে সাইরেনের ব্যবস্থা নেই। রান্নাঘরের মানুষ তা নিজেই খেয়াল রাখে এবং সতর্ক হয়।

গোপালের মা সতর্ক হচ্ছে না। গ্যাসের ওপর রাখা দুধের ডেকচির দিকে তার কোনও খেয়াল নেই। তার খেয়াল বাইরে। রান্নাঘরের দরজা দিয়ে স্থিরচোখে তাকিয়ে আছে ড্রইংরুমের দিকে। এই মুহূর্তে ড্রইংরুমে যা ঘটছে তাতে গোপালের মা নিশ্চিত এ বাড়ির গিন্নির মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। ছোটখাটো গোলমাল নয়, বড় গোলমাল। মাথায় বড় গোলমাল ছাড়া একজন মানুষ কখনও এ কাণ্ড করতে পারে? পারে না। এখন নিজের বাড়িতে করছে, বেলা বাড়লে রাস্তায় বেরিয়ে করবে। চড়া রোদ এবং রাস্তার মোড় মাথা গোলমাল মানুষদের খুবই পছন্দের জিনিস। ঘটনা খুবই দুঃখের। চোখে কি জল এল? আসেনি। না আসুক। দুঃখের সময় এত বাছবিচার চলে না। গোপালের মা শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছল। এতদিনের কাজের বাড়ি বলে কথা। গোপালের মা গ্যাস বন্ধ করে, দুধের ডেকচি নামাল সাবধানে। এখন কাজ অনেক। হাতে সময় কম। হঠাৎ করে বাড়ির গিন্নির মাথায় গোলমাল দেখা দিয়েছে। কাজের লোকের জীবনে এরকম সুযোগ দু'বার আসে না। সুযোগ বড় কথা নয়, বড় কথা হল সুযোগকে কাজে লাগানো। এখনই রান্নাঘর হাতড়ে খালি শিশি কৌটো খুঁজে বের করতে হবে। তারপর তেল, ডাল শুকনো লঙ্কা, পারলে কিছুটা তেজপাতা ভরে ফেলতে হবে। দু'মুঠো বাসমতী নিলে কেমন হয়? খারাপ হয় না। কখন লেগে যায় বলা যায় না। আর হ্যাঁ, গরম মশলা। গরম মশলা একটু লাগবে। তবে বেশি নয়, দামি জিনিস। অল্প নিলেই চলবে। গোপালের মা আড়চোখে তাকাল ড্রইংরুমের দিকে। আহা রে, পাগল মানুষ, চুরি-চামারির কী বোঝে? কিছু বোঝে না। কে জানে দেখে ফেললে, হয়তো একগাল হেসে বলবে, 'গোপালের মা, মনে করে ক'টা কিসমিস নিয়ে যেয়ো। পায়েসে দিয়োখন।'

কিসমিসের কৌটো খুঁজতে খুঁজতে আবার শাড়ির আঁচল দিয়ে চোখ মুছল গোপালের মা।

ড্রইংরুমে অঞ্জলি পায়চারি করছে। শুধু পায়চারি করছে না, তার হাতে একটা বই। বইটা সে একবার খুলছে, একবার বন্ধ করছে। বিড়বিড় করে কী যেন বলছেও! সেই বিড়বিড়ানি ফ্যানের হাওয়ায় ঘরের মধ্যে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। '...চিনের প্রাচীর... চিনের প্রাচীর... চিনের প্রাচীর... এক্স রে আবিষ্কার... এক্স রে আবিষ্কার... এক্স রে আবিষ্কার... উচ্চ জলপ্রপাত... উচ্চ জলপ্রপাত... উচ্চ জলপ্রপাত...।'

শুধু গোপালের মা নয়, যে এই দৃশ্য দেখবে তারই মনে হবে, হলটা কী? সত্যিই কি অঞ্জলির মাথাটা খারাপ হয়ে গেল?.অর্ণবই বা এই সাতসকালে গেল কোথায়? বোধহয় বাজারে গেছে। সে কি জানে না তার স্ত্রী ক্লাস সেভেনের একটা সাধারণ জ্ঞানের বই নিয়ে ঘুরে ঘুরে মুখস্থ করছে? মনে হয় না জানে। জানলে বাজারে না গিয়ে সে স্ত্রীর মাথায় ঠান্ডা জল ঢালার ব্যবস্থা করত। আচ্ছা, অর্কই বা কোথায়? সে তো তার মাকে একটু দেখতে পারে। ক্লাস সেভেনে পড়লে কী হবে? সে যথেষ্ট স্মার্ট। কম্পিউটার চালায়। ডাক্তারও ডাকতে পারবে। অর্ক কি স্কুলে গেল?

না অর্ক স্কুলে যায়নি। আজ তার কামাই। অর্কর সঙ্গে তার বাবারও আজ কামাই। অর্ণবও আজ অফিসে যাবে না। শুধু বাবা আর ছেলে নয়, অঞ্জলিও আজ তার প্রোগ্রাম বাতিল করেছে। বিকেলে ছোটবোনের সঙ্গে তার শপিং-এ যাওয়ার কথা ছিল। জটিল ধরনের শপিং। দু' দফায় কেনাকাটা। প্রথম দফায় পোশাক, দ্বিতীয় দফায় সেই পোশাকের সঙ্গে মিলিয়ে ইমিটেশন গয়না, দুল, হার, চুড়ি। গয়না যদি মেলানো না পাওয়া যায় তা হলে কেনাকাটা আবার প্রথম দফায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তখন পোশাক বদলের ব্যাপার থাকবে। সেই কারণেই জটিল। মাঝখানে খাওয়াদাওয়া। এক মাস আগে ঠিক করা প্রোগ্রাম। তবু বাতিল হয়েছে। অঞ্জলি সব প্রোগ্রাম বাতিল করতে পারে, খাওয়ার প্রোগ্রাম পারে না। আজ পেরেছে।

ব্যাপারটা কী? সত্যি সত্যি মাথায় গোলমাল?

না, গোলমাল নয়। তবে ব্যাপার মারাত্মক।

আর কয়েক ঘণ্টা পরে, আজ বিকেলে এই বাড়িতে একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটতে চলেছে। সাংঘাতিক এবং রোমাঞ্চকর।

এইসময় টিভির সবচেয়ে জনপ্রিয় অনুষ্ঠান হল 'হিরের টুকরো গিন্নি'। আর তাতেই চান্স পেয়েছে অঞ্জলি। এক-এক দিন এক-এক জন গিন্নির পারফরমেন্স। বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট, কাপড় কাচা থেকে শুরু করে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি। জিততে পারলে পুরস্কার এমন যে, হাতে নিলে বুক কাঁপে। হিরে! সত্যিকারের হিরে! ঘন নীল ভেলভেটের বাক্স খুলে সেই হিরে যখন ক্যামেরার সামনে মেলে ধরা হয় তখন ঘরে ঘরে গিন্নিদের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

গিন্নিরা আদর করে এই অনুষ্ঠানের একটা ডাকনাম রেখেছে। হিরে।

সেদিন দুপুরে এই 'হিরে' থেকে যখন চিঠি আসে তখন বাড়িতে কেউ ছিল না। অঞ্জলির

একটা শকের মতো হল। প্রথমে মনে হল, আনন্দে লাফাই। লাফাতেই থাকি। পরক্ষণেই মনে হল, জীবন অনিত্য। সংসার মায়া। শেষ পর্যন্ত মনে হল, এই চিঠি মিথ্যে চিঠি। ফোন নম্বর দেখে অঞ্জলি ফোন করল। একবার নয়, তিনবার। তিনবার তিনরকম গলায়। শেষবার জোর ধমক দেয়, 'ব্যাপারটা কী? এতবার ফোন করেন কেন? ঘরে কাজকর্ম নাই?'

টেলিফোন কেটে দেওয়ার পর অঞ্জলি বুঝতে পারল, তার শরীর কাঁপছে। অল্প কাঁপছে, কিন্তু কাঁপছে। মানুষের শরীর কাঁপে ভয়ে অথবা আনন্দে। অঞ্জলির শরীর দুটো কারণেই কাঁপছে। ভয়ে এবং আনন্দে। সে দ্রুত হাতে অর্ণবের মোবাইল নম্বর টেপে। অর্ণব অফিসে জরুরি কাগজপত্র দেখছিল। জরুরি কাগজপত্র দেখার সময় অর্ণব ফোন ধরে না। নম্বর দেখে কেটে দেয়। এইসময় ফোন ধরলে তার অসুবিধে হয়। অঞ্জলির নম্বর দেখে সে তাড়াতাড়ি ধরল। এই ফোন না ধরলে বাড়ি ফিরে অনেক বেশি অসুবিধে হবে। শুধু ধরল না, নরম গলায় বলল 'বলো অঞ্জলি। কেমন আছ?' ভাবটা এমন যেন বউয়ের সঙ্গে এক মাস পরে তার কথা হচ্ছে!

অঞ্জলি কাঁদোকাঁদো গলায় বলে, 'অ্যাই, তুমি চলে এসো। এক্ষুনি বাড়ি চলে এসো। একটা বিপদ হয়েছে।'

অর্ণব সোজা হয়ে বসে। জরুরি কাগজপত্র সরিয়ে চাপা গলায় বলে, 'বিপদ! কী বিপদ? অ্যাক্সিডেন্ট? আগুন? চুপ করে আছ কেন অঞ্জলি? বলো কী বিপদ।'

অঞ্জলির কাঁদোকাঁদো গলা এবার হাসিহাসি হল। সে হাসতে হাসতে বলে, 'হিরে থেকে চিঠি পাঠিয়েছে। আমি চান্স পেয়েছি। সত্যি আমি চান্স পেয়েছি। ফোনও করেছিলাম।'

অর্ণব ফিসফিসিয়ে বলে, 'হিরে! হিরেটা কী অঞ্জলি?'

'উফ, হিরে জানো না! তুমি কী গো? তুমি কি মানুষ? হিরের নাম শোনোনি! তোমার সঙ্গে আমি যে কী করে এতদিন সংসার করছি! হিরে একটা টিভি প্রোগ্রাম। হিরের টুকরো গিন্নি। ভীষণ পপুলার। গিন্নিরা ওখানে ভাল পারফরমেন্স করলে দারুণ প্রাইজ পায়। কী প্রাইজ বলো তো? হিরে? নকল হিরে নয়, সত্যিকারের হিরে। দেখলে তোমার চোখ কপালে উঠে যাবে। সোমবার ক্যামেরা, মেকআপ ম্যান নিয়ে ওরা বাড়িতে আসছে। বাড়িতেই সারাদিন শুটিং। বাইরের কাউকে বলতে বারণ করেছে। খবরদার, তুমি কাউকে বলবে না। আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে!'

'আনন্দ! এই যে বললে বিপদ হয়েছে? তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে অঞ্জলি? ডাক্তারকে ফোন করব?'

অঞ্জলি ভুরু কোঁচকায়। মানুষটা বড্ড প্রশ্ন করছে। সমস্যার কিছু নেই। সে জানে বেশি প্রশ্ন করা স্বামীর ওষুধ কী? একটা সময়ের পর এদের ধমক দিতে হয়। মৃদু ধমক নয়, জোর ধমক। সেই ধমকে শাশুড়ি, ননদ এবং পারলে জা-কেও আনতে হয়। তেমন বাড়াবাড়ি কিছু না হলে অসুখ এতেই সারে।

'চুপ। একদম চুপ। আনন্দ হবে না? কী বলছ তুমি? হিরেতে চান্স পাওয়া কত বড় ব্যাপার তুমি জানো? জানো তুমি? বউ চান্স পেয়েছে অমনি চোখ টাটাচ্ছে। সারাদিন বাড়িতে গাধার মতো মুখ বুজে খাটব তবেই উনি খুশি। দাঁড়াও এবার মজা বুঝবে। তোমার

মা-বোনের মুখ একেবারে আমসি করে দেব। টিভির পরদায় যখন আমার হাতে হিরেটা দেখবে তখন হিংসেতে হাত-পা ছড়িয়ে কান্নাকাটি শুরু করে না দেয়। আমার তো বেশ ভয় করছে।'

ধমক খেয়ে অর্ণব ভেবেছিল চুপ করে যাবে। পারে না। ভুল করে সে আবার প্রশ্ন করে বসে। বলল, 'ভয়! কীসের ভয়? এই তো বললে আনন্দ হচ্ছে! বললে না?'

অঞ্জলির মনে হল যেন পৃথিবীর সবথেকে বোকা মানুষটার সঙ্গে তার কথা হচ্ছে। বলল, 'আরে বাবা, সেই ভয় নয়। এটা অন্য ভয়। টিভিতে আমাকে দেখে তোমার ছোটভাইয়ের বউ রত্না রাগ করে তার নিজের টিভিটা ভেঙে না ফেলে। শুনেছি বেচারি নাকি নতুন টিভি কিনেছে। তাই ভয় করছে। পুরনো হলে করত না।'

অর্ণবের ইচ্ছে করল ফোনটা কেটে দিতে। তার বদলে সে হাসল। স্ত্রীর ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সময়ে এটাই হয়। যা ইচ্ছে করে তা পারে না। বদলে হাসে। আজও হেসে বলল, 'ছাড়ো তো ওসব। সত্যি দারুণ ব্যাপার অঞ্জলি। এত বড় একটা অনুষ্ঠান থেকে ডাক পেয়েছ, আমার তো বিশ্বাসই হচ্ছে না। কনগ্র্যাচুলেশনস। বলো আমি তোমার জন্যে কী করতে পারি।'

অঞ্জলি সন্তুষ্ট হল। অল্প ডোজেই ওষুধ কাজে দিয়েছে। সে আদুরে গলায় বলল, 'অ্যাই, আমাকে হেল্‌প করতে হবে। চিঠির সঙ্গে ওরা সিলেবাসও পাঠিয়েছে। খুব টাফ।'

অর্ণব তাড়াতাড়ি বলল, ভয়ের কিছু নেই সোনা। আমি আছি না? হাতে শনি আর রবিবারটা তো পাচ্ছি। *ঠেসে* প্র্যাকটিস করবে। *ঠেসে* প্র্যাকটিস করলে কোনও সমস্যাই হবে না। ভয়ের কিছু নেই।'

ভয়ের অনেক কিছু আছে। কারণ সিলেবাস ভয়াবহ। থিয়োরি ও প্র্যাকটিক্যাল দু'রকম প্রশ্নই থাকছে। সেই প্রশ্ন কখনও সিন, কখনও আনসিন। ঘর ঝাঁট, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, রান্নাবান্নার প্র্যাকটিক্যাল তো আছেই, এদের সঙ্গে ভয়ংকর ভয়ংকর সব প্রশ্ন। শুনলে গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায়।

সিলেবাসের সঙ্গে যেসব নমুনা প্রশ্নগুলো এসেছে সেগুলো এরকম—

মনে করুন, আপনি ঘর ঝাঁট দিয়েছেন, এমন সময় আপনার ছেলেমেয়ে আপনার কেনা নতুন কাঁচির ধার পরীক্ষা করবে বলে পরিকল্পনা করল। পরিকল্পনামতো গোপনে প্রচুর কাগজ কাটল এবং দ্রুত ঘরময় কাগজের নানাপ্রকারের টুকরো ফেলল। এবার যে ঝাঁটটা আপনি দেবেন সেটা ঠিক কেমন হবে? আপনার ঝাঁটের গতি এবং ছন্দ কি প্রথম পর্যায়ের ঝাঁটের মতোই থাকবে? নাকি পালটাবে? আপনার মনের অবস্থা কি দ্বিতীয় পর্যায়ের ঝাঁটে কোনও প্রভাব ফেলতে পারে? যদি পারে তা হলে সে প্রভাবকে কীভাবে আপনি নিয়ন্ত্রণ করবেন? হাসিমুখে? নাকি গম্ভীর হয়ে? ছেলেমেয়েদের বকাঝকা করে? নাকি শান্ত গলায় মনীষীদের ছেলেবেলার গল্প শুনিয়ে?

বাসন মাজার নমুনা প্রশ্ন আরও ভয়ংকর।

সকালে উঠে আপনি জানতে পারলেন কাজের লোক আসছে না। তার পেট ব্যথা। শুধু আজ নয়, সে কালও আসবে না। এই পরিস্থিতিতে গাদাখানেক বাসন মাজার সময় ঠিক

কোন ধরনের রবীন্দ্রসংগীত আপনার মনকে শান্ত করতে পারে? পূজা পর্যায় না প্রকৃতি? যদি পূজা পর্যায়ের হয় তা হলে ঠিক আছে, কিন্তু যদি প্রকৃতি হয় তা হলে কোন প্রকৃতি? গ্রীষ্ম? বসন্ত? নাকি শরৎ?

রান্নার সিলেবাস দেখতে তো মনে হবে অনার্সের আটটা পেপার! পিৎজা থেকে মুলো শাকের ঘণ্ট কী নেই? ব্যাপার এখানেই শেষ নয়, আরও আছে। হিরে পাওয়া কি চাট্টিখানি কথা? কাপড় কাচা, বাসন মাজার মতো মোটা বিষয়ের পাশে আছে সূক্ষ্ম বিষয়। সেই সূক্ষ্ম বিষয়ে কোনওটা ক্যামেরার সামনে বলতে হবে। কোনওটা হাতেকলমে করে দেখাতে হবে। সাধারণ জ্ঞান, চিত্রকলা, সিনেমা, থিয়েটার, আবৃত্তি, গান ও নাচ। বাপ রে! কী নেই?

নাচের কথা শুনে অর্ণব আঁতকে উঠল। বলল, 'নাচ! অঞ্জলি তুমি নাচতে পারবে?'

অঞ্জলি চোখ কপালে তুলে বলল, 'ওমা, আমি কেন নাচতে যাব? নাচবে তো তুমি।'

'আমি!' অর্ণবের প্রায় সোফা থেকে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। সে কপালের ঘাম মুছে বলে, 'আমি! আমি নাচব? তুমি কী বলছ অঞ্জলি! পারফরমেন্স তোমার। হিরে পাবে তুমি। আমি কেন নাচতে যাব?'

অঞ্জলি স্বামীর দিকে তাকায়। 'ফুঃ' ধরনের আওয়াজ করে বলে, 'তোমাদের নিয়ে এই হয়েছে মুশকিল। কিছুই জানো না। এই প্রোগ্রামে, ছেলের আবৃত্তি, মেয়ের গান, স্বামীর নাচ একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নম্বর তোলার জায়গা। কর্তাকে নাচ দেখাতেই হয়।'

'ব্যাপারটা তুমি একটু শান্ত মাথায় ভেবে দেখো অঞ্জলি। এটা কি ঠিক? আমার নাচাটা কি উচিত হবে?' অর্ণবের গলায় কাকুতিমিনতি।

অঞ্জলি চাপা গলায় ধমকে ওঠে। বলে, 'কেন উচিত হবে না কেন? তুমি আমার জন্য এইটুকু করতে পারবে না? তোমার জন্যে, তোমার বাড়ির জন্যে সারাজীবন আমি কম নেচেছি? বলো, কম নেচেছি?'

অর্ণব তাড়াতাড়ি হাত তুলে বউকে শান্ত করে। আমতা আমতা করে বলে, 'নিশ্চয় নেচেছ। একশোবার নেচেছ। তবু বলছিলাম, মানে ধরো, টিভিতে আমার নাচ দেখাল। অফিসের লোকজন দেখল তাদের ম্যানেজারবাবু ধেই ধেই করে নাচছে, সেটা কেমন হবে না?'

অঞ্জলি পাত্তা না দিয়ে বলল, 'খুবই ভাল হবে। ওরাই তোমার কাছে জানতে চাইবে, তুমি কোনটার সঙ্গে নাচতে চাও। হিন্দি, ক্লাসিকাল না রবীন্দ্রসংগীত। আমি একটা কথা বলব?'

অর্ণব হাল ছেড়ে দিয়ে মিনমিন করে বলল, 'বলো।'

'তুমি বাউল চাইবে। বাউল সংগীত। তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, বাউল নাচটা তোমার সঙ্গে মানাবে ভাল। ওরা নাচতে বললে তুমি চট করে একটা কাপড় কোমরে পেঁচিয়ে নেবে। এখন থেকে ক্যাসেট চালিয়ে প্র্যাকটিস শুরু করে দাও। তোমার কী মনে হয়?'

অর্ণব বাউলের মতো উদাস ভঙ্গিতে বলে, 'আমার কিছু মনে হয় না।'

সেই প্র্যাকটিস হয়েছে। ক্যাসেটে গান চলেছে, 'কী ঘর বানাইলা আমি শূন্যেরও মাঝার... লোকে বলে, বলে রে...।'

শুধু অর্ণবের নাচ নয়, অঞ্জলির কাপড় কাচা, বাসন মাজা, ঘর ঝাঁট, রান্না সবেরই প্র্যাকটিস চলছিল জোরকদমে। চলছিল জেনারেল নলেজ মুখস্থ। তাতে চিনের প্রাচীরের উচ্চতা যেমন আছে তেমনি আছে গদারের সিনেমা, পিকাসোর তুলি, দস্তয়েভস্কির কোটেশন। এগোচ্ছিল বেশ ভালভাবেই।

বিপর্যয়ের খবর এল গতকাল বিকেলে।

অঞ্জলি গোপনে সাজেশনের জন্যে লোক লাগিয়েছিল। লাস্ট মিনিট সাজেশন। সেই লোক খবর দিয়েছে, এই সপ্তাহে ঝাঁটা, বাসন, পিকাসো রাউন্ডের থেকেও অনেক বেশি ইমপর্টান্ট, 'শ্বশুরবাড়ি রাউন্ড।' বিচারকরা নাকি এই রাউন্ডের ওপর বিশেষ নজর রাখবেন।

অঞ্জলি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

'উফ ঝাঁটা, বাসন, মুড়িঘন্ট এত কিছু থাকতে এবারই শ্বশুরবাড়ি রাউন্ডটা ইমপর্টান্ট হল? বেছে বেছে আমার বেলাতেই? আমরা শুনছি, হিরেওলারা নাকি ক্যামেরা চালিয়ে শ্বশুর-শাশুড়িকে জিজ্ঞেস করবে, আপনার বউমা কেমন রাঁধে? ঝালের হাত বেশি, না মিষ্টির হাত বেশি?'

অর্ণব আমতা আমতা করে বলল, 'তোমার বদলে আমার শ্বশুরবাড়ির লোকজন এলে হয় না? মানে ধরো, আমার বাবা, মা, বোনের বদলে তোমার বাবা, মা, ভাই, বোনেরা এল। তারা নিশ্চয় তোমার খুবই প্রশংসা করবে। কোনও ঝুঁকি থাকবে না। ওরা শ্বশুরবাড়ি চেয়েছে, একটা হলেই তো হল। হল না?'

অঞ্জলি চাপা গলায় হিসহিসিয়ে ওঠে। বলে, 'চুপ। একেবারে চুপ। স্ত্রীর হাত থেকে হিরে ফসকে যাচ্ছে আর তুমি রসিকতা করছ? ইস এত মুখস্থ, এত নাচ-গান প্র্যাকটিস জলে গেল। আমার কান্না পাচ্ছে।'

নাচ প্র্যাকটিসের ফলে অর্ণবের সারা শরীরেই ব্যথা, সে অঞ্জলির কাঁধে অতি কষ্টে একটা হাত রেখে বলল, 'ভেঙে পোড়ো না সোনা। আমি বরং সোমবার সকালে ও বাড়িতে একবার যাই। গিয়ে বাবা-মাকে বলি। ঝগড়াঝাঁটি ভুলে ওঁরা যদি আসেন।'

অঞ্জলি মুখ ফিরিয়ে বলল, 'ইস তুমি বললেই যেন সুড়সুড় করে চলে আসবে ভেবেছ? কিছুতেই আসবে না। আমার শ্বশুরবাড়ির মতো পাজি, স্বার্থপর, জ্বালাতনের শ্বশুরবাড়ি একটাও নেই। সব একটা হিংসুটের দল। এমনি এমনি ও বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছি? আমার উপকার হবে শুনলে ওরা মোটেই আসবে না।'

অর্ণব জানে আসবে না। আসার পরিস্থিতি তিন বছর আগেই শেষ হয়ে গেছে। সে বলল, 'তবু বলি। তোমার হিরের কথাটা জানাই।'

অঞ্জলি উঠতে উঠতে বলল, 'হিরের কথা না বলে তুমি বরং ঘুঁটের কথা বলো। ছেলের বউ ঘুঁটে পাবে শুনলে ওঁরা এলেও আসতে পারেন। নইলে গিয়ে কোনও লাভ নেই।'

কোনও লাভ নেই জেনেও ঘুম থেকে উঠে আজ অর্ণব তার বাবা-মায়ের কাছে গেছে। অঞ্জলি মুখ শক্ত করে পায়চারি করতে করতে চিনের প্রাচীরের উচ্চতা মুখস্থ করছে। এমন সময় অর্ক পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে নাক কুঁচকে বলল, 'মা, হচ্ছে না।' অঞ্জলি পায়চারি থামিয়ে বলল, 'কী হচ্ছে না?'

'অত বড় কবিতাটা মুখস্থ হচ্ছে না।'

অঞ্জলি কড়া গলায় বলল, 'হচ্ছে না মানে? কান টেনে ছিঁড়ে দেব। তিন দিনে একটা কবিতা মুখস্থ হচ্ছে না! ছি ছি। ক্যামেরার সামনে তুমি ডোবাবে দেখছি।' মায়ের বকুনিতে অর্ক রেগে যায়। বলে, 'হিরে পাবে তুমি। আমি কেন কবিতা মুখস্থ করব? বয়ে গেছে।' অঞ্জলি চড় মারবার ভঙ্গিতে ছেলের দিকে এগিয়ে আসে। অর্ক ছুটে বারান্দায় পালায়।

গোপালের মা রান্নাঘর থেকে এই দৃশ্য দেখে নিশ্চিন্ত হল। সে যেরকম ভেবেছিল সেরকমটাই ঘটছে। মাথা গোলমেলে মানুষরা প্রথমে ঘরের লোকদের মারধর শুরু করে। তারপর আক্রমণ ছড়ায় বাইরের লোকদের ওপর। আহা রে, ব্যাপার খুবই দুঃখের। গোপালের মা আঁচল দিয়ে শুকনো চোখ মুছল। এখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়াটাই বুদ্ধির। তার ওপর সঙ্গে এতগুলো শিশি কৌটো আছে। বেশিক্ষণ থাকাটা ঠিক নয়।

এমন সময় বারান্দা থেকে অর্ক চিৎকার করে ওঠে, 'মা, মা শিগগিরি এসো। দেখে যাও কারা এসেছে। ট্যাক্সি থেকে নামছে।'

অর্কর এই এক বিচ্ছিরি স্বভাব। রেগে গেলে সে মিথ্যে বলে। তখন তার কান মুলে দিতে হয়। সেই কান মুলে দিতেই অঞ্জলি বারান্দায় এল। এসে চমকে উঠল। শুধু শ্বশুর-শাশুড়ি নয়, ননদ চন্দনা, ছোট জা রত্নাও ট্যাক্সি থেকে নামছে! ইস, চন্দনাটা মোটা হয়ে গেছে। আরে, সঙ্গে ওটা কে? রত্নার মেয়েটা না? হ্যাঁ, বুলুই তো। বাবা, কী লম্বা হয়েছে! ওদের বাড়ির ধাতটাই এরকম। সবাই তড়বড়িয়ে লম্বা হয়। চমৎকার লাগে।

এরপর এ বাড়িতে দুটি ঘটনা ঘটেছে। একটা ছোট, একটা বড়।

ছোট ঘটনা হল, 'হিরের টুকরো গিন্নি' অনুষ্ঠানের কর্মকর্তারা দুপুরে টেলিফোন করে জানিয়েছে, তাদের পরিচালকের ইনফ্লুয়েঞ্জা। ইনফ্লুয়েঞ্জাটা বড় বিষয় নয়, বড় বিষয় হল, সকাল থেকে পরিচালকের হাঁচি একবারও থামেনি। সাউন্ড ট্র্যাকে সব ধরনের বাড়তি শব্দ ম্যানেজ করা যায়, কিন্তু হাঁচির শব্দ ম্যানেজ করা যায় না। সুতরাং শুটিং বাতিল। অসুখ সারলে কাজ হবে।

এই খবর শুনে অঞ্জলির ভেঙে পড়বার কথা। তাকে নার্সিংহোমে ভরতি করতে হলেও আশ্চর্যের কিছু ছিল না। কিন্তু বড় ঘটনা হল, সে একেবারেই ভেঙে পড়েনি! সত্যি কথা বলতে কী, এই মুহূর্তে তার এদিকে মন নেই। তার মন এখন ননদ এবং জায়ের সঙ্গে গল্প করায়। তিন বছরের জমে থাকা গল্প তো কম কিছু নয়। সম্ভবত বড় ধরনের কোনও পরচর্চা নিয়ে তারা এখন ব্যস্ত। নইলে তিনজনেই অমন হাসবে কেন?

অন্যদিকে বউমার শুটিং বাতিলের খবরে অর্ণবের বাবা ও মা দু'জনেই খুশি হয়েছেন। বুড়োবুড়ি দু'জনেই জানিয়েছেন, বড়ছেলের বাড়িতে ক'টা দিন অপেক্ষা করে যেতে তাঁদের তেমন কোনও অসুবিধে নেই। বিশেষ করে যখন তাঁদের থাকাটা দরকার। কথাটা জানানোর সময় তাঁরা দু'জনেই লজ্জা পেয়ে হেসেছেন।

বেলা অনেক হয়েছে। খালি শিশি কৌটোতে তেল, ডাল, গরম মশলা ভরা হয়ে গেলেও গোপালের মা এখনও বাড়ি যেতে পারেনি। পারবে কী করে? বলা নেই কওয়া নেই এতগুলো মানুষ হুট করে চলে এসেছে। খাওয়া-দাওয়ার একটা ব্যাপার আছে। তার একটা

দায়িত্ব আছে। এখন ফেলে যাওয়া যায়? তবে এরা সবাই মিলে যেরকম হাসাহাসি শুরু করেছে তাতে তার খানিকটা ভয়-ভয়ই করছে। দুপুরবেলা বাড়িসুদ্ধ লোকের হাসি ভাল জিনিস নয়। মাথা খারাপের লক্ষণ।

এবার বুলু আর অর্কও কোথায় যেন হেসে উঠল। শুধু হাসি নয়। হাসির সঙ্গে হাততালিও।

গোটা বাড়িটা ঝলমল করে উঠল হিরের মতো।

সুখী গৃহকোণ, আগস্ট ২০০৬

গুহা

১

রসময় সামন্ত ঢোঁক গিললেন। নিচু গলায় বললেন, 'মারাত্মক!'

বৃন্দাবন জ্বলজ্বলে চোখে বলল, 'হ্যাঁ স্যার, মারাত্মক। খুবই মারাত্মক!'

রসময় সামন্ত ভুরু কুঁচকে বললেন, 'ঘটনা সত্যি তো বৃন্দাবন? মিথ্যে বলছে না তো? দেখো বাপু আমার প্রেস্টিজের ব্যাপার কিন্তু।'

বৃন্দাবন টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে বলল, 'সত্যি স্যার। হান্ড্রেড ওয়ান পারসেন্ট সত্যি।'

রসময় সামন্তর চোখে মুখে চাপা উত্তেজনা।

'প্রথমে কুলি মজুর আর মাপজোকের লোকেরা দেখেছিল স্যার। তখন বিশ্বাস করিনি। আপনাকেও কিছু জানাইনি। গত মাসে ডেপুটি সেক্রেটারি সাহেব নিজের চোখে দেখে এসেছেন।'

রসময় সামন্ত গম্ভীর গলায় বললেন, 'চোখে দেখে এলে হবে না। সরকারি কাজে চোখের কোনও দাম নেই। ফাইলের দাম আছে। ফাইল হয়েছে?'

বৃন্দাবন বলল, 'হয়েছে স্যার, এই যে স্যার।'

বৃন্দাবন ফাইল এগিয়ে ধরল। সবুজ রঙের ফাইল। কালো দড়ি দিয়ে বাঁধা। ফাইলের গায়ে লেখা 'মোস্ট কনফিডেনশিয়াল'। রসময় খুশি হলেন। 'মোস্ট কনফিডেনশিয়াল' লেখা সহজ কথা নয়। সরকারি কাজ এমনিতেই গোপনীয়। তারপরেও যখন 'অতি গোপনীয়' লেখা হয় তখন বুঝতে হবে বিষয় খুবই সিরিয়াস। তিনি হাত বাড়িয়ে ফাইল নিলেন। তারপর বললেন, 'মোট ক'টা পাওয়া গেছে?'

'তেইশটা স্যার। ছোট-বড় মিলিয়ে তেইশটা।'

'মাঝারি নেই?'

'আছে স্যার, ফাইলে ফোটোগ্রাফও আছে। আমাদের ডেপুটি সেক্রেটারি সাহেব করিতকর্মা মানুষ। তিনি নিজে ক্যামেরা নিয়ে গিয়েছিলেন।'

কথা শেষ করে বৃন্দাবন দাঁত বের করে হাসল। রসময় সামন্ত ফাইলের দড়ি খুলতে খুলতে বললেন, 'দরজার বাইরে আলো জ্বালানো আছে বৃন্দাবন? কেউ ঢুকে পড়বে না তো?'

বৃন্দাবন বলল, 'আছে স্যার, তার ওপর দিপুকেও বসিয়ে রেখেছি।'

রসময় বললেন, 'গুড।'

প্রথমদিন অফিসে এসেই রসময়বাবু তাঁর পার্সোনাল সেক্রেটারি বৃন্দাবনকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন, 'বৃন্দাবন, এই ঘরে লাল আলোর ব্যবস্থা কেমন?'

লাল আলো! কথাটা বুঝতে বৃন্দাবনের সময় লাগে। সে থতমত খেয়ে যায়। সে ভেবে রেখেছিল মন্ত্রী প্রথমদিন ফাইল, ডিকটেশন, বাজেট প্রভিশন, অ্যাটেনডেন্স, সারপ্রাইজ ভিজিট জাতীয় কঠিন এবং অস্বস্তিকর প্রশ্ন করবে। তার বদলে লাল আলো! একটু পরে বুঝতে পেরে লাফিয়ে ওঠে বৃন্দাবন।

'আছে স্যার, আলবাত আছে। থাকবে না কেন? তবে স্যার...।'

'তবে কী?' রসময় সামন্ত চোখ তুলে তাকালেন।

বৃন্দাবন মাথা চুলকে বলল, 'স্যার বাল্‌বটা কাটা। আগের মিনিস্টার জ্বালাতেন না। কখন যে বাল্‌ব কেটে বসে আছে বুঝতে পারিনি। কালই স্যার বদলানোর ব্যবস্থা করব।'

রসময়বাবু চাপা গলায় বললেন,'কাল নয়, আজ। আজ এখনই। আর মনে রাখবে আমি যতক্ষণ ঘরে থাকব, ওই আলো জ্বলবে। সবাই জানবে মিনিস্টার বিজি। বুঝতে পারলে?'

বৃন্দাবন বুঝতে পারে না। তবু সে ঘাড় নাড়ে। সে জানে সব জিনিস তার বোঝার নয়। মন্ত্রী চেয়েছেন এটাই যথেষ্ট। তিনি যদি একটার বদলে একশো আলো জ্বালতে চাইতেন সেটাই হত। ঘরের সামনে আলোর মালা ঝুলত।

'স্যার, নেমপ্লেটটা কেমন হবে যদি বলে দিতেন। কাঠের করব? নাকি মেটাল? আমার মনে হয় কাঠই ভাল। কাঠ মাটি খড়ে একটা গ্রাম বাংলা, গ্রাম বাংলা ব্যাপার থাকে। কাঠের গায়ে নাম থাকবে। নামের নীচে ডিপার্টমেন্ট।'

রসময় সামন্ত কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন। গদি মোড়া চেয়ারে হেলান দিলেন। চেয়ারে অসুবিধে আছে। একটু একটু দোলেও। দোলা জিনিস ভাল নয়, হড়কে যাওয়ার চান্স থাকে। ছোটবেলায় একবার দোলনা হড়কে পড়ে গিয়েছিলেন। সেই থেকে ভয়। চেয়ারের হাতল শক্ত করে ধরে বললেন, 'দেখো বৃন্দাবন, তুমি আমার পার্সোনাল লোক। নিয়মমতো তোমাকে সবই বলার কথা। পার্সোনাল লোকের কাছে লজ্জার কিছু নেই। দপ্তরের নাম শুনেই নিশ্চয় বুঝতে পারছ দপ্তর ভাল নয়। অতি ফালতু। নাম উচ্চারণেই দাঁত ভেঙে যাওয়ার জোগাড়। তুমি কি একবারে নামটা বলতে পারবে?'

বৃন্দাবন আমতা আমতা করে বলল, 'একবারে পারব না। এখনও সড়গড় হয়নি স্যার। কাগজ দেখে বলব?'

বৃন্দাবন পকেট থেকে চিরকুট বের করল।

মন্ত্রী বললেন, 'থাক, বাড়িতে গিয়ে মুখস্থ কোরো। আমি বলছি। দপ্তরের নাম হল, রুক্ষ পার্বত্য অঞ্চলের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা। ভাল দপ্তরের জন্য ক্যাচ ধরেছিলাম। ক্যাচ কাজ করেনি। সব দপ্তর বিলি বণ্টনের পর, আমার জন্য এই অদ্ভুত জিনিস বানানো হয়েছে। রুক্ষ পার্বত্য অঞ্চলের আবার সম্ভাবনা কীসের? কোনও সম্ভাবনা নেই। সুতরাং আমারও কোনও সম্ভাবনা নেই।'

কথা শেষ করে মন্ত্রী সুন্দর করে হাসলেন। বললেন, 'তবে কী জানো, মন্ত্রীই আসল,

ডিপার্টমেন্ট নয়। সুতরাং নেমপ্লেটে শুধু আমার নাম দাও। দপ্তরের কথা বলে লোককে ঘাবড়ে দিয়ে কাজ নেই।'

বৃন্দাবন বড় করে ঘাড় কাত করল। সুন্দর করে হাসল। মন্ত্রী হাসলেন তাই হাসল। এটাই নিয়ম। মন্ত্রী যদি কাঁদতেন তা হলে তাকেও কাঁদতে হত।

নেমপ্লেট হল, প্যাড হল, রবার স্ট্যাম্প হল। কিন্তু দপ্তরে কোনও কাজ হল না। মন্ত্রী আসেন, যান। লাঞ্চ সারেন, টিফিন করেন। চা খান, সিগারেট টানেন। ঘরের বাইরে লাল আলো জ্বলে। জ্বলতেই থাকে।

একদিন বৃন্দাবনকে ঘরে ডেকে মন্ত্রী বললেন, 'আচ্ছা বৃন্দাবন, এই জিনিস কোথায় পাওয়া যায়?'

'কোন জিনিস স্যার?'

'এই যে রুক্ষ পর্বত না কী যেন, ছাইয়ের মাথা, কোথায় পাওয়া যায় জানো?'

বৃন্দাবন মাথা চুলকে বলল, 'স্যার, আমি একটা অন্যায় করেছি। আপনাকে না বলেই জেলায় জেলায় রুক্ষ পর্বতের সন্ধানে অফিসার পাঠিয়ে দিয়েছি স্যার। সঙ্গে পাহাড় মাপার লোক। যতই হোক দপ্তরের সম্পত্তি, কাজকর্ম না হোক, একটা হিসেব তো রাখতে হবে। নিজেদের কাছে নিজেদের সম্পত্তির হিসেব নেই, এটা ভাল দেখায়?'

রসময়বাবু খুশি হলেন। বললেন, 'গুড, ভেরি গুড। হিসেব কবে আসবে?'

'দ্রুত আসতে শুরু করবে স্যার। কাল পরশু না হোক এক সপ্তাহের মধ্যেই অনেকটা পিকচার পাওয়া যাবে।'

হিসেব দ্রুত এল। আর তখনই জানা গেল এই মারাত্মক তথ্য! যাকে বলে রোমহর্ষক! বৃন্দাবন তার 'স্যার'-এর জন্য সেই রোমহর্ষক তথ্য ফাইল বন্দি করে নিয়ে এসেছে।

তিন জেলার সীমান্তে, বিস্তৃত রুক্ষ পর্বতমালায় সরকারি অফিসার আর পাহাড় মাপার লোকজন গুহার সন্ধান পেয়েছে! একটা নয়, দুটো নয়, একেবারে তেইশ তেইশটা! গুহার বয়স বোঝা যাচ্ছে না, তবে প্রাচীন এটা বোঝা যাচ্ছে। গুহাগুলো এতদিন লুকিয়ে ছিল বুনো ঝোপের আড়ালে, পাথরের ফাঁকে, ঝরনার পাশে! কোনওটার মুখ চওড়া, কোনওটা সরু। কোনওটা চলে গেছে অনেকখানি, পাহাড়ের পেট ফুঁড়ে! গুহাগুলোয় পৌঁছোতে হয় পাথরের খাঁজে পা রেখে, শুকনো গাছের ডাল ধরে। সেই সময় পায়ের ধাক্কায় নুড়ি গড়িয়ে পড়ে। সুন্দর আওয়াজ হয়।

সবটাই ফাইলে নোট করা হয়েছে।

ফাইল দেখা হয়ে গেলে রসময় সামন্ত সোজা হয়ে বসলেন। তাঁর চোখের পাতা পড়ছে না, মণি স্থির। কপালে ভাঁজ।

'বৃন্দাবন, এ জিনিস কি আমাদের?'

বৃন্দাবন গলায় জোর এনে বলল, 'আলবাত আমাদের স্যার। থাউজেন্ড টাইম আমাদের। রুক্ষ পর্বত যখন আমাদের, তার গুহাও আমাদের। পাহাড়ের ভবিষ্যৎ যদি আমাদের হয়, অতীত কী দোষ করল? গুহা তো স্যার অতীত-ই।'

'এতদিন কেউ খোঁজ পায়নি কেন?'

বৃন্দাবন এর উত্তর ঠিক জানে না। সে আমতা আমতা করে খানিকটা দার্শনিক কায়দায় জবাব দিল, 'কত কিছুর খোঁজই তো আগে পাওয়া যায় না স্যার। হাজার হাজার বছর লুকিয়ে থাকে। এই তো স্যার কাগজে পড়লাম, আফ্রিকার কোথায় যেন মাটি খুঁড়ে ডায়নোসোরের হাড়...।'

বৃন্দাবনের কথার মাঝখানেই ডান হাত মুঠো করে রসময় সামন্ত টেবিলে হালকা ঘুসি মারলেন। দাঁতে দাঁত ঘষলেন। তারপর কিড়মিড় আওয়াজ তুলে বললেন বাছাধন, এবার দেখবে খেলা কাকে বলে। এতদিন এক কোণে পড়ে ছিলাম, এবার আমাকে নিয়ে টানাটানি হবে, মারামারি হবে। শালারা সবাই হাড়ে হাড়ে টের পাবে রুক্ষ পর্বতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কত প্রকার এবং কী কী। বৃন্দাবন, আমরা এই গুহা বেচব।'

'গুহা বেচব!'

বৃন্দাবন এতটাই চমকে যায় সে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। রসময় সামন্ত উত্তেজনায় ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলতে থাকেন। বলেন, 'হ্যাঁ বেচব। জমি, বাড়ি, জল জঙ্গল যদি বেচা যায়, তা হলে গুহা বেচা যাবে না কেন? আপত্তি কোথায়?'

বৃন্দাবন চেয়ারে ধপাস করে বসে পড়ে। বিড়বিড় করে বলে, 'আপত্তি নেই স্যার। কিন্তু গুহা কে কিনবে? এই যুগে গুহা কি বিক্রি হবে? এখন স্পেস টাইম। সবাই চাঁদে অথবা মঙ্গল গ্রহে জমি খুঁজছে। তার বদলে গুহা?'

রসময় সামন্ত চোখ পাকিয়ে বললেন, 'আমি মন্ত্রী না তুমি মন্ত্রী বৃন্দাবন? তর্ক না করে বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করো। নোট খাতা এনেছ? নোট খাতা না নিয়ে মন্ত্রীর ঘরে কেন ঢুকেছ? হা ডু ডু খেলতে?'

বৃন্দাবন দ্রুত ছুটে গিয়ে প্যাড এবং পেন নিয়ে আসে। রসময় সামন্ত কপালে হাত রেখে বিজ্ঞাপন ডিকটেশন দিতে থাকেন। মন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম তিনি ডিকটেশন দিচ্ছেন। গুহা বিক্রির ডিকটেশন। অনেক কাটাছেঁড়ার পর বিজ্ঞাপনের যে কপি তৈরি হল সেটা এরকম—

'আপনার ফ্ল্যাট আছে। বাগান ঘেরা বাংলো আছে। টাওয়ারে আছে ডুপলেক্স বা ট্রিপলেক্স। কিন্তু আপনার যা নেই তা হল একটা গুহা। গা ছমছমে গুহা। আধো অন্ধকার, আধো আলো। বুনো ফুলের গন্ধ, জ্যোৎস্না এবং সঙ্গে ঝরনা স্নান। আপনি যদি এরকম একটা গুহার মালিক হতে চান তা হলে এখনই আমাদের দপ্তরে লিখিত আবেদন করুন। মেলে জানান। গুহার নীচে পার্কিং স্পেসের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হচ্ছে। থাকছে লিফট। ইচ্ছে করলে দড়ি ধরে পাহাড়ে বেয়ে ওঠানামাও করা যাবে। টুয়েন্টি ফোর আওয়ার্স রক ক্লাইমবিং ট্রেনার থাকবে আপনার জন্য। হিল টপে হবে শপিং মল, রেস্তোরাঁ। পাহাড়ি ঝরনায় আপনার ছেলেমেয়েরা করবে ওয়াটার স্পোর্টস। গুহায় টেলিফোন, ইন্টারনেট, কেব্‌ল কানেকশনের জন্য স্যাটেলাইট যোগাযোগের ব্যবস্থা হবে। মনে রাখবেন, এই গুহা প্রকল্প কোনও ব্যাবসায়িক কারণে করা হচ্ছে না। এই প্রকল্প থেকে পাওয়া অর্থ রুক্ষ পর্বতমালার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার জন্য ব্যয় করা হবে। সুতরাং আর দেরি না করে...।'

রসময় সামন্ত উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কালই এই বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা করো

বৃন্দাবন। অফিসের পোস্টাল অ্যাড্রেস, মেল অ্যাড্রেস সব দেবে। ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইট আছে? না থাকলে আজকের মধ্যে রেডি করবে।'

'স্যার, অ্যাডভার্টাইসমেন্টে আপনার ছবি থাকবে? বড় প্রকল্পে যেমন থাকে না? স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা টুলু পাম্পের পাশে মন্ত্রীর ছবি থাকে না? দেব স্যার?'

রসময় শান্ত গলায় বললেন, 'না এখন নয়। ছবির সুযোগ অনেক আসবে। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি টিভি, রেডিয়ো, পত্রিকাওলারা আমার পিছনে দৌড়োচ্ছে। আমি পালাচ্ছি, আমি পালাচ্ছি...।'

২

রসময় সামন্ত চেয়ারে বসে একটু একটু দুলছেন। কদিন আগেও যে দুলুনিতে তিনি ভয় পাচ্ছিলেন, আজ তাতে আরাম লাগছে। তিনি চোখ বুজে আছেন। চোখ বোজা অবস্থাতেই কথা বলছেন। বড়মানুষদের মাঝেমধ্যে এরকম হয়। চোখ বুজে কথা বলতে ভাল লাগে। রসময় শুধু চোখ বোজেননি, তিনি হাসছেনও। গত কদিন হল তাঁর হাসি বেড়েছে। হয় মিটিমিটি হাসছেন, নয় জোরে হাসছেন। এখন তিনি মিটিমিটি হাসছেন।

উলটোদিকের চেয়ারে বসে থাকলেও বৃন্দাবন 'স্যার'-এর মুখ ভাল করে দেখতে পাচ্ছে না। দেখবে কী করে? টেবিলে স্তূপীকৃত খাম। গুহা কেনবার আবেদন। এই খাম বৃন্দাবন মন্ত্রীর টেবিলে রাখতে চায়নি। কিন্তু উপায় নেই। ঘরের দু'-দুটো আলমারি ভরে গেছে। একটা ট্রাঙ্ক জোগাড় করা হয়েছিল, সেটারও ঠাসাঠাসি অবস্থা। বৃন্দাবন বিরক্ত হয়ে ক'টা খাম মাটিতে ফেলে দিল। খামের থেকে মন্ত্রীর মুখ দেখা অনেক বেশি জরুরি।

'স্যার মোটে তো তেইশটা গুহা পাওয়া গেছে, অথচ অ্যাপ্লিকেশন পড়েছে হাজার হাজার। কী হবে? আমার চিন্তা হচ্ছে স্যার। রাতে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে। তেষ্টায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।'

রসময়বাবু ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসলেন। এই হাসি হল প্রশান্তির হাসি।

'তুমি চিন্তা কোরো না বৃন্দাবন, সব ঠিক হয়ে যাবে। এভরিথিং উইল বি অলরাইট। তোমার নামটা ভাল। বৃন্দাবন, মথুরা ধরনের নামের মধ্যে একটা ভক্তি ভক্তি ব্যাপার থাকে। আমার এক ভাইপোর নাম ছিল কাশী। সেই ছেলেও ভাল ছিল। একটু চোর টাইপ, কিন্তু বিনয়ী ছিল। আজকাল চোর গুন্ডা পাওয়া সহজ, বিনয়ী পাওয়া সহজ নয়। ওসব ছাড়ো, গুহা কাণ্ডে ডিপার্টমেন্টের নাম কেমন ছড়িয়েছে সেই কথাটা বলো?'

বৃন্দাবন শুকনো মুখে বলল, 'অ্যাটম বোমার মতো স্যার। গুহার জন্য পাবলিকের যে এত ক্রেজ হবে ভাবতেও পারিনি। মেলে মেলে কম্পিউটার বোঝাই হয়ে গেছে। সাইটে যেভাবে সবাই ঢুকতে চাইছে তাতে যে-কোনও সময় ক্র্যাশ করে যেতে পারে। আপনি স্যার ভবিষ্যৎদ্রষ্টা।'

রসময় হাসলেন। এবার তৃপ্তির হাসি। বললেন, 'শুধু পাবলিক? ভি. আই. পি-দের

কথাটা বলবে না? সকাল থেকে শুধু ফোন আর ফোন। দাদা, ভাই, বন্ধু বলে কান্নাকাটি। একটা লাগবে, লাগবেই লাগবে। লাইনে কে নেই? মন্ত্রী, আমলা, পুলিশ, ফিল্মস্টার, ইনটেলেকচুয়াল, ইউনিভার্সিটির প্রফেসর— সব্বাই। সবার মুখে একটাই কথা, গুহা চাই, গুহা চাই। হা হা...। এই তো মিস্টার ঘোড়েল ঢুনঢুনিয়া একটু আগে মোবাইলে ফোন করলেন। মিস্টার ঘোড়েলকে চেনো তো? ওই যে তোমাদের শিল্পপতি না কী বলে, সাত-সাতটা কারখানা ব্যাটার। আরও দুটো পাইপ লাইন আছে। আমাকে কী বলল জানো? বলল, গুহার খবর পেয়ে স্টেটস থেকে তার মেয়ে নাকি ফোন করেছিল। শি নিডস আ কেভ। ফার্নিশড কেভ। সামারে বন্ধুরা মিলে এখানে আসছে। সোজা গুহায় গিয়ে উঠবে। তারপর গোটা ছুটি জুড়ে গুহার গায়ে ছবি আঁকবে। গুহাচিত্র! হা হা...। ঘোড়েল তো ফোনেই আমার পা চেপে ধরে। দাদা, মেরে লিয়ে এক বুক কর দিজিয়ে। যিতনা প্রাইস...। আমি বললাম সরি মিস্টার ঘোড়েল। যা নিয়ম সবাইকে মেনে চলতে হবে। গুহার ক্ষেত্রে ধনী দরিদ্র সবাই সমান। শালা সেদিন পর্যন্ত চিনতে পারত না। দেখলে নাক সিঁটকাত আমি যে একজন মন্ত্রী, মানতই না। আর এখন? এখন পা ধরছে! শুধু কি এই বৃন্দাবন? আরও আছে।'

বৃন্দাবন মিথ্যে করে চোখ বড় বড় করল। বলল, 'আরও আছে স্যার?'

'বলছি কী, তোমার বউদির এক মামাতো না পিসতুতো ভাগনে হল গিয়ে তোমার বিরাট মাতব্বর। সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। নাম সান্টু না টান্টু। বছরে স্যালারি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ।'

বৃন্দাবন নড়ে চড়ে বসল। বলল, 'ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ! সেটা কী স্যার?

রসময় ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, 'দূর, অত কি আমি জানি? এখন তোমার ওই ওয়ান পয়েন্ট, টু পয়েন্টের সিস্টেম চলছে। যাক, সেই টান্টু তোমার বিয়ে করছে। পরশু ভাবী বউকে নিয়ে বিরাট গাড়ি চালিয়ে বাড়িতে এসে হাজির। গাড়ি নিজে চালাচ্ছে না, তার বউ চালাচ্ছে। এসে বলল, মামা, আমরা ঠিক করেছিলাম হানিমুনে হাওয়াই দ্বীপে যাব। এখন সেই পরিকল্পনা বাতিল আমাদের মধুচন্দ্রিমা হবে গুহায়। তুমি একটা হানিমুন গুহার ব্যবস্থা করে দাও। প্লিজ, প্লিজ, প্লিজ মামু। হারামজাদা এমন করে বলছে যেন ওরিজিনাল ভাগনে। মায়ের পেটের...।'

'আপনি কী বললেন স্যার?'

'কী আবার বলব? বললাম, টান্টু, তোমাদের মামা সব পারবে কিন্তু স্বজনপোষণ পারবে না। তার একটা নীতি আছে, আদর্শ আছে। গুহা বণ্টনের ক্ষেত্রেও সে সেই আদর্শচ্যুত হবে না...।'

বৃন্দাবনের হাসি পেল না, তবু সে হাসল। মন্ত্রী হাসছে, তার না হেসে উপায় নেই। হাসি থামিয়ে বলল, 'স্যার, এবার অ্যালটমেন্টের ব্যাপারটা যদি ঠিক করে ফেলেন। লটারি করব?'

মন্ত্রী কিছুক্ষণ হল চোখ খুলছেন। এবার দুলুনি থামালেন। সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, 'লটারি করব না, হরির লুট দেব সেটা পরে। আগে কোটা ঠিক করতে হবে।'

'কোটা!'

রসময় সামন্ত ধমক দেওয়ার গলায় বললেন, 'অবশ্যই কোটা। জমি বাড়ি গাড়ি চাকরি, সব কিছুর কোটা হয়, গুহার কেন কোটা হবে না? নাও লেখো। ভি আই পি কোটা, এন আর আই কোটা, পার্টি কোটা, অপজিশন কোটা, বিলো পভার্টি লাইন কোটা...।'

'বিলো পভার্টি লাইন কোটা!' বৃন্দাবন কলম থামিয়ে মুখ তোলে। বলে, 'স্যার, আপনি কি দরিদ্র মানুষের কথা বলছেন? দরিদ্র মানুষ গুহা কিনবে!'

রসময় সামন্ত আবেগঘন গলায় বলেন, 'কেন নয় বৃন্দাবন? দরিদ্র মানুষ কি মানুষ নয়? আমি, তুমি গুহায় থাকতে পারি, ঘোড়েল পারে, টান্টু পারে। নেতা, মন্ত্রী, পুলিশ পারে, দরিদ্র মানুষ কেন পারবে না? ছি ছি। এই মনোভাব তোমার ঠিক নয়। ভেরি ব্যাড। ভেরি ভেরি ব্যাড।'

বৃন্দাবন কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'না না দামটা তো বেশি, তাই ভাবছিলাম...।'

রসময় বিরক্ত গলায় বললেন, 'বেশি তো কী হয়েছে? ওদের জন্য ইনস্টলমেন্টের ব্যবস্থা করো। সেরকম হলে সাবসিডি দাও।'

'স্যার, আপনি নিজের হাতে ক'টা রাখবেন না? ধরুন হুট বলতে কেউ চাইল। বলা তো যায় না কিছু।'

রসময় সামন্ত ঠোঁট ছড়িয়ে হাসলেন। তারপর দার্শনিক ভঙ্গিতে বললেন, 'আমি কে? কে আমি? কেউ নই রে পাগল, কেউ নই। আজ আছি কাল নেই, কাল আছি আজ নেই। আমার জন্য কিছু লাগবে না। তুমি শুধু একটা বড় দেখে সার্কিট হাউসের জন্য সরিয়ে রেখো। মাঝে মধ্যে যদি...'

বৃন্দাবন এবার প্রায় ভেঙে পড়ল।

'স্যার, এরপর তো হাতে রইল মাত্র কয়েকটা! অথচ এত অ্যাপ্লিকেশন...'

রুক্ষ পার্বত্য অঞ্চলের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা বিষয়ক মন্ত্রী কিছু বলতে যান, আর তখনই ইন্টারকম বেজে ওঠে। বাইরে দুটো টিভি চ্যানেলের লোকেরা অপেক্ষা করছে। মন্ত্রী ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। বৃন্দাবনের উদ্দেশে দ্রুত হাত নেড়ে বলেন, 'এখন ওসব বাদ দাও বৃন্দাবন, এখন বাদ দাও। কাল অফিসে এসে বাকিটা ফাইনাল করব। তোমার কাছে চিরুনি আছে?'

৩

আজও গদিচেয়ারে অল্প অল্প দুলছেন রসময় সামন্ত। তবে আজ আর তাঁর মুখ হাসি হাসি নয়। মুখ থমথমে। তিনি চেয়ে আছেন শূন্যের দিকে। সেই দৃষ্টিতে দুঃখ, হতাশা।

উলটোদিকে বসা বৃন্দাবনের মুখও ভেঙে পড়া টাইপ। সে মাথা চুলকে বলল, 'স্যার, কথাটা আমার জিজ্ঞেস করা উচিত নয়, তবু না করে পারছি না। স্যার এই নিষেধ কি চিফ মিনিস্টারের?'

রসময় কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'না।'

'তা হলে কি আপনার পার্টির লিডার?'

'না?'

বৃন্দাবন অবাক হয়ে বললে, 'তবে কি নিয়মকানুনে কোনও ঝামেলা হল?'

'না।'

বৃন্দাবন অধৈর্য হয়ে বলল, 'তা হলে? তা হলে এই সিদ্ধান্ত বদলের কারণ কী স্যার? এত ভাল একটা প্রজেক্ট। এত ভাবনা চিন্তা। অমন চমকে দেওয়া বিজ্ঞাপন। হাজার হাজার অ্যাপ্লিকেশন। দশ রকমের কোটা। তার ওপর আপনার টিভি ইন্টারভিউ। একেবারে মারকাটারি। তা হলে কেন পিছিয়ে এলেন স্যার।'

রসময় সামন্ত শান্ত গলায় বললেন, 'স্বপ্ন।'

'স্বপ্ন! স্যার স্বপ্নের জন্য এরকম একটা পরিকল্পনা বাতিল! এ আপনি কী বলছেন স্যার?' বৃন্দাবন হাসবার চেষ্টা করল।

রসময়বাবু এবার সোজা হয়ে বসলেন। টেবিলে ঢাকা দিয়ে রাখা গ্লাস তুলে লম্বা চুমুকে জল খেলেন। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছলেন। বললেন, 'হাসছ বৃন্দাবন। ওই স্বপ্ন দেখার পর আমি ঘামতে ঘামতে বিছানায় উঠে বসেছি। তুমি যদি দেখতে তা হলে তুমিও তাই করতে বৃন্দাবন। ঘুম ভেঙে ঘামতে ঘামতে বিছানায় উঠে বসতে। উফ্ কী ভয়ংকর!'

'স্বপ্নটা আপনি কবে দেখেছেন স্যার?'

'কাল রাতে। শেষ রাতেও হতে পারে। দুঃস্বপ্ন সাধারণত শেষ রাতের দিকেই দেখা যায়।'

বৃন্দাবন কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'স্যার, আমি কি স্বপ্নটা কেমন ছিল সেটা জানতে পারি?'

রসময় মুখটা ওপরে তুললেন। ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে অনেকটা আপনমনেই বলতে শুরু করলেন—

'গুহা গুহায় মানুষ। মহিলা, পুরুষ, শিশুদের হইচইতে পাহাড় একেবারে জমজমাট। কেউ গল্প করছে। কেউ বসে আছে ঝরনার পাশে। কেউ উঠছে পাহাড় বেয়ে। কারও কোলে ল্যাপটপ, কেউ কানে রেখেছে মোবাইল। পাথরের খাঁজে বসে বকবকানি চালাচ্ছে। কেউ আই পড হাতে বেঁধে পাহাড় বেয়ে উঠছে ওপরে।'

রসময় সামন্ত যেন চোখের সামনে স্বপ্নটা দেখতে পাচ্ছেন। সিনেমার মতো।

'হিল টপ রেস্তোরাঁ জমজমাট। বাইরে বারবিকিউ চলছে। লোহার শিকে মাংস নিয়ে পোড়ানো হচ্ছে। আগুন ঘিরে ছেলেমেয়েরা গান ধরছে। জংলি গান। সেই সঙ্গে কোমর দুলিয়ে নাচ। আর নীচে? পাহাড়ের নীচে একটার পর একটা গাড়ি এসে দাঁড়াচ্ছে। ঝাঁ চকচকে গাড়ি সব। পুরুষ মহিলারা নামছে জোড়ায় জোড়ায়, দল বেঁধে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে পাহাড়ে উৎসব শুরু হয়েছে, গুহা উৎসব।'

মন্ত্রীর সামনে হাত পা নেড়ে কথা বলা ঠিক নয়। বৃন্দাবন তবু হাত উলটে বিরক্ত গলায় বলল, 'এ তো দারুণ! চমৎকার! প্রজেক্ট একেবারে সুপার ডুপার সাকসেসফুল। আমি তো অসুবিধে কিছু দেখছি না। স্যার আপনি কী দেখলেন?'

রসময় সামন্ত মুখ নামালেন। পার্সোনাল সেক্রেটারির চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখলাম, সবাই উলঙ্গ! কয়েকজনের গায়ে সামান্য যেটুকু ছাল-বাকলের আবরণ রয়েছে সেটুকুও না থাকার মতো। পুরুষ নারী সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছে উদোম হয়ে। হাসছে, খেলছে, কথা বলছে, কাজ করছে স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। শুধু গায়ে কিছু নেই। আদিম গুহামানবের মতো তাদের বড় বড় চুল, গোঁফ দাড়ি। মেয়েদের নগ্ন শরীরে হাড়ের গয়না, পুরুষদের সঙ্গে পাথরের অস্ত্র।'

বৃন্দাবনের চোখ বড় বড় হয়ে গেছে। সে ফিসফিস করে বলল, 'তারপর?'

রসময় এতক্ষণ পর হাসলেন। শুকনো হাসি।

'তারপরটা আসল ভয়ংকর। হঠাৎ দেখি একটা গাড়ি আসছে পাহাড়ের উঁচুনিচু রাস্তা বেয়ে। এসে দাঁড়ায় বড় গুহাটার সামনে। গাড়ি চেনা লাগে। স্বপ্নের মধ্যেই আমি একটা পাথরের আড়ালে সরে যাই দ্রুত। সেখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাই, গাড়ির দরজা খুলে নেমে আসছি আমি। আমিও পোশাকহীন! উলঙ্গ। এরপরেই আমার ঘুম ভেঙে যায়। তখন ঘামে বালিশ বিছানা ভিজে গেছে।'

বেশ অনেকটা সময় মাথা নামিয়ে চুপ করে বসে থাকে বৃন্দাবন। তার মুখ তুলতে লজ্জা করে। যেন স্বপ্ন তার 'স্যার' দেখেনি, সে দেখেছে। একটা সময় মাথা নামিয়েই বলে, 'স্যার গুহাগুলোর কী হবে?'

রসময় সামন্ত অল্প হেসে বলেন, 'ওরা ওদের মতোই থাক। যেমন ছিল। তুমি বরং ঘরের বাইরে লাল আলোটা নিভিয়ে দাও বৃন্দাবন।'

আমার সময়, এপ্রিল ২০০৮

পোস্টম্যান

আমি মুখ তুলে লোকটার দিকে তাকালাম। চেহারার মধ্যে আলাদা কিছু নেই। পাড়াগাঁ থেকে কাজ করতে আসা আর পাঁচটা মুটে মজুরের মতো সাধারণ। বরং একটু বেশি রোগাভোগা আর চিমসে মার্কা। কাদা মাখা গেঞ্জিটা গায়ের কালো রঙের সঙ্গে মিশে আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হবে, এখনই গর্ত থেকে উঠে এল।

লোকটা কি কুঁজো? নাকি এমনি-ই কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? গ্রামের গরিব মানুষগুলোর এই এক অসুখ। শহরে এসে কুঁজো হয়ে যায়।

কানাইলাল বলল, 'স্যার, এই সেই লোক।'

আমি জানি এই সেই লোক, তবু না বোঝার ভান করে ভুরু কুঁচকে বললাম, 'কে? কোন লোক?'

কানাইলাল হাসি হাসি মুখে বলল, 'ওই যে স্যার, ওদের সঙ্গে খবর দেয়া-নেয়া করে।'

আমি বললাম, 'ও, হ্যাঁ এবার মনে পড়েছে।'

কথাটা মিথ্যে। মনে পড়েছে অনেক আগেই। গতকাল দুপুরে কানাইলাল যখন আমার কাছে গল্প করে, তখন থেকেই এই লোকের কথা আমার মাথায় ঘুরছে। কিন্তু সেকথা বলা যাবে না। বললে উদ্ভট জিনিসে গুরুত্ব দেওয়া হবে যাবে। কথাটা ছড়িয়ে যাবে। সবাই ভাববে আমিও ভুতুড়ে কাণ্ডে বিশ্বাস করে বসেছি। নইলে এত আগ্রহ কীসের?

বিশ্বাসের কোনও প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু আগ্রহ যে আমার একটা হয়েছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সামান্য একটা লেবার এরকম কথা বলে বেড়ালে আগ্রহ না হয়ে উপায় কী? আমি ঠিক করেছি, এই লোককে ডেকে জোর ধমক দেব। কাজের জায়গায় এসব জিনিস ঠিক নয়। ঘটনাটা শোনার পর থেকেই আমি চিন্তায় পড়েছি। কাল বাড়িতে ফিরে রত্নাকেও বললাম।

'বলো কী!' রত্না খাওয়া থামিয়ে দিল।

'আমি কিছু বলছি না, কানাই বলছিল। কানাইলাল, আমাদের সাপ্লায়ার। লেবার সাপ্লাই করে।'

'তুমি ওই লোকটাকে দেখেছ?'

আমি মাথার কাছে হাত ঘুরিয়ে বললাম, 'এখনও দেখিনি, নিশ্চয়ই মাথায় ক্র্যাক আছে।'

রত্না বলল, 'পাগল?'

আমি চোখ বড় করে বললাম, 'তা ছাড়া কী? পাগল না হলে কেউ এরকম কথা বলে? আর একটা জিনিসও হতে পারে।'

রত্না মুখের কাছে রুটি তুলে বলল, 'সেটা কী?'

আমি ভাত খেলেও রত্না রাতে রুটি খায়। ডায়েট করে। ও মোটা নয়, তবু সারাক্ষণ ভয় পায়, এই বুঝি পেটে চর্বি জমে গেল। খাওয়া কন্ট্রোলে রাখে। আমিও রুটির চেষ্টা করেছি, সহ্য হয়নি। গ্যাসের সমস্যায় রাতে ঘুম ভেঙে যায়। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে আবার ভাতে ফিরেছি। আমি ভেতো বাঙালিই ভাল।

'হতে পারে লোকটা পাজি। ভূতপ্রেতের কথা ছড়িয়ে পয়সা কামানোর ধান্দা করছে। লোকটাকে দেখলে বুঝতে পারব।'

রত্না চেয়ারটা টেনে আমার দিকে একটু সরে এল। ফিসফিস করে বলল, 'ও বাবা, ওই লোককে তুমি দেখবে!'

স্ত্রীর ভয় দেখে আমি হেসে ফেললাম। ভুরু তুলে বললাম, 'ওমা দেখব না? হাতের কাছে এমন একটা মানুষ পেয়েছি, না দেখে ছেড়ে দেব? চাইলে তুমিও দেখতে পারো। ডাকব একদিন বাড়িতে?'

'ওরে বাবাঃ। আমার দরকার নেই।'

আমি আরও জোরে হেসে উঠলাম। তবে মনের ভেতর দুশ্চিন্তাটা চেপে বসল। লোকটা এসব বলছে কেন? পয়সাকড়ির বিষয়টা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গরিব মানুষ রোজগারের জন্য কতরকম ফন্দি ফিকির বানায়। তবে এই লোকের ফন্দিটা একটু অন্যরকম। কানাইলালকে কাল জিজ্ঞেসও করেছি।

'এসব রটিয়ে ওই লোক কি টাকাপয়সা কামাতে চায়?'

কানাইলাল মাথা চুলকে বলল, 'না, স্যার সেরকম তো শুনিনি।'

'তা হলে!' আমি খানিকটা অবাক হই।

'মনে হয় মজা করে।' কানাইলাল হাসল।

'এটা একটা মজা করার মতো জিনিস? মৃত মানুষকে নিয়ে ঠাট্টা!'

কানাইলাল একটু চুপ করে থেকে বলে, 'দু'-একজন লেবার একটু ভয় পেয়েছে।'

আমি চেয়ার ঠেলে সোজা হয়ে বসলাম। কানাইলালের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'সে আবার কী? ভয় পেয়েছে! এরকম একটা পাগলামির কথা শুনে ভয় পেয়েছে!'

কানাই হাসল। বলল, 'মুখ্যু সুখ্যু লেবার। একই সঙ্গে মজা পায়, আবার ভয়ও পায়। গরিব মানুষের কাছে ভয়টাও একটা মজার মতো।'

আমি নড়েচড়ে বসলাম। কাজের জায়গায় এটা তো ঠিক নয়। দু'-একটা হাসি মশকরা হতে পারে, কিন্তু সিরিয়াস জিনিস কেন হবে? আমি মাথা নেড়ে গম্ভীর গলায় বললাম, 'না না কানাই, এটা ঠিক নয়।'

'ভয় পেলে কী করব? ছেলেমানুষ তো কেউ নয়। মুশকো জওয়ান সব মজুর।'

আমি বিরক্ত হলাম। বললাম, 'কী আবার করবে, ডেকে ধমক দেবে। যে ভয় দেখাচ্ছে, তাকে ডেকে ধমক দেবে। শুধু তাই নয়, যারা ভয় পাচ্ছে তাদেরও বলতে হবে। এটা একটা ভয় পাওয়ার মতো জায়গা হল? রাজারহাট তোমাদের গা ছমছমে পাড়াগাঁ নাকি যে, বাঁশবনে ভূত আসবে? এসব একদম বরদাস্ত করবে না কানাই। কোম্পানির বদনাম হয়ে

যাবে। ঠিক আছে তোমাকে কিছু বলতে হবে না, কালই তোমার এই লোকটাকে আমার কাছে ধরে আনবে। যা বলার আমিই বলব।'

কানাইলাল মাথা নামিয়ে বলল, 'তাই করব স্যার। আপনার কাছে ধরে আনব।'

আমাদের প্রজেক্ট চলছে রাজারহাটে। রাজারহাটে এখন যা হচ্ছে সম্ভবত তাকেই বলে কর্মযজ্ঞ। চারপাশে তৈরি হচ্ছে উঁচু উঁচু বাড়ি, ঝাঁ চকচকে রাস্তা, শপিং মল, বাস টার্মিনাস। তবে আমাদের দিকটা এখনও ফাঁকা ফাঁকা। মানুষের যাতায়াত বলতে শুধু মিস্ত্রি মজুর। মাটি, বালি, ইট বোঝাই লরি ধুলো উড়িয়ে হেলেদুলে ছুটছে মাঠের ভেতর দিয়ে। আমার কোম্পানির অফিস হবে বত্রিশ তলা। আই টি পার্ক। শুনেছি, বারোতলার পর পুরোটা শুধু কাচ। দেয়াল, ছাদ, মেঝে সব কাচের। হলে একটা দেখার মতো জিনিস হবে। তবে এখন সবে জমি টিন দিয়ে ঘিরে মাটি কাটার কাজ শুরু হয়েছে। আমি হলাম সেই মাটি কাটার সুপারভাইজার। কাজ হিসেবে খুবই সামান্য। রত্না অবশ্য বলে বেড়ায় তার স্বামী আই টি সেক্টরে কাজ করছে। আমি রাগ করি। কঠিন রাগ নয়, হালকা রাগ। কথাটা একেবারে মিথ্যে তো নয়। কাজ যা-ই হোক, জায়গাটা তো...। কোম্পানি আমার জন্য ব্যবস্থা খারাপ করেনি। ইটের গাঁথনি আর অ্যাসবেস্টসের চাল দিয়ে সাইট অফিস বানিয়ে দিয়েছে। অফিসের জানলা দরজায় পরদা। কম্পিউটারও দিয়েছে। তাতে হিসেব থাকে। মাটি কাটার হিসেব। কতটা মাটি উঠল, কাজ করছে ক'টা মেশিন, ক'জন মজুর লেগেছে— এইসব।

কানাইলাল হল আমাদের লেবার কন্ট্রাক্টর। অন্য মজুর নয়, শুধু মাটি কাটার মজুর সাপ্লাই করে। আশ্চর্যের বিষয় হল, এ বিষয়ে তার একটা কোম্পানিও আছে! নাম 'সয়েল অ্যান্ড কয়েল।' আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'এ আবার কীরকম নাম! সয়েল তো বুঝলাম, কয়েলটা কী?' কানাইলাল লজ্জা লজ্জা গলায় বলল, 'কোনও মানে নেই, এমনি দিয়েছি। সয়েলের সঙ্গে মিলিয়ে কয়েল। আজকাল জমি মাটির কারবারে সাহেবসুবো লোক আসে স্যার। একটা ইংলিশ নাম লাগে। নইলে ইজ্জত পাওয়া যায় না।'

নাম যা-ই হোক। সস্তায় মজুর সাপ্লাইতে কানাইলাল ইতিমধ্যেই নাম করেছে। এই লাইনে সকলেই মোটামুটি জানে, 'সয়েল অ্যান্ড কয়েল' থেকে লোক নিলে ঝুট ঝামেলা নেই।

শুধু এই ঝামেলাটা হল। একে কি ঝামেলা বলব?

গতকাল দুপুরে টিফিনের পর সাইটে চক্কর মারলাম। এই সময়টা কাজে একটা ভাঁটা পড়ে। লেবাররা কোদাল ঝুড়ি ফেলে খানিকক্ষণ গা ছেড়ে দেয়। একবার নিজে না ঘুরে দেখলে মুশকিল। শুধু কাজের জায়গা নয়, যে পাশটায় মিস্ত্রি মজুরদের থাকবার ছাউনি হয়েছে সেদিকটাও যেতে হয়। আয়োজন ছোট নয়, প্রায় শ'খানেক লোকের রাতদিন থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা। অফিসে ফেরার সময় কানাইলালকে ডেকে নিলাম। হেড অফিসে রিপোর্ট দিতে হবে। কতটা কাজ এগোল তাই নিয়ে রিপোর্ট। প্রতি সোমবার করে মাটি কাটার রিপোর্ট নিয়ে আমি কলকাতায় হেড অফিসে যাই। এখান থেকে দুর কম নয়! বড় রাস্তাতে পৌঁছোতে মাঠ, জল, কাদা মাড়াতে হয়।

কানাইলালের সঙ্গে কথা বলে সন্তুষ্ট হলাম। কাজ ভালই এগোচ্ছে।

'তোমার লেবাররা এবার ভালই দেখছি কানাই। ফাঁকি টাকি মারে না। বর্ধমানের কাজটার সময় খুব ভুগিয়েছিল।'

কানাইলাল গদগদ ভঙ্গিতে বলল, 'ফাঁকিবাজগুলোকে সব তাড়িয়েছি স্যার। এই লট একেবারে এক্সপোর্ট কোয়ালিটি।'

আমি টেবিলের কাগজপত্র গোছাতে গোছাতে বললাম, 'ওরা বলে কী? পেমেন্টে খুশি তো?'

কানাইলাল হেসে বলল, 'খুশি না হয়ে উপায় আছে? আপনার এখানে তো পাওনা বাকি কিছু থাকে না। সব একেবারে কারেন্ট। এদিকে স্যার এখানে একটা মজার কাণ্ড হয়েছে।'

'মজা!' আমি মুখ তুললাম।

কানাইলাল হাসিমুখেই রয়েছে। বলল, 'হ্যাঁ স্যার, আমার এক লেবার অদ্ভুত কথা বলছে। ভুতের কথা।'

'ভুতের কথা! সে আবার কী!'

কানাইলাল ঘাড় ঘুরিয়ে একবার পিছনে দরজার দিকে তাকাল, তারপর গলা নামিয়ে বলল, 'বলছে, সে নাকি মরা মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে।'

আমি ফাইল হাতে থমকে দাঁড়ালাম। ঠিক শুনলাম তো। কানাইলাল বলছেটা কী!

'কী! কী করতে পারে বললে?'

কানাইলাল দাঁত বের করে হাসল। বলল, 'মরে যাওয়া মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে। কিছু খবর টবর দেওয়ার থাকলে পৌঁছে দেয় আবার নিয়েও আসে। এই যেমন এখানকার আত্মীয়স্বজন কেমন আছে। ওদিককার খবরই বা কীরকম— এইসব। পোস্টম্যানের মতো।'

কথা শেষ করে 'খ্যাঁক খ্যাঁক' আওয়াজ করে হাসল কানাইলাল।

আমি ধমক দিয়ে বললাম, 'কী যা-তা বলছ? পাগল টাগল জোটালে নাকি?'

কানাই চেয়ারে হাত রেখে বলল, 'তাই হবে স্যার। পাগলই হবে। লোকটা এবারই প্রথম আমার এখানে কাজ করছে। মতিমতি এনেছে ওকে।'

'মতিমতিটা আবার কে?'

'মতিমতি মাঝেমধ্যে গ্রাম দেশ থেকে আমার জন্য লোক ধরে আনে। এই পাগলটা ওর শ্বশুরবাড়ির দিকে কোথায় থাকত। গত মাসে নিয়ে এল। বলল, ছেলেরা বুড়োকে বাড়ি থেকে বিদায় করেছে। কাজ পেলে খায়, নইলে চেয়েচিন্তে চলে। কাজ না দিলে মরে যাবে। বললাম, থাকুক। মাটি কাটতে তো বিরাট পণ্ডিত লাগবে না। এখন শুনেছি, এই কাণ্ড। তাও দু'দিন আগে শুনলাম, বেটা নাকি কয়েকজনকে ওই কথা বলেছে।'

আমি আবার চেয়ারে বসে পড়লাম।

'কী বলেছে?'

'বলেছে, তোমাদের যদি খবর টবর দেওয়ার থাকে বলোখন, অসুবিধে কিছু নাই। একজন নাকি তার শালাকে খবর পাঠিয়েছে। শালা গত বছর সাপের কামড়ে মরেছিল।'

আমি বুঝতে পারছি, আমার চোখ স্থির। পাতা কি পড়ছে? মনে হয় না পড়ছে। বিড়বিড় করে বললাম, 'কী খবর?'

কানাইলাল ছোপ ধরা দাঁত বের করে বলল, 'বাড়ি ঘরের খবর। চালা নাকি ভেঙে গিয়েছে। মরা শালার কাছ থেকে ঘর সারানোর পারমিশান নিয়েছে বেটা।'

কথাটা বলে আবার খানিকটা হাসল কানাই। তারপর বলল, 'ওই হারামজাদার দেখাদেখি, আরও দু'-একটা খেপেছে। কে যেন তার বাপ কেমন আছে জানতে চায় শশধরের কাছে। সে বুড়ো মরেছে তেরো বচ্ছর হয়ে গেল।'

'শশধর! শশধরটা কে?'

'শশধর ওই লোকের নাম স্যার। গুপি নামের এক মজুর তো মারাত্মক কাণ্ড করেছে। ছেলের সঙ্গে কথা বলবে বলে একেবারে ঝুলোঝুলি। ছেলে কলেরা না আন্ত্রিকে মরেছিল সাত বছর বয়েসে। তাও বছর তিন-চার হয়ে গিয়েছে। বুঝুন কাণ্ড! তিন বছর আগের মরা ছেলের সঙ্গে কথা বলতে চাইছে! শশধর বলেছে, কথা বলাতে পারব না, আমি শুধু খবর দেয়া-নেয়া পারি। খবর থাকলে বলো।'

আমি কী বলব বুঝতে পারছিলাম না। তবে এটা বুঝতে পারছিলাম, এই জিনিস বন্ধ করতে হবে। গাঁজাখুরি গল্প খুব তাড়াতাড়ি ছড়ায়। এটাও ছড়াবে।

কানাইলাল বলল, 'তবে শুধু মজা নয়, লেবারদের মধ্যে কেউ কেউ ভয়ও পাচ্ছে।'

এরপরই আমি কানাইলালকে জানাই, ওই লোকের সঙ্গে আমি দেখা করব। নিজে ধমক দেব।

কাল সারাদিন মনের ভেতরটা খচখচ করেছে। হেড অফিসে রিপোর্ট বলার সময় উলটোপালটাও হয়ে গেল। বাড়িতে ফিরে রত্নাকে গল্পটা করলাম।

'বলো কী! লোকটা নিজেও ভূত নাকি?'

'ভূত না হলেও শয়তান তো বটেই। টাকা পয়সা না চাইলে বুঝতে হবে অন্য কোনও ফন্দি আছে। এরপর হয়তো দেখব সাইটের ওখানে ভূত নামানোর পুজো টুজো বসিয়ে দিয়েছে। এর বাবা, ওর শ্বশুর, মরা কাকা-জ্যাঠারা সব সেখানে ভিড় করেছে।'

রত্না বলল, 'ওরকম করে বোলো না, আমার কিন্তু ভয় ভয় করছে।'

আমি হেসে বললাম, 'প্রথমে ভেবেছিলাম, কানাইয়ের হাতেই ব্যাপারটা পুরো ছেড়ে দেব। তারপর ভেবে দেখলাম, সেটা ঠিক হবে না। কড়া কোনও স্টেপ নেওয়া দরকার।'

রত্না কাঁপা গলায় বলল, 'কী স্টেপ নেবে? যাই করো বাপু সাবধানে করবে। ওসব লোক তন্ত্র মন্ত্র জানতে পারে। শ্মশানে এরকম তান্ত্রিক থাকে শুনেছি। বইতেও পড়েছি। মরা মানুষের খুলির সঙ্গে কথা বলে।'

আমি সামান্য হেসে বললাম, 'আমার ওটা শ্মশান নয় রত্না, প্রথমে ওয়ার্নিং দেব, তাতেও যদি কাজ না দেয়, দূর করে দেব। আজকাল তাড়ানো খুব সহজ ব্যাপার। বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার, ম্যানেজারকে আজকাল ফুৎকারে তাড়িয়ে দেওয়া যায়, একটা সামান্য মজুরকে তো তুড়ি দিলেই হবে।'

কানাইলাল সেই লোককেই এখন এনেছে। কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে।

নাম জানি তবু জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার নাম কী?' একটা কিছু দিয়ে তো কথা শুরু করতে হবে।

লোকটা চুপ করে রইল। কানাইলাল ধমক মেরে বলল, 'কী রে নাম বল, চুপ করে আছিস কেন? বল নাম।'

'শশধর হুজুর।' লোকটা জড়ানো গলায় বলল, মদ টদ খায় নাকি?

কানাইলাল দাঁত খিঁচুনি দিয়ে বলল, 'পষ্ট করে বল।'

আমি হাত তুলে বললাম, 'তুমি চুপ করো কানাই, ওকে বলতে দাও।' তারপর সহজ গলায় বললাম, 'শশধর, তুমি মাটি কাটো?'

'হ্যাঁ হুজুর কাটি, তবে সবসময় পারি না।'

খেয়াল করে দেখলাম লোকটার চোয়াড়ে মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়িও আছে। বয়স একেবারে কম নয়। চাউনির মধ্যে একটা ফ্যালফ্যালে ভাব। একেই কি ইংরিজেতে বলে ভেকেন্ট লুক?'

'হুজুর বাঁ হাতের এইখানটা ভেঙেছিল, তারপর থেকে অনেকক্ষণ কোদাল ধরলে ব্যথা পাই।'

শুধু পাগল নয়, লোকটা অকর্মণ্যও বটে। কানাই এটাকে জোটাল কেন কে জানে? এর সঙ্গে বেশি বকবক না করে সরাসরি আসল কথাতেই যাওয়া ভাল।

'শশধর তোমার নামে যা শুনেছি সেটা কি সত্যি; তুমি কি সত্যি মৃত মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো?'

শশধর চুপ করে রইল। ভেবেছিলাম, লোকটা লজ্জায় মাথা নামিয়ে ফেলবে। অন্যায় কাজ ধরা পড়ে যাওয়ার পর সাধারণত সবাই যা করে। এও সেরকম কিছু করল না। একই ভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কানাইলাল ফিসফিস করে বলল, 'কী রে বল? স্যার যা জিজ্ঞেস করছে জবাব দিবি তো।'

আমি আবার হাত তুলে কানাইলালকে থামালাম। নরম গলায় বললাম, 'কথাটা ঠিক?'

শশধর এবারও মুখে উত্তর দিল না। শুধু একপাশে ঘাড় নাড়ল। লোকটা বলে কী! পারে! আমি ভেবেছিলাম, এসব জিজ্ঞেস করলেই পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কাজ যাতে না যায় তার জন্য কান্নাকাটি জুড়ে দেবে। এ তো উলটো কাণ্ড। আমি নড়েচড়ে বসলাম। মজা পাচ্ছি। একটু হেসে বললাম, 'কীভাবে করো? নাম ধরে ডাকো? মনে মনে? নাকি রাতের বেলায় ফাঁকা মাঠে হাঁক দাও?'

শশধর আমার রসিকতা ধরতে পারল না। বিড়বিড় করে বলল, 'আমি মাটিতে বলি, ওরা শুনতে পায়।'

'মাটিতে বলো!' একটু চমকালাম কি?

'হ্যাঁ, যখন কাজ করি তখন বলি। বলতে বলতে একসময় সাড়া পাই। মাটি দিয়ে কাজ করি তো, তাই মাটি দিয়ে ডাকি।'

লোকটা সত্যি উন্মাদ। আমি কানাইলালের মুখের দিকে তাকালাম। তার ভুরু কোঁচকানো। মুখে টেপা হাসি। ভাবটা এমন— দেখলেন তো স্যার, বলেছিলাম কি না? এখন কী করা উচিত। জোর এক ধমক দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিই?'

ঠান্ডা গলায় বললাম, 'কীভাবে ডাকো? তোমার আশেপাশে যারা কাজ করে, তারা শুনতে পায়?'

'না পায় না। আপনে ধরেন কাউরে কিছু জানাতে চান, আমারে নামটা আর খবরটা বললেন, আমি তারে ডেকে চুপিচুপি কথাটা বলে দিই।'

'বলে দাও! ডেডম্যান, মানে মরা মানুষকে তুমি দেখতে পাও শশধর?'

'না পাই না, বুঝতে পারি। এলে মাটিতে কাঁপুনি লাগে। জোরে নয়, অতি সামান্য কাঁপুনি। ওই কাঁপুনির মধ্যে গলাও শুনতে পাই।'

কানাইলাল আর পারে না। ডান হাতটা তুলে বলে 'চোপ, একদম চোপ হতভাগা। গপ্প বানানোর জায়গা পাওনি। ইঃ কাঁপুনি লাগে! ফাজিলটার কানের গোড়ায় দেব এক ঘা।'

আমি কানাইলালের ধমকে গুরুত্ব দিলাম না। বুঝতে পারছি, কথা বেশি হয়ে যাচ্ছে। বেশি কথা মানে মানসিক রোগগ্রস্ত এই মানুষটাকে আশকারা দেওয়া। সেটা ঠিক নয়। আমার উচিত এখনই এই লোকের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করা। একজন সামান্য মজুরের সঙ্গে ভূত বিষয়ক দীর্ঘ আলোচনা চলতে পারে না।

কিন্তু থামতে পারছি না। এতক্ষণ যে ঘটনা শুধু আগ্রহ তৈরি করেছিল, মজা দিচ্ছিল, সেটাই ক্রমশ আমার ভেতরে কেমন যেন দাঁত নখ বের করে চেপে বসছে!

'মরা মানুষের সঙ্গে কথা বলার ক্ষমতা তুমি কবে থেকে পেয়েছ শশধর? জন্ম থেকে?'

কানাইয়ের ধমকে এই লোকের চোখের চেহারা বদলেছে। এতক্ষণ ফ্যালফ্যালে ছিল, এবার খানিকটা ভয়ের ভাব এসেছে। বুকের কাছে হাতদুটো জড়সড় রেখে বলল, 'জানিনে হুজুর। আঞ্জু বুড়ির মেয়েকে খপর দিতে গিয়ে দেখলাম আমি কাজটা পারছি।'

'আঞ্জু বুড়ি! সে আবার কে?' আমি টেবিলের ওপর একটু ঝুঁকে পড়লাম।

'আমাদের গাঁয়ের মানুষ। একদিন বিকেলে দেখি পথের ধারে বসে হাঁপায়। বুকটা হাপরের মতো ওঠে আর নামে। ওঠে আর নামে। আমি বললুম, কী হল গো বুড়িমা? বুড়ি চোখ উলটে বললে, মেয়েটাকে একটা খপর দে বাবা, বল আমি আসছি। আমি খপর দিলুম, বুড়িও মরল সন্ধের পরপর।'

'খবর দিলে মানে? বাড়ি থেকে মেয়েকে ডেকে আনলে?'

'ডেকে আনব কী হুজুর, বুড়ির তো বাড়ি ঘর কিছু নাই। একটা মাত্র মেয়ে ছিল, সেও পাঁচ বছর আগে বাচ্চা হতে গিয়ে শ্বশুরবাড়িতে মরেছে। মুক্তি না লক্ষ্মী— কী যেন নাম ছিল তার। পথের ধারে বসে ওই মরা মেয়েকেই, খপর দিলুম।'

লোকটা বানাচ্ছে। গল্প বানাচ্ছে। কিন্তু বানানোর ক্ষমতাটাও দারুণ। গল্পটা থেকে চট করে বেরোতে পারা যায় না। আমাকেই ধরে ফেলেছে, মিস্ত্রি মজুরদের ধাঁধায় ফেলতে কতক্ষণ?

'কী খবর?'

কানাইলাল এবার এগিয়ে এসে শশধরের কাঁধে হাত রাখল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'ব্যস অনেক হয়েছে, অনেক হয়েছে, ভূত, পেতনি, ব্রহ্মদত্যি সব শুনলাম। এবার কাজে যাও তো বাপু, স্যারেরও কাজ আছে, নাকি সারাদিন তোমার বকককানি শুনলে হবে? যা ভাগ।'

মাঝপথে আটকাতে আমি বিরক্ত হলাম। কানাইলালকে ঝাঁঝালো গলায় বললাম, 'আঃ কানাই, চুপ করো। আমার কথার মধ্যে বারবার ঢুকছ কেন?' তারপর শশধরের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত গলায় বললাম, 'মরা মেয়েকে কী খবর দিলে?'

শশধর ভয় পেয়েছে। কানাইয়ের দিকে তাকিয়ে কাঁচুমাচু গলায় বলল, 'আমি আসি হুজুর। আমায় ছেড়ে দেন।'

আমি ভেতরে ভেতরে একটা অস্থিরতা অনুভব করছি। ঠান্ডা গলায় বললাম, 'কথা শেষ করে যাও শশধর। বুড়ির মরা মেয়েকে কী খবর পাঠালে সেটা বলে যাও।'

'কী আর বলব? বললুম, ঘরদোর ধোওয়া মোছা করো, জল তুলে রাখো, তোমার কাছে তোমার মায়ে যায়।'

আমি বিড়বিড় করে বললাম, 'ওই লক্ষ্মী না মুক্তি শুনতে পেল?'

শশধর খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। মেঝের দিকে তাকিয়ে বলল, 'মাটিতে কাঁপন পেলাম হুজুর। তারপর থেকেই...।'

আমার গা কি একটু শিউরে উঠল? না মনে হয়। কী করে হবে? কেনই বা হবে? আমি তো আর ভয় পাইনি। টেবিলে রাখা জলের গেলাস তুলে এক চুমুকে শেষ করলাম। যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে অস্বস্তিটা ঝেড়ে ফেলতে চাইলাম। শুধু গল্প বলা নয়, এই লোকের অভিনয় ক্ষমতাও চমৎকার। কত স্মার্ট ভঙ্গিতে একটা অলৌকিক বিষয়কে সত্যি বলে চালানোর চেষ্টা করছে! এরকম একটা কড়কড়ে রোদের সকালে ভূতের গল্প ফাঁদা চাট্টিখানি কথা নয়। এই লোক সেটা খানিকটা হলেও পেরেছে। ধাপ্পাবাজদের মধ্যে এই গুণ অবশ্য প্রায় দেখা যায়। তারা অভিনয়ও ভাল করে। সমস্যা হল, কথা শুনে এই আধবুড়ো লোকটাকে সেরকম মনে হচ্ছে না। সম্ভবত এই কারণেই অস্বস্তি তৈরি হচ্ছে।

একটা কাজ করলে কেমন হয়? বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে? হোক। লোকটা কতখানি গোলমেলে সেটা বোঝা যাবে। জালিয়াত, পাগল— সবকিছুরই তো একটা মাত্রা আছে। এই লোকের সেই মাত্রাটা কতখানি? নিজের ইন্টারেস্টেই জানা দরকার। একটা মজাও হবে। রত্নাকে বাড়িতে গিয়ে যখন বলব, ভয় পাবে। কিন্তু তার আগে কানাইলালকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া দরকার। এ কথা ওর সামনে বলা যায় না।

'কানাই গত সপ্তাহের রিপোর্টটা আছে নাকি?'

'আমার ব্যাগে আছে স্যার। ব্যাগটা বাইরে।'

'চট করে নিয়ে এসো দেখি। ততক্ষণে তোমার শশধরের সঙ্গে কথা শেষ করি।'

কানাইলাল ইতস্তত করল। আমি ভুরু কুঁচকে তাকাই।

'যাও, দেরি করছ কেন?'

কানাইলাল আমার বিরক্তি বুঝতে পারে, খানিকটা যেন অবাক হয়ে ঘর ছাড়ল সে। মুহূর্ত কয়েক নিজের মনে কথাটা সাজিয়ে নিয়ে সরাসরি তাকালাম লোকটার দিকে।

'আমার একটা কাজ করে দিতে পারবে?'

মাথা নামিয়ে আছে শশধর। একা ঘরে তাকে যেন এবার একটু অন্যরকম লাগছে। সে কি বেলা বাড়ছে বলে? বেলা বাড়লে মানুষের কি চেহারা বদলায়?

'চেষ্টা করব হুজুর।'

আমি চেয়ারটা সামান্য পিছনে ঠেলে নিলাম। তারপর খানিকটা আপন মনেই বলতে থাকি—

'মেয়েটার ভাল নাম মালবিকা। আমরা মালা ডাকতাম। কলেজের ফার্স্ট না সেকেন্ড ইয়ার চলছে, তা প্রায় তেইশ-চব্বিশ বছর আগের ঘটনা। বলা নেই কওয়া নেই, একদিন কলেজে গিয়ে শুনি মালা গলায় দড়ি দিয়েছে।'

এতটা পর্যন্ত বলে চুপ করে গেলাম।

'কী খপর বলব হুজুর।'

'না না খবর কিছু বলতে হবে না... শুধু জিজ্ঞেস করবে, জিজ্ঞেস করবে কেন এরকম করেছিল সে... বলবে আমি জানতে চেয়েছি...। পারবে?'

প্রশ্নটা শেষ করে ঠোঁটে ঠাট্টার হাসি এনে মুখ তুলে তাকাই। তাকিয়ে চমকে উঠি। কুঁজো মানুষটা একদৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে। চোখদুটো যেন মানুষের নয়। মাটির চোখ! মাটির দৃষ্টি! সেই দৃষ্টি তীব্র, তীক্ষ্ণ সুচের মতো আমার গভীর পর্যন্ত গেঁথে, কেটে দেখতে দেখতে চলেছে!

রাতে খেতে বসে ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে উঠে পড়লাম। রত্না বলল, 'শরীর খারাপ।'

'খারাপ নয়, একটা অস্বস্তি হচ্ছে। কে জানে গ্যাসের প্রবলেমটা ফিরে এল হয়তো?'

'ওষুধ খাবে?'

'দেখি, রাতে দরকার হলে খাব।'

বিয়ের পর থেকেই দেখছি রত্না খাবার সময় চিবোয় বেশি। প্রথম প্রথম ভাবতাম হজমের জন্য করে। পরে শুনলাম, শুধু তাই নয়, এতে নাকি দাঁতের সেটিং ভাল থাকে। চিবোতে চিবোতেই রত্না বলল, 'সেই লোকটার সঙ্গে দেখা হয়েছে? ডেকেছিলে তাকে?'

আমি চমকে ফিরে তাকালাম, রত্নার মনে আছে!

'কোন লোক?'

রত্না হেসে বলল, 'বাঃ ওই যে ভূতের সঙ্গে কথা বলতে পারে, তোমাদের মাটি কাটার লেবার? ডাকোনি তাকে?'

আমি মুখ ফিরিয়ে গম্ভীর গলায় বললাম, 'খেপেছ? কাজের জায়গায় পাগলামির সময় কোথায়? কোথা থেকে একটা চিটার ধরে এনেছে কানাই বেটা।'

রত্না বলল, 'ওরকমভাবে বলছ কেন? গরিব মানুষ, অভাবে যে কত কী করে তার ঠিক আছে? মরা মানুষের সঙ্গে কথা বলা তো সহজ কাজ, আমাদের কোন্নগর স্টেশনে একটা জোয়ান লোক মরা সেজে পড়ে থাকত। পাশে ছেলে, বউ ভিক্ষে করত। পোড়ানোর খরচ চাই।'

আমি গজগজ করে উঠলাম, 'ওসব ফাজলামি তোমার কোন্নগর স্টেশনে হতে পারে রত্না, আমার প্রজেক্টের ওখানে চলতে পারে না। হেড অফিসে যদি খবরটা পৌঁছোয় আমার অবস্থাটা কী হবে ভেবে দেখেছ? আই টি পার্কে ভূত! ছি ছি।'

রত্না অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল, বলল, 'আমার ওপর রেগে যাচ্ছ কেন? আমি কী করলাম?'

নিজেকে দ্রুত সামলালাম। সত্যি তো, রেগে যাচ্ছি কেন? আর রাগ করলে নিজের ওপর করা উচিত। ওই জালিয়াতটাকে হুট করে মালবিকার কথাটা বলা উচিত হয়নি। কোনও

কিছুই বলা উচিত হয়নি। আর যদি বলতেই হয়, মরা লোকের কি অভাব ছিল? দাদু, মামা, কাকা যে কারও কথা বলতে পারতাম। মালা কে? হু ইজ মালা? তাকে কতটুকু চিনতাম? কিছুই নয়। দু'পাঁচ দিন তার সঙ্গে ঘুরেছি মানে এই নয় এত বছর পরেও তার কথা মনে পড়বে। হঠাৎ মালবিকার কথা মনেই বা পড়ল কেন!

খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও ওই লোক কি আমাকে প্রভাবিত করেছে?

ফ্ল্যাটের একফালি বারান্দায় এসে দ্রুত হাতে নম্বর টিপলাম। মোবাইলের ছোট্টো পরদায় ভেসে উঠল—সয়েল অ্যান্ড কয়েল।

'হ্যালো কানাইলাল? ঘুমিয়ে পড়েছ?'

স্কুটারটা গড়বড় করছিল। গ্যারেজে দেখিয়ে সাইটে আসতে খানিকটা দেরি হয়ে গেল। ঘরে ঢুকে কম্পিউটার চালু করলাম। কানাইলাল ঢুকল প্রায় আমার পিছু পিছু। মুখে হাসি।

'ভূতটাকে তাড়িয়ে দিয়েছি স্যার।'

আমি মুখ তুললাম, কানাই দাঁত বের করেই আছে। সেই অবস্থাতেই বলল, 'আপনার অর্ডার মতো আজ ভোরেই পাওনা গন্ডা বুঝিয়ে দেশে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। বললুম বাছা, ভূতগিরি এখানে চলবে না। মাটি কাটা ছেড়ে তুমি বরং কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে পোস্টম্যান হয়ে যাও। মরা মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে চিঠি দেওয়া নেওয়া করো। সামান্য কম্মে তোমায় মানাবে না।'

কথা শেষ করে 'হ্যা হ্যা' করে হাসতে লাগল কানাইলাল।

'মতি হারামজাদাকেও ধমকে দিয়েছি স্যার, বলেছি, ভবিষ্যতে এরকম পাগল ছাগল নিয়ে এলে তারও বিপদ আছে। সব সহ্য করব কিন্তু সয়েল অ্যান্ড কয়েলের বদনাম সহ্য করব না।'

আমি মাউসে ক্লিক করে চোখের সামনে মাটির হিসেব খুললাম। নিচু গলায় বললাম, 'শশধর কিছু বলল?'

'বলবে আবার কী? চুপচাপ পোঁটলা পুঁটুলি গুছিয়ে নিল। ও হ্যাঁ, আপনাকে জানানোর জন্য শুধু একটা কথা বলেছে স্যার।'

'কী বলেছে?'

'স্যার, মালা না মালবিকা কী যেন নাম বলল, ইস নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। যাই হোক, সেই মহিলা নাকি আপনাকে বলে পাঠিয়েছে...।'

কথাটা শেষ করে কানাইলাল মুচকি হাসল। নিচু গলায় বলল, 'ভূতটুত নাকি স্যার?'

বাড়ি ফিরলাম তাড়শ জ্বর নিয়ে।

প্রতিদিন রোববার, ৬ জুলাই ২০০৮

মূর্তি

বটুকেশ্বর মাইতির মুখ দেখে মনে হচ্ছে তিনি বিরক্ত। ভুরু কুঁচকে আছে। নাকের পাটা ফোলা। নাকের পাটা ফোলার অর্থ শুধু বিরক্ত নয়, মানুষটা রেগেও আছে।

ল'অব লিডার্স বলে একটা জিনিস আছে। নেতাদের নিয়ম। সেই নিয়মে নেতারা যেমন চট করে মনের কথা বলতে পারেন না, তেমন ফট করে মনের ভাব মুখে ফোটাতে পারেন না। কোনও কারণে মেজাজ খিঁচড়ে থাকলে তাঁদের থাকতে হয় হাসি হাসি। আবার উলটোটাও হয়। মন ভাল থাকলেও ভাব করতে হয় নিকট আত্মীয় মরণাপন্ন। এখনই অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে হাসপাতালে ছুটতে হবে। সব মিটিং বাতিল।

বটুকেশ্বর মাইতি নেতা, কিন্তু পুরোপুরি নেতা নন। কারণ তাঁর দল বাছাই এখনও ফাইনাল হয়নি। 'ওয়াচ অ্যান্ড সি' পর্যায়ে রয়েছে। 'ওয়াচ অ্যান্ড সি' পর্যায় জটিল ধরনের একটা পর্যায়। এই পর্যায়ে খুবই সতর্ক থাকতে হয়। বটুকেশ্বর মাইতিও আছেন। তিনি রোজই নানা ধরনের কর্মসূচি নিচ্ছেন। সেখানে পথ অবরোধ, বাস পোড়ানো, পুলিশ পেটানো যেমন রাখতে হচ্ছে, তেমনি আবার অবরোধের প্রতিবাদ, বাস পোড়ানোর নিন্দা, পুলিশ পেটানোর ধিক্কারও থাকছে। পক্ষে মিছিল ডাকলে, বিপক্ষে মিটিং করতে হচ্ছে। বিষয় খুবই জটিল। কিন্তু উপায় কী? শেষ পর্যন্ত কোনটা গিয়ে দাঁড়াবে এখনই বলা সম্ভব নয়। একটাই ভাল লক্ষণ নাম, বদনাম দুটোই বাড়ছে। এখন হুটোপাটির সময় নয়। কোমরের বেল্ট টাইট করে বাঁধবার সময়। কথা অনেক দিকেই চলছে। ফিলার আসছে। নানা ধরনের প্রস্তাব। বটুকেশ্বর হ্যাঁ-ও বলছেন না, না-ও বলছেন না। আর একটু সময় যাক। যতই বিরক্ত মুখে বসে থাক বটুকেশ্বর মাইতির মন এখন ফুরফুরে থাকবার কথা।

ফুরফুরেই আছে। একটু ফুরফুরে নয়, বেশি ফুরফুরে।

সকালের দিকটায় বটুকেশ্বর মাইতি চা খান না। তিন খান দুধ। প্রতিদিন সকালে বড় এক গ্লাস দুধ নিয়ে দর্শনার্থীদের মুখোমুখি হন। অনেকটা সময় ধরে আলতো আলতো চুমুক দিয়ে সেই দুধ খেতে থাকেন। শিশুর মতো তাঁর ঠোঁটের ওপর দুধের রেখা পড়ে। সেই রেখা তিনি মোছেন না। ইচ্ছে করেই 'দুধের শিশু' ভাবটা ধরে রাখেন। তবে গ্লাস শেষ হয়ে গেলে আর এক মুহূর্ত দর্শনার্থীদের ঘরে থাকার অনুমতি নেই। শত অনুনয়-বিনয় করলেও নেই। ছেলেপিলেরা ঘর ফাঁকা করে দেয়। কারণ পাবলিক মিটিং-এর পর বটুকেশ্বর মাইতিকে করতে হয় স্পেশাল মিটিং। বিশেষ বিশেষ লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ। এই কারণে শেষের দিকে আসা দর্শনার্থীরা থাকেন টেনশনে। তাঁরা ঘড়ির বদলে ঘনঘন বটুকেশ্বরবাবুর গ্লাসের দিকে তাকান। বালি-ঘড়ির মতো দুধ-ঘড়ি। দুধ শেষ হতে কত বাকি? শেষ হওয়ার আগে তাঁর

পালা আসবে কি? নাকি আসবে না? কেউ আবার মনে মনে দুধের দেবতাকেও ডাকাডাকি শুরু করে দেন। দুধ দেবতার নাম জানা না থাকার কারণে একটু অসুবিধা হয়। নাম করে ডাকা যায় না।

'ঠাকুর, ঠাকুর গো, তুমি ফুরিয়ে যেয়ো না ঠাকুর। গত সপ্তাহে আমার চান্স আসার ঠিক মুখে মুখে তুমি চলে গেলে। আজ একটিবারের জন্য মুখ তুলে তাকাও। শালার চাকরির কথাটা বলতে দাও। আজও যদি না পারি, বাড়ি ফিরে বউয়ের ধ্যাতানি খেতে হবে গো ঠাকুর। প্লিজ এইটুকু ধৈর্য ধরো, তোমার পায়ে পড়ি।'

আজ গ্লাস ফাঁকা হওয়ার অনেক আগেই বটুকেশ্বর মাইতি ঘর ফাঁকা করার নির্দেশ দিলেন। আজ বিকেলে অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠান রাম-শ্যাম-যদু-মধু টাইপের অনুষ্ঠান নয়। বটুকেশ্বর মাইতির স্বপ্নের অনুষ্ঠান। এর জাতই আলাদা। অনেক ভাবনাচিন্তা, পরিশ্রম, খরচাপাতি করে এর ব্যবস্থা হয়েছে। অনুষ্ঠান ঠিকমতো হলে বটুকেশ্বর মাইতির নামডাক এক লাফে কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। মিটিং, মিছিল, বোমা, আগুনের পাশাপাশি তিনি হবেন 'শিল্প রসিক', 'পরিবেশপ্রেমী'। ইদানীং পলিটিক্সে এই ধরনের জিনিসের দাম হু হু করে বাড়ছে। মাঝে মাঝে মনে হয়, সেদিন আর খুব দেরি নেই যখন নির্বাচনে দাঁড়াতে হলে কবিতা লেখা মাস্ট করে দেওয়া হবে। নমিনেশন পেপারের সঙ্গে প্রার্থীদের দুটো করে কবিতা জমা দিতে হবে। আধখেঁচড়া কবিতা নয়, ফুল সাইজ কবিতা।

অনুষ্ঠানটা করতে বটুকেশ্বর মাইতির সময় লেগেছে। টার্গেট ছিল চার মাস। লেগেছে সাড়ে ছ'মাস। সাড়ে ছ'মাস ধরে তৈরি হওয়া অনুষ্ঠানের আগে পাবলিকের ফালতু বকবকানি শুনে তিনি ক্লান্ত হতে চান না। একটা মেন্টাল প্রস্তুতি লাগে।

বেশ কিছুদিন ধরে মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। এমন একটা কিছু করতে হবে যাতে এলাকার মানুষ খুশি হবে আবার ভড়কেও যাবে। আহা উহু করবে। আজকের প্রোগ্রাম সেই আহা উহু করার মতো প্রোগ্রাম।

একটা দুঃসংবাদের মধ্যে দিয়ে এই অনুষ্ঠানের চিন্তা মাথায় আসে বটুকেশ্বর মাইতির। ঘটনা এরকম— এ পাড়ার শেষ প্রান্তে একটা পার্ক ছিল। পার্ক না বলে ডাস্টবিন বলাই ঠিক। রেলিং দিয়ে ঘেরা জায়গায় রাজ্যের জঞ্জাল জমা হত। সেখানে ঢোকা তো দূরের কথা, পাশ দিয়ে হাঁটলেই নাকে কাপড় চাপা। কাপড় না থাকলে দম বন্ধ। সন্ধের পর পার্কের ভাঙা ল্যাম্পপোস্টে একটা-দুটো টিমটিমে আলো জ্বলে। গা ছমছমে অন্ধকার। সেই সঙ্গে শুরু হয় নানা ধরনের গা ছমছমে কারবার। গাঁজা ভাঙের আস্তানা। প্রতি সপ্তাহেই ছিনতাই। বেশি রাতে ফ্যাকাশে আলোর তলায় দাঁড়িয়ে বেপাড়ার মেয়েরা ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাত। এক রাতে পুলিশ জিপটিপ এনে পার্ক ঘিরে ফেলল। পুব দিকের জঞ্জাল ঘেঁটে দিশি ওয়ানশটার, বস্তায় ভরা খান পাঁচ বোমা, ঝকঝকে একটা ভোজালি তুলে নিয়ে গেল। পুলিশের কাছে নাকি 'টিপ' ছিল।

বটুকেশ্বর মাইতি সকালে ঘুম থেকে উঠে এই সংবাদ শুনলেন। সংবাদ হিসেবে এটি তাঁর পক্ষে যথেষ্ট দুঃসংবাদ। কিন্তু দুঃখের বদলে মাথায় ঝলসে উঠল পরিকল্পনা। তিনি সোজা হয়ে বসলেন। ঠোঁটের ফাঁকে মৃদু হাসি দেখা দিল। একেই বোধহয় বলে দুঃখের আড়ালে সুখ।

বটুকেশ্বর মাইতি তাঁর ফার্স্ট এবং সেকেন্ড অ্যাসিস্টেন্ট জীবন-গজাকে তখনই মোবাইলে ডেকে পাঠালেন।

'জীবন, ওই জঞ্জাল পার্ক সংস্কার হবে।'

হসন্তে জীবনের কিঞ্চিৎ সমস্যা আছে। সে ঘাবড়ে গিয়ে বলে, 'কী হবে?'

'সংস্কার, রেনোভেশন। গাধার বাচ্চা কোথাকারে। সংস্কার মানে জানো না।'

গজা বলে, 'পরিষ্কার?'

বটুকেশ্বর মাইতি বলেন, 'তার থেকে বেশি।'

জীবন কাঁচুমাচু মুখে বলে, 'বুঝতে পারছি না গুরু।'

বটুকেশ্বর খিঁচিয়ে উঠে বললেন, 'ওখান থেকে অল ক্লিয়ার করতে হবে। অল ক্লিয়ার মানে বোঝো মুর্খ? মদ গাঁজা, চুরি ছিনতাই, মেয়েছেলে, বোমা পাইপগান সব হটাতে হবে।'

জীবন আরও কাঁচুমাচু গলায় বলল, 'সেটা কী করে সম্ভব গুরু। সবকটা থেকে যে হপ্তা আসছে। মেয়েদের আমাউন্ট বেড়েছে। ওদের বিজনেস ভাল হচ্ছে। কাল টাকা দিতে এসেছিল। গাঁজাভাঙের পার্টি কমপ্লেইন করল একদিকের আলোতে নাকি ডিসটার্ব হচ্ছে। পয়সা দিচ্ছে, কমপ্লেইন তো শুনতেই হবে। বিশুকে পাঠিয়ে বাল্‌ব ভেঙে দিয়েছি। তা ছাড়া মালপত্র রাখারও তো জায়গা চাই। বোমা ভোজালি তো বাড়িতে রাখা যায় না। পুলিশ অত মাল নিয়ে গিয়ে বিরাট লস করিয়ে দিল। কোন হারামির বাচ্চা টিপ দিল... এর মধ্যে তুমি বলছ সব বন্ধ।'

বটুকেশ্বর মাইতি শান্ত হলেন। বললেন, 'আমি তো বিজনেস বন্ধ করতে বলিনি, বলেছি কি? বলেছি এখানে হবে না। তোরা অন্য জায়গা খোঁজ। এক বাড়ি থেকে ভাড়াটে উঠলে কি ভাড়াটে মারা যায়? সবার সঙ্গে কথা বল। এখানে এবার অন্য বিজনেস হবে!'

'অন্য বিজনেস!'

বটুকেশ্বর ঠোঁটে মুচমুচ ধরনের আওয়াজ করে বললেন, 'হ্যাঁ, অন্য বিজনেস।'

গজা বলল, 'কী করতে হবে বলো বটুদা?'

বটুকেশ্বর মণি দুটো ওপরে তুলে বললেন, 'পুরোটা এখনই বলতে পারব না। তবে আপাতত ঠিক করেছি, জঞ্জাল পার্কের চেহারা একেবারে বদলে ফেলব। আবর্জনা ঝেঁটিয়ে বিদায় করব। আলো লাগবে। রং হবে। মাঝখানে ফোয়ারা। ভাঙা রেলিং সরিয়ে গাছ-পাতার নকশা দেওয়া নতুন রেলিং। সার দিয়ে বেঞ্চ। কাঠের, লোহার দু'রকমের বেঞ্চই থাকবে। গাছ লাগানো হবে কয়েকশো। নুড়ি পাথরের পথ করব। ছোটদের জন্য দোলনা, মেরি গো রাউন্ড আর ওই যে কী বলে দু'জনে বসে... একটা দিক ওঠে, একটা দিক নামে... একটা দিক ওঠে, একটা দিক নামে... কী বলে যেন?'

গজা উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'ঢেকুচকুচ?'

'অশিক্ষিতের মতো কথা বলবি না। জিনিসটার ইংরেজিতে একটা নাম আছে। যাক, সে পরে মনে পড়বে... পার্কের রেলিং-এ ছোট ছোট টিনের প্ল্যাকার্ড লাগাব ভাবছি। সেখানে ঋষি মনীষীদের বাণী থাকবে। কবিগুরুর গান-কবিতা থাকবে। আমিও দু'-একটা লিখব।'

গজা চমকে উঠে বলে, 'তুমি লিখবে!'

বটুকেশ্বর মাইতি চোখ খুলে বললেন, 'হ্যাঁ লিখব, সমস্যা কোথায়? ধর লিখলাম, রক্তের বদলে গাছ, হিংসার বদলে ফুল। কেমন হবে? মিল আছে না?'

জীবন ঢোঁক গিলে বলল, 'হ্যাঁ আছে, গাছ আর ফুলে সুন্দর মিল আছে।'

'তা হলে? পারব না বলছিলি কেন? নে এখনই ব্যবস্থা শুরু করে দে। মালী, মিস্ত্রি যা লাগে দেখ। আমি চাই কাল থেকে কাজ শুরু হোক। এলাকার সবাই দেখুক বটুকেশ্বর শুধু...।'

গজা বলল, 'এ তো অনেক খরচ!'

'খরচ বলছিস কেন, ইনভেস্টমেন্ট বল গাধার বাচ্চা। কমপ্লিট হয়ে গেলে ঢাকঢোল পিটিয়ে পার্কের উদ্বোধন হবে। আমি এখন আর খরচটরচ নিয়ে ভাবছি না। ভাবছি উদ্বোধন অনুষ্ঠান নিয়ে। কাকে কাকে ডাকা যায়...।'

গজা বলল, 'এখনই মন্ত্রীদের ডেট চেয়ে রাখো।'

বটুকেশ্বর মাইতি ধমক দিলেন। বললেন, 'নো নো। নো পলিটিক্স। এখানে রাজনীতি লোকে নেবে না। অন্য লাইনে ভাবতে হবে। তবে তাতেও সমস্যা আছে। বেশি মাতব্বর কাউকে নিলে আমি হাওয়া হয়ে যাব। সবাই তাকে নিয়ে মাতামাতি করবে।'

গজা তাড়াতাড়ি বলল, 'তা হলে ওসব ফ্যাচাঙের দরকার কী? মাল তোমার আর ক্ষীর খাবে অন্য লোকে? তুমিই উদ্বোধন করো গুরু।'

বটুকেশ্বর মাইতি চোখ সরু করে বললেন, 'বলছিস? কথাটা খারাপ বলিসনি। একটা গাছ পুঁতে ধর উদ্বোধন করলাম। আজকাল বড় বড় লোকেরা ধুমধাড়াক্কা গাছ পোঁতে।'

প্রথম দিন চারাগাছ ঠিক হলে দু'দিনের মাথায় বটুকেশ্বর মাইতি পরিকল্পনা বদলালেন। ঠিক করলেন পার্কের মাঝখানে মূর্তি বসবে। হাততালি, ব্যান্ডবাদ্য, বেলুন ওড়ার মাঝখানে তিনি সেই মূর্তির পরদা সরাবেন। এতে খরচ বাড়বে। মূর্তি তৈরিতে সময় লাগবে। লাগুক। খ্যাতি অনেক বেশি হবে। পরিবেশের সঙ্গে শিল্প যোগ হবে।

'মূর্তিফুর্তি কারা বানায় দেখ। সাইজ যেন ছোট না হয়। বড় হতে হবে।'

গজা বলল, 'গুরু কুমোরটুলিতে বলব?'

জীবন বলল, 'কেষ্টনগরের কাজ ভাল।'

শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণনগরেই ঠিক হল। আর্টিস্টের বয়স অল্প। বটুকেশ্বর মাইতি নিজে কথা বললেন। ছোকরা একটু পাকা। তা হোক। শিল্পী মানুষ পাকা হয়। তবে পাকার সঙ্গে খুঁতখুঁতেও। চার মাস টাইমের জায়গায় আড়াই মাস বেশি টেনে দিয়েছে। তবে কাজ অত্যধিক ভাল করেছে। ভাবনাটাই দুর্দান্ত। শেষ হওয়ার মুখে এক রোববার বটুকেশ্বর মাইতি নিজে কাজ দেখতে গেলেন। গিয়ে মুগ্ধ হলেন। আহা!

মূর্তি একটা নয়, মূর্তি তিনটে। একটা গোটা পরিবার। বাবা-মা আর মেয়ে। ধুতি পাঞ্জাবি পরা বাবা আর শাড়ি পরা মায়ের মাঝখানে হাত ধরে ফ্রক পরা খুকি। ঠিক যেন বিকেলবেলা বাবা-মায়ের সঙ্গে পার্কে বেড়াতে এসেছে।! খুকির চুলের বেণি, বাবার পাঞ্জাবির পকেট, মায়ের আঁচল সব একেবারে নিখুঁত। তাদের মুখের হাসি দেখলে কে বলবে এই পরিবারটি রক্তমাংসের নয়? এমনকী মেয়েটির ফ্রক হাওয়ায় উড়ছে! ঢালাই করে এমন কাজ হয় বটুকেশ্বর মাইতি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

আর্টিস্টকে অবশ্য মুগ্ধভাব প্রকাশ করেননি বটুকেশ্বর। করলে মাথায় চড়ে বসত। উলটে গম্ভীর মুখে বলেছেন, 'কাজ মন্দ হয়নি, তবে পরিকল্পনায় গোলমাল আছে। পাবলিক বলবে দেশে মনীষীর তো অভাব নেই, তাদের বাদ দিয়ে হঠাৎ আলটপকা একটা ফ্যামিলি... যাক, এখন তো আর কিছু করার নেই। হাতে সময় নেই যে জিনিস পালটাবে। তা ছাড়া আমি চাই না আর্টিস্টদের নিন্দে হোক। আমি চাই শিল্পীর সম্মান। তুমি বরং মূর্তির নীচে পরিকল্পনায় আমার নাম লিখে দিয়ো বাছা। বড় করে লিখো। সমালোচনা যদি শুনতে হয় আমিই শুনব।'

কাল রাতেই মূর্তি পার্কে বসে গেছে। মূর্তি সাধারণত বসে বেদির ওপর। কিন্তু এখানে শিল্পীর পরামর্শ মতো বসানো হয়েছে প্রায় মাটিতে। এতে ন্যাচারাল ভাবটা বেড়েছে। তবে কাপড় ঘেরা। বটুকেশ্বরবাবুর কড়া অর্ডার উদ্বোধনের আগে কেউ যেন জিনিস দেখতে না পায়। বাকি সাজগোজও কমপ্লিট। ফুলের টব, রঙের পোঁচ, নতুন বেঞ্চ, ঝলমলে আলো, ঝরঝরে ফোয়ারা— সব। খবর এসেছে স্টেজের ফিনিশিং টাচ চলছে।

দর্শনার্থী তাড়িয়ে বটুকেশ্বর মাইতি একা ঘরে বসে বিকেলের ভাষণ ঝালিয়ে নিচ্ছেন। তিনি ঠিক করেছেন ভাষণের প্রথম পর্যায়ে থাকবে পরিবেশ। দ্বিতীয় পর্যায়ে থাকবে শিল্প, আর একবারে শেষে থাকবে মূর্তির কথা। কেন তিনি এরকম মূর্তি বানালেন?

'... আমি ইচ্ছে করলেই বড় কোনও নেতা, মনীষীর মূর্তি বসাতে পারতাম। কিন্তু আমি তা করিনি। এই পার্ক কোনও নেতা, মনীষীর নয়। এই পার্ক কোনও কুকর্মের নয়। এই পার্ক সাধারণ মানুষের, এই পার্ক আপনাদের। বড়দের আনন্দ, ছোটদের হাসি। আমি চাই অতীতের সব কালি ধুয়ে ছোট ছেলেমেয়েদের হাত ধরে বাবা-মায়েরা আসুন এখানে, নির্মল বাতাস আর সবুজ গাছের মাঝখানে তাদের বুক ভরে শ্বাস নিতে দিন। ঠিক এই মূর্তির মতো...'

বটুকেশ্বর মাইতি চোখ বুজলেন। টেনশন হচ্ছে। জীবন আলোর আরেঞ্জমেন্ট ঠিকভাবে করেছে তো? মাইক? গজা বেলুন এনেছে? ব্যান্ডের ছেলেমেয়েগুলো কোথায়? ওরা কখন থেকে বাজনা শুরু করবে?

সব কিছু ঠিকঠাকই হল। নিখুঁত ও নিপুণ। ভাষণ শেষ করবার পর বটুকেশ্বর মাইতি দড়ি ধরে হালকা টান দিলেন। অনেক সময় দড়ি আটকে যায়। এখানে আটকাল না। মূর্তি ঘিরে রাখা পরদা সরে গেল দুলকি চালে। জ্বলে উঠল আলো।

কিন্তু এ কী? ছোট্ট মেয়েটা কোথায়? বাবা-মায়ের হাত ছেড়ে সে কোথায় পালাল!

আজকাল রবিবাসর, ১৫ নভেম্বর, ২০০৯

নিকুঞ্জবাবু

দরজার আড়ালে কেউ হাসছে। কে হাসছে? নিকুঞ্জ পাঠকের মাথা বালিশে, দুটো পা টানটান করে সামনে মেলা। সেই পা তিনি নাড়াচ্ছেন। নাড়াতে নাড়াতে ভাবছেন, কীভাবে শুরু করবেন। কোথা থেকে শুরু করবেন। হাসির আওয়াজে পা নাড়ানো বন্ধ করলেন নিকুঞ্জবাবু। ভুরু কোঁচকালেন। মৃত্যুর বাড়িতে হাসে কে! এ আবার কেমন অসভ্যতা? একটা মানুষ মাত্র হাত কয়েক দূরে মরে পড়ে আছে, সেইসময় হাসাহাসি! ঠিক শুনছেন তো?

হ্যাঁ, ঠিক শুনেছেন। দরজার ওপাশেই বারান্দা। নিকুঞ্জবাবুর শখের বারান্দা। সেই শখের বারান্দা থেকে হাসি ভেসে আসছে। জোরে হাসি নয়, চাপা গলায় হাসি। মুখে হাত রেখে হাসলে যেমন হয় সেরকম।

আশ্চর্য। খুবই আশ্চর্য। বাড়ির কর্তার মৃত্যুর মতো একটা শোকাবহ ঘটনার পর হাসি!

কে হাসছে? বাড়ির কোনও মেম্বার? নাকি বাইরের কেউ? হতে পারে, বাইরের লোকও হতে পারে। কিছুক্ষণ হল একটা-দুটো করে বাইরের লোকজন আসতে শুরু করেছে। গাড়ি, ট্যাক্সির হর্ন শোনা যাচ্ছে। সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ। 'মরোমরো' অবস্থার খবর পেলে আজকাল আর বাইরের লোক আসে না। তারা আসে ফাইনাল মারা যাওয়ার পর। ঠিকই করে। মরোমরো সময় ছুটে আসার মানে ডাক্তার, অ্যাম্বুলেন্স, হাসপাতাল, অক্সিজেনের হাজারটা ফ্যাচাঙে জড়িয়ে পড়ো। মারা যাওয়ার পর পৌঁছোলে আর সে ঝামেলা থাকে না। একেবারে ঝাড়া হাত-পা।

কাল রাতে যখন শ্বাস উঠল তখন ক'টা বাজে? নিকুঞ্জবাবু সময় মনে করার চেষ্টা করলেন। খুব বেশি হলে একটা। প্রথমে চাপ, তারপর কষ্ট। বুকটা ঢেউয়ের মতো একবার উঠছে, একবার নামছে। চোখ দুটো বেরিয়ে আসার জন্য ছটফট করছে। কপাল, গলা ঘামছে দরদরিয়ে। এসব এলাকায় রাত একটা মানে অনেক। সুরমাদেবীর চেঁচামেচিতে বাড়িসুদ্ধ সবাই উঠে পড়ল। দুই ছেলে, তাদের বউরা, বড় নাতনি, গোপালের মা— সবাই। একটা হট্টগোলের মতো অবস্থা। ঘরে ঘরে আলো জ্বালানো হল। কেউ হাতপাখা খুঁজছে। কেউ জল আনছে। কেউ ওষুধের বাক্স হাতড়ে ওষুধ খুঁজছে আর বাড়ির সবাইকে গাল দিচ্ছে— 'এ বাড়িতে একটা জিনিস যদি ঠিক সময় পাওয়া যায়। এটা বাড়ি না অন্যকিছু?'

একটা বেজে পনেরো-কুড়ি নাগাদ সুরমাদেবী মুখে আঁচল চাপা দিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন।

স্বপন রেগে গিয়ে বলল, 'আঃ মা, কী আরম্ভ করেছ? রাতদুপুরে মরাকান্না শুরু করলে কেন?'

সুরমাদেবী কান্না থামিয়ে বড় ছেলেকে ধমক দেন।

'তোর বাবা রাতে মরছে তাই রাতে মরাকান্না কাঁদছি। দিনে মরলে দিনে কাঁদতাম। তোর কী অসুবিধে?'

কথা শেষ করে সুরমাদেবী আবার মুখে আঁচল চাপা দিলেন। নিকুঞ্জবাবু বিয়ের পর থেকেই দেখছেন, তাঁর স্ত্রীর এই ক্ষমতা অদ্ভুত। কান্নাকাটির মধ্যেও সে ধমকাতে পারে। স্বপন অবাক হয়ে বলল, 'মরছে! মরছে কোথায়! বাবার বুকে ব্যথা হচ্ছে, বুকে ব্যথা হলেই কি মানুষ মরে যায় নাকি? গ্যাসের ব্যথা হতে পারে।'

অন্তরার ঘর থেকে বেরোতে দেরি হয়েছে। সে পরে ছিল নাইটি। নাইটি পরে শ্বশুরের ঘরে আসা যায় না। শ্বশুর মৃত্যুপথযাত্রী হলেও না, না হলেও নয়। সে হাউসকোট খুঁজে, গায়ে জড়িয়ে তবে এল।

সুরমাদেবী তার দিকে তাকিয়ে কঠিন গলায় বললেন, 'এতক্ষণ কী করছিলে? তখন থেকে ডাকছি। বাপ রে! বাড়িতে একটা মানুষ মরছে আর নাক ডেকে এত ঘুম!'

অন্তরা কাটা গলায় জবাব দিল, 'এত ঘুম কোথায়? এই তো সব সেরে সুরে বারোটার পর শুলাম। আপনি তো ভাল করেই জানেন মা, সবাইকে খাইয়ে, রান্নাঘর পরিষ্কার করে, বিছানা করে এই বাড়ির বউদের শুতে কত দেরি হয়। আপনি কি জানেন না? কুন্তলার তো আরও সময় লাগে। ওর ছেলে ছোট।'

সুরমাদেবী চোখের জল মুছে বললেন, 'স্বামী মারা যাচ্ছে, এখন আর বাড়ির বউদের কাজের ফিরিস্তি না-ই বা শুনলাম অন্তরা। একেবারে না হয় সব চুকেবুকে যাওয়ার পর শুনব। এখন যাও দেখি, একটা হাতপাখা নিয়ে এসো।'

তপন জলের গ্লাস হাতে নিকুঞ্জবাবুর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। সে বলল, 'হাতপাখা দিয়ে কী হবে মা? ঘরে তো ফুল স্পিডে ফ্যান চলছে।'

সুরমাদেবী ছোট ছেলের কথায় আমল দিলেন না।

কুন্তলা দরজার পাশ থেকে সরে এসে স্বামীকে বলল, 'আঃ, মা যখন বলছে... এইসময় হাতপাখা লাগে। তুমি বরং ডাক্তার সরকারকে ফোন করো।'

তপন বিরক্ত গলায় বলল, 'তুমি জলের গ্লাসটা ধরে দাঁড়াও। গ্লাস হাতে ফোন করতে পারব না।'

ডাক্তার সরকারকে ফোন করা হল দুই পর্যায়ে। ল্যান্ড এবং মোবাইলে। প্রথম পর্যায়ে ফোন বেজে গেল। দ্বিতীয় পর্যায়ে ঘুম ভাঙা, বিরক্ত গলায় ডাক্তারবাবু বললেন, 'হাসপাতালে নিয়ে যান।'

হাসপাতাল শুনে সুরমাদেবীর কান্না বাড়ল। দুই পুত্রবধূ এসে শাশুড়ির গায়ে হাত রাখতে গেলে তিনি কান্না থামিয়ে সেই হাত সরিয়ে বললেন, 'গায়ে হাত দাও কেন? আমি কি মুচ্ছা যাচ্ছি? সরো তো, মানুষ মরার সময় আদিখ্যেতা ভাল লাগে না। আদিখ্যেতা করতে হলে অন্য সময় করবে।'

হাসপাতালে নিতে হল না। তার আগেই নিকুঞ্জ পাঠকের বুকের ওঠা-নামা বন্ধ হল। চোখ স্থির হল। তিনি মারা গেলেন।

কিন্তু এখন হাসে কে? যে-ই হোক, নিকুঞ্জবাবুর মনে হচ্ছে, এই লোকের গালে এখনই একটা চড় লাগানোর দরকার। শোকের বাড়িতে হাসা বেরিয়ে যাবে। শুধু শোক তো নয়, একটা ভদ্রতা-সভ্যতাও আছে।

গায়ের চাদর সরিয়ে খাটের ওপর উঠে বসলেন নিকুঞ্জবাবু। হাতে সময় অল্প। এতে কতটুকু দেখা হবে? কিছুই হবে না। দীর্ঘ পঁয়ষট্টি বছরের জীবনে কত মানুষ, কত ঘটনা। একটা পাক মারতে না মারতেই সময় ফুরিয়ে যাবে। সময় বাড়াবার জন্য নিকুঞ্জবাবু যে চেষ্টা করেননি এমন নয়। চেষ্টা করেছিলেন। 'উনি' কিছুতেই রাজি হলেন না।

'স্যার, আর এক ঘণ্টা বাড়িয়ে দিন।'

'উনি' শান্ত গলায় বললেন, 'এইটা বলবেন না নিকুঞ্জবাবু। একেই আউট অব টার্ন পারমিশান করে দিলাম, এখন যদি আরও আবদার করেন তা হলে মুশকিলে পড়ব।'

নিকুঞ্জবাবু হাত কচলে বললেন, 'অনুমতি দিলেন বলেই আর একটু সময়ের জন্য রিকোয়েস্ট করছি। নইলে কি ছাই সাহস পেতাম?'

'উনি' হেসে ফেললেন। সুন্দর, সৌম্য হাসি। বললেন, 'আচ্ছা নিকুঞ্জবাবু, আপনি ঠিক কী দেখতে চাইছেন?'

নিকুঞ্জবাবু গদগদ গলায় বললেন, 'শুধু দেখতে নয়, শুনতেও চাইছি স্যার। আমার মৃত্যুর পর প্রিয়জন, পরিচিত মানুষ, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কে কী করে, কে কী বলে— আড়াল থেকে একবার দেখতে চাই।'

'কী হবে দেখে?'

নিকুঞ্জবাবু লাজুক গলায় বললেন, 'মানুষের এটাই মজা স্যার? নিজের জন্য অন্যের হাসি, আহ্লাদ, আনন্দ দেখে যেমন সুখ হয়, তেমনি তাদের শোক, দুঃখ দেখেও ভাল লাগে। তৃপ্তি পায়। এত মানুষ আমার জন্য কাঁদছে, আহা রে উহু রে বলছে— এটা একটা বড় পাওনা স্যার। বলছে, মানুষটা কত ভাল ছিল, কত বড়মাপের ছিল। সমুদ্রের মতো মন, পর্বতের মতো হৃদয়। শুনতে ভাল লাগবে না স্যার? আপনিই বলুন না।'

'উনি' মুচকি হাসলেন। বললেন, 'আমি ঠিক জানি না। হয়তো লাগবে। আচ্ছা নিকুঞ্জবাবু, আপনি নিজের জন্য কতখানি শোক, দুঃখ আশা করছেন?'

নিকুঞ্জবাবু উৎসাহী গলায় বললেন, 'নিজের মুখে কী বলব স্যার? অনেকটাই করছি, বলতে পারেন পুরোটাই। এত বছর বেঁচে থেকে এত কিছু করলাম আর মরার পর একটু কান্নাকাটি এক্সপেক্ট করব না? শুধু তো আর একটা তিনতলা-চারতলা বাড়ি তৈরি নয়, স্ত্রী যেমনটি চেয়েছে, তেমনটি করে বানিয়েছি। তার শখ মেটাতে ধার করেছি, পরিশ্রম করেছি। তারপর আমার দুই ছেলের কথাই ধরুন স্যার। স্বপন, তপন। মার্ভেলাস ছেলে। ছোটটা ব্যাবসা নিয়ে একটু গোলমালে আছে বটে কিন্তু সেটা বড় কিছু নয়। দু'জনকেই মানুষ করলাম, তাদের বিয়ে দিলাম। মেয়ে স্যার বর্ধমানে। জামাই কিঙ্কর অতি চমৎকার ছেলে। দারুণ রেজাল্ট। এই ছেলেকে আমিই খুঁজে বের করেছিলাম। সে এক গল্প স্যার। একদিন অফিস থেকে ফিরছি, হঠাৎ বাসে দেখি... যাক, সে গল্প আর একদিন হবে। নাতি, নাতনিগুলো আমার ভারী লক্ষ্মী পক্ষী। বড় ছেলের মেয়ে বুলি তো একটা সময় দাদু বলতে

পাগল ছিল। খালি বায়না আর বায়না। এখন বড় হয়ে গেছে। সারাদিন কম্পিউটার ঘাঁটে। বিদেশে যাবে বলে বায়না ধরেছে। ছোট ছেলের পুত্রটি স্যার আমার বড় আদরের। এত আদরের যে নাম দিয়েছি আদু। আদর থেকে আদু। নিজের মুখে বলাটা ঠিক নয়, তবু আপনাকে বলছি, শুধু বাড়ির জন্য নয়, বাইরেও কাজকর্ম করেছি। খাতিরও পাই। পাড়ার তিন-তিনটে ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আমি। এই বুড়ো বয়সেও প্রতি মাসে একবার করে পুরনো অফিসে যাই। সবার সঙ্গে দেখা করে আসি। চা না খাইয়ে বেটারা ছাড়তেই চায় না। আমাকে পেলে ওরা কত খুশি যে হয়...।'

'উনি' যেন খানিকটা আপন মনেই বললেন, 'সেই খুশিটা নিয়ে চলে যাওয়াটাই বুদ্ধির কাজ হত না কি নিকুঞ্জবাবু?'

নিকুঞ্জবাবু হাত জোড় করে ফেললেন, 'প্লিজ স্যার। একটিবারের জন্য।'

'উনি' মাথা নামিয়ে, জাবদা খাতায় ঘসঘস করে লিখতে লিখতে বললেন, 'ঠিক আছে যান, যখন চাইছেন একবার ঘুরে দেখে আসুন। তবে মনে রাখবেন, আপনি কিন্তু নিজেকে দেখাতে পারবেন না। শরীরটা আপনার শোওয়ার ঘরে যেমন শুয়ে আছে, মরে আছে, তেমনিই থাকবে। আপনি ঘুরবেন ছায়ার মতো, বাতাসের সঙ্গে। সবই দেখবেন, শুনবেন, কিন্তু দেখা দিতে পারবেন না। বলতেও পারবেন না কিছু। যান, আড়ালে থেকে দেখা করে আসুন সবার সঙ্গে।'

'তা হলে স্যার সময়টা কি আর একটু বাড়াবেন না?'

'উনি' মুখ তুলে তাকালেন। ঠোঁটের ফাঁকে হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন, 'না। মনে হয় না আপনার লাগবে।'

চোখ খুলে বিছানায় উঠে বসতেই নিকুঞ্জবাবু দেখতে পেলেন, ঘর প্রায় ফাঁকা। দু'-একজন এদিক সেদিক বসে দাঁড়িয়ে আছে। তারা বেশিরভাগই অচেনা বা আধ চেনা। বাড়ির লোকজন সব গেল কই? সুরমা? এ আবার কী? মৃত স্বামীকে ছেড়ে সে গেল কোথায়? ছেলেরা? তাদের বউ? নাতি নাতনি? নিশ্চয় হাতমুখ ধুয়ে ফ্রেশ হতে গেছে। সে তো যাবেই। আহা, বেচারিদের পুরো রাতটাই ধকল গেছে। রাতে মানুষ মরা ঠিক না।

মৃতদেহের বালিশের পাশে কে যেন যত্ন করে চশমা, ঘড়ি রেখে দিয়েছে। নিকুঞ্জবাবু তুলে চোখে দিলেন। ঘড়ি পরলেন হাতে। সময়টা খেয়াল রাখতে হবে। 'উনি' রেগে না যান। চিরুনি পাওয়া যাবে? মাথার এই উলুঝুলু অবস্থায় ঘর ছেড়ে বেরোনোটা বিচ্ছিরি। যাক কী আর করা। মরা মানুষের চিরুনি খোঁজাটা ভাল দেখায় না। হাত বুলিয়ে চুল ঠিক করলেন, তারপর দরজা পেরিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সবার আগে শোকের বাড়িতে হাসির রহস্য ভেদ করা দরকার।

কিন্তু বাইরে এসেই চমকে উঠলেন নিকুঞ্জবাবু।

আরে! এ তো বড় নাতনি বুলি দাঁড়িয়ে! বুলির সঙ্গে শালার মেয়েটাও আছে। কী যেন নাম মেয়েটার? মনে পড়েছে, কাজল। ওরা এর মধ্যে জামশেদপুর থেকে চলে এল! ভেরি গুড।

নিকুঞ্জবাবু নাতনির দিকে সরে এলেন। দাঁড়ালেন ফুল ফুল গ্রিলের সঙ্গে মিশে।

বুলি হাসি হাসি গলায় বলল, 'অ্যাই কাজল, চল না, কাল দুপুরে ছবিটা দেখে আসি। খুব হাসির বই।'

কাজল হাসতে হাসতে বলল, 'একেবারে কালই? হ্যাঁরে কাল সময় পাব? বাড়িতে এত ঝামেলা।'

বুলি চোখ কপালে তুলে বলল, 'ওমা! ঝামেলা কোথায়? বাবা বলছে আজ সন্ধের মধ্যেই শ্মশানমশান হয়ে যাবে। তারপর ফ্রি। আর ঝামেলা হলেই তো ভাল। আমাদের দিকে কেউ খেয়ালই করবে না। টুক করে ছবি দেখে চলে আসব। কাঁদোকাঁদো মুখে বাড়ি ঢুকলেই চলবে।'

কাজল এবার হেসে ফেলল। চোখ নাচিয়ে বলল, 'অ্যাই, ও যাবে?'

বুলি চোখ পাকিয়ে বলল, 'কে?'

কাজল বলল, 'ওই যে তোর ও।'

বুলি হাসতে হাসতে বলল, 'মার খাবি কাজল। ভাল হচ্ছে না কিন্তু। একটু আগে মোবাইলে ফোন করেছিল। আমি বললাম, আজ কথা বলব না। দাদু মারা গেছেন। পাজিটা কী বলল জানিস?'

কাজল ঠোঁট টিপে হেসে বলল, 'কী বলল?'

'বলল, তাতে কী হয়েছে? দাদু মারা গেলে, প্রেম করা বারণ নাকি? হি হি।'

নিকুঞ্জবাবু কী করবেন বুঝতে পারছেন না। তিনি সরে এলেন। পায়ে কোনও আওয়াজ নেই। পা টেপার কোনও দরকার ছিল না, তবু তিনি পা টিপে টিপে বারান্দা দিয়ে হাঁটতে লাগলেন। ওদের কথা তিনি শুনেছেন জানতে পারলে মেয়েদুটো লজ্জা পাবে। আহা, ছেলেমানুষ। ওরা ওসব দুঃখ-টুঃখ কী বোঝে?

বারান্দার শেষে বড় ছেলের ঘর। ঘরের সামনে পরদা। বড় বউমার টেস্ট ভাল। মনে আছে, স্বপনের সম্বন্ধ দেখার সময় গায়ের রঙের পাশাপাশি তিনি টেস্টের ব্যাপারটা খেয়াল রেখেছিলেন। রুচি ভাল হলে মানুষও ভাল হয়। ঘরের পরদা সুন্দর। সুন্দর পরদা সরিয়ে ভেতরে উঁকি দিলেন নিকুঞ্জবাবু।

ওয়ার্ডরোবের সামনে দাঁড়িয়ে অন্তরা কাপড়জামা গুছোচ্ছে। একপাশে সোফায় বসে আছে স্বপন। তার চোখমুখে রাত জাগার ক্লান্তি।

'অমন মুখ গোমড়া করে বসে আছ কেন?'

স্বপন মুখ তুলে বিরক্ত গলায় বলল, 'কী করব? নৃত্য করব?'

'আমাকে ধমকাচ্ছ কেন? বুড়ো বয়েসে বাবা মরেছে, তাতে ক্ষতিটা কী? বরং লাভই হয়েছে। ওনারও লাভ, আমাদেরও লাভ।'

'লাভ!'

স্বপন মুখ তুলল। অন্তরা বলল, 'বাঃ লাভ নয়? এই যদি অসুখবিসুখ করে বিছানায় পড়ে থাকত ভাল হত? নিজে কষ্ট পেত, আমাদেরও জ্বালিয়ে মারত। জ্বালাতে তো শুরুই করেছিল। এটা খাব, ওটা খাব। বউমা কচু লতির শাক করো, তিলের নাড়ু বানাও।'

'না বানালেই পারতে।'

অন্তরা ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, 'ইঃ না বানালেই পারতে। বলা খুব সোজা। উনি ছেলের বউমা বলে রাঁধুনি নিয়ে এসেছেন না? অর্ডার মতো না খাবার পেলে বুড়ো ছাড়ত? মুখে আবার কত আদিখ্যেতা। আমার বড় বউমার রান্নার হাত আমি সোনা দিয়ে বাঁধিয়ে দেব। কচুর মাথা দেবে। আসল সোনা তো সব নিজের স্ত্রীর লকারে।'

নিকুঞ্জবাবু পরদার আড়ালে এক পা সরে এলেন। এসব কী শুনছেন। ঠিক শুনছেন তো! স্বপনই বা চুপ করে আছে কেন? কিছু বলবে না? একটা ধমক তো দিতে পারে। বাবাকে 'বুড়ো' বলছে আর ছেলে চুপ করে শুনছে!

স্বপন বলল। হাত নেড়ে বলল, 'বাজে কথা ছাড়ো তো। আমি রয়েছি নিজের জ্বালায়।'

অন্তরা মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কী জ্বালা আবার?'

'শুনলে না তপনটা কী বলল?'

'কী বলল তোমার গুণধর ভাই?'

'বলল, দাদা তুই বড়, শ্মশানমশান, শ্রাদ্ধশান্তি, লোক খাওয়ানো সব তুই সামলাবি। ও সবের হ্যাপার মধ্যে আমি নেই। তা ছাড়া এই মাসটা ব্যাবসায় টানাটানি চলছে।'

'মানে!'

'মানে আর কী, খরচাপাতি সব আমার।'

অন্তরা মুখ ঝামটে বলল, 'কেন, তোমার কেন? উনি কি বানের জলে ভেসে এসেছেন? বিয়ের পরপরই তোমাকে বলেছিলাম, তোমার এই ভাইটি একটি মিচকে। বলিনি? বলো তুমি? শুধু তোমার ভাই নয়, তোমার ভাইয়ের ফরসা বউটিও সুবিধের নয়। একা পেলেই শ্বশুরের সঙ্গে এত গুজুর গুজুর কীসের রে বাপু? শ্বশুর কি তোর একার?'

স্বপন বলল, 'কী আবার? নিশ্চয় বাবার কাছ থেকে ব্যাবসার টাকা ম্যানেজ করত। যাক, ওসব ছাড়ো, আমি দেখি কাজকর্ম কত শর্টে সারা যায়।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সরে এলেন নিকুঞ্জবাবু। সন্তানের সব কথা ধরতে নেই। শোকের মাথায় মানুষ উলটোপালটা কত কী বলে। পিতৃশোক বলে কথা। চাট্টিখানি ব্যাপার নয়।

ছোট ছেলের ঘরে পরদা টানা নয়, ভেজানো। বিয়ে-থা হয়ে গেলে ছেলের ভেজানো দরজা ঠেলে ঢুকতে নেই। বাইরে থেকে হয় ডাকতে হয়, নয় গলাখাঁকারি দিতে হয়। আজ সেসব সমস্যা নেই। দরজার সঙ্গে মিশে ভেতরে সেঁধিয়ে পড়লেন নিকুঞ্জ পাঠক।

টেবিলের সামনে বসে তপন অফিসের কাগজপত্র ঘাঁটছে। একটু দূরে খাটে বসে আছেন তার শাশুড়ি। পান চিবোচ্ছেন। নিকুঞ্জবাবু বেয়ানকে দেখে খুশি হলেন। এই মহিলাকে তিনি পছন্দ করেন। মহিলা সরল সাদা মানুষ। কথায় কথায় বলতেন, 'আমাকে কিছু বলবেন না দাদা, মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। মেয়ে এখন আপনার। এই মেয়ের ভালমন্দ কিছুই আমি বুঝি না।' এই মহিলা মৃত্যুসংবাদ পেয়ে সবার আগে ছুটে আসবে না তো কে আসবে? এমনটাই হওয়া উচিত। বিপদের সময় পাশে না দাঁড়ালে কীসের আত্মীয়? কীসের আপনজন?

খাটের অন্যপাশে কুন্তলা তার চার বছরের ছেলে আদুকে ভাত খাওয়াচ্ছে। সিদ্ধ ভাত। ভাতের আড়ালে একটা ডিমও আছে। আদু ভাত খেতে চাইছে না। কুন্তলা ধমক দিয়ে খাওয়াচ্ছে।

নিকুঞ্জবাবু খাটের পাশে চুপটি করে দাঁড়ালেন।

শাশুড়ি-মহিলা তাঁর মেয়েকে বললেন, 'তাড়াতাড়ি কর। হুট বলতে কে এসে যাবে।'

তপন মুখ না ফিরিয়ে বলল, 'এসে যাবে তো কী হয়েছে?'

মহিলা চিবুক তুলে মুখের পিক সামলে বললেন, 'মরার বাড়িতে রান্নাবান্না ভাল দেখায় না। তার ওপর তোমার বাবার দেহ এখনও রয়েছে।'

তপন মুখ দিয়ে অবজ্ঞা ধরনের আওয়াজ তুলে বলল, 'ওসব আমি মানি না। আমিও খাব।'

মহিলা বললেন, 'আমি মানামানির কথা বলছি না। দেখানোর কথা বলছি। তোমার খাওয়াটা ঠিক হবে না তপন। কেউ দেখলে...।'

কুন্তলা তার মায়ের দিকে মুখ ফিরিয়ে কঠিন গলায় বলল, 'কী হবে মা? বাবা মরেছে বলে ছেলে উপোস করে থাকবে? এটা কেমন কথা বলছ? সবাই তো লুকিয়ে এটা-সেটা মেরে দিচ্ছে। তুমি কি ভাবছ এ বাড়ির বড়বউ তার স্বামীকে না খাইয়ে রেখেছে? ভোরবেলা চা দিল, বিস্কুট দিল। একটা ডিম পর্যন্ত ঝট করে ভেজে দিয়েছে। গোপালের মা আমাকে খবর দিয়েছে। তা ছাড়া উনি তোমার জামাইয়ের জন্য বাড়তি কী করেছেন? কিছুই নয়। কতদিন ধরে আদুর বাবা হাজার চল্লিশ টাকা চাইছে। এমনি চায়নি, বিজনেসের জন্য চাইছে। বাবা একটা ফিক্সড ভাঙালেই হেসে খেলে হয়ে যেত। শ্বশুরমশাই কিছুতেই শুনলেন না। দিচ্ছি, দেব বলে কাটিয়ে দিলেন। এখন তো বিশ বাঁও জলে। তার জন্য আমরা কেন বুক চাপড়ে কাঁদব?'

নিকুঞ্জবাবু সরে দাঁড়ালেন। এখানে এক মিনিটও নয়। এই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়াটাই নিরাপদ। যত দ্রুত পালানো যায় তত মঙ্গল।

কুন্তলার মা চাপা গলায় বলছেন, 'গাধার মতো কথা বলিসনি। শ্বশুর গেছে তো কী হয়েছে, এখন তোর শাশুড়িকে ম্যানেজে রাখতে হবে। টাকাপয়সা, বাড়িঘর ভাগাভাগির ব্যাপার আছে। যা ছেলেকে খাওয়ানো বন্ধ করে শাশুড়ির কাছে গিয়ে বস। গায়ে মাথায় হাত বোলা। এমনি বোলাবি না, সঙ্গে কাঁদবি।'

কুন্তলা গজগজ করে বলল, 'যাচ্ছি, কিন্তু কাঁদতে পারব না। তুমি তো জানো মা, টিভির সিরিয়ালগুলো ছাড়া চট করে আমার চোখে জল আসে না। তা ছাড়া মানুষটাকে কখনওই আমি পছন্দ করিনি। সারাদিন বাড়িতে বসে খালি ট্যাঁক ট্যাঁক আর ট্যাঁক ট্যাঁক। আলো নেভাও রে, কল বন্ধ করো রে, ছাদের দরজাটা খোলা কি না দেখে এসো রে, উফ হরিবল।'

নিকুঞ্জবাবু বেরিয়ে পড়লেন। তিনি কি চিন্তিত? মুখ দেখে মনে হচ্ছে চিন্তিত। আবার নাও হতে পারে। জীবিত মানুষের মুখ দেখে যা মনে হয়, মৃত মানুষের বেলায় তা নাও হতে পারে।

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দেখা হল মেয়ের সঙ্গে। 'দেখা হল' বলাটা ঠিক নয়। নিকুঞ্জবাবু ঝুমুরকে দেখতে পেলেও, ঝুমুর তাঁকে দেখতে পেল না। পাওয়ার কথাও নয়। ঝুমুরের পেছনে তার স্বামী, কিঙ্কর। মেয়ের হাতে রুমাল। জামাইয়ের হাতে ঢাউস সুটকেস। বর্ধমান থেকে আসছে বলে সুটকেস। নিশ্চয় এখানে ক'টা দিন কাটিয়ে ফিরবে।

নিকুঞ্জবাবু সিঁড়ির একপাশে সরে দাঁড়ালেন। ঝুমুরের মুখের দিকে তাকালেন। মেয়ের মুখ থমথমে এবং লালচে। আহা রে, নিশ্চয় খুব কান্নাকাটি করেছে। মেয়েটার এই এক দোষ। বড্ড নরম। বাবার একটা কিছু হল কি হল না কেঁদে ভাসাবে। এই তো গত বছর সামান্য ফ্লু নিয়ে কী কাণ্ড করল। সকালে খবর পেয়ে বিকেলের ট্রেনে চলে এসে কান্না জুড়ল। আর এ তো একেবারে মৃত্যু। কাঁদবে না?

মেয়ের কান্নায় বাবারা দুঃখ পায়, আজ অন্যরকম হল। নিকুঞ্জবাবু খুশি হলেন। তিনি মেয়ে-জামাইয়ের পিছু নিলেন।

ঝুমুর কোনও দিকে না তাকিয়ে চটি ফটফটিয়ে তার মায়ের ঘরে এসে থামল। নিকুঞ্জবাবুও ঢুকে পড়লেন বন্ধ জানলা গলে। সুরমাদেবী আধশোয়া অবস্থায় খাটে শুয়ে আছেন। চোখ বোজা। মাথার কাছে গোপালের মা হাতপাখা নিয়ে বাতাস করছে। দু'পাশে অন্তরা আর কুন্তলা দু'জনেই দাঁড়িয়ে। হাতে গ্লাস। দু'জনেই তাদের শাশুড়ির জন্য শরবত এনেছে। সম্ভবত সুরমাদেবী এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি, কোনটা তিনি খাবেন।

ঝুমুরের পায়ের আওয়াজে সুরমাদেবী চোখ খুললেন।

'এসেছিস?'

ঝুমুর ঝাঁকিয়ে উঠল, 'মা আমি এত পরে খবর পেলাম কেন?'

সুরমাদেবী বিরক্ত গলায় বললেন, 'এতে আগে পরের কী আছে? মানুষটা না মরলে মরার খবর দেব কী করে? তা ছাড়া স্বপন তো সকালেই ফোন করেছে।'

'ওটা সকাল হল? সাতটাটা কি সকাল? আমাদের আদ্দেক কাজ হয়ে যায়। তোমাদের বাড়ির মতো সবাই পড়ে পড়ে ঘুমোয় না।'

কথা শেষ করে বউদের দিকে আড়চোখে তাকাল ঝুমুর। অন্তরা চিমটিটা ধরে নিল। নিচু গলায় বলল, 'পড়ে পড়ে ঘুমোনোর কী আছে দিদি? গোটা রাতই তো আমরা জেগেছি।'

সুরমাদেবী মুখে আঁচল দিয়ে বললেন, 'এটা কোনও কথা নয়, বড় বউমা। বাড়ির কর্তা মারা যাচ্ছে, বাড়িসুদ্ধ সবাই জাগবে না তো কী করবে? নাক ডেকে ঘুমোবে? সত্যি তো তোমাদের ঝুমুরকে আরও আগে খবর দেওয়া উচিত ছিল।'

কুন্তলা জায়ের পক্ষ নিল। রিনরিনে গলায় বলল, 'সাতটা এমন কিছু দেরি নয়। বর্ধমান থেকে তো দশ মিনিট অন্তর অন্তর ট্রেন। সেরকম হলে কিঙ্করদার গাড়ি ছিল, এরকম একটা বিপদের দিনে তেল খরচ নিয়ে ভাবলে চলে না।'

কিঙ্কর বোকাসোকা মানুষ। চট করে সবটা ধরতে পারে না। সে সবসময়ই বউয়ের কথা অনুযায়ী চলতে চেষ্টা করে। কখন রাগবে, কখন খুশি হবে পারলে সেটাও জেনে নেয়। অপমান গায়ে লাগতে কিঞ্চিৎ বেশি সময় নিল। সে তার বউয়ের দিকে তাকাল। ঝুমুর গলা তুলল, 'ভাবতে তো হবেই। এখন থেকে সব খরচাপাতি নিয়েই ভাবতে হবে। নিজের বাড়ির টাকাপয়সা নিয়ে যেমন ভাবতে হবে, এ বাড়ির টাকাপয়সা নিয়েও ভাবতে হবে। বাবার সম্পত্তি শুধু ছেলের নয়, মেয়েরও।'

সুরমাদেবী বললে, 'উফ ঝুমুর। এখনও তোর বাবা পাশের ঘরে শুয়ে আছে, এসব কী শুরু করলি?'

বাবার মৃত্যুশোকে এতক্ষণ পর্যন্ত যে মন খুলে কাঁদবার সময় পায়নি সেই ঝুমুর এবার ফুঁপিয়ে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'শুরু আমি করেছি, না তোমার ছেলে আর তাদের বউরা শুরু করেছে মা? আমাকে বাবার মৃত্যুর খবর কেন দেরি করে দেওয়া হল আমি জানি না ভেবেছ? প্রমাণ করতে চাইছে, ঝুমুর কুণ্ডু এ বাড়ির কেউ নয়। এটা সহজ হবে না। এই বলে রাখলাম, পাই পয়সা সব বুঝে তারপর এ বাড়ি ছাড়ব।' কথা শেষ করে ঝুমুর তার স্বামীর দিকে ফিরে বলল, 'হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে আছ কেন? চলো, ঘরে চলো। কী জানি এরা বোধহয় আমার ঘরে এতক্ষণে তালা মেরে দিয়েছে। মেরে দিলে ক্ষতি নেই, উকিল ডেকে তালা ভাঙাব।'

দেয়াল বেয়ে নিকুঞ্জবাবু একতলায় এসে দাঁড়ালেন। মনটা বিষণ্ণ। খুবই বিষণ্ণ। এসব কী শুরু হয়েছে বাড়িতে! কী শুরু হয়েছে! এই তাঁর ছেলে-মেয়ে! এই তাঁর সংসার!

ভাবতে ভাবতে পাক দিয়ে বাড়ির পেছনে এলেন। বাগানে এসে দাঁড়ালেন। এদিকটা ভাড়াটেদের। ভাড়াটে বলতে দুটি মাত্র মানুষ। অল্পবয়সি স্বামী-স্ত্রী। চাকরি-বাকরি ছাড়া সারাদিন গান-বাজনা আর লেখাপড়া নিয়ে থাকে। এমনি গান-বাজনা নয়, গম্ভীর গান-বাজনা। ওয়েস্টার্ন ক্লাসিকস্। বেটোফেন, মোৎসার্ট, চাওকোভোস্কি। অনেক ঝাড়াই-বাছাই, ইন্টারভিউয়ের পর এদের একতলার পেছনের দুটো ঘর দিয়েছিলেন নিকুঞ্জবাবু। বাড়িতে লেখাপড়া, গান-বাজনার একটা পরিবেশ থাকা দরকার। সে নিজের ঘরেই হোক বা ভাড়াটের ঘরেই হোক। বাড়ি তো একটাই। ছেলে-মেয়ে দু'জনেই চমৎকার। এলেই ডেকে, ঘরে বসিয়ে খাতির যত্ন করেছে।

'এটা কী বাজছে হে?'

'ফিফথ সিম্ফনি মেসোমশাই।'

'ফিফথ সিম্ফনি! সেটা আবার কী!'

'এটা খুব বিখ্যাত একটা সুর। ভেতরে আসুন না মেসোমশাই। এক কাপ চা খেতে খেতে বাজনা শুনে যান।'

নিকুঞ্জবাবু ভেতরে গেছেন। সোফায় বসে বাজনা শুনতে শুনতে চা-বিস্কুট খেয়েছেন। চোখ বুজে মাথা নেড়েছেন। 'বিখ্যাত' সুর তাঁকে যতটা না আপ্লুত করেছে, তার থেকেও বেশি আপ্লুত করেছে, ভাড়াটেদের আচরণ। দশ-বারো দিন ভাড়া দিতে দেরি হলে গা করেননি কখনও। এই তো এ মাসের ভাড়া এখনও দেয়নি, তিনি কি তাড়া দিয়েছেন? দেননি। দেবেনই বা কেন? চমৎকার মানুষের থেকে কি ভাড়া বড় হল?

মৃত্যুর খবর পেয়ে এরা কী করছে? আজও কি গান-বাজনা শুনছে? দুঃখের বাজনা? বেহালা বা বাঁশি?

না, বাজনা শুনছে না। বাগানের ঝোপঝাড় আগাছার ওপর দিয়ে ভেসে নিকুঞ্জবাবু এসে দাঁড়ালেন ভাড়াটেদের ড্রইংরুমের জানলায়। ওই তো স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই বসে। হাতে বই। মুখ থমথমে। থমথমে হওয়ারই কথা। মাথার ওপর পছন্দের মানুষটা মরে পড়ে আছে, ওদের মুখ থমথমে হবে না তো কী হবে?

মেয়েটি বলল, 'খারাপ লাগছে।'

স্বামী মুখের সামনে থেকে বই সরিয়ে বলল, 'আমারও লাগছে বিপাশা।'

নিকুঞ্জবাবু সরে এলেন। তাঁর চোখদুটো আনন্দে চকচক করে উঠল। বিপাশা কাঁদোকাঁদো মুখে বলল, 'অনেক ভাগ্য করে এমন একজন বাড়িঅলা পেয়েছিলাম।'

ছেলেটি বলল, 'আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি না, কিন্তু এঁকে পেয়ে মনে হচ্ছিল, ভাগ্যই আসল।'

নিকুঞ্জবাবু মুগ্ধ। ইচ্ছে করছে, ঘরে ঢুকে পড়তে। তারপর সোফায় বসে হাসতে হাসতে বলবেন, 'এক কাপ চা খাওয়াও দেখি। আর ওই যে কী ফোনি আছে তোমাদের, বাজনাটা বাজাও। শুনতে শুনতে চা খাই।'

কিন্তু সে উপায় নেই। 'উনি' এক চক্কর ঘুরে দেখার অনুমতি দিয়েছেন। দেখা দেওয়ার অনুমতি দেননি। তাও আরও সরে এলেন নিকুঞ্জবাবু। একেবারে দরজার পাশে। নিজের জন্য অন্যের মায়া, শোক, প্রশংসা শোনার মধ্যে এত আনন্দ!

বিপাশা বলল, 'ভাগ্য বলে ভাগ্য। এমন বোকাহাঁদা বাড়িওলা কার কপালে জোটে বলো?'

ছেলেটি হাসল। পায়ের ওপর পা তুলে বলল, 'বোকা বলে বোকা? একেবারে গ্রেট বোকা। সেইজন্যই তো খারাপ লাগছে। বাজনা শুনিয়ে আর চা খাইয়ে হাঁদাটাকে তুমি যেভাবে ম্যানেজ করে রেখেছিলে বিপাশা, ভাড়া দিতে দেরি হলেও টুঁ-শব্দটা করত না। এমন গাধা তুমি কোথায় পাবে?'

বিপাশা খিলখিল করে হেসে উঠল।

'অ্যাই আস্তে। শুনতে পাবে।'

'কে?'

'গাধা বাড়িওলার গাধা ভূত।'

এবার দু'জনেই মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসতে লাগল।

নিকুঞ্জবাবু ছাদে। বেলা হল, রোদ কড়া হচ্ছে। নিকুঞ্জবাবু পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাম মুছলেন। পাঁচিল টপকে তাকালেন নীচে। অনেক মানুষ। কাচের গাড়ি এসে গেছে। দুই ছেলে সেই গাড়ি ফুল মালা দিয়ে সাজাচ্ছে চোখের জল মুছতে মুছতে। আহা রে! ঝুমুর আর পুত্রবধূদের অবস্থা আরও খারাপ। নতুন ধুতি পাঞ্জাবিতে মৃতদেহ সাজাতে সাজাতে কেঁদে ভাসাচ্ছে। চন্দন পরাচ্ছে বিপাশা। ভারী যত্ন করে পরাচ্ছে। নিকুঞ্জবাবু অবাক হলেন, এই মেয়ের এত গুণ!

সুরমা ইতিমধ্যে বার কয়েক ফিট গেছে। কাজল, আর বুলি তাকে সামলাচ্ছে। নিকুঞ্জবাবু স্ত্রীর ফিট যাওয়ার ঘটনায় চিন্তিত। এটা ঠিক নয়। শোকের জন্য নিজেকে অসুস্থ করা মোটে বুদ্ধিমানের কাজ নয়। সুরমাটা কোনওদিনই নিজের দিকে খেয়াল রাখে না।

নিকুঞ্জবাবু হাত উলটে ঘড়ি দেখলেন। সময় ফুরিয়ে এসেছে। এবার যাওয়ার পালা। দেরি করলে 'উনি' রাগ করবেন। দেরি করার দরকারও নেই। দেখাশোনা সবই হয়ে গেছে। খানিক আগে পুরনো অফিসেও টুঁ মেরেছিলেন তিনি। একেবারে লিফটে চেপে সোজা অ্যাকাউন্টসে। কত বছর যে এই ডিপার্টমেন্টে কাটিয়েছেন। টেবিল, চেয়ার, ফাইল সব জায়গাতেই মায়া পড়ে আছে।

সুদীপ্ত নিজের টেবিল থেকে চিৎকার করে বলল, 'খবর পেয়েছ অম্বরীশ, পাঠকদা গেছেন।'

উলটোদিকের টেবিলে বসে অম্বরীশ ফাইল ঘাঁটছিল। মুখ তুলে বলল, 'কোথায় গেলেন?'

সুদীপ্ত হাত তুলে আকাশ দেখাল। অম্বরীশ হেসে উঠল।

অম্বরীশ বলল, 'যাক নিজে বাঁচলেন, আমাদেরও বাঁচালেন। সপ্তাহে সপ্তাহে এসে আর জ্বালাবেন না। রিটায়ার্ড লোকগুলোর এই হয়েছে সমস্যা। ভাবে তাদের মতো অন্যদেরও বুঝি কাজকর্ম নেই।'

সুদীপ্ত হাসতে হাসতে বলল, 'বাপু হে, কাউকে পাঠিয়ে তাড়াতাড়ি একটা মালা ঘুষ দিয়ে এসো। ভূত হয়েও যেন আর এদিক মুখো না হয়।'

নিকুঞ্জবাবু পাঁচিলের ধার থেকে সরে এলেন। এগিয়ে গেলেন সিঁড়ির দিকে। ঠিক তখনই হালকা পায়ের আওয়াজ তুলে ছাদে উঠে এল আদু। চার বছরের ছোট্ট আদু। নিকুঞ্জবাবুর আদরের নাতি।

নিকুঞ্জবাবু থমকে দাঁড়ালেন। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ল আদুও। চোখ দুটো বড় বড় করে বলল, 'দাদু, তুমি! তুমি এখানে!'

নিকুঞ্জবাবু চমকে উঠলেন। আদু তাঁকে দেখতে পাচ্ছে! কী করে পাচ্ছে! 'উনি' তো সেই ক্ষমতা দেননি। বরং বারবার বলে দিয়েছেন, 'মনে রাখবেন নিকুঞ্জবাবু, আপনি দেখবেন, কিন্তু আপনাকে কেউ দেখতে পাবে না। আপনি চাইলেও পাবে না। মরা মানুষকে জ্যান্ত দেখা গেলে সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড হবে। নিয়মকানুন সব উলটেপালটে যাবে।'

তা হলে কী হল! ছোট্ট আদুর বেলায় নিয়ম কি উলটেপালটে গেল?

আদু দু'-পা এসে নিকুঞ্জবাবুর ডান হাতটা ধরল। সেই নরম আঙুল! সেই গরম গরম ছোঁয়া! নিকুঞ্জবাবুর শরীর কেঁপে উঠল। মৃত শরীরে প্রাণের কাঁপন!

'ছাদে কী করছ দাদু?'

নিকুঞ্জবাবু নিচু হয়ে নাতির মুখের কাছে মুখ নিয়ে হেসে বললেন, 'কিছু নয় রে বেটা। চলে যাওয়ার আগে বাড়িটা একবার ঘুরে নিচ্ছি।'

আদু আবদারের ঢঙে বলল, 'না, তুমি যাবে না।'

'ছি সোনা, অমন বলতে নেই।'

'যাবে না, যাবে না, যাবে না।'

নিকুঞ্জবাবু হাসার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'নীচে সবাই অপেক্ষা করছে। গাড়ি এসেছে, ফুল এসেছে।'

'করুক, তোমাকে আমি ছাড়ছি না। এসো তুমি আর আমি ঘুড়ি ওড়াই। তুমি কিন্তু লাটাই ধরবে, এই বলে রাখলাম।'

দাঁত চেপে নিজেকে সামলালেন নিকুঞ্জবাবু। তিনি কি এইটুকু শোনার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন?

'ও কথা বললে কি হয় বাবা? সময় হলে তো যেতেই হবে। তা ছাড়া দেরি করলে উনি যে রাগ করবেন দাদুভাই।'

ছোট্ট আদু তার চোখের ছোট্ট জল মুছে বলল, 'উনি কে দাদু?'

নিকুঞ্জবাবু নাতির মাথায় হাত রাখলেন। প্রশ্ন এড়িয়ে মুচকি হেসে বললেন, 'ভাল থেকো বাবা। দুষ্টুমি কোরো না। মা'র কথা শুনবে, কেমন?

আদু ঘাড় কাত করল। বলল, 'আবার আসবে তো?'

নিজের মৃত্যুতে মানুষ কখনও কাঁদে? কখনও কাঁদে না। নিকুঞ্জবাবুর চোখে তা হলে কীসের জল?

'আসব সোনা, নিশ্চয় আসব।'

নিকুঞ্জবাবু চলে যাচ্ছেন। তাঁর ভাল লাগছে না। মনে হচ্ছে, আর একটু থেকে যাই। আর একটুখানি।

শববাহী গাড়ি স্টার্ট নিল।

পুঃ গল্পটি লেখার পর প্রকাশের আগেই শুনি গল্পের সঙ্গে নাকি সিনেমার কাহিনির কিছু মিল পাওয়া যাচ্ছে। সিনেমাটি আমি দেখিনি। গভীর আগ্রহে সেই গল্পটি তখন শুনি। না, মিল নেই। বাইরের চেহারা দেখে কিছু বিভ্রম হয়েছে মাত্র। আসলে এই গল্পের সঙ্গে যে কাহিনির মিল আছে, সেটি হল...।

শারদীয় আজকাল, ১৪১৫

জলছাপ

১

সমস্যাটা শুরু হল খুব আবছাভাবে।

দুপুরে স্কুল থেকে ফিরে তালা খুলে ঘরে ঢুকছিল সুগত। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ, এক হাতে ছাতা, অন্য হাতে ক্লাস সেভেনের এক বান্ডিল হাফ ইয়ারলি পরীক্ষার খাতা। সব সামলে ঘরের ভেতর পা রাখতেই থমকে দাঁড়াল সুগত। কেমন একটা অস্বস্তি হল। মনে হল, ঘরে কিছু একটা হয়েছে। বড় কিছু নয়, ছোটখাটো কিছু। কিন্তু হয়েছে।

বৈশাখের গনগনে দুপুরেও ছোট এই ঘরটা ঠান্ডা। ছায়া ছায়া অন্ধকার। বাইরে থেকে হঠাৎ ঢুকলে আরাম হয়। চোখ সইতে খানিকটা সময় নিল সুগত। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে চারপাশে তাকাল। পুব-দক্ষিণ দুটো জানলাই বন্ধ। বারান্দার দিকের দরজাটিতে ছিটকিনি তোলা। খাটের ওপর অগোছালো পড়ে আছে বালিশ, চাদর। মশারির একটা খুঁট এখনও দেয়ালের পেরেকে বাঁধা। বাকিটুকু গা এলিয়ে পড়ে আছে বিছানার ওপর। বাথরুমের সামনে ছাড়া লুঙ্গি, জামা, গেঞ্জি ছড়ানো। ঘরে পরবার চটি ছিটকে আছে মাঝপথে। একটা পাটি কাত হয়ে রয়েছে আলসে ভঙ্গিতে। সুগত টেবিলের দিকে ফিরল। না, সেখানেও কোনও গোলমাল নেই। বইপত্র ছড়ানো, স্কুলের খাতা ডাঁই করা। চেয়ারের হাতলে গামছা ঝুলছে। একটা সময় ছিল যখন চেয়ারে গামছা, তোয়ালে দেখলে বিরক্ত হত সুগত। এখন আর হয় না।

না, ঘরের সবকিছু একইভাবে রয়েছে। বেরোবার আগে ঠিক যেমন রেখে গিয়েছিল। একচুলও এদিক-ওদিকও হয়নি কিছু। তা হলে কী হল?

সুগত মনে মনে নিজেকে ঝাঁকানি দিল। নিশ্চয় মনের ভুল। এতটা পথ কড়া রোদে হেঁটে আসার পর হঠাৎ প্রায় অন্ধকার ঘরে ঢুকে ভুল মনে হচ্ছে। হতেই পারে। আশ্চর্যের কিছু নয়। আলোর ফারাক শুধু যে দৃষ্টিতে বিভ্রম ঘটায় এমন নয়, মুহূর্তের জন্য মনকে ভুল বোঝাতে পারে। এখনও নিশ্চয়ই তাই হয়েছে। কিছু হয়নি, তবু মনে হয়েছে কিছু একটা হয়েছে।

সুগত ছাতাটাকে দাঁড় করিয়ে রাখল দরজার পাশে। কলকাতায় ফোল্ডিং ছাতায় কাজ চলে যায়। এখানে চলে না। এখানে রোদ জল বেশি। ঢাউস ছাতা সঙ্গে না রাখলে বিপদ। আড়াই বছর আগে যখন স্কুলে চাকরি পেয়ে এখানে প্রথম আসে সুগত, তখন ফোল্ডিং ছাতাই এনেছিল। সবাই হেসে বলল, 'দূর, ওসব শহুরে ফ্যাশন গাঁয়ে চলে না। গ্রামের

বৃষ্টিতে যেমন ঝাপটা, রোদে তেমন তাত। ও জিনিসে কোনও কাজ হবে না বাপ। জায়গাটা যদিও পুরো গ্রাম নয়। হাতে গোনা কয়েকটা পাকা বাড়ি আছে তো বটেই, স্টেশন, বাজার একটা সিনেমা হলও আছে। তবে মাঠ, পুকুর, গাছপালা, কাঁচা রাস্তা, ধানখেতটাই বেশি। পরের মাসেই সুগত বেতের হাতলওলা এই বুড়োটে ছাতা কিনে নিল।

কাঁধের ব্যাগটা টেবিলে ফেলে সুগত খাতার বান্ডিলটা নামিয়ে রাখল নীচে। সুইচ টিপে ফ্যান চালিয়ে ঘামে ভেজা জামাটা খুলতে খুলতে চেয়ারে বসল পা ছড়িয়ে। ফ্যানে জোর নেই, এখানে ভোল্টেজের অবস্থা শোচনীয়। ফ্যান ঘোরে, কিন্তু হাওয়া দেয় না। বেশিরভাগ দিনই সন্ধের পর আলো জ্বেলে লেখাপড়ার উপায় নেই। ঝড় জল হলে তো সেটুকুও গেল। গাছ পড়ে, কাঠের পোস্ট উলটে অবস্থা ভয়াবহ। কারেন্ট থাকে না। ফিরতে সাতদিনও হয়ে যায়।

ঝিনুক বলেছিল, 'একটা ফ্রিজ নিলে হত না?'

সুগত অবাক হয়ে বলেছিল, 'ফ্রিজ!'

'হ্যাঁ, বাপের বাড়িতে ছোট ফ্রিজটা তো পড়েই আছে। পড়ে পড়ে নষ্ট হচ্ছে। আনলে আর কিছু না হোক মাঝেমধ্যে ঠান্ডা জল খাওয়া যেত।'

সুগত হেসে বলল, 'খেপেছ ঝিনুক? এখানে ফ্রিজ চালাবে কী দিয়ে? কারেন্ট কোথায়? দেখছ তো আলোই জ্বলতে চায় না। কেরোসিনে যদি চালাতে পারো তো বলো নিয়ে আসি।'

'ঠিক আছে, ফ্রিজ না হোক, টিভি তো আসবে? সারাদিন ঘরে বসে করবটা কী?'

'কেন, আমার সঙ্গে গল্প করবে।' সুগত মজা করতে যায়।

ঝিনুক মজা বুঝতে পারে না। বলে, 'তুমি বুঝি সারাদিন ঘরে থাকো যে তোমার সঙ্গে গল্প করব?'

সুগত বলে, 'কতটুকু সময় আর বাইরে থাকি? স্কুলের পরেই তো সোজা বাড়ি। এই গণ্ডগ্রামে ইচ্ছে করলেও যাওয়ার জায়গাটা কোথায়? দুটো কথা বলার লোক নেই। সেই কারণেই তো তাড়াহুড়ো করে বিয়ে করে ফেললাম। আর কেউ না হোক বউয়ের সঙ্গে তো গল্প করা যাবে।'

কথা শেষ করে হাসল সুগত। ঝিনুক হাসল না। বলল, 'তা হোক, একটা টিভি এনে দাও। দুপুরটুকু তো সময় কাটবে।'

'টিভি কি চলবে? স্কুলের মাস্টাররা বলে টিভি এখানে চলে না ঠিকমতো। দু'-একজনের বাড়িতে আছে বটে কিন্তু দেখা যায় না। ফুলদানির মতো সাজিয়ে রাখতে হয়। এখানে রেডিয়োর এক হাল। চালালেই ঘস ঘস করে। সিগন্যাল পায় না।'

'ঠিকমতো চলার দরকার নেই। যেটুকু চলবে তাতেই হবে। সারাদিন একা থাকতে বিরক্ত লাগে।'

'একা থাকো কেন? মাঝেমধ্যে দোতলায় যেতে তো পারো। বাড়িওলার স্ত্রীর সঙ্গে দুটো কথা বলে এলে। ওকেও ডাকতে পারো নীচে। মহিলা খারাপ নয়।'

ঝিনুক মুখ ফিরিয়ে বলে, 'ওসব আমার ভাল লাগে না।'

'কীসব? ওই মহিলাকে?'

'না। এখানে কাউকেই ভাল লাগে না।'

সুগত স্ত্রীর দিকে তাকায়। রোগা হলেও টলটলে মুখের এই মেয়ে যথেষ্ট সুন্দরী। রং খুব ফরসা না হলেও একটা উজ্জ্বল ভাব আছে। টিকালো নাক, টানা টানা ভুরুতে আরও ভাল দেখায়। তার ওপর মেয়ে শান্ত আর চুপচাপ বিয়ের আগেই জেনেছিল সুগত। কলকাতা থেকে বড়মাসি ফটো পাঠিয়ে বলেছিল, 'তুই নিজে এসে একবার মেয়ে দেখে যা সুগত। দেখতে শুধু সুন্দর নয়, মেয়ে ভারী শান্তশিষ্ট। আজকালকার মেয়েদের মতো হুটোপাটি করা মেয়ে নয়। মনে হল, কথাও কম বলে। তোর মতো শান্ত ছেলের জন্য এরকম মেয়েই ভাল। মন দিয়ে ঘর সংসার করবে।'

বিয়ের ক'দিনের মধ্যেই সুগত বুঝেছিল, ঝিনুক একটু বেশিরকমের চুপচাপ। এতটা চুপচাপ আবার ভাল নয়।

সুগত নরম গলায় বলল, 'এমন করলে চলবে কী করে ঝিনুক? এখানে যখন থাকবে সবার সঙ্গে মিলেমিশেই তো থাকতে হবে।'

ঝিনুক নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলে, 'আমি নিজের মতো বেশ থাকি। টিভি কি তুমি আনবে? নাকি বাবাকে পাঠিয়ে দিতে বলব?'

ছোট একটা টিভি সেট কলকাতা থেকে কিনে এনেছিল সুগত। খাটের পায়ের কাছে উঁচু টুল পেতে রাখাও হল। কিন্তু ওই রাখাই পর্যন্ত। একেই তো কেব্‌ল লাইন নেই। দুরদর্শনের যেটুকু দেখা যায়, তাও হয় কাঁপে, নয় ঝিরঝির করে। বেশিক্ষণ তাকালে মাথা ধরে যায়। টুলের ওপর এখনও সেই টিভি রয়েছে। সুগত ঠিক করেছে, এবার কলকাতায় গেলে জিনিসটা রেখে আসবে।

গত ছ'মাস ধরে প্রতিদিনই স্কুল যাওয়ার আগে দরজা-জানলা বন্ধ করে বেরোয় সুগত। বড় কিছু না হলেও ছিঁচকে চুরির ভয় আছে এখানে। তার ওপর একতলা। জানলা-দরজা খোলা পেলে শিক ঢুকিয়ে কাপড় জামা তুলে নিতে পারে। স্কুলের মাস্টাররা প্রথমেই সাবধান করে রেখেছিল, 'ওই কম্মটিও কোরো না। বিরাট চোরের জায়গা।' বিরাট চোরের জায়গা না হলেও সুগত সাবধানই হয়েছিল। বারান্দায়ও কিছু ফেলে রাখে না। গ্রিল-টিলের বালাই নেই। বাড়িতে কেউ থাকলে ঠিক আছে। না থাকলে বিপদ। ঝিনুক আসার পর সুগত ঠিক করেছিল, বাড়িওলার সঙ্গে কথা বলে বারান্দায় গ্রিল আর সদরে কোলাপসেবলের ব্যবস্থা করবে। করছি করব বলে আর হয়ে ওঠেনি।

বারান্দার দরজা খুলে গামছা রাখতে গেল সুগত। বাইরে গরম হলকা। সত্যি এখানে শীত, বর্ষা, গরম সবই বেশি। লেবু চিনি দিয়ে এক গ্লাস শরবত খাওয়ার জন্য মনটা ছটফট করে উঠল সুগতর। লেবু কি ঘরে আছে? রান্নাঘরে গিয়ে দেখতে ইচ্ছে করছে না। কালির মা থাকলে হত। শরবত করে দিতে পারত। কিছুদিন আগে কালির মাকে প্রস্তাব দিয়েছিল, দুপুরটুকু সে যদি থেকে যায়। এতটা সময় বাড়িটা ফাঁকা থাকে। বাড়িওলা স্ত্রীকে নিয়ে গেছেন ইন্দোর। ছেলের কাছে। নাতি হয়েছে। কয়েক মাসের

আগে ফেরার কোনও সম্ভাবনা নেই। গোটা বাড়িটাই খাঁ খাঁ করে। সুগত কালির মাকে বলেছিল, 'অতটা পথ হেঁটে বাড়ি ফিরবে কেন কালির মা? তার থেকে বরং খেয়েটেয়ে এখানেই বিশ্রাম নিয়ো। বিকেলে একেবারে রান্না-টান্না সেরে যেও'খন। ততক্ষণে আমিও চলে আসব স্কুল থেকে।'

বুড়ি রাজি হয়নি। 'বউদি'র ঘটনার পর এ বাড়িতে তার একা থাকা নাকি অসম্ভব।

'কেন?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করে সুগত।

কালির মা উত্তর দেয়নি। মাথার ঘোমটা টেনে ঘর ঝাঁট দিতে শুরু করে। সুগত আবার বলে, 'আগে তো ছিলে। তখনও তো ঝিনুক আসেনি। আমার বিয়ের আগে। ছিলে না?'

বুড়ি বলে, 'সে ছিলাম ছিলাম। এখন পারব না।'

সুগত নিচু গলায় বলে, 'ঘটনা তো এখানে হয়নি, যা হওয়ার হয়েছে কলকাতায়।'

কালির মা বলে, 'ওই একই হল। মেয়েটা তো এখানেও ছিল।'

সুগত বিষণ্ণ হেসে বলে, 'এখন তো আর নেই।'

কালির মা বিড়বিড় করে বলে, 'অমন চট করে কি কেউ যায় গো?'

সুগত বুঝতে না পেরে বলে, 'মানে!'

বুড়ি উত্তর দেয় না কোনও। সুগতও আর কথা বাড়ায়নি। আড়াই বছর আগে সে যখন চাকরি পেয়ে এখানে এসে ঘর নিল, বাড়িওয়ালার স্ত্রী বলেছিল, 'কালির মাকে রেখে দাও। কাচাকুচি তো পারেই, রান্নাবান্নার হাতও খারাপ নয়, ভাল। তুমি ব্যাচেলর মানুষ। একটা লোক তো লাগবে। সবথেকে বড় কথা হল মানুষটা বিশ্বাসী।' কালির মাকে রেখে দিল সুগত। বাড়িওয়ালার স্ত্রী সবটা ঠিক বলেনি। কালির মায়ের রান্নাবান্নার হাত খুব খারাপ। কিন্তু মানুষটা সত্যি বিশ্বাসী। বুড়ির কামাইয়ের স্বভাব নেই। ঝিনুক আসার পর সুগত ভেবেছিল, ঘর সংসারের সব দায়িত্ব সে নিজের হাতে তুলে নেবে। জলতোলা, কাচাকাচি, ঝাড়পোঁছের মতো বড় খাটাখাটনি না করুক, রান্নাবান্না অন্তত দেখবে। প্রথম ক'টা দিন শুরু করলেও সেই উৎসাহ খুব দ্রুত ফুরিয়ে যায় ঝিনুকের। কী রান্না হবে শুধু সেটুকু বলেই থেমে যেত। কোনও কোনও দিন তাও বলত না। কালির মা জানতে চাইলে বলত, 'দেখো না, দাদাবাবু কী বাজার করেছে।' এমনকী চা করতেও তার ছিল অনীহা। সুগতর চায়ের নেশা বেশি বলে বড় একটা ফ্লাস্কের ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কালির মা ভরে রেখে যেত। একেকদিন খেতে বসে সুগত বলত, 'রান্নাটা তো তুমি করতে পারো ঝিনুক। রোজ রোজ কালির মায়ের রান্না কি মুখে তোলা যায়?'

ঝিনুক ভাত নাড়তে নাড়তে বলত, 'কেন? আমি তো বেশ পারি।'

সুগত গম্ভীর হয়ে বলত, 'ও।'

পরের দু'দিন রান্নাঘরে ঢুকত ঝিনুক। ব্যস ওই দু'দিনই। আবার যে কে সেই। ঝিনুক শুয়ে বসে, বই পড়ে, ঝিরঝিরে টিভি আর খসখসে রেডিয়ো নিয়ে সময় কাটাত।

মাসখানেক পরে বড়মাসিকে ফোন করেছিল সুগত। সম্বন্ধ তিনিই দেখেছিলেন। ভালমন্দ তাঁকেই আগে জানানো উচিত। বড়মাসি বললেন, 'ও কিছু নয়। বড়লোকের আদুরে মেয়ে, নিজের বাড়ি ছেড়ে গেছে। বয়সও কম। দেখবি ঠিক মন বসে যাবে।'

বউয়ের 'মন বসা'র জন্য অপেক্ষা করতে লাগল সুগত। একমাস, দু'মাস, তিনমাস। লাভ হল না। ঝিনুকের মন বসল না।

আজ স্কুল ছুটি হয়ে গেছে বেলা দুটোর কিছু পরে, চার পিরিয়ড হয়ে। পাড়াগাঁয়ের স্কুলে মাঝপথে ছুটি কোনও ঘটনা নয়। যে-কোনও ছুতোনাতা একটা পেলেই হল। ঘোর বর্ষা, হাড়কাঁপানো শীত, ঠা ঠা পোড়া গরম তো আছেই, এর সঙ্গে রয়েছে মাস্টারমশাইদের কামাই, কমিটির বৈঠক, স্কুল মাঠে পলিটিক্যাল পার্টির সভা। শ্রীজ্ঞানদানন্দ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আরও এক কাঠি ওপরে। প্রধান শিক্ষক মঙ্গলাচরণ মিত্র নিজেই 'ছুতোনাতা' খুঁজে বের করেন। কিছুদিন হল মনীষীদের জন্মমৃত্যুর দিনেও তিনি ছুটির ব্যবস্থা চালু করেছেন। মনীষী বুঝে ছুটি। খুব চেনা হলে হাফ, কম চেনা হলে কোয়ার্টার।

আজ যেমন হাফ ছুটি হয়েছে। তবে মনীষীদের জন্য নয়, ছুটি হয়েছে জলের অভাবে। স্কুলের একমাত্র টিউবওয়েল গড়বড় করছে। ছাত্রদের অভিযোগ পেয়ে হেডমাস্টার নিজে তদন্ত করতে যান। তদন্তে দেখা যায় ঘটনা সত্যি। টিউবওয়েলের হাতলে সমস্যা। এরপর ইচ্ছে থাকলেও স্কুল চালু রাখা সম্ভব নয়।

জলের কথা মনে পড়তে শরবতের ইচ্ছেটা আরও তীব্র হল সুগতর। ক্লান্তভাবে অগোছালো ঘরের দিকে তাকাল সুগত। কালির মা তিনদিন ধরে কামাই করছে। তার নাতি খবর দিয়ে গেছে, দিদিমার জ্বর। জ্বর বেশি নয়, তবে শরীর দুর্বল। প্রথমদিন নিজেই স্টোভ জ্বেলে ভাতে ভাত করে নিল সুগত। এখানে এসে চালিয়ে নেবার মতো রান্নার অভ্যেস তৈরি হয়ে গিয়েছিল। পরে স্টেশনের কাছে হোটেলে গিয়ে খাওয়ার ঝামেলা সারত। কালির মা আসায় ব্যবস্থা পালটায়। বিয়ের পর তো কথাই নেই। তবে এই ক'দিন আবার হোটেলে খাচ্ছে। হোটেলের মালিক লোক ভাল। একটু বেশি কথা বলে এই যা। একসময় নাকি জ্ঞানদানন্দ স্কুলের ছাত্র ছিল। সত্যি মিথ্যে কে জানে। মাস্টারমশাইয়ের জন্য কম তেল মশলা দিয়ে মাছের ঝোল রেঁধে দেয়। খাওয়ার সময় টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকে। রোজই একসুরে বলে, 'আহা, বউদি মানুষটা বড় ভাল ছিল গো। আমার হোটেলে কোনওদিন আসেনি ঠিকই, কিন্তু লোকের মুখে কত প্রশংসাই শুনেছিলুম। বড় শান্তশিষ্ট, লক্ষ্মীমন্ত মেয়ে ছিল... মাস্টারমশাই আর একটু ভাত দিতে বলি? আর একটা মাছ নিন না। গাদার দিকের একপিস?'

সুগত কোনও কথা বলে না। শুধু মাথা নেড়ে 'না' বলে।

গত দু'দিন ঘরদোরের দিকে নজর দেয়নি সুগত। এমনকী মশারির সবকটা খুঁট পর্যন্ত পেরেক থেকে খোলে না। সন্ধের পর টেবিলে বসেই স্কুলের কাজ-টাজ সারে। মাঝখানে একবার ঘরে তালা দিয়ে একটু হেঁটে আসে। তখনই হোটেল থেকে তিনটে রুটি আর ভাঁড়ে করে খানিকটা তরকারি নিয়ে ফেরে। পরশু ডিম ভেজে নিয়েছিল। রাতের খাওয়া সেরে কোনওদিনও শুয়ে পড়ে, কোনওদিনও বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে থাকে খানিকক্ষণ। বারান্দাটা একফালি হলেও সামনেটা অনেকখানি খোলা। মাঠ চলে গেছে রাস্তা পর্যন্ত। গাছপালাও প্রচুর। ফলে ধুলোবালির দাপটও কম নয়। কাল স্কুল থেকে ফিরে ঘর ঝাঁট দিয়েছিল সুগত। তাতে কাজ হয়নি। ধুলো যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেছে।

শুধু রান্নাবান্না নয়, অন্য কাজেও ঝিনুকের উৎসাহ ছিল না। হয় বিছানায় চিত হয়ে গল্প উপন্যাসের পাতা ওলটাত, নয়তো বারান্দায় বেতের চেয়ারটায় বসে থাকত সারা বিকেল। তবে সাজগোজে আলিস্যি ছিল না। গরমে তিনবার পর্যন্ত গা ধুত। ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসে অনেকটা সময় নিয়ে ক্রিম ঘষত গালে, হাতে, পায়ে। কাজের মধ্যে খুব বেশি হলে কোনওদিন হয়তো আলনাটা গোছাল একটু, বালিশের ওয়াড় বদলাল দুটো। কখনও সুগতর টেবিলের বই খাতাগুলো নেড়েচেড়ে রেখে দিত একইভাবে। যেন গুছোচ্ছে না, যেন সময় কাটাচ্ছে অলসভাবে। বড়মাসির মতোই সুগত ভেবেছিল, মন খারাপ। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বুঝতে পারল, না, মন খারাপ নয়। ঝিনুক আসলে এই ঘরসংসার নিজের বলে মেনে নিতে পারছে না। একসময় সুগত অল্প অল্প বলতে শুরু করল। সরাসরি নয়, বলতে শুরু করল ঘুরিয়ে।

'মেঝেতে ধুলো কিচকিচ করছে।' অথবা, 'ইস দেয়ালে কত ঝুল।' বা 'রান্নাঘরটা তো নরক হয়ে রয়েছে।'

ঝিনুক শুনেও শুনত না। অন্যমনস্কভাবে হাই তুলত। আড়মোড়া ভাঙত। বড় বড় সুন্দর চোখদুটোকে নিষ্প্রাণ করে বলত, 'কালির মাকে কালকে বলে দেব।' বিরক্ত হতে লাগল সুগত। এমনটা নয়, ঝিনুক এখানে না জেনেশুনে এসেছে। সম্বন্ধ হওয়ার সময়েই জানত, ছেলে গাঁয়ের স্কুলে মাস্টারি করে। বিয়ের পর তাকে সেখানে গিয়েই থাকতে হবে। সেখানে বালিগঞ্জের ফ্ল্যাটও নেই, রাজপ্রাসাদও নেই। তবে মাটির ঘরে তো আর উঠতে হয়নি। এখানে যতটা ভাল পাওয়া সম্ভব তার মধ্যেই ব্যবস্থা হয়েছে। ঘর মাত্র একটা হলে কী হবে, অ্যাটাচড বাথরুম। ঘরের পাশেই রান্নার ব্যবস্থা। বিয়ের পরপর বাড়ি বদলানোর সিদ্ধান্তর কথা ভেবেছিল সুগত। দুই বা দেড় কামরার যদি কিছু পাওয়া যায়। খোঁজখবর করতে পাওয়াও গেল দু'-একটা। কিন্তু কোনওটাই সুবিধের হল না। ঘর বেশি তো বাথরুম অনেকটা দূর। উঠোন পেরিয়ে যেতে হয়। ঝিনুক রাজি হল না। সুতরাং একঘরে থাকার জন্য সুগত দায়ী এমন নয়। পরিস্থিতিই বাধ্য করেছে।

সুগত আবার তার বড়মাসিকে বলল, 'সংসার নিয়ে এত নির্লিপ্ত, এত উদাসীন হলে চলবে কেন?'

বড়মাসি ঢোঁক গিলে অপরাধীর গলায় বললেন, 'বোঝানোর চেষ্টা কর। ভাল করে বুঝিয়ে বললে, নিশ্চয় শুনবে।'

চেষ্টা করল সুগত। রাতে কাছে টেনে নিয়ে গাঢ় স্বরে বলল, 'কী ব্যাপার বলো তো ঝিনুক? শরীর-টরির খারাপ হয়নি তো?'

ঝিনুক সুগতর দিকে সরে এসে বলে, 'কই, না তো!'

'তা হলে? তা হলে তোমার সমস্যাটা কী?' শান্তভাবে ঝিনুকের বাহারি রাত পোশাক খুলতে খুলতে জিজ্ঞেস করে সুগত। নিজের উন্মুক্ত বুকদুটো স্বামীর শরীরে লুকোতে লুকোতে ঝিনুক বলে, 'কীসের সমস্যা?'

সুগত বউয়ের গলায় ঠোঁট রেখে আদর করে। নাকে ক্রিম পাউডারের তীব্র গন্ধ আসে। পিঠে দু'হাত রেখে চাপ দেয়। বলে, 'এই যে তুমি সারাদিন শুয়ে বসে থাকো, মুখ ফিরিয়ে

থাকো সংসার থেকে...। ভাল লাগে না? আমার ঘরদোর, আমাকে ভাল লাগে না তোমার?'

নগ্ন শরীরে লজ্জা পায় ঝিনুক। অন্ধকারেও চোখ বোজে। ফিসফিস করে, 'এই তো লাগছে।'

বউয়ের ঠোঁটে, চিবুকে হাত বোলাতে বোলাতে সুগত বলে, 'আমি জানি এখানে তোমার ভাল লাগার মতো কিছুই নেই ঝিনুক। কলকাতার মতো বন্ধুবান্ধব, হইচই কিছুই নেই। তবু মানিয়ে তো নিতে হবে,' কথা শেষ করে ঝিনুকের গায়ে হাত রাখে সুগত। হাত সরিয়ে দিতে চেষ্টা করে ঝিনুক। ফিসফিসিয়ে বলে, 'আচ্ছা, চেষ্টা করব।'

সুগত খুশি হয়ে জড়িয়ে ধরে বউকে।

কিন্তু ওই রাতের কথাটুকুতেই সব শেষ। ঝিনুক মানানোর কোনও চেষ্টাই করে না। দিনকয়েক পরে সুগত গলা চড়ায়। মেজাজ দেখায়। তবে ঝিনুককে নয়, রাগ দেখায় কালির মাকে। ঘরে ধুলো ময়লা দেখলে ঝিনুককে শুনিয়ে বকাবকি করে। বাসি জামাকাপড় অগোছালো দেখলে ধমক দেয়।

ঝিনুকের কিছু এসে যেত না। সে উঠে বাথরুমে যেত। দরজা আটকে দীর্ঘ সময় ধরে স্নান করত। বেরিয়ে শান্ত ভঙ্গিতে ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসত পাউডারের কৌটো নিয়ে। তখন সুগত স্কুলে যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করছে। তার দেরি হয়ে গেছে।

এক বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে রান্নাঘরে গিয়ে সুগত দেখল, খাবার জল নেই। আগে কুঁজো ছিল। বিয়ের পর বড় মাটির জালা কেনা হয়েছে। জল ঠান্ডা থাকে। সকালেই জালা ভরতি করে রাখতে হয় এখানে। নইলে টানাটানি হয়। জ্বালা ফাঁকা দেখে চিৎকার করতে গিয়েও নিজেকে সামলেছিল সুগত। ঘরে ফিরে দেখেছিল, ঝিনুক গায়ের কাপড় আলগা করে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। সুগত অনুভব করল, শিকড় গাড়তে পারছে না ঝিনুক। চাইছেও না। সংসারে নিজেকে ভাসিয়ে রেখেছে পাতার মতো। সুগত দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল। মনে মনে বুঝেছিল, বাকি জীবনটা এভাবেই চলতে হবে তাকে। চলতে হবে ঘরসংসারে উদাসীন এক স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে।

এর দু'মাসের মধ্যে ঝিনুক সন্তানের জন্ম দিতে কলকাতায় চলে যায়। সুগত মৃদু আপত্তি করেছিল।

'আর কটাদিন থেকে যেতে পারতে। এখনও তো অনেকটা দেরি আছে।'

'না, বাবা-মা রাগারাগি করছে।' ঝিনুক চাপা অথচ জোর গলাতেই বলে। এর অর্থ তার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গেছে।

'রাগারাগি। কেন রাগারাগি করছে কেন?'

'বলছে, এখানে ভাল ডাক্তার নেই। এই সময়টা নিয়মিত চেকআপের দরকার। ব্লাড কাউন্ট রাখতে হবে, প্রেশার, সুগার সব মাপতে হবে। তা ছাড়া এখানে খাওয়াদাওয়ার সমস্যা।'

সুগত ভুরু কুঁচকে বলল, 'কেন বাজার-টাজার তো রোজই করছি। এদিকে শাকসবজি, ফলমূল সবই টাটকা। মাছও একেবারে পুকুরের। টেস্টই আলাদা। আমার তো কলকাতার মাছ মুখেও রোচে না আজকাল।'

ঝিনুক খাটের তলা থেকে সুটকেস টানতে টানতে বলল, 'টাটকাটা বড় কথা নয়। এই সময় সব মেয়ের বাবা-মা-ই মেয়েকে নিজের কাছে রাখতে চায়। একটু যত্ন আত্তি করতে চায়?'

'তুমি যা ভাল বোঝো।'

'বাচ্চা হওয়ার পরও কিন্তু আমি কলকাতায় থাকব বেশ কিছুদিন। অতটুকু বাচ্চাকে নিয়ে এখানে এসে থাকার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সে ঝুঁকি নিতে পারব না।'

সুগত চুপ করে গিয়েছিল। ভাল ডাক্তার নেই কথাটা সত্যি। ঝিনুক অ্যানিমিক। সত্যি নিয়মিত চিকিৎসকের নজরদারিতে থাকা দরকার তার। কিন্তু খাওয়াদাওয়ার সমস্যা কথাটার মধ্যে ঠেস আছে। অথবা কে জানে, চলে যাওয়ার সুযোগ পেয়ে দ্রুত পালাতে চাইছে। পুরো একটা দিন ভাবে সুগত। ভেবে দেখে, সত্যিই তো, এখানে যত্ন কোথায়? মাঝেমধ্যে স্বামীর ভালমন্দ বাজার করে আনার মধ্যে আদর সোহাগ থাকতে পারে যত্ন থাকে না। যে মেয়ের সংসারে মন বসেনি, স্বামীর আদর সোহাগে তার কী এসে যায়? সুগত পরের শনিবার বউকে নিয়ে কলকাতায় রওনা দেয়।

ঝিনুককে কলকাতায় রেখে এসে আবার ব্যাচেলর জীবন শুরু হল। গোড়ার দিকের সেই অগোছালো জীবন। বিছানা না তুললেও চলে, ঘরে ধুলোবালিতে অসুবিধে নেই। দু'দিন যেতে না যেতে মনে হল, এই ভাল। ঝাড়া হাত পা।

তখনও সুগত জানত না, সেটাই ছিল ঝিনুকের এখান থেকে শেষ যাওয়া। কলকাতার ডাক্তারদের কাছে নিয়মিত চেকআপ, বাবা-মা'র অঢেল যত্ন পাওয়া সত্ত্বেও ঝিনুক খুব অল্পদিনের মধ্যে জটিল শারীরিক সমস্যার মধ্যে পড়ল।.এক ঝড় বৃষ্টির রাতে তার লেবার পেন ওঠে। প্রিম্যাচিওরড পেন। পরদিন ভোরে, নার্সিংহোমে অঢেল রক্তক্ষরণের মধ্যে ঝিনুক এক মৃত শিশুর জন্ম দেয় এবং ঘন্টাখানেকের মধ্যে নিজেও মারা যায়।

খবর পাওয়ার পর সুগত ভেবেছিল, যাব না। কী হবে গিয়ে? পরে রাতের ট্রেন ধরে।

তেষ্টা বাড়ে সুগতর। টেবিলে ফেলা ব্যাগ হাতড়ে জলের বোতল বের করে। জল নিঃশেষ। এই বিশ্রী গরমে এইটুকু বোতলের জল থাকবেই বা কতক্ষণ? টেবিলে রাখা প্লাস্টিকের জগটা হাতে তুলে নিয়েও নামিয়ে রাখল সুগত। জল গরম। রান্নাঘরে জালা রয়েছে। কিন্তু তাতে কি জল আছে? গত ক'দিন জলই ভরা হয়নি যে! জালা নিশ্চয় খালি। নাকি তলানিতে পড়ে আছে খানিকটা? থাকলে আজকের দিনটা চলে যাবে। নইলে মুশকিল। ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে আসে সুগত। এলোমেলো রান্নাঘর। খানিকটা নোংরাও। সকালের কাপ ডিশ, চায়ের পাতা পড়ে আছে এক কোনায়। সসপ্যানটা এখনও স্টোভের ওপর। উঁচুতে হাত বাড়িয়ে খড়খড়ির ছোট্ট জানলাটা খুলে দিল সুগত। বাসি গন্ধটা বেরিয়ে যাক। তারপর হাত বাড়িয়ে জালার ঢাকনা তুলতে গিয়েই চমকে উঠল!

কাচের গেলাসে ওটা কী! ছোট একটা ডিশ দিয়ে ঢাকা গেলাসের ভেতর সাদা জল চিকচিক করছে জানলা দিয়ে ছিটকে আসা আলোয়। পাশে দুটো লেবুর টুকরো নিজেদের সব রস নিঃশেষ করে পড়ে আছে দুমড়ে মুচড়ে।

শরবত! শরবত কে বানিয়েছে!

যে সমস্যা শুরু হয়েছিল আবছাভাবে তা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হল। সুগত একেবারেই ভিতু প্রকৃতির মানুষ নয়। সে শুধু বিজ্ঞানের মাস্টারই নয়, ভাবনাচিন্তার মধ্যেও কখনও অবাস্তব, অসম্ভবকে ঠাঁই দেয়নি। ঠান্ডা মাথায় যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে সবকিছু বিচার করা, মেনে নেওয়াই তার স্বভাব। কিন্তু এই ঘটনায় সে হতচকিত হয়ে পড়ল। যুক্তি কাজ করল না। তালা বন্ধ বাড়িতে কে তার জন্য শরবত বানিয়ে রাখবে!

কালির মা পাঁচদিনের মাথায় কাজে যোগ দিয়েছে। শরবতের কথা বলব বলব করে সুগত কিছু বলেনি। বুড়ি শুনে ঘাবড়ে যাবে। বরং মনকে বুঝিয়েছে, কাজটা হয়তো তারই! স্কুলে যাওয়ার আগেই গ্লাস ভরে বানিয়ে রেখেছিল। বেরোবার আগে এক চুমুকে শেষ করে যাবে ভেবে। আগে কখনও করেনি তো কী হয়েছে? আজ থেকে শুরু করা যায় না? গরমে লেবু চিনির শরবত তো শরীরের জন্য ভালই। বিশেষ করে গনগনে রোদে বেরোবার আগে। পরে তালেগোলে ভুলে গেছে। হতেই পারে নানারকম চিন্তাভাবনার মধ্যে থাকলে সবকিছু মনে রাখা কঠিন। নিজের জন্য শরবত বানানোটা এমন কোনও বড় কাজ নয় যে মনে রাখতে হবে।

কিন্তু সোমবারে ঘটনাটা অবশ্যই মনে রাখার মতো হল।

গামছা মেলতে ভুলে গেলেও বেরিয়ে যাওয়ার সময় বারান্দায় রাখা জিনিস ঘরে তুলে যেতে কখনও ভুল করে না সুগত। সে শুকোতে দেওয়া কাপড়-জামাই হোক, বই খাতা, চা খাওয়ার কাপ ডিশ, বেতের চেয়ারই হোক। শুধু চুরির ভয় নয়, ভয় ঝড়-জল, রোদেরও। এরকমটা হয়েছে বেশ কয়েকবার। ঝিনুক শাড়ি জামা তুলতে ভুলে গেছে। দুপুরের ঝড়জলে উড়ে গেছে। একবার একটা মোড়া চুরি হয়ে গেল। ঝিনুকের চিরুনি হারিয়েছে বেশ কয়েকবার। পাঁচিলের ওপর রেখে আসত ভুলো মনে। স্নানের পর বারান্দায় বসে চুল আঁচড়ানোর অভ্যেস ছিল তার।

সোমবার স্কুল থেকে ফিরতে বিকেল গড়িয়ে গেল সুগতর। প্রায় সন্ধে। নতুন রুটিন নিয়ে হেডমাস্টারের ঘরে মিটিং ছিল। বাড়ি ফিরে দেখল, কালির মা তালা দেওয়া দরজার বাইরে বসে অপেক্ষা করছে। দ্রুত হাতে দরজা খুলে ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সুগত বলল, 'আগে গিয়ে চা বসিয়ে দাও তো কালির মা। বেশি করে করবে। ফ্লাস্কে রেখে যেয়ো। রাত পর্যন্ত পরীক্ষার খাতা দেখতে হবে আজ।'

কালির মা বলল, 'আর কিছু খাবে?'

'না, স্কুলে টিফিন করেছি। একেবারে রাতে খেয়ে নেব।'

কালির মা রান্নাঘরের দিকে পা বাড়িয়ে বলে, 'এমন করলে চলবে কী করে? বউদি চলে যাওয়ার পর খাওয়াদাওয়ার কী ছিরি করেছ বাপু।'

সুগত কথায় কান দেয় না। টেবিলে খাতা, পেন গোছাতে গিয়ে খেয়াল করে, ঘরে বেতের চেয়ারটা নেই। কী হল! স্কুলে যাওয়ার সময় টেবিলের পাশেই রেখে গিয়েছিল তো। স্পষ্ট মনে আছে। চেয়ার নিয়ে ঢুকতে গিয়ে তাড়াহুড়োতে বারান্দার আধখোলা দরজায় সামান্য ঠোক্কর খায়। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে ব্যথা লাগে। সেই ব্যথা এখন আর নেই। তবে ছড়া দাগটা রয়েছে। তা হলে? দ্রুত বারান্দার দরজা খুলে বাইরে যায় সুগত।

চেয়ার বারান্দায়! যেভাবে রোজ বিকেলে ঝিনুক পেতে বসত, ঠিক সেইভাবে সাজানো। একটু কোনা করে। শুধু চেয়ার নয়, বারান্দার নিচু পাঁচিলে একটা গোলাপি রঙের চিরুনিও রয়েছে। হতভম্ব সুগত ঝুঁকে পড়ে সেই চিরুনি তুলল।

সেদিন রাতে ঘুম আসতে দেরি হল সুগতর। নিজেকে বোঝাল, এই ভুলটাও তার। সেদিন যেমন গ্লাসে শরবত বানিয়েছিল, আজও তাই হয়েছে। চেয়ারটা বারান্দাতেই পড়ে ছিল। চিরুনিও ফেলে এসেছিল নিশ্চয়। ঝিনুকের মৃত্যুতে এখনও মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। খুঁটিনাটি সব মনে থাকছে না। ধীরে ধীরে এই সমস্যাটা নিশ্চয় কাটবে। পাশ ফিরে চোখ বুজল সুগত।

সকালে সুগতর ঘুম ভাঙল ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে চিনচিনে ব্যথা নিয়ে। চেয়ার হাতে দরজার কোনায় ঠোক্কর খাওয়ার ব্যথা। বেশিরভাগ সময়ে এটাই হয়। যে ব্যথা হারিয়ে গেছে বলে মনে হয়, পরে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে।

পরদিন স্কুল গেল না সুগত। খবর পাঠাল, শরীর ভাল নেই। সত্যিই তাই। রাতে ঠিকমতো ঘুম হয়নি। তবে আসল কথা হল গোটা দিনটা ঘরে কাটাতে চায় সে। বুঝতে চায়, গোলমালটা কোথায়। সত্যি কি কোনও গোলমাল? নাকি অশান্ত মনের ভুল। কীসের অশান্তি? ঝিনুকের মৃত্যু তাকে দুঃখ দিয়েছে, কিন্তু একই সঙ্গে শান্তিও কি দেয়নি?

সকালটা দিব্যি খাতা দেখে কাটাল। বিকেলে ইচ্ছে করেই মিনিট কুড়ি বারান্দায় গিয়ে বসল সুগত। ঝিনুকের মৃত্যুর পর এই তার প্রথম বিকেলে বারান্দায় বসা। সন্ধের পর রান্নাঘরে গিয়ে নিজেই চা বানাল। চায়ের কাপ হাতে ঝিরঝির করা টিভি চালিয়ে খবর শুনল। রাতে খাওয়ার সময় রেডিয়ো বাজাল জোর ভল্যুমে। খসখস আওয়াজ হল খুব, তবু বন্ধ করল না। ঘুমও হল ছেঁড়া ছেঁড়া। কিন্তু কোনও গোলমাল হল না।

গোলমাল হল পরদিন।

স্কুল ছুটি হয়ে গেল তিন পিরিয়ডের মাথায়। এর সঙ্গে রয়েছে ছেলেদের আবদার। ছাত্ররা অঙ্ক খাতার পাতা ছিঁড়ে হেডমাস্টারের কাছে দরখাস্ত জমা দিয়েছে, 'মাননীয় প্রধানশিক্ষক মহাশয়, আজ বৈকালে তারাপোতা গ্রামের আদ্যনাথ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সহিত আমাদের ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হইবে। এই উপলক্ষে আপনার কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ আপনি যদি তিন পিরিয়ডের পর বিদ্যালয়ের ছুটি ঘোষণা করেন...।' সুগত ফিরে এলও তাড়াতাড়ি। শরীর সংক্ষিপ্ত একটা ঘুম চাইছে। খাতা দেখাও শেষ করতে হবে। হাফ ইয়ারলি পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোতে দেরি নেই। তার ওপর শনিবার কলকাতায় যাওয়ার ইচ্ছে। বাবার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। বড়মাসির কাছেও যাওয়ার দরকার। ঝিনুকের বাপের বাড়ির দেওয়া গয়নাগাটি, কাপড়জামা নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। মেয়ের বাবা-মা কি ওগুলো ফিরিয়ে নেবে? না নিলে কী করা হবে?

সোজা বাথরুমে ঢুকল সুগত। পুরো দু'বালতি জল ঢালল মাথায়। গা মুছতে মুছতে সুগতর মনে হল, অনেক খারাপের মধ্যেও নিজেকে ধুয়ে মুছে রাখার অভ্যেসটা ঝিনুকের ভালই ছিল। আরামেরও। কতদিন মাঝরাতে বাথরুমে গিয়ে জল ঢেলেছে। ভেজা গায়ে এসে শুয়ে পড়েছে ফের। ঠান্ডা লাগার ভয় দেখালেও শুনত না। বলত, 'ও কিছু হবে না। বাপের বাড়িতে আমার অভ্যেস ছিল।'

ভেবেছিল ঘুমোবে অল্প। সুগতর ঘুম হল লম্বা। বিকেলের মুখে ঘুম ভাঙল। কালির মা আজ আর আসবে না। নাতনিকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যাবে। সুগত এ বেলা হোটেল থেকেই খেয়ে আসবে। রান্নাঘরে গিয়ে চা বানাল সুগত। এবার খাতা নিয়ে বসতে হবে। খানিকটা ফুরফুরে মেজাজেই হাতে চায়ের কাপ নিয়ে রান্নাঘর থেকে ঘরে ফিরল। ফিরেই থমকে গেল। শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা একটু স্রোত বয়ে গেল তার। ঘরের লাল সিমেন্ট করা মেঝের ওপর ওগুলো কী!

বাথরুম থেকে কতকগুলো ভেজা পায়ের ছাপ চলে গেছে। চলে গেছে খাট পর্যন্ত। অস্পষ্ট সেই ছাপ কোনও নারীর!

চায়ের কাপটা মাটিতে পড়ে সশব্দে ভেঙে টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। জানলা বন্ধ ঘরে সেই আওয়াজ রয়ে যায় অনেকক্ষণ। কাঁপা হাতে দেয়াল ধরে কোনওরকমে নিজেকে সামলায় সুগত। মুখ তুলে তাকায় খাটের দিকে। বিকেলের আবছা আলোয় দেখতে পায়, বিছানা পরিপাটি করে পাতা। পাশাপাশি দুটো মাথার বালিশ কে যেন সাজিয়ে রেখেছে যত্ন করে!

২

তন্দ্রা চুল বাঁধছে। চেয়ারে বসে আড়চোখে নজর করছে সুগত। চুল বাঁধার আগে তন্দ্রা ঘরের কোনায় রাখা এঁটো থালা বাসন রান্নাঘরে শুধু রেখেই আসেনি, ধুয়েছেও। সুগত বলেছিল, 'থাক না কাল সকালে কালির মা তো আসবেই।' তন্দ্রা শোনেনি। জল ভরে এনেছে জগে। সুটকেস থেকে কাপড় জামা বের করে আলনায় সাজিয়ে রেখেছে যত্ন করে। ঝাঁটা খুঁজে এই রাতেও মেঝেতে বুলিয়েছে বার কয়েক। সুগত অবাক হওয়ায় সে অবাক হয়েছে আরও বেশি। ছোট চোখ দুটো বড় করে বলেছে, 'বাঃ, ঝাঁট না দিলে হবে কেন? পায়ে লেগে বিছানায় ধুলো উঠবে না!'

সুগত চুপ করে গেছে।

আজ দুপুরের ট্রেনে তন্দ্রাকে নিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছে সুগত। কাল থেকে স্কুলে জয়েন করবে। সব মিলিয়ে এক সপ্তাহের ছুটি নিয়েছিল। তাও শেষে একটা রবিবার রেখেছে। দ্বিতীয় বিয়েতে এর বেশি ছুটি নেওয়া যায় না। তবে সহকর্মীরা সবাই খুশি। বলেছে, 'খুবই ভাল সিদ্ধান্ত নিয়েছ সুগত। কারেক্ট ডিসিশন।'

সুগত লজ্জা লজ্জা মুখ করে বলেছিল, 'আমি রাজি হই-ইনি। বড়মাসিই জোর করলেন। মা-ও বলল, একা থাকিস...।'

'ঠিকই বলেছেন। গোটা জীবনটাই পড়ে আছে তোমার। কী বা বয়স হয়েছে? কিছুই নয়। একটা দুর্ঘটনার জন্য... না না নতুন করে সংসার শুরু করো আবার।'

এই অল্প কয়েকদিনেই সুগত লক্ষ করেছে রাতে শোওয়ার আগে অনেকটা সময় ধরে চুল বাঁধে তন্দ্রা। না বেঁধে উপায় কী? মেয়েটার চুল অনেকখানি। তবে গায়ের রং কালো।

শরীরটাও ভারীর দিকে। মোটাই বলা চলে। বড়মাসি মেয়েকে দেখার পর বলেছিল, 'এই ভাল। রোগা প্যাংলা অসুস্থ মেয়ে আর চাই না। বড়লোক বাপের আদুরে মেয়েতেও কাজ নেই। ঘরসংসার ফেলে সারাদিন শুয়ে বসে ঘুমোবে তা চলবে না। কাজ করতে হবে বাপু।'

সুগত বলেছিল, 'আঃ, মাসি। কাজের লোক তো খুঁজছি না, বউ খুঁজছি। ওখানে গিয়ে মন বসবে কিনা সেটাই আসল। জল তোলা, বাসন মাজার জন্য কালির মা তো রইলই।'

বড়মাসি বিরক্ত গলায় বললেন, 'তুই চুপ কর দেখি। কালির মা-ই থাকুক আর বাবাই থাকুক। ঘরের বউ নিজের সংসার না দেখলে চলে কখনও? এই মেয়ে পারবে। দেখিস তুই ঠিক পারবে।'

খানিকটা নিশ্চিন্ত, খানিকটা অবিশ্বাসী গলায় সুগত বলে, 'তুমি বুঝলে কী করে?'

'ওসব ঠিক বুঝতে পারি। গরিব ঘরের মেয়ে অত রং ঢং জানে না। লেখাপড়াও কম। সারাদিন যে শুয়ে বই পড়বে সে উপায় নেই। বাপের বাড়ি থেকেই খাটাখাটনিতে অভ্যস্ত। দেখলি না, ছেলের দ্বিতীয় বিয়ে শুনেও এককথায় কেমন রাজি হয়ে গেল? আগেরবার আমারই ভুল হয়েছিল। মেয়ে পছন্দ করবার আগে সবদিক ভেবেচিন্তে নেওয়া উচিত ছিল।'

চুল বাঁধা শেষ করে তন্দ্রা স্বামীর দিকে ফিরে বলল, 'গা- টা ধুয়ে আসি?'

সামান্য চমকাতে গিয়েও নিজেকে সামলাল সুগত।

'তোমারও রাতে স্নান করা অভ্যেস নাকি?'

তন্দ্রা সহজ ভাবে বলল, 'না অভ্যেস নয়। তবে এখানে বড্ড গরম।'

'বৃষ্টি শুরু হলে গরম থাকবে না। যাও চট করে সেরে এসো।'

চট করে পারল না, তবে বাথরুমে বেশি দেরিও করল না তন্দ্রা। আলো নেভানোর আগে সুগতকে তুলে বিছানার চাদর বদলাল। মশারি টাঙাল যত্ন করে। তারপর সহজভাবে শাড়ি ছেড়ে সায়া ব্লাউজ পরে উঠে আসে খাটে। সুগতর গা ঘেঁষে বসে পিঠ ফেরায়। মাথার চুল তুলে ধরে ঠোঁটের ফাঁকে অল্প হেসে বলে, 'নাও খোলো।'

একটু অস্বস্তি হলেও সুগতর খুব ভাল লাগে। সহজ, স্বাভাবিক মেয়ে। চার-পাঁচদিনেই স্বামীকে মেনে নিয়েছে। মন ভরে যায় সুগতর। সে দ্রুত হাতে ব্লাউজের হুক খুলতে থাকে।

একসময় তন্দ্রার বুকে হাত রেখে ফিসফিস করে বলে, 'আমাকে পছন্দ হয়েছে?'

সুগতর আর একটা হাত নিজের উরুর ওপর নিয়ে তন্দ্রা বলে, 'খুব।'

'আর এই ঘর?'

স্বামীর গলা জড়িয়ে তন্দ্রা বলে, 'আরও বেশি। অ্যাই তুমি জানতে, না, আজ আসব?'

বউয়ের কোমর নিজের দিকে টেনে নেয় সুগত। চেপে ধরে। কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে 'আজই যে আসব এমনটা ঠিক ছিল না। তবে কাল সকালে আসতেই হত। কেন বলো তো?'

সুগতর লুঙ্গির গিঁট খুলতে খুলতে তন্দ্রা বলল, 'না, এমনি। বাথরুমে নতুন সাবান সাজিয়ে রেখেছ তো, তাই। আমি তো ভয়ে মরছিলাম। সাবান, পাউডার, তেল সব ফেলে এসেছি।

গুছিয়েও তাড়াহুড়োয় ব্যাগে ঢোকাতে ভুলে গেছি। একটু আগে খেয়াল হল। বলতে ভয় করছিল, তুমি যদি রাগ করো। স্নান করতে গিয়ে দেখলাম, ওমা... নাও এবার এসো।'

চমকে উঠল সুগত। বাথরুমে নতুন সাবান! কই না তো! সে তো কিছু জানে না! কে আনল?

নগ্ন শরীরে স্তব্ধ হয়ে শুয়ে রইল সুগত। তন্দ্রা অনেক চেষ্টা করেও সেই শরীর জাগাতে পারল না।

আমার সময়, শারদীয় সংখ্যা ১৪১৬

গোলাপি জামা

শান্তনুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে। তবু সে তানিয়াকে একটা সুযোগ দিতে চায়। ওনলি ওয়ান চান্স। মানুষ রাগের মাথায় অনেক কিছু করে বসে, পরে নিজের ভুল বুঝতে পারে। হয়তো তানিয়াও বুঝতে পেরেছে। এখন সেই অনুতাপের কথা জানার জন্যেই সুযোগ করে দেওয়া। এতে যদিও সিদ্ধান্তের কোনও হেরফের হবে না। তাই মনটা খুব শক্ত করে রেখেছে সে! টেলিফোন তুলে তানিয়ার নম্বর টিপল শান্তনু।

তানিয়া ঘুম জড়ানো বিরক্ত গলায় বলল, 'এত ভোরে ঘুম ভাঙালি কেন? তুই জানিস না, আমি দেরি করে উঠি?'

শান্তনু ছোট মতো একটা ধাক্কা খেল। কাল এত বড় একটা অন্যায় করেও বেলা পর্যন্ত ভোঁস ভোঁস করে কেউ ঘুমোতে পারে! এও হয়! অথচ কাল রাতে সে নিজে একফোঁটাও ঘুমোতে পারেনি। এই তানিয়ার অনুতাপের বহর? ছি ছি!

শান্তনু নরম গলায় বলল, 'সরি, আমি বুঝতে পারিনি।'

তানিয়ার বিরক্তি যেন আরও বাড়ল। বলল, 'এইটুকু না বুঝতে পারলে কী হবে? উফ, তুই কি চিরকাল একই রকম হাঁদা থাকবি শান্তনু? ফার্স্ট ইয়ার শেষ হয়ে সেকেন্ড ইয়ার হতে চলল, এইটুকু তো বুঝতে হবে!'

শান্তনুর উপর ধাক্কা আরও জোরে এল! জ্ঞান দিচ্ছে! নিজে ভয়ংকর একটা কাণ্ড করে তাকে এখন জ্ঞান দিচ্ছে?

তানিয়া ফোনের মধ্যে হাই তুলল। বলল, 'চুপ করে আছিস কেন? কী বলবার তাড়াতাড়ি বলে ফেল। কাল অনেক রাত পর্যন্ত 'রোমান হলিডে' সিনেমাটা দেখলাম। ছবিটার কথা অনেক শুনেছি, দেখা হয়নি। হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা হয়ে গিয়েছে। আজ ঠিক করেছি, একদম হাসব না। হাসিকে রেস্ট দেব। সিনেমাটা তুই দেখেছিস নাকি?'

শান্তনু চমকে উঠল, সে ঠিক শুনছে তো? এই মেয়ে কাল রাতে সিনেমা দেখেছে? শুধু দেখেছে না, আবার বলেছে হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা হয়ে গিয়েছে! নাঃ, এই মেয়ের উপর আর কোনও আশা নেই!

সে গম্ভীর গলায় বলল, 'না দেখিনি।'

'চান্স পেলেই দেখে নিবি।'

শান্তনু গম্ভীর গলায় বলল, 'আচ্ছা দেখে নেব।'

তানিয়া হেসে বলল, 'গুড। এবার কী বলবে চট করে বলে ফেলো দেখি।'

তানিয়ার হাসি ওর কানে কাঁটার মতো বিঁধল। এইসময় হাসি। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তানিয়া তোকে একটা প্রশ্ন করব?'

'প্রশ্ন? সাতসকালে ঘুম ভাঙিয়ে প্রশ্ন করবি? এত ভোরে তো যাবতীয় প্রশ্ন শুরু হয় কাকদের! তুই তা হলে কাক হয়ে গেলি শান্তনু। অ্যাঁ, ভোর হতে না হতেই শুরু করে দিলি?'

শান্তনুর মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। সে কাক? আর কালকের ওই ঘটনার পর উনি বুঝি কোকিল হয়েছেন আর কুহু-কুহু করছেন! হাসি থামিয়ে তানিয়া তাড়া দিল, 'অ্যাই, যা প্রশ্ন-টশ্ন করবি তাড়াতাড়ি কর, করে টেলিফোনটা ছাড় দেখি। আমি আর একবার ঘুমোনোর ট্রাই নেব। কলেজ ছুটি, তাও দুপুরে একবার বেরোতে হবে, অনেক কাজ আছে। তার আগে একটু ঘুমিয়ে চোখ ফুলিয়ে নেব। বিউটি স্লিপ।'

শান্তনু বুঝতে পারছে, আর-একটা কথাও না বলে, তার রিসিভারটা নামিয়ে রাখা উচিত। ফোন করাটাই ভুল হয়েছিল। মারাত্মক ভুল। কিন্তু ফোন কেটে দেওয়ার সাহসও হচ্ছে না। একবার বিচ্ছিরি কাণ্ড হয়েছিল। মাঝখানে ফোন কেটে দেওয়ায় তানিয়া টানা সতেরো মিনিট চেঁচিয়েছিল। নিজেকে অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে শান্তনু বলল, 'তানিয়া, তুই কি মনে করিস না, কাল যে কাজটা তুই করেছিস, সেটা খুব অন্যায়?'

'অন্যায়? কোন কাজটা অন্যায়?' তানিয়ার গলায় অবাক সুর।

ন্যাকামি হচ্ছে? কোন কাজ মনে পড়ছে না?

শান্তনু গলা নামিয়ে বলল। 'ওই জামার ব্যাপারটা। জামা নিয়ে তুই যা করলি...' কথা মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে তানিয়া ধমকে উঠল, 'তুই ওটাকে অন্যায় বলছিস শান্তনু? ছি ছি।'

ধমকানিতে শান্তনু থেমে গেল। থতমত খেয়ে বলল, 'না, না, অন্যায় নয়। মানে ভুল আর কী। আমি জানি, রাগের মাথায় কাজটা তুই করে ফেলেছিস। সেটাই তোকে জিজ্ঞেস করছিলাম। কনফার্ম করছিলাম বলতে পারিস।'

তানিয়া ওপাশ থেকে একেবারে তেড়েফুঁড়ে উঠল, 'ভুল হয়েছে? ভুল হতে যাবে কেন? যা করেছি, বেশ করেছি। ঠিক কাজ করেছি। খুব ভাল কাজ করেছি।'

এরপর আর ফোনের রিসিভার ধরে থাকার কোনও মানে হয় না। ফোন কেটে দেওয়াই উচিত। যত খুশি রাগ করুক। মেয়েটাকে ভাল মতো বুঝিয়ে দেওয়া উচিত সেই দিন আর নেই। তার রাগ দেখে ঘাবড়ে যাওয়ার দিন চলে গিয়েছে! আজ সকাল থেকেই চলে গিয়েছে। কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া গেল না। তার আগেই তানিয়া ফোন নামিয়ে রাখল। শান্তনু খুশি হল। যাক, ভালই হয়েছে। নিজের কাছে পরিষ্কার থাকা গেল। এমন নয় যে, সে সুযোগ দেয়নি। সুযোগ সে দিয়েছিল। তানিয়া যদি বলত, 'সরি, কিছু মনে করিস না, কালকের জন্য আমি খুব দুঃখিত,' তা হলেই বরং সমস্যা হত। মুখে যাই বলুক, কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়ে শান্তনুকে তখন দু'বার ভাবতে হত। সে ঝামেলা আর রইল না। আজ এই মুহূর্ত থেকে ওই মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ। শান্তনু বালিশের পাশ থেকে ঘড়িটা বার করে দেখল। ছ'টা সাঁইত্রিশ। সব সময় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নোট করে রাখা উচিত। পরে অনেক সময় রেফারেন্সে লাগে। কালকের ঘটনার সময়ও শান্তনু ঘড়ি দেখে রেখেছিল। তখন ঠিক

বিকেল চারটে এগারো মিনিট। তারপরই সিঁড়ি দিয়ে নেমে চারটে সতেরোর মেট্রো ধরতে চলে যায় তানিয়া।

২

শান্তনু বসে আছে টেবিলে। সামনে কেমিস্ট্রি বই খোলা রয়েছে। একটা অক্ষরও মাথায় ঢুকছে না। ঢোকবার কথাও নয়। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এবার সেটা জানাতে হবে। জানাতে হবে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব। এই ধরনের কাজে কী ফল হয়, সেটা ওই মেয়ের দ্রুত টের পাওয়া দরকার। কিন্তু পদ্ধতিটা কী হবে? আচ্ছা, একটু বেলার দিকে আবার টেলিফোন করলে কেমন হয়? তারপর কড়া গলায় বলতে হবে, 'অনেক হয়েছে তানিয়া, আর নয়। এনাফ ইজ এনাফ। তোমার মতো একটা মেয়ের সঙ্গে আমার কোনওরকম সম্পর্ক রাখা সম্ভব নয়। তুমি তোমার পথ দেখো, আমি আমার পথ দেখব। তোমার যদি পথ দেখতে ইচ্ছে না করে, তা হলে কুহু কুহু করে কোকিলের মতো ডেকে বেড়াও! কিন্তু দয়া করে আর আমাকে জ্বালাতন কোরো না।'

কাজটা কি বুদ্ধিমানের মতো হবে? মনে হচ্ছে না। একটা ঝুঁকি থেকে যাচ্ছে। তখনও যদি তানিয়া ঘুমিয়ে থাকে? দু'-দু'বার ঘুমিয়ে থাকলে তো কেলেঙ্কারি ব্যাপার হয়ে যাবে। এইসব ঝুঁকি নিয়ে বরং কাজ নেই। এর চেয়ে চিঠি লেখা নিরাপদ। কলেজে কাউকে দিয়ে এই চিঠি ধরিয়ে দিলেই হল। ছোট চিঠি বেশি ধানাই পানাই থাকবে না। থাকবে কেবল কাজের কথাটুকু। শান্তনু মনে মনে চিঠির খসড়া লিখতে শুরু করল,

তানিয়া, কাল বিকেলে তুই যে কাজটা করলি, সেটা যে-কারও পক্ষে চরম অপমানজনক। ঘটনাটা একবার ভাল করে ভাবলেই বুঝতে পারবি, আমি কী বলতে চাইছি। আচ্ছা আমিই মনে করিয়ে দিচ্ছি। আগামী সপ্তাহে আমার জন্মদিন আর সেই উপলক্ষে তুই আমায় একটা জামা উপহার দিলি। আমি কফি হাউজে বসে সেই জামা খুলে দেখলাম জামার রং অতি জঘন্য। গোলাপি। আমি অবাক হয়ে বললাম, এইরকম একটা গোলাপি রঙের জামা তুই আমার জন্য কিনলি? তুই বললি, সে নাকি একটা মজার কাণ্ড। কবে সন্ধেবেলায় বাড়ি ফেরার সময় তুই দেখেছিস আকাশের রংটা গোলাপি হয়ে আছে। তোর ইচ্ছে করল যে, তুই রংটা হাত বাড়িয়ে একটু ছুঁবি। এরপরেই নাকি তুই অনেক খুঁজে পেতে জামাটা কিনেছিস। আমি বললাম, এই জামাটা তুই বদলে দে। এই রঙের জামা আমি পরব না। কেউই পরবে না। যদিও বা পরে, তা হলে ব্যাপারটা খুব হাস্যকর হবে। তুই গম্ভীর হয়ে বললি, তাই হবে। দে জামাটা দিয়ে দে। আমি বদলে দেব। এরপর আমরা হাবিজাবি গল্প করতে করতে মেট্রো স্টেশন পর্যন্ত গেলাম। মাঝপথে তুই রাস্তায় দাঁড়িয়ে ফুচকা খেলি। মুখে লঙ্কা পড়ায় তুই 'উঃ আঃ' করলি। এই পর্যন্ত ঘটনা ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু তারপর? তারপর তুই যা কাণ্ড করলি, তা একবার ভেবে দেখ? মেট্রো স্টেশনের সিঁড়িতে বসে থাকা একটা ভবঘুরে টাইপের লোককে জামার প্যাকেটটা দিয়ে গটগট করে চলে গেলি। আমি নিশ্চিত, ওই লোকটা নিশ্চয় জামাটা দশ-বারো টাকায় বেচে রাতে নেশা করেছে। তুই

একেই অতগুলো টাকা নষ্ট করলি এবং আমায় অপমান করলি। তবে অপমানের কায়দা মারাত্মক। গোলাপি এমন কিছু মারাত্মক রং নয় যে, তাকে খারাপ বলায় তুই আমার সঙ্গে অমন কঠিন ব্যবহার করলি। পরে আমার মনে হয়েছিল, তুই জেনে বুঝে জিনিসটা করেছিস। আসলে তুই আমায় অপমান করতে চেয়েছিলি। তবুও একটা সুযোগ আমি তোকে দিতে চাইলাম। আমার আশা ছিল, তুই নিজের ভুল বুঝে দুঃখ প্রকাশ করবি, সেই কারণে তোকে কাল ফোন করা। তুই বলতে পারিস, কেন আমি আগ বাড়িয়ে ফোন করলাম। আই ডোন্ট মাইন্ড। তা ছাড়া আমাদের টেলিফোন ক'দিন ধরে গোলমাল করছে, লাইন পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু শোঁ শোঁ করছে। ভেবেছিলাম তুই চেষ্টা করছিস, পাচ্ছিস না।

চিঠি এই পর্যন্ত ভেবে শান্তনু থেমে গেল। কেমন যেন লাগছে। একে তো অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, তার উপর মনে হচ্ছে না, এটা আদৌ সম্পর্ক শেষ করে দেওয়ার চিঠি! এ তো ভোরবেলায় ঘুম ভাঙানোর কৈফিয়তের মতো শোনাচ্ছে। কেমন যেন একটা ভয় ভয় ভাব। ভয়ের কী আছে? কিচ্ছু না।

না, যাক চিঠি-ফিঠির মধ্যে না যাওয়াই ভাল। যার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ, তাকে আবার চিঠি কীসের? তা ছাড়া, মেয়েটাকে জোরে একটা ধাক্কা দিতে হবে। চিঠি লিখে সে ধাক্কা দেওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। শান্তনু ভাবতে লাগল।

৩

শান্তনু এখনও টেবিলে বসে আছে। সামনে আর কেমিস্ট্রি বই খোলা নেই। তার বদলে রয়েছে সাদা কাগজ। তানিয়াকে জোরে ধাক্কা দেওয়ার একটা জবরদস্ত উপায় পেয়েছে সে। শান্তনু ঠিক করেছে, তানিয়া তাকে যা যা উপহার দিয়েছে, সবকটা সে ফিরিয়ে দেবে। সেই উপহারের একটা তালিকা করার চেষ্টা চালাচ্ছে শান্তনু। এইবার মেয়ে বুঝতে পারবে, যে কাক কেবল কা কা করে না। ঠোকরাতেও জানে। কাজটা ছেলেমানুষের মতো হচ্ছে না তো? একটা ভিখারিকে গোলাপি জামা দিয়ে তানিয়া কী এমন বড় মানুষির কাজ করেছে শুনি? মনে মনে হাসল শান্তনু। প্রতিশোধের হাসি। তবে তালিকা তৈরি করতে গিয়ে দেখল যে, কাজটা মোটেও সোজা নয়। অনেক আইটেম মনে পড়ছে না। আর মনে পড়বেই বা কী করে? তানিয়ার হাতটা একটু বাড়াবাড়ি রকমের খোলা। নিষ্ঠুর মেয়েদের কি এরকমই হয়? উপহার দেওয়ার ব্যাপারে মেয়েটা কোনওকালেই কোনও নিয়মকানুন মানেনি দেখা যাচ্ছে। জন্মদিন-টন্মদিনে দিলেও মনে আছে। গত বর্ষাতে একটা ফোল্ডিং ছাতা সঙ্গে একটা ক্যাসেট। শান্তনু অবাক হয়ে বলল, 'ছাতার সঙ্গে ক্যাসেট দিলি কেন?'

তানিয়া বলল, 'হাঁদার মতো কথা বলিস না তো! বৃষ্টিতে বাইরে বেরোলে ছাতা নিবি আর বাড়িতে থাকলে রবীন্দ্রসংগীত শুনবি। দেখছিস না, রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান।'

শান্তনু কাগজে প্রথম লিখল ছাতা। তার নীচে লিখল ক্যাসেট। ক্যাসেটের পাশে জিজ্ঞাসা চিহ্ন দিল। ছাতাটা আছে, কিন্তু ক্যাসেটটা কি আছে? থাকলে কোথায়? দিদি নিয়েছে না

বড়মাসির কাছে আছে? মনে পড়ছে না। এরপর পেন। পেন তো অজস্র দিয়েছে। গুনে শেষ করা যায় না। দরকারও নেই। ড্রয়ারেই আছে। ধরিয়ে দিলেই ল্যাটা চুকে যাবে। সমস্যা একটাই। প্রায় সবকটারই কালি শেষ হয়ে গিয়েছে, নয় ফুরোনোর মুখে। এটাও মন্দ নয়। কালি ফুরোনো পেন ফেরত দিলে ধাক্কাটা আরও জোর হবে। বইগুলো সবই ফেরত দেওয়া যাবে। তবে সেখানেও একটা ঝামেলা রয়েছে। বাড়ির ভয়ে সেগুলো তানিয়া কেটে বন্ধুদের নাম লিখে রেখেছে শান্তনু। যেমন, প্রিয় শান্তনুকে বিশ্বনাথ, প্রাণের শান্তনুকে কৌশিক, শান্তনুকে খুব ভালবাসি দেবাঞ্জন, শুধু তোমাকে ভোম্বল। ছোড়দি একদিন বইগুলো উলটে-পালটে দেখে বলল, 'তোদের কলেজের ছেলেরা তো ভারী ন্যাকা!'

ছোড়দি না হয় ম্যানেজ হয়ে গিয়েছে। তা বলে তানিয়া? এই কাণ্ড দেখে সে কী মনে করবে? নিশ্চয় খুব ভিতু ভাববে। ভাবুক গে, যা খুশি ভাববে। যার সঙ্গে সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছে, তার সঙ্গে ভাবা নিয়ে কী যায় আসে? কিছুই আসে যায় না।

তারপর আসছে খাবার-দাবার। ক্যান্টিনে চা-কফি, কোল্ড ড্রিঙ্ক, আলুর চপ তো আছেই। সঙ্গে ক্যাডবেরি, আইসক্রিম ও চাইনিজ। সত্যি মেয়েটার পয়সায় কম খাওয়া-দাওয়া করা হয়নি। কী করা যায়? এগুলো তো আর গুনে ফেরত দেওয়া যায় না। ফেরত যখন দেওয়া হচ্ছে তখন সব ফেরত দেওয়াই ভাল। কোনও ফাঁক রাখা চলবে না। আচ্ছা, মোটামুটি একটা হিসেব করে টাকা ধরে দিলে কেমন হয়? না বাবা, এখনই সেটার দরকার নেই। রেগে-মেগে একটা কেলেঙ্কারি করে বসতে পারে। একসঙ্গে এতটা সাহস না দেখালেও চলবে। এগুলো আপাতত তোলাই থাক। তালিকার একদম শেষে শান্তনু বড় বড় করে লিখল, বত্রিশটা চিঠি এবং সাতটি ফোটো। লিখে তলায় লাল কালির দাগ দিল। চিঠি আর ফোটো ফেরত হবে আর সেটা তানিয়ার কাছে রাম ধাক্কা, তাই লাল কালির দাগ। ব্যাগটা মনে হচ্ছে বেশ ভারী হবে। তবে তালিকা তৈরি করে মনটা বেশ হালকা হয়ে গিয়েছে। আজ দুপুরে তানিয়া কোথায় বেরোবে বলছিল যেন? তার আগেই ভারী ব্যাগ আর হালকা মন নিয়ে ওর বাড়িতে হাজির হতে হবে। বেল টিপতে তানিয়ার মা বেরিয়ে আসবেন। হেসে বলবেন, 'আরে শান্তনু। ভিতরে এসো, কতদিন আসোনি। কী খাবে, শরবত না চা?' শান্তনু তখন খুব ভদ্রভাবে বলবে, 'না মাসিমা, আজ আর ভিতরে যাব না। হাতে একদম সময় নেই। আপনি বরং তানিয়াকে একটু ডেকে দিন। আমি এখানেই দাঁড়িয়ে আছি।' তারপর তানিয়া এলে ব্যাগটা ধরিয়ে দিয়ে কি একটু হাসবে? হাসাই উচিত। এইসময় তার হাসি, তানিয়ার গায়ে জ্বালা ধরানোর কাজ করবে!

৪

মানুষ যেমন ভাবে, সবটা তেমন হয় না। কিছুটা হয়, কিছুটা উলটো হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে অনেকটাই উলটো হয়ে গেল। শান্তনু ডোরবেল বাজাতে তানিয়ার মা দরজা খুললেন ঠিকই, কিন্তু ভিতরে আসতে বললেন না। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'দুপুরে এতবার বেল দিচ্ছ কেন? দাঁড়াও তানিয়াকে খবর দিচ্ছি, ও তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।'

প্রথম চোটেই শান্তনু চমকে গেল। তানিয়া ওর জন্য অপেক্ষা করছে। ঠিক শুনছে তো? তানিয়া ওর জন্য অপেক্ষা করতে যাবে কেন? সে তো বলে আসেনি। হইহই করতে করতে বেরিয়ে এল তানিয়া। সেজেগুজে একেবারে রেডি। হেসে বলল, 'দেরি করলি কেন? সকালে বললাম না, দুপুরে বেরোব?'

শান্তনু ভেবে এসেছিল, হেসে সে তানিয়ার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেবে! কিন্তু তানিয়ার হাসির চোটে শান্তনুর গায়ে জ্বালা ধরে গেল। বেরোব বললেই তাকে ছুটে বেরোতে হবে নাকি? সেদিন আর নেই। কাল পর্যন্ত ছিল, আজ থেকে নেই। হাতের ব্যাগটা আড়াল করতে করতে বলল, 'তানিয়া তোর সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে।'

তানিয়া চোখ পাকিয়ে বলল, 'রাখ তোর কথা। ওসব কথা-টথা পরে হবে। আগে ছুটে গিয়ে ওই ট্যাক্সিটাকে ধর। ইস, দেরি হয়ে গেল। যা যা!' তানিয়ার তাড়ার চোটে সত্যি ছুটে গেল শান্তনু। হাতের ভারী ব্যাগ নিয়ে ছুটতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল তার।

সত্যি তানিয়ার অনেক কাজ ছিল। সারাদুপুর টো-টো করে ঘুরল। ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে বই বদলাল। মোবাইলে কার্ড ভরল। শ্রেয়া নামে ওর এক বন্ধুর বাড়ি থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের নোট নিল। সালোয়ার কামিজের সঙ্গে ম্যাচিং একজোড়া দুল কিনল ফুটপাথ থেকে। ঘড়ির ব্যান্ড বদলাল। কলেজ স্ট্রিটে এসে ভাইয়ের ইতিহাসের বই কিনল। তারপর কফি হাউজে ঢুকে একগাল হেসে বলল, 'নে, এবার কোল্ড কফি বল।'

কোল্ড কফি অর্ডার দিয়ে শান্তনু বুঝল, গোলমাল হয়ে গিয়েছে। যে মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, তার সঙ্গে এতটা সময় কাটানো উচিত হয়নি। মনে হচ্ছে, তানিয়ার বাড়ি যাওয়ার পরিকল্পনাটা ভুল হল। আসলে তানিয়াই ঠিক বলে। ও একটা হাঁদা! তানিয়ার সামনে আরও বেশি হাঁদা হয়ে যায়। এই মেয়ের তাড়া আর ধমকানি তুচ্ছ করে ব্যাগটা ধরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। এখন দেবে? এই কফি হাউজের মাঝখানে তানিয়ার চিঠি, পেন, বই ছাতা সব বের করে বসে? সে আর-এক বিপদ হবে। তার চেয়ে বরং একেবারে যাওয়ার সময় হাতে ব্যাগটা দিয়ে বলতে হবে, 'টা টা।' বাড়ি ফিরে গিয়ে ও কাঁদুক-হাসুক, যা খুশি করুক। কিছু বুঝতে দেওয়া যাবে না।

শান্তনু কফির সঙ্গে দুটো প্রন কাটলেটও বলল। তার যে খুব খেতে ইচ্ছে হচ্ছিল তা নয়। তবে বড় ধাক্কা খাওয়ার আগে পেট ভরে থাকাই ভাল।

তারিয়ে তারিয়ে কাটলেট খেতে খেতে তানিয়া বলল, 'বুঝলি শান্তনু, আজ একটা জিনিস দেখতে পাব।'

'কী জিনিস?'

'উঁহুঁ, এখন বলব না। আগে নিজে দেখি, তারপর বলব,' কথা শেষ করে তানিয়া মিটিমিটি হাসল।

শান্তনুও হাসল। তবে মনে মনে। আজ তোমাকেও আমি একটা জিনিস দেখাব বাছাধন। একেবারে জিনিসের মতো জিনিস। ব্যাগ ভরতি জিনিস। শান্তনু টেবিলের তলায় ব্যাগটা একটু সরিয়ে রাখল। ছাতা উঁচু হয়ে খোঁচা মারছে।

মেট্রো স্টেশনের সামনে এসে পৌঁছোতে আজ একটু দেরিই হয়ে গেল। বিকেল গড়িয়ে

গিয়েছে। নরম একটা আলো আকাশ থেকে পিছলে পিছলে পড়ছে। একটু খেয়াল করলে বোঝা যাবে, এ আলোর রং গোলাপি। হালকা গোলাপি।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল তানিয়া। শান্তনুর হাত চেপে ধরে ফিসফিস করে বলল, 'দেখ, কী সুন্দর লাগছে!'

শান্তনু মন কঠিন করল। তানিয়া যতই হাত ধরুক, এই কঠিন মন নরম হবে না। আজ সারা দিনটা তাকে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এতটা সময় একসঙ্গে ঘুরল, কই একবারও তো বলল না, কালকের কাজটা ভুল হয়েছে। আর সুযোগ নয়।

উফ! তানিয়া কনুইয়ের কাছে একটা চিমটি কেটেছে। গলা আরও নামিয়ে বলল, 'দেখ না? ওই তো, ওই যে!'

আবার চিমটির ভয়ে শান্তনু বিরক্তি নিয়ে মুখ তুলে তাকাল। তুলেই চমকে উঠল।

মেট্রো স্টেশনের সিঁড়িতে আজও বসে আছে সেই ভবঘুরে লোকটা। বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত মনে পা নাড়াচ্ছে। সেই এলোমেলো চুল। হালকা দাড়ি। তবে আজ লোকটার গায়ে একটা নতুন জামা। সেই জামার রং গোলাপি। লোকটা একটু পরে পরেই জামাটা টেনেটুনে ধুলো ঝেড়েঝুড়ে নিচ্ছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, একটা গোলাপি আলোর মধ্যে একটা গোলাপি মানুষ পরম আনন্দে বসে আছে।

শান্তনু বিড়বিড় করে বলল, 'খুব সুন্দর, না রে!'

'অ্যাই হাঁদা, এমন হাঁ করে তাকিয়ে আছিস কেন? আমার ট্রেনের টাইম হয়ে গেল। যা বলবার তাড়াতাড়ি বল। ঠিক এক মিনিট টাইম দেব। ওনলি ওয়ান মিনিট।'

তানিয়ার কথায় ঘোর কাটল শান্তনুর। লজ্জা-লজ্জা মুখ করে সে বলল, 'না, কিছু বলব না। তুই যা। কাল দেখা হবে।'

রাতে হাতে বেশ ব্যথা হল শান্তনুর। হবেই তো। অত ভারী একটা ব্যাগ নিয়ে যাওয়া, আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা তো চাট্টিখানি কথা নয়!

উনিশ কুড়ি, শরৎ ২০০৫

চন্দ্রাহত

আজ কণিকার বিয়ে।

কণিকাদের তিনতলা বাড়ি ঝলমল করছে। ছাদ থেকে নীচ পর্যন্ত ঝুলছে হলুদ আলোর মালা। গেটে বেত দিয়ে তৈরি হয়েছে চোখ-ধাঁধানো তোরণ। তোরণের মাথায় সবুজ ঘাসের ব্যাকগ্রাউন্ডে সাদা ফুলের পাপড়ি দিয়ে লেখা—'কণিকা-শ্যামলের শুভবিবাহে স্বাগতম'। সাউন্ড বক্সে নিচু ভল্যুমে সানাই বাজছে। বিসমিল্লার সানাই। রাগের নাম সাহানা। হাতে সুদৃশ্য গিফ্‌ট প্যাকেট নিয়ে নিমন্ত্রিতরা দামি গাড়ি থেকে নামছে। সুট, ধুতি পাঞ্জাবি, বেনারসির খসখস আওয়াজ। গয়নার টুং টাং শব্দ। বিদেশি সেন্টের মায়াময় সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে চারপাশে। ফিসফাস, খিলখিল হাসি, নিচু গলায় গল্প। মনে হচ্ছে, এই বাড়ি থেকে ফোয়ারার মতো আনন্দ উপচে পড়ছে।

যদিও ঘটনা উলটোরকম। এত আয়োজনের ব্যাপারে খোদ কনেরই আপত্তি ছিল। কণিকা তার মাকে বলেছিল, 'জাঁকজমক কিছু করার দরকার নেই। যেটুকু না করলেই নয় শুধু সেটুকু করো লোকজন বেশি না এলেই ভাল হয়।'

কণিকার মা মঞ্জুদেবী বিরক্ত গলায় বলেছিলেন, 'কেন? বড়মেয়ের বিয়েতে আমরা জাঁকজমক করব না কেন?'

কণিকা মায়ের রাগ বুঝতে পেরে সামান্য হাসে। বলে, 'এলাহি ব্যাপার দেখলে শ্যামল অস্বস্তিতে পড়তে পারে।'

'কেন? অস্বস্তির কী হল?'

ওরা তো তেমন কিছু করতে পারবে না সেই কারণেই বলছি।'

মঞ্জুদেবী দাঁতে কিড়মিড় জাতীয় আওয়াজ করে বলেন, 'ওদের না পারাটা কি আমাদের অপরাধ?'

'অপরাধের কথা হচ্ছে না মা। তবে বিষয়টা আমাদের মাথায় রাখা উচিত। সকলের সামর্থ্য সমান হয় না। আমরা আলো জ্বালালাম, বিরাট প্যান্ডেল খাটালাম, লম্বা মেনুতে লোক খাওয়ালাম অথচ ওরা তেমন কিছুই পারল না, সেটা কেমন দেখাবে?'

মঞ্জুদেবী রাগে হিসহিস করে ওঠেন, 'খুবই খারাপ দেখাবে। কিন্তু তার জন্য তো আমরা দায়ী নই কণি। ওদের সামর্থ্য কতখানি আমি গোড়া থেকেই জানি। যেদিন থেকে তুমি ওই ছেলেকে বিয়ে করবে বলে ঠিক করেছ সেদিন থেকেই জানা হয়ে গেছে। নতুন করে আর আমাকে এসব শোনাতে এসো না। আমরা আমাদের সামর্থ্য মতোই মেয়ের বিয়ে দেব। তার বেশিও দেব না, কমও দেব না। যতটা জাঁকজমক করা আমাদের পক্ষে দরকার ততটাই করব।'

কণিকা একইভাবে শান্ত গলায় বলল, 'জাঁকজমকের আবার দরকার অদরকার কী?'

মঞ্জুদেবী কঠিন চোখে মেয়ের মুখের দিকে মুহূর্তখানেক তাকিয়ে থেকে নিচু গলায় বললেন, 'দরকার-অদরকার বুঝতে পারলে তুমি এই কাজ করতে না। এই বাড়ির মেয়ে হিসেবে তোমাকে যা মানায় তাই করতে।'

কণিকার বাবা মনোময় চ্যাটার্জি উলটোদিকের সোফায় বসে ছিলেন। তিনি স্ত্রীকে থামানোর চেষ্টা করেন। বলেন, 'আহা, কণি যখন বলছে, থাক না, আমরা ছোট করেই না হয় করলাম।'

মঞ্জুদেবী এবার আর গলা নিচু রাখতে পারলেন না। উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে উঠলেন।

'আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে আমাদের একটা সম্মান আছে। তোমার পরিচিত লোকজন আসবে। এত বড় বিজনেস। সেখানকার লোকজন তো সব হেঁজিপেজি নয়। ঘাসে মুখ দিয়ে চলে না। সবাই কী ভাববে সেটা একবার ভেবে দেখেছ? সবাই ভাববে, এই বিয়েতে আমাদের সায় নেই, তাই ঘর অন্ধকার করে মেয়েকে কোনওরকমে পার করছি। সত্যি কথাটা সবাইকে জানানোর দরকার কী? তার থেকে আলো জ্বেলে, সানাই বাজিয়ে, পেট পুরে পোলাও মাংস খাইয়ে না হয় মিথ্যেটাই বলব। বলব, বড়মেয়ের বিয়েতে আমরা খুব খুশি। হিরের টুকরো জামাই পেয়ে আমাদের আহ্লাদের শেষ নেই।'

মনোময়বাবু মুখ নামিয়ে বলেন, 'এসব কথা আর এখন তুলে লাভ কী মঞ্জু? ডিসিশন যখন হয়েই গেছে...।'

মঞ্জুদেবী ঝাঁঝের সঙ্গে বলেন, 'ডিসিশন আমার হয়নি। ডিসিশন হয়েছে তোমার মেয়ের। এটা তার একার সিদ্ধান্ত। তুমি নিজেই মেয়ের সামনে বলো না, এই বিয়েতে তোমার মত আছে? বলো, চুপ করে আছ কেন?'

কথা শেষ করে সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন মঞ্জুদেবী। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে দ্রুত পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় বলতে বলতে গেলেন, 'তোমার মেয়ের মাথায় গোলমাল হয়েছে। মাথার গোলমাল না হলে কেউ এ কাজ করতে পারে না। তুমি ওকে বোঝাও। এখনও সময় আছে।'

মনোময়বাবু চুপ করে হাতের আঁকিবুকি কাটতে থাকেন। তিনি জানেন, মঞ্জু ভুল কিছু বলছে না। কণিকা সত্যি পাগলামি করছে। এই বিয়েতে তাঁরও মত নেই। মত থাকার কোনও কারণও নেই। কোনও সুস্থ মানুষ এই বিয়েতে মত দিতে পারে না। ওই ছেলেকে কণিকার সঙ্গে কোনওভাবেই মানায় না। তার ওপর শোনা যাচ্ছে, আলাপ পরিচয়ও অতি অল্পদিনের। বছরখানেকও হয়নি ছোকরা গ্রামের দিকে কোনও এক ব্লক অফিসে চাকরি জুটিয়েছে। সেই চাকরি এখনও পাকা হয়নি। প্রবেশন পিরিয়ড চলছে। কাজ পাকা হবে কিনা সে সম্পর্কেও সন্দেহ রয়েছে। মঞ্জু যখন তাঁকে ঘটনাটা বলে তখন তিনি বিজনেসের কাজে চেন্নাইতে। কানে টেলিফোন ধরে টানা এক মিনিট চুপ করে থাকেন।

'তুমি শিয়োর মঞ্জু?'

মঞ্জুদেবী ফুঁপিয়ে ওঠেন। বলেন, 'কণি বলছে, আমরা যদি রাজি না হই তা হলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে ওই ছেলেকে বিয়ে করবে।'

'না না, এখনই মেয়ের সঙ্গে কোনও কনফ্রনটেশনে যেয়ো না মঞ্জু। তুমি শান্ত হও।'

মঞ্জুদেবী ডুকরে উঠে বলেন, 'কী বলছ তুমি? আমি শান্ত হব। এই কথা শোনার পর কোনও মা শান্ত হয়ে থাকতে পারে? ছি ছি! কোথাকার কোন এক ভ্যাগাবন্ড...কণির কত ভাল বিয়ের ব্যবস্থা আমি করছিলাম তুমি জানো না?'

মনোময় চ্যাটার্জি চুপ করে থাকেন। তিনি জানবেন না কেন? খুবই জানেন। ইতিমধ্যে গোপনে ছেলে দেখা শুরুও করেছিল মঞ্জু। দুটি ছেলের খবরও বলেছিল তাঁকে। পাত্র হিসেবে দু'জনেই চমৎকার। একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। ছ'মাসের মধ্যে স্টেটসে সেটল করবে। কোম্পানির সঙ্গে কথাবার্তা পাকা। অন্যজন ডাক্তার। পড়া কমপ্লিট করেছে। আর একদিনও এই পোড়ার দেশে থাকতে চায় না। ছেলের ধারণা এদেশে ডাক্তারি করাও যা খেতে লাঙল চালানোও তাই। এদেশের রোগীদের ট্যাবলেট, ক্যাপসুলের থেকে জড়িবুটিতে বেশি কাজ দেয়। ওই ছেলে ইতিমধ্যে লন্ডনের তিনটে হাসপাতালে অ্যাপ্লাই করে ফেলেছে। ওখানে গিয়ে এফ আর সি এস-টাও করবে। তবে দু'জনেই নাকি এখন বিয়ে করার ব্যাপারে গাঁইগুঁই করছে। ওদের বাড়ির লোকেরাও ছাড়ছে না। তারা চায় বাইরে যাওয়ার আগে বিয়েটা সেরে নিক। মঞ্জুদেবীর মতে ও কিছু নয়। ভাল ছেলেরা বিয়ের আগে ওরকম একটু-আধটু গাঁইগুঁই করে। ভাবে সংসার করলে কেরিয়ার রসাতলে চলে যাবে। চিন্তার কিছু নেই কণিকার সঙ্গে আলাপ হলে এরা বুঝতে পারবে, তাঁর মেয়ে ফেলনা কিছু নয়। সেও সবার আগে কেরিয়ার পছন্দ করে। ক'দিন আগেই মঞ্জুদেবী গদগদভাবে স্বামীকে বলেছিলেন, 'আমার ইচ্ছে, কণি দুই ক্যান্ডিডেটকেই মিট করুক। তারপর না হয় নিজেই বেছে নিক। বিয়ে কোনও হেলাফেলার বিষয় নয়। জোর করে চাপিয়ে দেওয়া চলে না। আজকাল জীবনসঙ্গী নিজেই পছন্দ করে নিতে হয়।'

মনোময়বাবু বলেছিলেন, 'তুমি তা হলে মেয়ের সঙ্গে কথা বলো।'

সেই কথা বলতে গিয়েই যে বিপদ হয়েছে মনোময়বাবু বুঝতে পারছেন। তিনি নিজেই সামলে নিয়ে বললেন, 'এই ছেলে কী করে?'

'ভিক্ষে করে। ভিক্ষে। হি ইজ আ বেগার। তোমার মেয়ে একজন ভিখিরিকে বিয়ে করতে চলেছে।' কাঁদতে কাঁদতে বলেন মঞ্জুদেবী।

'তুমি এতটা এক্সাইটেড হয়ো না মঞ্জু। বিপদ ঠান্ডা মাথায় সামলাতে হয়। তুমি কণিকে বুঝিয়ে বলেছ?'

'তোমার অসভ্য মেয়ে বলতে দিল কই? কথা শুরুর আগেই বলল, আমি খবর পেয়েছি তোমরা আমার জন্য ছেলে খুঁজছ। খামোকা পরিশ্রম করে লাভ নেই মা, আমি বিয়ের ব্যাপারে ডিসিশন নিয়ে ফেলেছি। ছেলের নাম...।'

কথা শেষ করতে পারলেন না মঞ্জুদেবী। রিসিভার চেপে ধরে কেঁদে ফেললেন। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, 'সেই ছেলে নাকি কোন পাড়াগাঁয়ে সামান্য চাকরি করে।' ফোন রাখার আগে মনোময় চ্যাটার্জি চিন্তিত গলায় বলেন, 'তুমি আর এটা নিয়ে ঝামেলা কোরো না মঞ্জু। কণি যদি সত্যি সত্যি বাড়ি থেকে চলে যায় সেটা আরও বড় কেলেঙ্কারি হবে। আমি নেক্সট অ্যাভেলেবল ফ্লাইটেই কলকাতায় ফিরছি।'

পুরো একটা দিন অবাক হয়ে ভেবেছিলেন মনোময়। তাঁর ইউনিভার্সিটিতে পড়া মেয়ে

এত বড় গাধা কী করে হল? শুধু ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত পড়েছে না, কণিকা বি. এ. এবং এম. এ. দুটোতেই ফার্স্ট ক্লাস! গাধা না হলে তার পরেও কেউ এই কাণ্ড করতে পারে? আমেরিকা, লন্ডন ছেড়ে গ্রামে গিয়ে সংসার পাতার সিদ্ধান্ত নেয়? তিনি ঠিক করেন মেয়ের সঙ্গে নিজে কথা বলবেন। তার মায়ের মতো রাগের কথা নয়, কথা বলবেন ঠান্ডাভাবে। তিনি জানতে চাইবেন, ওই ছেলের মধ্যে মেয়ে কী দেখেছে? কোন প্রতিভা? মায়ের সঙ্গে জেদাজেদি থাকলেও মেয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক মধুর। অনেক কথাই সে সহজভাবে বাবাকে বলতে পারে। বলতে ভালোওবাসে। গোড়া থেকে নিজে হাতে ট্যাকল করলে সমস্যা এতটা দূর যেত না বলে মনে হয়। কণিকা নিজের ভুল বুঝতে পারত।

'তোমার মা যা বলেছে তা কি সত্যি?'

কণিকা অবাক হয়ে চোখ বড় করে। বলে, 'মা কী বলেছে তা তো জানি না বাবা।'

'তুমি নাকি কাকে বিয়ে করবে ঠিক করে ফেলেছ।'

বাবার সঙ্গে সহজ হলেও কণিকা লজ্জা পায়। যতই হোক বিয়ের কথা। সে মাথা নিচু করে। নিচু করে তার উত্তর বুঝিয়ে দেয়।

'তুমি কি ফাইনাল ডিসিশন নিয়ে ফেলেছ কণি।'

মাথা নামানো অবস্থাতেই কণিকা বলে, 'হ্যাঁ বাবা। নিয়ে ফেলেছি। তোমাদের হয়তো আরও কয়েকটা দিন পরে জানাতাম। কিন্তু মা যেভাবে আমার জন্য ছেলে খুঁজতে উঠে পড়ে লেগেছে, তাই এখনই বলে রাখলাম।'

'ও।'

মনোময় চাটার্জি মুখের সামনে হাত মুঠো করে কাশলেন। মেয়ের কথা শুনে মনে হচ্ছে, ঘটনা অনেকদূর নয়, পুরোটাই গড়িয়ে গেছে। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, 'ছেলে শুনলাম চাকরিবাকরি তেমন কিছু করে না। তোমার মা বলছিল।'

কণিকা শান্ত গলায় বলে, 'মা পুরোটা ঠিক বলেনি, খানিকটা ঠিক বলেছে। শ্যামল চাকরি পেয়েছে কিন্তু মাইনেপত্র ভাল নয়। তবে কোয়ার্টার পেয়েছে। এইসব ছোট চাকরিতে প্রবেশনে থাকার সময় সাধারণত কাউকে কোয়ার্টার দেওয়া হয় না। ওকে দিয়েছে।'

হবু স্বামীকে 'কোয়ার্টার দিয়েছে' বলার মধ্যে মেয়ে একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব অনুভব করছে বলে মনোময়বাবুর মনে হল। তিনি দুঃখিত হলেন। কলকাতা থেকে দূরে অজ পাড়াগাঁয়ে সামান্য একটা এলেবেলে কোয়ার্টার নিয়ে তাঁর মেয়ে গর্ব করছে। দুঃখের বিষয়। মেয়েকে তিনি এভাবে মানুষ করেননি। তিনি যেভাবে মানুষ করেছেন, তাতে তার স্বামী লন্ডনে টেমস নদীর ধারে কোয়ার্টার পেলে গর্ব করা উচিত। নিজের প্রতি এক ধরনের হতাশা তৈরি হল মনোময়বাবুর। সেই হতাশা লুকিয়ে তিনি হাসবার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'গুড। সেই কোয়ার্টার কেমন তা কি তুমি জানো কণি? ক'টা ঘর?'

ইচ্ছে করেই আগে ছেলেতে না গিয়ে ছেলের ঘরবাড়ি নিয়ে আলোচনা শুরু করতে চাইছেন মনোময়।

কণিকা উৎসাহ নিয়ে বলল, 'কোয়ার্টার কেমন জানি না বাবা। তবে শুনেছি ঘর দুটো বেশ ছোট। তবে ছাদ খুব বড়।'

মনোময়বাবু অবাক হয়ে বললেন, 'ছাদ বড়! বড় ছাদ খুব একটা কাজে লাগবে কি?'

কণিকা উজ্জ্বল চোখে বলে, 'বাঃ লাগবে না? ওখানে তো বেশিরভাগ সময়েই সন্ধের পর কারেন্ট থাকে না। ভ্যাপসা গরমে ঘরের মধ্যে শুয়ে মরব নাকি? মাদুর নিয়ে ছাদে চলে গেলেই হবে। জানো বাবা, খানিকটা দূরেই একটা জঙ্গল মতোও আছে। বড় কিছু নয়, ছোট জঙ্গল। গায়েই একটা দিঘি। তাই সন্ধের পর বাতাস খুব প্লেজেন্ট। রাতের দিকে শীত শীত করে। বাড়ির কাছে জঙ্গল বা দিঘি থাকা একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। তাই না বাবা?'

মনোময় চ্যাটার্জি ঢোঁক গিলে বলেন, 'তুমি দেখছি খুব ডিটেইলসে খবর নিয়েছ মা। পাড়াগাঁয়ে দিঘি থাকবে, জঙ্গল থাকবে, সাপখোপ, মশা মাছি থাকবে এটা আর আশ্চর্যের কী? শহরে গাছপালা, ওয়াটার বডি থাকলে সেটাই মজার। বিদেশে এরকম অনেক আছে।'

কণিকা লজ্জা পেয়ে বলল, 'খবর আমি নিইনি, ও বলছিল। খোলামেলা জায়গা ও খুব ভালবাসে তাই সব বলছিল।'

মনোময় ভুরু কুঁচকে মেয়ের দিকে তাকালেন। নিজের মেয়েকে কি তাঁর খানিকটা অচেনা লাগছে? কী এমন ঘটল যে মেয়ে এতটা বদলে গেছে।

'ছাদের কথা তো হল, বাথরুম? কিচেন? এগুলো ঠিক আছে?'

'ঠিক নেই বাবা। শুনেছি কিচেনের অবস্থা খুবই খারাপ। বৃষ্টির সময়ে টিনের শেড থেকে জল পড়ে। বাথরুমও সেইরকম। উঠোন পেরিয়ে যেতে হয়। জলের সমস্যাও আছে। গরমের সময় সমস্যা বাড়ে। যদিও খুব সমস্যা হওয়ার কথা নয়।'

মনোময়বাবুর মনে হল নিশ্বাস থমকে গেছে। কণিকা এসব কী বলছে! তিনি বললেন, 'কেন? সমস্যা হওয়ার কথা নয় কেন?'

কণিকাকে এমনিতেই খুব সুন্দর দেখতে। সে সুন্দর করে হাসতেও পারে। বাবার দিকে তাকিয়ে সুন্দর হেসে কণিকা বলল, 'শ্যামল বলেছে, কাছেই একটা কুয়ো আছে। সেই কারণে খুব কিছু সমস্যা হবে না। জানো তো বাবা, কুয়ো থাকলেই সঙ্গে দারুণ একটা বাঁধানো কুয়োতলা থাকে। আমি অবশ্য এখনও জানি না, এখানকার কুয়োতলাটা বাঁধানো কিনা।'

মনোময় চ্যাটার্জি অবাক হয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। তিনি কী শুনছেন! যা শুনছেন তা কি ঠিক শুনছেন? তাঁর মেয়ে উঠোন পেরিয়ে বাথরুমে যাবে। কুয়ো থেকে জল তুলবে! এরপর হয়তো বলবে কুয়োতলায় বসে দুপুরে নভেল পড়বে। মঞ্জু ঠিকই বলেছে, কণিকার মাথায় গোলমাল হয়েছে। নইলে যে মেয়েকে একগ্লাস জল নিজে নিয়ে কোনওদিন খেতে হয়নি সে মেয়ে এসব কী ভাবছে!

মনোময়বাবু বুঝেছিলেন, কণিকাকে আর কিছু বলে লাভ নেই। যে হবু স্বামীর কোয়ার্টারের কুয়ো নিয়ে উত্তেজিত, আনন্দিত— তাকে কিছু বলে লাভ কী? স্ত্রীকে সেকথা বলেও ছিলেন। মঞ্জুদেবী বলেছিলেন, 'দেখবে ওই মেয়ে কত বড় বিপদে পড়ে। তুমি আমার কথা মিলিয়ে নিয়ো।' মনোময় চ্যাটার্জি সেই বিপদ আঁচ করতে পারলেন না, এমন নয়। পারলেন। এক সপ্তাহ রাতে ঘুম হল না। কাজে মন দিতে পারলেন না। মেয়েকে এখন বকাঝকা করে লাভ হবে না। সে এখন একটা ঘোরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ওই ছেলের কাছ থেকে তাকে সরিয়ে

আনা অসম্ভব। ওর মায়ের মতো জোর খাটাতে চাইলে খারাপ কিছু ঘটে যেতে পারে। তা ছাড়া কণিকার প্রতি কঠোর হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। উপায় একটাই, ছেলেকে যদি কিছু করা যায়। খড়কুটো চেপে ধরার মতো করে মনোময় চ্যাটার্জি একটা শেষ চেষ্টা করেছিলেন। কিছুদিন পরে কণিকাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তুমি যদি চাও, আমি ওই ছেলের সঙ্গে কথা বলতে পারি কণি। মুম্বই বা চেন্নাইতে, যদি বলো কলকাতাতেই আমি ওর একটা কাজকর্মের ব্যবস্থা করে দেব। তুমি অন্য ভাবে নিয়ো না। আমার মনে হয় না, ওরকম একটা অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে তোমার বেশিদিন ভাল লাগবে। তুমি স্যুট করতে পারবে। আমি যে কাজের ব্যবস্থা করব তাতে মাইনেপত্র খারাপ হবে না। আই থিঙ্ক এটার থেকে তো বেটার হবেই। তা ছাড়া আমাদের টাচে থাকতে পারবে। যদি আরও কোনও দরকার হয় আমি তো রইলাম।'

কণিকা বাবার প্রস্তাব শোনার পর মুচকি হাসে। বলে 'থ্যাঙ্কু বাবা। কিন্তু এর কোনও দরকার নেই। শ্যামল ওরকম একটা জায়গাতেই থাকতে চায়। সে পুরুলিয়া টাউনের প্রপারেও থাকার চান্স পেয়েছিল। নেয়নি। আসলে তার একটা উদ্ভট শখ আছে। ফাঁকা জায়গা না হলে সেই শখ ভাল করে মেটানো যায় না।'

'শখ! কীসের শখ?' মনোময় অবাক হন।

কণিকা উদ্ভাসিত মুখে বলে, 'থাক বাবা। সেই শখের কথা জেনে তোমদের লাভ নেই। মা এমনিতেই ভেঙে পড়েছে। তার ওপর যদি এটা শোনে তা হলে আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না।'

মনোময়বাবু এবার খানিকটা কঠিন গলায় বলেন, 'তোমার মায়ের ভেঙে পড়াটা কি অকারণ হয়েছে বলে মনে করো কণি? মায়েরা তো মেয়েদের ভবিষ্যতের কথা ভাববেই। যাই হোক, তুমি যদি শ্যামলের শখের কথা না বলতে চাও বোলো না। আমি তোমাকে জোর করব না। শখ মেটানোর সঙ্গে ফাঁকা জায়গায় কী সম্পর্ক আমি বুঝতে পারছি না। সে কি বাগান করে? গার্ডেনিং? করলে অসুবিধে কী? আমাদের বাদুর ফার্ম হাউস তো আছেই। উইক এন্ডে না হয় তোমরা চলে গেলে। নো বডি উইল ডিসটার্ব ইউ।'

কণিকা শক্ত মুখে বলে, 'আমি যতদূর চিনি শ্যামল শ্বশুরমশাইয়ের বাগানবাড়িতে গিয়ে শখ মেটানোর মতো ছেলে নয়। তা ছাড়া গার্ডেনিং সে করেও না। তার স্বভাব অন্য। ইনফ্যাক্ট ওর এই স্বভাবের কথা যেদিন আমি জানতে পারি সেদিনই আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এই ছেলেকে আমি বিয়ে করব। তোমরা যদি মনে করো, আমার এই বিয়েতে বাড়ির সম্মানে বড় ধরনের ধাক্কা লাগছে তা হলে আমি না হয় বাইরে গিয়েই বিয়ে করে নিচ্ছি। কত মেয়েই তো বিয়ের জন্য বাড়ি ছাড়ে। ছাড়ে না?'

কথা শেষ করে কণিকা দু'হাতে মুখ ঢাকে এবং ফুঁপিয়ে ওঠে। মনোময়বাবু মেয়ের মাথায় হাত রেখে গাঢ় স্বরে বলেন, 'ইটস ওকে। তুমি শান্ত হও কণি। আমরা চাই তুমি সুখী হও। আমার বিশ্বাস তুমি নিশ্চয় ঠিক মানুষকেই বেছেছ। তার কোনও একটা সুন্দর স্বভাব তোমাকে স্পর্শ করেছে।'

কণিকা মুখ থেকে হাত সরিয়ে বড় বড় ভেজা চোখদুটো তুলে বলে, 'সুন্দর কিনা জানি না বাবা, তবে তার এই শখের কথা তুমি শুনলেও মুগ্ধ হবে।'

মনোময় চ্যাটার্জি একদৃষ্টিতে মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। কণিকা ফিসফিস করে বলতে থাকে, 'বাবা, শ্যামল হল একজন মুন লাভার। চাঁদের ভক্ত। একটু ভক্ত নয়, ভীষণ ভক্ত। জ্যোৎস্না দেখলে সে পাগলের মতো হয়ে যায়। জাস্ট লাইক আ ম্যাড। পূর্ণিমার দিনগুলোতে সে কিছুতেই ঘরে থাকতে চায় না। থাকলেও সব আলো নিভিয়ে বসে থাকবে। নইলে ছুটে চলে যাবে ছাদে। ছাদ না থাকলে পথে পথে ঘুরবে। কতবার যে জ্যোৎস্না দেখতে সে কলকাতা ছেড়ে বাইরে চলে গেছে। গভীর রাত পর্যন্ত খোলা ছাদে বা মাঠে শুয়ে ঠান্ডা লাগিয়ে ফিরেছে গা ভরতি জ্বর নিয়ে। একবার তো নিউমোনিয়া হতে হতে বেঁচে গিয়েছিল। কলেজে পড়ার সময় বন্ধুদের সঙ্গে কাঁকড়াঝোড়ের জঙ্গলে গিয়ে হারিয়ে গেল। বিরাট টেনশনের ব্যাপার। খুঁজে পাওয়ার পর সবাই যখন চেপে ধরল সে জানাল, একটা চকচকে পথ ধরে হাঁটছিল। খানিক পরে খেয়াল হয়, ওটা আসলে কোনও পথই নয়! চাঁদের আলো। ব্যস রাস্তা হারিয়ে গেল। বোঝো কাণ্ড। তারপর থেকে ওর বন্ধুরা কেউ আর ওর সঙ্গে বাইরে যেত না। গেলেও অমাবস্যা দেখে যেত। সবাই ঠাট্টা করে বলত চাঁদে পাওয়া ছেলে। ওই ছেলেকে প্রথমে আমি তেমন আমল দিতাম না। বিশ্বাস করো। আমল দেবার মতো কী গুণই বা তার আছে? কিন্তু যেদিন শুনলাম...।'

কণিকার চোখ চকচক করছে। মনোময়বাবু সেদিকে তাকিয়ে রইলেন অবাক হয়ে। বিড়বিড় করে বললেন, 'শুধুমাত্র এই কারণে তুমি এই ছেলেকে পছন্দ করলে!'

'শুধুমাত্র! একে তুমি শুধুমাত্র বলছ! মা বুঝবে না, কেউ-ই বুঝবে না, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম তুমি অন্তত বুঝতে পারবে। একজন চাঁদে পাওয়া মানুষের সঙ্গে জীবন কাটানোর লোভ কোনও মেয়ে ছাড়তে পারে? অনেক কষ্ট হবে জেনেও পারে না।'

স্ত্রীকে এই অদ্ভুত কথাটা বলেননি মনোময়বাবু। বললে বিরাট ঘাবড়ে যাবে সেই ভয়ে বলেননি। শুধু বলেছিলেন, 'ওই ছেলের নাকি কীসব শখটখ আছে। তাতেই তোমার মেয়ে মুগ্ধ হয়েছে।' মঞ্জুদেবী বলেছিলেন, 'ওসব বাজে কথা। ওই ছেলে আসলে বিরাট বদ। মিথ্যে ভুজুংভাজুং দিয়ে বড়লোকের সুন্দরী মেয়েকে কবজা করেছে। ছোড়দি বলছিল, নিশ্চয় জলপড়া ধরনের কিছু খাইয়ে দিয়েছে কিনা খবর নিয়ে দেখ।'

চিন্তিত মনোময় বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আঃ, চুপ করবে?'

মঞ্জুদেবী চুপ করেই গেলেন। তবে বিয়ের সময় জাঁকজমকের কিছু কম করলেন না। বাড়ির সামনেই প্যান্ডেল করে নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা হয়েছে। সেখানে পাতা হয়েছে লাল ভেলভেটের সোফা। রয়েছে চা-কফি, ঠান্ডা পানীয়। মূল খাবার জায়গা তিনতলার ছাদে। বিয়ের আসর বসছে বাড়ির পিছনে। বাগানের একটা অংশে শামিয়ানা টাঙিয়ে নেওয়া হয়েছে।

সমস্যা হল এখনও বর এসে পৌঁছোয়নি। যদিও বিয়ের লগ্ন রাত বারোটা বেজে তিপান্ন মিনিটে। বরের চলে আসার কথা আটটায়। এখন সাড়ে আটটার কিছু বেশি হয়ে গেছে। মনোময়বাবু বরযাত্রীর জন্য বাসের ব্যবস্থা করতে চেয়েছিলেন। এসি ভলভো বাস। কণিকা সেই পরিকল্পনা বাতিল করেছে। বরযাত্রীর সংখ্যা নাকি কিছুতেই দশের বেশি হচ্ছে না। দু'-

একজন কমও হতে পারে। দুটো গাড়িতেই ধরে যাবে। মনোময় মেয়ের কথা শুনে বিরক্ত হয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'তুমি কী করে জানলে দশের বেশি হবে না?'

কণিকা শান্ত গলায় বলে, 'শ্যামল বলেছে। ওর অত আত্মীয়-টাত্মিয় নেই। যারা আছে তারাও সকলে আসবে না।'

'ও। তা হলে গাড়ির কথাই বলে দিচ্ছি। ক'টা গাড়ি বলব? তিনটে বলি?'

'বাবা, ওরা নিজেরাই ব্যবস্থা করে আসবে।'

নিজেরা ব্যবস্থা করে আসতে আসতে বরযাত্রীরা রাত দশটা বজিয়ে ফেলল। ততক্ষণে অতিথিরা অনেকেই চলে গেছে। বারবার ফোন করেও বর বা তার বাড়ির লোকদের ধরা যায়নি। টেনশনে মঞ্জুদেবীর প্রেশার বেড়ে গেল। তাঁকে ফাঁকা ঘরে নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল। তিনি বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'আমি জানতাম, আমি জানতাম এই ছেলে বিরাট গোলমাল করবে। গোলমালের এখন কী দেখলে? পরে আরও দেখবে।'

মনোময়বাবু চাপা গলায় ধমক দিয়ে বললেন, 'উফ, তুমি চুপ করবে? বাড়ি ভরতি লোক। কণি কাঁদছে, তুমি চেঁচাচ্ছ, কী ভাবছে সবাই?'

বাড়ি যতটা বড় করে সাজানো হয়েছিল, বিয়ে ততটা হইচই করে হল না। বর দেরি করে আসার রাগ চট করে কেউ ভুলতে পারল না। শান্তভাবেই বিয়ে শেষ হল। বাড়তি কোনও উচ্ছ্বাস ছাড়াই। আরও শান্তভাবে পরদিন বিকেলে কণিকা বাপের বাড়ি ছেড়ে রওনা দিল হাতে গোনা দু'-তিনটে সুটকেস আর ব্যাগ নিয়ে। সবাই ভেবেছিল, মেয়ে চলে যাওয়ার সময়ে মঞ্জুদেবী খুব কান্নাকাটি করবেন। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না। তিনি থমথমে মুখে মেয়েজামাইকে আশীর্বাদ করলেন।

মঞ্জুদেবী কাঁদলেন চারবছর বাদে। বদ্ধ উন্মাদ অবস্থায় জামাই গাছে ফাঁস ঝুলিয়ে আত্মহত্যা করার ঠিক তিনদিন পর আড়াই বছরের নাতনির হাত ধরে মেয়ে যখন ফিরে এল তখন। তবে সেই কান্নার মধ্যে দুঃখের থেকে আনন্দই বেশি ছিল। নাতনিকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'ইস কী চেহারা হয়েছে দু'জনের? চুলে তেল নেই, গায়ের পোশাক ময়লা। ছি ছি। দাঁড়া দু'দিনে তোদের ভোল পালটাচ্ছি। মা মেয়েকে জলে চুবিয়ে কেমন কাচি দেখবি।'

মনোময় চ্যাটার্জি ছিলেন তিনতলার বারান্দায়। তাঁর শরীর ভাল নেই। একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। সপ্তাহে তিনদিনের বেশি কাজে বেরোন না। তার ওপর আজ মেয়ে আসছে শুনে আরও বেরোননি। কণিকার পায়ের আওয়াজে মুখ ফেরালেন।

'আয় মা।'

কণিকা বাবার কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসল চেয়ারের পাশে। তারপর কোলে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে উঠল। মনোময়বাবু মেয়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে শান্ত গলায় বলেন, 'কাঁদিস না মা। কাঁদিস না। তুই তো চেষ্টা করেছিলি। এই কবছরে সেবা, চিকিৎসা কোনওটাই তো কম করিসনি। মাঝখানে তো কদিনের জন্য একটু ভালও হয়েছিল শুনলাম। আসলে কী জানিস অসুখটাই এরকম।'

কণিকা মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, 'আমারই ভুল বাবা। আমি বুঝতে পারিনি। আমি

ভেবেছিলাম নরমাল। তখন আমার বোঝা উচিত ছিল। সন্দেহ করা উচিত ছিল। পুরনো অসুখ, ট্রিটমেন্ট কিচ্ছু নেই।'

পরম স্নেহে মেয়ের পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে মনোময়বাবু বললেন, 'মানুষ তো ভুল করে। করে না? এবার অন্যভাবে শুরু কর। তোর রেজাল্ট ভাল। ইচ্ছে করলে চাকরি করতে পারিস। যদি চাস আমার বিজনেসও দেখতে পারিস। আমার শরীরটা ভাল নেই। তুই যদি দায়িত্ব নিস বড় নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।' বাবার কোলে মাথা রেখে কণিকা আকুলভাবে কাঁদতে লাগল।

সতেরো বছর পর।

সৌমী কলেজ থেকে ফিরল সন্ধের মুখে। ফিরেই বিরাট হইচই শুরু করে দিল। রোজই করে। চিৎকার করে দিদিমাকে খাবারের অর্ডার দেয়। ড্রইংরুমে রাখা দাদুর ফটোর সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বকর বকর করে। কাচের ধুলো পরিষ্কার করে। ফুল গুছিয়ে রাখে। তারপর দুটো করে সিঁড়ি টপকে সোজা চলে আসে তিনতলায়। মায়ের কাছে। কণিকা সবদিন বাড়ি থাকে না। অফিসে আটকে পড়লে ফিরতে রাত হয়। এত বড় ব্যাবসা একা হাতে সামলানো সহজ কথা নয়। মনোময়বাবু মৃত্যুর আগে অনেকটা গুছিয়ে দিয়ে গেছেন। মাইনে করা লোকজনও অনেক। তবু সবদিকে খেয়াল রাখতে হয়।

আজ কণিকা বাড়ি আছে। নিজের ঘরে বসে অফিসের কাগজপত্র ঘাঁটছিল। সৌমী এসে লাফ দিয়ে খাটে উঠে পড়ল। মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে বলল, 'আই লাভ ইউ মামি।'

কণিকা গলা থেকে মেয়ের হাত ছাড়াতে ছাড়াতে বলল, 'যাও, আগে চেঞ্জ করে এসো।'

সৌমী মায়ের গায়ে হেলান দিয়ে চোখ বড় বড় করে বলল, 'আজ একটা দারুণ কাণ্ড হয়েছে মা।'

কণিকা চোখ থেকে চশমা খুলল। সৌমীকে দেখতে ভারী সুন্দর হয়েছে। যত বড় হচ্ছে, তার রূপ বাড়ছে। সবাই বলে, মায়ের মতো স্নিগ্ধ চেহারা পেয়েছে মেয়েটা। শুধু চেহারা নয়, মাথাও খুব পরিষ্কার। কণিকা ঠিক করে রেখেছে, কলেজের পাট শেষ হলেই মেয়েকে বিদেশে পাঠিয়ে দেবে। খোঁজখবরও শুরু করেছে। কণিকা মেয়ের এলোমেলো চুলে হাত বুলিয়ে বলল, 'মজার কাণ্ড পরে শুনব। আগে তুমি চেঞ্জ করে হাতমুখ ধুয়ে এসো।'

'না আগে শুনতে হবে।'

'উফ! তুমি কিন্তু দিন দিন খুব অবাধ্য হয়ে যাচ্ছ সৌমী। যত বড় হচ্ছ কথা না শোনাটা একটা হ্যাবিটে দাঁড়াচ্ছে।' মিথ্যে রাগ দেখায় কণিকা।

সদ্য কৈশোর পেরোনো সৌমী একটু উঠে বসে। মায়ের চোখে নিজের ঝলমলে চোখ রেখে বলে, 'আজ কী হয়েছে জানো মামি? আজ আমি একটা দারুণ ছেলেকে মিট করেছি। আমাদের কলেজেই পড়ে। সেকেন্ড ইয়ার ফিজিক্স। দ্য বয় ইজ আ মুন লাভার। বাংলায় কী বলব? চন্দ্রপ্রেমিক? নাকি চাঁদপাগল? ফুল মুন হলেই সেই ছেলে পাগল হয়ে যায়। টোটাল ম্যাড। মুন লাইট দেখার জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে পড়বে। কেউ ঠেকাতে পারবে না। কী দারুণ না মামি?'

কণিকা নিষ্পলক হয়ে মেয়ের দিকে তাকিয়ে আছে।

'মামি, ওই ছেলে আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে একদিন মুনলাইট এক্সপিডিশনে যাবে কথা দিয়েছে। মুনলাইট এক্সপিডিশন কী বলো তো? জ্যোৎস্নায় খোলা আকাশের নীচে ইচ্ছেমতো ঘুরে বেড়ানো। উফ! কী রোমান্টিক! আমরা ঠিক করেছি গ্রামটামের দিকে কোথাও চলে যাব। রিভার সাইড বা ফরেস্ট হলে সবথেকে ভাল হয়। আমি বলেছি, গাড়ি আমি দেব। তুমি কিন্তু বারণ করতে পারবে না।'

কণিকা বারকয়েক কেঁপে উঠল। মনে হচ্ছে চারপাশের সবকিছু দুলছে। সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তার চোখ ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে জলে।

উদিতা বিশেষ বর্ষপূর্তি সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ২০০৯

লাস্ট ট্রেন

মনে হচ্ছে, আজ আমার জন্য খুব বড় ধরনের বিপদ অপেক্ষা করে আছে। ধানখেতের মধ্যে সারারাত আমাকে বসে থাকতে হবে। ফোন করে যে পর্ণাকে একটা খবর দেব সে পথও বন্ধ। বিকেলেই আমার মোবাইলের চার্জ ফুরিয়ে গেছে। ট্রেন ধরার আগে। লোকাল ট্রেনে চার্জ দেওয়ার কোনও ব্যবস্থা থাকে না। যদিও পর্ণা এসব শুনবে না। বিয়ের রাতেই সে আমাকে জানিয়ে দিয়েছিল, আগামী দু'বছর রাগ হলে সে কোনওরকম যুক্তি বুদ্ধির ধার দিয়ে যাবে না। পুরো তিন দিন আমার সঙ্গে কথা বন্ধ রাখবে। এই তিন দিন আমি যেন তাকে কোনওভাবে বিরক্ত না করি। আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম, 'ওরে বাবা, দু'বছর! অতদিন কেন?'

পর্ণা গম্ভীরভাবে বলেছিল, 'ম্যাক্সিমাম বছর দেড়েক স্বামীদের প্রতি বিশ্বাস থাকে। আমি আরও ছ'মাস বাড়িয়ে রাখলাম। তারপর আর বিশ্বাস থাকে না। বিশ্বাস না থাকলে রাগ টাগেরও কোনও কারণ নেই।'

আমি ভেবেছিলাম পর্ণাকে জিজ্ঞেস করব, এই উদ্ভট তত্ত্বটি সে কোথা থেকে পেল? কিন্তু সাহস পাইনি। ফট করে যদি রেগে যায়।

আমাদের বিয়ের দু'বছর এখনও হয়নি। দেড় মাস বাকি আছে। ফলে পর্ণাও তার সিস্টেম বজায় রেখেছে। রাগ হলে স্কুলের মেয়েদের মতো কথা বন্ধ করে দেয়, আর সেই তিন দিন আমি একটা দিশেহারা অবস্থার মধ্যে পড়ি।

তবে শুধু তো কথা বন্ধের জন্য নয়, আমি আজ না ফিরলে বেচারি খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়বে।

খানিক আগে পর্যন্ত ভেবেছিলাম ঝড়-বৃষ্টি দুটোই কমে আসবে। বৃষ্টিটা একটু ধরেও এসেছিল। আবার নতুন করে নেমেছে। সেই সঙ্গে হাওয়াও দিচ্ছে খুব। নিশ্চয় বড় কোনও দুর্যোগ শুরু হয়েছে। ওই যে নিম্নচাপ না কী যেন বলে। টানা তিন-চার দিন এই অবস্থা চলবে। আমার নার্ভাস লাগছে।

ট্রেন শেষ পর্যন্ত পৌঁছোবে তো? নাকি মাঝপথেই কোথাও আটকে যাবে? ওভারহেডের তার ছিঁড়লে বা লাইনের ওপর গাছ পড়লে রেহাই নেই। তার ওপর জল জমার ব্যাপার আছে। গত বর্ষায় মুম্বইতে আমার ছোটমামার এই কাণ্ড হয়েছিল। ছোটমামা আসছিল থানে থেকে। বৃষ্টিতে লাইনে জল জমে ট্রেন গেল আটকে। পুরো দেড় দিন গাড়িভরতি মানুষ বসে ছিল ট্রেনের ভেতর। খাবারদাবার, বাথরুম কিচ্ছু নেই। ট্রেন থেকে নেমে যে জল ভেঙে হাঁটবে সে পথও বন্ধ। গুজব ছড়িয়েছিল, একজন নাকি ছেঁড়া ইলেকট্রিক তারে কারেন্ট

খেয়ে মারা গেছে। এরপর আর কেউ নামে? এমনিতে ছোটমামার কথা আমার একেবারেই মনে পড়ে না। আজ বারবার পড়ছে। মানুষের মনের এই একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার। বিপদের সময় বিপদের গল্প বেশি বেশি করে মনে পড়ে। অথচ ভাল সময়ে ভাল কিছু মনে পড়বে না। কথা বন্ধের মতো পর্ণার আরও ছেলেমানুষি আছে। কোনও কোনও রাতে বিছানায় শুয়ে সে আমার সঙ্গে গল্প করতে চায়। বলে, খানিকক্ষণ গল্প না করলে কিছুতেই আমাকে তার গায়ে হাত দিতে দেবে না। তাও আবার হাবিজাবি অফিসের গল্প করলে চলবে না। ইন্টারেস্টিং বিষয় নিয়ে গল্প করতে হবে। কী ভয়ংকর। আমি পড়ি সাত হাত জলে। ঠিক ওই সময়টাতেই আমার কোনও ইন্টারেস্টিং বিষয় মনে আসে না। আমি আঁতিপাঁতি করে গল্প মনে করবার চেষ্টা করি। পর্ণা পাশ ফিরে শুতে শুতে বলে, 'আমি এখন ঘুমোলাম। গল্প মনে পড়লে ডেকে তুলবে, আমি শুনব।'

না, লাস্ট ট্রেন ধরাটা ঠিক হয়নি। অবশ্য ঝড়-বৃষ্টির আর লাস্ট ফার্স্ট কী? যখন গাড়িতে উঠেছি তখন আকাশের অবস্থা এরকম ছিল না। শুধু শিরশিরে একটা হাওয়া দিচ্ছিল। সেই সঙ্গে হালকা হালকা বিদ্যুৎ। সারাদিন গুমোট গরমে ছোটাছুটি করে কাজ করেছি, ঠান্ডা হাওয়া বেশ লাগছিল। সেই হাওয়া যে এমন ভয়ংকর চেহারা নেবে কে জানত?

ট্রেন স্পিড কমিয়ে দিয়েছে। একটু বেশি দুলছেও। ঝড়ের জন্য দুলছে নাকি? সিটের পিছনটা চেপে ধরলাম। ঘটনাটা শুনে মনে হচ্ছে, জীবনে এই প্রথম ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে ট্রেনে উঠেছি। মোটেও তা নয়। আড়াই বছর চাকরিতে জয়েন করেছি। সেলসের কাজ। সেদিক থেকে চাকরি এখনও নতুন। টার্গেট সামলাতে হিমসিম খেয়ে যাই। মারাত্মক ছোটাছুটি করতে হয়। হাড়কাঁপানো শীত, পিচগলা গরম, তুমুল বৃষ্টি— সব সময়েই ঘুরে বেড়াই। তবে সেগুলোর কোনওটাই আজকের মতো ভয়ংকর ছিল বলে মনে পড়ছে না। আজ দূরের এক মফস্‌সল শহরে কাজ সেরে ফিরছি। পর্ণার জন্য তিন দিনের কাজ দু'দিনে করেছি এবং খুব স্বাভাবিক কারণে টার্গেট ফেল হয়েছে। আরও হাফবেলা অন্তত থাকা উচিত ছিল। কিন্তু উপায় কী? পর্ণাকে কথা দিয়েছি আজ ফিরব। যত রাতই হোক ফিরে একসঙ্গে ডিনার করব। পর্ণা জেগে থাকবে। শুধু জেগে থাকবে না, বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবে। মেয়েটার এই আর এক খারাপ অভ্যেস। আমার ফেরার সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবে। বারণ করলেও শোনে না। আমাদের বারান্দাটা আবার খোলা। একবার ঠায় আড়াই ঘণ্টা দাঁড়িয়ে ঠান্ডা লাগিয়ে ফেলেছিল বেচারি। আমি মোবাইলে তাকে কত বলেছিলাম 'লক্ষ্মীটি, এরকম করে না, তুমি ঘরে যাও। আমি মিটিং-এ আটকে পড়েছি। মুম্বই থেকে বস এসেছে।' কে শোনে কার কথা? সুন্দরী মেয়েরা জেদি টাইপের হয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করা ঠিক হয়নি। আজ যদি সারারাত না ফিরি তা হলে আমি নিশ্চিত পর্ণা সারারাতই বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবে। কী জ্বালাতন! এই কামরায় কারও কাছে কি মোবাইল আছে? অনুরোধ করলে একটা ফোন করতে দেবে?

আমার টেনশন বাড়ছে।

খানিক আগে সিট বদল করেছি। ওদিকের জানলাগুলো ঠিকমতো বন্ধ করা যাচ্ছে না। সিট, মেঝে সব জলে ভেসে গেছে। আমার জামা প্যান্টেও ঝাপটা লেগেছে। খোলা

জানলার ওপারে হঠাৎ হঠাৎ ঝলসে ওঠা বিদ্যুতের আলোয় দেখছিলাম অন্ধকার ধানখেত আর মাঠ জুড়ে বৃষ্টি পড়ছে। হাওয়ার দাপটে সাদা পরদার সেই বৃষ্টির পরদার মতো দুলছে। লাইনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ভুতুড়ে গাছগুলো তেড়ে তেড়ে আসছে। ডালপালা নাড়ছে তো না, যেন হাত পা দাপাচ্ছে! কে জানে অন্য সময় হলে এই দৃশ্য হয়তো ভাল লাগত। আজ ভয় ভয়ও করছে। এদিকে অবশ্য দু'পাশের জানলাই বন্ধ। ফলে ঝড়ের দাপাদাপি দেখতে হচ্ছে না। বিয়ের আগে শুনেছিলাম বড়, টানা টানা চোখের মেয়েরা বৃষ্টি ভালবাসে। কুশলের বউ ওরকম। বৃষ্টি-পাগল মেয়ে। আমার পর্ণার চোখও বড় আর টানা টানা, কিন্তু সে একেবারেই বৃষ্টি পছন্দ করে না। তার মতে বৃষ্টি মানেই জল-কাদা, জামাকাপড় স্যাঁতসেঁতে, সর্দি কাশির সময়। তার পছন্দ ঝলমলে রোদ। গোটা আষাঢ়-শ্রাবণ মাস দুটো ধরে পর্ণা মুখ বেজার করে থাকে। যেন আকাশে নয়, তার মুখেই মেঘ জমেছে। প্রথম প্রথম একটু দুঃখ পেয়েছিলাম। কারণ বৃষ্টি ছিল আমার ফেভারিট। পরে দেখলাম পর্ণাকে আমার হাসিমুখেও যেমন ভাল লাগে, বেজার মুখেও ভাল লাগে। মজার কথা হল, ওর সঙ্গে থাকতে থাকতে আজকাল আমিও বৃষ্টি অপছন্দ করতে শুরু করেছি।

গোটা কামরাটা ফাঁকা। এমনিতেই লাস্ট ট্রেনে প্যাসেঞ্জার কম হয়। আজ মনে হচ্ছে আরও কম। হাতে গোনা দু'-পাঁচজন মাত্র। তারাও এমনভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসে আছে যে কাউকে ঠিকমতো দেখা যাচ্ছে না। অন্যদিন ট্রেনের ভিড় অসহ্য লাগে। আজ মনে হচ্ছে, ভিড় থাকলে ভাল হত। চেঁচামেচি, হই-হট্টগোল, তাস খেলা দেখতে দেখতে সময় কাটত। ব্যাগ থেকে অফিসের কাগজপত্র বের করে উলটোলে কেমন হয়? সেলস টার্গেট ফেল করার ধাক্কা আগামী মাসে কীভাবে সামলাব তা নিয়ে কিছুটা অন্যমনস্ক থাকা যেত। কিন্তু সে উপায় নেই। এদিকটায় যেমন জলের ছাট কম, তেমন আলোও কম। মাথার ওপর পরপর দুটো বাল্‌ব জ্বলছে ঠিকই, কিন্তু দুটোর অবস্থাই শোচনীয়। লোহার জালির মধ্যে ঝুলকালি মেখে টিমটিম করছে। এই আলোয় কিছু পড়া অসম্ভব। আমি চোখ নামালাম।

আর তখনই উলটোদিকে বসা মানুষটাকে দেখতে পাই।

লম্বা সিটের এককোনায় ভদ্রলোক বসে আছেন চোখ বুজে। মনে হচ্ছে, ঝিমোচ্ছেন। ঝিমোনোর মধ্যে একটা নিশ্চিন্ত ভাব। আশ্চর্য! এত ঝড়-জলে এরকম নিশ্চিন্তে কেউ ঘুমোতে পারে? মনে হচ্ছে, বাইরে কী হচ্ছে জানেনই না। অথবা জানলেও পাত্তা না দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। ঘুমোনোর জন্য অন্ধকার দিকটা বেছে নিয়েছেন। ভদ্রলোকের গায়ে ধোপদুরস্ত ধুতি পাঞ্জাবি। চোখে পুরনো ধরনের মোটা কালো ফ্রেমের চশমা। চশমা নাকের ওপর ঝুলে পড়েছে। বুকপকেটে পেন। পাশে একটা ব্যাগও রয়েছে। ঝোলা ব্যাগ। ব্যাগটাও বেশ পরিষ্কার। ভদ্রলোকের বয়স কত? বুঝতে পারছি না। চুয়ান্ন পঞ্চান্নর নীচে নয়। ঘাড়টা ডান দিকে সামান্য হেলে আছে। ট্রেনের দুলুনিতে একটু একটু কাঁপছে। আমার হিংসে হচ্ছে। আহা। আমিও যদি এমন করে ঘুমোতে পারতাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পর্ণাকে স্বপ্ন দেখতাম। দেখতাম, আমি আর পর্ণা টেবিলে খেতে বসেছি। বাড়ি ফিরতে দেরি হওয়ার অপরাধে নিয়ম অনুযায়ী সে আমাকে শাস্তি দিয়েছে। কথা বলছে না। ইশারায় আমাকে আরও একটা রুটি নেওয়ার জন্য ধমক দিচ্ছে। ইশারায় প্রেম করা যায় জানতাম, ধমকও যে

দেওয়া যায় পর্ণাকে বিয়ে না করলে জানতাম না। ইশারা ইঙ্গিতে পর্ণা আমাকে ভারী সুন্দর ধমক দিতে পারে। মুখে কিছু বলি না, কিন্তু মুগ্ধ হয়ে যাই।

আচ্ছা, এই ঘুমন্ত ভদ্রলোকও কি কলকাতা যাচ্ছেন? গেলে ভাল। একজন সঙ্গী পাওয়া যাবে। ঘুমন্ত সঙ্গী।

ট্রেন থমকে দাঁড়াতে বুকটা ধড়াস করে উঠল। ছাদ থেকে ঝরঝর করে জল পড়ার আওয়াজ পাচ্ছি। স্টেশন না ধানখেত? ধানখেতই হবে। উঠে একবার দেখলে হয়।

আমি ওঠবার আগেই উলটোদিকের ভদ্রলোক চোখ খুলে ধড়ফড় করে সোজা হয়ে বসলেন। নাকের ওপর ঝুলে পড়া চশমাটা আঙুল দিয়ে ঠেলে তুলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আনন্দপুর এল, না?'

ভদ্রলোকের জেগে ওঠা এবং কথা বলায় আমি উৎসাহ পেলাম। বিনয়ী গলায় বললাম, 'ঠিক জানি না। এই লাইনে আমার যাতায়াত নেই।'

ভদ্রলোক হাতের কবজি উলটে ঘড়ি দেখলেন। বললেন, 'আনন্দপুরই হবে।'

যারা এক পথে রোজ যাতায়াত করে তাদের জানলা দিয়ে স্টেশনের নাম দেখতে হয় না। সময় দেখেই বলে দিতে পারে ট্রেন কোথায় এসেছে। তাদের হাতের ঘড়িতেই স্টেশনের নাম ফুটে ওঠে। তবে আজ গাড়ি সময় মেনে চলছে না। ভদ্রলোক ভুল বলছেন। আমি নার্ভাস গলায় বললাম, 'মনে হয় মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়েছে।'

ভদ্রলোক হাতদুটো মাথার ওপর তুলে আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে থমকে গেলেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'মাঝপথে! কেন? মাঝপথে দাঁড়াবে কেন?'

'যা ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে। গাড়ি লেট করছে।'

ভদ্রলোক হেসে ফেললেন। বললেন, 'না না, গাড়ি রাইট টাইমে যাচ্ছে।' বলতে বলতে সরে গিয়ে ভদ্রলোক জানলার ওপর ঝুঁকেও পড়লেন। যেন স্টেশন দেখিয়ে আমাকে হাতেকলমে আশ্বস্ত করতে চাইছেন। তবে দু'হাতে জানলাটা একটু খুলতেই ট্রেন ছেড়ে দিল। চলন্ত জানলার ফাঁক দিয়ে দেখলাম, নির্জন, ভেজা একটা প্ল্যাটফর্ম হুসহাস করে পার হয়ে যাচ্ছি। জানলার গা বেয়ে ঝপঝপ করে জল পড়ছে। ভেজা স্টেশনে জলে মুছে যাওয়া ধরনের আলোর তলায় ছাতা মাথায় একজন দাঁড়িয়ে। লোকটার পিছনে হলুদ বোর্ড। এক ঝলকের জন্য পড়তে পারলাম, তাতে লেখা— আনন্দপুর।

ট্রেন স্পিড বাড়াল।

ভদ্রলোক আবার জানলা তুলে নিজের জায়গায় ফিরে এলেন। আমি খুব খুশি হলাম। আলাপ করার ঢঙে বললাম, 'ঝড় কমেছে। বাপ রে যা শুরু হয়েছিল।'

ভদ্রলোক ঠোঁটের ফাঁকে আবার মুচকি হাসলেন। বাঃ, মানুষটা বেশ হাসিখুশি ধরনের তো! মনে হয় আমার নার্ভাস ভাব দেখে মজা পেয়েছেন। অন্য সময় হলে রাগ হত। এখন হচ্ছে না। উনি তো ঠিকই বলেছেন। গাড়ি ঠিক সময় চলছে। না দেখেই স্টেশনের নাম বলে দিলেন। বাকি পথটা যদি ঠিকমতো চলে তা হলে হাওড়া আর বেশিক্ষণ নয়। পর্ণাকেও বারান্দায় দাঁড়াতে হবে না। সে আমার সঙ্গে কথাও বন্ধ করবে না। দু'দিন পরে বাড়ি ফিরে বউয়ের সঙ্গে ইশারায় ভাব-ভালবাসা চালাতে হলে খুব বাজে হত। এখন মনে হচ্ছে, আমার

এতটা টেনশন করা বাড়াবাড়িই হচ্ছিল। মনটা এক ঝটকায় অনেকখানি হালকা হয়ে গেছে। এই ভদ্রলোকই নিশ্চিন্ত করে দিয়েছেন। মুচকি হাসি কেন, মানুষটা যদি এখন গালে একটা চড়ও দেয় আমি কিছু মনে করব না। বয়সে তো আমার থেকে বেশ কিছুটা বড়ই, ভদ্রলোকের চেহারাতেও একটা মাস্টার মাস্টার ভাব আছে। চড়ে ক্ষতি নেই। মুখ হাসিহাসি রেখেই পাশে রাখা ঝোলাটা থেকে একটা ছোট্ট কৌটো বের করলেন ভদ্রলোক। রুপোলি কৌটোর ঢাকনা খুলে দু'আঙুলে তুলে কিছু একটা মুখে দিলেন। ঢাকনা বন্ধ করতে গিয়ে মুখ তুলে আমার দিকে ভুরু তুলে বললেন, 'খাবেন? মশলা।'

ট্রেনে অচেনা কারও কাছ থেকে কিছু খাওয়া ঠিক নয়। তবে এই ভদ্রলোকের বেলায় এই সাবধানতার কোনও মানে নেই। ইনি টেনশন দূর করে আমার উপকার করেছেন। বাকি পথটুকু বকবক করার লোভ সামলাতে পারছি না। হাত বাড়িয়ে মশলা নিয়ে মুখে দিলাম। মশলাজাতীয় জিনিস আমি একেবারেই পছন্দ করি না, পর্ণা করে। বিয়েবাড়ি বা রেস্তোরাঁয় খেতে গেলেই এক খাবলা তুলে মুখে দেয়।

আমি মিথ্যে করে বললাম, 'বাঃ, চমৎকার মশলা তো। সুন্দর গন্ধ।'

ভদ্রলোক আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সত্যি সুন্দর?'

আমি স্মার্ট সাজার চেষ্টা করে হাসলাম। বললাম, 'মিথ্যে বলব কেন?'

ভদ্রলোক কৌটোটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'তা হলে এটা রাখুন।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'না না, এই তো খেলাম।'

ভদ্রলোক সহজভাবে বললেন, 'তাতে কী হয়েছে? আবার খাবেন। নিন ধরুন। বাড়িতে নিয়ে যান। আমার কাছে আরও আছে।'

ভদ্রলোক যেভাবে হাত এগিয়ে দিয়েছেন তাতে প্রত্যাখ্যান করা খারাপ দেখায়। আমি দ্রুত ভেবে নিলাম, অসুবিধে কী? নিয়ে নিই। মশলার কৌটো উপহার নিয়ে বাকি পথটুকু যদি ঘনিষ্ঠ থাকা যায় ভালই তো। আমি লজ্জা লজ্জা মুখ করে হাত বাড়িয়ে কৌটোটা নিয়ে ফেললাম। শার্টের পকেটে রাখতে রাখতে লাজুক হেসে বললাম, 'ধন্যবাদ, আমার স্ত্রী মশলা খুব ভালবাসেন।'

ভদ্রলোক ছোট একটা হাই তুলে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'আমার স্ত্রীও ভালবাসতেন।'

পর্ণার সঙ্গে মিল শুনে আমি খুশি হলাম। নতুন নতুন বিয়ের এই একটা সুন্দর ব্যাপার। ছুতোনাতায় বউয়ের কথা মনে পড়লেই ভাল লাগে। তরল গলায় বললাম, 'উনি এখন ভালবাসেন না?'

'ঠিক জানি না। আমি এখনকার খবর বলতে পারব না।'

এখনকার খবর বলতে পারব না! কথাটার মানে কী? স্ত্রী কি ভদ্রলোকের সঙ্গে আর থাকেন না? সম্পর্ক নেই? ডিভোর্স?

ভদ্রলোক নিজেই উত্তর দিলেন। ঠোঁটের কোনায় মৃদু হেসে বললেন, 'সে এখন তো আমার সঙ্গে থাকে না, তাই বলতে পারব না।'

একটু অস্বস্তি হল। আমি বললাম, 'ও।'

ভদ্রলোক কথা বন্ধ করে আপনমনে গুনগুন করে একটা গানের মতো কী করতে

লাগলেন। যেন স্ত্রী সঙ্গে না থাকাটা তাঁর কাছে এখন আর কোনও ব্যাপার নয়। আমি প্রসঙ্গ পালটাতে বললাম, 'আসলে কী জানেন, ঝড়-বৃষ্টিতে টেনশন হয়ে গিয়েছিল। যদি না কমে।'

গান থামিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'বয়স কম, টেনশন হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। খোলা ট্রেনে সব সময়েই বৃষ্টি বেশি মনে হয়। তার ওপর দু'পাশে মাঠঘাট, খেত, গাছপালা। সবটা জুড়েই বৃষ্টি দেখা যায়। পরিমাণে মনে হয় অনেক। সেই সঙ্গে রাতও হয়েছে; সব মিলিয়ে আপনার মনে হচ্ছিল, বড় কোনও দুর্যোগ চলছে। তাই তো?'

কথা শেষ করে ভদ্রলোক সুন্দর করে হাসলেন।

চমৎকার যুক্তি। আলাপী, হাস্যমুখের মানুষটাকে এতক্ষণ নিজের ভয় ভাঙানোর জন্য পছন্দ করছিলাম, এখন সত্যি সত্যি পছন্দ করে বসলাম। মানুষটা মিশুকেও। একটু মিশুকে নয়, অতিরিক্ত মিশুকে। নইলে সামান্য আলাপে কেউ মশলার কৌটো প্রেজেন্ট করে বসে? ভদ্রলোক পুরো পথটা সঙ্গে থাকলে বাঁচি। কথা বলতে বলতে যাওয়া যাবে। আমি অন্তরঙ্গ হওয়ার কায়দায় বললাম, 'আসলে বাড়িতে অপেক্ষা করে থাকবে। আটকে গেলে মুশকিল।'

ভদ্রলোক আরাম করে বসে ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের আঙুলগুলো মটকাতে থাকলেন। পুরনো দিনের অভ্যাস। আজকাল আর কাউকে খুব একটা আঙুল মটকাতে দেখা যায় না।

'সে তো দেখেই বুঝতে পারছি। অনেকক্ষণ ধরে ছটফট করছ। তুমি বলছি ভাই, বয়সে ছোট। তা ছাড়া স্কুল মাস্টারি করে আপনি, আজ্ঞে ভুলে গেছি। কিছু মনে করলে না তো?'

আমি আগ্রহ নিয়ে হেসে বললাম, 'ছি ছি, মনে করব কেন?'

'বাড়িতে বউ চিন্তা করছে? ছটফটানি দেখে মনে হচ্ছে হয়েছে।'

একেই সহজ সরল মানুষ বলে। নিশ্চয় কলকাতার বাইরে থাকেন। কলকাতায় থাকলে চট করে কেউ এই প্রশ্ন করতে পারত না। ভদ্রতায় লাগত। আমি লাজুক ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়লাম।

'বিয়ে বেশিদিন হয়নি। আমার স্ত্রী পর্ণা আবার অল্পেই চিন্তা করে বসে। বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত জেগে থাকবে।'

ভদ্রলোক এবার যেন নিজের মনেই হাসলেন। গায়ের পাঞ্জাবিটা হাত দিয়ে টেনেটুনে ঠিক করলেন। ভদ্রলোক খানিকটা শৌখিন প্রকৃতির। এই ঝড়-জলেও ধুতি পাঞ্জাবিতে একফোঁটা কাদা লাগাতে দেননি।

'স্বাভাবিক, বিয়ের পরপর এটাই স্বাভাবিক। আমার উনিও একই কাণ্ড করতেন। আমার স্কুল তোমার ঘণ্টা আড়াইয়ের ট্রেন জার্নি। তখন আবার ক'টা টিউশন করতাম। তার ওপর ট্রেনের গোলমাল ছিল, চেনাজানাদের সঙ্গে স্টেশনে দাঁড়িয়ে চা খাওয়া ছিল। কোনও কোনও দিন বন্ধুরা টানাটানি করলে তাসের আড্ডাতেও বসে যেতাম। সেসব সামলে বাড়ি ফিরতে দেরি হত। গিয়ে দেখতাম সে বেচারি ঠায় বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে। বোঝো কাণ্ড!'

বারান্দায়! আমি চমকে উঠলাম। আরে, এ তো একেবারে পর্ণার মতো! সব নতুন বউই এরকম করে নাকি? বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে? আমার যেসব বন্ধুবান্ধব আগে বিয়ে করেছে তারা নিজেদের দাম্পত্য সম্পর্কে অনেক অভিজ্ঞতার কথাই আমাকে জানিয়েছে। না জানতে চাইলে জোর করে জানিয়েছে। সেগুলো সবই শিক্ষামূলক। রাতের শিক্ষা।

আমাদের অফিসের মানসদা নাকি রবিবার দুপুরেও ‘ওস্তাদ’। অনেকেই আমাকে পরামর্শ দিয়েছিল, ‘মানসদার কাছে একবার এক্সপিরিয়েন্স শুনে এসো ভায়া। ছুটিছাটার দিনে কাজে লাগবে।’ আমি শুনেছিলাম, তবে লাভ হয়নি। পর্ণা দিনের বেলায় কিছুতেই রাজি হয় না। ওর নাকি লজ্জা করে। কী ঝামেলা! বিয়ের দু’বছর হতে চলল এখনও লজ্জা! কে যেন বলেছিল, যাদের মাথায় একঢাল চুল থাকে তারা নানা ধরনের ঝামেলা পাকানোর এক নম্বর হয়। পর্ণারও তাই। অনেক রবিবার দুপুরেই হতাশ মনে ভাবি, এক ঢালের চুলের মেয়েকে বিয়ে করাটা একেবারেই উচিত হয়নি। বিরাট বোকামি হয়েছে।

ট্রেন দাঁড়াল। মিনিট খানেকের জন্য। জল পড়ার আওয়াজ পাচ্ছি না। বৃষ্টি কি থামল? ভদ্রলোক মনে হয় আমার মনের কথা বুঝতে পারলেন। বললেন, ‘বৃষ্টি ধরে এসেছে। চিন্তা কোরো না, ঠিক সময় পৌঁছে যাবে। আমার গিন্নির বুঝলে আরও একটা মজার স্বভাব ছিল।’

ভদ্রলোক নিজের স্ত্রীর কথা বলতে ভালবাসছেন। আমার নাম কী? কী কাজ করি? দেশের ভবিষ্যৎ কেমন? রাজনীতি কতটা গোল্লায় গেছে? আবহাওয়ার পাগলামি কেন বেড়েছে? এই ধরনের কমন টপিক ছেড়ে শুধু স্ত্রীর কথা বলছেন। কেন? ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে বলে? তাই হবে। বয়স্ক মানুষরা পুরনো দিন, পুরনো সম্পর্ক নিয়ে কথা বলতে ভালবাসে। আমার মজা লাগছে। আবার একটু খারাপও লাগছে। যতই হোক স্ত্রীর সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে।

‘কী স্বভাব?’ আমি কৌতূহল দেখালাম।

‘বিয়ের প্রথম দিকে আমার ওপর রাগ হলে সে কোনও যুক্তির ধার ধারত না। একেবারে স্টপ্ টকিং। তিন দিন কথা বন্ধ। তখন কোনও সাধাসাধি গায়ে মাখবে না। আমি পড়তাম জটিল সমস্যায়। সারাক্ষণ জামা পাচ্ছি না, ব্যাগ দাও, চশমা কোথায়? খিদে পেয়েছে— দেয়ালের সঙ্গে কথা বলতে হত।’

কথা শেষ করে নিঃশব্দে দুলে দুলে হাসতে লাগলেন ভদ্রলোক। নিমেষের জন্য আমার শরীরটা যেন অবশ হয়ে গেল। ভদ্রলোক বলছেন কী! রাগ করলে স্ত্রী কথা বলত না। তাও আবার ঠিক তিন দিন। এ তো একেবারে বসানো পর্ণা! মশলা ভালবাসে, স্বামীর জন্য বারান্দায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে, রাগ করলে কথা বন্ধ করে দেয়। নড়েচড়ে বসে নিজেকে দ্রুত বোঝানোর চেষ্টা করলাম— দু’জন বিবাহিতা মহিলার আচরণ তো একই রকম হতেই পারে। এতে অবাক হচ্ছি কেন! রাগ-অনুরাগ দেখানোর ব্যাপারগুলো কাছাকাছি হলে অসুবিধা কোথায়? নিজেকে সামলে আমি আবার সহজ হতে চেষ্টা করলাম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ভদ্রলোক একটু ঝুঁকে পড়ে, চশমার ওপর দিয়ে আমার দিকে তাকালেন। মিটিমিটি হেসে বললেন, ‘বুঝলে ভায়া, সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করার অনেক হ্যাপা। তারা যেমন জেদি হয়, ঝামেলাও করে বিস্তর। হুট বলতে চোখে জল এনে ফেলে। আমার স্ত্রীটি আবার ছিলেন বেশি রকমের সুন্দরী, বড় আর টানা টানা চোখ। কোমর পর্যন্ত লম্বা চুল। গোড়ার দিকে রান্নাবান্নায় ছিল অষ্টরম্ভা। রোজই মন দিয়ে শুধু আলুরদম বানাত। গাদাখানেক ঝাল। আমি সেই ঝাল আলুরদম খেয়ে উস্ আস্ করতে করতে ন’টা বারোর গাড়ি ধরতে ছুটতাম। বেশ লাগত ভায়া।’

ছেলেমানুষের মতো হাসতে শুরু করল মানুষটা।

আমিও হাসতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু পারলাম না। আমার শরীর মনে হচ্ছে কাঁপছে। বেশি নয়, খুব সামান্য। কিন্তু কাঁপছে। পর্ণাও রান্না পারে না। এই কারণে রান্নার একজন লোক রাখা হয়েছে। মাঝেমধ্যে সে শখ করে দু'-একটা আইটেম রাঁধে ঠিকই, কিন্তু সেগুলোতে অতিরিক্ত ঝাল দিয়ে ফেলে। দারুণ, দুর্দান্ত, ফ্যানটাস্টিক বলে সেই রান্না আমি খাই। আমার যে খুব খারাপ লাগে এমন নয়। বরং মনে হয়, যত্ন করে বেচারি আমার জন্য রেঁধেছে তো। এই ভদ্রলোকের ঘটনা দেখছি এক! পর্ণার সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর এত মিল!

না, আর আমার ভাল লাগছে না। আমার ভালবাসার মানুষের সঙ্গে আর একজনের এত খুঁটিনাটি মিল থাকবে কেন? এটা খুবই অস্বস্তিকর। মনে হচ্ছে পর্ণাই যেন ওঁর স্ত্রী। ভদ্রলোকের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর পরিণতিটাও তো ভাল নয়। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। না, আমি আর এইসব গল্প শুনতে চাই না। কে জানে, এরপর হয়তো ভদ্রলোক বলবেন, তাঁর স্ত্রীর নামও পর্ণা। বাপ রে!

ভদ্রলোককে এবার কেমন জানি লাগছে। এইটুকু আলাপে হড়বড় করে এত স্ত্রীর গল্প শোনানোর কী আছে? একবার বলেছেন, ব্যস। সহজ সরল হওয়া ভাল, বেশি হওয়া ভাল নয়। আমি বাজি ফেলে বলতে পারি, এই ভদ্রলোকের সহকর্মী, পরিচিতরা আড়ালে হাসিঠাট্টা করে। সামনেও করতে পারে। সেই কারণে হয়তো যাকে পায় তাকে ধরেই বউয়ের গল্প শোনায়।

আমি কথা ঘোরানোর জন্য বললাম, 'আমার এক মামা একবার বিপদে পড়েছিলেন। বৃষ্টির মধ্যে ট্রেনে আটকে ছিলেন সারারাত। বিচ্ছিরি কাণ্ড। তবে এখানে নয়, মুম্বইতে।'

ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে আমার দিকে মুহূর্তখানেক তাকিয়ে রইলেন। কিছু একটা ভাবলেন। অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'এখানেও হতে পারে। বিপদ কখন হয়, তার কি কোনও ঠিক আছে? কোনও ঠিক নেই। বিপদে পড়লে ট্রেনে যেমন আটকে থাকতে হয়, তেমন দরকার হলে ট্রেন থেকে আগেভাগে নেমেও পড়তে হয়।'

কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। বললাম, 'মানে!'

ভদ্রলোক একই রকম মুচকি হেসে বললেন, 'কিছু নয়।'

একটা কিছু হেঁয়ালি রয়েছে। গল্পের মতো। নিশ্চয় এই এখানেও তাঁর স্ত্রী থাকবেন। আমি কিছুতেই শুনব না। বললাম, 'আপনি কতদূর যাবেন? হাওড়া?'

ভদ্রলোক চোখ থেকে চশমা খুলে পাঞ্জাবির খুঁটে মুছতে মুছতে বললেন, 'সেরকমই তো ইচ্ছে।'

এবার আমি একটু ঘাবড়ে গেলাম। ইচ্ছে মানে। এটাও কি হেঁয়ালি? নাকি ঠাট্টা? মানুষটা সম্পর্কে আমার ধারণা একটু একটু করে বদলাচ্ছে। গোড়াতে যেমন লাগছিল, এখন মনে হচ্ছে খানিকটা অস্বাভাবিক। আমি গলায় সামান্য কঠিনভাব এনে বললাম, 'আপনার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

বেশ কিছুক্ষণ আগেই ভদ্রলোক সিটের ওপর দুটো পা তুলে বাবু হয়ে বসেছেন। মিটিমিটি হেসে বললেন, 'ওই যে বললাম না? বিপদে পড়লে যেমন তোমার মামার মতো আটকে থাকতে হয়, আবার দরকারে আগে নেমেও যেতে হয়।'

'আপনি কি গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ার কথা বলছেন? অ্যাক্সিডেন্ট?' আমি বিরক্ত গলায় বললাম।

'না, তা নয়।'

'তবে?' আমি ভুরু কোঁচকালাম।

ভদ্রলোক কিছু একটা বলতে গিয়ে চুপ করে গেলেন। ট্রেন আবার দাঁড়াল। ভদ্রলোক ঘড়ি দেখলেন। মনে হয় স্টেশনের হিসেব কষলেন। কামরার ওদিক থেকে উঠে দু'জন নেমে গেল। এর আগের স্টেশনেও কয়েকজন নেমেছে। কামরায় আর কি কেউ আছে? নাকি শুধু আমরা দু'জন? না থাক। আর চিন্তা নেই। এসেই তো গেলাম। বাইরের ঝড়-জলও থেমে গেছে। খোলা দুটো দরজা দিয়ে শুধু ঠান্ডা হাওয়া আসছে।

ট্রেন ছেড়ে দিতে চুপ করে রইলাম। এবার ভদ্রলোকের সামনে থেকে উঠে গেলে কেমন হয়? বৃষ্টির ব্যাপার নেই। বাকি পথটুকু ওদিকে হাত পা ছড়িয়ে বসে থাকি। তবে ওঠবার জন্য একটা ছুতো বের করা দরকার। বললাম, 'চা পেলে হত।'

'পেলে হত, কিন্তু এই বৃষ্টি-বাদলায় কে চা বেচবে? তা ছাড়া রাতও হয়েছে। বরং বাড়ি ফিরে বউকে বলবে আদা-চা করে দিতে। দু'জনে চা খেতে খেতে গল্প করবে।'

বিরক্তি অস্বস্তির মাঝখানেও মজা লাগল। বয়স হয়ে গেলে কী হবে, মানুষটার রসবোধ আছে। একটু মমতাও হল। আমি হেসে বললাম, 'এত রাতে গল্প!'

ভদ্রলোক চশমার ভেতরে চোখ নাচিয়ে বললেন, 'তা নয় তো কী? বিয়ের প্রথমদিকের ক'বছর প্রতি রাতে স্ত্রীকে গল্প শোনাতে হত। একেবারে মাস্ট ছিল। নইলে...।'

ভদ্রলোক আওয়াজ করে হেসে উঠলেন। অপ্রকৃতিস্থের হাসি। আমার শরীর ঝনঝন করছে। গল্প শোনাতে হত। আমি কি ঠিক শুনছি? মনে হচ্ছে না ঠিক শুনছি। এ তো একেবারে পর্ণার ঘটনা! নিজের অজান্তেই বিড়বিড় করে বলে ফেললাম, 'নইলে কী?'

ভদ্রলোক সিট থেকে পা নামালেন। নীচে রাখা জুতো পায়ে গলিয়ে নিচু হয়ে বেল্ট বাঁধলেন। ধুতির কোঁচা ঠিক করতে করতে বললেন, 'নইলে কী হত তুমি বুঝতে পারছ না? তোমার বয়েসেই তো আমার বিয়ে হয়েছিল বাপু।'

ভদ্রলোক পাশে পড়ে থাকা কাঁধের ব্যাগ তুলে ধুলো ঝাড়লেন। পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ, কপাল, ঘাড় মুছলেন। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে গলা নামিয়ে বললেন, 'বুঝলে হে ভায়া, গিন্নিটি আমার বড় জ্বালাতন করত। ছুটিছাটার দিনে দুপুরে আদর সোহাগ করতে গেলে ঠেলা মেরে সরিয়ে দিত। দিনের আলোয় তার নাকি লজ্জা করে! বোঝো কাণ্ড। বিয়ের বছর দুই কেটে গেছে, তার পরেও স্বামীর কাছে লজ্জা! তবে তোমাকে চুপিচুপি বলছি, ওই লজ্জাটুকু আমার কিন্তু মন্দ লাগত না। বেশ লাগত।'

ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন।

আমার মনে হচ্ছে, আমি আর রক্ত-মাংসের মানুষ নেই। আমি একটা পাথরের স্ট্যাচু হয়ে গেছি। হাত পা কিছুই নাড়াতে পারছি না। এমনকী চোখের পাতাও নয়।

ভদ্রলোক কাঁধে ব্যাগটা তুললেন। দু'হাতে চশমাটা ঠিক করতে করতে ফিসফিস করে বললেন, 'একদিন কী হল জানো?'

আমার ইচ্ছে করল ট্রেনের আওয়াজ ছাপিয়ে চিৎকার করে বলি, 'আমি জানতে চাই না। আপনি চুপ করুন। প্লিজ চুপ করুন আপনি।'

গলা দিয়ে স্বর বেরোল না। আতঙ্কে কণ্ঠনালিও কি পাথর হয়ে গেল!

'একদিন হঠাৎ দুম করে দু'পিরিয়ডের পর স্কুল ছুটি হল। নেতা না কে মারা গেছে। অন্যদিন হলে আড্ডা দিয়ে সময় কাটাতাম। সেদিন কেন জানি আমার মনে হল, বাড়ি গিয়ে বউকে চমকে দিলে কেমন হয়? সে সময় তো এখনকার মতো মোবাইল-টোবাইলের ব্যাপার ছিল না। আগেভাগে খবর দেওয়ার উপায় ছিল না। দিতে চাইওনি। আমি রিকশ নিয়ে ছুটলাম স্টেশন। কপালও ভাল ছিল। ট্রেনও পেয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে। সাঁইসাঁই করে পৌঁছে গেলাম বাড়ি। বাড়ি বলতে ভাড়া বাড়ির একতলা। বাড়িওলা থাকে বাইরে। দরজার সামনে গিয়ে দেখি তালা ঝুলছে। আমি একটু অবাকই হলাম। মনে আছে সময়টা ছিল বৃষ্টি বাদলার। বড় বৃষ্টি নয়। ঘ্যানঘ্যানে বৃষ্টি। আমার উনি আবার বৃষ্টি সহ্য করতে পারেন না। জল-কাদায় নাক সিঁটকোয়। তার পছন্দের হল কড়া রোদ। তা হলে বৃষ্টির মধ্যে গেল কই? কারও বাড়ি? দোকান বাজারে যায়নি তো? কে জানে রান্না করতে গিয়ে হয়তো কাঁচা লঙ্কা কম পড়েছে।

ভদ্রলোক মুহূর্তখানেকের জন্য চুপ করলেন। কবজি উলটে ঘড়ি দেখলেন। আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ঢোঁক গেলা দরকার! পারছি না। আমি কি ঢোঁক গিলতে ভুলে গেছি? পর্ণার মতো ওই মহিলাও বৃষ্টি পছন্দ করেন না! এটাও কি কাকতালীয়?

ভদ্রলোক রুমাল দিয়ে ফের নিজের কপাল মুছলেন। একটু যেন উত্তেজিত। নিশ্বাস ফেলছেন ঘনঘন। ফ্যাকাশে ধরনের হাসলেন।

'মিনিট পাঁচ-সাতেক ছাতা মাথায় অপেক্ষা করার পর বাড়ির পিছন দিকটায় গেলাম। ওদিকেও একটা দরজা আছে। বাগানের দিকের দরজা। আমার স্ত্রী কোনও কোনও সময় সেই দরজা আটকাতে ভুলে যায়। এমনও হয়েছে, রাতে বাড়ি ফিরে দেখেছি, খিল, ছিটকিনি কিছুই পড়েনি। বললে দু'দিন মনে রাখে, ফের ভুলে যায়। আজ ভুলে যায়নি তো? সেটা দেখতেই পিছনে গেলাম। মনে মনে ঠিক করলাম, দরজা খোলা দেখলে জোর বকুনি দেব। তাতে রাগ করলে করবে। আসলে বকুনির থেকে খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে পড়ার একটা সুযোগ নিতে চেয়েছিলাম।'

এতক্ষণ পরে আমি কথা বলতে পারলাম। বিড়বিড় করে উঠলাম, 'কী দেখলেন? খোলা?'

ভদ্রলোক সোজা হয়ে বসলেন। ঠোঁটের ফাঁকে হেসে বললেন, 'না বন্ধ! তবে পাশের জানলাটা সামান্য খোলা। ওটা আমাদের শোওয়ার ঘর। জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে ঘরের ভেতর থেকে ফিসফিসানি ভেসে এল।'

'ফিসফিসানি!'

'হ্যাঁ ফিসফিসানি। একজনের নয়, দু'জনে ফিসফিস করে কথা বলছে। মহিলার গলা চিনতে পারলাম। আমার বউ। পুরুষমানুষটি অচেনা। আমি খানিকটা অবাকই হলাম। ওর কোনও আত্মীয় এসেছে? তাই হবে। ডাকতে গিয়ে থমকে যাই, সামনের দরজায় তা হলে তালা কেন! যা করা উচিত নয়, আমি তাই করলাম।'

'কী?' প্রশ্নটা করলাম বটে, তবে মুখ দিয়ে বের হল কিনা বুঝতে পারলাম না।

'জানলায় কান পাতলাম। স্পষ্ট শুনলাম, অচেনা পুরুষটি বলছে, চলো, এখনই আমার সঙ্গে পালিয়ে চলো... আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না... তোমার বিয়ের পর একটা রাতও আমি ভাল করে ঘুমোতে পারি না। আমার বউ আদুরে গলায় বলল, ছিঃ সোনা অমন করে না। যা হওয়ার হয়ে গেছে। তুমি আর ক'টাদিন অপেক্ষা করো। মানুষটা যে খারাপ নয় গো, ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য একটা গোলমাল-টোলমাল তো লাগবে...। আমি পা টিপে সরে আসি।'

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। ট্রেন ছুটছে। শেষ মুহূর্তে এসে যেন স্পিড বাড়িয়েছে।

ভদ্রলোক বড় করে হাসলেন, 'এবার বুঝতে পারলে তো কেন এত বউ বউ করি? তবে ঘটনা সবাইকে বলি না। সবাইকে নিজের ঘরের কেচ্ছা কেলেঙ্কারি বলা যায় না। এ আর নতুন কী? কতই তো ঘটে। বিয়ের পর পুরনো প্রেমিকের সঙ্গে দেখা হওয়া তো জল-ভাত। সংসার ছেড়ে চলে যাওয়াও আশ্চর্যের কিছু নয়। তবু বলি। বয়স হয়ে যাচ্ছে বলেই হয়তো... তোমার মতো কাউকে মনে ধরে গেলে বলে ফেলি। লাস্ট ট্রেনে অবশ্য সব সময় মনের মতো লোক পাওয়া মুশকিল। সেটা একটা সমস্যা।'

আমি দরদর করে ঘামছি। কিন্তু হাত তুলে সেই ঘাম মোছার মতো অবস্থা আমার নেই। অস্ফুটে বললাম, 'আপনি কি সবসময় লাস্ট ট্রেনেই যাতায়াত করেন।'

ভদ্রলোক অল্প হেসে বললেন, 'উপায় কী বলো? সেই ঘটনার কিছুদিন পর স্ত্রী ছেড়ে চলে গেল। আমি কোনও গোলমাল করিনি, কোনও সুযোগ দিইনি, তবু চলে গেল। অনেক বারণ করেছিলাম। লাভ হয়নি। ভেবেছিলাম, ভুলে যাব। ভাবতে ভাবতে বেশ কটা বছর কাটিয়ে ফেললাম। ভুলতে পারলাম না। এমনি বউ হলে পারতাম। জ্বালাতনের বউ বলেই পারলাম না। যাবার সময়ও আমাকে জ্বালিয়ে গেছে। বলে যায়নি কেন যাচ্ছে। আমার দোষ বলে যায়নি। যত দিন যেতে লাগল সে যেন ঘাড়ের ওপর চেপে বসল। স্কুলের চাকরিটা দিলাম একদিন ফট করে ছেড়ে। সারাদিন সদর দরজায় তালা দিয়ে পিছন দিয়ে ঢুকে ঘরে বসে থাকতাম। বসে থাকতাম স্কুল থেকে ফেরার পোশাকে। ধুতি, পাঞ্জাবি, কাঁধে ব্যাগ, পকেটে পেন। বুঝতে পারলাম, এই অবস্থা বেশিদিন চলতে দেওয়া উচিত নয়। চলতে দিলে আমি পাগল হয়ে যাব। পাড়ায় ছেলেপিলেরা আমাকে দেখে ঢিল ছুড়বে, ধুতির কোঁচা খুলে দেবে। বলবে বউ-পাগলা...। তাই একদিন ভেবেচিন্তে লাস্ট ট্রেন থেকে দিলাম ঝাঁপ। সুইসাইড করার জন্য ঝড়-বৃষ্টির দিনের লাস্ট ট্রেন ভারী চমৎকার। লোকজন কম থাকে। তোমাকে বললাম না, দরকার হলে আগেও ট্রেন থেকে নেমে যেতে হয়? ইচ্ছে থাকলেও পুরো যাওয়া যায় না। আজ আসি ভাই কেমন?'

ভদ্রলোক চলন্ত ট্রেনের খোলা দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। আমার উচিত উঠে গিয়ে ওঁকে জাপটে ধরা। আমি পারছি না। কিছুতেই পারছি না। আমাকে কি কেউ সিটের সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে? নাকি আমি চাইছি, ভদ্রলোক ঝাঁপ মারুন? আমি চোখ বুজলাম।

ট্রেন থেকে নেমে প্রথমেই চোখ গেল আকাশে। ঝলমলে আকাশ। তারা ফুটেছে। হাত দিলাম জামার পকেটে। না, মশলার কৌটোটা নেই।

সাপ্তাহিক বর্তমান, ১৪ নভেম্বর ২০০৯

শ্রাবণের হানিমুন

চমকে উঠল শ্রীময়ী। ওই লোকটা না? হ্যাঁ, তাই তো, ওই লোকটাই! অন্ধকারে মনে হচ্ছে, মানুষ নয় মানুষের ছায়া বসে আছে! ছায়াটা সামান্য নড়ছে।

রাতের সমুদ্র দেখায় আলাদা মজা। আজ বেশি মজা লাগছে। কারণ আজ সন্ধে থেকে অঝোরে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। শ্রীময়ী মুগ্ধ। তার মাথা নীলাদ্রির বাঁ কাঁধের ওপর। ঘরের ঝলমলে আলো নিভিয়ে নরম আলো জ্বালানো হয়েছে। আলোর শেডটা দেখতে ঝিনুকের মতো। মনে হচ্ছে ভেতরের মুক্তো থেকে আলো আসছে! খুব সুন্দর।

সোফার ঠিক সামনেই কাচের বিরাট জানলা। জানলার মুখোমুখি কিছুক্ষণ বসে থাকলে মনে হয়, ঘর নয়, এটাও সমুদ্র। শ্রীময়ীর মনে হচ্ছে, চারতলার এই হানিমুন স্যুইট থেকে অন্ধকার সমুদ্রে বৃষ্টি দেখা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা। ভাগ্যিস তার বিয়ে শ্রাবণ মাসে হয়েছে। নইলে এই অভিজ্ঞতা থেকে সে নিশ্চয় বঞ্চিত হত। চমৎকার এই হানিমুন স্যুইট পাওয়াটাও একটা ভাগ্যের ব্যাপার। এই হোটেলে মাত্র দুটো এরকম স্যুইট আছে। চারতলার ওপর, হোটেলের ভিড় হট্টগোল থেকে দূরে। ইন্টারকমে না ডাকলে বেয়ারারাও কখনও ওপরে ওঠে না। নীলাদ্রি কলকাতা থেকে ঘর বুক করে এসেছে। হানিমুনের দু'দিন কেটেছে মোটে। শ্রীময়ী সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তার যদি মেয়ে হয়, মেয়ের বিয়ে সে শ্রাবণ মাসেই দেবে। মেয়ে যদি আপত্তি করে শুনবে না। বলবে একটা বিশেষ কারণে তার বিয়ে শ্রাবণে ঠিক করা হয়েছে।

'কী কারণ মা?'

'কারণ বলা যাবে না। পরে নিজেই জানতে পারবে।'

সত্যি জানতে পারবে। মেয়েও তার মতো হানিমুনের সময় সমুদ্রে বৃষ্টি দেখতে পাবে।

নীলাদ্রি স্ত্রীর থুতনি ধরে নিজের দিকে ফেরাতে চায়। শ্রীময়ী মুখ ঘোরায় এবং তখনই পাশের বারান্দায় চোখ পড়ে।

চমকে উঠল শ্রীময়ী! দ্রুত নীলাদ্রির কাঁধ থেকে মাথা তুলে ফিসফিস করে বলল, 'অ্যাই দেখো, দেখো, ওই যে লোকটা।'

নীলাদ্রি শ্রীময়ীর মুখের কাছে ঠোঁট নামিয়ে বলল, 'কোন লোকটা সোনা? উঁ উঁ, এখানে কোনও লোক নেই। এখানে শুধু তুমি আর আমি। আমি আর তুমি। উঁ উঁ...।'

শ্রীময়ী সোজা হয়ে বসেছে। হাত দিয়ে নীলাদ্রির মুখ সরিয়ে চাপা গলায় বলল, 'আঃ, দেখো না, ওই তো লোকটা। বারান্দায় বসে আছে।'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও নীলাদ্রি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। সত্যি লোকটা বারান্দায় বসে আছে। বসে বসে ভিজছে বৃষ্টিতে।

শুধু স্যুইট নয়, হানিমুন স্যুইটের লাগোয়া বারান্দাগুলোও দারুণ। এক টুকরো ছাদের মতো। চারপাশ খোলা, মাথাও খোলা। সবসময় মাথার ওপর আকাশ আর সামনে সমুদ্র। ফাঁকা বারান্দায় লোকটা বসে আছে চেয়ারে। অন্ধকার আর বৃষ্টিতে খানিকটা অস্পষ্ট, খানিকটা আবছা। সামান্য ঝুঁকে আছে সামনের দিকে। যেন উলটো দিকে বসে থাকা কারও সঙ্গে কথা বলছে! কার সঙ্গে কথা বলছে? নীলাদ্রি ভাল করে দেখল। কই আর কেউ নেই তো!

লোকটা যে একটু কুঁজো আগেই খেয়াল করেছে নীলাদ্রি। আজ বিকেলে যখন শ্রীময়ী আর ও সি-বিচে যাচ্ছিল তখন হোটেলের লাউঞ্জে দেখেছে। ঝুঁকে হাঁটছিল। শ্রীময়ী নীলাদ্রির কনুইতে চিমটি কেটে বলল, 'দেখো দেখো, ওই লোকটার কথাই বলছিল।'

নীলাদ্রি অবাক হয়ে বলল, 'কে বলছিল?'

শ্রীময়ী বলল, 'হোটেলের ঘর পরিষ্কার করতে যে ছেলেটা আসে সে... তুমি তখন সিগারেট আনতে নীচে গিয়েছিলে। অ্যাই জানো, লোকটা না খুব অদ্ভুত। ঘটনা শুনলে অবাক হয়ে যাবে।' শ্রীময়ীর গলায় গল্প বলার উৎসাহ।

নীলাদ্রি হাত নেড়ে বলল, 'সরি শ্রীময়ী, হানিমুনে এসে অন্য পুরুষমানুষের ঘটনা শুনে অবাক হতে পারব না। প্লিজ স্টপ করো।'

শ্রীময়ী 'স্টপ' হল না। অন্যমনস্ক গলায় বলল, 'প্রতি বছরই লোকটা এখানে আসবে একবার করে, এই হোটেলে উঠবে। টানা বারো-তেরো বছর নাকি একই কাণ্ড করছে! ভাবতে পারো? টুয়েলভ ইয়ার্স!'

নীলাদ্রি বিরক্ত হয়ে বলল, 'ওঃ শ্রীময়ী, বাড়াবাড়ি কোরো না। জায়গা ভাল লেগেছে, হোটেল ভাল লেগেছে তাই আসে। এতে অদ্ভুতের কী দেখলে? অনেকেরই এই ব্যাড হ্যাবিট আছে। এক জায়গায় একশোবার ঘুরবে। আমার বড়মামা মনে হয় আড়াইশোবার দেওঘর গেছেন। এক হলিডে হোমে উঠেছেন। হলিডে হোম ভেঙেচুরে গেছে তাও ওঠা চাই। বুড়োটে মার্কা চিন্তা।' এরপর গলা নরম করে নীলাদ্রি। বলে, 'আজ কিন্তু বেশিক্ষণ বাইরে থাকব না। তাড়াতাড়ি হোটেল ফিরতে হবে। আমার অন্য প্ল্যান আছে।'

'কী প্ল্যান?'

'ম্যারাথন আদরের প্ল্যান। গিনেস বুকে আদর সংক্রান্ত যত রেকর্ড আছে সব আজ ভেঙে ফেলব ঠিক করেছি। হা হা।'

নীলাদ্রি গলা খুলে হাসলেও শ্রীময়ী হাসল না। চুপ করে বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল। নীলাদ্রি আড়চোখে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে বলল, 'কী হল? কী ভাবছ?'

শ্রীময়ী প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বলল, 'অদ্ভুত লোকটা প্রতিবারই চারতলার ওই হানিমুন স্যুইটটা-ই নেয়। আমরা যেখানে আছি তার পাশেরটায়। নিউলি ম্যারেড কাপল ছাড়া ওই ঘর কাউকে ভাড়া দেওয়ার কথা নয়। একমাত্র ওর বেলাতেই ছাড় আছে। ওকে একলা ঘর দেওয়া হয়। বেয়ারা ছেলেটা বলছিল, ওই লোক প্রথমবার এখানে এসেছিল হানিমুন করতে। বউকে নিয়ে ওই ঘরে উঠেছিল। সারারাত বারান্দায় বসে গুটুর গুটুর করে গল্প করত। মেয়েটি বছরখানেকের মাথায় মারা যায়। মনে হয় বাচ্চা টাচ্চা হতে গিয়ে কোনও গোলমাল হয়েছিল। অন্যকিছুও হতে পারে। তারপর থেকে লোকটা প্রতিবছর নিয়ম করে

একা একা আসে। আসে নিজের সেই হানিমুনের তারিখ মিলিয়ে। দিন তিন-চার থাকে। তারপর চলে যায়। বেশিরভাগ সময় ঘরেই থাকে। বেরোয় না।'

নীলাদ্রির বিরক্তি বাড়ল। দাঁতে দাঁত চেপে বলল, 'কী করে? মরা বউয়ের ধ্যান করে?'

শ্রীময়ী এই ঠাট্টায় বিরক্ত হল। ভুরু কুঁচকে বলল, 'যা ওরকম করে বোলো না। লোকটা স্ত্রীকে নিশ্চয় খুব ভালবাসত। হয়তো ভালবাসার বিয়ে। হানিমুনের দিনগুলো এখানে এসে তাকে মনে করে। শুনতেও ভাল লাগে। তোমার লাগছে না?'

'না, লাগছে না। যত সব পচা সেন্টিমেন্ট।'

শ্রীময়ী স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অ্যাই, আমি যদি পট করে মরে যাই তুমি এরকমভাবে আসবে?'

নীলাদ্রি আর পারল না। রেগে গেল। নিজের হানিমুনে অন্য মানুষের ভালবাসার কথা শুনলে রাগ হওয়ারই কথা। তারওপর মরা টরার কথা এই সময় মানায় না। সে রাগ হওয়া গলায় বলল, 'বাজে কথা বোলো না শ্রীময়ী। এই গল্প সব ট্যুরিস্ট স্পটেই চালু আছে। হোটেলওলারাই প্ল্যান করে ছড়ায়। যখন যেমন সুবিধে। হানিমুন কাপল পেয়েছে তাই হানিমুনের গল্প ছড়াচ্ছে। এমনভাবে বলছে যেন এই হোটেলের প্রেম একেবারে বিরাট প্রেম। একেবারে জীবন মরণের সীমানা ছাড়িয়ে চলে যায়। আহা! শুনে তুমিও দেখছি গলে গেছ।'

স্বামীর ঠাট্টা-যুক্তি কোনওটাই শ্রীময়ীর পছন্দ হল না। বলল, 'লোকটা যে বছর বছর আসে সেটা তো সত্যি।'

নীলাদ্রি ঝাঁঝিয়ে বলল, 'সত্যি কি না তুমি জানলে কী করে? হোটেলের রেজিস্ট্রার দেখেছ? বারো বছরের খাতা? আর যদি আসে তা হলে বলব হয় পাগল, নয় অন্য ধান্দা আছে। যত্তসব বাড়াবাড়ি।'

'অন্য কী ধান্দা?'

'আমি জানি না। তুমি পারলে ওই প্রেমিক পুরুষকে জিজ্ঞেস করে নিয়ো।'

শ্রীময়ী একটু চুপ করে থেকে ভুরু কুঁচকে বলল, 'তুমি রাগ করছ কেন? একটা লোক তার বউকে বাড়াবাড়ি ধরনের ভালবাসে শুনলে রাগ করার কী আছে?'

নীলাদ্রি ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলে, 'জ্যান্ত বউ নয়, মরা বউকে ভালবাসে। যত্তসব ফালতু। চলো এবার ফিরে যাি।'

কথা শেষ করে নীলাদ্রি স্ত্রীর হাত ধরল। শ্রীময়ী হাত সরিয়ে নিল। তার হাতের চুড়িগুলো বেজে উঠল রিনরিন করে। আজ সে ড্রেসের সঙ্গে রং মিলিয়ে হাত ভরতি চুড়ি পরেছে। সমুদ্রের দিকে মুখ ঘুরিয়ে শ্রীময়ী বলল, 'না, এখন যাব না। অন্ধকার নামুক।'

ওরা যখন ফিরল তখন অন্ধকারের সঙ্গে অল্প অল্প বৃষ্টি নেমেছে। সেই বৃষ্টি ক্রমশ বাড়ছে। নীলাদ্রির অস্বস্তি হচ্ছে। এই ভর সন্ধেতে একটা মাঝবয়সি মানুষ একা একা বারান্দায় বসে ভিজছে দেখলে অস্বস্তি হওয়ারই কথা। শুধু ভিজছে না, ফাঁকা বারান্দায় হাত নেড়ে নেড়ে গল্পও করছে! কার সঙ্গে গল্প করছে? মরা বউয়ের সঙ্গে? কথাটা ভেবে বুকটা একটু যেন ছ্যাঁৎ করে উঠল। নিজেকে সামলাতে শ্রীময়ীর মুখটা দু'হাতে ধরল সে। গালে ঠোঁট ছোঁয়াল হালকাভাবে। শ্রীময়ী ফিসফিস করে বলল, 'জানলার পরদা টেনে দাও।'

নীলাদ্রি কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'পাগলটা দেখতে পাবে না। বারান্দা থেকে ঘরের ভেতর দেখা যায় না।'

শ্রীময়ী একটু সরে গিয়ে বলল, 'তাও টেনে দাও। আমার কেমন যেন লাগছে।'

উঠে গিয়ে পরদা টানল নীলাদ্রি। টানার সময় উঁকি মেরে দেখল, লোকটা নেই, উঠে গেছে। বাঁচা গেল। তবে পাশের ঘরে একটা মাথা গোলমালের মানুষ থাকা ঠিক নয়। কালই ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। সোফায় ফিরে এসে স্ত্রীর জামার বোতাম খুলল। মুখ নামিয়ে দিল সেখানে। নামিয়ে বুঝতে পারল ঠিক জুত হচ্ছে না। শ্রীময়ী সাড়া দিচ্ছে না। এই সময়গুলোতে মেয়েটা সাধারণত আবেশে চুলের মুঠি চেপে ধরে। নীলাদ্রি মুখ তুলে চাপা গলায় বলল, 'কী হল?'

'একটা কথা মনে হচ্ছে সকাল থেকে।' অন্যমনস্ক গলায় বলল শ্রীময়ী।

'কী?' ভুরু কোঁচকাল নীলাদ্রি।

'বউ-পাগল লোকটা তো আসে, কিন্তু ওর মরা বউও আসে?' ফিসফিস করে বলল শ্রীময়ী।

'উফ তুমি দেখছি, মাথা থেকে ফালতু জিনিসটা ফেলবে না।'

'ধরো আমি মরে গেলে, তুমি এখানে প্রতি বছর আসবে, কিন্তু আমি কি আসব?'

'উফ থামবে তুমি? পাগলামি বন্ধ করবে? না, দেখছি কালই হোটেল বদলাতে হবে। নইলে তোমার মাথা থেকে এসব যাবে না।'

শ্রীময়ী নিচু গলায় বলল, 'তাই ভাল কালই হোটেলটা বদলে নাও।'

নীলাদ্রি স্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'নাও এদিকে সরে এসো তো।'

শ্রীময়ী জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে চাপা গলায় বলল, 'এখন নয়, রাতে।'

নীলাদ্রি বুঝল, কোথাও একটা সুর কেটেছে। জোর করে লাভ নেই। শ্রীময়ীর মন সহজ করতে সে ইন্টারকম তুলে ডিনারে খিচুড়ি আর পমফ্রেট ভাজার অর্ডার দিল।

বেশি রাতে ঘুম ভাঙল শ্রীময়ীর। বৃষ্টি বেড়েছে। সমুদ্র গর্জনের সঙ্গে ভেসে আসছে সেই শব্দ। বড় সুন্দর। যেন যুগলবন্দি। জানলার পরদা ভেদ করে বিদ্যুৎ চমকের আলো ঢুকছে অন্ধকার ঘরে। শরীরভরা তৃপ্তি নিয়ে শ্রীময়ী ঘুমন্ত নীলাদ্রিকে জড়িয়ে ধরল। আর ঠিক তখনই পাশের বারান্দা থেকে ভেসে আসা আওয়াজটা শুনতে পেল সে।

হালকা রিনরিন ধরনের আওয়াজ। মেয়েদের হাতের চুড়ির আওয়াজ! নগ্ন শরীরে ধড়ফড় করে উঠে বসল শ্রীময়ী। কার চুড়ির আওয়াজ! নিজের হাত ভরতি চুড়ির দিকে তাকাল অন্ধকারেই।

বৃষ্টি আর সমুদ্রের আওয়াজ ভেদ করে পাশের বারান্দা থেকে ভেসে আসে মেয়ের গলার ফিসফিসানি। শ্রীময়ীর বুঝতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগল। এ গলা তার চেনা।

নিজের গলা চিনতে মানুষের একটু সময় তো লাগবেই।

আনন্দবাজার পত্রিকা, উৎসব ক্রোড়পত্র, ৩১ জুলাই ২০১০

দাঁত

প্রথম কামড়েই খচ করে লাগল।

নিখিল সাঁতরা থমকে গেলেন। খাওয়া বন্ধ করে ভুরু কোঁচকালেন। লাগল কেন? মন ভাল নেই নিখিল সাঁতরার। থাকার কথাও নয়। খানিক আগে ইউনিয়ন অফিসে যে ঘটনা ঘটেছে তারপর মন ভাল থাকতে পারে না। ভাগ্যিস মান-অপমান বোঝার কলকবজাগুলো অকেজো হয়ে এসেছে, নইলে বেশি খারাপ লাগত। কান্টিনে আসবার সময় নিখিল সাঁতরা ভেবেছিলেন, আজ টিফিন খাবেন না। এক কাপ চা খেয়েই পেট ভরাবেন। তবু টিফিন বক্স খুলে ফেললেন খানিকটা অভ্যেস আর খানিকটা ভয়ে। আজকাল অনেকক্ষণ পেট খালি রাখলে কেমন জ্বালা জ্বালা করে। কে জানে আলসার-টালসার কিছু হচ্ছে কিনা। হলে বিরাট ঝামেলা। কষ্ট তো আছেই, বড় কথা চিকিৎসার বিরাট ধাক্কা। অপমানের দাম কানাকড়িও নয়। চিকিৎসার খরচ অনেক।

নিখিল সাঁতরা অন্যমনস্কভাবেই টিফিন মুখে তুললেন। আর তখনই লাগল খচ করে।

লাগল কেন! আজকের টিফিনে মুখে লাগার মতো তো কিছু নেই। না মাছের কাঁটা, না মাংসের হাড়। বক্সে চাপাচুপি করে রয়েছে দুটো রুটি, খানিকটা আলুর দম, একদলা ছানা। আগে ছানার ব্যবস্থা ছিল না। কিছুদিন হল মন্দিরাদেবী ব্যবস্থা চালু করেছেন। কোথা থেকে যেন শিখে এসেছেন ব্লাডপ্রেশার, কোলেস্টেরল, সুগারের সঙ্গে লড়তে ছানা হল অব্যর্থ ওষুধ। যমে-মানুষে টানাটানির মতো ছানায়-অসুখেও টানাটানি চলে। সেই টানাটানিতে ছানার জয় সুনিশ্চিত। তথ্যের সত্যাসত্য নিয়ে নিখিল সাঁতরা মৃদু প্রশ্ন তুলেছিলেন।

'ছানা ভাল জিনিস, কিন্তু এতটা ভাল বলে তো জানতাম না মন্দিরা। একেবারে সব অসুখ সারিয়ে দেবে!'

মন্দিরাদেবী স্বামীর প্রশ্ন অবজ্ঞা করে বলেছিলেন, 'আগে জানতে না, এবার জানবে। অনেক কিছুই এবার জানবে। এখনও সঙ্গে রুটি-পরোটা দিচ্ছি, এরপর শুধু ছানাই দেব। অসুখ যেমন বাধিয়েছ টিফিনও তেমন পাবে।'

কথাটা নিয়ে তর্ক করা যেত। ব্লাডপ্রেশার, কোলেস্টেরল বা সুগার সর্দি কাশি নয় যে বৃষ্টিতে ভিজে নিজে বাধানো যাবে। তার ওপর ছানার এত ব্যাপক গুণ সত্যিই আছে কিনা তা নিয়েও সংশয় রয়েছে। কিন্তু নিখিল সাঁতরা তর্ক করেননি। ছানা তো অতি সামান্য বিষয়, অনেক বড় বড় বিষয় নিয়েও তিনি তর্ক করেন না। ঘরে-বাইরে কোথাওই নয়। তার মানে এই নয় যে তর্ক তাঁর পছন্দ নয়। খুবই পছন্দ। বহুদিনই মনে হয় ঝগড়াঝাঁটি, চিৎকার-চেঁচামেচি করে একটা বড়সড় গোলমাল পাকিয়ে দিতে পারলে বেশ হত। অফিসে

তো প্রায় রোজই ইচ্ছে করে। অন্যরা 'সাঁতরাদা প্লিজ, এটাও একটু করে দিন' বলে ঘাড়ে একটার পর একটা কাজ চাপিয়ে যখন সরে পড়ে তখন মনে হয়, খুব জোর একটা চিৎকার দিই— 'কেন হে? অফিসটা কি আমার বাপের? নাকি তোমাদের থেকে বেশি বেতন পাই?' ছোটখাটো ভুল নিয়ে ওপরওলারা চিবিয়ে চিবিয়ে অপমান করলে ইচ্ছে করে টেবিল চাপড়ে বলতে 'স্যার, এর থেকে ঢের বেশি ভুল করেও অনেকে এ অফিসে রেহাই পেয়ে যায়। কেন? আপনাদের তেল মারে বলে?' শুধু অফিসে নয়, সংসারেও মাঝেমধ্যে গলা ফাটিয়ে ঝগড়া করতে মন চায়। স্ত্রীর দাপট, মেয়ের অবজ্ঞা, ছেলের তাচ্ছিল্য দেখে কখনও-সখনও মনে মনে তিনি প্রস্তুতিও নেন। চোখমুখ লাল করে হাত-পা ছুড়ে বলবেন—

'আমাকে তোমরা পেয়েছটা কী? ভেবেছটা কী সবাই? কিছু বলি না বলে ...সকাল থেকে মাথার ঘাম ফেলছি অথচ মানুষ বলেই মনে করো না...।'

কিন্তু শেষ পর্যন্ত করা হয় না। শেষ পর্যন্ত কিছু করতে পারা খুবই কঠিন একটা জিনিস। দীর্ঘ জীবন পার করে এসে নিখিল সাঁতরা অনুভব করেছেন, মানুষ আসলে তিন প্রকারের। এক প্রকারের মানুষ সব কিছুতেই শেষ পর্যন্ত যেতে পারে। আরেক রকমের মানুষ যাওয়ার চেষ্টা করে এবং মাঝপথে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। আর তিন নম্বর ধরনের মানুষ শেষ পর্যন্ত যেতে পারব কি পারব না নিয়ে দোলাচলে পড়ে হাবুডুবু খায়। এই দোলাচল তার মধ্যে এক ধরনের বিশেষ স্বভাব তৈরি করে। এই স্বভাবকে বলা যেতে পারে শামুক স্বভাব। গুটিয়ে থাকা টাইপ। সম্ভবত তিনিও এরকমই গুটিয়ে থাকেন।

ব্লাড সুগারের কারণে ছানায় চিনি নেই। চিনিহীন ছানা যে কত বড় অখাদ্য একটা জিনিস যে না খেয়েছে তার পক্ষে বোঝা অসম্ভব। নিখিলবাবু রোজই ভাবেন একটু মুখে দিয়ে বাকিটুকু ফেলে দেবেন। মন্দিরা জানতে পারবে না। ক্যান্টিনের ডাস্টবিনে উলটে দিলেই হল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেন না। কোনওরকমে গিলে নেন। গিলতে গিলতে বুঝতে পারেন কোনও কিছু রাখার জন্য যেমন জোর লাগে, ফেলে দেওয়ার জন্যও লাগে। দুটোর একটাও তাঁর নেই।

কিন্তু আজ মুখে লাগল কেন!

ঠান্ডা হয়ে চিমসে মেরে গেলেও রুটি মুখে লাগার মতো জিনিস নয়। আলুর দমে আলুগুলো একটু শক্তর দিকে, কিন্তু তারা তো আর মাড়িতে কামড় দেবে না। তবে?

খোঁচাটা লেগেছে মুখের সামনে। নীচের মাড়িতে। ওপরের দাঁত দিয়ে কামড় পড়লে যেমন হয়। সত্যি কথা বলতে কী, এরকম একটা সামান্য আঘাত নিয়ে এতখানি মাথা ঘামানোর কোনও দরকার ছিল না। ঘামাতে হচ্ছে অন্য কারণে।

টিফিন খাওয়ার সময় মুখে লাগার ঘটনা আগেও ঘটেছে নিখিল সাঁতরার। বেশি নয়, মাত্র বছরখানেক আগের কথা। তখনও খাবার নিয়ে এরকম কড়াকড়ি শুরু হয়নি। মন্দিরাদেবী টিফিনে একটা মাছের চপ দিয়েছিলেন। বাড়িতে তৈরি মাছের চপ। তাতে কাঁটা থাকার কথা নয়। তবু কীভাবে যেন সেদিন থেকে গিয়েছিল। ছোট সাইজের জিনিস, আলু-টালুর আড়ালে ঘাপটি মেরে ছিল বোধহয়। দুইয়ের পর তিন নম্বর কামড়েই বেটা টাগরায় খোঁচা মারল। গোড়াতে পাত্তা দেননি নিখিল সাঁতরা। কাঁটা ফেলে টিফিন শেষ করেছিলেন হালকা

মনে। চা খেলেন, সিগারেট ধরালেন। তখনও দিনে দুটো সিগারেটের পারমিশান ছিল। মন্দিরাদেবীর পারমিশান। সকালে একটা রাতে একটা। অফিসের টিফিনে আরও একটা খেতেন লুকিয়ে। সেই সিগারেট শেষ করতেন গভীর তৃপ্তিতে। লুকানো জিনিসে তৃপ্তি বেশি। একেবারে ফিল্টারের ডগা পর্যন্ত টান মারতেন। সেদিনও মারলেন। তারপর নিজের টেবিলে ফিরে গিয়ে বসলেন ফাইল নিয়ে। আধঘন্টা পর থেকে শুরু হল ঝামেলা। প্রথমে অস্বস্তি, তারপর অল্প ব্যথা। অফিস ছুটির পর সেই ব্যথা টনটনে চেহারা নিল। বাড়ি ফেরার সময় ট্রাম থেকে নেমে একেবারে মারকিউরোক্রম কিনে বাড়ি ফিরতে হল। ততক্ষণে ব্যথা আরও বেড়েছে। রাতে শক্ত খাবার খেতে পারলেন না। মুখ বেজার করে মন্দিরাদেবী সুজি করে দিলেন। মুখ বেজার হওয়ারই কথা। অত রাতে সুজি বানাতে কারও মুখই হাসি হাসি থাকে না। শুতে যাওয়ার আগে নিখিল সাঁতরা তুলোয় করে যখন মুখের ভেতর ওষুধ লাগাচ্ছেন মন্দিরাদেবী বললেন, 'উফ সামান্য একটা কাঁটা নিয়ে যা শুরু করেছ! একটু দেখেশুনে খেলেই পারতে। পেটরোগা মানুষকে এসব দেওয়াটাই ভুল হয়েছে আমার।'

ব্যথা-কষ্টে এমনিতেই রাগ হয়। স্ত্রীর কথায় নিখিল সাঁতরা আরও রাগলেন। ঠিক করলেন, ওষুধ লাগানো শেষ হলে স্ত্রীকে কথা শোনাবেন। শোনানোর দরকার। বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই বলবেন— 'অফিসের টিফিন কোনও রেস্তোরাঁর মেনু নয় মন্দিরা, যে মাছের চপ, মাংসের কাটলেট সাজিয়ে দিতে হবে। তা ছাড়া পেটের সঙ্গে কাঁটা লাগার সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক আছে রান্নার। চপ তৈরির সময় আরও মনোযোগ দেওয়া উচিত ছিল।'

স্বাভাবিকভাবেই নিখিল সাঁতরা তেমন কিছু বলতে পারলেন না। শুধু জড়ানো গলায় বললেন, 'অফিসে কাঁটা বাছাবাছির সময় থাকে না।'

রাতে শোওয়ার আগে গ্লাস ভরতি জল খান মন্দিরাদেবী। সেই গ্লাস হাতে নিয়েই স্বামীর দিকে তাকালেন। ভুরু তুলে বললেন, 'কেন?'

অবাক হয়ে নিখিল সাঁতরা বললেন, 'কেন মানে! অফিসে কি আমি খাওয়া-দাওয়ার মধ্যেই থাকি? কাজ নেই আমার?'

গ্লাস তুলে জল শেষ করলেন মন্দিরাদেবী। আঁচল দিয়ে ঠোঁট মুছলেন। তারপর শান্ত গলায় বললেন, 'কী কাজ?'

টাগরার ব্যথা গিলতে গিলতে নিখিল সাঁতরা আরও অবাক হলেন। বললেন, 'কী কাজ মানে! আমার অফিসের কাজ তুমি কী বুঝবে?'

নাকে 'ফুঁ' ধরনের বিদ্রূপের হাসি হেসে মন্দিরাদেবী বললেন, 'না বুঝব না। তাও বড় কোনও অফিসার-টফিসার হলে একটা কথা ছিল। এত বছর চাকরি করলে, সেকশন ইনচার্জটুকুও তো হতে পারোনি এতদিনে। এখনও তো সেই মাছিমারা কেরানি। তুমি আমায় কাজের কথা বলো কোন মুখে!'

এরপরই নিখিল সাঁতরা চুপ করে যান। দ্রুত গুটিয়ে যান বলাই ভাল। স্ত্রীর কথাটা আদ্দেক সত্যি, আদ্দেক মিথ্যে। সেকশন ইনচার্জ হতে পারেননি ঠিকই, কিন্তু একটা প্রোমোশন ঝুলে রয়েছে। বড় কিছু নয়, ছোট প্রোমোশন। লোয়ার ডিভিশন থেকে এক ধাপ ওঠবার প্রোমোশন। বছর দুয়েক ধরে 'হচ্ছে হবে' বলেও হচ্ছে না। ফাইলটা গলিগুঁজিতে

কোথাও পড়ে আছে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। যে ফাইলের বাপ-মা থাকে না সে ফাইলের ধুলো মেখে পড়ে থাকাটাই নিয়ম। ফাইলের বাপ-মা খুঁজতে অফিস ইউনিয়নের নেতাদের কাছে যেতে হয়। নেতাদের সামনে বসে হাত কচলাতে হয়। হাত কচলানোয় খুশি হলে নেতারা ওপরতলায় চাপ মারে। তখন ওপরতলা নড়ে। ফাইলও নড়ে। নিখিল সাঁতরা প্রায়ই ভাবেন, এবার একদিন যাবেন। ইউনিয়ন অফিসে গিয়ে দরবার করবেন। সেক্রেটারি এখন তালুকদার। তিন বছর আগে রিটায়ার করেছেন, কিন্তু কর্মচারী ইউনিয়নের চেয়ার ছাড়েননি। এসব কথা মন্দিরাকে বলে কী লাভ? কোনও লাভ নেই। তার থেকে গুটিয়ে যাওয়াই ভাল। মুখে মাছের কাঁটার চিনচিনে ব্যথা নিয়ে সেদিন আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন নিখিল সাঁতরা। অন্ধকারে হাঁ করে শ্বাস টেনেছিলেন। অতিরিক্ত অক্সিজেনে যদি একটু আরাম হয়। আরাম কিছু হয়নি। ব্যথা পুরোপুরি যেতে দিন দুয়েক সময় লেগেছিল সেবার।

এবারও সেরকম কিছু হল না তো?

বাকি টিফিনটুকু হেলাফেলায় শেষ করলেন নিখিল সাঁতরা। কিছুটা খেলেন, বাকিটা ফেলে দিলেন। তারপর তড়িঘড়ি বাথরুমে ঢুকে আয়নায় মুখ রেখে হাঁ করলেন বড় করে। আয়নার অবস্থা শোচনীয়। জায়গায় জায়গায় ছোপ। জলের দাগ, পানের পিক, ধুলো জমে আছে। কত বছর যে পরিষ্কার হয়নি! নিজের মুখ দেখলে ভয় করে। চিনতে অসুবিধে হয়। বাথরুমে আলোও কম। গনগনে দুপুরেও ছায়া ছায়া। তবু মুখ পেতে ধরলেন নিখিল সাঁতরা। হাঁ-করা মুখ হেলিয়ে দুলিয়ে, কাত করে দেখতে লাগলেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। খোঁচা লাগার কারণ খুঁজতে লাগলেন প্রাণপণে। হলদেটে দাঁত, কালো হয়ে থাকা থেবড়া ঠোঁট। এবড়ো-খেবড়ো মোটা জিভ কোথাও সাদা, কোথাও ফ্যাকাশে। বাকিটুকুর বেশিরভাগই অন্ধকার। হাঁ বাড়িয়ে কমিয়ে মুখের ভেতর আলো নেবার চেষ্টা করলেন নিখিল সাঁতরা। হল না। অবাক লাগল। মানুষের মুখের ভেতরটা কি এতটাই অন্ধকার! নাকি আজ বেশি লাগছে? একটা টর্চ পেলে হত। কতদিন তিনি নিজেকে এভাবে দেখেননি! কোনওদিনই কি দেখেছেন? মনে করার চেষ্টা করলেন নিখিল সাঁতরা। কোনও কারণ নেই, তবু মনে করার চেষ্টা করলেন।

কিছুই পাওয়া গেল না। টিফিন বক্স ধুয়ে, চোখে মুখে জল দিয়ে টেবিলে ফিরে এলেন। কাগজ দিয়ে মুছে ব্যাগে টিফিন বক্স পুরলেন যত্ন করে। রুমাল বের করে মুখ মুছলেন। টেবিলের এক পাশে ঢাকা দিয়ে রাখা গ্লাস তুলে জল খেলেন দু'চুমুক। তারপর খোঁচার কথা ভুলে ফাইলে মন দিতে চেষ্টা করলেন। মন পুরোটা দেওয়া গেল না। মিনিট কুড়ির মধ্যে ক্যাশের বিপুল হালদার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। অনুমতি ছাড়াই চেয়ার টেনে উলটোদিকে বসতে বসতে নিচু গলায় বলল, 'সাঁতরাদা, ঘটনাটা কী?'

কাজ শুরুতেই ব্যাঘাত পেয়ে একটু বিরক্তই হলেন নিখিল সাঁতরা। বিরক্তি লুকিয়ে বললেন, 'কোন ঘটনা বিপুল?'

বিপুল হালদারের বয়েস বেশি নয়, তবে মাতব্বরি বেশি। ইউনিয়ন ইলেকশনে দু'বার দাঁড়িয়ে দু'বারই হেরেছে। এখন টেবিলে টেবিলে ঘুরে ঘোঁট পাকায়। ভুরু কুঁচকে বলল, 'আপনি নাকি সকালে ইউনিয়ন অফিসে গিয়েছিলেন? সেখানে আপনাকে... ভুলে গেলেন!'

শুকনো হাসলেন নিখিল সাঁতরা। ঘটনা আসলে তাই। অপমান প্রায় ভুলেই গেছেন। অন্যদিন হলে হয়তো আরও একটু সময় লাগত। আজ মুখে খোঁচা লাগার কারণে আরও কম লেগেছে।

'না সেরকম কিছু নয়।'

বিপুল হালদার চাপা অথচ কঠিন গলায় বলল, 'সেরকম নয় মানে? আপনার ন্যায্য প্রোমোশন এতদিন ঝুলে আছে, সেটা বলতে গিয়ে অপমানিত হবেন সেটা কিছু নয়। কে ছিল ওখানে? ওই তালুকদার হারামজাদাটা না? আর? আর ওই মেয়েছেলেটা?'

নিখিল সাঁতরা ভয় পেলেন। নেতাদের নামে গালি শুনতে ইচ্ছে করে, কিন্তু শুনলে ভয় করে। তার ওপর আবার একেবারে নিজের টেবিলে বসে শোনা তো মারাত্মক।

'না না, ওরাই বা কী করবে? ইউনিয়নে তো আর প্রোমোশন দেখে না। একটু বলতে টলতে পারে আর কী।'

'দেখে না বললেই হবে? শুনলাম তিন বছরের বেশি আপনার কেসটা ঝুলে আছে।'

'ছেড়ে দাও বিপুল। ওপরতলা না চাইলে কে কী করবে বলো? তা ছাড়া প্রোমোশনটা হলে হাতি ঘোড়া বিরাট কিছু মাইনে বেড়ে যাবে এমনটা তো নয়। এই একটু হল আর কী। বাড়িতে গিয়ে বললাম, ছেলেমেয়েরা খুশি হল ব্যস। তাও বুড়ো বয়েসে একটা কিছু হয়েছে।'

কথা শেষ করে বানিয়ে হাসলেন নিখিল সাঁতরা।

বিপুল দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, 'এই ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও নেকামিটা এবার ছাড়ুন তো সাঁতরাদা। বেটারা আসলে আপনার কেসটা উঠতেই দেয় না। ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে নেগোসিয়েশনের সময় আর পাঁচটা নিয়ে ঘষাঘষি করে।'

নিখিল সাঁতরা আবার হাসতে চেষ্টা করলেন। পারলেন না। বললেন, 'বাদ দাও বিপুল। অন্যরা অনেকদিন ধরেই বলছে, তাদেরটাও তো দেখতে হবে। আমারও আগে বলা উচিত ছিল, যাওয়া উচিত ছিল... ভেবেছিলাম নিজে থেকে হয়ে যাবে। সামান্য ব্যাপার। সবারই তো হয়।'

টেবিলে আঙুল দিয়ে রাগের টোকা মেরে বিপুল বলল, 'ঘোড়ার ডিম হয়ে যাবে। পারচেজের ওই নতুন মেয়েটার কী নাম যেন? রমলা না কমলা? না না পর্ণা। পর্ণা রায়। তার কী করে এত অল্পদিনে পরপর দু'-দুটো প্রোমোশন হয়ে গেল? কিছু জানি না ভেবেছেন? ডিপার্টমেন্টে কোনও কাজ করে না। সারাদিন ইউনিয়নবাজি। শুনেছি তালুকদারের সঙ্গে নটর-ঘট আছে। সন্ধের পরও অফিস ঘরে বসে থাকে... জানি না ভেবেছেন? ...ঢলানি সবাই জানে... বেটা বুড়ো।'

নড়ে-চড়ে বসলেন নিখিল সাঁতরা। বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। এইসব ছেলেছোকরাদের বাড়াবাড়ি করার ক্ষমতা থাকতে পারে, তাঁর নেই। যদিও আজকের অপমানের ঘটনাটা ওই মেয়েটিকে নিয়েই ঘটেছে। ঘটেছে না বলে ঘটানো হয়েছে বলাই ভাল। একতলার অফিসে গিয়ে তালুকদারের কাছে কথাটা পেড়েছিলেন তিনি।

'অনেক বছর আটকে আছে ভাই।'

'আটকে আছে তো আমরা কী করব নিখিলবাবু? ইউনিয়ন তো প্রোমোশন ডিমোশন আটকে রাখার মালিক নয়।'

'তবু যদি একটু বলতেন...।' খুবই লজ্জিত গলায় বললেন নিখিল সাঁতরা। বলতে বলতে ভাবলেন, কেন যে এলাম। আসলে মেয়েটার বিয়ের কথা শুরু হয়েছে। শুরু করেছে মন্দিরা। দু'-একটা সম্বন্ধ আসছে। চিঠি-চাপাটিও চলছে। ঊর্মি নাকি তার মাকে বলেছে, 'চিঠিতে বাবা কী করে সেটা আর ঢাকঢোল পিটিয়ে লেখার দরকার নেই। চাকরি করে ব্যস এইটুকু লিখেই চেপে যাও।' কথাটা পরশু মন্দিরা তাঁকে ঠারে-ঠোরে বলেছেও। যেমন অবাক হন, তেমন রাগও হয় নিখিল সাঁতরার। বাপের পয়সায় বড় হয়েছে, বাপের পয়সায় বিয়েও করবে, অথচ পরিচয় দেওয়ার বেলায় লজ্জা। তিনি শান্তভাবেই স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কী বললে?'

'কী আবার বলব? ঊর্মি তো বাজে কথা কিছু বলেনি। হাতি-ঘোড়া এমন কিছু তো কাজ করো না যে ছেলের বাড়িতে বললে তারা লাফিয়ে উঠবে।'

'তা বলে নিজের বাবার সম্পর্কে অমন বলবে!'

মন্দিরা ঝাঁঝিয়ে ওঠে। বলে, 'মেয়েরও তো একটা মান-সম্মান আছে। শুধু নিজেরটা দেখছ কেন?'

নিখিল সাঁতরা খানিকটা মিনমিন করে বললেন, 'আমি যে কাজ করি সেটাই তো বলব।'

মন্দিরাদেবী এবার চাপা গলায় হিসহিসিয়ে উঠলেন। বলতে লাগলেন একটানা— 'কাজটা বড় কথা নয়, উদ্যোগটাই আসল। শুরু যেখানে থেকেই করো, একটা জায়গায় তো মানুষ যায়। বড় হয়। তোমার সঙ্গে অফিসে চাকরি শুরু করে কতজন কত এগিয়ে গেছে দেখেছ একবার? হিসেব করেছ? রিটায়ারমেন্টের আর ক'টাদিন বাকি? শুধু কি অফিস? সংসারেও তো কোনও কম্মে লাগো না। এতদিনেও নিজেদের একটা ফ্ল্যাট হল না। জন্মভর ভাড়া করা বাসাতেই পচে মরছি। আরে বাপু, শুধু কি টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট হয়? এদিক-ওদিক ধরাকরায় লোকজনেরা কত সস্তায় ফ্ল্যাট বাড়ি পেয়ে যাচ্ছে সে খবর জানো? জানতে চাও? সৌমির ননদাই পাইকপাড়ায় গরমেন্টের.....। যাক এখন আর বলে কী হবে? ছেলেটা কলেজ শেষ করে বসে আছে আট মাস। চাকরির জন্য যে ক'জনকে বলতে গেলে, দেখছি, দেখব বলে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিল। দেবেই তো, তোমার মতো মেদামারা পুরুষমানুষকে কে কোলে বসিয়ে খাতির করবে বলো? মেয়ের বিয়ে নিয়েও মাথা-ব্যথা নেই। আজকাল সব কিছুতেই সোর্স লাগে। ছেলে খুঁজতেও লাগে। ভাল পাত্র ঘাপটি মেরে থাকে। মাটি খুঁড়ে বের করতে হয়। আমি যেটুকু করার করছি। কিছু বলতে গেলে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছ।'

একটা দুটো অভিযোগেই চুপ করে যান নিখিল সাঁতরা, এ তো দীর্ঘ তালিকা! নিয়মমতো গভীর নৈঃশব্দ্যে চলে যান তিনি। সত্যি তো, মন্দিরা ভুল কিছু বলেনি। নিখিল সাঁতরা সিদ্ধান্ত নিলেন, অন্য কিছু না হোক বকেয়া প্রোমোশনটা নিয়ে একবার তদ্বির করে দেখবেন। যদি হয়ে যায় সামান্য হলেও কিছু তো হল। ঊর্মির ভাবী শ্বশুরবাড়িতে না হয় বলা যাবে— 'মেয়ের বাবার একটা প্রোমোশন হয়েছে। তেমন কিছু না, বুড়ো বয়েসে... হে হে।'

এই সিদ্ধান্ত মতোই টিফিনের মুখে ইউনিয়ন অফিসে এসে কাঁচুমাচু মুখে কথাটা তুলেছেন নিখিল সাঁতরা।

তালুকদার সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ঠোঁটের ফাঁকে হেসে বলেন, 'এই একটুটাই মুশকিল দাদা। আপনি বলছেন, একটু দেখুন, অথচ এই একটু দেখতে হলে যে কত পরিশ্রম করতে হয় জানা নেই আপনাদের। আপনার তো মোটে বছর তিনেকের মামলা। পাঁচ-দশ বছরের কেস নিয়ে জেরবার হয়ে আছি। দেখবেন ক'টা অ্যাপ্লিকেশন পড়েছে? দেখবেন? নিন দেখুন না!'

টেবিলের একপাশে ডাঁই হয়ে পড়ে থাকা কাগজপত্রে হাত বাড়ান তালুকদার। নিখিল বললেন, 'না না তার কোনও দরকার নেই, আপনারা যখন বলছেন আমি বিশ্বাস করছি।'

ঠোঁটের কোনায় বিদ্রূপের হাসি হাসলেন তালুকদার।

'এটাই তো সমস্যা নিখিলবাবু। বুড়ো বয়স পর্যন্ত শুধু নিজেরটুকু নিয়েই ব্যস্ত রইলেন। অন্যের কী হল না হল ভাবলেন না একবারও। অফিসে লেট করে এলুম, টিফিনে ছানা খেলুম, তারপর বাড়ি চলে গেলুম— এটা করলে কীভাবে চলবে বলুন দেখি? আর পাঁচটা সহকর্মীর কথাও তো ভাবতে হবে। তাই না?'

নিখিল সাঁতরার মনে হল, তালুকদার যেন এক গালে সপাটে চড় কষাল। সেই চড় পড়ল আর এক গালেও। নারীকণ্ঠের চাপা হাসিতে। এতক্ষণ চোখে পড়েনি, এবার হতচকিতে মুখ ফিরিয়ে তিনি দেখতে পেলেন ঘরের এক কোনায় মেয়েটি বসে আছে। আধো আলো, আধো ছায়ায় মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসছে। ঠাট্টার হাসি। তালুকদারও হাসতে লাগলেন।

'দেখছেন তো নিখিলবাবু, আমরা কর্মীদের কেমন খবর রাখি? তাদের টিফিন বক্সের ভেতরও আমাদের নজর আছে। শুধু শুধু কি আর এই চেয়ারে বসে আছি এতদিন? বলেন তো আরও ভেতরের খবর বলতে পারি। বলব?'

মেয়েটি হাসতে হাসতে ঝুঁকে পড়ল। খসে যাওয়া আঁচল একই সঙ্গে সামলে এবং না সামলে বলল, 'উফ তালুকদারদা, আপনি না কিছু পারেন।'

কান মাথা ঝাঁ ঝাঁ করছে নিখিল সাঁতরার। তালুকদার বললেন, 'একে চেনেন? চিনে রাখুন। পর্ণা রায়। পারচেজে এসেছে বছর তিনেকও হয়নি। এসেই ইউনিয়নে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। রাতদিন পড়ে থাকে। দেখে শেখবার মতো। এরাই আগামীদিনের লিডার।'

মেয়েটি চেয়ারে হেলান দিয়ে আধো আধো গলায় বলল, 'কী যে বলেন না তালুকদারদা, দূর, লিডার না ছাই হব।'

'যা সত্যি তাই বলছি পর্ণা। এতে লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। অনেক বুড়ো-হাবড়ারা যা পারে না তোমরা তা করে দেখিয়ে দিচ্ছ।'

নিখিল সাঁতরা মাথা নামালেন। 'বুড়ো-হাবড়া' কথাটা যে তাঁর জন্যই বলা সেটা বুঝতে অসুবিধে হওয়ার কিছু নেই। তালুকদার সিগারেটের শেষ অংশটুকু অ্যাশট্রেতে গুঁজে বললেন, 'পর্ণা একটা কাজ করো তো, এই ভদ্রলোকের কেসটা হ্যান্ডেল করো। শুনলে তো সবই। বেচারি শান্তশিষ্ট, লাজুক মানুষ বলে ডিউ প্রোমোশন তিন বছর ঝুলে থাকবে এটা কোনও কথা নয়। ভোকাল মানুষকে নিয়েও যেমন আমাদের চলতে হবে, লাজুক মানুষকে

নিয়েও তো চলতে হবে। ইউনিয়ন তো সবার। তাই না? তুমি দেখো নেক্সট মিটিং-এই যেন ফাইলটা পুট-আপ করা হয়। ওঁর কাছ থেকে একটা অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে রাখো।'

নিখিল সাঁতরা মুখ তুলে বললেন, 'অ্যাপ্লিকেশন কি আজই দেব? এখনই?'

কনুইয়ে পড়া আঁচল কাঁধে তুলে বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে পর্ণা রায় বলল, 'না না আজ নয়। আজ আমি খুব বিজি। আপনি বরং কাল, থাক কাল আবার পরপর দুটো মিটিং আছে, একেবারে সোমবারই দিন।'

তালুকদার সোজা হয়ে বললেন, 'ব্যস হয়ে গেল। সোমবার বারোটা নাগাদ অফিসে এসে কাগজপত্র দিয়ে যাবেন। দেরি করবেন না। পর্ণা না থাকলে অপেক্ষা করবেন। থাকবে না-ই ধরুন। তবু অপেক্ষা করবেন। ও আবার খুব লেট লতিফ মেয়ে।'

পর্ণা নাক কুঁচকে বলল, 'ওমা লেট না করে উপায় কোথায় তালুকদারদা? বাড়িতে কত কাজ। বরকে অফিসে পাঠিয়ে, ছেলেকে খাইয়ে...।'

তালুকদার এতক্ষণে সম্পূর্ণভাবে মেয়েটির দিকে ঘুরে বসেছেন। চোখ নাচিয়ে বললেন, 'কী খাইয়ে? ছানা?' দু'জনের হাসির মাঝখানেই সম্পূর্ণভাবে নিঃশব্দে উঠে এসেছিলেন নিখিল সাঁতরা। ক্যান্টিনে যেতে যেতে ভেবেছিলেন, টিফিন যেমন খাবেন না, তেমন অ্যাপ্লিকেশনও জমা দেবেন না। কিন্তু এখন মত বদলেছেন। সোমবার অ্যাপ্লিকেশন দেবেন বলে ঠিক করেছেন। দরকার হলে ওই মেয়েটির জন্য সারাদিন বসে থাকবেন।

নিখিল সাঁতরা অনুরোধের ঢঙে বললেন, 'বিপুল, এখন বরং এসব থাক। আমার হাতেও অনেক কাজ। দেখছ তো কতগুলো ফাইল। না দিতে পারলে আবার খিটমিট করবে।'

বিপুল মুখ বিকৃত করে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'সারাজীবন ওই খিটখিটের ভয়েই মরুন আপনারা। আমার কী? কিছুই নয়। শুনলাম, ওই পর্ণা মেয়েটা নাকি আপনাকে যাচ্ছেতাই করে অপমান করেছে। বলেছে, ঘরে এসে বসে থাকবেন। সেইজন্যই বলতে আসা। নিজের প্রেস্টিজ নিজে যদি না বোঝেন...।'

বিপুল চলে যাওয়ার পর ফাইল খুলে বসলেন নিখিল সাঁতরা। কিন্তু কাজ বেশি এগোল না। চার নম্বর ফাইল দেখার সময়েই মুখে আবার লাগল। এবার সেই ব্যথা তীক্ষ্ণ। ঠিক যেন কেউ ছুঁচ ফোটাল! চমকে উঠলেন নিখিল সাঁতরা। জিভ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেন এবং বুঝতেও পারলেন দ্রুত।

ওপরের একটা দাঁতের ডগা ছুঁচালো হয়ে গেছে!

আগেকার দিনে ডাক্তাররা রোগীর হাতে প্রেসক্রিপশন ধরিয়েই দায়িত্ব শেষ করতেন। এখন ব্যবস্থা পালটেছে। প্রেসক্রিপশনের ওপর নিজের হাতেই তাঁরা ছবিটবি এঁকে সমস্যা বুঝিয়ে দেন। এই ডেনটিস্ট ভদ্রলোকও তাই করছেন। একটু যেন বেশিই করেছেন। সব সময়েই করেন? নাকি আজ বেশি করছেন? টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে নিখিল সাঁতরার দাঁতের ছবি এঁকেছেন। এলোমেলো স্কেচ। সারি সারি দাঁত। ডাক্তারের মুখ থমথমে। সম্ভবত দাঁতের চিকিৎসকরা রোগীর সামনে হাসেন না।

'এই হল মানুষের দাঁত। মোটামুটি এটাই ধরুন কম্পোজিশন। এই সামনের চারটেকে বলে ইনসিজার, পাশের দুটো ক্যানাইন। ইনসিজার দিয়ে আমরা খাবার ছিঁড়তে পারি। আর

ক্যানাইন সেই খাবার টুকরো করতে কাজে লাগে। আর এই যে পাশের দুটো দেখছেন? এই দুটো হল প্রিমোলার। খাবার ক্রাশ করে। ভেঙে ফেলে বলতে পারেন। এদের ফাংশনও খুব জরুরি। পিছনের তিনটে দাঁত ইউসড ফর গ্রাইন্ডিং ফুড। বাংলায় পেষাপিষি বলতে পারেন। আপনার হয়েছে...।'

ডাক্তারের কাছে আসার সিদ্ধান্ত নিখিল সাঁতরা নিজেই নিয়েছেন। নিয়েছেন কাল গভীর রাতে। বাড়ির কাউকে জানাননি।

অফিস থেকে ফেরার পর দাঁত সমস্যা নিয়ে বাড়িতে কাউকেই কিছু বলেনওনি। ইচ্ছে করেই বলেননি। বছরখানেক আগের অভিজ্ঞতা ভাল নয়। মাছের চপের কাঁটা নিয়ে স্ত্রীর কথা শুনতে হয়েছিল। তার ওপর মন্দিরা এখন বিয়ে নিয়ে খুবই ব্যস্ত। দুপুরের পোস্টে আন্দুলের দিক থেকে একটা সম্বন্ধ এসেছে। ছেলের মা চিঠি লিখেছে। ছেলের দুটো ফটোও পাঠিয়েছে। রঙিন আর সাদা কালো ফটো। রঙিন ফটো দেখে ঊর্মি নাক বেঁকালেও, সাদা কালো চেহারা তার পছন্দ হয়েছে। ছেলে ভাল। স্কুল টিচার। ছেলের মা ব্রাকেট করে জানিয়েছে, মোটা টিউশনি আছে। ঊর্মির চেহারা তাদের ফটোতে ভাল লেগেছে। এখন একবার চোখে দেখতে চায়। বড় কথা হল, দেওয়া-থোওয়ার কোনও ব্যাপার নেই। শুধু আন্দুলের বাড়ির দোতলায় ছেলে ছেলের বউয়ের জন্য একটা ঘর বানিয়ে দিলেই চলবে। ঘরের সঙ্গে অ্যাটাচড বাথ। সেই ঘরের মেঝে মার্বেল হবে না টাইলস বসবে, জানলা একটা না পাঁচটা হবে, বাথরুমে ফিটিংস ওয়েস্টার্ন না দেশি হবে সবই মেয়ের ইচ্ছেমতো করলে চলবে। এ বিষয়ে ছেলে ট্যাঁ ফুঁ করবে না। ছেলের মা-বাবারও কোনও বক্তব্য নেই। ঘর তৈরির সময় তারা ফিরেও দেখবে না। মন্দিরাদেবী গদগদ হয়ে পড়েছেন। এ তো হিরের টুকরো পাত্র! ঊর্মি অভিমান করে বলেছে, 'শুধু পাত্র ভাল বলছ মা! শ্বশুর-শাশুড়ি কেমন দেখছ না? কী ভাল! একেবারে নাক গলানো টাইপ নয়। সেটা একবার বলবে না?' এই পরিস্থিতিতে দাঁতের ঘটনা বলা যায় না। তা ছাড়া একটা দাঁত একটু ছুঁচালো হয়ে পড়াটা এমন একটা 'আনন্দঘন' পরিবেশে বলার মতো ঘটনাও নয়। রাতে শোওয়ার আগে জল খেতে খেতে মন্দিরাদেবী বললেন, 'প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার জন্য কালই অ্যাপ্লাই করো। বাকিটা ধার-দেনা করতে হবে। এই সুযোগ আমি মরে গেলেও হাতছাড়া করব না। কিছুতেই করব না। কী শুনছ?'

'শুনছি মন্দিরা।'

'মনে তো হচ্ছে না। মুখের ভেতর যেভাবে বনবন করে জিভ ঘোরাচ্ছ। ঘাবড়ে গেলে নাকি?'

জিভের নড়াচড়া সামলে নিখিল সাঁতরা হাসার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'না ঘাবড়াব কেন? আসলে...।'

'আসলে কী?' রাগে ভুরু তুললেন মন্দিরাদেবী।

'না কিছু নয়।'

'না হলেই ভাল। তোমার মতো মানুষের আসল-নকল যত কম থাকে ততই সংসারে মঙ্গল।'

তখনও ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেননি নিখিল সাঁতরা। নিলেন মাঝরাতে। সবাই ঘুমিয়ে পড়বার পর। বালিশের তলায় লুকিয়ে রাখা ছোট্ট টর্চটা নিয়ে বাথরুমে ঢুকলেন পা টিপে টিপে। দরজা আটকে টর্চ জ্বালিয়ে মুখের ভেতর আলো ফেলেই শিউরে উঠলেন। এ কী! একটা তো নয়, দু'পাশের দুটো দাঁতেই...।'

ডেনটিস্ট ভদ্রলোক একটু দম নিয়ে বললেন, 'আপনার এই ক্যানাইন দুটোতে সমস্যা হয়েছে। বাংলায় এদের আমরা বলি শ্বদন্ত। সমস্যাটা খানিকটা আনইউসুয়াল। অন্তত, আমি তো কখনও দেখিনি। ইটস ডাসন্ট ম্যাটার। চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনেককিছুই প্রথম দেখতে হয়। অভিজ্ঞতার মধ্যে চলাটাই বড় কথা।'

এতটা বলে ডাক্তার একটু চুপ করলেন। নিখিল সাঁতরা পলকহীন চোখে বললেন, 'সমস্যাটা কী ডাক্তারবাবু?'

ডাক্তার নিজের আঁকা ছবি থেকে মুখ তুলে বললেন, 'দুটো দাঁতই হঠাৎ করে অন্যদের থেকে খানিকটা লম্বা হয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, এদের মুখ দুটোও দেখলাম সরু। অনেকটা নিডল সেপড্। মানে ছুঁচের মতো হয়ে গেছে। তা ছাড়া আরও একটা ব্যাপার আছে। যদিও আমি শিয়োর নই, এক্স-রে করে দেখতে হবে, মনে হচ্ছে দাঁত দুটোর ভেতরে একটা ফাঁপা অংশ তৈরি হয়েছে, পাইপের মতো।'

নিখিল সাঁতরার মনে হল, শরীরটা একটু কাঁপছে। তিনি দু'হাতে টেবিলের কোনা চেপে ধরলেন। ডাক্তার ভদ্রলোক এই প্রথম হাসলেন। সুন্দর হাসি। দাঁতের ডাক্তারের হাসি কি সবসময় সুন্দর?

'চিন্তা করবেন না মিস্টার সাঁতরা। ড্রাকুলার দাঁত বলে কিছু হয় না। ওটা কল্পনা মাত্র। আমার ধারণা ক্যালশিয়ামের কোনওরকম আনইউসুয়াল গ্রোথের কারণেই... যাই হোক, এখন আমাদের সামনে অপশন দুটো। এক, আমি দুটো দাঁত আপাতত ঘসে খানিকটা নরমাল সেপে এনে দিতে পারি। সেকেন্ড, আপনি বললে ক্যানাইন দুটো তুলে দিই। তা হলে আর কোনওরকম ঝুঁকি থাকে না। ভবিষ্যতেও ভয় নেই। নাউ ইউ ডিসাইড। একদিন সময় নিন, বাড়িতে কথা বলুন।'

তিনশো টাকা ভিজিট শুনে একটু ঘাবড়ে গেলেন নিখিল সাঁতরা। সঙ্গে আছে তো? মানিব্যাগ বের করে দেখলেন, হ্যাঁ, আছে। বেশিই আছে। ডেসপ্যাচের অমূল্যর কাছ থেকে নেওয়া ধার শোধ করার জন্য সঙ্গে নিয়ে ঘুরছেন ক'টা দিন। ছোকরা তিনদিন হল অফিস কামাই করে বসে আছে। ভাগ্যিস করছে। নইলে আজ লজ্জায় পড়তে হত। সুন্দর হাসির ডাক্তার একটা আধময়লা একশো টাকার নোট বদলে নিতে নিতে বললেন, 'সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করবেন না। যতই হোক ঝামেলাটা অন্যরকম।'

দেরি করলেন না নিখিল সাঁতরা। ট্রামের সেকেন্ড ক্লাস কামরার ভিড়ে ছাতা, ব্যাগ, টিফিন বাক্স সামলাতে সামলাতে সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেললেন।

থাক না দাঁত দুটো। ক্ষতি কী? শেষ পর্যন্ত যদি কোনওদিন কাজে লাগে।

আজ বরং অফিসে পৌঁছেই একবার ইউনিয়নের ঘরে যাবেন। তালুকদারকে ঠান্ডা গলায় বলবেন, 'থাক, আমার ফাইলটা নিয়ে আপনাদের ব্যস্ত হতে হবে না। এখন মনে হচ্ছে

বিষয়টা আমি নিজেই বুঝে নিতে পারব।' খারাপ মানুষকে ঠান্ডা গলায় সব থেকে বেশি ভয় পাওয়ানো যায়।

নিখিল সাঁতলা ট্রামের দুলুনি সামলাতে সামলাতে নিজের মনেই হাসলেন। জিভ দিয়ে উঁচু হয়ে আসা দাঁত দুটোকে স্পর্শ করলেন গোপনে। আদরের স্পর্শ গোপনেই করতে হয়।

শারদীয়া বর্তমান ২০০১

মাটির মেডেল

লজ্জা পেলে অনেক রকম হয়। কেউ চুপচাপ গাল লাল করে বসে থাকে। কেউ বেশি কথা বলে। কিন্তু সেই কথা জড়িয়ে যায়। কেউ কথা বলে না, শুধু লাজুক ভঙ্গিতে এদিক-ওদিক তাকায় আর মিটিমিটি হাসে।

উমানাথ হালদারের তিন নম্বরটা হয়েছে। তিনি লাজুক ভঙ্গিতে মিটিমিটি হাসছেন। কিন্তু সেই হাসি মুখে ফুটছে না। আশ্চর্যের ব্যাপার হল, হাসি যে মুখে ফোটেনি সেটা উমানাথবাবু নিজেও বুঝতে পারছেন না। তিনি সেই না-ফোটা হাসিমুখ নিয়েই বোকা বোকা ভাবে চারপাশে তাকাচ্ছেন। মনে হচ্ছে, এইমাত্র সাতান্ন বছরের মানুষটার অ্যানুয়াল পরীক্ষার রেজাল্ট বের হল। ক্লাস এইটের অ্যানুয়াল পরীক্ষা। সারাটা বছর ভুল করার পর আজ হঠাৎ শুনছেন, অঙ্কে নাকি একশোতে একশো হয়ে গেছে! একেবারে ফুল মার্কস। বিরাট লজ্জার বিষয়।

মাইকে ঘোষণা চলছে। ঘোষণার মাঝখানে ফটাফট হাততালি।

গলাটা কার? অ্যাকাউন্টসের সন্তোষ না? কীরকম যেন ঘষা ঘষা। মাইকে কথা বললে এরকম বিচ্ছিরি লাগে? আবার ঘোষণা হল। আবার হাততালি। এবার হাততালির সঙ্গে হাসি। সবাই ঘুরে ঘুরে তাকাচ্ছে। ভিড়ের মধ্যে উমানাথ হালদারকে খুঁজছে। এত বছর ধরে সকালে বিকেলে দেখার পরও আজ যেন নতুন করে আর একবার দেখতে চাইছে!

ছি ছি, কী কাণ্ড!

উমানাথবাবু মুখ লুকোনোর চেষ্টা করলেন। এই বুড়ো বয়সে এরকম একটা বিপদে পড়বেন কল্পনাও করতে পারেননি। নার্ভাস লাগছে। খুবই নার্ভাস লাগছে। বিপদ-আপদের সময় পাশে বাড়ির লোক কেউ থাকলে কিছুটা ভরসা পাওয়া যায়। তাও নেই। অথচ অনেকের বাড়ির লোক এসেছে। প্রতিবারই আসে। ছেলে, মেয়ে, বউ। আসবে না কেন? অসুবিধে তো কিছু নেই। বাড়ির লোকদের জন্য বিনি পয়সায় খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা। যতবার খুশি চা। দুপুরে প্যাকেটে লাঞ্চ। কোনওবার লাচ্চা পরোটা, কোনওবার ফ্রায়েড রাইস। সঙ্গে আলুর দম, মাংস আর একটা করে নলেন গুড়ের সন্দেশ। স্টোরের পরিমল এবার তো ওর শালাকেও এনেছে। শালা বাড়ির লোকের মধ্যে পড়ে কি না তা নিয়ে একটু গুজগুজ ফুসফুস হয়েছে, পরিমল পাত্তা দেয়নি। ছোকরা মাঠের পাশে চেয়ার নিয়ে বসেছে। পায়ের ওপর পা তোলা। জামাইবাবুর লাফঝাঁপ দেখে মিটিমিটি হাসছে।

উমানাথবাবুও বাড়ির লোক আনতে চেয়েছিলেন। গতকাল রাতে শুতে যাওয়ার আগে গিন্নির কাছে কথাটা পাড়লেন। তবে সরাসরি পাড়েননি। অন্য কথা দিয়ে শুরু করেছিলেন।

পরে আসল কথায় গেছেন। ইদানীং উমানাথবাবু এটা করছেন। ধমক খাওয়ার ভয়ে গিন্নিকে আসল কথা সরাসরি বলছেন না। আসল কথার আগে নকল কথা দিয়ে খানিকটা ধানাইপানাই করে নিচ্ছেন। তাঁর ধারণা, গোড়াতে আসল কথা বলতে গিয়ে তিনি বেশির ভাগ সময়ই ভুল করে বসেন, আর তাতেই যত বিপত্তি হয়। সুলেখার মাথা গরম হয়ে যায়। নকল কথা দিয়ে শুরু করলে মনে সাহস আসে, ভুলও কম হয়। যদিও ঘটনা তা নয়। নকল কথাতেও প্রায়ই ভুল করে বসেন উমানাথবাবু। কালও করেছেন।

'সুলেখা, টিভি দেখছ?'

সুলেখাদেবী ভুরু কোঁচকালেন। তিনি খাটের ওপর বসে পান সাজছিলেন। দিনের শেষের এই পানটা তিনি যত্ন করে সাজেন। সাজতে সাজতে টিভি দেখেন। কালও দেখছিলেন। টিভিতে সিরিয়াল চলছে। হাসির সিরিয়াল। এই সিরিয়ালের প্রতিটি ডায়লগে হেসে গড়িয়ে পড়ার উপকরণ রয়েছে। সুলেখাদেবী হাসছেন না। তাঁর মুখ থমথমে। থমথমে থাকাটাই স্বাভাবিক। তিন দিন হতে চলল টিভির আওয়াজে গোলমাল চলছে। নায়ক, নায়িকা, ভিলেন সবার গলাই ফ্যাসফ্যাসে শোনায়। ফ্যাসফ্যাসে গলার কথা শুনে আর যাই হোক হাসি পায় না। উলটে রাগ হয়। সুলেখাদেবীর ইচ্ছে করছে লোকগুলোকে ধরে চড় লাগাতে। সেটা সম্ভব নয়। তাই মুখ থমথমে করে বসে আছেন।

সুলেখাদেবী যে টিভির আওয়াজ ঠিক করার চেষ্টা করেননি এমন নয়। চেষ্টা করেছিলেন। মেকানিক ডাকার জন্য ছেলেমেয়ে দু'জনকেই তিনি বলেন। দু'জনের কেউই সময় দিতে পারেনি। বিল্টুর সময় দিতে না পারাটা আশ্চর্যের কিছু নয়। শুধু তিন দিন নয়, গত এক বছর ধরেই সে বাড়ির কোনও কাজে সময় দিতে পারে না। তার হাতে একদম সময় নেই। গতবার কান ঘেঁষে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করার পর পরই সে প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। তার মাথায় শুধু একটাই চিন্তা। ব্যাবসা চিন্তা। কলেজে নাম লেখানো আছে, কিন্তু এক সপ্তাহের বেশি যাওয়ার সময় পায়নি। আর কোনওদিন পাবে বলে মনে হয় না। এখনও পর্যন্ত সে ষোলো জন পার্টনারের সঙ্গে মোট তেরো ধরনের ব্যাবসা করেছে। মূলধন ছাড়া ব্যাবসা করার এই একটা সমস্যা। ঘনঘন পার্টনার এবং ব্যাবসার বিষয় বদলাতে হয়। বিল্টুকেও হয়েছে, এবং সেগুলোর কোনওটারই আয়ু এগারো দিনের বেশি হয়নি। শুধু একটাই যা একটু বেশি দিন টিকেছিল। প্রায় তিন সপ্তাহ। এই ছেলের সামান্য টিভি-রেডিয়োর আওয়াজ নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় কোথায়?

বুলি সময় দিতে পারেনি অন্য কারণে। সে তার দাদার মতো ব্যস্ত নয়। বরং বলা উচিত তার হাতে অঢেল সময়। প্রায় সারাদিনই বাড়িতে শুয়ে-বসে থাকে এবং রূপচর্চার নানাবিধ পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়। কখনও আলুথেঁতোর রস মুখে মেখে শুয়ে আছে, কখনও হাতে-পায়ে পাতিলেবুর রস লাগাচ্ছে। মাধ্যমিকে খুব নিচুর দিকে নম্বর পেয়ে বুলি এ বছর ক্লাস ইলেভেনে পড়ছে। তবে বেশিদিন পড়বে না। বিয়ে করে ফেলবে। তার মা এবং মেজমাসি তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে। অল্প বয়সে বিয়ের কথায় বাবা মিনমিন করে আপত্তি তুলেছিল। সেই আপত্তি শোনা হয়নি। এ-বাড়িতে বাবার ছোটখাটো কোনও আপত্তিই শোনা হয় না, এ তো অনেক বড় ব্যাপার। মেয়ের বিয়ে। মায়ের বিশ্বাস, কালো

মেয়ের বিয়ে যত আগে হয় তত ভাল। কারণ যত বয়স বাড়বে রং নাকি আরও কালো হবে। ক্রমশ বাড়তেই থাকবে। ফরসাদের ক্ষেত্রে এটা হয় না, এই সমস্যা নাকি শুধু কালোদের! মায়ের সেই বিশ্বাসমতো কাজ দ্রুত এগোচ্ছে। মুখে বেশি করে পাউডার দিয়ে বুলির ছবি তোলা হয়েছে। দু'রকম ছবি। ফুল সাইজ আর হাফ সাইজ। বড় ছবিটার পিছনে স্টুডিয়োর আঁকা ঝরনা রয়েছে। পাথরের ওপর ঝরনা আছড়ে পড়ছে। অন্যটার পিছনে কিছু নেই। শুধু নীল রং। ঘন নীল। এটা মেজমাসির কথামতো করা হয়েছে। তিনি বলেছেন, পাত্রীর ছবিতে নীল রং একটা শুভ জিনিস। এতে ছেলে সারাজীবন বউ-ন্যাওটা হয়ে থাকে। কাগজের বিজ্ঞাপনে দাগ দিয়ে এই দু'ধরনের ছবিই পাঠানো চলছে। যত দিন যাচ্ছে বুলি বুঝতে পারছে, লেখাপড়ার থেকে বিয়ে অনেক ইন্টারেস্টিং বিষয়। এই বিষয়ের মধ্যে নানা ধরনের মজা এবং রহস্য লুকিয়ে আছে। লেখাপড়ায় মন না বসলেও, তার বিয়েতে মন বসে গেছে। শনিবার কাঁথির একটা পার্টি এসে মেয়ে দেখে গেল। পাত্র নিজে ছিল না, তবে তার এক বন্ধু ছিল। চ্যাংড়া ধরনের বন্ধু। জুতো পরে ঘরে ঢুকে পড়ল এবং চেয়ারে বসে বিশ্রীভাবে পা নাচাতে লাগল। ঘটনা এখানেই শেষ নয়। আরও আছে। চ্যাংড়াটা পকেটে করে বুলির ছবিও এনেছিল। মাঝেমধ্যে সেই ছবি লুকিয়ে লুকিয়ে বের করে কী যেন মেলাচ্ছিল। আর কেউ না দেখতে পাক, বুলি দেখেছে। মনে হয় গায়ের রং মেলাচ্ছিল। অন্য কিছুও হতে পারে। যেটাই হোক ঘটনা খুব ইন্টারেস্টিং তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কথাটা কাউকে বলেনি বুলি। বিয়ে সম্পর্কিত ইন্টারেস্টিং বিষয় সবাইকে বলা যায় না। কাঁথির এই পার্টি যে-কোনওদিন রেজাল্ট জানিয়ে দেবে। হাবেভাবে বোঝা গেছে মেয়ে তাদের অপছন্দ হয়নি। ছেলের মামা দুটো লুচি চেয়ে খেয়েছেন। মেয়ে পছন্দ না হলে কেউ লুচি চেয়ে খায়? এই অবস্থায় বুলি কীভাবে বাড়ি থেকে বেরোবে? ফাইনাল না হলেও, সে এখন বিয়ের পাত্রী। বিয়ের পাত্রী অনেক কিছু পারে, কিন্তু পথে ঘুরে ঘুরে টিভি মেরামতের মিস্ত্রি খুঁজতে পারে না। মা বললেও পারে না।

শেষ পর্যন্ত সুলেখাদেবী নিজেই মেকানিক ধরে আনলেন। সে অনেক কায়দা করল। টিভি চালিয়ে একবার কাছ থেকে শুনল, একবার দূর থেকে শুনল। একবার খবরের চ্যানেল ঘোরাল, একবার সিনেমার গান চালাল। তারপর ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলল, 'খরচা আছে কাকিমা। ভোকাল কর্ড বিগড়েছে। ভয়েস ঠিক করতে ঝামেলা হবে। হাজার টাকার কমে কিছু হবে বলে মনে হচ্ছে না।'

এক হাজার টাকা দিয়ে টিভি সারানোর সামর্থ্য এ-বাড়ির নেই। 'পরে খবর দেব' বলে মেকানিক বিদায় করেছেন সুলেখাদেবী। তারপর থেকে মেজাজটা আরও থম মেরে আছে। এই অবস্থায় স্বামীর প্রশ্ন শুনে ভুরু কোঁচকানো আশ্চর্যের কিছু নয়। তিনি ঠান্ডা গলায় বললেন, 'তোমার কী মনে হচ্ছে? আমি অন্য কিছু করছি? টিভির দিকে তাকিয়ে আমি কুনকে দিয়ে মোহর গুনছি?'

উমানাথবাবু বুঝলেন প্রশ্নটা ভুল হয়ে গেছে। সামলে নিয়ে বললেন, 'না না, তা বলিনি। টিভির আওয়াজটা কেমন গোলমাল করছে তো, তাই বলছিলাম।'

'টিভির আওয়াজ গোলমালে তোমার কোনও অসুবিধে হচ্ছে? তুমি তো টিভি দেখছ না,

টিভি দেখছি আমি। অসুবিধে হলে আমার হবে। বাজে কথা বলো কেন। রাত হয়েছে ঘুমিয়ে পড়ো।'

উমানাথবাবু মিনমিন করে বললেন, 'রাগ করছ কেন সুলেখা? আমি তো খারাপ কিছু বলিনি। টিভিটা সারিয়ে নেওয়ার কথা বলছিলাম। সারিয়ে নিলেই পারতে।'

সুলেখাদেবীর পান সাজা হয়ে গেছে। তিনি সেই পান মুখে পুরতে গিয়ে থমকে গেলেন। সুপুরি দেওয়া হয়েছে? নাকি ভুলে গেছেন? মনে রাগ থাকলে অনেক সময় ছোটখাটো ভুল হয়ে যায়। সুলেখাদেবী হাত নামিয়ে সাজা পান খুলতে খুলতে বললেন, 'ঠিকই, সারিয়ে নিলে পারতাম। বাড়ির একমাত্র রোজগেরে মানুষটা যদি আর পাঁচটা ভদ্র মানুষের মতো রোজগার করত তা হলেই সারিয়ে নিতাম। তোমাকে এত করে বলতে হত না!'

কম রোজগারের অভিযোগ কোনও হাসির কথা নয়। তবু উমানাথবাবু শুকনো ধরনের হাসলেন। এইসময় তিনি যে হাসতে চান এমন নয়। তবু হাসতে হয়। পঁচিশ বছরের অভ্যেস। যতবার তিনি গিন্নির কাছ থেকে একথা শোনেন ততবারই এরকম হয়। শুকনো ধরনের হাসেন। সম্ভবত অন্য কোনও উত্তর জানা নেই বলেই হাসতে হয়।

প্রথম প্রথম সুলেখাদেবী রেগে যেতেন। কাটা কাটা গলায় বলতেন, 'কম রোজগারের কথা শুনে বোকার মতো হাসছ কেন? তোমার কি মনে হচ্ছে আমি কোনও হাসির কথা বলছি? এই ভরসন্ধেতে সংসারের টানাটানি নিয়ে তোমার সঙ্গে রঙ্গরসিকতা করতে বসেছি?'

তখনও সুলেখাদেবী সন্ধের দিকে হালকা সাজগোজ করতেন। চোখে একটু কাজল দিতেন। গালে অল্প পাউডার। কপালে ছোট্ট একটা টিপ। বেশিরভাগ দিনই তার রং হত কালো। বেশ দেখাত। উমানাথবাবু আড়চোখে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতেন। তারপর ধমক শুনে মুখ নামিয়ে বলতেন, 'ছি ছি মজা করবে কেন? আসলে কী হয়েছে জানো, অফিসে সেদিন শুনলাম মাইনে বাড়বে। এবার না বাড়লেও সামনের বছর অবশ্যই বাড়বে। ক্লারিকাল পোস্টগুলো নিয়ে বেশি ভাবনাচিন্তা চলছে। ওপরের লেভেলের ভাবনাচিন্তা তো তাই সময় লাগছে।'

এরপর গলায় খানিকটা জোর আনার চেষ্টা করতেন উমানাথবাবু। বলতেন, 'হারামজাদারা টাকা না বাড়িয়ে যাবে কোথায়? অ্যাঁ, যাবে কোথায়? আর কারও না বাড়াক, আমারটা বাড়াতেই হবে। কেরানি হলে কী হবে আমি এই অফিসের কত পুরনো লোক জানো? একদিন নিয়ে যাবখন। দেখবে পিয়ন থেকে অফিসার সবাই কী খাতিরই না করে। উমানাথদা বলতে অজ্ঞান। এই বছরটা একটু কষ্ট করে সামলে নাও সুলেখা, পরের বছর অবস্থা পালটে যাবে।'

কথা শেষ করে আবার হাসতেন উমানাথ। সেই শুকনো ধরনের হাসি। আর সেটাই হত মারাত্মক। আগুনে যেন ঘি পড়ত। এক ফোঁটা নয়, এক শিশি ঘি।

সুলেখাদেবী চিৎকার করে উঠতেন।

'চুপ, একদম চুপ। হাসি বন্ধ করো। বন্ধ করো হাসি। লজ্জা করে না? কাপড় কাচা, বাসন মাজা থেকে শুরু করে দোকান-বাজার, ঘর ঝাঁট, সারাদিন দাসী-বাঁদির মতো কী না করাচ্ছ?

এর ওপর বাড়িওলা ভাড়া চাইতে আসছে, মুদির দোকানে মাসকাবারির টাকা বাকি। উনি পিয়ন অফিসারের খাতির দেখান। বিরাট খাতিরের লোক এসেছেন। দাঁত বের করে হাসেন। কাল যে বিল্টু- বুলির স্কুলের মাইনের দিন মনে আছে? খেয়াল আছে? ছি ছি। হাসছ কোন মুখে? লজ্জা করে না? মুখ নামিয়ে বসে থাকো। বসে থাকো মুখ নামিয়ে, বসে থাকো বলছি।'

বকুনির শেষের দিকটাতে সুলেখাদেবী সম্ভবত কেঁদে ফেলতেন। গলাটা ভেজা ভেজা লাগত। চোখের কাজলটা কি থেবড়ে যেত? উমানাথবাবুর ইচ্ছে করত একবার দেখি। পারতেন না। কারণ, তিনি তখন সত্যি সত্যি স্ত্রীর কথামতো মাথা নামিয়ে বসে থাকতেন। ক্ষতি কী? স্ত্রীর কথায় মাথা নামানোয় কোনও লজ্জা নেই। আহা, এতে যদি মেয়েটার দুঃখ একটু কমে।

রোজগারের প্রসঙ্গ এড়িয়ে উমানাথবাবু চাপা গলায় বললেন, 'কাল একটু সময় হবে সুলেখা? আমার সঙ্গে যাবে একটা জায়গায়?'

সুলেখাদেবী সাজা পান খুলে দেখলেন, না, সুপুরি দেওয়া হয়েছে। ফের পান মুড়ে মুখে দিলেন। স্বামীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বাঁ হাতের পিঠ দিয়ে ঠোঁট মুছে বললেন, 'কী ব্যাপার বলো তো? আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইছ! গত দশ বছরে তো এমন কথা শুনিনি। কী হল তোমার? শরীর-টরির খারাপ করছে নাকি?'

উমানাথবাবু লজ্জা পেলেন। কথাটা কীভাবে বলবেন? সুলেখা নিশ্চয় খুব হাসবে। হাসতে হাসতে ছেলেমেয়েদের ঘুম থেকে ডেকে তুলে না বসে। তুলে হয়তো বলল, 'ওরে, তোরা তোদের বাবার কাণ্ড শোন। এই বুড়ো বয়সে...। মাথাটা একেবারে গেছে মনে হচ্ছে রে বিল্টু।'

সে বড় লজ্জার হবে। ছেলেমেয়ের এসব না জানাই ভাল।

হাত বাড়িয়ে উমানাথ বললেন, 'একটা পান হবে? আচ্ছা, পান দিতে হবে না। সুপুরি দাও।'

সুলেখাদেবীর সুবিধের মনে হচ্ছে না। মানুষটার সত্যি সত্যি কিছু হয়েছে নাকি? দু'টুকরো সুপুরি এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'কী হয়েছে তোমার? অফিসে গোলমাল-টোলমাল কিছু নয় তো?'

উমানাথবাবু সোজা হয়ে বসলেন। সুপুরি মুখে ফেলে কোলের ওপর বালিশটা তুলে বললেন, 'না না, সেসব কিছু নয়। বলছি কী হয়েছে, তবে হাসতে পারবে না কিন্তু সুলেখা। কাউকে বলতেও পারবে না। সবাইকে ডেকেডুকে মাঝরাতে যে একটা হট্টগোল বাধিয়ে ফেলবে তা চলবে না। আগেই বলে রাখছি।'

'বাজে কথা ছেড়ে বলো কী হয়েছে।' সুলেখাদেবীর গলায় ধমকের সুর। ধমকের সঙ্গে অল্প উদ্বেগ।

গিন্নির কৌতূহলে উমানাথবাবু সামান্য উৎসাহ পেলেন। সরে এলেন একটু। কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বললেন, 'একটা কাণ্ড করে ফেলেছি সুলেখা। বোকার মতো কাণ্ড। সবাই মিলে এমনভাবে চেপে ধরল... প্রথমটায় রাজি হচ্ছিলাম না। বিশ্বাস

করো একদম রাজি হচ্ছিলাম না। পরিতোষ, তপনবাবু, প্রেমাংশুটা এমনভাবে বলতে লাগল...।'

উমানাথবাবু এক মুহূর্তের জন্য থামলেন। টিভির আওয়াজে খ্যাসখ্যাসে ভাবটা আরও বেড়েছে যেন। সুলেখাদেবী স্থির হয়ে তাকিয়ে আছেন স্বামীর দিকে। উমানাথবাবু ডান হাতের আঙুলগুলো মাথার অল্পক'টা চুলে নার্ভাসভাবে বোলালেন। তারপর বললেন, 'ওরা অমন করে বলল আমি শেষ পর্যন্ত পারলাম না।'

'কী পারলে না?'

উমানাথবাবু চোখ তুলে সরাসরি গিন্নির দিকে তাকালেন। কাঁচুমাচু মুখে বললেন, 'রাজি না হয়ে পারলাম না সুলেখা, আমি স্পোর্টসে নাম দিয়ে ফেলেছি। অফিসের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। কাল হবে। তুমি যাবে আমার সঙ্গে? ওরা তোমাকেও নিয়ে যেতে বলেছে।'

স্পোর্টস! মানে দৌড়-ঝাঁপ? সুলেখাদেবী নড়েচড়ে বসলেন। তিনি কি ঠিক শুনছেন? মনে হচ্ছে না, ঠিক শুনছেন। যে মানুষ প্রতিদিন ভাত খাওয়ার পর কম করে তিনটে চোঁয়া ঢেকুর তোলে, অমাবস্যা, পূর্ণিমায় যার ডান হাঁটুতে বাতের তেল মালিশ করতে হয়, শীত পড়বার মাসখানেক আগেই যাকে মাফলার বের করে দিতে হয়, সে যদি দৌড়-ঝাঁপের কথা বলে তা হলে 'ভুল শুনছি' মনে করাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তুমি কী বলছ। তুমি অফিসে দৌড়োতে যাবে? লাফাবে?'

উমানাথবাবু ভেবেছিলেন সুলেখা তাঁর কথা শুনে হেসে ফেলবে। তার বদলে গম্ভীর মুখ দেখে তিনি কিছুটা ঘাবড়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি হাত তুলে বললেন, 'না না, দৌড়োব কেন? কী যে বলো! এই বয়েসে কি ওসব হয় নাকি? হাই জাম্প, লং জাম্প, হান্ড্রেড মিটার্স সব ছেলেছোকরাদের জন্য থাকছে। আমার নাম নিয়েছে হাঁড়ি ভাঙাতে। ব্রেকিং দ্য জার।'

সুলেখাদেবী চোখ সরু করে বললেন, 'কী? কী জার?'

উমানাথবাবু লাজুক ভঙ্গিতে হাসলেন। বললেন, 'ব্রেকিং দ্য জার। হাঁড়ি ভাঙা। হাঁড়ি ভাঙা জানো না? কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে হাতে লাঠি ধরিয়ে দেবে, আর সেই চোখ বাঁধা অবস্থায় তোমায় হাঁড়ি ভাঙতে হবে। হাঁড়ি কেউ ভাঙতে পারে না। ওই যতটা কাছে গিয়ে লাঠি মারে আর কী। দেখতে বেশ মজা লাগে। প্রেমাংশু বলল, উমানাথদা, আপনি তো কোনওদিন অফিস স্পোর্টসে পার্টিসিপেট করেননি। এবার কিন্তু করতেই হবে। এই আপনার নাম লিখে রাখলাম। কাল সকালে মাঠে যেন দেখতে পাই। আমি বললাম, খেপেছ? আমি বাবা ওসবে নেই। এই বয়সে হাত-পা ভাঙব নাকি?'

স্বামীর কথার মাঝখানেই সুলেখাদেবী খাট থেকে নামলেন। টেবিলের ওপর পানের কৌটো রাখলেন। টিভির সুইচ বন্ধ করলেন। জল খেলেন এক গেলাস। তারপর ঘরের আলো নিভিয়ে খাটে এসে উঠলেন আবার। বালিশে মাথা রাখতে রাখতে বললেন, 'তারপর?'

অন্ধকারেই উমানাথবাবু বলে যেতে লাগলেন।

'তারপর আর কী, পরিতোষ বলল হাত-পা ভাঙবেন কেন দাদা? লাঠি তো আর নিজের

গায়ে মারছেন না। লাঠি মারবেন মাটির হাঁড়িতে। হাঁড়ির কাছে যেতে পারলেই হবে। সারা বছরই তো ভাঙা টাইপ মেশিন নিয়ে খুটুরখাটুর করছেন, একদিন না হয় লাঠি হাতে হাঁটবেন। বলো দেখি, কী ফাজিল। বলে কিনা লাঠি হাতে হাঁটবেন?'

সুলেখাদেবী ওপাশ ফিরে শুলেন। ঘুম জড়ানো গলায় বললেন, 'তুমি কী বললে?'

উমানাথবাবু খুশি হলেন। সুলেখা প্রশ্ন করছে। এটা ভাল লক্ষণ। মনে হচ্ছে, কাল সঙ্গে যেতেও রাজি হয়ে যাবে। হেসে বললেন, 'কী আর বলব? রাজি হয়ে গেলাম।' তারপর সামান্য ঝুঁকে বললেন, 'শুনেছি ভাল প্রাইজ় আছে। ফ্লাস্ক, টেবিল ল্যাম্প, জলের জাগ। ফ্লাস্কটা পেয়ে গেলে মন্দ হয় না। কী বলো মন্দ হয়? শীতের ক'টা দিন চা রাখা যাবে। যখন ইচ্ছে ঢেলে গরম গরম খাব। সুলেখা, অ্যাই সুলেখা, কাল চলো না। অনেকেই ফ্যামিলি নিয়ে যায়। শামিয়ানার নীচে চেয়ারে বসে থাকবে। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা আছে। মাঠেই প্যাকেট দেবে। ড্রাই লাঞ্চ। ড্রাই লাঞ্চ কী জানো? কাল দেখবে। যাবে? অ্যাই, বলো না যাবে?'

উমানাথবাবু ভয়ে ভয়ে স্ত্রীর গায়ে হাত রাখলেন। সামান্য নাড়া দিলেন। সুলেখাদেবী কোনও উত্তর দিলেন না। আবার নাড়া দিলেন উমানাথবাবু। এবার একটু জোরে। লাভ হল না। সুলেখাদেবী ঘুমিয়ে পড়েছেন।

মাইকে সন্তোষ বলছে—

'আপনারা মন দিয়ে শুনুন... শ্রীউমানাথ হালদার... শ্রীউমানাথ হালদার কোথায় আপনি? যেখানেই থাকুন, এগিয়ে আসুন। আমরা আবার জানাচ্ছি, আমাদের সহকর্মী উমানাথ হালদার হাঁড়ি ভাঙা প্রতিযোগিতায় প্রথম হয়েছেন।'

ঘোষণার মাঝখানেই হাততালি। সন্তোষ চুপ করল কয়েক মুহূর্ত। হাততালি কমলে বলতে শুরু করল ফের।

'উপস্থিত দর্শকবৃন্দ, আপনারা শুনে খুশি হবেন, উমানাথদা শুধু প্রথম হননি, তিনি রেকর্ড করেছেন। আমাদের অফিস স্পোর্টসের ইতিহাসে অনেক রকম ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু এরকম ঘটনা কখনও ঘটেনি। অনেকেই হাঁড়ির কাছাকাছি গেছেন, কেউ হাঁড়ির গায়ে লাঠি ছুঁয়েছেন, কিন্তু হাঁড়ি ভেঙে ফেলতে পারেননি। উমানাথদা পেরেছেন। আপনারা যাঁরা সেই সময় উপস্থিত ছিলেন তাঁরা নিজের চোখে দেখেছেন, চোখ বাঁধা অবস্থায় তিনি কীভাবে লাঠি মেরে হাঁড়ি ভাঙলেন। একটা মারেই মাটির হাঁড়ি তিন টুকরো হয়ে গেছে।'

মাঠের একপাশেই রঙিন শামিয়ানার তলায় পুরস্কার বিতরণীর অনুষ্ঠান চলছে। এতদিন অন্যরকম হত। স্পোর্টস হয়ে যাওয়ার ক'টা দিন পর মিউনিসিপ্যালিটির হল ভাড়া করে ফাংশন হত। এবার মিটিং-এ ঠিক হল, মাঠের অনুষ্ঠান মাঠেই শেষ হবে। গম্ভীর গান-আবৃত্তির সঙ্গে হাই জাম্প, লং জাম্প চলে না। মজা নষ্ট হয়ে যায়।

বাজে কথা বলার অন্যতম লক্ষণ হল বেশি কথা বলা। এই অফিসের অ্যাকাউন্টস বিভাগের তন্ময় হাজরার ঘটনা উলটো। সে খুবই কম কথা বলে এবং বাজে কথা বলে। ঘটনা উলটো হওয়ার কারণে সেই বাজে কথা চট করে ধরা কঠিন হয়। কিন্তু সেদিন মিটিং-এ সবাই ধরে ফেলল।

তন্ময় গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি মন্ত্রী নিয়ে আসব। এবার আমাদের চিফ গেস্ট হবেন মন্ত্রী। বিশেষ অতিথি। তিনি প্রাইজ দেবেন।'

সবাই একেবারে রে-রে করে উঠল। সব কিছুর একটা সীমা থাকে। অফিস স্পোর্টসে মন্ত্রী হবেন বিশেষ অতিথি! 'বস্তা দৌড়' আর 'যেমন খুশি সাজো'র পুরস্কার বিলি করতে আসবেন! ডাহা মিথ্যের মতো তন্ময় একটা ডাহা বাজে কথা বলেছে। আজ পর্যন্ত এই অনুষ্ঠানে লোকাল থানার ও.সি-র বেশি নামকরা কাউকে পাওয়া যায়নি। আর উনি শোনাচ্ছেন মন্ত্রীর গল্প! একবার তো ও.সি-ও জোটেনি। সে এক কেলেঙ্কারি। অনুষ্ঠান শুরুর আধঘণ্টা আগে থানায় গিয়ে জানা গেল, বড়বাবু নেই। তিনি ডাকাত ধরতে সুন্দরবনের দিকে গেছেন। ফিরতে কম করে তিন দিন। পাঁচ দিনও হতে পারে। তিন না পাঁচ নির্ভর করছে নদীর জোয়ার-ভাটার ওপর। সকলের মাথায় হাত। শেষ সময় অনেক কিছু পাওয়া যেতে পারে, 'বিশেষ অতিথি' পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত ঠিক হল, ও.সি-র বদলে ও.সি-র বউকে নিয়ে যেতে হবে। পাশেই কোয়ার্টার! গিয়ে একবার অনুরোধ করলে কেমন হয়? একবারে রাজি না হলে অনেকবার বলতে হবে। তেমন হলে, হাতে-পায়ে ধরতে হবে। মনে হয় না তাতেও মহিলা রাজি হবেন। তবু একটা শেষ চেষ্টা আর কী।

একবার বলতেই সেবার ও.সি-র বউ রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। এক গাল হেসে বললেন, 'একটু অপেক্ষা করুন ভাই। আমি তৈরি হয়ে আসছি। আপনারা গাড়ি এনেছেন? না আনলে অসুবিধে নেই। আমি থানা থেকে জিপ আনিয়ে নিচ্ছি।'

এক গা গয়না পরে সেবার হাসি হাসি মুখে তিনি পুরস্কার বিলি করলেন। গয়নার খুব প্রশংসা হয়েছিল।

তন্ময় ভুরু তুলে নাটকীয় গলায় বলল, 'মন্ত্রীর কথা বিশ্বাস হচ্ছে না তো?'

সবাই একসঙ্গে বলল, 'না, বিশ্বাস হচ্ছে না।'

তন্ময় মৃদু হেসে বলল, 'ঠিক আছে, বিশ্বাস কোরো না। আমি মন্ত্রী আনবই। সবাই চমকে যাবে।'

সবাইকে চমকে দিয়েই তন্ময় আজ মন্ত্রী এনেছে। হোমরাচোমরা কিছু নয়, ছোটখাটো মন্ত্রী। কিন্তু মন্ত্রী। গ্রামীণ ও অবলুপ্তপ্রায় লোকক্রীড়া দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী। খুব বড় ধরনের চুরিচামারি না করলে কাগজে এই ধরনের মন্ত্রীর নাম বা ছবি কোনওটাই ছাপা হয় না। দেখলে মন্ত্রী বলে মনেই হবে না। মনে হবে, নার্ভাস প্রকৃতির এই রোগাসোগা মানুষটা এইমাত্র ভিড় ঠেলে বাস থেকে নামলেন। তাঁকে খাতির করে শামিয়ানার তলায় বসানো হল। তন্ময় খুবই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। হাতের সামনে যাকে পাচ্ছে তাকেই ধমক লাগাচ্ছে। পর্যায়ক্রমে একবার চা, একবার ডাব, একবার কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়ে মন্ত্রীর কাছে ছুটে ছুটে যাচ্ছে। প্রতিবারই মনে করা হচ্ছে, মন্ত্রী মহাশয় এবার প্রত্যাখ্যান করবেন। করছেন না। সবই খাচ্ছেন। ঠান্ডার পর গরম, গরমের পর ঠান্ডা, তারপর আবার গরম। খাচ্ছেন এবং ঘনঘন নাকের ওপর ঝুলে পড়া চশমা ঠিক করছেন।

'বন্ধুগণ, বন্ধুগণ আপনারা শান্ত হন। আপনাদের জন্য আরও একটা সুখবর রয়েছে।

হাঁড়ি ভাঙা প্রতিযোগিতার জন্য আমরা সাধারণ পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু উমানাথ হালদার হাঁড়ি ভেঙে ফেলে অসাধারণ কাজ করেছেন। সাধারণ পুরস্কারে তাঁকে মানায় না। সেই কারণে একটু আগে আমরা, কমিটি মেম্বাররা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তাঁকে মেডেল দেওয়া হবে। মেডেল দিয়ে আমরা তাঁকে সম্মান জানাতে চাই। আপনারা হাততালি দিন। জোরে হাততালি দিন। এখন সেই মেডেল উমানাথ হালদারের গলায় পরিয়ে দেবেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়...।' হাততালির আওয়াজে সন্তোষের কথার শেষটুকু বোঝা গেল না।

উমানাথবাবু উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর হাঁটু দুটো কি কাঁপছে? হ্যাঁ, কাঁপছে। একটা ঘোরের মতো মনে হচ্ছে। ভয় করছে, আবার ভয় করছেও না। বিশ্বাস হচ্ছে না, আবার হচ্ছেও। মাথাটা টলটল করছে। শরীরটা মনে হচ্ছে হালকা হয়ে এসেছে। ফুরফুরে লাগছে। প্রেশারটা ঠিক আছে তো? মেডেল নেওয়ার সময় কি এরকমই হয়? মাথা টলটল করে? শরীর হালকা হয়ে আসে? হাঁটলে মনে হয় ভেসে যাচ্ছি!

ভিড় ঠেলে এগোতে লাগলেন উমানাথ। কেউ হাত জড়িয়ে ধরছে। কেউ কাঁধে হাত রাখছে। কেউ আবার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলছে, শাবাস, দাদা।'

সুলেখা পাশে থাকলে বেশ হত। বেচারি সংসারের জন্য অনেক কষ্ট করে। আজ নিশ্চয় খুশি হত। কে জানে, স্বামীর গলায় মেডেল দেখে ছেলেমানুষের মতো লাফালাফিই শুরু করে দিত হয়তো। পরে অফিসের সবাই খেপাত। বিশেষ করে পরিতোষটা যা ফাজিল! ঠিক বলত, 'বাপ রে, মেডেল দেখে সেদিন বউদি একটা কাণ্ড করেছিল বটে।' না, সুলেখা আসেনি ভালই হয়েছে। তার থেকে বরং বিল্টু আর বুলি এলে পারত। এতদিন ধরে দেখে আসা সামান্য বাবাটাকে হঠাৎ মেডেল পরা অবস্থায় দেখলে হয়তো চিনতেই পারত না। বুলি হয়তো মজা করে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করত, 'অ্যাই মশাই আপনি কে? আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না।'

বাড়ির সামনে রিকশা থামতেই উমানাথবাবুর বুকটা ধক করে উঠল। অন্ধকার কেন? আলো চলে গেছে? নাকি নেই কেউ? আশ্চর্য তো! এই ভরসন্ধেতে বাড়ি ফেলে সব গেল কোথায়? দরজায় তালা নিশ্চয়। তা হলেই হয়েছে কাণ্ড। বাড়ি ঢুকতে হচ্ছে না। বাইরে দাঁড়িয়ে কতক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে কে জানে।

দু'পা এগিয়ে এসে উমানাথ দেখলেন, না, তালা নয়। অন্ধকার বারান্দায় বুলি বসে আছে। একা। বাবাকে দেখে উঠে দাঁড়াল। গ্রিলের দরজা খুলে বলল, 'এসো।'

উমানাথবাবু অবাক গলায় বললেন, 'অন্ধকারে বসে আছিস কেন? তোর মা কই?'

'এসো বলছি।'

মেয়ের গলার আওয়াজে চমকে উঠলেন উমানাথবাবু। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'কী হয়েছে বুলি? তোর মা কোথায়?'

'মা থানায় গেছে।'

'থানায়!'

বুলি কান্নাভেজা গলায় বলল, 'হ্যাঁ, থানায়। দাদাকে দুপুরে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে।'

উমানাথবাবুর পা টলে উঠল। তিনি দ্রুত হাত বাড়িয়ে গ্রিলের দরজাটা ধরে ফেললেন। কখন জানি রিকশাওলাটা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। গম্ভীর এবং বিরক্ত গলায় সে বলল, 'এগুলোর কী হবে? কোথায় রাখব?'

উমানাথবাবু মুখ ফিরিয়ে অন্ধকারেই দেখলেন লোকটার হাতে ভাঙা মাটির হাঁড়ির কতগুলো টুকরো।

২

টানা তিন দিন ফ্যাঁস ফ্যাঁস করবার পর আজ সকাল থেকে টিভিতে কোনও শব্দ নেই। তবে ছবি দেখা যাচ্ছে। শব্দহীন ছবি। সেই শব্দহীন ছবি নিয়েই টিভি চলছে। এখন অবশ্য সিরিয়াল হচ্ছে না। বিদেশি চ্যানেলে বাথরুম বিষয়ে একটা প্রোগ্রাম চলছে। দামি হোটেলের বাথরুম। প্রোগ্রামে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধরনের বাথটাব, কমোড, বেসিন দেখা যাচ্ছে। লাল জামা পরা একজন ছোট চুলের মেমসাহেব ছুটে ছুটে গিয়ে কখনও বাথটাবে স্নান করছে, কখনও বেসিনে মুখ ধুচ্ছে, কখনও আবার কমোডে বসে পড়ছে ধপাস করে। বসার সময় ফিক করে হেসে সামনের ফিনফিনে পরদাটা টেনে নিচ্ছে। আওয়াজ না থাকার কারণে গোটা অনুষ্ঠানটাই লাগছে কার্টুন ছবির মতো।

সুলেখাদেবী আজও টিভির দিকে তাকিয়ে আছেন, তবে খাটে বসে নেই। তিনি বসে আছেন মোড়ায়। স্থির হয়ে। হাত দুটো কোলের ওপর রাখা। পাশে নিচু বেতের টেবিলে থালা রেখে রাতের খাওয়া সারছেন উমানাথ। রুটি, আলু-পোস্তর তরকারি আর মুসুরির ডাল। পাশে ছোট বাটিতে অল্প দুধ। তাতে বেশি করে চিনি দেওয়া। শেষ রুটিটা উমানাথবাবু দুধে ভিজিয়ে খান।

উমানাথবাবুর খুব ইচ্ছে করছে, সুলেখাকে বলেন, তার খাবারটাও নিয়ে আসতে। তারপর দু'জনে মিলে একসঙ্গে খেতে। কথাটা বলতে সাহস হচ্ছে না। বাড়িতে যা ঘটে গেছে তাতে এই ধরনের কথা বলা কঠিন। উমানাথবাবু তাও চেষ্টা করছেন। মনে সাহস আনার চেষ্টা করছেন।

শুধু স্ত্রীকে একসঙ্গে খেতে বলা নয়, উমানাথবাবুর আজ বড় ধরনের পরিকল্পনা ছিল। বাড়ি আসবার সময় রিকশাতে বসেই গোটা পরিকল্পনাটা নিজের মনে ঝালিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর প্রস্তাব শুনে কে কী বলতে পারে, উত্তরে তিনি কী বলবেন—সবটাই ভাবা হয়ে গিয়েছিল। একবারে নাটকের মতো। তিনি ঠিক করেছিলেন, আজ রাতের খাওয়ার সময় ছেলেমেয়েকেও ডেকে নেবেন। বলবেন, 'আয়, আজ আমরা সবাই একসঙ্গে খেতে বসি।' বললেই যে সবাই ছুটে চলে আসত এমন নয়। বিল্টুটার সবসময় ছটফটানি। সে অবধারিতভাবে বলত, 'একসঙ্গে খ.ব! খেপেছ নাকি বাবা? নাওয়া-খাওয়ার সময় আছে আমার? নতুন প্রজেক্টে হাত দিতে চলেছি। এবার পার্টনার সলিড।

তোমরা খেয়ে নাও। আমার বারোটার আগে কোনও চান্স নেই। ব্যাঙ্ক লোনের কাগজপত্র নিয়ে বিস্তর ঝামেলায় আছি।'

বুলির ছটফটানি নেই। তবে মা আর মাসির পাল্লায় পড়ে মেয়েটার মাথা বিগড়েছে। বিয়ের কারণে তাকে নাকি এখন নানা ধরনের নিয়মকানুনের মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। আটটার মধ্যে রাতের খাওয়া সারতে হবে। ন'টার মধ্যে সোজা বিছানায়, ঘুম না পেলেও জোর করে চোখ বুজে শুয়ে থাকা চাই। বেশি রাত পর্যন্ত চোখ খোলা রাখার মানে নাকি একটাই। চোখের তলায় কালি ফেলা। কালো মেয়ের তো সবই কালো, তার আবার চোখের তলায় কালি কীসের? উমানাথবাবু বুঝতে পারেন না। তবে এইটুকু বোঝেন বুলিও এসব উদ্ভট নিয়মকানুনে খুশি। বাবার প্রস্তাব শুনে সে বলত, 'একসঙ্গে খাব! বাবা, তুমি বোধহয় জানো না আমার অনেক আগেই খাওয়া হয়ে গেছে। এখন আমার ঘুমোতে যাওয়ার সময়। ঘুম না পেলে চোখ বুজে শুয়ে থাকব। একটা জিনিস হতে পারে। আমি তোমাদের সঙ্গে চোখ বুজে বসে থাকতে পারি। চলবে?'

পরিকল্পনার সময়তেই উমানাথবাবু জানতেন সব থেকে ঝামেলার জায়গাটা সুলেখা। তাকে রাজি করানোটাই হবে আসল ব্যাপার। সুলেখা বিশ্বাস করে, তার স্বামীর মতামতের যেমন কোনও মূল্য নেই, তেমনই তার যে-কোনও পরিকল্পনাই সংসারের পক্ষে অতি বিপজ্জনক। একসঙ্গে খেতে বসার পিছনেও নিশ্চয় কোনও বিপদ লুকিয়ে আছে। সে তখন কঠিন জিজ্ঞাসাবাদের মধ্যে দিয়ে যেতে চেষ্টা করবে। জানতে চাইবে বিপদটা ঠিক কোন ধরনের। বড়, না ছোট? নাকি মাঝারি?

ভাবা ছিল, এরকম একটা টানাপোড়েনের সময় উমানাথবাবু হাসবেন। প্রথমে অল্প অল্প। পরে বেশি। হাসতে হাসতে বলবেন, 'ঠিক আছে বোসো না। ভেবেছিলাম, আজ তোমাদের একটা দারুণ খবর দেব। সেটা আর বলা হল না।'

উমানাথবাবু নিশ্চিত সুলেখা এই সময় ঠোঁট বেঁকিয়ে বলত, 'বুড়ো বয়সে ঢঙ কোরো না। তোমার আবার দারুণ খবর!'

বুলি নির্লিপ্ত মুখে বলত, 'তোমার দারুণ খবর আমার জানা আছে বাবা। নিশ্চয় পুরনো কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। সে তোমায় জোর করে চায়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে চা আর বিস্কুট খাইয়েছে।'

বিল্টু চোখ নাচিয়ে বলবে, 'আমার কী মনে হয় জানিস বুলি? আমার মনে হয়, বাবার কোনও কলিগ পুরী গিয়েছিল। বাবার জন্য একটা বড় সাইজের গামছা এনেছে। গামছা বাবার বিরাট ফেভারিট জিনিস। কী বাবা আমি ঠিক বলেছি? তুমি গামছা পেয়েছ। তাই না?'

উমানাথবাবুর ভাবা ছিল, এইরকম একটা সময় তিনি আসল কাজটা করবেন। দু'হাত পাশে ছড়িয়ে বলবেন, 'পেয়েছি ঠিকই, তবে গামছা নয়। মেডেল। মেডেল পেয়েছি।'

কে বেশি চমকাবে? রিকশাতে বসে অনেক ভেবেছেন উমানাথ। নিশ্চিত হতে পারেননি। একবার মনে হয়েছে স্ত্রী, একবার মনে হয়েছে মেয়ে। বিল্টু যে চমকাবে না এমন নয়, তবে সেটা বুঝতে দেবে না। আজকালকার ছেলেরা স্মার্ট হয়। চট করে কিছু

বুঝতে দেয় না। তবে চমকালেও সুলেখা মুখে কিছু বলবে না। হাতের কাজ থামিয়ে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। সন্দেহের চোখে তাকিয়ে থাকবে। বুলি লাফিয়ে উঠবে। চোখ কপালে তুলে বলবে, 'অসম্ভব। বিশ্বাস করি না। তুমি মেডেল পেয়েছ! কই দেখি। দেখাও তো।'

উমানাথবাবুর ভাবা ছিল, এবার আর হাসবেন না। গম্ভীর হয়ে বলবেন 'উঁহু এখন নয়। এসো আগে সবাই মিলে খেতে বসি। খেতে খেতে অফিসের ব্যাগ থেকে বের করব। শুধু মেডেল নয়। ভাঙা হাঁড়িটাও দেখাব।'

বুলি বলবে, 'সেটাও কি তোমার ব্যাগে আছে নাকি!'

'দূর, ব্যাগে থাকবে কেন? কী যে বোকার মতো বলিস! পরিতোষরা জোর করে রিকশাতে তুলে দিল। দেওয়ার সময় বলল, সঙ্গে নিয়ে যান। চোখ বাঁধা অবস্থায় ভেঙেছেন। চাট্টিখানি কথা নয়। আসলে ছেলেগুলো বিরাট ফাজিল। কী আর করব, মাটির টুকরোগুলো এনে বাইরে রেখে দিয়েছি। খাওয়ার পর দেখাব।' এরপর গিন্নির দিকে তাকিয়ে বলবেন, 'হ্যাঁগো, বাইরের বাল্‌বটা ঠিক আছে তো?'

বুলি বলবে, 'ঠিক না থাকলে কোনও চিন্তা নেই। আমরা টর্চ জ্বেলে তোমার ভাঙা হাঁড়ি দেখব।'

বিল্টু বোনকে ধমকে দিয়ে বলবে, 'কেন? টর্চ জ্বেলে দেখব কেন? টুকরোগুলো ঘরের ভেতর আনতে অসুবিধে কোথায়? প্রত্নতাত্ত্বিক যুগের মাটির বাসনপত্রের মতো এরও একটা দাম আছে। তাই না বাবা?'

এবার বিল্টু-বুলির মা কি কিছু বলবে? বলতে পারে, আবার নাও বলতে পারে। উমানাথবাবু এখানটায় একটু ধাঁধার মধ্যে আছেন। ভাঙা হাঁড়ি তারও কি দেখতে ইচ্ছে করবে না? নিশ্চয় করবে। কিন্তু মুখে বলতে লজ্জা পাবে। তখন হয়তো রাগের ভান করে বলবে, 'খবরদার, খবরদার বলে দিচ্ছি, ওই মাটির ঢেলা কিছুতেই ঘরে ঢোকানো চলবে না।'

আসলে এসব কিছুই হয়নি। মেডেলের কথা বাড়িতে বলতেই পারেননি উমানাথ। পারবেন কী করে? খানিক আগে ছেলেকে নিয়ে থানা থেকে ফিরল সুলেখা। বাড়িতে এসেই নিজের ঘরে ঢুকে দরজা আটকে দিয়েছে বিল্টু। মাথা ধরেছে বলে বুলিও না খেয়ে শুয়ে পড়েছে। এই অবস্থায় অতি তুচ্ছ এই মেডেলের কথা কি বলা যায়?

উমানাথবাবু নরম গলায় বললেন, 'সুলেখা, তোমার খাবারটা নিয়ে এসো না। দু'জনে মিলে খাই।'

সুলেখাদেবী চুপ করে বসে রইলেন।

উমানাথবাবু আবার বললেন, 'সুলেখা, যাও নিয়ে এসো।'

সুলেখাদেবী এবারও বসেই রইলেন।

উমানাথবাবু গলা আরও নরম করে বললেন, 'এত চিন্তা করছ কেন? বিল্টুকে তো পুলিশ ছেড়ে দিয়েছে। বিল্টুর তো কোনও দোষ নেই। দোষ নেই বলেই তো ছেড়েছে। ওর পার্টনারটাই মিথ্যে বলে ওকে ফাঁসাতে চাইছিল। পারল না তো। পারবে কী করে?

বিল্টুর কাছে তো কাগজপত্র সব আছে। আসলে কী জানো, ব্যাবসা করতে গেলে এরকম একটু- আধটু ঝামেলা হয়। সেই ঝামেলা...'

সুলেখাদেবী যেন এইজন্যই অপেক্ষা করছিলেন। স্বামীর কথা শেষ হওয়ার আগেই মুখ ঘুরিয়ে ফোঁস করে উঠলেন।

'একটু-আধটু! এটা একটু-আধটু হল? কথাটা বলতে তোমার লজ্জা করছে না? কোথায় ছিলে তুমি? কোথায় ছিলে? ছেলেকে পুলিশ ধরে নিয়ে যাচ্ছে আর বুড়ো বাবা মাঠে গিয়ে দৌড়োচ্ছে। ছিঃ! বলতে লজ্জা করছে না? কাগজপত্রগুলো নিয়ে আমি থানায় না ছুটলে পুলিশ বিল্টুকে ছাড়ত? কী ভেবেছ? ছাড়ত ছেলেটাকে? হাজতে বসে পচতে হত। তাই ভাল ছিল। যে-ছেলের বাবা এরকম তার হাজতে বসে পচাই উচিত।'

উমানাথবাবু মুখ নামিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'আমাকে বলছ কেন? আমি তো ওকে ব্যাবসা করতে বলিনি।'

'তোমাকে বলব না তো কাকে বলব? কী করেছ তুমি ছেলেমেয়ের জন্য? আমার জন্য? কী পারো তুমি? ছেলের একটা চাকরি জোগাড় করে দিতে পেরেছ?'

'আজকাল চাকরি জোগাড় করা অত সহজ নয় সুলেখা। তুমি তো জানো। জানো না তুমি?'

সুলেখাদেবী এবার পুরোটা ঘুরে বসলেন। চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'বাবা, সারাদিন মাঠে লাফঝাঁপ দিয়ে এসে গলার খুব জোর বেড়েছে দেখছি! ছেলের চাকরি না পারো মেয়ের জন্য একটা পাত্র তো এনে দিতে পারতে। না কি সেটাও আজকাল পাওয়া কঠিন?'

এই সময় কারও মিষ্টির কথা মনে পড়ার কথা নয়, তবু উমানাথবাবুর মনে পড়ে গেল। কুড়ি টাকার সন্দেশ। আসার পথে রিকশা থামিয়ে কিনেছিলেন। ভেবেছিলেন, বাড়িতে থাকা ভাল। বলা তো যায় না, হুট করে যদি কেউ এসে পড়ে। তারপর সুলেখার কাছে মেডেলের গল্প শুনে হয়তো মিষ্টি খেতে চেয়ে বসল। ঘরে কিছু না থাকলে সে একটা লজ্জার ব্যাপার হবে। সেই কারণেই কেনা। ইস, বাক্সটা ব্যাগের মধ্যেই রয়ে গেছে। পিঁপড়ে ধরে গেল নাকি? ধরাটা স্বাভাবিক। এতক্ষণ ধরে রয়েছে। নষ্ট না হয়ে যায়। এই বাজারে কুড়ি টাকা কম নয়।

সুলেখাদেবী বলতে থাকলেন, 'কী হল, কথা বলছ না যে? কষ্ট হচ্ছে? বুড়ো বয়সে মাঠে গিয়ে লাফাতে পারো আর বউয়ের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে নিয়ে দুটো কথা বলতে কষ্ট হয়? হাঁপ ধরে?'

উমানাথবাবু থালা সরিয়ে উঠে পড়লেন। ঠান্ডা গলায় বললেন, 'কী বলব বলো? বুলির জন্য তো তোমরাই ছেলে দেখছ। আমি আর নতুন করে কী করব? প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা ক'টার জন্য অফিসে বলে রেখেছি। কাঁথির ওরা নিশ্চয় রাজি হয়ে যাবে। রাজি হয়ে গেলেই একটা অ্যাপ্লিকেশন করে দেব।'

এতক্ষণ পর মুখ নামালেন সুলেখাদেবী। বেশ খানিকটা সময় চুপ করে রইলেন। তারপর নিচু গলায় বললেন, 'কাঁথির ওরা খবর পাঠিয়েছে। মেয়ে পছন্দ হলেও মেয়ের

গায়ের রং ওদের পছন্দ হয়নি। ছেলে রাজি নয়। আমি জানতাম এরকম একটা কিছু হবে। আরও হবে। হোক, যত খুশি হোক। যে বাবার মেয়ে বিয়ে দেওয়ার মুরোদ নেই...।'

কথা শেষ হল না। তার আগেই কান্না শুরু হল। উমানাথবাবু দেখেছেন সুলেখার এই এক অসুবিধে। অনেক দিনের অসুবিধে। সে উঁচু গলায় ধমক দিয়ে শুরু করে ঠিকই, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে পারে না। কেঁদে ফেলে। চাপা, ফিসফিসে ধরনের কান্না। এই ধরনের কান্না সহজে থামতে চায় না। অনেকক্ষণ চলে। চলতেই থাকে।

উমানাথবাবু টিভির দিকে তাকালেন। বাথরুমের অনুষ্ঠান শেষ। এবার খাওয়াদাওয়া দেখাচ্ছে। অচেনা সব খাবার। খাবার দেখে মিষ্টির কথাটা আবার মনে পড়ে গেল। না, বাড়িতে ঢুকেই জিনিসটা বের করে রাখা উচিত ছিল। মস্ত ভুল হয়ে গেছে। আসলে থানা-পুলিশে সব গোলমাল হয়ে গেল। শুধু মিষ্টি কেন? আসল জিনিসটাও ব্যাগে আছে। ছোট্ট বাক্সের ভেতর। বাক্সের গায়ে সবুজ ভেলভেট। হাত বোলালে আরাম লাগে। জিনিসটা ঠিকঠাক আছে তো? দেখতে পারলে হত। বড় সুন্দর দেখতে। শেষ বিকেলের আলো পড়ে ঝলমল করছিল। হঠাৎ দেখে মনে হয়েছিল সোনার! সোনার মেডেল! তাতে লাল ফিতে বাঁধা। পরিতোষ মজা করে বলল, 'সোনা বলে ভুল করবেন না দাদা। এটা আসলে মাটির মেডেল। মাটির হাঁড়ি ভাঙার জন্য মাটির মেডেল। সাবধানে রাখবেন। ভেঙে না যায়।'

আহা, একবার যদি দেখা যেত। ঠিক আছে, না দেখলেও হবে। হাত দিয়ে ছুঁলেই হবে। সুলেখাকে লুকিয়ে যাবে নাকি? ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে জিনিসটা একবার ছুঁয়ে আসবে?

নিজের ছেলেমানুষিতে নিজেই হেসে ফেললেন উমানাথবাবু। বাথরুমের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে নিজের মনে হাসতে হাসতে শুনতে পেলেন সুলেখাদেবী তখনও কাঁদছেন। চাপা, ফিসফিসে ধরনের কান্না।

রাত ক'টা? দুটো? তিনটে? নাকি আরও বেশি? মানুষগুলো তো ঘুমোচ্ছেই, মনে হচ্ছে বাড়িটাও ঘুমিয়ে পড়েছে। মাথার কাছের জানলাটার ফাঁকফোকর দিয়ে আলো আসছে। নীল, আবছা আলো। কীসের আলো? চাঁদের? চাঁদের আলো এই ঘরে ঢোকে নাকি! কই কখনও তো খেয়াল হয়নি!

খাট থেকে নামলেন উমানাথবাবু। পা টিপে টিপে পৌঁছোলেন ব্যাগের কাছে। সাবধান, আওয়াজ যেন না হয়। ঘুম যেন ভেঙে না যায় সুলেখার। না জানি বেচারি কত রাত পর্যন্ত জেগে থেকেছে। জেগে থেকে কেঁদেছে কি?

মেডেলটাকে শুধু একবারে ছুঁয়ে দেখতে অন্ধকারেই নিঃশব্দে ব্যাগ হাতড়াচ্ছেন উমানাথবাবু। হাতড়ে চলেছেন।

দেশ, ১৭ সেপ্টেম্বর ২০০৬

রক ফেস্টিভাল

বামাচরণ কবিরাজ লেনে জরুরি মিটিং বসেছে। মিটিং-এ গলির বড়, মেজ, ছোট— তিন প্রজন্মই হাজির। কত বছর পরে যে সকলে একসঙ্গে বসল, কেউ মনে করতে পারছে না। যদিও আলোচনা মোটেই শান্তিপূর্ণ হচ্ছে না। যত সময় যাচ্ছে, মিটিং তত উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। উত্তপ্ত হয়ে ওঠারই কথা। ষোলো থেকে ছাব্বিশের স্লট অতি আশ্চর্য এবং উদ্ভট এক প্রস্তাব নিয়ে এসেছে। গলির 'বড়' এবং 'মেজ' প্রজন্ম সেই প্রস্তাব শুনে আকাশ থেকে পড়েছে। এমনটা আবার হয় নাকি! হয়েছে কখনও? ষোলো থেকে বাইশের দল বলছে, 'না হয়নি। এটাই প্রথম হবে।' বয়স্করা বলছে 'অসম্ভব। অর্থহীন। পাগলামি।' ষোলো থেকে বাইশ বলছে, 'আমরা পাগলামিই করব। পাগলামি করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেব।'

সত্যি পাগলামি। বামাচরণ কবিরাজ লেনের ছেলেমেয়ের দল ঠিক করেছে, এই বসন্তে তারা...।

ওদিকে মিটিং চলুক। এই ফাঁকে বামাচরণ কবিরাজ লেনের একটু পরিচয় দেওয়া যাক।

শান্তশিষ্ট, লাজুক ধরনের গলি। গলির মুখে বেঁটেখাটো একটি ল্যাম্পপোস্ট রয়েছে। জরাজীর্ণ, বয়সের ভারে ক্লান্ত। একসময় বলা হত, এটি নাকি ব্রিটিশ আমলের গ্যাসবাতি। তথ্য নিয়ে বিতর্ক থাকলেও জিনিসটি নিয়ে গলির বাসিন্দাদের চাপা গর্ব ছিল। বহু বছর আগে একবার চাঁদা তুলে রংও করা হয়েছিল। কালচে সবুজ। রং নিয়ে আপত্তি উঠলে বৃদ্ধরা চোখ পাকিয়ে বলেছিলেন, 'বেশি বোকো না হে। ব্রিটিশ আমলে এমনটাই নিয়ম ছিল। জিনিস যখন তাদের, নিয়মও তাদের মতো হবে।' দীর্ঘ অযত্ন, অবহেলায় সেই ল্যাম্পপোস্টে মরচে পড়েছে। বাইরের ল্যাম্পপোস্টটি (মতান্তরে গ্যাসবাতি) নড়বড়ে হয়ে গেলেও, গলির ভেতরের সারি সারি বাড়ি এখনও খুবই শক্তসমর্থ। দোতলা, তিন তলা, সাড়ে তিন তলা। একটার ঘাড়ে আর একটা। ছাদে ছাদে বাটিচচ্চড়ি, পোস্তর বড়া, চিংড়িমাছের মালাইকারি আর ভুল বানানে 'তোমারি বিরহে কাঁদে মম প্রাণ' লেখা প্রেমপত্র চালাচালির চমৎকার সিস্টেম ছিল। দুপুরে কার্নিশে বসে ঝিম ধরা গলায় পায়রা ডাকত, বিকেলে গলির সরু আকাশে পেটকাটি, চাঁদিয়ালে প্যাঁচ চলত প্রবলবিক্রমে। ব্যাকগ্রাউন্ডে শাঁখের আওয়াজ নিয়ে সন্ধের পর ঘরে ঘরে হলুদ বাল্‌ব জ্বলে উঠত। ছেলেমেয়েরা নামতা মুখস্থ করত গলা ফাটিয়ে। ভেসে আসত রান্নার ছ্যাঁকছোঁক। এখন কোথায় বাটিচচ্চড়ি? কোথায় পেটকাটি চাঁদিয়াল? কোথায় বা টিমটিমে হলুদ আলো? সব পালটে গেছে। আজ ঘরে ঘরে চাপা গলায় টিভি খবর বলে, চিৎকার করে ইন্ডিয়ান আইডল খোঁজে। মাইক্রোওভেনে চিকেন বা পমফ্লেট মাছ শুয়ে থাকে পরমানন্দে, রোস্ট হয় চুপিচুপি।

গভীর রাতে বামাচরণ কবিরাজ লেনের কিশোর ল্যাপটপে প্রেম চালায় নর্থ ক্যারোলিনাবাসী চিনা তরুণীর সঙ্গে। ভাইটাল স্ট্যাটিস্টিক্সের খবর জেনে নার্ভাস হাতে কপালের ঘাম মোছে।

তবে সব পালটায়নি। কিছু জিনিস রয়েছে একইরকম। সেই বাড়ি, সেই ছাদ যেমন আছে, তেমনই আছে রোয়াক। রোগা, মোটা, লম্বা, বেঁটে নানা চেহারায়, নানা সাইজে। প্রতিটা বাড়ির নীচে ঝকঝকে তকতকে হয়ে শুয়ে আছে চিতপটাং হয়ে। কোনওটা লাল, কোনওটা ধূসর। কোনওটায় শখ করে পাথরের টুকরো বসানো। প্রপিতামহের শখ ছিল। এখন একাকী থাকলেও বছরের পর বছর এইসব রোয়াক বামাচরণ কবিরাজ লেনের বাসিন্দাদের দুরন্ত সার্ভিস দিয়েছে। সকালে খবরের কাগজ আর চায়ের ভাঁড় সহযোগে রাজনীতির রাজা-উজিররা ধরাশায়ী হয়েছে পটাপট। কতবার যে এই গলির আলোচনায় গভর্নমেন্টের পতন হয়েছে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই। সরকার ফেলেই সবাই ছুটেছে অফিসের জন্য তৈরি হতে। শীতের দুপুরে রকের দখল থাকত মহিলাদের কবজায়। উল কাঁটা হাতে নেমে আসতেন তাঁরা। রোদে পিঠ রেখে দুটো সোজা একটা উলটোর জটিল নকশায় ঢুকতে ঢুকতে গভীর আনন্দে উত্তম-সুচিত্রা আর পরচর্চায় ডুব দিতেন। বিকেলে রোদ পড়লে বৃদ্ধদের বৈঠকখানা সেজে স্মৃতিকথা শুনতে হত এই রোয়াককেই। শুনতে শুনতে তারাও বিশ্বাস করত, আহা, এক পয়সার যুগ কত ভালই না ছিল! দুধ টু চোনা— সব খাঁটি ছিল। সন্ধের পর অফিস ফেরত বাবুরা বড় বড় কড়া নেড়ে বাড়ি ঢোকার আগে এই রোয়াকেই ক্যাম্বিসের ব্যাগ আর ছাতা ফেলে গোল মিস করা মোহনবাগানের গুষ্টির তুষ্টি করতেন গলা খুলে। তারা জায়গা ছাড়লে ছেলে-ছোকরারা ছড়িয়ে ছিটিয়ে দখল নিত গোটা রোয়াক সাম্রাজ্য। এ বাড়ির দোতলা, ও বাড়ির আড়াই তলা থেকে ছিটকে আসা আবছা আলোয় আলুকাবলি, ঘুগনি সহযোগে পলিটিক্স থেকে দুর্গা পুজোর প্ল্যান, ফুটবল থেকে কাব্যচর্চার ঝড় উঠত। হাতের মুঠোয় লুকিয়ে জ্বলত বিড়ি-সিগারেটের আগুন। ও পাশের তিন তলা থেকে 'মিত্তির জেঠিমা', এ পাশের দোতলা থেকে 'ন'কাকিমা' দেখে না ফেলে। মাঝে মাঝে পটলা বা গোবিন্দ ঠোঁটে আঙুল রেখে বলত— শ্ শ্ শ্। ত্রস্ত পায়ে চলে যাওয়া অচেনা কিশোরীকে দেখে বেসুরো চাপা গলায় গেয়ে উঠত— 'কে তুমি নন্দিনী? আগে তো দেখিনি...'

বামাচরণ কবিরাজ লেনের রোয়াক গার্জেন সেজে চোখ পাকিয়ে ধমক দিয়েছে কতবার। 'অ্যাই বাঁদর ছেলে। রকবাজের দল সব। হচ্ছেটা কী? বাড়ি গিয়ে পড়তে বস।' দুর্ভাগ্যের বিষয় ধমক শোনা যেত না। গান চলত।

রকের এই রমরমা চুকেবুকে গেছে অনেককাল। বামাচরণ কবিরাজ লেনের রক আজও আছে, কিন্তু সেখানে বসার মানুষ নেই। দিনরাত খাঁ খাঁ করে। বৈশাখ মাসের রোদে কখনও সখনও সেলসম্যানের দল জিরিয়ে নেয় ছায়ায়। কাগজের বাক্স থেকে শুকনো স্যান্ডউইচ বের করে চিবিয়ে লাঞ্চ সারে। বোতল থেকে জল খায়। বৃষ্টিতে গলি জলে থইথই করলে, নেড়ি কুকুর সেখানে উঠে লেজ গুটিয়ে উদাসীন মুখে শুয়ে পড়ে। ভাবটা এমন যেন, 'সবই মায়ের খেলা। আজ আছে কাল নেই।' সকালে স্কুলের বাস ধরতে এসে খুদে খুদে

ছেলেমেয়েরা বিশ-মনি ব্যাগ কাঁধ থেকে নামিয়ে রাখে এই রোয়াকেই। রাইমস মুখস্থ করে ঘুম ঘুম চোখে। বাকি সময়গুলো শুনশান।

বামাচরণ কবিরাজ লেনের ছেলে-ছোকরার দল তাদের গলি এই রোয়াক নিয়েই হঠাৎ মেতেছে! প্ল্যান করেছে, সামনের বসন্তে হবে অনুষ্ঠান!

বদিনাথ চট্টোপাধ্যায় গলির প্রাচীনতম বাসিন্দা। ছিয়াশিতে পা দেবেন দেবেন করছেন। মিটিং-এর মাঝখানে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, 'গলির রোয়াকে আবার অনুষ্ঠান কী বাছারা! আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কলেজে অঙ্কুরের সেকেন্ড ইয়ার চলছে। সে গলা তুলে বলল, 'এখনই বোঝার কিছু নেই দাদু। প্রোগ্রাম হলে দেখবেন।'

শীলবাবু সরকারি অফিসের সেকশন অফিসার। সহজে ফাইল ছাড়া ধাতে নেই। চশমা তুলে বললেন, 'মজা হবে কী করে বুঝলে? তোমাদের প্ল্যান-প্রোগ্রাম তো কিছুই বলছ না। মজার বদলে দুঃখও তো হতে পারে। পারে না?'

ঋষভ হোটেল ম্যানেজমেন্টের ফাইনালে দুর্দান্ত রেজাল্ট করেছে। ক্যাম্পাস ইন্টারভিউতেই তিন-তিনটে চাকরির অফার এসেছে। একটাও নেয়নি। সে ফিল্মমেকার হতে চায়। শুরু করবে ডকুমেন্টারি দিয়ে। প্রথম কাজ— 'কলকাতার গলি। গলির কলকাতা।' স্বাভাবিক কারণেই তার উৎসাহ খুব বেশি। মাথা খাটিয়ে অনুষ্ঠানে বেশ কিছু আইটেম ঢুকিয়েছে। সে বলল, 'একবার আমাদের হাতে ছেড়েই দেখুন না কাকু।'

বিমল কাশ্যপ ব্যাবসায়ী মানুষ। লাভ-ক্ষতি ছাড়া কোনও কিছু নিয়ে মাথা ঘামানো তাঁর পছন্দ নয়। বিরক্ত গলায় বললেন, 'সামান্য রোয়াক নিয়ে তোমরা হঠাৎ খেপে উঠলে কেন বুঝতে পারছি না। একটা সময় এসবের কদর ছিল। আমরা তোমাদের বয়সে ওখানে বসে গুলতানি দিয়েছি। সেসব তো এখন উঠে গেছে।'

বিমলবাবুর কন্যা রাই। সে জিনস পরে থাকার কারণে ফরাসে বসে কথা বলতে পারছে না। বসেছে জানলার গায়ে। এক হাতে জানলার রড ধরে ঝগড়া ঝগড়া গলায় বলল, 'রকে বসে গুলতানির যুগ শেষ বাপি। বাট স্টিল উই হ্যাভ দ্য রকস। ওরা এখনও আছে। কলকাতার গলি থেকে তো সেগুলো আর ছেঁটে ফেলা যাবে না। আসলে এই অনুষ্ঠানটা করে আমরা একটা ট্রেন্ড সেট করতে চাইছি। একটা এগজাম্পেল বলতে পারো। এক্সপেরিমেন্টাল। ভাল বাংলায় পরীক্ষামূলক দৃষ্টান্ত স্থাপন।'

'কীসের দৃষ্টান্ত?'

কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার উৎসব উত্তেজিত গলায় বলল, 'এই সময়ের ছেলেমেয়েরা কীভাবে রক ইউজ করতে পারে, সেই দৃষ্টান্ত। আমরা শিয়োর, জিনিসটা ঠিকমতো করতে পারলে, চারিদিকে খবর ছড়িয়ে পড়বে। অন্য পাড়াতেও এ ধরনের অনুষ্ঠান শুরু হবে। রক সেলিব্রেশন। মে বি কম্পিটিশনও হতে পারে।'

দিব্যজ্যোতি সেন কলেজের প্রিন্সিপাল। সবসময় ভুরু কুঁচকে থাকা সম্ভবত তাঁর চাকরির শর্তের মধ্যে পড়ে। একথা শুনে তিনি ভুরুর সঙ্গে চোখ-মুখও কোঁচকালেন। বললেন, 'এত কিছু থাকতে রোয়াক নিয়ে কম্পিটিশন! তোমরা হলটল ভাড়া নিয়ে নাচগান করো না।

নাটকও করতে পারো। যদি চাও সেমিনার হোক। ধরো বিষয় হল, তরুণ প্রজন্মের হাতেই দেশের ভার তুলে দেওয়া উচিত। আমাকে যদি খুব চাপাচাপি করো, তা হলে আমিও বলতে পারি। কী খুব খারাপ হবে?'

রাজন্যা আজকাল যেখানেই যায় সঙ্গে ল্যাপটপ রাখে। অর্কুটে বকবক না করলে তার চলে না। মিটিং-এ এসেও করছে। দেওয়ালে পিঠ ছড়িয়ে বসেছে। কোলের ওপর ল্যাপটপ। সে এখন কথা বলছে, হায়দরাবাদের ই-ফ্রেন্ডের সঙ্গে। স্ক্রিন থেকে মুখ না তুলেই বলল, 'সেমিনার করলে আপনাকে ভেরিমাচ বলব সেনজেঠু। তবে দেশের বদলে আপাতত এই বামাচরণ কবিরাজ লেনের রকের ভার তরুণ প্রজন্মের হাতে আপনারা ছেড়ে দিন। তা হলে খুবই ভাল হয়।'

দিব্যজ্যোতি সেনের ইচ্ছে করল রাজন্যা মেয়েটিকে জোর গলায় একটা ধমক দেন। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। রাজন্যা তাঁর কলেজের ছাত্রী নয়। প্রতিবেশী কন্যা। তিনি গলা খাকারি দিলেন। এইজন্যই তিনি যে-কোনও জায়গায় আসতে চান না। নেহাত বিষয়টা গুরুতর। গলির ভেতর একটা হুজুগ হবে আর তিনি চুপ করে বসে থাকবেন, সেটা তো হয় না। কিন্তু এরপর আর কথা বলা অর্থহীন। আজকালকার ছেলেমেয়েদের নিয়ে এটাই সমস্যা। কথা বললেন তপন পালিত। মাথার কাঁচাপাকা চুলে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তোমাদের প্ল্যানটা কী জানতে পারি?'

রবিবার সকালটা অর্ক তার ব্যান্ডের রিহার্সাল নিয়ে ব্যস্ত থাকে। ব্যান্ডের নাম 'শক থেরাপি'। জটিল কিছু ফিউশন আছে। সেই 'শক থেরাপি'র রিহার্সাল বাদে তাকে মিটিং-এ আসতে হয়েছে। কিছু করার নেই। রোয়াক অনুষ্ঠানের সে একজন অন্যতম প্রস্তাবক। এক সপ্তাহ জুড়ে গোপনে মোবাইলে, মেলে পরিকল্পনা নিয়ে সকলের সঙ্গে কনফারেন্স হয়েছে। ফাইনাল অ্যাপ্রুভালের দিন না থাকলে চলবে কেন? সে বলল, 'প্ল্যান খুবই জমজমাট তপনদা। থ্রি ডেজ ফেস্টিভাল।'

গায়ত্রীদেবী আঁতকে উঠে বললেন, 'তিন দিন!'

সিঞ্চন ফ্যাশন ডিজাইন নিয়ে চণ্ডীগড়ে পড়তে গিয়েছিল। কোর্স শেষ করে দিন কতক হল বাড়িতে ফিরেছে। ফিরেই হইচইতে ঢুকে পড়েছে। কলকাতায় জন্মালেও এই গলিতে তার কখনওই একটানা বেশিদিন থাকা হয়নি। একটু বড় হওয়ার পরপরই হস্টেলে হস্টেলে কেটেছে। তবে বামাচরণ কবিরাজ লেন সম্পর্কে ভেতরে একটা টান আছে। ঠাকুরদার কাছে গল্প শুনছে। গ্যাস বাতি রং করা থেকে রকে বসে রাজাউজির মারা— সবই। উত্তেজিত গলায় সে বলল, 'শুধু তিন দিন নয় মা। আমরা ভেবেছি, শেষের দিন হোল নাইট টানব।'

সুনন্দা পাকড়াশি রাগী মহিলা। চমকে উঠে বললেন, 'অ্যাঁ! সারারাত?'

রণিত সামলানোর গলায় বলল, 'ঠিক আছে হোল নাইটটা বাদ দিচ্ছি। কিন্তু প্লিজ আমাদের বাধা দেবেন না। এটা হবে আ ট্রিবিউট টু আওয়ার বিলাভেড রকস। প্রিয় রোয়াকের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা। একটা সময় এরা তো কম সার্ভিস দেয়নি।'

'অসম্ভব। ইমপসিবল।'

বৃদ্ধ বদ্যিনাথ চট্টোপাধ্যায় আবার তাঁর কাঁপা কাঁপা হাত তুললেন। বললেন, 'আহা,

ছেলেমেয়েরা যখন বলছে রাজি হয়েই দেখো না। যতই হোক নিজেদের গলিকে ভালবেসেই তো বলছে... আমারও কত কথা মনে পড়ছে... একবার কী হয়েছিল জানো, আমি আর বিভূতি বসেছিলাম মিত্তিরদের রোয়াকে, সন্ধে হয় হয়... আমি বামাচরণ কবিরাজ লেনের সবথেকে বুড়ো মানুষ, এই গলির সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আমার একটা হক আছে। যাও বাছারা, আমি তোমাদের পার্মিশন দিয়ে দিলাম।' ষোলো থেকে বাইশের দল হাততালি দিয়ে উঠল। বদ্যিনাথ মাথা নেড়ে বললেন, 'তবে একটা শর্ত।'

'কী শর্ত?'

'যাই করো বাপু, তোমাদের এই রোয়াক নিয়েই করতে হবে কিন্তু। দেখি তোমাদের ক্ষমতা।'

ছেলেমেয়েরা ক্ষমতা সত্যি দেখিয়ে দিয়েছে। তাক লাগিয়ে দিয়েছে একেবারে। সন্ধের পর আলোয় ঝলমল করছে বামাচরণ কবিরাজ লেন। উৎসবের নাম হয়েছে 'রক ফেস্টিভাল'। মিত্তিরদের রকে বসেছে রক ব্যান্ডের আসর। অর্ক সেখানে ভীষণ ব্যস্ত। ড্রামস আর সিন্থেসাইজারে তুলকালাম কাণ্ড হচ্ছে। চাটুজ্যেদের রকে সাজানো হয়েছে রক কাফে। পিৎজা, চিকেন অ্যাসপারাগাসের সঙ্গে পিঠেপুলি এবং আলুকাবলি পাওয়া যাচ্ছে। আলুকাবলিতে তেঁতুল জল। ফুড কোয়ালিটির ওপর কড়া নজর রেখেছে ঋষভ। শীলবাবু রোয়াক ছেড়েছেন চ্যাট কর্নারের জন্য। নাম হয়েছে রক চ্যাট। খান তিনেক কম্পিউটার চলছে সারাক্ষণ। রাজন্যা ইনচার্জ। সেনকাকুদের রোয়াক বেশ খানিকটা চওড়া বলে সেখানে আটটার পর শুরু হচ্ছে ফ্যাশন শো। রক ফ্যাশন। ধুতি, পাঞ্জাবি, শাড়ি, জিনস, টপ আর কুর্তা সালোয়ার পরে রক-র‍্যাম্পে শো চলছে বাজনার তালে তালে। জামদানি পরে সেজেগুজে হাঁটতে গিয়ে বাহান্ন বছরের গায়ত্রীদেবী পা পিছলেছেন সামান্য। হাসির তুফান উঠেছে। মজার ব্যাপার গায়ত্রীদেবীও সেই হাসিতে যোগ দিয়েছেন! প্রিন্সিপাল দিব্যজ্যোতিবাবুর রোয়াকে চেয়ার-টেবিল পেতে কেরিয়ার গাইডেন্সের ওয়ার্কশপ খোলা হয়েছে। মাথার ওপর ব্যানার ঝুলিয়ে লেখা হয়েছে— রক কেরিয়ার। দিব্যজ্যোতিবাবু কলেজ থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে এসে গম্ভীর মুখে ছেলেমেয়েদের কেরিয়ার বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছেন। প্রথম দিন ওয়েব পেজ ডিজাইন সম্পর্কে একটি কিশোর জানতে এলে, তিনি খানিকটা সমস্যায় পড়েন।

বৃদ্ধ বদ্যিনাথ চট্টোপাধ্যায় খুবই আহ্লাদিত। আহ্লাদিত হওয়ারই কথা। উৎসব কমিটির ছেলেমেয়েরা তাঁকে সংবর্ধনা জানিয়েছে। এই খবর তারা গোপন রেখেছিল। তাঁকে দেওয়া হয়েছে 'রক মাস্টার' খেতাব। তিনি বিকেলের পর থেকেই ধোপদুরস্ত ধুতি-পাঞ্জাবি পরে হাসি হাসি মুখে উৎসব চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন লাঠি হাতে। একেবারে খুদে ছেলেমেয়েদের জন্য নিজের বাড়ির রোয়াক ছেড়ে দিয়েছেন রাগী সুনন্দা পাকড়াশি। এই ইভেন্টের দায়িত্বে রণিত। ইভেন্টের নাম ফিউচার-রকস্টার। ফিউচার রকস্টাররা যদিও তাদের 'ফিউচার' নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয়। তারা বেদম ছোটাছুটি করছে। রকের ওপর হাততালি সহযোগে লাফালাফি করে গাইছে 'মেরি হ্যাড আ লিটল ল্যাম্ব।'

খবর আরও দুটি আছে। এক নম্বর খবর হল, গলির মুখের ল্যাম্পপোস্টে (মতান্তরে

ব্রিটিশ আমলের গ্যাসবাতি) রং পড়েছে। কালচে সবুজ রং। আর দ্বিতীয় খবরটি হল, কলকাতার বহু গলি এবং উপ-গলির বাসিন্দারা এই উৎসবটি চাক্ষুস দেখতে চাইছেন। তাঁদের একাকী, নিশ্চুপ পড়ে থাকা রকগুলিতেও যদি এরকম কিছু করা যায়।

কোনও অসুবিধে নেই। বামাচরণ কবিরাজ লেনে যাওয়া কঠিন কিছু ব্যাপার নয়। সুকিয়া স্ট্রিটের মোড়ে নেমে, গড়পাড় রোডকে বাঁ হাতে রেখে...।

আনন্দবাজার পত্রিকা, রবিবাসরীয়, ৩ মে ২০০৯

এবার পুজোয়

অভিমান হলে এক-একটা মানুষ এক-এক রকম আচরণ করে। কেউ মুখ ঘুরিয়ে রাখে। কেউ উঠে চলে যায়। ছন্দার ঘটনা অন্যরকম। অভিমান হলে সে মুচকি মুচকি হাসে। মুচকি হাসলে এই কিশোরীটিকে বড় সুন্দর দেখায়। এখনও দেখাচ্ছে। হাসিমুখে ছন্দা বলল, 'বাবা, তা হলে তুমি কিছুতেই রাজি হচ্ছ না? এটাই তোমার ফাইনাল?'

কৃষ্ণেন্দু টিভি থেকে মুখ না সরিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, তাই। এটাই আমার ফাইনাল।'

ছন্দা ফিক করে হাসল। এর মানে তার অভিমান আর-একটু বেড়েছে। বাড়বারই কথা। একটু আগে আর প্রিয়তম মানুষটি তার যে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে সেটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয়, এর সঙ্গে তার প্রেস্টিজ জড়িয়ে আছে। সে তার বন্ধুদের বলে এসেছে, বাবা অবশ্যই রাজি হবে। শুধু রাজি হবে না, শুনলেই লাফিয়ে উঠবে। সেই বাবার এই নিস্পৃহ অবস্থা! এই বয়সে সব কিছু হেলাফেলা করা যায়, কিন্তু প্রেস্টিজ হেলাফেলা করা যায় না। বাবা কি বিষয়টা বুঝতে পারছে না? মনে হচ্ছে না পারছে। একটু চুপ থেকে ছন্দা বলল, 'বাবা, কেন ফাইনাল কেন? রিখিয়া, মেখলা, কাবেরী, টুটুদা, ভুটুস সবার বাবাই তো পার্টিসিপেট করছে। তুমি করবে না কেন? আমি কত আশা করে তোমার নাম দিলাম।'

কৃষ্ণেন্দু বিরক্ত হল। সেই বিরক্ত ভাব চোখেমুখে ফুটল। বলল,'তোমার মতো একটা বুদ্ধিমতী মেয়ে এরকম কাজ কেন করল সেটাই তো বুঝতে পারছি না। নাম দেওয়ার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল। সবাই পাগলামি করলে তোমার বাবাকেও করতে হবে?'

সামনের নিচু টেবিল থেকে হাত বাড়িয়ে ছন্দা স্যুপের বাটিটা তুলল। শালপাতার আদলে তৈরি এই বাটিগুলো চমৎকার দেখতে। চেহারায় একটা বুনো এফেক্ট আছে। চামচটাও সেরকম। ঠিক যেন একটা পাতা! ছন্দা রোজ রাতে খেতে বসার আগে এই স্যুপটা খায় এবং বাবার সঙ্গে জরুরি কথা সারে।

পাতা চামচে ছোট্ট চুমুক দিয়ে ছন্দা বলল, 'এটা তুমি কী বলছ বাবা? পাগলামি কেন হবে? উৎসবের দিনে সবাই মিলে হইচই করাটা পাগলামি? পুজোর সময় আমাদের এখানে প্রত্যেক বছরই তো কিছু না কিছু হয়। নাটক, গান, আবৃত্তি। ছোট-বড় সকলের জন্য ব্যবস্থা থাকে। সেই যে একবার ছোটবেলায় আমাদের ছোট নদী আবৃত্তি করতে গিয়ে মাঝপথে আজ ধানের ক্ষেতে গেয়ে ফেলেছিলাম। মনে আছে?'

কৃষ্ণেন্দু আরও গম্ভীর গলায় বলল, 'কত কিছু হওয়া আর এটা হওয়া এক হল ছন্দা? নাটক, গানটানের একটা মানে আছে। এই ধরনের পারফরমেন্সের মধ্যে দিয়ে অনেকের

ভেতরের চাপা থাকা গুণগুলো বেরিয়ে আসে। কিন্তু এসব কী? যত্তোসব ছেলেমানুষি। পুজো কমিটিতে কারা আছে এবার? সুধাংশুবাবু সেক্রেটারি না? কাদের মাথা থেকে এসব বেরিয়েছে!'

'বাবা, তুমি মিথ্যে রাগ করছ। এবারের আইটেমগুলো যদি শোনো তুমি আনন্দে এত জোর লাফিয়ে উঠবে যে ছাদে মাথা ঠুকে যেতে পারে। তুমি কি শুনবে? দয়া করে তুমি যদি টিভির সাউন্ডটা একটু কমাও তা হলে তোমাকে শোনাতে পারি।'

কৃষ্ণেন্দু টিভির আওয়াজ কমাতে কমাতে বলল, 'শোনাতে পারো তবে তাতে আমার মত বদলাবে না।'

ছন্দা ভাষণ দেওয়ার কায়দায় হাত নেড়ে বলতে শুরু করল—

'এবার পুজোর ফাংশনগুলো একটু অন্যরকম হচ্ছে। সামথিং ডিফারেন্ট। সেই চলতি গান, কবিতা, নাটক নয়। সব কিছুর মধ্যেই একটা ফোক আর ভিলেজ টাচ থাকবে। ফোক আর ভিলেজ টাচ মানে বুঝতে পারছ তো? লোক অনুষ্ঠান আর গ্রাম গ্রাম ব্যাপার। লোকসংগীত, লোকনৃত্য যেমন হবে, তেমনি আবার আলপনা, ধুনুচি নাচ, পিঠে তৈরি এসব গেমসও থাকছে।'

কৃষ্ণেন্দু সোজা হয়ে বসল। চোখ বড় বড় করে বলল, 'গেমস!'

ছন্দা হাসতে হাসতে বলল, 'বাবা, এবার কিন্তু আমি কেঁদে ফেলব। তুমি এমন একটা ভান করছ যে গেমস মানেও জানো না। সবাই বলছিল, গেম লিস্টে অন্তাক্ষরী, সং মেকিং আর হুজি-বুজি ঢোকানো হোক। সেই নিয়ে একটা ঝগড়া হল। শেষ পর্যন্ত ঠিক হয়েছে, ওগুলোও থাকবে আবার এগুলোও থাকবে।'

'হুজি-বুজি! হুজি-বুজিটা কী জিজ্ঞেস করলে তুমি রেগে যাবে ছন্দা?'

ছন্দা ঘাড় নেড়ে বলল, 'না, রাগব না। তবে বলবও না। হুজি-বুজি খেলাটা বড়দের আগে থেকে বলা যাবে না। তা হলে খেলা দেখার মজা নষ্ট হয়ে যায়। এর সঙ্গে আমাদের মতো টিন এজারদের জন্য থাকছে আলপনা কম্পিটিশন। মা-কাকিমারা করবে পিঠে তৈরির লড়াই। আর তোমাদের জন্য ধুনুচি নাচ। কেমন হয়েছে?'

কৃষ্ণেন্দু মুখটাকে তেতো খাওয়ার মতো কুঁচকে বলল, 'খুব খারাপ। অতি জঘন্য। এসবের মানে কী? আমি যদি পুজো কমিটিতে থাকতাম সব বাতিল করে দিতাম। এগুলো ছেলেমানুষি ছাড়া আর কিছুই নয়। শুধু ছেলেমানুষি নয়, মেকি, বানানো। গ্রাম ভাল লাগে তো গ্রামে যাও না বাবা। দু'-চারদিন বেড়িয়ে এসো। হ্যারিকেন আর মশার কামড় কেমন লাগে দেখবে। ফ্লাইওভারের ধারের ফ্ল্যাটে বসে একতারা বাজানোর কী আছে?'

ছন্দা উৎসাহের সঙ্গে বলল, 'চিন্তা কোরো না বাবা। একতারার ব্যবস্থাও থাকছে। এবার আমরা যে ব্যান্ড আনছি, তার নাম একতারা। নাম শুনেছ? অল বাউল সংগীত। সপ্তমীর রাতে ওদের পারফরমেন্স। তোমাদের ধুনুচি-নৃত্য অষ্টমীর সন্ধেতে।'

'তোমাদের মানে! ছন্দা, শুনে রাখো, কোনওরকম লোক হাসানোতে আমি নেই। রাস্তায় ধুনুচি হাতে নাচতে পারব না।'

ছন্দা বলল, 'রাস্তায় কোথায়? প্যান্ডেলের ভেতরে তো।'

'ওই একই হল। বরং একটু বেশিই হল। সং সেজে নাচানাচি করলে অনেকেই পাশ কাটিয়ে চলে যাবে। প্যান্ডেলে দাঁড়িয়ে পড়বে।'

ছন্দা হাত নেড়ে বলল, 'এ মা, দাঁড়িয়ে পড়বে কেন? আমরা তো বসার জায়গা রাখছি।' ছন্দা এরপর গলা নামিয়ে বলল, 'একটা সিক্রেট কথা তোমায় বলে রাখছি বাবা। গোটা প্রোগ্রামটা তপুদা হ্যান্ডিক্যামে ধরে রাখবে। পরে প্রত্যেককে একটা করে সিডি দেওয়া হবে। তবে বিনিপয়সায় নয়। সিডির দাম ঠিক হয়ে গেছে। আমাদের আলপনা কম্পিটিশনের দাম হয়েছে একশো টাকা। মায়েদের পিঠে তৈরির সিডির জন্য দিতে হবে একশো পঁচিশ। সব থেকে কস্টলি হচ্ছে ধুনুচি নাচের সিডি। ওয়ান হানড্রেড অ্যান্ড ফিফটি। ওই প্রোগ্রামটাই সব থেকে এক্সাইটিং কিনা। ইতিমধ্যেই সাতাশটা বুকিং হয়ে গেছে। ভুটুস তো বলেছে, ওর বাবার নাচ কালেকশনে রাখার জন্য তিনশো টাকা পর্যন্ত খরচ করতে রাজি। হি হি। আর কিছু জানতে চাও বাবা?'

কৃষ্ণেন্দু থমথমে গলায় বলল, 'আর একটা জিনিসই জানতে চাইছি। এসবের প্ল্যান কার? মানে পরিকল্পনা কে করেছে?'

ছন্দা এগিয়ে গেল বাবার কাছে। কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'মায়ের।'

একটু চুপ করে থেকে কৃষ্ণেন্দু বলল, 'তোমার মা কেন এরকম একটা অদ্ভুত পরিকল্পনা করেছে তুমি জানো ছন্দা?'

ছন্দা গম্ভীর গলায় বলল, 'জানি বাবা। কিন্তু বলব না। ওটা বড়দের ব্যাপার।'

২

কৃষ্ণেন্দু সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে বলল, 'পুজো প্যান্ডেলে নাচানাচির পরিকল্পনা তোমার?'

বনানী আয়নার সামনে বসে ক্রিম মাখছে। হাসতে গিয়ে নিজেকে সামলে নিল। রাতক্রিম মাখার সময় হাসি কান্না বারণ। বলল, 'হ্যাঁ আমার। ভাল হয়েছে না? বেশ অন্যরকম। আমাদের তো এরকম কখনও হয়নি। সবাই খুব অ্যাপ্রিশিয়েট করল। অ্যাই তুমি কিন্তু আবার প্যান্ট-শার্ট পরে নাচতে যেয়ো না। ছবিতে বোকার মতো লাগবে। হাতে ধুনুচি, গায়ে একজিকিউটিভ শার্ট।'

কৃষ্ণেন্দু সদ্য ধরানো সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল। উঠে গিয়ে এসি মেশিনটা চালিয়ে দিয়ে খাটে এসে বসল। বলল, 'তুমি কী ভাবছ বনানী? আমি নাচব?'

বনানী এবার মুখ ঘোরাল। রাতের ক্রিমে কি চোখ বড় করা বারণ আছে? থাকলে থাক। বনানী দুটো চোখই বড় বড় করে অবাক গলায় বলল, 'ওমা তুমি নাচবে না মানে! তোমার জন্যই তো আইটেমটা রাখলাম।'

কৃষ্ণেন্দু ঠান্ডা গলায় বলল, 'আমার জন্য! কেন? তোমাদের কি ধারণা আমি খুব ভাল নাচতে পারি? এই যে রোজ সকালে আমি অফিসে গাড়ি চালিয়ে যাই, কেন যাই? সেখানে

গিয়ে নাচব বলে? এই যে মাসে একদিন করে মুম্বইতে বোর্ড মিটিং হয়। আমাকে প্লেনে উড়ে যেতে হয়। চেয়ারম্যান আসেন। মিটিং-এ আমি কী করি? নাচি?'

বনানী আর পারল না। রাতক্রিমের নিয়ম ভেঙে হাসল। বলল, 'এরকম রাগ রাগ ভাবে বলছ কেন?'

'কীভাবে বলব? নেচে নেচে? শুধু প্ল্যান করোনি, মেয়েটাকেও তাতিয়েছ। মনে হচ্ছে, সে তার বাবাকে না নাচিয়ে ছাড়বে না। চলো, ওই দিন আমরা কোথাও ঘুরে আসি। ছন্দার হাত থেকে বাঁচার আর অন্য কোনও পথ নেই। ভোরে কোথাও বেরিয়ে যাব। ফিরব একেবারে রাতে। বাইরে কোথাও খাব। ততক্ষণে এখানকার রং তামাশা শেষ হয়ে যাবে।'

কথা থামিয়ে কৃষ্ণেন্দু খাট ছেড়ে উঠে এসে স্ত্রীর পাশে বসল। কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'চলো না, তিনজনে মিলে সত্যি সত্যি একটা গ্রামের পুজো দেখে আসি। কাছাকাছি কোনও গ্রাম। গাড়ি নিয়ে চলে যাব। সন্ধের পর ব্যাক। ছন্দা তো গ্রামের পুজো দেখেনি কখনও।'

বনানীর ক্রিম মাখা হয়ে গেছে। এবার সে তুলো দিয়ে গোটা ক্রিমটা মুছে ফেলবে। এই জিনিসের এটাই মজা। লাগাতে হয়, আবার সঙ্গে সঙ্গে তুলেও ফেলতে হয়।

তুলো ঘষতে ঘষতে বনানী বলল, 'পুজোর সময় গ্রাম দেখতে গ্রামে যেতে হবে কেন? আজকাল পুজোর সময় কলকাতার অলিতে-গলিতে অজস্র গ্রাম হয়। মাটির বাড়ি। সুপুরি গাছ। খড়ের চাল। শুনেছি, গত বছর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের পাশে একটা গ্রামে নাকি আলপথ ধরে ঢোকার ব্যবস্থা হয়েছিল। সরু আলপথ। দু'পাশে ধানখেত। খেতে গাড়ি পার্কিং। বেশ কিছুটা আলপথ ধরে হেঁটে গেলে তবে পুজো মণ্ডপ। সেই আলপথে কাদা ছিল, এমনকী চোরকাঁটা পর্যন্ত ছিল। ঘটনা এখানেই শেষ নয়। ওখানে ঝিঁঝির ডাকেরও আয়োজন করা হয়। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী মাইকে আর কিছু বাজেনি। ওনলি ঝিঁঝি। সত্যিকারের গ্রামে গিয়ে এর থেকে বেশি তুমি কী পাবে?'

কৃষ্ণেন্দু ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। না, মনে হচ্ছে না পারা যাবে। এবার এদের এখান থেকে সরানো যাবে না। বনানী উঠে পড়ল। বলল, 'নাও আলোটা নিভিয়ে দাও। পুজোর ক'টা দিন আমি গ্রাম, শহর কোথাও যাব না। এখান থেকে নড়ছি না। এত বড় একটা প্রোগ্রামের রেসপনসিবিলিটি নিয়েছি। দায়িত্ব আগে না মজা আগে? অ্যাই শোনো, আমি না পিঠে তৈরি কম্পিটিশনে চিতৈ পিঠে বানাব ঠিক করেছি। রবিবার ভবানীপুরে ছোড়দির শাশুড়ির কাছে ট্রেনিং নিতে যাব। কীরকম হবে বলো তো?'

কৃষ্ণেন্দু ফিসফিস করে বলল, 'খুবই ভাল হবে। শুধু একটা কথা বলো তো বনানী, ধুনুচি নাচের প্ল্যানটা তোমার মাথায় এল কীভাবে? এসব ছেলেমানুষদের মানায়। বুঝতে পারছি, সেদিন আমাকে ফ্ল্যাট ছেড়ে পালাতে হবে।'

বনানী বিছানায় উঠতে উঠতে বলল, 'তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ। এমন একটা ভাব করছ, আমি যেন তোমাকে ধরে বেঁধে নাচাচ্ছি। তুমি বলেছিলে, তাই।'

'আমি বলেছিলাম! আমি কী বলেছিলাম?'

বনানী বালিশে মাথা রেখে পাশ ফিরল। গলা নামিয়ে বলল, 'তুমি সব ভুলে যাও। সেই

যে বিয়ের পরপরই এক রাতে বলেছিলে না... মনে নেই? ওই যে আমি তোমাকে গান শোনালাম। মনে পড়ছে? জানি পড়বে না। আমার কথা তোমার মনে পড়বে কেন? আমি গান করলাম। তুমি আহা উহু করলে। মনে পড়ছে। তারপর তুমিও বেসুরো গলায় একটা গান ধরলে। আমি বললাম, খুব খারাপ হচ্ছে। চুপ করো। তখন তুমি বললে, গান না পারলেও তুমি নাকি খুব ভাল নাচতে পারো। স্কুল-কলেজে পড়ার সময় পাড়ার পুজো প্যান্ডেলে ধুনুচি নিয়ে... বলোনি তুমি? এবার দায়িত্ব পেয়ে ভাবলাম,আরে তোমার ধুনুচি নাচ তো এখনও দেখা হয়নি। আইটেমটা ঢুকিয়ে দিলাম। যাক অত ভাবতে হবে না। আমি ছন্দাকে বুঝিয়ে বলে দেব। ও তোমার নাম কেটে দেবে। এত চিন্তার কী আছে?'

৩

ঘন নীল কোট প্যান্টের সঙ্গে হালকা মেরুন টাই। পায়ের বাদামি জুতো চকচক করছে আয়নার মতো। ফুরফুরে চুলে হাত বোলাতে বোলাতে অফিসের করিডর ধরে হেঁটে আসছে কৃষ্ণেন্দু। পাশে হাঁটছে তীর্থপতি সান্যাল। তারা সকালের ফ্লাইটে মুম্বই এসেছে। একটু পরেই মিটিং। দু'জনেই চাপা গলায় কথা বলছে। নিশ্চয় মিটিং শুরুর আগে জরুরি কিছু ঝালিয়ে নিচ্ছে।

তীর্থপতি বলল, 'তারপর কী হল স্যার।'

কৃষ্ণেন্দু বলল, 'কী আর হবে। একটা ধুনুচি হাত থেকে পড়ে গেল বলে তো আর থেমে যেতে পারি না। পুরনো ট্রিকস অ্যাপ্লাই করলাম। নাচতে নাচতেই হাত বাড়ালাম। কে যেন আর একটা এগিয়ে দিল। ব্যস চটাপট হাততালি।'

'ওয়ান্ডারফুল!'

'ওয়ান্ডারফুল কিনা বলতে পারব না। প্রাইজ তো ভাই পেলাম না। তবে শেষ হয়ে যাওয়ার পর দেখি, মেয়েটা খুব হাততালি দিচ্ছে। হা হা। বাবার নাচ দেখে হাততালি। ভাবো কাণ্ডটা।'

তীর্থপতি বলল, 'স্যার, আমি তো অবাক হয়ে যাচ্ছি। কোনও জখমটখম ছাড়াই এই বয়সে এতক্ষণ ধরে নাচ...।'

কৃষ্ণেন্দু অল্প হাসল। বলল, 'না, সেরকম কিছু নয়। কোমরে একটা হালকা ব্যথা হয়েছে। তবে সেটা এনজয় করছি। নেক্সট উইকে সিডিটা হাতে পাব। একদিন এসো না সবাই মিলে দেখা যাবে।'

আজকাল রবিবাসর, ১৬ অক্টোবর ২০০৫

নীলকণ্ঠ

এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছিল। এবার বসতে দেওয়া হয়েছে। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকার থেকে হাত-পা ছড়িয়ে বসা সব সময়েই আরামের। কিন্তু দুটো হাত পিছমোড়া করে বাঁধা থাকলে বসা আর আরামের থাকে না। কাঁধ দুটো ঝুঁকে পড়ে। কনুইগুলো ঠেলে বেরিয়ে আসে সামনের দিকে। পিঠে লাগে। মনে হয়, কে যেন লোহার চেন দিয়ে পিছনেও টানছে, আবার সামনেও টানছে। কষ্ট হয়।

পচা কষ্ট করেই বসেছে। এটা মারের সময়। সাধারণ মার নয়। চোরের মার। চোরের মার অতি মারাত্মক জিনিস। কথায় আছে 'চোরের মার'। কথা এমনি এমনি তৈরি হয়নি। এই সময় এত সুবিধে-অসুবিধে দেখলে চলে না। বসতে বলেছে এটাই যথেষ্ট।

'অ্যাই ছোঁড়া, তোর নাম কী?'

পচা বিড়বিড় করে বলে, 'পচা।'

কেউ শুনতে পেল বলে মনে হয় না। চোরের নাম জানার জন্য কেউ ব্যস্তও নয়। জিজ্ঞেস করতে হয় তাই করা।

মার বলতে প্রধানত থাপ্পড় এবং লাথি। সেই সঙ্গে চুলের মুঠি ধরে ঝাঁকুনি। সমস্যা হচ্ছে, প্রতি ঝাঁকুনিতেই হাতে চুল উঠে আসছে। গোছা গোছা চুল। বারো-তেরো বছরের একটা নোংরা ভিখিরি ধরনের ছেলের চুল হাতে উঠে আসা ভাল জিনিস নয়। একটা গা ঘিনঘিনে ব্যাপার। হারামজাদা কতদিন স্নান করেনি তার ঠিক আছে? কোনও ঠিক নেই। করলেও তেল, সাবান যে দেয় না সেটা নিশ্চিত। মারের সময় তো হাতে শ্যাম্পুর শিশি ধরিয়ে বলা যায় না, 'যা আগে ভাল করে স্নান করে আয়। তারপর তোকে ঠ্যাঙাব।' বলা যায় কখনও? বলা যায় না।

তবে সুসংবাদ হল, খানিক আগে চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। সম্ভবত অনেকটা ছিঁড়ে, ওপরে উঠে যাওয়ার পর চুল নিজেই নিজের প্রতিরোধ ক্ষমতা তৈরি করে নিয়েছে। অনেক সময় এরকম হয়। শরীর কিছুটা সময় বাইরের সাহায্যের জন্য হাঁকুপাঁকু করে। তারপর নিজেই নিজের জন্য এগিয়ে আসে। তবে ঘটনা যাই হোক, আসল কথা হল, চুল এবার ধরা যাচ্ছে নিশ্চিন্তে। চোর ঠ্যাঙানোর সময় ঘনঘন চুলের মুঠি ধরতেই হবে। চুল খামচে ধরে ইচ্ছেমতো মাথাটা ডানদিক-বাঁদিকে, ওপরে-নীচে পেঁচিয়ে-পুঁচিয়ে ফেলতে হয়। এই ক্ষেত্রেও হচ্ছে। সুবিধে হল, ছোট মানুষ। বেটার ঘাড় এখনও তেমন শক্ত হয়নি। একটা প্লাস্টিক প্লাস্টিক ভাব রয়েছে। মাথা দুমড়ে-মুচড়ে দিতে বিরাট কিছু কসরত করতে হচ্ছে না। অল্পেই হচ্ছে।

মঙ্গল এবং তার বউ জানকী দু'জনেই এই ফ্ল্যাটবাড়িতে কাজ করে। দু'জনের দু'রকম কাজ। মঙ্গল পেয়েছে দারোয়ানের দায়িত্ব। তার চেহারা ভারী এবং গলার আওয়াজ মোটা। দারোয়ান হিসেবে এই দুটি জিনিসেরই খুব প্রয়োজন। এই যোগ্যতার জোরে তাকে দিনে এবং রাতে ডিউটি দেওয়া হয়েছে। দিনের ডিউটিতে সারাদিন গেটের সামনে টেবিল নিয়ে বসে থাকতে হয়। কেউ এলে মোটা খাতায় তার নাম, ঠিকানা, বাবার নাম লিখে ফেলতে হয়। রাতের ডিউটিতে লেখালিখির কোনও ব্যাপার নেই। কাজ হল শুধু দু'ঘণ্টা অন্তর একবার করে বাড়ি চক্কর দেওয়া এবং হাঁক পাড়া। এর জন্য তাকে খাকি পোশাক এবং বেঁটে লাঠি কিনে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে তার বউ পেয়েছে খুটখাট ফাইফরমাশের দায়িত্ব। দোকান-বাজার, পোস্টাপিস এইসব।

কিন্তু ভেতরে সমস্যা আছে।

চেহারা ভারী হলেও মঙ্গল খুবই ভিতু ধরনের একজন মানুষ। ফ্ল্যাট চক্কর তো দূরের কথা, রাতে ঘরের বাইরে যাওয়ার মুরোদই তার নেই। গভীর রাতে ঘরের বাইরে খুটখাট আওয়াজ হলে সে হাত বাড়িয়ে জানকীকে ঠেলা দেয়। জানকীর ঘুম গভীর। চট করে ভাঙতে চায় না। তবু সে স্বামীর ঠেলায় চোখ কচলে তক্তপোশের ওপর উঠে বসে। বসে হাঁক মারে— 'কৌন হ্যায়? কৌন হ্যায় শালা?'

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যের গোপন খবর হল, বেঁটে লাঠিটা আজকাল মঙ্গলের বদলে জানকীর হাতের কাছেই থাকছে।

আজ ভোরে বাড়ির সামনে পচাকে সন্দেহজনকভাবে ঘুরতে দেখে মঙ্গল তাকে ধরতে পেরেছে দুটো কারণে। এক নম্বর কারণ, ঘটনা দিনের আলোয়। দু'নম্বর কারণ হল, চোরের বয়স অল্প। অল্পবয়সি চোর ফ্ল্যাটবাড়ির উলটোদিকের মাঠে দাঁড়িয়ে হিসি করছিল। মঙ্গল গিয়ে পেছন থেকে জাপটে ধরে।

মঙ্গল চোর ধরেছে— এই খবর জানাজানি হয়েছে খানিকটা পরে। চোরকে বেঁধে ফেলার পর।

'বল, হারামজাদা বল। সাতদিন ধরে তুই এই ফ্ল্যাটের সামনে ঘুরঘুর করছিলি কিনা বল। তিনতলার চুরিটা কার কাজ? তোর? বল, বল আগে। তিনতলায় উঠলি কী করে? সিঁড়ি দিয়ে? পাইপ বেয়ে? চেহারাটা যেরকম টিকটিকির মতো রেখেছিস তাতে তো মনে হচ্ছে দেওয়াল বেয়ে ওঠা-নামা করিস। বল, চুরির জিনিস কোথায় বেচিস? আর ক'টা বাড়িতে এই কাণ্ড করেছিস? মালগুলো বেচেছিস কোথায়? কী রে চুপ করে আছিস কেন? কথা বল। না বললে তোর ঘাড়খানা মটকে একদম মেরে ফেলব। এই দেখ, এইভাবে মটকাব, এই যে, এই এই এইভাবে...।'

পচা চিৎকার করে ওঠে। প্রথমে চাপা। তারপর তীব্র, তীক্ষ্ণ। ঘাড় যত বেঁকে চিৎকার তত তীক্ষ্ণ হয়। উঁচু ফ্ল্যাট, অনেকে উঁকি দেয়।

চুল খামচে শুধু মেরে ফেলার হুমকি নয়। প্রতিটা হুমকির শেষে একটা করে জোর থাপ্পড় দেওয়ার ব্যাপার রয়েছে। থাপ্পড় যে মঙ্গল একা দিচ্ছে এমন নয়। অন্যরাও দিচ্ছে। আশপাশের ফ্ল্যাট থেকেও অনেকেই চোর দেখতে আসছে। দারোয়ান, কাজের লোক,

মিস্ত্রি-মজুররা যেমন আছে, তেমনি বাবুরাও আছে। বাজার যাওয়ার পথে, ছেলেমেয়েকে স্কুলবাসে তুলে এসে দেখে যাচ্ছে। দেখে যাওয়ার পথে থাপ্পড় দিয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের থাপ্পড়ে গাল লাল হয়ে ওঠার কথা। শুধু লাল নয়, ফেটে রক্ত পড়লেও আশ্চর্যের কিছু ছিল না। কিন্তু পচার সেরকম কিছু হচ্ছে না। সম্ভবত, ছোকরার রক্তে টানাটানি আছে। থাপ্পড়ে লাল হওয়ার মতো এক্সট্রা রক্ত তার নেই।

একটা ভাঙা কাচের প্লেটে আলুর দম আর পাউরুটি এসেছে। সঙ্গে হাতল ভাঙা কাপে জল। আলুর দমে ঝোল অনেকটা, আলু মোটে একটা। তবে পাউরুটি দুটো। আনন্দের কথা হল, মিষ্টিও আছে। প্লেটের কোণে, পাউরুটির আড়ালে একটা লাড্ডু উঁকি মারে। চেহারা দেখে বোঝা যাচ্ছে, জিনিস বাসি। হোক বাসি। পচা ইতিমধ্যেই ঠিক করে ফেলেছে, লাড্ডু সে সবার শেষে খাবে। শেষপাতে মিষ্টি।

কেউ একজন হাত খুলে দিল।

'নে খেয়ে নে। খেয়ে নে তাড়াতাড়ি। তারপর ঠেলা কাকে বলে বুঝবি। তখন চুরির মাল বের করবি সুড়সুড় করে। এক ফোঁটা ছেলের রস নিংড়ে বের করব।'

হাত নামিয়ে প্লেটটা ধরতেই কাঁধের কাছটা টনটনিয়ে উঠল। হাতে কে যেন পাথর বেঁধে রেখেছে। ব্যথার পাথর। সেই পাথর হাত নামিয়ে দিতে চাইছে টেনে। আঙুল নড়তে চাইছে না। মনে হচ্ছে, নখে নখে সুই ফোঁড়ানো! অনেক কায়দাকানুন করে, দাঁতে দাঁত চেপে খাবার তুলে মুখে দিল পচা। মুখে দিতেই মাথা পর্যন্ত ঝনঝনিয়ে উঠল! বাপ রে! বাপ রে কী ঝাল! সত্যি ঝাল? নাকি, মুখের ভেতর কাটাকুটি হয়েছে? অসম্ভব নয়। হতেই পারে। বেমক্কা মারধরে সারা গায়েই কাটাকুটি হয়েছে। ঠোঁট ফেটেছে, নাক থেকে রক্ত পড়েছে, মুখের আর দোষ কী? এখন মনে পড়ছে খানিক আগে জ্বালার সঙ্গে একটা রক্ত রক্ত স্বাদও পাচ্ছিল। হোক, যা খুশি হোক। মারধরে জ্বালা-যন্ত্রণা হবে না তো কী হবে? আরাম হবে? খাওয়ার সময় ওসব নিয়ে মাথা ঘামালে চলে না।

পচা কামড় দিল পাউরুটিতে। কামড় হল না। ব্যথার কারণে চোয়াল জমে গেছে। থম মেরে আছে। নড়তে চাইছে না। কিছুতেই নড়তে চাইছে না। নড়াতে গেলে ব্যথা বাড়ছে। মাথা ঘুরে যাচ্ছে। ইচ্ছে করছে, ডাক দিয়ে কেঁদে উঠি। পচা অনেক কষ্টে নিজেকে সামলাল। আবার চেষ্টা করল।

না, পাউরুটি খারাপ নয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের মারের পদ্ধতিপ্রকরণ কীরকম হবে? সম্ভাবনা অনেক। সকাল থেকে চোরকে ঘিরে আলোচনা চলছে। মার-সম্পর্কিত আলোচনা। অনেকরকম পরামর্শ, পরিকল্পনা।

'বেটা যে মুখ খুলছে না কিছুতেই। একেবারে কুলুপ দিয়েছে।'

'খুলবে। ঠিক খুলবে। তোমরা খোলাতে পারছ না তাই খুলছে না।'

'থানায় দিয়ে এলে কেমন হয়? পুলিশ বুঝে নেবে। পুলিশের ডান্ডা খেলে জামাপ্যান্টে হেগেমুতে দেবে।'

'অসভ্যের মতো কথা বোলো না। মনে রাখবে এটা ভদ্রলোকের পাড়া। চোর পেটাচ্ছ বলে

লাটসাহেব হয়ে যাওনি। পুলিশে দিলে খারাপ হয় না। ভালই হয়। তবে তার আগে নিজেরা আধমরা করে দেওয়াটাই ভাল। পুলিশের সঙ্গে এদের কন্নাইভেন্স আছে। বখরার ব্যবস্থা থাকে। তোমরা চলে এলে, ছেড়ে দেবে। মনে রেখো, এত বড় একটা বিজনেস এমনি এমনি রান করে না। অনেক ভেবে রান করাতে হয়। ভাল করে ধোলাই দাও। আর যেন এমুখো না হয়।'

'ধোলাই তো কম হচ্ছে না।'

'মনে হচ্ছে, কম হচ্ছে না। আসলে কমই হচ্ছে। এরা মার খেয়ে খেয়ে হ্যাভিচুয়েটেড। অভ্যস্ত। আমার ধারণা চোরদের মার খাওয়ার ট্রেনিং হয়। এদের শুরুই করতে হয় ওপর থেকে।'

'দাদা, সেটা একটা ভুল হয়ে গেছে। আমরা মাঝখান থেকে শুরু করেছিলাম। প্রথমেই হারামজাদার পাছায় মারা হয়েছে।'

'আবার? আবার স্ল্যাং? তোমার বললাম না, এই বাড়িগুলোতে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, টিচাররা থাকেন? বলিনি তোমায়? তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আছে। তারা কী শিখবে? হোয়াট দে উইল লার্ন? কথা বলবে মুখ সামলে।'

'আর হবে না। তা হলে কি দাদা, হাত-পা ভেঙে দেব?'

'বুদ্ধি খারাপ নয়। তবে হাত-পা দুটো ভাঙার দরকার নেই। শুধু হাত ভাঙতে পারো। হাত ভাঙলে কী হবে জানো?'

'কী হবে?'

'অনেকদিন মনে থাকবে।'

'তা হলে দুটো হাতই ভেঙে দিতে বলি?'

'বোকার মতো প্রশ্ন করছ কেন? ছোকরার কি দশটা হাত? হাত যখন দুটো তখন দুটোই ভাঙবে। দশটা হলে দশটা ভাঙতে। সামান্য একটা ফচকে চোর। কবে কোন ফ্ল্যাট থেকে দুটো ঘড়ি, একটা মোবাইল, দুটো গলার হার চুরি করেছে, তাকে তোমরা এতজন মিলে ট্যাকল করতে পারছ না! টিচ হিম আ গুড লেসন।'

'কীরকম দাদা?'

'আঃ চুপ করো। ইংরেজি জানো না সেটা জাহির করে বলতে হবে না।'

'আচ্ছা, ঝোল্লা মার দিলে কেমন হবে?'

'ঝোল্লা মার! সেটা আবার কেমন?

'ঝোল্লা মার হল ঝুলিয়ে মার। হাত দুটো বেঁধে ওপর থেকে শরীরটা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে। ছোকরার বডি দুবলা পাতলা আছে। সহজেই ওপর থেকে ঝুলিয়ে দেব। তারপর লাঠি দিয়ে পায়ের তলায়...। মাথা পর্যন্ত টং টং করে বাজবে। মনে হবে পায়ে নয়, লাঠি মাথায় পড়ছে। নকশাল পিরিয়ডে এ জিনিস হেভি পপুলার ছিল দাদা। থানায় থানায় ঝোল্লা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। পাকা ব্যবস্থা।'

'আইডিয়া মন্দ নয়। তবে মরে টরে যাবে না তো? দেখো বাবা। মরে গেলে আর এক চিত্তির। ফ্ল্যাটসুদ্ধু লোকের হাতে হাতকড়া পড়বে। আমাদের দেশ বড় অদ্ভুত। সব কিছুতেই মরা পর্যন্ত ছাড় আছে। মরা পর্যন্ত যা খুশি অ্যালাউ। মরলেই কেস ঘুরে যায়।'

'কী যে বলেন। এরা হল গিয়ে দাদা কই চোর।'

'কই চোর! কই চোর ব্যাপারটা কী?'

'কই চোর মানে হল কই মাছের মতো প্রাণ। কড়াইতে তেল ফুটিয়ে ফেললেও মরবে না। লাফাবে। চেঁচাবে। মরবে না। ছিঁচকেগুলো এরকমও হয়। কই ধরনের।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। বাজে বকতে হবে না। তোমরা যা ভাল বোঝো করো। তবে যেটাই করো সাবধানে করবে।'

ব্যবস্থা সাবধানেই হচ্ছে। পচা খাওয়াদাওয়া শেষ করে জল খেয়েছে। প্যান্টে হাত মুছেছে। তারপর তারিয়ে-তাড়িয়ে লাড্ডুটা খেয়েছে আর পিটপিটে চোখে সেই ব্যবস্থা দেখছে। মই এনে বাড়ির গ্যারাজে উঁচু করে দড়ি ঝোলানো হচ্ছে। মইয়ের ব্যবস্থা করেছে মঙ্গল। দড়িও তার আনা। মনে হচ্ছে, ঝোল্লা মারের ব্যাপারে তার খুবই উৎসাহ।

এই পর্যন্ত ব্যবস্থা পচা মোটামুটি ঠিক আছে। কিন্তু এর পরেরটুকু মারাত্মক। পচার দুবলা শিরদাঁড়া দিয়ে ঠান্ডা স্রোত বয়ে গেল। সে দুটো চোখই বন্ধ করে।

এক বালতি জল আনা হয়েছে। ঠান্ডা জল। ঝোল্লা মারের সময় নাকি ঘনঘন অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার একটা ব্যাপার আছে। ব্যথা সহ্য করতে না পেরে অজ্ঞান। খুব বেশিক্ষণ নয়, মিনিট পাঁচেকের মামলা। তবু জলের ঝাপটা লাগে। তাই জলের ব্যবস্থা।

পচাকে যখন ঝোলানো হচ্ছে তখন ভয়ে এবং আতঙ্কে তার সারা শরীর কাঁপছে। এটা কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। এরকম সময় শরীর কাঁপাটাই স্বাভাবিক। একটু পরে এ ছেলে জামাপ্যান্টও নোংরা করে ফেলবে।

পচা ফিসফিস করে বলে উঠল, 'নিয়ে যাও। নিয়ে যাও আমাকে...।'

সামনের লোকটা খনখনে গলায় হেসে উঠল।

'নিয়ে যাও! কে তোমাকে নিয়ে যাবে বাবা হিরের টুকরো? হি হি। একটু পরেই নিয়ে যাওয়া কী জিনিস বুঝতে পারবে। হি হি।'

পচা তবু চোখ বুজে ফিসফিস করে বলতে লাগল, 'নিয়ে যাও, নিয়ে যাও, নিয়ে যাও আমাকে...'

ঘটনা সত্যি। দ্বিতীয় পর্যায়ের মার শুরুর আগেই পচা জামাপ্যান্ট ভাসিয়ে বমি করে ফেলে।

প্রথমটায় ভেবেছিল, অজ্ঞান হয়ে গেছে। কিন্তু অজ্ঞান কোথায়? এই তো দিব্যি চোখ খুলে আছে। দেখতে পাচ্ছে সব। ঝুলে থাকা পা দুটো নাড়তে পারছে একটু একটু। তা হলে? তা হলে কি মার এখনও শুরু করেনি? আয়োজনের কি বাকি আছে আরও?

না, তা নয়। মার শুরু হয়ে গেছে। মঙ্গলের হাতে লাঠি। বেঁটে লাঠি। লাঠি দিয়েই সে মারছে। ভালই মারছে। কখনও পায়ের তলায়। কখনও হাঁটুতে। বেচারি মোটা মানুষ। এত লাফালাফি কি তার পোষায়? হাঁপিয়ে পড়ছে।

কে যেন বলে উঠল, 'হারামজাদার কাণ্ড দেখো। চিৎকার নাই। কান্না নাই। উলটে কেমন ড্যাবড্যাবিয়ে তাকায়! শালার শলিলে কি ব্যথা-বেদনা কিছু নাই? কষিয়ে আরও দু'ঘা লাগা।'

কষিয়ে লাগিয়েও কিছু হচ্ছে না। তা হলে কি এটা সত্যি মার নয়? এটা কোনও স্বপ্ন? কিন্তু আওয়াজ হচ্ছে যে? স্বপ্নে আওয়াজ হয় না। নাকি হয়? সে কি এমন একটা স্বপ্নের মধ্যে ঢুকে পড়েছে যেখানে মারের সময় আওয়াজ থাকে, কিন্তু ব্যথা থাকে না?

আশ্চর্য! খুবই আশ্চর্য!

ঘটনা আশ্চর্যের হলেও সত্যি। মারে আর কোনও ব্যথা নেই! শুধু তাই নয়, পচার মনে হচ্ছে, শরীরের পুরনো যন্ত্রণাগুলো যেন কমে কমে আসছে! কাঁধ দুটো আর ভারী ঠেকছে না। বরং বেশ হালকাই লাগছে। পালকের মতো? জিভের জ্বালাটাই বা কোথায়? পিঠটা যে টনটন করছিল! ওমা কী হল তার? কোথায় পালাল? মাথার যন্ত্রণাটাও যে উবেছে!

খানিক আগেই পচা বারবার কাকে নিয়ে যেতে বলেছিল জানা যায়নি। যে-ই হোক, সে পচাকে নিয়ে যেতে পারেনি। শুধু তার ব্যথাটুকু নিয়ে গেছে।

শারদীয় আজকাল, ১৪১৩

---

9 788177 569582